উদ্বোধন

উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০-০০৩

মাঘ, ১৩৮৩
৭৯তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৯তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনাঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭।।০টা হইতে ১১টা; বিকাল ২।।০টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৮৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

ডাঃ পি. মজুমদারের
এন্টিব্যাক্ট্রিন
কার্ব্বাঙ্কল কিওর (রেজিঃ)
কার্ব্বাঙ্কল, শোথ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়
বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে রোগমুক্তি
সেলিং এজেন্ট—লিটন এণ্ড কোং কলিকাতা-১৩
Antebactrin
CARBUNCLE CURE
IT CUTS
IT CLEANSES
IT CURES

গোপাল
মানে
ভাল গেঞ্জি মোজা
Gopal Hosiery. Calcutta

বেনারসী
সিল্ক
শাড়ী
পোষাক
মোহনলাল মণিলাল
ষ্টোর্স
বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট • কলি-১২
(বসুমতী ভবনের পাশে)
বউবাজার
৩৫-৮৬৩৭
শ্যামবাজার
৫৫-২০০৭
কাশ্মিরী
শাল
বিছানা
হোসিয়ারী

ভাল চা বললে
টসের
চা
এ. টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা—১

দিব্য বাণী

পদ্মাকরং দিনকরো বিকচং করোতি
চন্দ্রো বিকাসয়তি কৈরবচক্রবালম্।
নাভ্যর্থিতো জলধরোঽপি জলং দদাতি
সন্তঃ স্বয়ং পরহিতে বিহিতাভিযোগাঃ॥

এতে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থান্ পরিত্যজ্য যে
সামান্যাস্তু পরার্থমুদ্যমভৃতঃ স্বার্থাবিরোধেন যে।
তেঽমী মানুষরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিঘ্নন্তি যে
যে তু ঘ্নন্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে॥

—ভর্তৃহরি : নীতিশতকম্, ৬৩, ৬৪

পদ্মরাজি দিনকর করে প্রস্ফুটিত
কুমুদনিকর চন্দ্র করে বিকশিত
বারি বর্ষে জলধর ধরণীর 'পরে—
অযাচিতে এরা পর-উপকার করে।
এইরূপ পরহিতে স্বতঃপ্রণোদিত
যাঁরা—তাঁরা সন্ত ব'লি জগতে বিদিত।

সজ্জন তাঁরাই, স্বার্থ তেয়াগিয়া পরহিতে রত যাঁরা ;
স্বার্থ-অবিরোধে পরহিত সাধে—সাধারণ নর তারা।
স্বার্থের কারণে পরার্থ বিনাশে যত নররাক্ষসেরা ;
অকারণে যারা পরহিত নাশে, না জানি তাহারা কারা !

কথাপ্রসঙ্গে

নববর্ষ

ঈশ্বরেচ্ছায় 'উদ্বোধন' এই মাঘে ৭৯তম বর্ষে পদার্পণ করিল। একটি বাংলা সাময়িক পত্রিকার পক্ষে ৭৮ বৎসর স-মানে এবং স-সম্মানে জীবিত থাকা বিস্ময়কর মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কারণ, এই সুদীর্ঘকালের পরিসরে সাধারণ পত্র-পত্রিকার কথা দূরে থাক, অনেক প্রখ্যাত পত্র-পত্রিকাও স্ব স্ব আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিয়া যবনিকার অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। 'উদ্বোধন' যে এই বাংলার মাটিতে দৃঢ়মূল হইয়া এতকাল জীবিত আছে, ইহা কিন্তু আমাদের মনে বিন্দু-মাত্র বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কথার অনুসরণে ও অনুকরণে আমাদের অন্তরের বিশ্বাস এইভাবে ব্যক্ত করিতে পারা যায় যে, উদ্বোধন-চন্দ্রমা ৭৮ বৎসর পরেও দ্বিতীয়া তিথিতেই বিরাজ করিতেছে, রাকাশশীতে পরিণত হইয়া কলাহ্রাসের কালে পৌঁছিতে ইহার অপরিমেয় বিলম্ব আছে—যুগ যুগ ধরিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ প্রচারমাধ্যম হইয়া এই পত্রিকা দেশের ও দশের সার্বিক হিতসাধনে নিয়োজিত থাকিবে, এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সংশয় নাই।

নববর্ষের সূচনায় শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বিশেষ-ভাবে স্মরণ করি 'উদ্বোধনে'র প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দকে, যাঁহার অমোঘ জীবকল্যাণেচ্ছার বহুমুখী প্রকাশনিচয়ের অন্যতম গৌরবময় প্রকাশ এই পত্রিকা। স্মরণ করি 'উদ্বোধনে'র প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে, যিনি স্বামী বিবেকানন্দের 'উদ্বোধন'-পরিকল্পনার অনন্য রূপকার হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। স্মরণ করি পরবর্তী কালের সম্পাদকসমূহের অন্যতম—একাধারে 'উদ্বোধনে'র বিশিষ্ট লেখক ও সম্পাদক—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীকার স্বামী সারদানন্দকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ এই সকল মহাপুরুষদের স্মরণ করাই কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হওয়া। তাঁহাদের অতুলনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা নিঃস্বার্থ পরোপচিকীর্ষা অমেয় আধ্যাত্মিকতা ও অপূর্ব কর্মকুশলতার সমুজ্জ্বল আদর্শ সর্বদা পুরোভাগে রাখিয়া আমরা যেন লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হই, ইহাই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বর্ষারম্ভে 'উদ্বোধনে'র লেখক-লেখিকা গ্রাহকবর্গ পাঠকবর্গ বিজ্ঞাপনদাতা শুভানুধ্যায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের সাদর অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই এবং শ্রীভগবানের নিকট তাঁহাদের সকলেরই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। অতীতে তাঁহাদের অকুণ্ঠ সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই এবং বিশ্বাস রাখি যে, সেই স্বতঃস্ফূর্ত সহায়তা বর্তমান বর্ষে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকিবে।

'উদ্বোধন'—স্বামীজীর মমতায়

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে আমেরিকা হইতে 'উদ্বোধনে'র ভাবী সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণা-তীতানন্দকে লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্রে আছে: 'আরবীজানা মুসলমান ভায়া ধরে যদি পুরানো আরবী গ্রন্থের তর্জমা করাতে পারো, ভাল হয়। ফার্সী ভাষায় অনেক Indian History (ভারতীয় ইতিহাস) আছে। যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে তর্জমা করাতে পারো, একটা বেশ regular item (নিয়মিত বিষয়) হবে। লেখক অনেক চাই।...শশী, শরৎ, কালী প্রভৃতি সকলে পড়ে লিখতে আরম্ভ কর। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয় ?'

'উদ্বোধন'-পত্রিকাটির জন্ম ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পত্রিকাটির জন্মের তিন বৎসর পূর্ব হইতেই স্বামীজী উহাতে প্রকাশিতব্য রচনাসমূহ ও লেখক-সংগ্রহ সম্পর্কে চিন্তা করিতেছিলেন। এই চিন্তা কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। এবং যতদিন পর্যন্ত না পত্রিকাটি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে ততদিন তিনি ঐ চিন্তার বশবর্তী হইয়া একাধিক ব্যক্তিকে উৎসাহিত করিয়াছেন প্রবন্ধাদি লিখিতে ও প্রবন্ধ সংগ্রহ করিতে এবং তাঁহার জনৈক শিষ্যকে আদেশ দিয়াছেন তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ করিতে। ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া তিনি স্বয়ং লেখনী ধারণ করিয়াছেন, স্থূল শরীরে বিরাজমান থাকার প্রায় এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত। বাস্তবিক 'উদ্বোধনে'র জন্য স্বামীজীর সুগভীর মমতা আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত করে।

পত্রিকাটির জন্মের দেড় বৎসর পূর্বে, ১১ই জুলাই ১৮৯৭, স্বামীজী আলমোড়া হইতে তাঁহার শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দকে লিখিলেন: '... যে বাঙলা কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্য প্রবন্ধ ও প্রয়োজনীয় উপাদান যেন তারা [স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ] পাঠায়।'

ইহারও প্রায় দুই মাস পূর্বে স্বামীজী শুদ্ধানন্দজীকে 'রাজযোগ'-গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করিতে বলেন। এবং শুদ্ধানন্দজীও তখনই উহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ফলতঃ আমরা দেখি উদ্বোধনের ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যাতেই 'রাজযোগ' হইতে অনূদিত 'রাজযোগ'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এবং ২য় সংখ্যায় 'প্রাণায়াম'-শীর্ষক আরেকটি অনূদিত প্রবন্ধ। সম্পূর্ণ অনূদিত 'রাজযোগ' অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া যাওয়ায় 'উদ্বোধনে' উহা আর প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু স্বামীজীর 'জ্ঞানযোগ' ও অন্যান্য বক্তৃতাবলী শুদ্ধানন্দজী কর্তৃক অনূদিত হইয়া 'উদ্বোধনে'র ২য় বর্ষ হইতে ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইয়া পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। কোন সন্দেহ নাই, এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল স্বামীজীরই অনুপ্রাণনা।

'উদ্বোধনে'র জন্মের বৎসরাধিক কাল পূর্বেই যে স্বামীজী উহার জন্য অসুস্থ শরীরেই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার একটি পত্র হইতে জানা যায়। ১১ই অক্টোবর, ১৮৯৭ তারিখে মরী হইতে স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে লেখেন: 'আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর[১] article (প্রবন্ধ) লিখেছি।'

এইভাবে নানা অসুবিধা অতিক্রম করিয়া 'উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্রিকারূপে ১লা মাঘ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। স্বামীজী স্বয়ং উহার 'প্রস্তাবনা' লিখিয়া দেন—উহাই প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ।[২] দ্বিতীয় সংখ্যাটির প্রথম রচনা স্বামীজীর 'সখার প্রতি' কবিতা। তৃতীয় সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ স্বামীজী লিখিত 'জ্ঞানার্জন'। পঞ্চম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ স্বামীজী লিখিত 'ম্যাক্‌সমূলার কৃত রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি।' প্রত্যেকটি সংখ্যার প্রথম প্রচ্ছদে "প্রধান লেখক" হিসাবে স্বামীজীর নাম মুদ্রিত থাকিত। স্বামীজী দেখিলেন, দুই-একটি

১ 'উদ্বোধনে'র ভাবী সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের জন্য।

২ 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'য় 'বর্তমান সমস্যা' শিরোনামে প্রকাশিত।

(৬।২৯, ১ম সং)

প্রবন্ধ বা কবিতায় কুলাইবে না—ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। ফলতঃ অব্যবহিত পরবর্তী সংখ্যা—ষষ্ঠ সংখ্যা (১৫ই চৈত্র, ১৩০৫) —হইতেই স্বামীজীর রচিত 'বর্তমান ভারত' ধারাবাহিক প্রবন্ধরূপে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইতে থাকে। ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ১০ম ও ১১শ সংখ্যায় (১লা আষাঢ়, ১৩০৬) উহা মুদ্রিত হয়। এই পাঁচটি কিস্তিতে প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হয় নাই—সামান্য কিছু অংশ বাকি থাকিয়া যায়। ১১শ সংখ্যা প্রকাশিত হইবার এক সপ্তাহের মধ্যেই (২০শে জুন, ১৮৯৯) স্বামীজী দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্যযাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। রওনা হইবার পূর্বে 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামীজীকে অনুরোধ করেন, তিনি যেন তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত 'উদ্বোধনে' প্রকাশ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠান। স্বামী তুরীয়ানন্দকেও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ 'গুপ্ত উপদেশ' দেন, তিনি যেন 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য স্বামীজীকে তাগাদা দেন।

পাঁচ মাসের একটি শিশুসন্তানকে—একান্ত আপন জনের নিকট হইলেও—রাখিয়া জননীকে যদি দূরদেশে গমন করিতে হয়, তাহা হইলে জননী-হৃদয়ে যে মমতার উদ্রেক হয়, সেই মমতাই আমরা লক্ষ্য করি স্বামীজীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনায়। জাহাজেই তিনি 'বিলাতযাত্রীর পত্র' লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৯শে জুলাই ১৮৯৯, মিস ম্যাকলাউডকে লিখিত ভগিনী নিবেদিতার পত্রে উহার হৃদয়গ্রাহী সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। জাহাজে থাকাকালীন নিবেদিতা লিখিয়াছেন:

'রাজা (স্বামীজী) তাঁর বাংলা পত্রিকার জন্য ঘাড় গুঁজে দাসের মত খাটছেন ক্যাবিনে বসে। ... বাংলা পত্রিকাটি তাঁর কাছে কী না আশীর্বাদের মত হয়েছে, তোমাকে তা বলা দরকার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এর জন্য একটি দীর্ঘপত্র রচনা করছেন—মজাদার রসিকতায় তা পূর্ণ, সেইসঙ্গে টিপ্পনী ও মন্তব্য এবং আর্ত ভবিষ্যৎবাণী। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন।'[৩]

২০শে জুন হইতে ৩১শে জুলাই, ১৮৯৯—প্রায় দেড় মাসের এই সমুদ্রযাত্রায় 'বিলাত-যাত্রীর পত্র'টি সম্পূর্ণ হয়। 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের ১৫শ সংখ্যা (১লা ভাদ্র, ১৩০৬) হইতে ২৩শ সংখ্যা (১লা পৌষ, ১৩০৬) পর্যন্ত প্রতি সংখ্যায় এবং দ্বিতীয় বর্ষের ৩য় (১লা ফাল্গুন, ১৩০৬), ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় (১লা চৈত্র, ১৩০৬) উহা সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। শেষ পত্রটির শেষাংশে আছে: 'নেপলস্ ত্যাগ ক'রে জাহাজ মার্সাইতে লেগেছিল, তারপর একেবারে লণ্ডন।' এবং একেবারে শেষের কথাগুলি শুধু 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের অথবা স্বামীজীর অন্যান্য গুরুভাই বা শিষ্যমণ্ডলীর জন্যই নহে—ভারতের তথা বিশ্বের সকল মহান কর্মীদের জন্যই। সেই চিরকালের প্রেরণাপ্রদ কথাগুলি হইল: 'বড় মানুষ, পণ্ডিত, ধনী—এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না; এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না; কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে—এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যত হবে ততই ভাল। বাধা

৩ নিবেদিতা লোকমাতা, পৃঃ ৬৯

না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিস যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিস প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই তো সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ। বাধাও নাই, সিদ্ধিও নাই। অলমিতি।'

স্বামীজী লণ্ডনে পৌঁছিয়াছিলেন ৩১শে জুলাই, ১৮৯৯। সুতরাং 'বিলাতযাত্রীর পত্র' আর 'প্রেরণ' করার প্রয়োজন না থাকায় তিনি উপসংহারে 'অলমিতি' লেখেন। সাত মাস ধরিয়া 'উদ্বোধনে'র মোট বারটি সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয়। প্রথম পত্র-প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের অগস্টের মাঝামাঝি—স্বামীজী তখন লণ্ডনে অথবা গ্লাসগো হইতে মার্কিনগামী জাহাজে। শেষ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের মাঝামাঝি—স্বামীজী তখন উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায়।

মার্কিনদেশে প্রচারকার্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিলেও 'উদ্বোধনে'র প্রতি স্বামীজীর মমতায় বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়ে নাই। তিনি বিস্মৃত হন নাই যে, 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধটির অবশিষ্ট অংশ লিখিয়া উহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। সুতরাং 'বিলাতযাত্রীর পত্র' 'উদ্বোধনে' সাত মাস ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া সমাপ্ত হওয়ায় তিনি 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করেন এবং 'উদ্বোধনে'র ২য় বর্ষের ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় (১লা ও ১৫ই বৈশাখ, ১৩০৭—১৯০০ খ্রীঃ এপ্রিলের মাঝামাঝি ও শেষ) উহা প্রকাশিত হয়। অতএব দেখা যায়, প্রায় দশ মাসের ব্যবধানে অনুবৃত্ত হইয়া 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়। স্বামীজী তখনও উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায় বেদান্ত-প্রচারে নিরত।

'বর্তমান ভারত' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ায় স্বামীজী 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হন।[৪] 'উদ্বোধনে'র ২য় বর্ষের ১০ম, ১১শ, ১২শ ও ১৯শ—এই চারিটি সংখ্যায় উহার কিয়দংশ প্রকাশিত হয় (১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭ হইতে ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০৭ —১৯০০ খ্রীঃ জুন মাসের শেষ হইতে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি)।

ইহার পর ৯ই ডিসেম্বর ১৯০০, স্বামীজী পাশ্চাত্যদেশ হইতে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯০১ সালের জানুআরির শেষ হইতে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র অবশিষ্ট অংশ তৃতীয় বর্ষের ২য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম—এই চারিটি সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ায় ধারাবাহিক প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্বামীজী 'বিলাতযাত্রীর পত্র' শেষ করিলেও মার্কিন মুলুকে প্রচারকার্য শেষ করিয়া ভারতের পথে যখন ইউরোপে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখেন। স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার পরই উহা 'উদ্বোধনে'র ৩য় বর্ষের ১ম (১৯০০ খ্রীঃ জানুআরির মাঝামাঝি) ও ৩য় সংখ্যায় (১৯০০ খ্রীঃ ফেব্রুআরির মাঝামাঝি) 'পরিব্রাজক' নামে প্রকাশিত হয়।[৫]

৪ স্বামীজী কোন্ সময়ে ইহা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন, সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। 'উদ্বোধনে' যে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল, তদনুসারেই বাক্যটি লিখিত হইল। বলা বাহুল্য, রচনার কাল সম্পর্কে গবেষণার অবকাশ আছে।

৫ পরবর্তী কালে (১৩১২ বঙ্গাব্দে) 'বিলাতযাত্রীর পত্র' ও 'পরিব্রাজক' একত্রে 'পরিব্রাজক' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে স্বামীজীর কাগজপত্রের মধ্যে আরও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কতক সবিস্তারে কতক ডায়েরির আকারে পাওয়া যায় এবং ১৩১৮ বঙ্গাব্দে উহা 'পরিব্রাজক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তৃতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যায় (১লা বৈশাখ, ১৩০৮) 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সমাপ্ত হইবার পর স্বামীজীর আর কোনও মৌলিক রচনা ঐ বর্ষে এমনকি চতুর্থ বর্ষের ৮ম সংখ্যা (১৫ই বৈশাখ, ১৩০৯) পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তবে স্বামীজীর ইংরেজী 'জ্ঞানযোগে'র বক্তৃতাগুলি স্বামী শুদ্ধানন্দজী কর্তৃক অনূদিত হইয়া দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল এবং দেখা যায়, যে-সংখ্যা হইতে স্বামীজী লেখনীকে বিরাম দিলেন, ৩য় বর্ষের সেই ৮ম সংখ্যা হইতে শুরু করিয়া ৪র্থ বর্ষের ৭ম সংখ্যা পর্যন্ত—প্রত্যেকটি সংখ্যায় 'জ্ঞানযোগে'র একটি এবং প্রায়ই দুইটি বক্তৃতা 'ক্রমশঃ' আকারে একই সংখ্যায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এবং ৭ম সংখ্যাটিতেই বাংলা 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়। পত্রিকাটি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছে দেখিয়া এবং যাহাতে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর হয়, সেইজন্য স্বামীজী স্বয়ং আর লেখনী ধারণ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, এইরূপই মনে হয়।

চতুর্থ বর্ষের ৯ম সংখ্যায় (১লা আষাঢ়[৬] ১৩০৯) 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ'-শীর্ষক স্বামীজীর বিখ্যাত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।[৭] উহাই স্বামীজীর জীবৎকালে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত শেষ মৌলিক প্রবন্ধ।[৮] ২০শে আষাঢ় ১৩০৯, স্বামীজী মহাসমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন। 'উদ্বোধনে'র জীবনে তখন সাড়ে তিন বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, স্বামীজীর যে স্নেহমমতায় 'উদ্বোধন' এ যাবৎ লালিত হইতেছিল, তাহাতে ছেদ পড়িল। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই? আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, 'উদ্বোধনের' যখন আড়াই বৎসরও পূর্ণ হয় নাই, তখনই স্বামীজী লেখনীকে বিরাম দিয়াছিলেন। ইহাকেও মমতারাহিত্যের নিদর্শন বলিয়া মনে করিতে পারি না। বরং মমতারই পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। কারণ, তিনি চাহিয়াছিলেন, অতঃপর তাঁহার গুরুভাই ও শিষ্যগণই পত্রিকাটি পরিচালনা করেন। এই মনোভাবের ভিতর আবার মমতার স্বাক্ষর কোথায়?—এই প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। উত্তরে বলিতে হয়, যিনি নির্মায় ব্রহ্মবস্তু করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া বিলোমমার্গে 'অহং'-কার ও

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'ও যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে স্বামীজীর দেহ-ত্যাগের পরে প্রাপ্ত কাগজপত্র হইতে স্বল্পাবয়ব 'পরিশিষ্ট'টি সংযোজিত হয়।

৬ তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যাদ্বয় প্রকাশিত হইত না। এইজন্য ১৫ই বৈশাখের অষ্টম সংখ্যার পর নবম সংখ্যাটি একেবারে ১লা আষাঢ়ে প্রকাশিত হয়।

৭ এই প্রবন্ধটি ১৮৯৮ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের সময়ে পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। মরী হইতে ১১ই অক্টোবর, ১৮৯৭ তারিখের পূর্বোক্ত চিঠিতে উল্লিখিত প্রবন্ধটি, এইটি অথবা 'উদ্বোধনে'র 'প্রস্তাবনা' কিংবা অন্য কোনও প্রবন্ধ, তাহা গবেষণার বিষয়।

৮ স্বামীজীর দেহান্তের পর 'উদ্বোধনে'র ৫ম, ৭ম ও ৯ম বর্ষে তাঁহার কয়েকটি মৌলিক রচনা—কবিতা, স্তব ও সঙ্গীত—প্রকাশিত হয়। স্বামীজীর জীবৎকালে প্রকাশিত 'বর্তমান ভারত', 'বিলাতযাত্রীর পত্র' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'— এই তিনটি ধারাবাহিক প্রবন্ধের উল্লেখ আমরা বিশেষভাবে করিয়াছি। এইগুলি ছাড়াও উদ্বোধনের ১ম ও ২য় বর্ষে কিছু মৌলিক রচনা—কবিতা, স্তব ও ক্ষুদ্র নিবন্ধ—প্রকাশিত হয়। উহাদের কয়েকটির উল্লেখ আমরা করিয়াছি।

'মম'-কার বৃত্তি অবলম্বনে 'জগদ্ধিতায়' কর্ম-নিরত, সেই মহামানবের 'মম'-তা তো তথা-কথিত সাধারণ মমতা নহে যে, উহা অনায়াস-বোধ্য হইবে। সেই মমতার স্বরূপের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়, মহাপ্রস্থানের প্রায় তিন মাস পূর্বে কথিত তাঁহার এই উক্তিটিতে : 'বড় গাছের ছায়া ছোট গাছগুলোকে বাড়তে দেয় না ; তাদের জায়গা ক'রে দেবার জন্য আমাকে যেতেই হবে।' 'যেতেই হবে'—ইহার প্রকৃত তাৎপর্য হইল : 'স্ব-ইচ্ছায় যাইব।' ইচ্ছা-মৃত্যু তো তাঁহার!—বাবা অমরনাথের বরে। স্বার্থশূন্য কতখানি গভীর মমতা থাকিলে মানুষ ঐরূপ কথা বলিতে পারে এবং ঈশ্বরানুগ্রহে তদনুযায়ী কার্যও করিতে পারে! এই মমতার তুল্য বিচিত্রতর পবিত্রতর ও সুন্দরতর ভাব জগতে কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে!

স্বামীজীর আরেকটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে : 'যতদিন না আমার দেহত্যাগ হচ্চে, অবিশ্রান্তভাবে কাজ ক'রে যাবো ; আর মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাকবো।'

সত্যসন্ধ স্বামীজীর বাণী ব্যর্থ হইবার নহে। এবং আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, বিগত ৭৮ বৎসরে 'উদ্বোধনে'র যে-অগ্রগতি, তাহা স্বামীজীরই মমতায় এবং সেই অপার্থিব মমতা চিরন্তন প্রেরণারূপে 'উদ্বোধনে'র জয়যাত্রা নব নব সার্থকতায় মণ্ডিত করিবে।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : **পুনঃ** পশ্চাৎ **তৎ** ব্রহ্ম অস্মি ইতি অভ্যাস-ব্যগ্রং চিত্তম্ **অত্র এব** ব্রহ্মাত্মনি এব **বিলাপ্য** বিলয়ং প্রাপয্য **চিত্তে ক্ষীণে** লীনে সতি ধ্যান-ব্যাপারাৎ উপরতে সতি, **তাদৃশিঃ অস্মি ইতি**। স্বপ্রকাশ-চিদ্রূপঃ পরমাত্মা অস্মি ইতি যং বিষ্ণুং বিদুঃ ইতি অর্থঃ। তৎ উক্তং ভারতীতীর্থৈঃ,—'নির্গুণোপাসনং পক্কং সমাধিঃ স্যাচ্ছনৈস্ততঃ। যঃ সমাধির্নিরোধাখ্যঃ সোঽনায়াসেন লভ্যতে॥' (পঞ্চদশী, ৯।১২৬) 'নিরোধলাভে পুংসোঽন্তরসঙ্গং বস্তু শিষ্যতে। পুনঃ পুনর্বাসিতেঽস্মিন্ বাক্যাজ্জায়েত তত্ত্বধীঃ॥' (পঞ্চদশী, ৯।১২৭) ইতি। শ্রুতিশ্চ—'যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥' (কঠ উ. ১।৩।১৩) ইতি। অস্যাঃ চ অয়ম্ অর্থঃ—প্রাজ্ঞো বিবেকী মুমুক্ষুঃ পুরুষঃ বাক্ বাচং মনসি নিযচ্ছেৎ নিরুন্ধ্যাৎ। বাগ্গ্রহণং সর্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ উপলক্ষণম্। প্রথমং বাগাদীন্দ্রিয়-ব্যাপারং বিহায় মনোমাত্র-ব্যাপারেণ অবতিষ্ঠেত ইতি অর্থঃ। তৎ মনঃ জ্ঞানে আত্মনি দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপার-সাক্ষিণি চিৎপ্রকাশে আত্মনি যচ্ছেৎ। মনআদিষু আত্মবুদ্ধিং বিহায় তৎ-সাক্ষিচৈতন্যে এব আত্মবুদ্ধিং কুর্যাৎ ইতি অর্থঃ।

তদুক্তম্ আচার্যৈঃ—'সত্যানন্দস্বরূপং ধীসাক্ষিণং জ্ঞানবিগ্রহম্। চিন্তয়াত্মতয়া নিত্যং ত্যক্ত্বা দেহাদিগাং ধিয়ম্॥' ইতি।

অনুবাদ: **পুনঃ**—তদনন্তর **তৎ**—'আমি ব্রহ্ম', এইরূপ অভ্যাস-তৎপর চিত্তকে **অত্র এব**—ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতেই **বিলাপ্য**—বিলীন করিয়া **চিত্তে ক্ষীণে**—চিত্ত (ঐরূপে) বিলীন হইলে অর্থাৎ ধ্যানব্যাপার হইতে উপরত[১] হইলে **তাদৃশিঃ অস্মি ইতি**—'স্বপ্রকাশ-চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাই আমি', এইরূপে **যং**—যাঁহাকে (যে ব্যাপক বিষ্ণুকে) **বিদুঃ**—(মুমুক্ষুগণ) জানিয়া থাকেন (সংসারের কারণীভূত অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি।), ইহাই অর্থ।

এইজন্যই (আচার্য) ভারতীতীর্থ বলিয়াছেন: 'নির্গুণোপাসনং পক্বং…তত্ত্বধীঃ।'[২]

শ্রুতিও (এই কথাই) বলিয়াছেন: 'যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসী … আত্মনি।'[৩] এই শ্রুতির (টীকাকার-কৃত) অর্থ: প্রাজ্ঞ অর্থাৎ বিবেকী মুমুক্ষু পুরুষ বাগিন্দ্রিয়কে মনে নিরোধ করিবে। এখানে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই উপলক্ষণরূপে (অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই বুঝাইবার জন্য) বাগিন্দ্রিয় গৃহীত হইয়াছে। (অভ্যাসকালে) প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার পরিত্যাগপূর্বক মনের ব্যাপারমাত্রই অবলম্বন করিবে, ইহাই অর্থ। তাহার পর সেই মনকে জ্ঞানাত্মা অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদিক্রিয়ার সাক্ষিস্বরূপ চিৎপ্রকাশ প্রত্যগাত্মাতে বিলীন করিবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, মন আদি পদার্থে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের (মন প্রভৃতির) সাক্ষিচৈতন্যেই আত্মবুদ্ধি করিবে। আচার্যও এই কথাই বলিয়াছেন: 'সত্যানন্দস্বরূপং… ধিয়ম্।'[৪]

১ পূর্বে 'অভ্যাস-ব্যগ্র' চিত্তের কথা বলা হইয়াছে। উহার অর্থই হইল ধ্যানপরায়ণ চিত্ত। এইরূপ চিত্ত ব্রহ্মে বিলীন হইলে যাবতীয় চিত্তবৃত্তির নিরোধ ঘটে। সুতরাং ধ্যানব্যাপারেরও বিরতি হয়।

২ টীকাকার পঞ্চদশীর এই দুইটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই। প্রথম শ্লোকটির অর্থ: নির্গুণ উপাসনা পরিপক্ক হইলে (সবিকল্প) সমাধি হয়; তাহার পর ধীরে ধীরে (ক্রমশঃ) নিরোধনামক যে (নির্বিকল্প) সমাধি, তাহা অনায়াসে লাভ হয়। দ্বিতীয় শ্লোকটির অর্থ: (উক্ত) নিরোধ (-সমাধি) লাভ হইলে (মুমুক্ষু) পুরুষের অন্তরে অসঙ্গ (কূটস্থচৈতন্য) (চিদ্-) বস্তুই অবশিষ্ট থাকে। এই অসঙ্গ বস্তু পুনঃ পুনঃ ভাবিত হইলে ('তত্ত্বমসি' প্রভৃতি) মহাবাক্য হইতে ('আমিই ব্রহ্ম'—এইরূপ অপরোক্ষ) তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

৩ কঠোপনিষদের এই শ্লোকটির অর্থ: বিবেকী পুরুষ ইন্দ্রিয়বর্গকে মনে অর্পণ করিবেন, মনকে প্রকাশাত্মক বুদ্ধিতে অর্পণ করিবেন, বুদ্ধিকে প্রথমজ মহত্তত্ত্বে অর্পণ করিবেন এবং উক্ত মহান্ আত্মাকে সর্ববিক্রিয়া-রহিত মুখ্য আত্মাতে লয় করিবেন।

৪ টীকাকার কর্তৃক উদ্ধৃত এই শ্লোকটির আকর পাওয়া যায় নাই। শ্লোকটির অর্থ: দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সত্যানন্দস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিসাক্ষী (প্রত্যগ্-) আত্মাকেই নিজের আত্মারূপে নিয়ত চিন্তা করো।

কঠোপনিষৎপ্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

যমরাজ চেষ্টা করেছেন নচিকেতা যাতে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ পরিত্যাগ ক'রে অন্য কোন বিষয় স্বীকার করেন তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই বিভ্রান্ত হবার ন'ন। তাঁর যে সিদ্ধান্ত—'আমি ঐ আত্মতত্ত্বই চাই এবং আত্মতত্ত্বের তুলনায় অন্য সমস্ত জিনিস অকিঞ্চিৎকর'—সেই সিদ্ধান্তে, সেই শ্রদ্ধায় তিনি অটল ছিলেন। যখন কিছুতেই তাঁকে প্রলোভিত করা গেল না, তখন যমরাজ বুঝলেন যে, নচিকেতা যোগ্য অধিকারী। প্রশংসা ক'রে তিনি পরে (১৷২৷৯) বলেছেন—'আমার যেন তোমার মত প্রশ্নকর্তা হয়।' অর্থাৎ শিষ্য যদি পেতে হয়, তবে তিনি যেন নচিকেতার মত শিষ্য পান। শিষ্য সম্পর্কে গুরু এর চেয়ে বড়ো প্রশংসা-বাক্য আর কিছু বলতে পারেন না।

নচিকেতাকে যমরাজ বহু রকমে পরীক্ষা করেছেন। সর্বপ্রকারে নচিকেতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এখন যমরাজ তাঁকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করছেন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে। গোড়াতেই কিন্তু বলছেন না আত্মতত্ত্বের কথা। আমরা দেখবো প্রথমে তার ভূমিকা হিসেবে তিনি বলছেন যে, জগতে দুটি জিনিস পাওয়ার মত আছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা এ জিনিসের জন্য হতে পারে—একটি শ্রেয় আর একটি প্রেয়। কেন এই শ্রেয় আর প্রেয়ের কথা বলতে গেলেন প্রথমেই? কারণ, আত্মতত্ত্ব শোনার আগে আত্মতত্ত্ব ধারণা করার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। প্রেয়কে পরিত্যাগ ক'রে শ্রেয়কে সর্বান্তঃকরণে বরণ না ক'রলে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হ'লে এটি হচ্ছে pre-condition, পূর্বশর্ত, পূর্বভূমিকা। এটি হলে তবে আত্মতত্ত্বের অধিকার হবে, তা না হলে নয়।

আত্মতত্ত্ব জানা কেবল বুদ্ধির কসরতের দ্বারা হবে না। কেউ যদি বুদ্ধিমান হয়, তো সে যুক্তির সাহায্যে অপরের যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারে। এমন যুক্তি নেই, যার খণ্ডন বেরোয়নি। সুতরাং শুধু যুক্তির সাহায্যে কাউকে আত্মতত্ত্ব বোঝানো যায় না। তা যদি যেতো, তা হলে ব'লে দিলেই হোত যে, আত্মা এই রকম। আগে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, তাই যমরাজ শ্রেয় আর প্রেয়ের উল্লেখ ক'রে বললেন, প্রেয়কে ছাড়তে হবে, শ্রেয়কে মাত্র বরণ করতে হবে। তবে আত্মজ্ঞান লাভ হবে।

আত্মজ্ঞান এরকম দুরূহ কেন? না—আমাদের মন যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়াসক্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিষয়ের রাগে রঞ্জিত, ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মতত্ত্ব ধারণা করতে পারে না। যেমন 'কথামৃতে' আমরা দেখেছি মাস্টারমশাই বলছেন, 'একি অঙ্কশাস্ত্র, না ইতিহাস, না সাহিত্য যে পরকে বুঝাবো?' ঠিক এরকম কথা এখানে যে, আত্মতত্ত্ব কি সাহিত্য, না গণিত, না এরকমেরই একটা কিছু যে, বুদ্ধির সাহায্যে বোঝানো যাবে? প্রশ্ন হতে পারে, যদি বুদ্ধির সাহায্যে বোঝানো না যায়, তা হ'লে আর অন্য কী উপায় আছে? যমরাজ তো কিছু অলৌকিক উপায় অবলম্বন করেননি, কোন রকম যাদুবিদ্যা

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট)।

প্রয়োগ করেননি, বুদ্ধির সাহায্যে শব্দ দিয়েই বুঝিয়েছেন—মানুষ যেভাবে বোঝে এবং বোঝায় তা-ই করেছেন। ঠিক কথা, কিন্তু লক্ষণীয় যে, যমরাজ আত্মজ্ঞ এবং নচিকেতাও প্রেয়কে ত্যাগ ক'রে শ্রেয়কে অবলম্বন করায় যোগ্য অধিকারী। সুতরাং এই দুটি শর্ত রয়েছে আত্মজ্ঞান-লাভের ক্ষেত্রে।

আবার প্রশ্ন হ'তে পারে, যখন কোন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত পড়তে যান, তখন অধ্যাপক তো বলেন না—আগে প্রেয়কে ত্যাগ ক'রে এসো, তবে পড়াবো। তিনি যা বলেন, তার দ্বারা কি বেদান্ত বোঝানো যায় না? এ প্রশ্নের দুটি উত্তর—যায় এবং যায় না। বুদ্ধির দ্বারা যতটুকু বোঝাবার ততটুকু তিনি বোঝান, কিন্তু শুধু বুদ্ধির দ্বারা বেদান্তের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। পুঁথিগত বেদান্ত-তত্ত্ব শুনে আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আসল উদ্দেশ্য কী? না—এই তত্ত্বকে জেনে সমস্ত অনাত্ম-বন্ধন যা রয়েছে, তা থেকে মুক্ত হওয়া। এই যে বন্ধন-মুক্তি, শাস্ত্রে যাকে অজ্ঞানের নিবৃত্তি বলা হয়েছে, তা হ'তে হ'লে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার চাই—তত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান চাই। বুদ্ধিপূর্বক যে জ্ঞান, প্রত্যক্ষের দ্বারা যা অর্জিত নয়, তাকে বলা হয় পরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞান হ'লে প্রত্যক্ষ যে অজ্ঞান, তা দূর হয় না। এটি পরিষ্কার ক'রে বু'ঝে রাখতে হবে যে, অজ্ঞানটা আমাদের প্রত্যক্ষ। আমরা সাক্ষাৎভাবে অজ্ঞান অনুভব করছি, যুক্তির সাহায্যে নয়। এই সাক্ষাৎভাবে অনুভূত যে অজ্ঞান, প্রত্যক্ষ যে অজ্ঞান, তা দূর করতে গেলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান চাই। অন্য কোন উপায়ে এই প্রত্যক্ষ অজ্ঞান দূর হয় না। লেকচার শুনে পরোক্ষ জ্ঞান হবে—অপরোক্ষ জ্ঞান হবে না। বেদান্তের ভাল অধ্যাপক—ভাল বক্তা—বুদ্ধির দ্বারা বেদান্ত বুঝিয়ে দেবেন। শুনে মনে হবে, যা বলেছেন, খাঁটি কথা, এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু তবু মনে হবে যে, সবই তো বললেন, কিন্তু…। 'কিন্তু' কথাটা রয়েই যাবে। অর্থাৎ সব কথাই তো বলা হ'ল কিন্তু সংশয় যাচ্ছে না। অসংশয়িত জ্ঞান হচ্ছে না। মনে মনে কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে, যে খটকাকে হয়তো পরিষ্কার ক'রে ভাষায় প্রকাশ করতে পারা যাচ্ছে না। এইজন্য বলে যে, তত্ত্বকে পরোক্ষ করলে কাজ হবে না, অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করতে হবে।

এখানে আর একটি কথা। এটা শাস্ত্রের একটি সূক্ষ্ম কথা। পরোক্ষ জ্ঞান কা'কে বলে? না—যা আমাদের সাক্ষাৎ অনুভূত নয়। যেমন একটা শহরের কথা শুনলুম বা বইতে পড়লুম। এটা পরোক্ষ জ্ঞান। আবার অনুমানাদির দ্বারাও যে জ্ঞান হয়, তাও পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান কখনও পরোক্ষ হয় না। আত্মাকে জানে না, তাঁকে অনুভব করছে না, এমন কোন নির্বোধ নেই। যতই নির্বোধ, যতই জড়বুদ্ধি হোক না কেন, কেউ কখনও মনে করে না—আমি নেই। সুতরাং, আমার সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান কখনও পরোক্ষ হয় না। তাহলে আত্মার সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান আর অপরোক্ষ জ্ঞান—এই দুটি বিভাগ কেমন ক'রে হ'তে পারে? হ'তে পারে এইভাবে যে, আত্মার সম্বন্ধে যে জ্ঞানটি সাধারণ মানুষের হচ্ছে, তা অসন্দিগ্ধ, অবিপর্যস্ত নয়। সংশয়-বিপর্যয়-রহিত জ্ঞান হচ্ছে না। সংশয় রয়েছে—আত্মা কি এমন না অন্য রকম? বিপর্যয় রয়েছে—আত্মাকে কর্তা, ভোক্তা ব'লে মনে করছে। এই সংশয় এবং বিপর্যয় যে জ্ঞানের ভেতরে রয়েছে, সেই জ্ঞানকে কার্যতঃ পরোক্ষ

জ্ঞানই বলতে হবে। অর্থাৎ ফলে দাঁড়াচ্ছে পরোক্ষ। যতই আমাকে বুদ্ধির সাহায্যে বোঝানো যাক যে আমি কর্তা, ভোক্তা নই, প্রতি পদে আমার মনে হচ্ছে যে, আমি কর্তা, ভোক্তা। হাজার বার 'আত্মা জ্ঞানস্বরূপ' বললেও, আমি সর্বদা অনুভব করছি যে, আমি অজ্ঞ। সুতরাং প্রত্যক্ষ অনুভূত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানকে যুক্তির সাহায্যে মিথ্যা প্রমাণিত করা যতই হোক, তা কিছুতেই দূর হবে না। অতএব বন্ধন-মুক্তিও হবে না।

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধন-মুক্তি। সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমানন্দের প্রাপ্তি আমাদের উদ্দেশ্য। আত্মতত্ত্ব অনুশীলন করছি সেইজন্য। 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ'—যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি শোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান। উপনিষৎ পাঠের উদ্দেশ্য এই। নতুবা কতকগুলি শব্দ জেনে লাভ নেই কিছু। শব্দগুলিকে সুবিন্যস্তভাবে ব'লে অপরকে মোহিত করাও উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হ'ল কি ক'রে আমরা অজ্ঞানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। এই কথাটুকু মনে রাখতে হবে। আমাদের প্রয়োজন কি, সে-সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। অনুবন্ধ-চতুষ্টয় যখন আলোচনা করেছি, তখন বলেছি উপনিষৎ-পাঠের প্রয়োজন কি। বলেছি বেদান্ত-অধ্যয়ন 'কাকদন্তপরীক্ষা ইব' নয়। কাকের দাঁত নেই, তবু যদি কেউ তার দাঁত আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখতে যায়, সে-কাজটা নিষ্ফল হয়। বেদান্তের অন্বেষণ সে-রকম নয়—নিষ্ফল নয়, ব্যর্থ নয়। এখানে আমাদের দারুণ একটা প্রয়োজন রয়েছে। অজ্ঞান-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই সেই প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন যদি সিদ্ধ না হয়, তা হ'লে সে-বেদান্তে আমাদের কোন লাভ হবে না, সে-বেদান্তে আমাদের প্রবৃত্তি হবে না, রুচি হবে না। আমরা সেরকম বেদান্ত চাই না। কাজেই আসল বেদান্তজ্ঞান পেতে হলে যে-জ্ঞান আমার কাছে অসন্দিগ্ধ এবং অবিপর্যস্ত—অসম্ভাবনা-ও বিপরীত-ভাবনা-রহিত, সেই জ্ঞান আমার প্রয়োজন, কারণ তার দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হবে, অন্য কোন প্রকারেই নয়। কাজেই, যমরাজ প্রথমেই বললেন যে, এই রকম জ্ঞান লাভ করতে হ'লে একটিমাত্র উপায় আছে। সেটি হচ্ছে, প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে ধরা।

এই জগতের সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটি শ্রেয়, অপরটি প্রেয়। দুটিই মানুষের প্রয়োজন মনে হয়। মানুষের স্বভাব অনুসারে তারা দুটিকে চায়। অধিকাংশ মানুষই প্রেয়কে চায়। প্রেয় অর্থাৎ ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি—এর ভিতরে স্বর্গাদিও পড়ে যাবে। এ সব অনিত্য সুখ, 'উৎপাদ্য' সুখ, যা উৎপন্ন করা যায়, যা কর্মের দ্বারা লাভ করতে হয়। এই রকম সুখ মানুষের কাম্য। আবার দুঃখের পরিহারও মানুষের কাম্য। সকলেরই প্রবৃত্তি এইভাবে চলেছে। কি জন্য আমরা ছুটছি জীবনের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত? বিরামহীন এই অন্বেষণ! কিন্তু কী খুঁজছি? সুখের প্রাপ্তি, দুঃখের পরিহার—ইহলোকে এবং পরলোকেও। পরজগতেও আমরা সুখ চাই এবং তার সঙ্গে যে দুঃখ মিশ্রিত আছে, তা চাই না। দুঃখকে এড়াতে চাই। এরই জন্য সকলে ছুটছি। অধিকাংশ লোক ঐহিক বা পারত্রিক এই ইন্দ্রিয়-সুখ, যাকে 'জন্য' সুখ বা 'উৎপাদ্য' সুখ বলে, সেই সুখেই বা সেই সুখের অন্বেষণেই ব্যাপৃত। তাতেই মশগুল। এই সুখের প্রাপ্তি বা দুঃখের নিবৃত্তির জন্য তারা এমন ব্যাপৃত যে, আর অন্য দিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। প্রেয় তাদের

পেয়ে বসেছে। কিছুতেই এই প্রেয়ের অন্বেষণ থেকে অবকাশ নিয়ে তারা অন্য জিনিস অন্বেষণ করতে পারছে না। আপাত-দৃষ্টিতে যেখানে আমরা মনে করি প্রেয়ের অন্বেষণ নয়, যেমন ঐতিহাসিকের বা বৈজ্ঞানিকের অন্বেষণ, সেখানেও সাক্ষাৎভাবে প্রেয়ের অন্বেষণ দেখা না গেলেও, গৌণভাবে প্রেয়েরই অন্বেষণ রয়েছে। ভেতরে একটু অভিমান আছে যে, আমি একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করবো, একটা সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করবো বড় দার্শনিক হিসেবে, বড় বৈজ্ঞানিক হিসেবে, বা বড় ঐতিহাসিক হিসেবে। সেই প্রতিষ্ঠা অপর সকলকে তাক্ লাগিয়ে দেবে—এই রকম ভেতরে একটু আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়, যতই আমরা মনে করি না কেন নিরাকাঙ্ক্ষ হয়ে অন্বেষণ করছি। সুতরাং এক কথায় এই প্রেয়কে নিয়ে সবাই ব্যাপৃত।

আর এক দল আছেন, যাঁরা বলেন, আচ্ছা এর একটু, ওর একটু মিলিয়ে মিশিয়ে নিলেই তো হয়। জগতের সুখ-দুঃখ, এতো দেখতেই হবে। তার সঙ্গে আত্মজ্ঞান, এটাও একটু জুড়ে দিলে মন্দ হয় না—সম্পূর্ণ হয় চিত্রটা! এরকম ভাব মনে ওঠে। স্বামীজী বেশ বলেছেন, গৃহিণীর সারা দুনিয়া থেকে সংগৃহীত নানারকমের আসবাব আছে, কিন্তু এখন ফ্যাশন জাপানী কোন জিনিস ঘরে রাখা, তাই তিনি একটা জাপানী ফুলদানি কিনে ঘরে রাখলেন—অধিকাংশ লোকের পক্ষে ধর্মও এই রকম। ভোগের জন্য তাদের সব রকমের জিনিস আছে, কিন্তু ধর্মের একটু চাটনি তার সঙ্গে না থাকায় জীবনটা যেন ঠিকভাবে চলছে না।

সব রকমের ভোগের উপকরণ আমার প্রয়োজন, তারই সঙ্গে ধর্মের একটা ফুলদানি থাকলে মন্দ হয় না—এই মনোভাব অনেকেরই আছে। তাঁরা ধর্মকে জীবনের পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করতে চান। তাঁরা বলেন—এ-ও করো, ও-ও করো; বাড়াবাড়ি কোনটারই ভাল নয়। 'সর্বম্ অত্যন্তগর্হিতম্'—সংস্কৃত ক'রে ব'লে দিলে আর কথা নেই! সুতরাং জাগতিক সুখ যা আছে তা ভোগ করতে হবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মও করতে হবে। তাঁদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এদিকটা অক্ষুণ্ণ রেখে তারপর ওদিকটা অর্থাৎ ধর্মটা একটু হোক, তাতে আপত্তি নেই, ভালই হবে।

এছাড়া আরেকটি থাকের মানুষ আছেন, যাঁরা বলেন, বাপু, এতেও হবে না। আত্মতত্ত্বের অন্বেষণ এমন একটি কঠিন ব্যাপার যে, সেখানে আর কোন রকমেই মনের ভাগাভাগি ক'রে নেওয়া সম্ভব নয়। পুরো মনটি সে দিকে দিতে হবে। আর তার জন্য অন্য সব ছাড়তে হবে। এরকম লোক খুব কম। আমরা দেখব এই উপনিষদেই বলা হয়েছে যে, এমন লোক খুব কম। আমরা সমাজে দেখতে পাই অধিকাংশ মানুষ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ইন্দ্রিয়ের ভোগকেই চরম লক্ষ্য ব'লে গ্রহণ করেছে। আর বুদ্ধিমান কিছু লোক মনে করছে, তা ক'রলে সর্বনাশ - মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি নানা বিশৃঙ্খলা হবে। সেজন্য ধর্মের একটু প্রলেপ দিলে ভাল হয়, যাকে বলে thin veneer। বেশী হ'লে গোলমাল। ধর্মের একটুখানি প্রলেপ ভোগের ওপরে দিলে ভাল হয়, এরকম বলেন। কিন্তু সব ছেড়ে আত্মতত্ত্বের অন্বেষণ, এ তাঁদের কল্পনাতীত। অতি বিরল কিছু মানুষই সব ছেড়ে অর্থাৎ সমস্ত ভোগাসক্তি ত্যাগ ক'রে ধর্মলাভের জন্য —আত্মজ্ঞানের জন্য পুরো মন দিতে প্রস্তুত। এরকম অধিকারী পাওয়া খুব কঠিন। নচিকেতা সেই দুর্লভ অধিকারী। নচিকেতা পথেঘাটে মেলে না। অসাধারণ তিনি। কারণ, অসাধারণ

দাম দিতে প্রস্তুত আত্মতত্ত্বের জন্য। এই কথাগুলি মনে রেখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নচিকেতাকে যমরাজ কি বলছেন, তা আমরা দেখবো।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥
(১।২।১)

'অন্যৎ শ্রেয়ঃ অন্যৎ উত এব প্রেয়ঃ' -- শ্রেয় ভিন্ন এবং প্রেয় ভিন্ন অর্থাৎ শ্রেয় একটি জিনিস আর তার থেকে ভিন্ন প্রেয় আর একটি জিনিস। 'তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ'-- ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে তারা মানুষকে বদ্ধ করে। শ্রেয় আর প্রেয় এ দুটির প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য তারা সাধন করে। উভয়েই মানুষকে বদ্ধ করে অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী সাধনে প্রবৃত্ত করে। মানুষের প্রবৃত্তি শ্রেয়ের জন্যও হোতে পারে, প্রেয়ের জন্যও হোতে পারে। 'তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি'—তাদের মধ্যে অর্থাৎ এই শ্রেয় আর প্রেয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তার কল্যাণ হয়। আর 'হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে'-- যিনি প্রেয়কে বরণ করেন, তিনি পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হন। সাদা কথা! দুটি জিনিসের জন্য মানুষের প্রবৃত্তি হয়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মানুষ এ দুটি জিনিস চাইছে। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের দৃষ্টি যাচ্ছে প্রেয়ের দিকে, আগেই যা বললুম। আর শ্রেয়ের দিকে দৃষ্টি মুষ্টিমেয় দুচারজন মানুষের। বলছেন, 'হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে' -- যিনি প্রেয়কে বরণ করেন, তিনি 'অর্থ' অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজন থেকে ভ্রষ্ট হন। ভ্রষ্ট হন কেন? ভোগের অন্বেষণ ক'রলে ভোগ ত পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হবে কেন? তার উত্তরে বলছেন, এই যে প্রেয়কে উদ্দেশ্য ক'রে আমরা প্রেয়ের অন্বেষণ করি, এই অন্বেষণ আমাদের চরম সার্থকতা দিতে পারে না। কিছু জিনিস দেয়, কিছু আনন্দের ছিটে-ফোঁটা আমরা তা থেকে পাই। দুঃখ-নিবৃত্তির অজস্র চেষ্টা ক'রে কখনও কখনও একটু আধটু দুঃখলাঘবও হয়, কিন্তু তাতে আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই আসলে যা চাচ্ছি তা পাই না। আমাদের হৃদয়ের গভীরে পরম প্রাপ্তির যে গোপন আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তা মেটে না। এইজন্য বলছেন, প্রেয়কে অনুসরণ করলে মানুষ 'হীয়তেঽর্থাৎ'— তার চরম প্রয়োজন থেকে, পরমার্থ থেকে বিচ্যুত হয়। বিচ্যুত হয় এইজন্য যে, সে সময় পায় না, অবকাশ পায় না, তার সেই আসল প্রয়োজনকে সিদ্ধ করবার। কাজেই সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, পথভ্রষ্ট হয়, তার মূল লক্ষ্যে সে পৌঁছতে পারে না। আর 'শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি'—শ্রেয়কে যে গ্রহণ করে, তার কল্যাণ হয়, কারণ তার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার কিছু নেই। দুটি লক্ষ্যের ভিতরে একটিকে সে ছেড়ে দিয়েছে। একটিকেই জীবনের লক্ষ্য ব'লে গ্রহণ করেছে। কাজেই, সে কল্যাণলাভ করে। চরম সার্থকতা সে লাভ করে। এই হ'ল শ্লোকটির তাৎপর্য। বলার উদ্দেশ্য এই যে, নচিকেতা তো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তবু গুরু তাঁকে তাঁর স্থানে আরো দৃঢ় করবার জন্য, আরও প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য—ভবিষ্যতে সন্দেহ যাতে কখনও মনে না ওঠে, মন যাতে কখনও একটুও চঞ্চল না হয় লক্ষ্য থেকে, সেই উদ্দেশ্যে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, তৈরী ক'রে দিচ্ছেন: 'তোমার জীবনে এই কথাগুলি সব সময় মনে রাখতে হবে।'

তার পরের কথা ঃ

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

(১।২।২)

'শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যম্ এতঃ'—শ্রেয় আর প্রেয়, এ দু'টিই মানুষকে প্রাপ্ত হয়। এ দু'টিই মানুষের ভেতরে আকাঙ্ক্ষারূপে রয়েছে। এ দু'টি জিনিসকেই তার মন চাইছে। এই দু'টি যেন পরস্পর মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। আমরা তিনটি থাকের মানুষের কথা বলেছি। তাদের মধ্যে দ্বিতীয় থাকের মানুষ, যাঁরা বলেন, 'এটারও খানিকটা হোক, ওটারও খানিকটা হোক', যমরাজ যে তাঁদের কথা এখানে বলছেন, তা নয়। শ্রেয় আর প্রেয়কে মিশিয়ে নিতে বলছেন না। বলছেন, শ্রেয় আর প্রেয় আমাদের কাছে যেন মেশামিশি হয়েই আসে। এই আপাত-মিশ্রণের ভেতরে কতখানি শ্রেয়ের ভাগ আর কতখানি প্রেয়ের ভাগ, তা আমরা হিসেব করতে পারি না—বিচার করতে পারি না, আমাদের বুদ্ধি সেরকম শুদ্ধ নয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধি হ'লেই হবে না, শুদ্ধ বুদ্ধি চাই। সূক্ষ্ম বুদ্ধি থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি যদি শুদ্ধ না হয়, নির্মল না হয়, বাসনার দ্বারা কলুষিত যদি থাকে, তা হ'লে এই শ্রেয় এবং প্রেয়কে পৃথক্ করা যায় না। প্রেয়কে তখন শ্রেয় মনে হবে। আমরা সুখ চাই। কোন্ সুখটি আমাদের কাম্য, এ কথা ভাবি না। নিত্য এবং অনিত্য সুখের পার্থক্য বিচার ক'রে অনিত্য সুখকে পরিহার ক'রে নিত্য সুখকে যে চাইব, এরকম মনোভাব আমাদের প্রায়ই থাকে না। কিন্তু 'ধীরঃ'—ধীর ধীমান্ বিচারশীল বিবেকী ব্যক্তি 'তৌ'—সে দু'টিকে, শ্রেয় ও প্রেয়কে 'সম্পরীত্য'—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বিবিনক্তি'—পৃথক্ করেন। নিত্য সুখ আর অনিত্য সুখ, এই দু'টিকে পৃথক্ ক'রে নেন। আর পৃথক্ হয়ে যাবার পর ধীর ব্যক্তি, 'শ্রেয় প্রেয়সো অভিবৃণীতে'—প্রেয়ের থেকে শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ ব'লে বরণ করেন। দুটিকে পৃথক্ ক'রে না নিলে, কোন্‌টি বরণ করবো আর কোন্‌টি ত্যাগ করবো বোঝা যায় না। কাজেই, আগে বিশ্লেষণ ক'রে, বিচার ক'রে তাদের পৃথক্ ক'রে নিতে হয়। পৃথক্ ক'রে নিয়ে ধীর ব্যক্তি দেখেন যে, শ্রেয়ই হল ঠিক ঠিক কল্যাণ। তাই তিনি শ্রেয়কেই গ্রহণ করেন, প্রেয়কে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু সবাই পারে না। যাঁরা বুদ্ধিমান বিবেকী—বিবেকী শব্দের অর্থই হচ্ছে পৃথক্-করণে সামর্থ্যবান—তাঁরাই ঐ প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে গ্রহণ করেন। আর মন্দঃ' অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তি, যে এইভাবে বিচার ক'রে শ্রেয় আর প্রেয়কে পৃথক্ করতে পারে না, শ্রেয়ই যে একমাত্র কল্যাণের পথ, তা বুঝতে পারে না, সে 'প্রেয়ঃ'—প্রেয়কে 'বৃণীতে —বরণ করে, গ্রহণ করে। কেন গ্রহণ করে? 'যোগক্ষেমাৎ'—যোগ এবং ক্ষেমের জন্য। আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তির নাম যোগ। আর প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণের নাম ক্ষেম। এই যোগ আর ক্ষেমের জন্য সে প্রেয়কে বরণ করে। শ্রেয়কে ছেড়ে প্রেয়কে বরণ করে, পরম কল্যাণকে ছেড়ে অকল্যাণকে গ্রহণ করে—এ কি রকম? যেহেতু সে মন্দ, অবিবেকী। তার এই বিবেক করবার, পৃথক্ করবার সামর্থ্য নেই, কাজেই সে প্রেয়কে স্বীকার ক'রে নেয়, শ্রেয়ের দিকে দৃষ্টি দেয় না।

এইভাবে শ্রেয় এবং প্রেয়—এ দু'টি যে একেবারে ভিন্ন বস্তু—একটি আর একটির বিপরীত, একটিতে কল্যাণের প্রাপ্তি আর একটিতে তার হানি, এরকম স্পষ্ট তাদের পার্থক্য

দেখিয়ে দিয়ে তারপর যমরাজ নচিকেতার প্রশংসা ক'রে বলছেন:

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥

(১।২।৩)

'নচিকেতঃ'—হে নচিকেতা, 'স ত্বং'—সেই তুমি অর্থাৎ যাকে আমি বারংবার প্রলোভিত করেছিলুম, সেই তুমি 'প্রিয়ান্ প্রিয়রূপান্ চ কামান্' — প্রিয় এবং প্রিয়রূপ যে কাম অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুসমূহ তাদের···। প্রিয় মানে যা আমাদের স্বভাবতঃ প্রিয়, যেমন দেহ এবং দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ যারা, যেমন পুত্রাদি। আর প্রিয়রূপ মানে যারা আমাদের প্রিয়কারী, সুখ দেয় যারা, আমাদের আনন্দদান করে গৌণভাবে, যেমন অপ্সরা প্রভৃতি,যাদের কথা আগে বলা হয়েছে(১।১।২৫)। অপ্সরা প্রভৃতি স্বতঃপ্রিয় নয়। তারা আনন্দ দেয় ব'লে প্রিয়। শরীরটা স্বতঃপ্রিয়। শরীরটাকে আমরা স্বাভাবিকভাবে ভালবাসি, কারণ তাতে 'আমি' বোধ আছে। আর পুত্রাদিতেও গভীর মমত্ববোধ আছে, তাই তারাও স্বভাবতই প্রিয়। কিন্তু আগন্তুক অপ্সরাদিতে 'আমি'-বুদ্ধি বা মমত্ব-বুদ্ধি হয় না। গৌণভাবে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় মাত্র। এইজন্য তাদের প্রিয়রূপ বলা হয়েছে। এরকম যে কাম্যবস্তুসমূহ, তাদের 'অভিধ্যায়ন্'—চিন্তা ক'রে, বিচার ক'রে 'অত্যস্রাক্ষীঃ'—ত্যাগ করেছ। বিচার না ক'রলে ত্যাগ করা যায় না। তুমি দেখেছ এগুলি মানুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। দেখেছ অপ্সরা রথ বিত্ত দীর্ঘ-জীবন, এগুলি সবই মানুষকে ভুলিয়ে রাখে, মানুষকে জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে দেয় না। দেখে তুমি এদের পরিত্যাগ করেছ। সুতরাং 'নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীম্ অবাপ্তঃ'—এই যে বিত্তময়ী সৃঙ্কা অর্থাৎ গতি, ঐশ্বর্যময় যে পথ, ভোগের যে পথ, যে পথ দিয়ে মানুষ ভোগ্যবস্তু অর্জন ক'রতে ছোটে, তুমি সে-পথ বেছে নাও নি, সে-পথ গ্রহণ করোনি। এই ভোগের পথে গেলে কি হয়, তা-ই বলছেন, 'যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ'—যাতে বহু লোক মগ্ন হয়, ডুবে যায়। তুমি তাদের মধ্যে পড়োনি। বেশীর ভাগ লোক এই ভোগের পথে গিয়ে ডুবে যায়—মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু মানে অজ্ঞানরূপ মৃত্যু। অবিদ্যা-কাম-কর্ম। অজ্ঞান, অজ্ঞানজন্য বাসনা, বাসনাজন্য প্রবৃত্তি। এর ভেতর দিয়ে গিয়ে মানুষ ডুবে যায়—আত্মাকে বিস্মৃত হয়ে থাকে। আমাদের শাস্ত্র বলেছেন, এরই নাম মৃত্যু। আত্মাকে ভুলে থাকার নামই মৃত্যু। কারণ, আত্মার তো মৃত্যু হয় না।

এই মৃত্যুপথে বেশীর ভাগ মানুষ চলছে, না জেনে। মনে করছে তারা, এই বুঝি জীবনের পথ। জানে না যে, মৃত্যুর পথে চলছে। তাই বলছেন, 'বহবো মনুষ্যাঃ'—বহু লোক 'যস্যাং মজ্জন্তি'—যাতে ডোবে। নচিকেতা সে পথে যাননি। কাজেই তিনি অসাধারণ। শিষ্যকে প্রশংসা করলে যে ভাল শিষ্য, তার ভেতরে উৎসাহ জাগে। যমরাজ তাই নচিকেতার প্রশংসা ক'রে তাঁর এই যে আত্ম-অন্বেষণ, সেই অন্বেষণের ভিত্তিকে দৃঢ় করছেন।

তারপর আগে যে-কথা হচ্ছিল—যদি এমনই হয়, যদি ভোগের পথে গেলে বিনষ্টই হতে হয়, তাহলে শ্রেয় আর প্রেয়ের মেশামেশি ক'রে চলো না। এর খানিকটা, ওর খানিকটা। যেমন চলতি কথায় বলে, 'জনকরাজা মহাতেজা তার বা কিসের ছিল ত্রুটি/সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।' অনেকটা সেইরকম। অর্থাৎ আমাদের এ-ও হোক,

ও-ও হোক—যোগও হোক, ভোগও হোক। একেবারে সংসারকে অস্বীকার না ক'রে, জলাঞ্জলি না দিয়ে সংসারও হোক, আবার আত্ম-অন্বেষণও হোক, দুই করো না।

এ সব হ'ল সত্যের সঙ্গে আপস করার কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের কথা বলা হয়, একটির সঙ্গে আর একটির যোগ করার কথা বলা হয়, বুঝতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আত্ম-অন্বেষণের আগ্রহ প্রবল হয়নি।

তাছাড়া মেশামিশি যে সম্ভবই নয়, সে কথা যমরাজ এখন স্পষ্ট বলছেন :

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।

(১।২।৪, প্রথমার্ধ)

(এই যে শ্রেয় আর প্রেয় দু'টি) যারা 'বিদ্যা' এবং 'অবিদ্যা' ব'লে 'জ্ঞাতা' অর্থাৎ পরিচিত, 'এতে'—এ দু'টি 'দূরম্'—অতিশয়, 'বিপরীতে' —বিপরীত এবং 'বিষূচী' অর্থাৎ ভিন্নফলপ্রদ, একটির ফল মুক্তি, অপরটির ফল বন্ধন। বিদ্যার নিষেধার্থে নঞ্ প্রত্যয় ক'রে অবিদ্যা শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সুতরাং স্পষ্টতই বোঝা যায় বিদ্যা আর অবিদ্যা সম্পূর্ণ বিপরীত—বিপরীত-মুখী। যেন পূর্ব আর পশ্চিম, আলো আর অন্ধকার। আলোর খানিকটা নিলুম আর অন্ধকারের খানিকটা নিলুম, এরকম হয় না কখনও। হয় আলো, নয় অন্ধকার। দুটিকে কখনও একসঙ্গে নেওয়া যায় না। পূর্ব দিক আর পশ্চিম দিক এক করা যায় না—এরা বিপরীতমুখী। সুতরাং, যারা মনে করে এরও খানিকটা, ওরও খানিকটা নিয়ে অগ্রসর হবো, তারা মহা ভ্রান্তিতে পড়েছে। ওরকম হয় না। আমি পারছি না, সে আলাদা কথা। কিন্তু দু'টোকে মিশ্রিত ক'রে জীবনের পথে চলবো— এ অবাস্তব কথা।

তারপর আবার নচিকেতাকে প্রশংসা ক'রে বলছেন :

বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
ন ত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত॥

(১।২।৪, শেষার্ধ)

নচিকেতা, তোমাকে 'বিদ্যাভীপ্সিনং'— বিদ্যা-অভিলাষী ব'লে 'মন্যে'—মনে করি। তোমার ব্যবহারে, তোমার সিদ্ধান্তে নিষ্ঠা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, তুমি বিদ্যার আকাঙ্ক্ষী, অবিদ্যার নও। তাই 'ন ত্বা কামা বহবঃ অলোলুপন্ত'—বহু প্রকারের ভোগ্যবস্তু তোমাকে প্রলোভিত করতে পারেনি।

নানা রকমের ভোগ্যবস্তু যমরাজ দিতে চেয়েছিলেন—নচিকেতাকে পরীক্ষা করবার জন্য। সে-সব ভোগ্যবস্তু নচিকেতাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, প্রলুব্ধ করতে পারেনি, তাঁকে তাঁর সঙ্কল্প থেকে বিচলিত করতে পারেনি। ভাব হচ্ছে এই যে, যদি কেউ নচিকেতার মত সত্যসন্ধ হন, যদি কেউ ঐ রকম লক্ষ্যে দৃঢ় থাকতে পারেন, তবেই তিনি আত্মজ্ঞানের অধিকারী হবেন, আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবেন। তা না হলে নয়। মূল্য না দিয়ে আত্মজ্ঞান কেউ পায় না। এবং সেই মূল্য আবার একটু-আধটু নয়—সর্বস্ব-দান! যাঁরা সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত, তাঁরাই এই জিনিসটি পান। অপরে নয়।

কিন্তু সাধারণ লোক, তারা কী করে? যমরাজ এখন সেই কথাই বলছেন :

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥

(১।২।৫)

'অবিদ্যায়াম্ অন্তরে বর্তমানাঃ'—অজ্ঞানের

মধ্যে তারা রয়েছে, ডুবে রয়েছে যেন গাঢ় অন্ধকারে, অথচ 'স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ' —নিজেরাই নিজেদের জ্ঞানী, পণ্ডিত ব'লে মনে করে। জাগতিক সাফল্য-লাভ হয়তো তাদের কিছু হয়েছে, তাই মনে করে যাদের সে রকম সাফল্য-লাভ হয়নি—তারা বোকা। বলে, বুদ্ধি থাকলে আমাদের মতো কিছু গুছিয়ে নিতে পারতো, বুদ্ধি নেই—বোকা। এই গুছিয়ে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ! সংসারে যে রকম করেই হোক, প্রয়োজন হলে অপরকে একটু-আধটু ঠকিয়েও নিজের একটা position গড়ে তুলতে হবে! কেউ বলে, ও! অমুক ব্যক্তি is a self-made man! আগে যেন পশু ছিল, তারপর মানুষ হয়েছে! জাগতিক সাফল্যেই এরা গৌরববোধ করে। নিজেদের মনে করে খুব বুদ্ধিমান, খুব পণ্ডিত। এরা শাস্ত্র নিয়ে মাথা ঘামায় না।

আর একদল নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞ ব'লে মনে করেন। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ক'রে বলেন: 'দেখ বাপু, শাস্ত্র বলছেন, যাগ-যজ্ঞ করো, তা হলেই যা পাবার, সব পাবে। তা যদি না করো, তো সর্বনাশ। যারা এই কর্মকাণ্ডের পথে না চ'লে অন্য পথে চলছে, তারা শাস্ত্র-গর্হিত কাজ করছে।' এই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা নিজেদের শাস্ত্রজ্ঞ ব'লে দাবী করেন, শাস্ত্রের মর্ম তাঁরাই বোঝেন। তাঁরা আরও বলেন, ঐ যাগ-যজ্ঞাদি নিয়মিতরূপে করতে হবে। তবেই কল্যাণ। কত দিন করতে হবে? না—জীবনের শেষ পর্যন্ত। 'যাবজ্জীবম্ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ'—যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন অগ্নিহোত্র-যাগ করতে হবে। করে যেতে হবে, ফল কী হবে? —অক্ষয় স্বর্গলাভ। এই জগতের ভোগও করতে পারবে, কারণ অগ্নিহোত্র করলেই যে সব ছাড়তে হবে এমন কথা নয়। একটু সংযম হয়তো দরকার, কিন্তু ইহজগতের ভোগের বস্তু সবই পাবে। আর পরজগতে গিয়ে তো কথাই নেই! নানান রকম ক'রে এই কথাটুকু ডালপালা দিয়ে সুন্দর ক'রে তাঁরা বলেন। গীতার ভাষায় 'পুষ্পিতা বাক্'। শুনলে মনে হয় সত্যিই তো, এই জগতে সুখে দিন কাটুক আর পর-জগতে তো সুখ একেবারে কায়েম ক'রে নেওয়া হল! যজ্ঞের ফল যাবে কোথায়?

এই শাস্ত্রজ্ঞ দলটির পাণ্ডিত্যের অভাব নেই। কচ কচ ক'রে বেদান্তের কথাগুলো কেটে দেবেন—যদিও তা কাটা যায় না। বলবেন, কর্মেই বেদের আসল তাৎপর্য। আমরা এখানে আর সে-সব কথার ভিতরে যাচ্ছি না। কারণ, অনেক আলোচনার বিষয় আছে, কেমন ক'রে তাঁরা বলেন যে, বেদান্তের পথটা পথই নয়, শাস্ত্রের তাৎপর্যই ওতে নেই, শাস্ত্রের তাৎপর্য হচ্ছে কাজ করায়। এঁরা নিজেদের পণ্ডিত ব'লে মনে করেন, বুদ্ধিমান ব'লে মনে করেন। অথচ বেদান্তের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, এঁরা অজ্ঞানে একেবারে ডুবে আছেন। অজ্ঞানে ডুবে আছেন কেন?—না যেহেতু, তাঁরা নিজেদের দেহেন্দ্রিয়াদির সঙ্গে অভিন্ন ব'লে মনে করছেন—নিজেদের কর্তা, ভোক্তা ব'লে মনে করছেন। তাঁরা যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম করেন নিজেদের কর্তা জ্ঞান ক'রে এবং যাগ-যজ্ঞের ফল ভোগ করেন ইহজীবনে বা পরজীবনে—ভোক্তা হিসাবে। কিন্তু আত্মা স্বরূপতঃ অকর্তা, অভোক্তা। সুতরাং এই যে আত্মাতে কর্তৃত্ববোধ, ভোক্তৃত্ববোধ—এরই নাম অজ্ঞান। এই অজ্ঞানেরই ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে লৌকিক এবং বৈদিক সমস্ত কর্মপ্রবৃত্তিতে। তাই প্রবৃত্তিপরায়ণ সকল মানুষই—কি শাস্ত্রজ্ঞ,

কি অপারস্ক—অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন—'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ'। তা হয়েও কিন্তু তাঁরা নিজেদের জ্ঞানী মনে করেন, পণ্ডিত মনে করেন। ফল কী হচ্ছে? না—'দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিষন্তি মূঢ়াঃ'—যমরাজ বলছেন, এই অবিবেকীরা পরিভ্রমণ করছে নানান দিকে—নানান রূপে জন্মজন্মান্তরে গতি হচ্ছে তাদের। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম; বার বার দেহের ভেতর দিয়ে তাদের আসতে যেতে হচ্ছে। তাদের অবস্থাটা কী রকম? না—'অন্ধেন এব নীয়মানাঃ যথা অন্ধাঃ'। যখন অন্ধেরা অন্ধকর্তৃক নীত হয়, তখন তাদের অবস্থা যেরকম হয়, সেই রকম। কতকগুলি অন্ধ চলছে আর তাদের নেতা হিসেবে চালাচ্ছে যে, সেও অন্ধ। তাদের গতি কী হয়? তারা গর্তে পড়ে, খানায় পড়ে। ঠিক সেই রকম এই সব পণ্ডিতম্মন্যেরা পথভ্রষ্ট হচ্ছে, পথ কোনদিকে চিনতে পারছে না; না পেরে খানায় পড়ছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অধোগামী হচ্ছে, নানা দুঃখের ভাগী হচ্ছে। এই হ'ল সাধারণ মানুষের অবস্থা।

এই কথা ব'লে যমরাজ বোঝালেন যে, যাঁরা সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন, যাঁরা লক্ষ্যে স্থির, যাঁরা আত্মজ্ঞানের জন্য সর্বত্যাগ করতে প্রস্তুত, শুধু তাঁরাই সেই পরম কল্যাণ লাভ করতে পারেন, অপরে নয়।*

* ১৮ই মে ১৯৭৫, কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে কঠোপনিষদ্-ব্যাখ্যা। শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

স্বামীজীর গানের খাতা

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজীর গানের খাতার একদিককার ৬১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কালিতে ও পেন্সিলে লেখা গান, স্বরগ্রাম প্রভৃতির বিস্তারিত বিবরণ উদ্বোধনের পূর্ববর্তী সংখ্যাতেই (অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩) শেষ হইয়াছে। অপর দিকের লেখা পৃষ্ঠাগুলির বিবরণ এখানে দেওয়া হইল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, খাতাটির প্রথমদিককার ১৬পৃষ্ঠা কালিতে লেখা, তাহার পর খাতাটির অপর দিক হইতে কালিতে লেখা আরম্ভ হইয়াছিল এবং এইদিককার প্রথম পৃষ্ঠাকে ১৭শ পৃষ্ঠা ধরিয়া সেই হিসাবে ৪৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত (আসলে এদিককার ২৯পৃষ্ঠা পর্যন্ত) পাতার উপরে কালিতে পত্রাঙ্কও দেওয়া আছে, যদিও কালিতে লেখা আছে কেবল প্রথম পৃষ্ঠাটি। ইহার কারণ আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি (উদ্বোধন ৭৭তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ [illegible])।

স্বামীজী মন্মথবাবুর বালিকা কন্যাকে কিছু গান ও কিছু বাজনা শিখাইয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে এই গানের খাতাটি দিবার পর সেই সব গান ও বাজনার স্বরগ্রামের অনেককিছু খাতাটির এইদিকে লেখা হইয়াছে। অধিকাংশই মন্মথবাবুর কন্যার অপটু হাতের লেখা—প্রচুর বানান ভুল, বড় বড় আঁকা বাঁকা অক্ষর। তিন পৃষ্ঠা স্বামীজী নিজেই লিখিয়া দিয়াছিলেন।

স্বামীজীর গানের খাতা : দশম পৃষ্ঠা

Narendranath Datta

স্বামীজীর হাতের লেখা ঃ প্রথম পৃষ্ঠা

দু-এক পৃষ্ঠায়, শেষের দিকে, অন্যপ্রকার হস্তাক্ষর দেখা যায়—যাহা মন্মথবাবুর কন্যার একটু বেশি বয়সের হাতের লেখা হইতে পারে, অথবা অপর কাহারো হইতে পারে।

নীচে এইদিককার পৃষ্ঠাগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে, খাতাটির অনেকগুলি পাতা বাঁধন কাটিয়া যাওয়ায় আলগা হইয়া ছিল; এইসব আলগা পৃষ্ঠাগুলি সবই পূর্বের ক্রমানুসারে না-ও থাকিতে পারে। পরে যাহাতে আর কোন গণ্ডগোল না হয়, সেজন্য আমরা খাতাখানি যেভাবে পাইয়াছি, সেভাবেই পাতাগুলিতে ক্রমিক নম্বর দিয়া দিয়াছি; আমাদের দেওয়া এদিককার এই পত্রাঙ্কগুলি 'প্রথম পৃষ্ঠা', 'দ্বিতীয় পৃষ্ঠা' ইত্যাদি রূপে এখানে দেওয়া হইল। খাতার মূল পত্রাঙ্ক যেখানে আছে (কালিতে লেখা, ইংরেজী হরপে), তাহাও সেখানে দেওয়া হইল।

মন্মথবাবুর বালিকা কন্যার লেখা গান প্রভৃতির বানান যেমন আছে, সেভাবেই রহিল। পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়; যেমন 'তপস্বিনী'-র স্থলে লেখা আছে 'তপস্সিনি'; বুঝা যায় বলিয়াই কোন পাদটীকা দেওয়া হইল না। দু-একটি শব্দ আমরা ঠিকমতো পড়িতে পারি নাই। সেখানে, আগের মতো (?) এই চিহ্ন রহিল, এবং যাহা একেবারেই পড়িতে পারি নাই, সেখানে [...] এই চিহ্ন রহিল।

প্রথম পৃষ্ঠা

এই পৃষ্ঠায় কালিতে পাকা হাতে 'নটের প্রথম গীত' লেখা আছে (স্বামীজীর হস্তাক্ষর নয়)। গানটি এবং পৃষ্ঠার অন্যান্য বিবরণ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে (উদ্বোধন, ৭৭তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৫২)। গানের নীচে এই পৃষ্ঠায় তারিখ সহ পেন্সিলে স্বামীজীর সই—'Narendranath Dutt', নীচে 'Friday 22nd Jan 86'। দুঃখের বিষয় সইটির উপর কেহ, খুব সম্ভবতঃ মন্মথবাবুর কন্যা কালি বুলাইয়াছে, পৃষ্ঠার উপরে নীচে পেন্সিলে হিজিবিজি কি সব লিখিয়াও রাখিয়াছে। এই পৃষ্ঠার ফটো এই সঙ্গে রহিল।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

ফাঁকা। উপরে পেন্সিলে হিজিবিজি দাগ কাটা আছে।

৩য় পৃষ্ঠা হইতে ৯ম পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্বামীজীর হস্তাক্ষর নয়; মন্মথবাবুর কন্যার কাঁচা হাতে বড় বড় হরপে পেন্সিলে লেখা। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পৃষ্ঠা কাল পেন্সিলে, বাকীটা কপিং (বেগুনী রংএর) পেন্সিলে।

তৃতীয় পৃষ্ঠা

19

জাগিয়ে যদি প্রাণ ধরি তাহারে না হেরে মরি কেমনে রে॥

আড়া

ধিন ধিনাক ধিন ধিন ২ ধা | ধিন ধিনাক ধিন তিন ২ তা

\+ ৩ ০ ১

ধা ধা তেরেকেটে ধা ধা ধিন তাতাকে তাকে তেরেকেটে ধা ধা তিন তা

যৎ

১ + ৩ ০

ধিনা ধিন ধা ধিন তেনা তিন তা তিন

ধাক্ ধাক ধাক্ ধিন্ তাক্ তাক্ তাক তিন

চতুর্থ পৃষ্ঠা

20

একতালা

১ + ৩ ০

ধাগড়: ধিন্না ধাক্ তিন্না নাক্ তিন্না তাক তিন

আড়া খেমটা

১ +

তেরে কেটে ধিন্নাক ধেনা ধিন ধা,

৩ ০

তেরে কেটে ধিন্নাক তেনাতিন তা

তেওট

১ + ৩ ০

তাক ধিন ধিন, তাগি নাকি ধিন ধিন তাক ধিন ধিন তাগ

নাকি তিন তিন

ধা ধা ধিন্না তেরেকেটা তিন তেরেকেটা গে দে ঘেনে ধা

পঞ্চম পৃষ্ঠা

21

তোরা আয়লো

আড়া

তা ধিন তা ধিন ধা তা তিন তা তিন তা ধিন্ ধিন্ তা তা ধিন্

ধিন্ ধা ধিন্ ধিন্ তা তা তিন্ তিন্ তা

ষষ্ঠ পৃষ্ঠা

22

আড়া খেমটা বেহাগ

আজ মা সাবিত্রী আশা সত্যবান বরণে।

অল্প আয়ু সে কুমার শুনেছিলাম শ্রবণে॥

তুমি মা রাজনন্দিনি হইবে মন্দভাগিনি,
নারোহেদে[1] (?) বেদে জানি ত্যাজিব জীবন জীবনি
ঋষি বাক্য মিথ্যে নহে শুনিয়া কাঁপে গো হিয়ে
মরিগো মরি রাখহ মম মিনতি,—ছাড় সত্যবান পতি,—
পাইবে মনমথ পতি গুণবতি ভুবনে।

সপ্তম পৃষ্ঠা

23

আড়া খেমটা বেহাগ

নিবারণ করি মা তোরে প্রাণের নন্দিনি।
আপনি কাঁদিবে কেন কাদাবে জনক জননি॥
তুমি মা রাজকুমারি হইবে রাজার নারি;
কেন তপসির সনে, হতে চাও মা তপস্বিনি।
বিধবা রমনি হলে, সে জ্বালা ত বর যায় না মলে,
পড়ে থাকি দাবানলে রসেরি ভাণ্ডার,
তাই বলি স্নেহভরে, বর তুমি অন্য বরে,
সুখে রবে এ সংসারে, হয়ে উল্লাসিনি॥

অষ্টম পৃষ্ঠা

24

কেন রে প্রাণ এমন করে না জানি কারণ।
সর্ব্বনাস কি ঘটবে বুঝি অস্থির হতেছে মন॥
দক্ষিণ অঙ্গ নৃত্য করে, হৃদয় কাঁপে থরে থরে,
ধর্য্য না ধরে, প্রাণের বিহঙ্গ বুঝি[2], অন্তরে চাহে না মন॥
বিধি কি বাদ সাধিবে, দুখ নিরে ভাসাইবে, এ দুখিনিরে,
তা নইলে কি পোড়া প্রাণে জলিতেছে হুতাসন॥

নবম পৃষ্ঠা

25

কাওয়ালি

কেন মিছে ভাব চন্দ্রাননি॥
একান্ত যাইবে যদি হও অনুগামিনি॥
অন্ধ জনক জননি, ভাবিছে দিবা জামিনি, সেই কাননে;
চল প্রিয়ে ত্বরা করি, বিলম্ব সহিতে নারি,
বিদায় গ্রহণ করি এভুবনে এখনি॥

---

১ নারন্ন হতে? ২ বুঝি (?)

এরপর তিন পৃষ্ঠায়, ১০ম, ১১শ ও ১২শ পৃষ্ঠায় স্বামীজীর হস্তাক্ষর। এই তিন পৃষ্ঠায় মন্মথবাবুর কন্যার জন্য স্বামীজী নিজেই দুটি গান ও কিভাবে বাজাইতে হয় তাহার নির্দেশ সহ পাখোয়াজের কয়েকটি বোল লিখিয়া দিয়াছেন।

দশম পৃষ্ঠা

26

প্রভু মেরে অগুনে চিত না ধরো
সমদরশি নাম তুঁহারো একই ব্রহ্ম করো
এক লোহা পূজামে রহত হ্যায় এক ঘর বধিক পর্য়ো
পার নাকো মনে—দ্বিধা—নহি কাঞ্চন করো (?) সো খর্য়ো
They Say
এক নদী এক নালো কহায়ে—ময়লো · নীর খরো Contd.
in one
যায় মিলে—গঙ্গাজল নাহি দুই একই রূপ ধরো।[৩]

(এ) দয়ানিধে তোরি গতি লখি না পরে
ধরম অধরম—অধরম—ধর্ম করি—, অকরণ—করণ করৈ।
(তো—রি গতি etc.

জয় অরু বিজয় পা-প কহকি নো
ব্রা—হ্মণ শা প দিয়া—য়ো
অসুর যোনি—দিনী—তা উপর
ধর্ম উচ্ছেদ – করা—য়ো ॥
পি—তা বচন খণ্ডে – ত পাপী—
সো প্রহ্লা – দ্ কি—নো—
তিন্‌কে – হে – ত্ স্তম্ভতে প্রকটে
নরহরি রূ—প যো নীন (লীন ?)
দ্বিজকুল পতিত অজা—মিল বিষয়ী / গণিকা—প্রীত বড়া—ই[৪]

---

৩ 'কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা'-প্রকাশিত 'সুরসাগর' (১ম খণ্ড, ২ সং, পৃঃ ৭২) গ্রন্থে গানটি এইরূপ পাওয়া যায়: [রাগ খাম্বাবতী, তিতালা] হামারে প্রভু অওগুণ চিত না ধরৌ। সমদরশী হ্যায় নাম তুম্হারো সোঈ পার করৌ॥ ইক লোহা পূজামে রাখত ইক ঘর বধিক পরৌ। সে দু বিধা পারস নহিঁ জানত কাঞ্চন করত খরৌ। ইক নদিয়া ইক নার কহাবত মৈলো নীর ভরৌ। যব মিলি গয়ে তব এক বরণ হৈবে গঙ্গা নাম পরৌ॥ তন মায়া জ্যৌ ব্রহ্ম কহাবত সূর সু মিলি বিগরৌ। কৈ ইনকো নিরধার কীজিয়ে কৈ প্রাণ জাত তরৌ॥

৪ এই গানটির বাকী অংশ একাদশ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। 'সুরসাগর' গ্রন্থে (ম খণ্ড ২য় সং, পৃঃ ৩৩-৩৪) গানটি এরূপ পাওয়া যায়: [রাগ-গৌরী] দয়ানিধে তেরী গতি লখি ন পরৈ। ধর্ম অধর্ম, অধর্ম ধর্ম করি অকরণ করণ করৈ। জয় অরুবিজয় কর্ম কহ কীন্‌হৌ ব্রহ্ম

একাদশ পৃষ্ঠা
27

যজ্ঞ করত বিরো—চনকে সুত
বেদ বিহিত বিধি—করম
তিহি হট বাঁধি পাতা—ল হি দীনো
কো— ন্ কৃপা—নিধি ধরম
পতিব্রতা—স্বা—লঙ্কর যুবতী
প্রকট সত্যতে টারো—
অধম পুংশ্চলী দুষ্ট গ্রামকী (?) শুগা
পরাবত তায়রো— ।
দানী ধরম ভানুসুত সুনিয়ত
তুমি তো (?) বিমুখ কহাওয়ে
বেদ-বিরুদ্ধ সকল পাণ্ডবসুত
সো তোম্‌রে জীউ ভাওয়ে—
মুক্তি হে—তু যোগী বহু শ্রম করে
অসুর বিরোধে পাওয়ে
(হা)
অকণিত (?) কণিত (?) তো (মা) রী মহিমা
সুরদা—স ক্যাসে কহ গাওয়ে ॥

দ্বাদশ পৃষ্ঠা
28

মান = Standard
লয় = Keeping to the Standard

এই পৃষ্ঠায় স্বামীজী মন্মথবাবুর কন্যার জন্য পাখোয়াজের কয়েকটি বোল লিখিয়া দিয়াছেন, কিভাবে বাজাইতে হয় তাহার কিছু নির্দেশও। এগুলি পূর্বে প্রকাশিত হইলেও এখানে পুনরায় দেওয়া হইল।

সুরফাঁক তাল

+			১			২		
ধা	ঘেড়ে	নাক	ধী	ঘেড়ে	নাক	গদ্দী	ঘেড়ে	নাক

সরাপ দিবায়ৌ। অসুর যোনি তা উপর দীন্হী ধর্ম-উচ্ছেদ করায়ৌ॥ পিতা বচন খণ্ডৈ সো পাপী সো ই প্রহ্লাদহিঁ কীন্ হৌ। নিকষে খম্ভ বীচতেঁ নরহরি তা হি অভয় পদ দীন্ হৌ। দানধর্ম বহু কিয়ো ভানুসুত সো তুব বিমুখ কহায়ৌ। বেদবিরুদ্ধ সকল পাণ্ডবকুল সো তোম্হরে মনভায়ৌ॥ যজ্ঞ করত বৈরোচন কো সুত বেদবিহিতবিধিকর্মা। সো ছলি বাঁধি পাতাল পাঠায়ৌ কৌন কৃপানিধি ধর্মা॥ দ্বিজকুল পতিত অজামিল বিষয়ী গণিকা হাথ বিকায়ৌ। সুতহিত নাম লিয়ো নারায়ণ সো পতিব্রত তৈঁ টারী। দুষ্ট পুংশ্চলী অধম সো গণিকা সুবা পরাবত তারী॥ মুক্তিহেতু যোগী শ্রম সাধে অসুর বিরোধে পাবৈ। অবিগত গতি করুণাময় তেরী সুর কহা কহি গাবৈ॥

ঝাঁপতাল

\+ ৩ ॰ ১
ধাক্ ধা ধিনা তাক্ তা ধিনা

তেতাল

১ ॰
তা ধিন্ ধিন্ | ৩ | তা তিন্ তিন্ |

চৌতাল

\+ ॰ ১ ॰ ২ ৩
ধা ধা ধিন্ ধা | কৎ তেটে কেটে তা | তেটে কতা গদি ঘিনা ধা
(তা)

ধা = দুহাতে জোরে ঘা তা = ডান হাতে জোরে ঘা

ধিন্ = ঐ আস্তে ঘা তিন্ = ঐ—আস্তে—

কৎ = বাম হাতে ময়দাতে চেপে থাবড়া। ক = ঐ আস্তে।

তেটে = ডান হাতে (তে = (…) + টে – হয়) তা = ডান হাতে (…)

গ = ডান হাতের চাকতির উপর। দি = ময়দার উপর ফাঁকা (…)

ঘে = ডান হাতে। না = ডান হাতে (…)

ত্রয়োদশ পৃষ্ঠা
28[৫]

ফাঁকা পৃষ্ঠা, কোন লেখা নাই।

চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠা
30

ফাঁকা পৃষ্ঠা, কোন লেখা নেই।

পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ পৃষ্ঠায় মন্মথবাবুর কন্যার (অন্য কাহারো হইতেও পারে) হস্তাক্ষর। কাল পেন্সিলে লেখা।

পঞ্চদশ পৃষ্ঠা
31

ভূপালী—ত্রিতাল

ইতন যবন পর, মানন করিহে { ব্যবহার—শুদ্ধ
মা, নি বর্জিত
ঔরব—জাতী
রাত্রি ১ম প্রহর }

(তান)
(১) গা পা
(৪)

---

৫ এইটি ভুল করিয়া 28 লেখা হইয়াছে, 29 হইবে। আগের পৃষ্ঠায় 28 এবং পরের পৃষ্ঠায় 30 লেখা আছে।

ষোড়শ পৃষ্ঠা

32

তানা

১। সা রে গা পা　ধা র্সা পা ধা,　র্সা র্সা ধা পা　গা রে সা।

২। র্সা র্সা ধা　র্সা র্সা ধা　পা ধা,　র্সা র্সা　ধা পা গা রে সা

৩। সা রে গা পা　ধা র্সা　র্রে র্গা,　র্রে র্সা　ধা পা　গা রে র্সা,

৪। গা গা রে　গাগারে,　সারে　গারে　সারে গাপা গারে
সারে　গাপা ধাপাগারে,　র্সা রে　গা পা　ধার্সা—
ধা পা গারে,　সারে গা পা　ধা র্সা　র্রে র্সা　ধা পা—
গারে সা।

৫। র্গা র্গা র্রে র্সা　ধা র্সা　র্রে র্রে　র্সা ধা পা ধা　র্সার্সা—
ধা পা　গা পা　ধা পা　গারেসা।

সপ্তদশ পৃষ্ঠা

33

৬। গা গা রে গ

ইহার পর খাতাটির এদিকে অষ্টাদশ পৃষ্ঠা হইতে উনত্রিংশৎ পৃষ্ঠা পর্যন্ত, 34 হইতে 45 পর্যন্ত পত্রাঙ্ক-মাত্র পৃষ্ঠার একেবারে উপরের দিকে কালিতে লেখা রহিয়াছে, আর কোন লেখা নেই, ফাঁকা। কেবল একবিংশ পৃষ্ঠার উপরে পেন্সিলে ইংরেজীতে একটি সই (……), এবং সপ্তবিংশ পৃষ্ঠার উপরে পেন্সিলে হিজিবিজি দাগ রহিয়াছে।

স্বামীজীর গানের খাতার সব লেখারই বিস্তারিত বিবরণ আমরা দিলাম। আমরা পুনরায় জানাইতেছি, কয়েকটি জায়গায় লেখা আমরা পড়িতে পারি নাই, কয়েকটি পড়িলেও ঠিক পড়িয়াছি কিনা, সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ নই। সেই স্থানগুলি চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবিষয়ে আমরা সঙ্গীতজ্ঞ পাঠকগণকে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা যদি কেহ কিছু সহায়তা করিতে পারেন, দয়া করিয়া পত্রে জানাইবেন; খাতাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে আমরা সংশোধন করিয়া লইব।

বিবেকানন্দবন্দনা

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য*

অখণ্ডানন্দাম্ভোনিধিভবতরঙ্গায়িতসুধা-
সমুল্লাসং প্রজ্ঞাশতদলপরাগদ্যুতিময়ম্।
অখর্ব্বব্যামোহোদ্ভবমলনিতান্তক্ষয়করং
বিবেকানন্দাখ্যং ভজত সুরলোকচ্যুতমহঃ ॥ ১ ॥

গরিম্না পঞ্চাস্যালঘুমহিমবিক্রান্তিসুভৃতা
সমন্তাদুদ্দীপ্তং শিরসি বিধৃতোষ্ণীষসুভগম্।
সহেলং ভ্রূভঙ্গীপ্রতিহতজগদ্‌ভোগ্যবিষয়ং
বিবেকানন্দাখ্যং ব্রজত শরণং দিব্যপুরুষম্ ॥ ২ ॥

নিরোদ্ধুং যো মায়াং বিষয়মৃগতৃষ্ণালয়পদাং
মহামায়ামাদ্যাং স্বমহিমপরিব্যাপ্তভুবনাম্।
সমারূঢ়ো বীরঃ কুমতিশবমগ্রীণয়দহো
বিবোধাস্ত্রাঘাত-ক্রমবিহিতহৃৎকামবলিনা ॥ ৩ ॥

নিরুদ্ধান্তর্বৃত্তিস্তিমিতহৃদয়ান্তঃপবনকং
নিষণ্ণং নিষ্পন্দং স্থিতমিব মহান্তং হিমগিরিম্।
পরধ্যানজ্যোতি র্বলয়িতশরীরং যতিবরং
বিবেকানন্দং তং পরিগতসমাধিং ভজত রে ॥ ৪ ॥

জগৎক্লেশধ্বংস-প্রকরণকৃতে জ্ঞানবিপিনে
ভ্রমন্ চায়ং চায়ং বিবুধমহিতং তত্ত্বকুসুমম্।
অথ প্রজ্ঞাসূত্রগ্রথিত-বরমাল্যার্জ্জিতযশঃ-
কিরীটো যোঽদীপ্যৎ প্রবচনপটু র্বিশ্ব-সমিতৌ ॥ ৫ ॥

যুবানং ধীবৃদ্ধং পরিণতবয়োভিঃ শ্রিতপদং
বিরক্তং সন্তুষ্টং শিবপদসরোজামৃতরসে।
দরিদ্রং রাজেন্দ্রাভ্যধিকসুসমৃদ্ধিং চিতিধনৈঃ
বিবেকানন্দং তং শ্রয়ত শরণং রুদ্ররুচিরম্ ॥ ৬ ॥

---

* সপ্ততীর্থ। অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

অথর্ব্বং গর্ব্বং যচ্চকিতনয়নোৎপ্রেক্ষণবতাং
ভবান্ শক্ত্যা খর্ব্বং ব্যকুরুত মহাদর্পিতধিয়াম্ ।
ন তচ্চিত্রং প্রজ্ঞাপ্রবলভবতো দৃপ্তমহসঃ
বিবস্বৎসম্পর্কাদ্ ব্রজতি বিলয়ং ধ্বান্তনিচয়ঃ ॥ ৭ ॥

দধানঃ কাষায়ং বসনমমলং মুণ্ডিতশিরাঃ
জনোৎসৃষ্টগ্রাহং জ্বলিতহুতভুক্সন্নিভরুচিঃ ।
বহন্ দণ্ডং দুষ্টপ্রশমনকৃতে নগ্নচরণঃ
পরিব্রাড্ যোঽসৌ ভো নরপতিসমানঃ ক্ষিতিতলে ॥ ৮ ॥

অনল্পার্ত্তিব্রাতাকবলিতজনুর্দুঃখশমনো
ভ্রমন্ দেশং দেশং রবিরিব হরন্ জাড্যনিকরম্ ।
পরপ্রেমোদ্ভিন্নান্তরকমলসৎ-তত্ত্বসুরভিং
বিতন্বানো যোঽস্যাং ভুবি তনুভৃতামাশ্রয় ইহ ॥ ৯ ॥
অকামং কুর্ব্বাণং নিরবধি জনানাং শুভকরং
সমস্তোঽয়ং জীবঃ শিব ইতি ধিয়া কর্ম্মবিপুলম্ ।
গুরুস্নেহপ্রেমামৃতসলিলনির্ধূতরজসং
বিবেকানন্দং তং শ্রয়ত পরমাদর্শমিহ নঃ ॥ ১০ ॥

বিদ্বন্মণ্ডিত-বিশ্বধর্ম্মসমিতৌ প্রজ্ঞাসহস্রাংশুনা
বেদান্তাম্বুধিভারততত্ত্বমহিমা যেনৈব সংস্থাপিতঃ ।
চিত্তাহ্লাদকরৈর্মহার্থবচনৈঃ সম্মানিতো যশ্চিরং
কাষায়াম্বরকঞ্চুকদ্যুতিভৃতং সন্ন্যাসিনং তং ভজে ॥ ১১ ॥

মৃগেন্দ্রবিক্রমং বীরং সন্ন্যাসিনং জগদ্গুরুম্ ।
শঙ্করাংশসমুদ্ভূতং নমামি বিবেকাহ্বয়ম্ ॥ ১২ ॥

চরণধ্বনি*

ভগিনী নিবেদিতা

(অনুবাদক : ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ)

মাগো,

ওই শুনি তোমার চরণধ্বনি।

যুগ থেকে যুগান্তরে

পৃথিবীর নানা প্রান্তে

ধীরে অতি ধীরে

তোমার চরণপদ্মে ফুটে উঠছে

ইতিহাসের বিশ্রুত নগরী,

প্রাচীনতম শাস্ত্র,

কবিতা,

আর মন্দির,

মহৎ সাধনা

আর

সুকঠোর ন্যায়ের সংগ্রাম।

মাগো!

কোন লক্ষ্যপথে চলেছে ওরা,

তোমার চরণচিহ্ন যত!

ওদের গভীরতম অর্থ

অনুভবের শক্তি আমায় দাও,

দাও সেই পরিব্যাপ্ত দিব্যদৃষ্টি,

আর মানব-ইতিহাসে

তুঙ্গতম মননের অধিকার।

---

* ভগিনী নিবেদিতার 'ভারত-ইতিহাসের পদধ্বনি' (Footfalls of Indian History)-গ্রন্থের ভূমিকা 'The Footfalls'—কবিতা।

মাগো!

কোথায় চলেছে ওরা

তোমার চরণচিহ্ন যত!

আবির্ভূত হও অয়ি মুক্তিদাত্রী জননী আমার!

তোমারি সন্তান,

তোমারি তো স্নেহনীড়ে পালিত সবাই।

ওই দুটি চরণের হোক পাদপীঠ

আমাদের সবার হৃদয়।

'ভূম্যা' দেবী,

আমরা তো একান্ত তোমার।

মাগো!

কোথায় চলেছে ওরা

তোমার চরণচিহ্নের পদাবলী যত!

সমন্বয়াচার্য বিবেকানন্দ

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

জ্ঞান-কর্ম-সমন্বয়-মূরতি শঙ্কর
চারি পীঠে আজো নাম রয়েছে ভাস্বর!
বুঝি রবে চিরকাল!

শাক্যসিংহ ত্যাগমূর্তি করুণা-সাগর
সে করুণা বহি চলে দেশ-দেশান্তর
বুকে বহে মহাকাল।

প্রেমের অমিয় রূপ চৈতন্য-নিমাই।
কারো সাথে কাহারো তো তুলনা না পাই—
বুঝি সব চিরন্তন।

সবার বৈশিষ্ট্য হেরি ব্যক্তিত্বে তোমার
জ্ঞান-প্রেম-ত্যাগ-কর্ম-করুণা-আকার
হেরি' প্রণমে ভুবন।

অদ্ভুতানন্দ-সঙ্গীত

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

[ভৈরবী—একতাল বা দাদ্‌রা]

মূর্খের রূপে কে তুমি হে ঋষি, মেষপালকের ঘরে জনমিলে।
রাম দত্তের ভৃত্য সাজিয়া মা সারদা আর রামকৃষ্ণে পেলে।
ঠাকুর তোমাকে কত না যতনে স'পিয়া দিলেন শ্রীমা'র চরণে ;
(আহা) জননীও কত সোহাগে তোমায় দু'হাত বাড়ায়ে নিলা কোলে তুলে ॥

'সাধুসন্ন্যাসী গরীবের সেবা হয় না যেথায় দেবতা-পূজায়'
কহিলে, 'নিষ্ফল হয় সেই পূজা—দান ও দরদ বিহনে হায়।'
বিশ্ব মোহিত শুনে তব বাণী, নরেন তোমার মহিমা গায়
অতি অদ্ভুত সাধনা তোমার, 'অদ্ভুতানন্দ' নাম তাই পেলে ॥

তব বন্দনা

শ্রীসুসময় রায় চৌধুরী

তব বন্দনা গাহি যেন নাথ তব বন্দনা লাগি,
আমারে প্রচার করিবার তরে মান নাহি যেন মাগি।
ক্ষণিকের মান ক্ষণেকে ফুরাবে—
প্রাণ মন তাহে কভু না জুড়াবে ;
কর এ আশিস্ চিরদিন যেন তব মুখ চাহি জাগি।

আমার গর্ব দূর ক'রে প্রিয়, আমার মাঝারে এসে
সখার মতন হাত ধরে মোরে কাছে ডেকো ভালোবেসে।
বন্ধু আমার ওগো চির-প্রিয়,
করুণা করিয়া বুকে টেনে নিও ;
এমন করিয়া পথহারা হয়ে নাহি যাই যেন ভেসে।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের যুগচিন্তা

স্বামী জীবানন্দ

যুগনায়ক আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ও কর্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল। তিনি নিজের জীবনে বেদান্তের মহত্ত্ব উপলব্ধি ক'রে তার ভাব দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য তাঁর কণ্ঠে যথাযথ-ভাবে ধ্বনিত হয়েছিল, তার প্রতিধ্বনি আজো শুনতে পাওয়া যায়। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন, ভারতের কল্যাণেই জগতের কল্যাণ, ভারতের স্বাধীনতা সমগ্র মানব-জাতির মুক্তির নিদান এবং ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ বিশ্ব-বাসীর শান্তিপথের অমূল্য পাথেয়। শুধু তাই নয়, জাতীয়-শিক্ষা সমাজনীতি অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান সাহিত্য ললিতকলা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর চিন্তার পরিচয় তাঁর বিদ্যুদ্গর্ভ বাণীতে বিদ্যমান।

শ্রীঅরবিন্দ লিখিয়াছেন, "ভারতের বিরাট প্রাণপুরুষ বলিয়া যদি কাহাকেও স্বীকার করা যায়, তবে তিনি একমাত্র বিবেকানন্দ। তাঁহার প্রভাব ভারতাত্মাকে আলোড়িত করিয়াছে। আমরা বলিব বিবেকানন্দ এখনও বাঁচিয়া আছেন তাঁহার দেশবাসীর আত্মায়, দেশজননীর সন্তানদের আত্মায়।"

ভারতের বহুমুখী জাগরণের মূলে যুগাচার্য বিবেকানন্দের অমূল্য অবদানকে বহু মনীষী অভিনন্দিত করেছেন, যথা মহাত্মা গান্ধী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহামতি গোখলে। ম্যাক্স্‌মূলার, রোমাঁ রোলাঁ, অধ্যাপক রাইট, পল ডয়সন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনীষী স্বামীজীর প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

চিকাগো ধর্মমহাসভায়, আমেরিকা ও ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সর্বত্র তাঁর বজ্রবাণী ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। আজো তাঁর শ্রীমুখে উচ্চারিত উপনিষদের মহামন্ত্র "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" প্রাণে অপূর্ব সাড়া জাগায়। ওঠ, জাগো, থেমো না, যে পর্যন্ত না লক্ষ্যে উপস্থিত হচ্ছ—থামবার অবসর নেই। এ বাণী ঘুমন্ত মানুষকে জাগাবার বাণী।

স্বামীজী চেয়েছিলেন বিজ্ঞান ও দর্শনের মিলন, কর্মজীবনে বেদান্তের প্রয়োগ, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, অস্পৃশ্যতা-বর্জন, ছুৎমার্গ পরিত্যাগ, ধর্মের কুসংস্কার-ত্যাগ, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন, খাদ্য পোশাক ও আচার-ব্যবহারের সামঞ্জস্য, ঘৃণার ভাব বিসর্জন, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য, স্বাদেশিকতা, দেশপ্রেম, বিশ্বজনীনতা, রাষ্ট্রের শৃঙ্খল-মুক্তি, মাতৃভাষার উন্নতি, নারীজাতির স্বাধীনতা শিক্ষা ও উন্নতি এবং সর্বত্র শিক্ষার বিস্তার।

আমাদের বৈষয়িক উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও কারীগরী বিদ্যার প্রয়োজন এবং মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য আধ্যাত্মিক শক্তি আবশ্যক—এটি তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন।

পাখি যেমন একটি ডানায় উড়তে পারে না, তেমনি জাতির উন্নতির জন্য পুরুষ ও নারী উভয়েরই উন্নতিসাধন প্রয়োজন। তিনি বিশ্বকে একটি মহাপরিবারে পরিণত দেখতে চেয়েছিলেন

—শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে ; যেখানে ধর্মে ধর্মে বিভেদ থাকবে না, বেদান্তের উচ্চতত্ত্ব মহাসাম্য সর্বধর্মের নরনারী অনুশীলন করবে, অথচ নিজেদের গোঁড়ামি বিসর্জন দিয়ে স্ব স্ব ধর্মেরও উন্নতি করবে, যেখানে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য থাকবে না, উচ্চজাতি ও পদদলিত অবহেলিত মানুষের মধ্যে অসাম্য থাকবে না যেখানে ছোট বড় সকলেই শিক্ষা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যলাভের সমান সুযোগ পাবে।

স্বামীজী চেয়েছিলেন ব্রাহ্মণের মস্তিষ্ক ত্যাগ তপস্যা পাণ্ডিত্য সদাচার সত্যপালন ঈশ্বরানুরাগ; ক্ষত্রিয়ের বীর্যবত্তা সাহসিকতা দেশপ্রেম দেশ-রক্ষার জন্য বাহুবল মনোবল পরোপকার-স্পৃহা দয়া দানশীলতা ; বৈশ্যের দেশের সম্পদ-বৃদ্ধির শক্তি, কৃষিবাণিজ্যের উন্নতি-বিধানের প্রয়াস, পশুপালন প্রভৃতি এবং শূদ্রের সেবার ভাব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের গুণাবলীর সম্মিলনে ব্যক্তিগতভাবে পরিণত হবে 'মানুষ মহামানবে এবং জাতিগতভাবে সর্বজাতি রূপান্তরিত হবে এক মহাজাতিতে—একটি মহাবিশ্বপরিবারে।

একদিন যেমন স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা-ধারার প্রয়োজন ছিল ভারতের প্রাক্-স্বাধীনতার যুগে এবং সে-প্রয়োজন দেশপ্রেমিক দেশমাতৃকার সন্তানগণ উপলব্ধি ক'রে তার সদ্ব্যবহার করে-ছিলেন, আজো তেমনি ভারতবাসীর কাছে তাঁর মহাবাণী অনুশীলনের প্রয়োজন আছে দেশগঠনের কাজে। শুধু তাই নয়, যতদিন না সর্বদেশের রিক্ত উপেক্ষিত নিগৃহীত সর্বহারা মানুষের সর্ববিধ উন্নতি হচ্ছে, ততদিন জগতে যুগাচার্য স্বামীজীর বাণী অনুশীলনের প্রয়োজন থাকবে।

সর্ববিধ উন্নতির মূলে শিক্ষা। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তা একেবারে শিক্ষার মূল থেকে বহু দিকে বিস্তৃতভাবে অগ্রসর হয়েছে। শিক্ষার সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রে স্বামীজী বলেছেন, "Education is the manifestation of the perfection already in man." তার মানে যে-প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ হয়, মানুষ সর্বাঙ্গীণ শক্তিপ্রকাশে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে শরীর মন ও বুদ্ধির সুষম বিকাশে —তারই নাম শিক্ষা। স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে বহু জিনিস রয়েছে, যেখানে আমরা পাই—শিক্ষাদর্শন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর চরিত্র, শিক্ষায়তন, ধর্মশিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা ও জনশিক্ষার কথা। স্বামীজী বলতেন: শিক্ষাই সর্বব্যাধির মহৌষধ, শ্রদ্ধা তার মুখ্য উপকরণ। কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে তা তিনি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন: যেমন বাগানের মালী বাগানে গাছ লাগিয়ে তার পরিচর্যা করে; সার ও জল দেয়, আগাছা তোলে, রৌদ্রছায়ার প্রতি দৃষ্টি রাখে। গাছ উপযুক্ত পরিচর্যার ফলে আপনা থেকেই বেড়ে ওঠে নিজের শক্তিতে ; তেমনি মানুষের মনে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে তার বিকাশের সুযোগ ক'রে দিতে হবে, শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষার্থীর শরীর ও মনের সুষম বিকাশ সাধনের জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উপযুক্ত ব্যায়াম অনুশীলন ব্রহ্মচর্যপালন প্রাতরুত্থান নিয়মিত স্নানাহার খেলাধুলা প্রভৃতি তার দৈনন্দিন নিয়মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সত্যকথন, মেধাবৃদ্ধির জন্য একাগ্রতা-অভ্যাস, চারিত্রিক উন্নতির জন্য আজ্ঞানুবর্তিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা-ত্যাগ, গুরুজনের উপদেশ পালন, নিঃস্বার্থ হওয়ার জন্য সহপাঠী ও খেলুড়েদের সুখে দুঃখে বিপদে আপদে সাহায্য ও জনগণের সেবায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীকে ব্রতী হতে হবে। শিক্ষাদান-

প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। তিনিই হলেন আদর্শ শিক্ষক যিনি নিজে উপদেশগুলি পালন করেন। তাঁর কথাতেই শিক্ষার্থীর মনে শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে। মস্তিষ্কের মধ্যে কতকগুলি জিনিস প্রবেশ করানোই শিক্ষা নয়, সেগুলি যাতে পরিপাক হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা চাই। পঠনীয় গ্রন্থ যাতে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয় সেইভাবে রচনা করতে হবে।

প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে মহান্ করে, উদার করে, বিনয়ী হ'তে শেখায়, নিঃস্বার্থপর করে, স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হতে শিক্ষা দেয়; অর্থাৎ শিক্ষার ফলে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে, পরমুখাপেক্ষী হয় না। শিক্ষা অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে যায়। প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ কুসংস্কারমুক্ত হয়।

স্বামীজী বলেছেন—জনগণের শিক্ষার প্রয়োজনে ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি জনশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, সেজন্য ম্যাপ গ্লোব ছায়াচিত্র ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন প্রভৃতি আধুনিক উপকরণগুলির সাহায্য নিতে হবে। আবার যাত্রা কথকতা কবিগান কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে পুরাণের গল্প ও রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে জনসাধারণকে পরিচিত করতে হবে, যেমন প্রাচীন কালে করা হ'ত। মাতৃভাষাই হবে জনশিক্ষার মাধ্যম। সর্বসাধারণের কল্যাণই হবে শিক্ষাবিস্তারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে প্রাচীন ভাবের সঙ্গে নবীন ভাবের মহামিলন সূচিত হয়েছে; একদিকে উপনিষদের মহাবাণী ও ধর্মের সারতত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে, অপরদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও কারীগরী বিদ্যায় যাতে পারদর্শিতা লাভ হয় তাও করতে হবে। স্বামীজীর দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রাচ্যের দর্শনকে একদিন অবশ্যই হাত মেলাতে হবে। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের নিয়মানুবর্তিতা কর্মদক্ষতা স্বাধীনতাস্পৃহা প্রভৃতি চাই।

নারীশিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন স্বামীজী। মেয়েদের সাহিত্য ধর্ম ললিতকলা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। মেয়েরা হবে স্বাস্থ্যবতী গুণবতী পবিত্র এবং আত্মরক্ষায় পারদর্শিনী; এজন্য ভগিনী নিবেদিতাকে দিয়ে তিনি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। তাঁর আদর্শ-রূপায়ণে নিবেদিতা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তা সকলেই জানেন।

স্বামীজীর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হ'ল—Man-making and character-building—এ শিক্ষায় মানুষ হবে প্রকৃত মানুষ, স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়ে জীবন উৎসর্গ করতে শিখবে সকলের কল্যাণে এবং চরিত্র হবে সুষমামণ্ডিত। যে শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে না, স্বাবলম্বী হ'তে শেখায় না, সে শিক্ষা স্বামীজীর দৃষ্টিতে শিক্ষাই নয়। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি হবেন সাহসী ধৈর্যপরায়ণ নিয়মানুবর্তী পরোপকারী এবং অবিচার-অনাচার-দমনে খড়্গহস্ত। শিক্ষিত ব্যক্তি অর্থোপার্জনে সমর্থ হবেন এবং অধ্যাত্ম-বিদ্যাতেও পারদর্শী হবেন। দারিদ্র্যমোচনের জন্য চাই অর্থকরী বিদ্যা ও জ্ঞানোন্মেষের জন্য প্রয়োজন অধ্যাত্ম-বিদ্যা। স্বামীজী ব্রহ্মচর্যভাবাশ্রিত প্রাচীন গুরুকুল প্রথার সঙ্গে বর্তমান বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীর সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন চেয়েছেন।

স্বামীজী সর্বস্তরের মানুষের উন্নতি কামনা করতেন। তাঁর দেশপ্রেমের মধ্যে আছে দেশকে সামগ্রিক ভাবে উন্নত করার প্রচেষ্টা। তিনি যে উন্নত ভবিষ্যৎ ভারত দেখতে চেয়েছেন

সেখানে আছে সমস্ত মানুষের উন্নতি।

তাঁর মহাবাণীর মধ্যে পাই : "হে ভারত, ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ...।" এখানে আমরা বুঝতে পারছি, তাঁর দেশপ্রেম প্রতিটি রক্তবিন্দুর সঙ্গে মিশ্রিত ছিল। এ দেশপ্রেম মুখের কথা নয়, স্বামীজীর জীবন ও বাণীর সঙ্গে ওতপ্রোত।

নূতন ভারতের কল্পনায় তিনি চেয়েছেন: "...নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।"

আজ যে নিম্নস্তরের মানুষের উন্নতির জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা চলেছে, তা যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা ব'লে মনে করা যেতে পারে।

স্বামীজী শ্রমজীবীদের কত ভালবাসতেন, তা তাঁর বাণীতেই প্রকাশিত: "বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের বাহবার সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজ্ঞান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য—সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি!—তোমাদের প্রণাম করি।" ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয় মহাত্যাগী পরমসন্ন্যাসী দেশপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ শ্রমজীবীদের ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেছেন

আলস্য পরিহার ক'রে যথার্থ দেশসেবক ও দেশপ্রেমিক হ'তে স্বামীজী আহ্বান করেছেন। বলেছেন: 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব।'

পাশ্চাত্য বিজয় ক'রে স্বদেশে ফিরে এসে তিনি বলেছিলেন, "আগেও আমি দেশকে ভালবাসতাম, এখন দেশের প্রতিটি অণুপরমাণুও আমার প্রিয়, আমার প্রাণের জিনিস।"

শিক্ষার মতো ধর্মচিন্তায়ও স্বামীজীর বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন আজন্ম সত্যের পূজারী এবং সেই সনাতন শাশ্বত সত্যকেই বিশ্বে প্রচার করেছেন। ধর্ম বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন—মনুষ্যত্বের এবং দেবত্বের বিকাশ। মনুষ্যত্বের বিকাশ মানে—আমি যে মানুষ, পশু নই, পশু থেকে আমার অনেক তফাত—এ ভাবটি সর্বদা জাগ্রত রাখা। দেবত্বের বিকাশ মানে—প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি রয়েছে, তাকেই জাগিয়ে তোলা এবং সর্বদা অনুভব করা। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হলেই মানুষ যথার্থ ধার্মিক হয়।

আসল ধর্ম আছে চরম সত্যের উপলব্ধিতে, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি ধর্মের বহিরঙ্গ মাত্র। স্বামীজীর ধর্ম সম্পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত ধর্ম। যথার্থ সাম্য ঐক্য উপলব্ধি করার ধর্ম। এ ধর্মে আছে পরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য একাগ্রতা অভ্যাস; প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য, শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করার জন্য ঐকান্তিক প্রয়াস; স্বার্থপরতা নীচতা দূর করার অভ্যাস এবং নরনারায়ণজ্ঞানে সেবাবৃত্তির অনুশীলন। এ ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে না, অসীম সাহসী পরার্থপর ও মহনীয় করে; এ ধর্মে গোঁড়ামি নেই, ধর্মধ্বজিতা নেই, নেই সঙ্কীর্ণ

মনোভাব বিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণ্যভাব ও ধর্মে ধর্মে কলহ করার প্রবৃত্তি। স্বামীজীর ধর্ম অনুশীলন করলে মানুষ হয় প্রকৃত মানুষ প্রকৃত দেবতা আত্মজ্ঞ পরব্রহ্মবিদ্। স্বামীজীর ধর্ম মানুষকে বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে, তার হৃদয়কে মহাসমুদ্রের মতো বিশাল ও মহাকাশের মতো উদার করে আর নারীমাত্রকে জগজ্জননীর রূপ ভাবতে শেখায়। স্বামীজীর ধর্ম অনুশীলন না করলে মানুষ হয় অমানুষ, হস্তপদবিশিষ্ট হয়েও পশুতুল্য জীবন-যাপন করে; অতএব তাঁর ধর্ম তথাকথিত ধর্ম নয়, যে-ধর্ম ধর্মে ধর্মে বিবাদ ঘটায়, বিদ্বেষ আনে, কুসংস্কার বাড়ায়। স্বামীজীর ধর্ম অনুশীলনে মানুষ হয় সর্বসংস্কারমুক্ত মহামানব, যথার্থ সাম্যে প্রতিষ্ঠিত; অতএব এই ধর্ম বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্বকালের সকল মানুষের সর্ববিধ উন্নতির জন্য একান্ত কাম্য।

আগে বলা হ'ত দেবদেবী শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে বিশ্বাস করলে মানুষ হয় আস্তিক, কিন্তু স্বামীজী আত্মবিশ্বাসের উপর জোর দিয়ে বলেছেন, যে আত্মবিশ্বাসী সেই প্রকৃত আস্তিক, তা নইলে তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করেও নিজের উপর যদি কেউ অবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাহীন হয়, তবে তাকে আস্তিক আখ্যা দেওয়া যাবে না। তিনি নচিকেতার মতো শ্রদ্ধাবান ও সত্যাশ্রয়ী হ'তে বলেছেন। মেয়েদের সীতা সাবিত্রীর মতো পবিত্র হ'তে বলেছেন। স্বামীজীর ধর্ম আমাদের প্রাণের জিনিস, কারণ এতে আছে ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজের সম্মিলন। এ ধর্মে জ্ঞান কর্ম ভক্তি ও যোগ এই চারটি দিকই প্রত্যেক ব্যষ্টি-জীবনে ফুটে উঠবে।

স্বামীজী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর মহাজীবনে সর্বদিকেই ছিল অসামান্য প্রতিভার দীপ্ত স্বাক্ষর। তাঁর জীবনের যে দিকেই তাকাই, সে দিকেই মন প্রাণ আকৃষ্ট হয়; তবে শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাবটি সবচেয়ে আকর্ষণীয়; জীবসেবার মাধ্যমে তিনি বলেছেন কর্মে পরিণত বেদান্তের কথা। তিনি ছিলেন একাধারে মহাবৈদান্তিক মহাযোগী মহাকর্মী ও মহাভক্ত। শুধু কথায় বৈদান্তিক ছিলেন না। তিনি কাজেও বৈদান্তিক ছিলেন। প্রত্যেকটি কর্মের মাধ্যমে তিনি বেদান্তের উচ্চ তত্ত্ব জীবনে পরিস্ফুট করেছেন।

শাস্ত্রে আছে, সর্বভূতে এক পরমাত্মা বিরাজ করছেন—এই মহাভাবটি তিনি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন; তাই তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি:

> "ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু
> সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
> মন প্রাণ শরীর অর্পণ
> কর সখে এ সবার পায়।
> বহুরূপে সম্মুখে তোমার
> ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
> জীবে প্রেম করে যেই জন
> সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামীজীর হৃদয় ছিল মহাসমুদ্রের মতো। তিনি দরিদ্র বঞ্চিত অবহেলিত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন। শিবজ্ঞানে জীবসেবা অর্থাৎ সকলের মধ্যে যে পরম শিব রয়েছেন, তাঁরই সেবা পূজা উপাসনা। দরিদ্র রিক্ত ও আর্ত মানুষের সেবা করলে তাঁরই পূজা করা হবে। মন্দিরে বিগ্রহের পূজা থেকে এ পূজা বহু বিস্তৃত ও ব্যাপক। এ হচ্ছে কর্ম-জীবনে বেদান্ত-প্রয়োগের সার কথা। পূর্বে হিন্দু সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যে আর্তসেবার প্রচলন ছিল না। তাঁর নূতন সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ শিবজ্ঞানে জীবসেবা বা নরনারায়ণসেবার প্রচলন করেছেন এবং এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। দেশবাসীকেও

তিনি ঐ ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'তে বলেছেন। এই মহাসেবার উদ্দেশ্য হ'ল—সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন। সেবায় মানুষের সঙ্কীর্ণতা চলে যায়, হৃদয় মহাকাশের মতো উদার হয়, স্বার্থপরতার স্থলে নিঃস্বার্থ প্রেমের আবির্ভাব হয়। মন্দিরে যখন পূজা করা হয়, তখন শ্রদ্ধা আন্তরিকতা ও ভক্তি সহকারে সমস্ত পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়, তেমনি আর্ত পীড়িত রিক্ত মানুষের যখন সেবা করতে হবে, তখন সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভগবানেরই সেবা করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে যে ভগবান রয়েছেন, তিনি আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ সেবা গ্রহণ করছেন এবং আমাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছেন, যাতে আমার হৃদয়ের প্রসার ঘটে, ভববন্ধন ঘুচে যায় এবং সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন হয়। জীব-সেবা করার সময় মনে যদি শ্রদ্ধা ভালবাসা ভক্তি না থাকে, তবে সেবা সার্থকতা লাভ করে না, গতানুগতিক সেবার সঙ্গে তার কোন পার্থক্যই থাকে না; তথাকথিত সাধারণ কর্মীর মতো হয়ে যেতে হয়। ভগবদ্বুদ্ধিতে সেবা করতে না পারলে শ্রদ্ধার পরিবর্তে মনে অহঙ্কার বাসা বাঁধে, আমি যে একজন বড় সেবাকারী কর্মী এই ভাবের বশবর্তী হয়ে মানুষ অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ওঠে; জীবসেবার যে মহান্ উদ্দেশ্য তা ফলপ্রসূ হয় না; ভগবানলাভের পথ থেকে দূরে সরে যেতে হয়। সাধারণভাবে অর্থাৎ ভগবদ্বুদ্ধিতে না ক'রে আর্তসেবা জনসেবা শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্যে যাদের সেবা করা হয়, তাদের দুঃখমোচন শিক্ষালাভ প্রভৃতি অনেকাংশে হয়ে থাকে, কিন্তু সেবাকারীর বিশেষ কোন লাভ হয় না। স্বামীজীর ভাব হ'ল এই সমস্ত কাজই বেদান্তের আলোকে, সেবার ভাবে, ভগবদ্বুদ্ধিতে করতে পারলে মোক্ষলাভ হবেই। কাজ ছোট হোক বা বড় হোক, সেবার ভাবে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবদ্বুদ্ধিতে করতে হবে, তবেই মুক্তি। সকলে হয়তো বড় কাজ করার সুযোগ পাবে না, কিন্তু ছোট কাজের তো পাবেই; সেই আপাতপ্রতীয়মান অকিঞ্চিৎকর কাজটি যদি ঈশ্বরের উপাসনাজ্ঞানে করতে পারা যায়, তবে তাতেই ঈশ্বরদর্শন হবে।

বিভিন্ন যোগের মাধ্যমে পরম তত্ত্ব উপলব্ধির কথা শাস্ত্রে আছে। স্বামীজী বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, শিবজ্ঞানে জীবসেবার মাধ্যমে সেই তত্ত্বই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধ হবে। যুগাচার্য স্বামীজীর যুগচিন্তার এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সমালোচনা

অর্ঘ্য : শ্রীঅজয়কুমার গোস্বামী। প্রকাশিকা : শ্রীমতী রমা গোস্বামী, ৯/১/এ সদানন্দ রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬, (১৯৭৫), পৃষ্ঠা ৪৪০ + ২৪ + ২২, মূল্য পনের টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি আকাশবাণীর অন্যতম গীতিকার শ্রীঅজয়কুমার গোস্বামীর স্বরচিত একটি সংগীত-সংগ্রহ। ইহা তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে বিভক্ত। ১ম ও ২য় খণ্ডে বিভক্ত 'অর্ঘ্য' ইহার পূর্বে প্রকাশিত হইয়া সংগীতরস-পিপাসুদের পরিতৃপ্তি দিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে ৪৩২টি সংগীত স্থান পাইয়াছে। শ্যামা-মায়ের উদ্দেশেই সংগীতগুলি রচিত। দুই-একটি গানে শ্যাম ও শ্যামা যে অভিন্ন তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

সংগীতগুলির অধিকাংশই সুলিখিত ও উচ্চ-ভাবোদ্দীপক। এই সংগীত-সংগ্রহের বেশ কয়েকটি সংগীত আকাশবাণীতে গীত হইয়াছে। আধুনিককালে ভক্তিমূলক গান রচনা তো প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে। যে-সব গান সাধকদের ভগবদ্-ভাবোদ্দীপনায় সাহায্য করে, তাহা প্রায়ই শ্রুতিগোচর হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্যামাসংগীতগুলির রচনা ও প্রকাশন বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রত্যেকটি গানে লেখকের ভক্তিপ্রাণতা ও শ্যামামায়ের চরণস্পর্শ পাইবার ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানা ছন্দে রচিত, নানা ভাববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সংগীতগুলি মাতৃমাহাত্ম্য উপলব্ধির সহায়ক হইবে। সুর তাল লয়ের সহিত সংগীতগুলি গীত হইলে গায়ক ও শ্রোতা উভয়েরই অন্তরে ভক্তিরস সঞ্চারিত হইবে বলিয়া মনে করি।

অলৌকিক দর্শনের কথা দুই-একটি সংগীতে পরিবেশিত হইয়াছে। বিশ্বাসীদের তাহা উপভোগ্য হইবে এবং তাঁহাদের মনে হয়তো সুদূরপ্রসারী ছাপ রাখিবে। অবিশ্বাসীরা সম্ভবতঃ নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু মনে রাখা ভাল এমন অনেক কিছু জগতে ঘটে যাহা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত।

পরিশেষে পুস্তকখানির দুই-একটি ছোটখাট ত্রুটির কথা উল্লেখ করিতে হইতেছে। 'উৎসর্গ' পত্রে রবীন্দ্রনাথের যে গানটি প্রথমেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই ভুল থাকিয়া গিয়াছে: 'জীবনের যত পূজা' হইবে না, হইবে 'জীবনে যত পূজা'। যদিও একটি শুদ্ধিপত্র পুস্তকের শেষে দেওয়া হইয়াছে, তথাপি স্থানে স্থানে আরো কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটিগুলি সংশোধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উচ্চ মানের। জনসমাজে গ্রন্থটি সমাদৃত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

শ্রীমৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী
প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্কস্‌বাদই শেষ কথা নয়: নন্দু ঘোষ। প্রকাশক: শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৮এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯। পৃঃ ১৫৫, মূল্য ছয় টাকা মাত্র।

দর্শনের জগতে যাঁরা বাস করেন, তাঁরা সকলেই এক হিসাবে মানবেন যে, কোনো মতবাদই শেষ কথা নয়, তারও পরে কথা থাকে বা কথার অতীত কিছু থাকে। তবু এক এক যুগে এক একটি মতবাদ সর্বগ্রাসী হয়ে আর সব মতবাদকে আচ্ছন্ন করতে চায়। কিছুকাল আগে এই বাংলাদেশে কোম্‌তের পজিটিভিজম্ বা ধ্রুববাদ এমনি এক চিরন্তন সত্যের দাবী নিয়ে এসেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতসমাজে এ মতবাদের প্রভাব কতখানি ব্যাপক হয়েছিল, তা অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের রচনাবলীতে লক্ষণীয়। তবে এঁরা কেউই ধ্রুববাদকে শেষ সত্য মনে করেন নি, এই যা রক্ষা। একান্ত ধ্রুববাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে বঙ্কিমের যোগাযোগ ছিল, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিতে ও মননে তার স্বাক্ষর রয়েছে।

একালে গোটা দুনিয়ার তরুণসমাজে (অনেক তরুণ এখন পরিণত বৃদ্ধও বটে) মার্কস্‌বাদ ও তার নানা শাখাপ্রশাখার প্রভাব যে ব্যাপক, তা সংবাদপত্রের পাতা ওল্টালেই চোখে পড়ে। যথার্থ মার্কস্‌বাদ কি, তা নিয়ে তর্ক বিতর্ক, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাঙা-গড়া, নানা দলের ও উপদলের

উত্থান-পতন—এ সবই বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশিষ্ট ঘটনা। দেখে শুনে মনে হয়, মার্কস্‌বাদের রাষ্ট্রীয় রূপায়ণের উজ্জ্বলতম মুহূর্ত কেটে গিয়ে পড়ন্ত বেলার আলোকে আত্মবিলয়ের সময় আসন্ন। পরবর্তী শতাব্দীর গবেষকেরা অতীত চিন্তাধারার পর্যালোচনায় মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে কৌতূহলী দৃষ্টিপাত করে নবতর যুগসত্যের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

না, মার্কস্‌বাদ অবশ্যই শেষ কথা নয়। তবু আধুনিক মানুষকে বুঝতে হলে এ মতবাদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণার প্রয়োজন আছে। অমলেন্দু ঘোষ তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং বিশ্ববিস্তারী কৌতূহল ও অধ্যয়নের দ্বারা স্বল্পসীমার মধ্যে এই মতবাদের মূল বক্তব্যগুলি প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়ে তুলে পাঠকদের বিশেষ সহায়তা করেছেন। মার্কস্‌বাদের প্রতি যেমন তাঁর অন্ধ আসক্তি নেই, তেমনি অন্ধ মার্কস্‌বিদ্বেষীও তিনি নন। ফলে আলোচনার সর্বত্র একটি সশ্রদ্ধ সজাগ দৃষ্টি রয়েছে, যা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। গ্রন্থের প্রথম অংশে মার্কস্‌বাদের আলোচনা ও দ্বিতীয় অংশে মার্কস্‌বাদের সমালোচনা—দুটি আলোচনাই মনোজ্ঞ।

ভারতীয় দৃষ্টির চার পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এর মধ্যে দ্বিতীয়টিকেই মার্কস্ সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণে মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। কাছাকাছি সময়ে আর এক মনীষী ফ্রয়েড নিয়েছিলেন তৃতীয়টিকে। বস্তুতঃ বিশ্বসভ্যতার বিবর্তনে এ দুটি মূলসূত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে যে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল, তা এঁদের দুজনের দ্বারাই সাধিত হয়েছে। কিন্তু মানবজীবনসমস্যার সব দিকটির উত্তর দেবার দাবী এঁরা কেউই করেন নি। মার্কস্ তো নিজেকে মার্কস্‌বাদী বলেই মনে করতেন না। তার অর্থ—তিনিও সচেতন ছিলেন যে মতবাদমাত্রেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে, তা না হলে তা শেষ অবধি আফিমের নেশায় পরিণত হয়ে মানুষকে আচ্ছন্ন করে দেয়—যে নেশার বিরুদ্ধে মার্কসের অভিযোগ।

ভারতের ইতিহাসে চার্বাকপন্থীদের চিন্তাধারার সঙ্গে মার্কস্‌বাদের মিল আছে কিছু কিছু। নিরীশ্বর চিন্তাধারা পরবর্তী বৌদ্ধ বা জৈনদর্শনেও দেখা গেছে। কিন্তু কোনো নিরীশ্বর বস্তুবাদী চিন্তাধারাই মার্কস্‌বাদের মতো রাষ্ট্রে সমাজে শিল্পে সাহিত্যে মানবজীবনের বিভিন্ন চেতনায় এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আবার এত তাড়াতাড়ি সেই প্রভাবের অবক্ষয়ও কম লক্ষণীয় নয়। যে কোনো কারণেই হোক কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার দ্বারা আধুনিক মার্কস্‌বাদী দেশগুলির শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রে ক্রমাবনতির কারণ নির্দেশ করা যায় না। এসব দিক থেকে 'মার্কস্‌বাদের বিকল্প' নামে আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় অংশে লেখক সুভাষচন্দ্রের 'সামাজিক বিপ্লব' সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন। এই অংশেও লেখকের বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা সাধুবাদের যোগ্য।

ভারতীয় পটভূমিতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ', বঙ্কিমের 'সাম্য' এবং বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত'—এই তিনটি গ্রন্থের ও উক্ত মনীষীদের চিন্তাধারা সবিস্তারে আলোচিত হলে মার্কসবাদের পাশাপাশি ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অগ্রগতি সম্বন্ধে পাঠকদের ধারণা স্বচ্ছতর হতে সাহায্য করতো। এদিকটি এ গ্রন্থের প্রসঙ্গে ভেবে দেখার মতো। স্বামীজীর মতো গণচেতনার অধিকারী চিন্তানায়ক বহু আগেই

উপলব্ধি করেছিলেন যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণদের শূন্যে বিলীন হবার দিন এসেছে, কিন্তু যারা তাদের স্থান পূর্ণ করবে সেই সর্বহারাদেরও যে অতীত সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ হতে হবে, সেকথা স্বামীজী ভোলেন নি। শূদ্রযুগ যে সংস্কৃতির দিক থেকে দীনতর হবে একথাও তিনি ভেবেছিলেন। সুতরাং তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র ছিল ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্যের অর্থ ও শূদ্রের শ্রমের মিলিত রূপ—যে রাষ্ট্রে সকলেরই সমান মর্যাদা। বেদান্ত আত্মার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য বা সুবিধাবাদই স্বীকার করে না। (স্বামীজীর শ্রীমতী মেরী হেলকে লেখা ১লা নভেম্বর, ১৮৯৬ তারিখের পত্র, 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থ, এবং Vedanta and Privilege-বক্তৃতা স্মরণীয়।)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুলিখিত ভূমিকাটিও গ্রন্থের ভূষণস্বরূপ। শোভন প্রচ্ছদ, পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ প্রকাশকের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। বিশ্বসংস্কৃতির সামগ্রিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে এ জাতীয় আলোচনাগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য।

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

উন্নিদ্র—প্রথম সংখ্যা—পৌষ, ১৩৮৩। সম্পাদক—বিজন ঘোষাল। ২১/১ অরবিন্দ রোড, হাওড়া ৭১১১০৬। মূল্য ০·৭৫।

নবপ্রকাশিত মাসিক পত্রিকা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাব অবলম্বনে যুবসম্প্রদায়কে মনুষ্যত্বের সাধনায় জাগ্রত রাখার সংপ্রচেষ্টায় কয়েকজন যুবকের মিলিত প্রয়াসে পত্রিকাটির আবির্ভাব। আমরা কামনা করি ইহার যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন ও সুদূরপ্রসারী হউক।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব

গত ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ (১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৬), বেলুড় মঠে ও বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ১২৪তম শুভ জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উদ্বোধন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উৎসবের বিবরণী গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বেলুড় মঠ এবং চেরাপুঞ্জী ও মেদিনীপুর শাখাকেন্দ্র হইতে যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বেলুড় মঠ: মঙ্গলারতি বেদপাঠ ভজন পাঠ বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। পূজার পর প্রায় ২৫,০০০ ভক্ত নরনারী হাতে হাতে খিচুড়ি-আদি প্রসাদ ধারণ করেন। অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গীতানন্দ স্বামী অসক্তানন্দ ও সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম: উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু খাসিয়া ও গারো উপজাতীয় নারী-পুরুষ আশ্রমে আসেন। মঙ্গলারতি সমবেত ভজন (বাংলা ও খাসিয়া ভাষায়) এবং পূজা হয়। মধ্যাহ্নে আশ্রম-অধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দ খাসিয়া ভাষায় মায়ের সম্পর্কে আলোচনা করেন। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় শ্রীফিলোন সিং ও ব্রহ্মচারী সর্বচৈতন্য শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পাঁচ শতাধিক ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম: মঙ্গলারতি বেদপাঠ উষাকীর্তন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহু ভক্ত নরনারী শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পাদ-পদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে সমবেত হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নে প্রায় ১০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ ধারণ করেন। সান্ধ্য-আরাত্রিকান্তে মন্দির-প্রাঙ্গণে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জীবন ও বাণী অবলম্বনে ভাষণ প্রদান করেন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু ভক্ত নরনারী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। স্থানীয় শিল্পি-বৃন্দের সুমধুর ভজন-সঙ্গীতে সকলে পরিতৃপ্ত হন।

স্বামী সারদানন্দের জন্মোৎসব

উদ্বোধন কার্যালয়ে (শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে) গত ১১ই পৌষ ১৩৮৩, ইং ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬, রবিবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর শুভ জন্মতিথি মঙ্গলারতি পূজা হোম চণ্ডীপারায়ণ জীবনী-আলোচনা ও ভজনকীর্তনাদির মাধ্যমে পালিত হয়। পূর্বাহ্ণে স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ ও আলোচনা করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় ২০০ জন সাধু ও ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। সমগ্র দিনে প্রায় ৪,৫০০ দর্শনার্থীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারতির পর উদ্বোধন কার্যালয়ের নূতন ভবনে সারদানন্দ হলে প্রায় চারিশত ভক্তের সমাবেশে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ পূজ্যপাদ স্বামী সারদা-নন্দজী মহারাজের স্মৃতিচারণ করেন।

হীরক-জয়ন্তী

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ৬০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৭৬) তিনদিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট স্বামী ভূতেশানন্দজী। তিনি বলেন: 'স্বামীজীর শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ১৯১৬ সালে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, কলকাতার একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে, তা-ই আজ ঠাকুর মা স্বামীজীর অপার করুণায় এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের প্রাণঢালা আশীর্বাদে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আজকের এই প্রতিষ্ঠানটিকে দেখে অতীতের সেই ক্ষুদ্র সূচনাকে কিছুতেই জানা যাবে না। যাঁদের যত্ন ক'রে এই লোককল্যাণযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছিল, সেই স্বামী নির্বেদানন্দজী, স্বামী সন্তোষানন্দজী, স্বামী বিশোকানন্দজী—যাঁরা তাঁদের সমস্ত সত্তা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটির সেবা করেছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, তাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই। তবে তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষা ও লোক-কল্যাণচিকীর্ষা বর্তমান কর্মীদের প্রেরণা ও উৎসাহ দেবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর মা ও স্বামীজীর শ্রীচরণে আন্তরিক প্রার্থনা জানাই, এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক।'

দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত সাধারণ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মসচিব স্বামী গম্ভীরানন্দজী। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী।

স্বামী গম্ভীরানন্দজী বলেন:

"সমবেত ভক্তমণ্ডলী ও মাতৃগণ,

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, আমার বুকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি ব্যাজ, যেটি দিয়ে—এখানকার কর্তৃপক্ষ বললেন—নতুন ও প্রাক্তন ছাত্রদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। আমি কি করে নতুন এবং প্রাক্তন—ঠিক জানি না। তবু বলতে পারি, অনেক বছর আগে স্বামী নির্বেদানন্দজী যখন Corporation Street-এ একটি ভাড়াবাড়ীতে বিদ্যার্থী আশ্রম পরিচালনা করতেন, তখন সেখানে মাসাধিক কাল থাকার সুযোগ আমার ঘটেছিল এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। ছাত্র হিসাবে নয়, ছিলাম কিছুদিন সেখানে এবং শিখেছি অনেক কিছু তাঁর কাছ থেকে। কাজেই আমি প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে পড়বো কিনা সেটা আপনারা বিচার করুন। নতুন ছাত্রদের মধ্যে ঢুকতে আমি রাজী আছি, যদি কেউ আমাকে নেয়। কিন্তু এই বয়সে কেউ নেবে বলে মনে তো হয় না।

এই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীকে অবলম্বন ক'রে, তাঁদের ভাবধারা প্রতিফলিত করবার জন্য।

তাঁদের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক থাকতে পারে? —প্রশ্নটা মনে আসা স্বাভাবিক। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণকে আমাদের ভাষাতে বিদ্বান বলা চলে না, শ্রীশ্রীমাকে অবশ্যই বলা চলে না, স্বামীজীর কথা স্বতন্ত্র।

প্রশ্নটির উত্তর আমরা পাই ঠাকুর মা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীর মধ্যে। ঠাকুর জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন: ভক্তদের এনে দাও, যাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি। ডেকেছিলেন ভক্তদের: 'তোরা কে কোথায় আছিস, আয়।' তাঁর আহ্বানে, আপনারা জানেন, প্রথম যাঁরা এসেছিলেন,

কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের লোক, তাঁরা তাঁকে একজন মহাপুরুষ ব'লেই গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভিতর যে অভিনবত্ব আছে, সমগ্র জগৎকে দেবার মত একটা কিছু আছে, সেটা তাঁরা স্বীকার করেছিলেন ব'লে মনে হয় না। দ্বিতীয় স্তরে যাঁরা এসেছিলেন, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি, তাঁরা তাঁকে অবতাররূপে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু প্রাচীনের পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর ভিতর যে অভিনবত্ব আছে, সমাজকে নতুন ক'রে গড়বার জন্য, জীবনে একটা নতুন ধারা এনে দেবার জন্য, সেটা তাঁরা স্বীকার করেছিলেন ব'লে আমার তো মনে হয় না। সুতরাং তিনি খুঁজেছিলেন 'ইয়ং বেঙ্গল'-কে, যারা নবভাবে গঠিত, মন যাদের উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ—নতুন জিনিসকে বুঝে নেবার ক্ষমতা যারা রাখে, যারা শক্তি রাখে হৃদয়ে এবং দেহে, তাঁর নতুন বাণীর মাধ্যমে নতুন ভাবে সমাজকে—জগৎকে সংগঠিত করার। তিনি চেয়েছিলেন নরেন্দ্রকে, রাখালকে, ঈশ্বরকোটী অন্তরঙ্গ ভক্তদের, যাঁদের ভেতর দিয়ে তাঁর বাণী মূর্ত হয়ে এসেছে আজ আমাদের কাছে।

শ্রীশ্রীমা কী করেছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে আমরা জানি—রাধুর বিয়ে হ'য়ে গেছে, গোলাপ-মা বলছেন, 'বড় হয়েছে মেয়ে, এখন আবার স্কুলে যাওয়া কি?' মা বললেন, 'কি আর বড় হয়েছে, যাক্ না। লেখাপড়া, শিল্প এ সব শিখতে পারলে কত উপকার হবে। যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে—এ সব জানলে নিজের এবং অন্যেরও কত উপকার করতে পারবে।'

তাঁর সেবায় নিযুক্ত ব্রহ্মচারীদেরও তিনি বলেছিলেন: 'দেখো, ওদেশ থেকে অনেক সাহেব-সুবো ভক্ত আসবে; তোমরা ইংরেজী লেখা-পড়া শিখে নাও।'

শিক্ষার প্রতি ঠাকুর ও মায়ের আগ্রহ ছিল। স্বামীজীর যে ছিল তা আর বলতে হবে না। সুতরাং তাঁদের ভাবধারা অবলম্বন ক'রে আমরা যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়তে যাই, মনে হবে ঠিকই হচ্ছে—তাঁদের প্রদর্শিত পথেই আমরা চলেছি। তবু অনেকের মনে সন্দেহ জাগে। তাঁরা বলেন: আপনারা এটাকে গ্রহণ করেছেন একটা সাধনা হিসাবে; অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ কথনো হাসপাতাল ইস্কুল কলেজ গড়তে তো বলেননি! উত্তরে বলা যায়: বারণও তো তিনি করেননি! কেউ হাসপাতাল খুলবে না, কেউ কথনো ইস্কুল খুলবে না এমন কথা তো 'কথামৃতে' নেই, 'লীলাপ্রসঙ্গে' নেই, স্বামীজীর গ্রন্থাবলীতেও নেই। শম্ভুবাবুকে একদিন যে বলেছিলেন, 'যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্পেনসারি ক'রে দাও?'—সেটা শম্ভুবাবুর ভুল বুঝিয়ে দেবার জন্য।

আমরা যে ধারা অবলম্বন করেছি—এটা ঠিক প্রাচীন যুগের কর্মযোগ ব'লে মনে করি না। কর্মযোগ বলতে সাধারণভাবে যা বুঝে থাকেন লোকেরা বা সাধারণভাবে যা ব্যাখ্যা করা হয়, তার অর্থ হলো, যে-সমস্ত কাজ শাস্ত্রে বিহিত আছে, যেগুলির দ্বারা কোন স্বার্থ লাভ হ'তে পারে, সেই সমস্ত কর্মের সমাপ্তির পরে তাদের ফল শ্রীভগবানে অর্পণ ক'রে দেওয়া। এটাকে বলা হয়েছে কর্মযোগ। অনাসক্ত হ'য়ে সেই কার্যগুলি করা সাধারণের জন্যে শাস্ত্রে বিহিত আছে। কিন্তু আমরা যে কর্মযোগ অবলম্বন করেছি—স্বামীজী যে-পথ দেখিয়ে গেছেন—সেখানে আগে কাজ করা নিজের স্বার্থের জন্য, তার পরে ফল অর্পণ করা ভগবানে, এ রকমের কথা তো উঠছে না।

স্বয়ং ঠাকুর ব'লে গেছেন—আমি নারায়ণ দেখতে পাচ্ছি ব'লে তোদের ভালবাসি।

বলেছেন, প্রতিমাতে ভগবানের পূজা হয় আর মানুষে হয় না ?

স্বামীজীও সেই ধারাই দেখিয়ে গেছেন। সম্মুখে জীবন্ত সজ্ঞান মানুষ যাঁরা চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে শুধু মন্দিরে প্রতিমায় পূজা করতে হবে, এ ধারা স্বামীজী মেনে নেন নি। সেবার কথা তিনি বলেন নি, বলেছেন পূজার কথা। সামনে যারা আছে, ছাত্র হিসাবে যারা এসেছে বা অন্যভাবে অভাব-অনটন নিয়ে যারা এসেছে, তাদের অভাব-অনটন দূর ক'রে দেওয়া, তাদের যতখানি পারি শিক্ষা দেওয়া দেবতাজ্ঞানে—এই পূজার কথা তিনি বলেছেন। এখানে ফল-সমর্পণের কী আছে ?—দেবতা তো সম্মুখে উপস্থিত! সুতরাং আমাদের যে চলার ধারা, সেটাকে প্রাচীন কর্মযোগের ধারা ব'লে আমি মনে করতে পারছি না।

তারপর এই যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—এর মূলগত কথাটা কী ? আমরা বলতে চাইছি—স্বামীজী যেটা বলে গেছেন—ধর্মকে অবলম্বন ক'রে, নীতিকে অবলম্বন ক'রে জীবন পরিচালিত করতে হবে। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানলাভ—শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। স্বামীজীও তা-ই বলেছেন সমস্ত কর্ম, সমস্ত প্রচেষ্টা হবে ধর্মভিত্তিক। আমরা অনেকে মনে ক'রে থাকি পাশ্চাত্যের কথা শুনে, 'স্লোগান' শুনে ধর্মকে যদি ধরে রাখা হয়, তা হলে সমাজের উন্নতি হবে না, জীবনে প্রগতি হবে না। যদি তা-ই হতো, ও কথা যদি সত্য হতো, তা হলে এই খ্রীষ্টান জগৎ কি ক'রে গড়ে উঠল ? মুসলমান জগৎ কি ক'রে গড়ে উঠল ? এই যে রামদাস স্বামীর গেরুয়া নিয়ে শিবাজী মহারাষ্ট্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করলেন—এ সব কি ক'রে হলো! আধুনিক, অত্যাধুনিক কালে নেমে এসে আমরা যদি স্বামীজীর দিকে তাকাই, তিনি কী করেছিলেন ? তিনি তো পড়াশুনায় ও অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তবু ধর্মকে তো তিনি ছাড়েন নি। যে-কালে তবলায় চাঁটি দিলে লোকে মনে করতো যে ছেলে চরিত্রহীন হয়ে গেছে, সে-কালের দিনেও তো তিনি তবলা শিখেছিলেন, গান শিখেছিলেন, কুস্তি লড়েছিলেন। সব কিছু করেও তিনি ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং ধর্মনেতাও তিনি হয়েছিলেন। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে জীবনের প্রসারের কোথায় বাধা ঠেকে আমি তো দেখতে পাই না। প্রাচীন কাল থেকে আমরা জানি, নটরাজের নৃত্যের তালে তালে ছন্দ বেরিয়ে আসে, সঙ্গীত বেরিয়ে আসে, আমরা বিদ্যার জন্য বাণীর পাদপীঠে উপস্থিত হই; নানা রকম যন্ত্রকৌশল শিখবার জন্য বিশ্বকর্মার কাছে গিয়ে থাকি। সুতরাং ধর্মকে বাদ দিয়ে আমাদের জীবন কখনো চলেনি। ধর্মকে নিয়ে ভারত অবনত হয়নি। ধর্মকে নিয়ে সে খুব বড় ছিল। অতীত যুগে বাইরে থেকে শক-হুন দল এসে পড়েছিল ভারতের উপরে। তারা এসেছিল কিসের জন্য ? ধর্ম শিক্ষা করতে নয়, এসেছিল ধন দৌলত নিয়ে যাওয়ার জন্য। ধার্মিক ভারতের ধন-দৌলতের অভাব ছিল না। ভারত ধনী ছিল—ধার্মিকও ছিল। এটা সম্ভব আমরা তাই ভেবেছি, আমাদের যত কিছু প্রতিষ্ঠান হবে, তার মূলে থাকবে ধর্ম।

আমরা দেখলুম যে, ধর্মকে অবলম্বন ক'রে জীবনের বিস্তারে কোন রকম বাধা নেই আর ধর্মকে বাদ দিলে জীবন হবে বিপথে পরিচালিত। আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ? মানব-সমাজ কিসের দ্বারা গড়ে উঠেছে বা কিসের দ্বারা পরিচালিত হয় ? আমি বলি না—

শক্তির দ্বারা। সাধারণতঃ বলা হয় শক্তির দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয়। কিন্তু আপনারা যদি তাকিয়ে দেখেন আশেপাশে, তা হ'লে কী দেখবেন? পরস্পরের প্রতি আপনাদের যে ভালবাসা, প্রতিবেশীসুলভ সহায়-সাহচর্য, তার দ্বারাই সমাজ চালিত হয়। এগুলি যদি আপনারা বাদ দিয়ে দেন, তবে সমাজ দাঁড়ায় কোথায়? সুতরাং দাঁড়িয়েছিল প্রাচীন কালে এই গুরুকুল প্রথা—যে-প্রথায় শিক্ষক ও ছাত্র ভালবাসায় জড়িত হ'য়ে এক জায়গায় থাকবে, যেখানে শিক্ষণ ব'লে কোন জিনিস আনুষ্ঠানিক ভাবে থাকবেই না, অথচ ছেলেরা শিখে নেবে বড়দের দেখে, শিক্ষকদের দেখে আপনা থেকে—ভালবাসার মাধ্যমে, ভালবাসার ভেতর দিয়ে।

এই আদর্শ অবলম্বন ক'রে আমরা আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি—এই সব আশ্রমগুলি গড়ে তুলেছি। যদি বলেন—আপনারা এর দ্বারা কতটুকু সাফল্য লাভ করেছেন, তা হ'লে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখুন, প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ, যাঁরা সুচরিত্র মেধাবী এবং সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁরা কতজন আজকে এখানে সম্মিলিত হ'য়েছেন এবং আরও কত বাইরে রয়েছেন যাঁরা আজ আসতে পারেন নি। সুতরাং আমাদের কার্য-ধারা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। বলবো না জগতের যত কিছু অভাব সব আমরা দূর করতে পেরেছি—সে দাবী আমরা কোন কালে করি না। আমরা বলি আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী দু-চারটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলতে চাই। আর দশ জন সেটা দেখুক। তারা শিখে নিক। তারাও করুক। আমরা তো সব কাজ হাতে নিতে পারি না। যেটুকু আমরা করবো ঠাকুর মা ও স্বামীজীর ভাবে, সেটুকু ভাল ক'রে করতে চেষ্টা করবো। এবং সেই চেষ্টাই আমরা ক'রে চলেছি। আপনাদের দেখে আমার খুবই আনন্দ হয়, এই ভেবে যে আমরা হয়তো খানিকটা সাফল্য লাভ করেছি।"*

প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন: শিক্ষার মূলকথা চরিত্র-গঠন এবং সুগঠিত চরিত্র নিয়ে মানুষের সেবা। উপনিষদ বলেছেন, 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'। এর সঙ্গে স্বামীজী সংযোজন করলেন, 'দরিদ্র-দেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। বিদ্যার্থী আশ্রমের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমানে যাঁরা সেবা ক'রে চলেছেন, তাঁরা সমাজের একটি মহৎ কাজ করছেন—ছাত্রসমাজের মধ্যে আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টি। সেই আদর্শ-চরিত্র মানুষেরা দেশ ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেবায় নিয়োজিত আছেন। জীবনসায়াহ্নে এই কথাটুকু বলতে আমি এখানে এসেছি।

এই সভায় মনীষিবৃন্দের শুভেচ্ছা পঠিত হয়। শুভেচ্ছা-বাণীতে বিদ্যার্থী আশ্রমকে আন্তরিক ভাবে অভিনন্দিত করেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ, প্রধান কর্মসচিব, ভারতের রাষ্ট্রপতি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ্ জাষ্টিস্, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ, কলিকাতা মহানগরীর পৌরিক পার্লামেণ্টের ভূতপূর্ব মেম্বার শ্রীযুত মৃগাঙ্কমোহন সুর।

এই সভায় 'কথামৃত'-এর সংস্কৃত অনুবাদ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতম্" প্রথম খণ্ডের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘোষণা করা হয়। হীরক-জয়ন্তী উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়।

হীরক-জয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থী আশ্রমের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের চতুর্দশ মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজী তাঁহার ভাষণে বিদ্যার্থী আশ্রমের আদর্শের কথা অতি সুললিত ভাষায় বর্ণনা করেন এবং সমাগত প্রাক্তন বিদ্যার্থীদের সাদর অভ্যর্থনা

*শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

জানান। তিনদিনব্যাপী মিলনোৎসবে ১৯১৬ সালের প্রাক্তন বিদ্যার্থী কাশীশ্বরানন্দজী ও শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সাহাকে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রাক্তনদের মধ্যে ছিলেন যেমন ত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দ, তেমনি সমাজের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক অধ্যাপক সরকারের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী এবং সমাজসেবী। মিলনোৎসবের মূল সভাপতি আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজীর লিখিত ভাষণের প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি: "আজ ২৪শে ডিসেম্বর। বিদ্যার্থী আশ্রমের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলা-সহচর, তাঁর মানসপুত্র পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর পুণ্যপাদস্পর্শে এই আশ্রম ধন্য হয়েছিল। তিনি এখান থেকে ফিরে গিয়ে বলেছিলেন, 'ঋষির আশ্রম, ঋষি-বালকেরা ধ্যান করছে।' "

বর্তমান বিদ্যার্থীদের অতি সুন্দর নাট্যানুষ্ঠান, সঙ্গীত-পরিবেশন, ক্রীড়ানুষ্ঠান ও নরনারায়ণ-সেবা উৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। শেষদিন ২৬।১২।৭৬ তারিখে প্রায় চার হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

হীরক-জয়ন্তী ও মিলনোৎসব সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব হইল ২৫ লক্ষ টাকার একটি হীরক-জয়ন্তী তহবিল গঠন করা। ১৯৭৭ সালের মধ্যে যাহাতে অন্ততঃ ৬ লক্ষ টাকা উক্ত তহবিলে সংগৃহীত হয়, সেজন্য একটি উপসমিতি গঠিত হয়।

কার্যবিবরণী

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭৫-৭৬ সালের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১০৩টি শয্যাযুক্ত এই হাসপাতালটির অন্তর্বিভাগে মোট ৫,৩২০ জন রোগী চিকিৎসিত হন। প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত শয্যারও ব্যবস্থা করা হয়, ফলে গড়ে দৈনিক ১০৪টি শয্যায় রোগী ছিলেন। মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৪,০১২।

বহির্বিভাগে মোট ৩,১০,৩৫৮ জন রোগী চিকিৎসিত হন, তন্মধ্যে ৫৫,৫৪০ জন নূতন। গড়পড়তা দৈনিক রোগীর সংখ্যা ছিল ৮৪৮। মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৭৩৯।

রক্তমলমূত্রাদি পরীক্ষার সংখ্যা ২৯,৪৭৭; ৪,৭০৩টি এক্সরে ফটো তোলা হয়। ফিজিও-থেরাপি বিভাগে ইনফ্রা-রেড রশ্মি ইত্যাদি দেওয়ার সংখ্যা ৫৮৩।

নন্দবাবা চক্ষু বিভাগের অন্তর্বিভাগে ৮০৩ ও বহির্বিভাগে ৯,১৯৪ জন রোগী চিকিৎসিত হন এবং উভয় বিভাগে মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১,১৭৪।

শেঠ মানেকলাল চিনাই ক্যান্সার বিভাগের অন্তর্বিভাগে ৭৮ ও বহির্বিভাগে ৮৭ জন রোগী চিকিৎসিত হন।

হোমিওপ্যাথি বিভাগে মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২৪,৮০০, তন্মধ্যে নূতনের সংখ্যা ৪,৮৭১।

কোশিকালনে প্রতি পক্ষকালে আয়োজিত চক্ষুচিকিৎসাকেন্দ্রে গড়ে দৈনিক চক্ষুরোগীর সংখ্যা ছিল ২৫। ফেব্রুআরি, ৭৬-এ উক্ত স্থানে পরিচালিত চক্ষুশিবিরে বহু চক্ষুরোগীর শল্যচিকিৎসা করা হয়।

চিকিৎসা ব্যতীত ৭ জন দুঃস্থকে অর্থসাহায্য, ৩৭১ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তকাদি দান, স্থানীয় স্কুল-কলেজের ৪ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কারদান, ২৯৬ জন দরিদ্র লোকের মধ্যে ধুতি ও কম্বল বিতরণ, দরিদ্র রোগীদের নৈতিক শিক্ষাদান এবং এইজাতীয় অন্যান্য ত্রাণ-ও

কল্যাণমূলক সেবাকার্যে মোট ৬,৫২১ টাকা ব্যয় করা হয়।

বৃন্দাবনের মত তীর্থক্ষেত্রে এই বৃহৎ সেবাকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন। ৩১.৩.৭৬ তারিখে সেবাশ্রমের সঞ্চিত ঋণ ছিল ১,৫৮,২৭০ টাকা। উক্ত ঋণ পরিশোধ ও আশু প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক অন্যান্য কার্যের জন্য কর্তৃপক্ষ সহৃদয় জনসাধারণের নিকট মোট ৮,০১,৬৭০ টাকা সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

যুব শিক্ষণশিবির

বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির হোস্টেলে গত ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডলের দশম বার্ষিক সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় যুব শিক্ষণশিবির পরিচালিত হয়। ২৫শে ডিসেম্বর শিবিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী। উদ্বোধনী বক্তৃতায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে সমাগত চারি শতাধিক যুব সদস্যদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন:

"যদি আমরা ইতিহাসের পাতা সামান্য উলটিয়ে দেখি, তা হ'লে দেখবো এবং তোমরাও হয়তো শুনে থাকবে যে, ইংরেজরা যখন তাদের মতলবমতো এদেশকে ভেঙেচুরে গড়তে চেয়েছিল, তখন—সেই 'স্বদেশী যুগে'—এদেশের যুবকরা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল—স্বামীজীর বাণী নিয়ে। ইংরেজদের পুলিশের রিপোর্টে লেখা হয়েছিল—'আমরা যখন বিদ্রোহীদের ধরছি, তখন তাদের হাতে পাচ্ছি গীতা আর স্বামী বিবেকানন্দের বই।' এসব ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল এবং তার পরেরও কথা। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, 'আমরা যখন যুবক ছিলাম, তখন যুবসম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।' আমরা হয়তো জহরলালজীর চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। আমরাও জানি স্বামীজীর বাণী কত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল এবং কেমনভাবে তা সকলের জীবনে সাড়া এনে দিয়েছিল।

স্বামীজীর নাম কেউ করুক বা না করুক, স্বামীজীর বাণী প্রচারিত হচ্ছে অজ্ঞাতসারে অতি দূর দূরান্ত পর্যন্ত। হয়তো বছর চার পাঁচ আগেকার কথা হবে। রাশিয়া থেকে একটি সাংস্কৃতিক দল এসেছিল। তাঁদের বেলুড় মঠ দেখিয়ে আমি বললাম, 'আপনারা সব দেখলেন, স্বামীজীর ঘর দেখবেন কি?' তাঁদের ভিতর তাসখন্দের এক মুসলমান ভদ্রলোক বললেন, 'স্বামী বিবেকানন্দের?—নিশ্চয় দেখবো।' গেলেন তিনি সেখানে অত্যন্ত ভক্তিভরে। দেখলেন স্বামীজীর ঘরটি।

স্বামী বিবেকানন্দ যেদিন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন শিকাগো ধর্মমহাসভাতে, সেদিন সমস্ত জগৎ জেনেছিল যে, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি, শক্তি বিদ্যা বুদ্ধি শুধু পাশ্চাত্যের একচেটিয়া জিনিস নয়, তা আছে অন্যান্য দেশেও প্রচুর এবং এক দেশ অপর দেশ থেকে কিছু-না-কিছু শিখতে পারে। স্বামীজী সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন, শুধু ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে নয়, অবহেলিত পদদলিত সমস্ত সমাজের প্রতিনিধিরূপে। তার পর থেকে সর্বত্র জাগরণ আরম্ভ হয়েছে, ভারত স্বাধীন হয়েছে এবং অন্যান্য

দেশেও স্বাধীনতা ক্রমে ক্রমে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বিবেকানন্দের বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েছে, তখনি শক্তি দিয়েছে। সেই শক্তির পথ...কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেছে।...যুবকদের মধ্যে যে সব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই, তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।' বাস্তবিক স্বামীজী ডেকেছিলেন মানুষের আত্মাকে। মানুষের আত্মার প্রতি সম্মান দিয়ে মানুষকে তিনি সম্মান দিয়েছেন, তাকে বড় করেছেন। সমস্ত পৃথিবী সে বার্তা শুনেছিল, বুঝেছিল, মুখে প্রকাশ করুক বা না করুক। আজও স্বামীজীর সেই উদ্দীপনাময়ী বাণী সর্বত্র প্রসারিত হচ্ছে, সকলে গ্রহণ করছে—জেনে হোক বা না জেনে হোক।

ভারতের জন্য স্বামীজীর প্রাণ কেঁদেছিল। সারা ভারত ঘুরে ধর্মপ্রাণ এই দেশের মানুষের দুরবস্থা দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদেছিল। কিন্তু শুধু ভারতেরই জন্য তিনি কাঁদেন নি, কেঁদেছেন তিনি বিশ্বমানবের জন্য। তিনি বলেছিলেন—তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীর মর্মার্থ বলছি—এমন একদিন আসবে যখন মানবসন্তান ভগবদ্‌ভাবে উদ্বোধিত হয়েই জন্মগ্রহণ করবে এবং সারা জীবন ধর্মভাবেই যাপন করবে।

ধর্ম যেহেতু মানুষকে বল দেয়, এগিয়ে যাবার পথ দেখায়, সকলকে একসূত্রে আবদ্ধ করে—

'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'

—যেখানে সমগ্র বিশ্ব যেন একটি পাখির বাসায় মিলিত হয়, সেহেতু তিনি ধর্মের বার্তা প্রচার করেছিলেন সকলের সামনে—সর্বত্র। সেই ধর্মের মূল কথা হ'ল আত্মাকে জাগানো। যদি মানুষের সুপ্ত আত্মাকে জাগানো যায়, তাহলে তার অন্য সব অভাব সহজেই দূর হতে পারে। তিনি মানুষ করতে চেয়েছিলেন সকলকে। তাই প্রার্থনা করতে বলেছিলেন, 'মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো।'

ভারতের জন্য স্বামীজী কী করলেন? ১৮৯৭ সালের কথা বলছি। স্বামীজী ফিরে এসেছেন ভারতবর্ষে প্রথমবারে, ট্রেনে যাচ্ছেন মাদ্রাজের দিকে, একজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হচ্ছে। স্বামীজী বললেন, ভারতের জনসাধারণ ভয়ানক গরীব। তারা বড় ভাল, কিন্তু লৌকিক বিদ্যায় অজ্ঞ।...তাদের উন্নতির জন্য লৌকিক বিদ্যা শেখাতে হবে।

এই গণজাগরণের কথা আগেও তিনি বলেছেন। আজ যে-সব কথা খুব বেশী শোনা যাচ্ছে, তা তিনি যে-যুগে বলেছেন, সে-যুগে খুব কম লোকের মুখেই শোনা গেছে। আমি একদিন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনেছিলাম—অনেক দিন আগের কথা—তিনি বলেছিলেন, তখনকার দিনের রাজনৈতিকগণ কী চেয়েছিলেন? না, কাগজের একখানি নৌকা তৈরী ক'রে তাতে তাঁরা পাড়ি দেবেন সমুদ্রে! অর্থাৎ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন ক'রে তাঁরা মনে করেছিলেন দেশে আনবেন স্বাধীনতা।

সেই দিনে স্বামীজী বলেছিলেন শিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের উন্নতির কথা—নারীজাতির উন্নতির কথা। প্রকৃত স্বাধীনতার পথ তিনিই দেখিয়েছিলেন।

ধর্ম আমাদের ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাতি নিয়ে—কে বড় কে ছোট—এই নিয়ে, স্মৃতিশাস্ত্র আউড়ে 'তোমায় এই করতে হবে, সেই করতে হবে, নইলে জাত যাবে', ইত্যাদি কথা নিয়ে কালাতিপাত করছিলুম। ফলে—স্বামীজী যা বলতেন—ধর্ম ঢুকে গিয়েছিল হেঁসেলে। আর আমাদের দেবতা তখন বন্ধ

ছিলেন মন্দিরের ভেতরে। মন্দিরে না গেলে পূজো হোত না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'চোখ বুজলেই তিনি আছেন আর চোখ চাইলেই নেই!' ভগবান সর্বব্যাপী—সর্বত্র ও সর্বভূতে তিনি আছেন। সুতরাং সর্বত্র ও সর্বভূতে আমি তাঁর উপাসনা করতে পারি। 'প্রতিমায় পূজা হয় আর জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না?'—প্রশ্ন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। উত্তর আমরা পাই তাঁর জীবনে।

স্বামীজী সেই বার্তা গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুরের কাছ থেকে। আহ্বান করেছিলেন সকলকে নররূপী নারায়ণের সেবায় পূজায়। অন্ন দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে, ঔষধপথ্যাদি দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে মানুষের অভাব দূর করতে বলেছিলেন পূজাবুদ্ধিতে। এই হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথ। সেবার ভেতর দিয়ে, ভালবাসার ভেতর দিয়ে, পূজার ভেতর দিয়ে, আত্মোৎসর্গের ভেতর দিয়ে নতুন ভারতকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আর ভারত যদি বড় হয়, তখন—তোমরা দেখতে পাবে—জগৎ ভারতের কথা শুনবে। এখনি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দু দিন আগে পর্যন্ত ভারতকে যারা 'দূর ছাই' করতো, তারাই বলছে,—হ্যাঁ, ভারত একটা দেশের মতো দেশ বটে, ভারত অনেক উন্নতি করেছে এবং আরও উন্নতি করবে। তাই আগে আমরা নিজেরা যদি বড় হ'তে পারি—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ', উপনিষদের এই বাণী অনুসরণ ক'রে নিজেরা শক্তিমান হ'তে পারি, তাহলে ভারতের উন্নতি হবে, জগতেরও কল্যাণ হবে।"*

স্বামী গম্ভীরানন্দজীর ভাষণের পর স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ও প্রধান অতিথি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য ভাষণ দেন। অন্যান্য দিনে ভাষণ দেন স্বামী আত্মস্থানন্দ স্বামী তদ্রূপানন্দ স্বামী মুখ্যানন্দ ও ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। সমাপ্তি-দিবসে বিদায় সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী। স্বামী বন্দনানন্দও বক্তৃতা দেন।

উৎসব

ঘোকসাডাঙা (কুচবিহার) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বিগত ২৬শে হইতে ২৮শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ২৬শে মঙ্গলারতি বিশেষ পূজা গীতাপাঠ, ২৭শে শ্রীঅহীন্দ্রনারায়ণ সাহা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-কীর্তন এবং ২৮শে প্রায় দুই সহস্র ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচনা-চক্র কর্তৃক বিগত ৮ই ও ৯ই মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ৮ই প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া একটি শোভাযাত্রা বাহির হয়। বৈকালে ধর্মসভায় স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ স্বামী বিকাশানন্দ ও সভাপতি শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরে কৃষ্ণনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ-রাগরঙ্গম্ কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যলীলা গীত হয়। ৯ই শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও লীলাকীর্তন হয়। বৈকালে ধর্মসভায় স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ স্বামী বিকাশানন্দ ও সভাপতি ডঃ অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সারদা-দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভান্তে ব্রহ্মচারী শক্তিচৈতন্যের গ্রন্থনায় এবং শ্রীদামোদর ভট্টাচার্যের সুর-সংযোজনায় শ্রীশ্রীমায়ের বাল্যলীলা শ্রীরামকৃষ্ণ-রাগরঙ্গম্ কর্তৃক পরিবেশিত হয়।

* শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সং

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন

[১ম বর্ষ।] ১৫ই অগ্রহায়ণ। (১৩০৬ সাল) [২২শ সংখ্যা।]

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

আরাব।

মরুভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হলেও, সে গরম দুর্ব্বল করে না। তাতে, কাপড়ে গা মাথা ঢেকে রাখলেই, আর গোল নেই। শুষ্ক গরমি দুর্ব্বল ত করে না, বরং বিশেষ বলকারক। রাজপুতানার, আরবের, আফ্রিকার লোকগুলি এর নিদর্শন। মারোয়ারের এক এক জেলায় মানুষ গরু ঘোঁড়া সবই সবল ও আকারে বৃহৎ। আরাবী মানুষ ও সিদিদের দেখলে আনন্দ হয়। যেখানে জলো গরমি, যেমন বাঙ্গালা দেশ, সেখানে শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, আর সব দুর্ব্বল।

রেডসির গরম।

রেডসির নামে যাত্রীদের হৃৎকম্প হয়। ভয়ানক গরম। তায়, এই গরমী কাল। ডেকে বসে যে যেমন পারছে একটা ভীষণ দুর্ঘটনার গল্প শোনাচ্ছে। কাপ্তেন, সকলের চেয়ে চেঁচিয়ে বলেন। তিনি বলেন দিনকতক আগে এক খানা চীনী যুদ্ধজাহাজ এই রেডসি দিয়ে যাচ্ছিল। তার কাপ্তেন ও আটজন কয়লাওয়ালা খালাসি গরমে মরে গেছে।

বাস্তবিক কয়লাওয়ালা একে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তায় রেডসির নিদারুণ গরম। কখন কখন খেপে উপরে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে, আর ডুবে মরে ; কখনও বা গরমে নীচেই মারা যায়।

এই সকল গল্প শুনে হৃৎকম্প হবার ত যোগাড়। কিন্তু অদৃষ্ট ভাল, আমরা বিশেষ গরম কিছুই পেলুম না। হাওয়া দক্ষিণী না হয়ে উত্তর থেকে আসতে লাগলো—সে ভূমধ্যসাগরের হাওয়া।

সুয়েজ বন্দর।

১৪ই জুলাই রেডসি পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছুল। সামনে—সুয়েজ খাল। জাহাজে, সুয়েজে নাবাবার মাল আছে। তার উপর এসেছেন মিসরে প্লেগ, আর আমরা আনছি প্লেগ—সম্ভবতঃ। কাযেই দো তরফা ছোঁয়া ছুঁয়ির ভয়। এ ছুঁৎ ছাঁতের ন্যাটার কাছে, আমাদের দিশী ছুঁৎ ছাঁত কোথায় লাগে। মাল নাব্‌বে, কিন্তু সুয়েজের কুলি জাহাজ

* পৌষ, ১৩৮৩ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

ছুঁতে পারবে না। জাহাজে খালাসি বেচারাদের আপদ আর কি! তারাই কুলি হয়ে, ক্রেনে করে মাল তুলে, আলটপকা নীচে সুয়েজী নৌকায় ফেল্‌চে,—তারা নিয়ে ডাঙ্গায় যাচ্ছে। কোম্পানির এজেণ্ট, ছোট লাঞ্চ করে, জাহাজের কাছে এসেছেন, ওঠবার হুকুম নাই। কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজে নৌকায় কথা হচ্চে। এ ত ভারতবর্ষ নয় যে, গোরা আদমি প্লেগ আইন ফাইন সকলের পার। এখানে ইউরোপের আরম্ভ। ইঁদুর-বাহন প্লেগ পাছে ওঠে, তাই এত আয়োজন। প্লেগ-বিষ, প্রবেশ থেকে দশ দিনের মধ্যে, ফুটে বেরোন; তাই দশ দিনের আটক। আমাদের কিন্তু দশ দিন হয়ে গেছে। ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু মিসরী আদমিকে ছুঁলেই, আবার দশ দিন আটক। তা হলে আর নেপল্‌সেও লোক নাবান হবে না, মার্সাইতেও নয়। কাযেই যা কিছু কায হচ্ছে, সব আল্‌গোছে। কাযেই ধীরে ধীরে মাল নাবাতে সারাদিন লাগবে। রাত্রিতে জাহাজ অনায়াসেই খাল পার হতে পারে, যদি সামনে বিজলী আলো পায়। কিন্তু সে আলো পরাতে গেলে, সুয়েজের লোককে জাহাজ ছুঁতে হবে,—বস্ দশ দিন কারাণ্টীন্। কাযেই রাতেও যাওয়া হবে না। চব্বিশ ঘণ্টা এই খানে পড়ে থাক, সুয়েজ বন্দরে। এটী বড় সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিন দিকে বালির ঢিপি, আর পাহাড়। জলও খুব গভীর। জলে অসংখ্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই বন্দরে, আর অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নি বন্দরে, যত হাঙ্গর, এমন আর দুনিয়ার কোথাও নাই। বাগে পেলেই মানুষকে খেয়েছে। জলে নাবে কে? সাপ আর হাঙ্গরের উপর মানুষের জাতক্রোধ; মানুষও বাগে পেলে ওঁদের ছাড়বে না।

হাঙ্গর ও বনিটো।

সকাল বেলা খাবার দাবার আগেই শোনা গেল, যে জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। জল-জেন্ত হাঙ্গর পূর্ব্বে কখন আর দেখা যায় নি। গতবারে, আস্‌বার সময়ে, সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তাও আবার সহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই, আ-রা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেণ্ড কলাসটী জাহাজের পাছার উপর। সেই ছাদ হতে, বারান্দা ধরে, কাতারে কাতারে স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে, ঝুঁকে, হাঙ্গর দেখ্‌ছে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর মিঞারা একটু সরে গেছেন; মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হলো। কিন্তু দেখি যে, জলে গাঙ্‌ধাড়ার মত এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসছে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ, জলে থিক্ থিক্ করছে। মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিস মাছের চেহারা, তীরের মত এদিক ওদিক করে দৌড়ুচ্ছে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙ্গরের বাচ্ছা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম তা নয়। ওঁর নাম বনিটো। পূর্ব্বে ওঁর বিষয় পড়া গেছলো বটে; এবং মালদ্বীপ হতে, উঁনি শুঁটকি রূপে, আমদানি হন, হুড়ি চড়ে,- তাও পড়া ছিল। ওঁর মাংস লাল ও বড় সুস্বাদ—তাও শোনা আছে। এখন ওঁর তেজ আর বেগ দেখে খুসী হওয়া গেল। অত বড় মাছটা, তীরের মত জলের ভিতর ছুটছে, আর সে সমুদ্রের কাচের মত জল, তার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা টাক, এই প্রকার বনিটোর ছুটোছুটি, আর ছোট মাছের কিলিবিলি, ত দেখা যাচ্ছে। আধ ঘণ্টা, তিন কোয়াটার, ক্রমে তিতি বিরক্ত হয়ে আস্‌ছি, এমন সময় একজন বল্লে ঐ ঐ। দশ বার জনে বলে উঠ্‌লো, ঐ আস্‌ছে

ঐ আস্‌ছে। চেয়ে দেখি, দূরে একটা প্রকাণ্ড কাল বস্তু ভেসে আস্‌ছে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নীচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আস্‌তে লাগলো। প্রকাণ্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিলে; সে গদাই-লস্করি চাল; বনিটোর সোঁ সোঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হলো। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আস্‌ছে। আর আগে আগে দু একটা ছোট মাছ। আর কতকগুলো ছোট মাছ তার পিঠে, গায়ে, পেটে, খেলে বেড়াচ্ছে। কোন কোনটা বা জেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বস্‌ছে। ইনিই সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙ্গর। যে মাছগুলি হাঙ্গরের আগে আগে যাচ্ছে, তাদের নাম "আড়কাঠি মাছ"—"পাইলট ফিস্"। তারা হাঙ্গরকে শিকার দেখিয়ে দেয়, আর বোধ হয়—প্রসাদটা আসটা পায়। কিন্তু হাঙ্গরের সে মুখ-ব্যাদান দেখলে, তারা যে বেশী সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশে পাশে ঘুরছে, পিঠে চড়ে বস্‌ছে, তারা হাঙ্গর-"চোষক"। তাদের বুকের কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা, ও দুই ইঞ্চি চওড়া, চেপটা গোলপানা একটী স্থান আছে। তার মাঝে, যেমন ইংরাজী অনেক রবারের জুতোর তলায় লম্বা লম্বা জুলি কাটা কিরকিরে থাকে, তেমনি জুলি কাটা কাটা। সেই জায়গাটা ঐ মাছ, হাঙ্গরের গায়ে দিয়ে চিপ্‌সে ধরে; তাই হাঙ্গরের গায়ে, পিঠে, চড়ে চলচে দেখায়। এরা নাকি হাঙ্গরের গায়ের পোকা মাকড় খেয়ে বাঁচে। এই দুই প্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হয়ে, হাঙ্গর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায় পারিষদ জ্ঞানে, কিছু বলেনও না। এই মাছ একটা ছোট হাত-সুতোয় ধরা পড়লো। তার বুকে জুতোর তলা একটু চেপে দিয়ে পা তুলতেই, সেটা পায়ের সঙ্গে চিপ্‌সে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। ঐ রকম করে সে হাঙ্গরের গায়ে লেগে যায়।

[ক্রমশঃ।]

রামানুজ চরিত।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।)

[১ম ভাগ, ৮ম ও ৯ম অধ্যায়ের কিয়দংশ—বর্তমান সঃ]

বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

আজকাল কোন তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইলে যে পক্ষ খুব জোরের সহিত কোন বিষয় উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি অমনি বলিয়া উঠেন, আমি অমুক বিষয়টী Scientifically prove করিব। এমন কি, ধর্ম্ম বুঝাইতে গেলেও আজকাল বিজ্ঞানের একটু দোহাই না দিলে শ্রোতৃমণ্ডলী বড় আকৃষ্ট হন না। এইরূপে দেখা যায়, আজকাল Science বা বিজ্ঞান শব্দের সহিত 'অকাট্য সত্য' এই ভাবটী যেন কেমন এক অচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে। কি শিক্ষিত, কি অর্দ্ধশিক্ষিত, সর্ব্বপ্রকার লোকের কাছেই এই Science-এর প্রতি কেমন একটা শ্রদ্ধার ভাব,

কেমন একটা ভক্তির ভাব যেন আপনা হইতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতভাবে প্রবেশ করিয়াছে। এক শ্রেণীর লোকের নিকট এই বিজ্ঞানে শ্রদ্ধা—ধর্ম, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি অলৌকিক অস্তিত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস, আবার আর এক শ্রেণীর লোকের মনে ইহার ঠিক বিপরীত ভাব জন্মাইয়া দিয়াছে। উভয় দলই বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া থাকেন; উভয় দলই আপনাপন মত-প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের সহায়তা লইবার, অন্ততঃ, ভানও করেন; অথচ এইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হন। উপস্থিত প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়—বিজ্ঞানের কতদূর দাবী,—বিজ্ঞানের কতদূর সীমা; আর এই বৈজ্ঞানিকতা, অথবা স্পষ্ট ভাষায় বলিতে গেলে—এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী কি ও সত্যানুসন্ধানে আমাদের কতদূর সহায়।

কাল, বিজ্ঞান—রেলওয়ে টেলিগ্রাফ সম্ভব করিল; আজ রণ্টজেন রে আবিষ্কার করিয়া জগৎকে চমকিত, বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছে। বিনা তারে টেলিগ্রাম চলিতেছে। আবার সম্প্রতি, তারে এক স্থান হইতে অপর স্থানে চিত্রপ্রেরণ—কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। সভ্যতার মূল-প্রস্রবণ, বিস্ময়ের অদ্ভুত আকর, এই বিজ্ঞানের গর্ভে—আরো কি লুক্কায়িত আছে, কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে, কাল বিস্মিত মানবমণ্ডলীর সমক্ষে বিজ্ঞান কি অদ্ভুত রত্ন-রাজি—না উপস্থিত করিবে?

বিজ্ঞানের কার্য্য কি? বিজ্ঞানের যন্ত্র কি? বিজ্ঞান দৃশ্য জগতের ব্যাপারপরম্পরাকে লইয়া, তাহার উপর তীব্র সাবধান অথচ ধীর পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা প্রয়োগে, আপাতপরিদৃশ্যমান বিভিন্নতার ভিতরে একীভাব দেখিতে চায়—আপাতবিষমের ভিতর সমতা স্থাপন করিতে চায়; বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে উহা পদার্থের সামান্য ও বিশেষ লক্ষণ দেখিয়া পদার্থকে শ্রেণী-বদ্ধ করিতে চায়। এইরূপ ভাবে বস্তু লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে, ইহা অনেক বিষয় দেখিতে পায়—যাহা অশিক্ষিত মনের সম্মুখে পড়ে নাই, অথবা পড়িলেও উপযুক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। ইহাকেই আবিষ্কার বলে। অশিক্ষিত মন যাহা তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করে, বিজ্ঞান তাহাকে তুচ্ছ না ভাবিয়া তাহারই মধ্য হইতে অসাধারণ ব্যাপার আবিষ্কার করে। নিউটন আপেলের পতন দেখিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার পূর্বে ও পরে উহা দেখিয়াছিল, কিন্তু কাহারো মনে এই মহা সার্ব্বভৌমিক সত্য প্রতিভাত হয় নাই। এই সত্য যাই তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হইল, নানা বিষয়ে পরীক্ষিত হইল, উহার বিভিন্ন নিয়ম আবিষ্কৃত হইল,—তখনি নানা বিষয়ে ঐ নিয়মের সহায়তা লইয়া অনেক কার্য হইতে লাগিল; মানুষের পক্ষে অনেক নূতন নূতন বিষয় সম্ভব হইল।

প্রকৃতিকে জয় করা মানুষের মনুষ্যত্ব। মানুষ জগতে প্রথমে প্রবেশকালে নগ্নবেশে আসিয়াছিল। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়া বস্ত্রবয়ন করিয়াছে, বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এক কথায়, যাহাতে আপনার ও অপরের অভাব পূরণ হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিয়াছে। বিজ্ঞান-চর্চা না করিয়াও মানুষ এ বিষয়ে কতক কৃতকার্য হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞানসহায়জাতি এ বিষয়ে বিশেষরূপে, নিশ্চয়তররূপে ও অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছে। এ বিষয়ের প্রমাণ আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকা। এ, অবশ্য, বাহ্য প্রকৃতির জয়—আভ্যন্তর প্রকৃতি-জয়ের কথা-প্রসঙ্গ নহে।

বিজ্ঞান নিজের অন্বেষ্টব্য বিষয়গুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া এত সতর্কতা সততা ও ধীরতার সহিত অগ্রসর হইয়াছে যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তগুলি যদিও সকলের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তথাপি বৈজ্ঞানিক প্রণালী এরূপ সুখ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে, এক্ষণে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রণালীর আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি, এখন একরূপ নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে,—যে কোন সত্য, মত বা প্রণালী যে পরিমাণে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করিবে, উহা সেই পরিমাণে সহৃদয় শিক্ষিত-মণ্ডলীর গ্রাহ্য হইবে।

এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী কি প্রকার, বুঝিবার জন্য দুই একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিব, তাহাতে পাঠক উহার সাধারণ লক্ষণের আভাস পাইবেন।

কোন গ্রামে কতকগুলি বালক, যেমন পাড়াগেঁয়ে দুর্দ্দান্ত বালকদের হইয়া থাকে, রাত্রে খেৎ হইতে আক চুরী করিত। তাহারা এইরূপ আক চুরী করিয়া কেবল যে নিজেরা খাইত, তাহা নহে। তাহারা আজ কয়েক বাড়ীতে কাল কয়েক বাড়ীতে, কয়েক গাছা করিয়া ফেলিয়া দিত। প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ উহার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া উহা সিদ্ধান্ত করিত। বালকগণ অবশ্য জানিত, কোন্ ভূতে এ কার্য্য করিতেছে। একদিন উহারা আবার, আর এক ভূতের হাতে পড়িতে পড়িতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছিল। একদিন তাহারা এইরূপ আক চুরী করিয়া বাড়ি ফিরিতেছে, দেখে অন্ধকারে কে একজন বাঁশের উপর বসিয়া দোল খাইতেছে ও খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। দেখিয়াই তো সকলের বুক শুকাইয়া গেল। সকলে কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল; সকলে একরূপ স্থিরই করিল —এ ভূত ;— আর কিছু নয়। ইহার মধ্যে জন দুই—সকলের অপেক্ষা একটু বেশী ডানপিটে ;— সহজে ভূত বলিতে স্বীকার পাইল না। ভূত সম্বন্ধে কথা উঠিলে সচরাচর, একদল বিশ্বাসী, আর একদল অবিশ্বাসী হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও ঐ দুইজন অবিশ্বাসী হইয়া ক্রমশঃ সেই ভূতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশ্য তাহাদের হাতে লাঠি ছিল; একবার এগোয়, একবার পেছোয়; এইরূপ খানিক ক্ষণের পর তাহারা ভূতের প্রায় নিকটবর্ত্তী হইল। অবশ্য, ইহাদের সঙ্গীরাও ক্রমশঃ ইহাদের সাহস দেখিয়া ইহাদের পশ্চাদ্গমন করিয়াছিল। খানিক চলিতেছে, জিজ্ঞাসিতেছে—কে ও? কোন উত্তর নাই। পুনর্ব্বার আহ্বান; পুনঃ নিরুত্তর। এইরূপ অনেকবার ;—ক্রমশঃ ভূত-বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। ভূত ডাকিলে কথা কয় না আপন মনে দুলিতেছে, খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। ভূত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ভূত সম্বন্ধে যত প্রকার বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা আছে, তাহার সকলগুলির সহিত মিলিতেছে। তবে ভূত নয় তো আর কি? এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই নিবৃত্ত হইলে ভূত সম্বন্ধে আর কোন সংশয়ই থাকিত না। কিন্তু তাহারা আর এক পদ অগ্রসর হইল। তাহারা খুব নিকট গিয়া লাঠি লইয়া বলিল, বল্ কে তুই? নয় ত এই মারিলাম। এই বলিয়া লাঠি উদ্যত করিলেই মৃদুভাবে উত্তর আসিল "কে ও দা"। তখন বিস্মিত দা বলিল, কেও দাদা য; এখানে এত রাত্রে কেন? য একজন ভদ্রলোকের ছেলে; কোন কারণে পাগল হইয়া গিয়াছে। ভূত উড়িয়া গেল।

দুই ব্যক্তির ভিতর ঘোর তর্ক উপস্থিত। একজন বলিতেছে, বৃহস্পতিবারে বার বেলায়

বাটীর বার হইলে অনিষ্ট হয়। অপরে বলিতেছে, ইহার প্রমাণ কি? প্রথম ব্যক্তি বলিতেছে, আমি অমুক দিন বাহির হইয়াছিলাম, আমার অনিষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিতেছে, স্বীকার করিলাম তোমার অনিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চাও যে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারের বার বেলা বাহির হইলেই অনিষ্ট হইবে? অবশ্য আমি তোমার সিদ্ধান্ত মিথ্যা বলিতে পারি না, কিন্তু তুমি যে প্রণালীতে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছ, তাহার উপর আমার একটা আপত্তি আছে। যদি তুমি দেখাইতে পার, যতবার তুমি ঐ সময় বাহির হইয়াছ, ততবারই তোমার অনিষ্ট হইয়াছে; শুধু তাহাই নহে, জগতে অনেক লোকের সম্বন্ধে ঐ পরীক্ষা করিয়া তাহার ঐরূপ ফল তুমি যদি স্থাপন করিতে পার, তাহার পর যদি তুমি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই ঐরূপ ঘটনার সহিত এই অজ্ঞাত তত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য দেখাইতে পার, তবে তোমার অনুমানের উপর কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিতে পারি; নতুবা যখন এই সকল অনিষ্টের অনেক জ্ঞাত কারণ রহিয়াছে, তখন অজ্ঞাত কারণকল্পনায় প্রয়োজন কি?

আমাদের পুরাণোক্ত ক্ষীর সমুদ্র, দধি সমুদ্র ইত্যাদি, বাসুকি নাগের পৃথিবী ধারণ, রামধনু—'রামচন্দ্রের ধনু' এই বিশ্বাস, ইত্যাদি ইত্যাদি এবং পাশ্চাত্য প্রদেশেরও এতদ্বিধ অনেক বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অভাব হইতে প্রসূত।

আমাদের নিকট ধর্ম্ম-বিশ্বাসের নামে এমন অনেক বিষয় উপস্থিত হয় যে, যাহা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষিত ব্যক্তির হৃদয় স্বভাবতঃই পশ্চাৎপদ হয়।

'বৈজ্ঞানিক প্রণালী' অর্থে সুতরাং, ঘটনাবলীর বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা যে পরিমাণে সম্পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণে উহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী; যে পরিমাণে উহা অসম্পূর্ণ, সেই পরিমাণে উহা অবৈজ্ঞানিক। তবে কি বিজ্ঞান কেবল প্রত্যক্ষেই পর্য্যবসিত? তাহা হইলে বিজ্ঞানের সীমা ত অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকপ্রণালী-সহায় হইয়া অনেক অজ্ঞাত রাজ্যেও ভ্রমণ করা যাইতে পারে। তবে প্রতিপদে জ্ঞাত বিষয়ের সহায়তা লইয়া অগ্রসর হইতে হয়। Hypothesisকে যেন কেবল Hypothesis বলিয়াই মনে থাকে, আর যেন প্রতি পদবিক্ষেপে অতিশয় সাবধানতার সহিত অগ্রসর হওয়া হয়। নতুবা ভ্রমে পড়িবার খুব সম্ভাবনা। এইরূপেই বিজ্ঞান, সূর্য্য তারা প্রভৃতির গতি আবিষ্কার করিয়াছে। এইরূপেই উহা লক্ষ লক্ষ বর্ষের পূর্ব্বের পৃথিবীর বা সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে কথা কহিতে সাহসী হইয়াছে। এক সময়ে বিজ্ঞানকে অতি ভীতভাবে অগ্রসর হইতে হইত। গ্যালিলি যখন আবিষ্কার করিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে; তখন তাঁহাকে এই আবিষ্কার বাইবেলের বিরোধী বলিয়া জেলে যাইতে হইয়াছিল। এক্ষণেও বিজ্ঞানের মহতী আবিষ্ক্রিয়া ক্রমোন্নতিবাদ সম্বন্ধেও সময়ে সময়ে সঙ্কীর্ণমনাগণের নিকট হইতে প্রতিবাদ শুনা যায় বটে; কিন্তু এই প্রতিবাদকেরা অতি অল্পসংখ্যক ও তাহাদের হস্তে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা নাই।

বিজ্ঞানপ্রণালীর অপর পক্ষ দেখিতে গেলে, এইরূপে ক্রমশঃ স্বাধীনতা পাইতে পাইতে বিজ্ঞান যেন আপনার জয়ে আত্মহারা হইয়া আপনার প্রকৃত মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া, আপনার প্রকৃত সীমা ভুলিয়া গিয়া, অনধিকার চর্চ্চা আরম্ভ করিল। আত্মার অস্তিত্ব নাই, ঈশ্বর নাই,

পরলোক নাই, এ যেন বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল। বিজ্ঞান মানিতে হইলেই যেন এগুলিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানিতে হইবে। বিজ্ঞান Laboratoryতে আত্মাকে analyse করিতে পারিল না,—তবে আত্মা নাই ; অথবা আত্মা অর্থে কেবল Brain এর Function !!

একদিকে একেবারে অন্ধবিশ্বাসের লীলাভূমি ; অপরদিকে আত্মবিস্মৃত বিজ্ঞানবাদের ভ্রান্তপ্রলাপ। এ দুইএর মধ্যে প্রকৃত সত্য কোথায়, তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া কেহ এক-দিকে, কেহ বা অপর দিকে চলিয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে এক্ষণে অনেকের অন্তরে উভয়ের প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রকৃত সীমা কত-টুকু ? এক হিসাবে বিজ্ঞানের সীমা—কি বহির্জ্জগৎ, কি অন্তর্জ্জগৎ—সমুদয়। আর এক হিসাবে বিজ্ঞানের সীমা—কেবল জড়জগৎ। যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর এই অর্থ করা হয় কতকগুলি ঘটনাপরম্পরার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ; তবে আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি, যেমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জড়জগৎ অনুসন্ধান করা চলে, তদ্রূপ অন্তর্জ্জগতেরও কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরা আছে, তাহা উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা অনুসন্ধান করিলে তাহার দ্বারাও প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। অন্তর্জ্জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিবার যন্ত্র মন ও উহার একাগ্রতাবিধায়ক যোগ। বিজ্ঞান যখন জড়জগৎ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত বলেন, তখন আমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি, কেননা তাঁহার প্রণালীর উপর আমাদের বিশ্বাস আছে ; আর উহাদিগকে জানিবার যথোপযুক্ত যন্ত্রও তাঁহার আছে। কিন্তু অন্তর্জ্জগতের অনুসন্ধানে—বৈজ্ঞানিক "প্রণালী" প্রযুক্ত হইতে পারে ; কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক "যন্ত্র" নহে। যাঁহারা অন্তর্জ্জগৎ পর্য্যবেক্ষণের যন্ত্রব্যবহারের কৌশল জানেন, ও আমাদিগকে শিখাইতে পারেন, আমরা অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা বিশ্বাসে বাধ্য। যেমন আমাদের পরীক্ষা করিবার শক্তি না থাকিলেও বাল্যকালে আমরা, পৃথিবী গোল, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে,—এইরূপ কঠোর পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণলব্ধ সত্যসকল শিক্ষা পাই ও বিশ্বাস করি, তেমনি বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও উপযুক্ত যন্ত্রসহকারে লব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যসকলও, আমরা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে অক্ষম ব্যক্তিগণকে, অনায়াসে বিশ্বাস করিতে বলিতে পারি।

বৈজ্ঞানিক—বহির্জ্জগতের উপদেষ্টা, যোগী—অন্তর্জ্জগতের উপদেষ্টা। বৈজ্ঞানিক—যোগীর অধিকারে, এবং যোগীও বৈজ্ঞানিকের অধিকারে যেন না গমন করেন। বৈজ্ঞানিক যেন উচ্চহাস্যসহকারে আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি জীবনের গভীর সত্যসমূহকে অযাচিতভাবে উপহাস না করেন, যোগীও যেন অলৌকিক বিষয় বলিতে গিয়া উহাকে লৌকিক নিয়মের বিরোধী বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা না পাইয়া অপর এক অজ্ঞাত ও উচ্চতর নিয়মের দ্বারা লৌকিক নিয়মের তিরোভাব অথবা উচ্চতর প্রকাশরূপে ব্যাখ্যা করেন। ইউরোপ আমেরিকা—বৈজ্ঞানিক ; ভারত—আধ্যাত্মিক। সময়ের যেরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদ, শীঘ্রই আপনাদের বিরোধ ভুলিয়া গিয়া, আপনাদিগকে এক ভ্রাতা বলিয়া বুঝিবে ও আপনাদিগকে বিভিন্ন বিভাগে একই সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত বুঝিয়া পরস্পরের প্রতি অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে।

আসামের কথা।

(বাবু প্রবোধচন্দ্র দে।)

অনেক দিন হইতেই আসামটা দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল; কার্য্যগতিকে এবং কলিকাতায় প্লেগ মহাশয়ের বিভীষিকায় এবার—তাহা হইল। আসামে আসিবার দুইটী পথ আছে,—প্রথম যাত্রাপুর হইয়া; দ্বিতীয় গোয়ালন্দ হইয়া। আমি প্রথমোক্ত পথেই আসিয়াছি। অধিকাংশ লোকই, কেবল চা-বাগানের সংগৃহীত কুলি ব্যতীত, ঐ পথেই আসিয়া থাকে; তাহার কারণ, যাত্রাপুর দিয়া আসিলে প্রায় দুই দিন অগ্রে আসিয়া পৌঁছান যায়। যাত্রাপুর দিয়া আসিতে কিন্তু অনেক কষ্ট আছে,—বারম্বার গাড়ী বদল, নদী পার, ইত্যাদি। গোয়ালন্দ হইয়া আসিলে শিয়ালদহে রেলে চাপুন,—গোয়ালন্দে আসিয়া ষ্টীমারে উঠিয়া যথাস্থানে গমন করুন। কিন্তু, বিলম্বের ভয়ে সকলেই প্রায় সে পথ ছাড়িয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া যাত্রাপুর দিয়া আসিতে বাধ্য হয়েন।

কলিকাতা হইতে প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিং-মেলে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে দামুকদিয়া ঘাটে পৌঁছিলাম। তথায় পদ্মার উপরে ষ্টীমার অপেক্ষা করিতেছিল। মালপত্র ও নিজের শরীরখানা লইয়া গাড়ি ছাড়িয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। রাত্রি তখন প্রায় দশ ঘটিকা,—চন্দ্রমা আপনার রূপরাশি পদ্মার তরঙ্গময়ী তনুতে অবিরাম ধারে ঢালিতেছিলেন। জ্যোৎস্না-লোক ও তরঙ্গ বিমিশ্রিত জলরাশি গলায় গলায় মিলিয়া কি অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। আবার শোভার উপর শোভা, ষ্টীমার যখন ভাসিতে ভাসিতে চলিতে লাগিল এবং পরপার অর্থাৎ সারা বা সাঁড়া-ঘাট নয়নগোচর হইল। সারাঘাট-ষ্টেসনের আলোক-মালা জলে প্রতিফলিত হইয়া কি নয়নানন্দদায়িনী হইয়াছিল! ষ্টীমারে নদী পার হইতে হইতে সাহেবদিগের খানা খাওয়া হইয়া গেল। সে দিন বিশেষ কারণে অপেক্ষাকৃত অনেক সাহেব-যাত্রী ছিলেন; তাঁহারা প্রায় সকলেই দার্জ্জিলিং যাইতেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি সাহেব নিঃশব্দে ভোজন করিয়া লইল দেখিয়া মনে মনে অনেক কথার উদয় হইল। আপনার কি আমার বাটীতে ঐরূপ ৫০ কি ১০০ শত লোককে ভোজ দিতে হইলে একটা সমারোহ পড়িয়া যাইত। 'শ্যামা—পাতা নিয়ে আয়, রাম জল নিয়ে আয়'-এইরূপ একটা মহা কলরব পড়িত, তাহার পর আধ ঘণ্টা পরে হয়ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, চাঙ্গারি কক্ষে করিয়া খানিকটা গল্প করিত, আর 'খাতক'গণ হয় ত 'লুচি লুচি' করিয়া মহা হল্লা উপস্থিত করিত; কোন পরিপোষণকারী পা পিছলাইয়া দাঁত কপাটী যাইত; আবার হয় ত কোন ব্যক্তি ছাদের উপর হইতে পড়িয়া যাইত, ইত্যাদি অনেক কাণ্ড না হইয়া আমাদের একটা নিমন্ত্রণ বাড়ীতে কায সম্পন্ন হয় না।

সারা-ঘাটে আসিয়া দার্জ্জিলিং-মেল ও আসাম-মেল পৃথক্ হইয়া গেল। সুতরাং, দার্জ্জিলিং-ডাক, মালপত্র ও যাত্রী, দার্জ্জিলিঙ্গের গাড়ীতে উঠিল; এবং আসামের আসাম-মেলে উঠিল। দার্জ্জিলিং-মেল ছাড়িয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে আসাম মেল ছাড়িল। অতি প্রত্যুষে পার্ব্বতীপুর জংশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই ষ্টেশন হইতে দিনাজপুর লাইন কাচনা-ঘাটে গিয়া থামিয়াছে; এবং তথা হইতে B. & N. W. Ry. দিয়া পশ্চিমে যাওয়া যায়। [ক্রমশঃ]

কোলে
বিস্কুট
লজেন্স
জ্যাম জেলী আচার
স্কোয়াশ
KOLAY
ORANGE SQUASH
নির্মাতা :
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৭০০ ০১০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১২'০০। ২য় ভাগ ১৭'০০

সাধারণ ১ম খণ্ড ৩'৫০; ২য় খণ্ড ৭'৮০; ৩য় খণ্ড ৫'২০; ৪র্থ খণ্ড ৭'০০; ৫ম খণ্ড ৭'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬'০০

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ১'৭৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ০'৭০

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। (ছাপা নাই)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১'৬০; কাপড়ে বাঁধাই ১'৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। মূল্য ৫'০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২২৯, মূল্য ৪'০০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭'০০, ২য় ভাগ ৬'৫০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬। মূল্য ৬'০০ টাকা

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য—১৫'০০

[illegible]-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ৮'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪'২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ছেলেদের উপযোগী। পৃঃ ৬৪, মূল্য ০'৭০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(একত্রে) শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। পৃঃ ২৬২, মূল্য ৪'৫০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (স্বামী মাধবানন্দ-কৃত বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ৩৬৯, মূল্য ৬'০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল ১'২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২'৫০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ৮'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬. মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই); ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী—পৃঃ ৩১৮, মূল্য ২'২৫

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ১২৭, মূল্য ১'৫০

স্মৃতি-কথা--স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ২০০, মূল্য ৩'০০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরত্তি-স্তব—মূল্য ০'৭০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ১'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'২০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৮০, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ প্রসঙ্গ— (ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২০৯, মূল্য ৩'০০

তিব্বতের পথে হিমালয়ে— স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০, শোভন ৬'০০

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৫২, মূল্য ৩'৩০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৭৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। পৃঃ ১৫৮, মূল্য ২'০০

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ—স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি—স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬০, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য: ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০; ৩য় অঃ ১৩'০০; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৬, মূল্য ১'০০

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮২, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ-চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃঃ ২৭৪, মূল্য ১০'০০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ২'০০ (ছাপা নাই)

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৬২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

COVER PRINTED BY—

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২'০০ টাকা   প্রতি সংখ্যা ১'২০ টাকা

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৯তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭৷৷০টা হইতে ১১টা; বিকাল ২৷৷০টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৮৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

"ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, তখন নির্জনে বাস ক'রবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'রবে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী

শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

দিব্য বাণী

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥

—ভাগবত, ১১।১৪।১৩

(উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

আমারে পাইয়া যিনি সন্তুষ্টহৃদয়
সকল দিকই তাঁর হয় সুখময়।
জিতেন্দ্রিয় হন তিনি, হন অকিঞ্চন,
সর্বভূতে সমচিত্ত, সমাহিত-মন।

নিত্যোৎসবো ভবেৎ তেষাং নিত্যশ্রীর্নিত্যমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনং হরিঃ॥

—পাণ্ডবগীতা, ২০

মঙ্গলনিলয় ভগবান হরি
অধিষ্ঠিত হৃদয়ে যাঁদের,
নিত্যই উৎসব, নিত্যই ঐশ্বর্য
সুমঙ্গল নিত্যই তাঁদের।

কথাপ্রসঙ্গে

আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ

সমুদ্রের তরঙ্গসমূহ সমুদ্র হইতেই উদ্ভূত হয়, সমুদ্রেই অবস্থিতি করে, অন্তে সমুদ্রেই প্রবেশ করে এবং সমুদ্রেই বিলীন হয়। ঠিক সেইরূপ জীবসমূহ আনন্দ হইতেই উদ্ভূত হয়, আনন্দেই অবস্থিতি করে, অন্তে আনন্দেই প্রবেশ করে এবং আনন্দেই বিলীন হয়।[১] সুদূর অতীতে উপনিষদের যুগে এই পুণ্যভূমি ভারতে তপোবলে বলীয়ান্ এক ঋষির মানসলোক উদ্ভাসিত করিয়া একদা এই দিব্য তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছিল। সমুদ্রের তরঙ্গ স্বরূপতঃ সমুদ্রই— জীবও স্বরূপতঃ আনন্দই। যাহার আদিতে, মধ্যে এবং অন্তেও আনন্দ, সেই জীব সর্বাবস্থায় অনিবার্যভাবেই নিঃসন্দেহে আনন্দস্বরূপ। ইহাই আর্য প্রজ্ঞা-দৃষ্টি।

ঋষির দৃষ্টিতে তত্ত্ব যাহাই হউক না কেন, তপঃসহায়হীন সাধারণ মানুষ আমরা—আমাদের দৃষ্টিতে বস্তুস্থিতি কী? কোন সন্দেহ নাই, আমরা জানি না আমরা কোথা হইতে আসি এবং কোথায় যাই। জানি শুধু এইটুকু যে, ছিটেফোঁটা আনন্দাভাসের মধ্যে একান্ত নিরানন্দ বর্তমানেই আমাদের অবস্থিতি। তাই আমাদের মনের গহনে নিহিত গোপন বেদনা কবির ভাষায় রূপ পায়:

> 'জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই?
> কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই!
> ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
> কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই!'

বস্তুতঃ যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের ব্যক্তি-জীবন, পরিবার-জীবন ও সমাজ-জীবনের প্রতি লক্ষ্য করি, তাহা হইলে সর্বত্রই গভীর বেদনাদায়ক অসংখ্য নিরানন্দ চিত্রই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কেহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, কেহ জরাজীর্ণদেহে কম্পিত স্খলিত চরণে যষ্টিসহায়ে পথচারী, কেহ বিকৃতমস্তিষ্ক, কেহ নিরুদ্দেশ, কেহ প্রিয়জনবিয়োগে নিদারুণ শোকে মুহ্যমান, কেহ মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত, কেহ কর্মাভাবে অর্থাভাবে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, কেহ অবসৃত জীবনের কর্মহীনতায় গভীর অবসাদে খিন্ন, কেহ বা নৈরাশ্যের অন্ধকার হইতে মুক্তির আলোকে উত্তরণের কোনও পথ না পাইয়া অবশেষে আত্মঘাতী। আর আকস্মিক দুর্ঘটনার তো কথাই নাই! প্রতিদিনের সংবাদপত্র দেশ-বিদেশের কত মর্মন্তুদ দুঃসংবাদই না পরিবেশন করিয়া থাকে!

আপত্তি উঠিতে পারে, জীবনের কেবলমাত্র অন্ধকারময় দিকটিই আমরা উপরে উপস্থাপিত করিয়াছি—আলোকোজ্জ্বল দিকটি উপেক্ষিত থাকিয়া গিয়াছে। জীবনের সব দিনগুলিই কি নিরানন্দের? প্রাণ-চঞ্চল আনন্দ-উচ্ছল দিন কি নাই?

আছে এবং নাই। জীবনের তথাকথিত রঙীন দিনগুলি অপরিণতবুদ্ধি মানুষের দৃষ্টিতে নিঃসংশয়ে আনন্দের, কিন্তু পরিণতবুদ্ধি মানুষ-মাত্রেই উহার শূন্যগর্ভতা স্বীকার করিয়া থাকেন। আর সাধকের দৃষ্টিতে তো ক্ষণিকের অতিথি ঐ আনন্দ-মুখর দিনগুলি আনন্দের মুখোশ-পরিহিত নিরানন্দেরই ক্রীড়াবিলাসের পরিচায়ক মাত্র—

১ আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি, অভিসংবিশন্তি।—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ৩।৬

নিষ্কিঞ্চনের ললাটে যেন রজতরাগরঞ্জিত রাজটীকা !

সুতরাং ইহাই যদি বস্তুস্থিতি হয়, তাহা হইলে মোক্ষম কথাটি দাঁড়াইতেছে এই যে, জীব আনন্দস্বরূপ হইয়াও নিরানন্দ। নির্দুঃখ আমাদের আত্মা। তথাপি নিরন্তর দুঃখের মধ্য দিয়াই আমাদের জীবন অতিবাহিত হইতেছে। শুধু নির্দুঃখ নহে—স্বরূপে আমাদের শুধু যে দুঃখাভাবই আছে, ভাববস্তু কিছুই নাই, তাহাও নহে। আনন্দই সেই ভাববস্তু। উহাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ। তথাপি আমরা নিরানন্দ। ইহা এক বিচিত্র পরিস্থিতি !

কিন্তু ঋষির দৃষ্টি তো সত্যদৃষ্টি। আনন্দেই যে আমাদের অবস্থিতি—ইহা তো বেদবাক্য। অভ্রান্ত স্বতঃসিদ্ধ বেদবাক্য। সুতরাং আসামী আমরা নিজেরাই। 'স্বখাত-সলিলে' ডুবিয়া মরিলে কে আমাদের ঠেকাইবে! প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গি পালটানোর। ইহারই নির্দেশ পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়। বারংবার তিনি নানাভাবে বলিয়াছেন, জগৎ দুঃখময় মনে হয়, ঈশ্বরকে না জানার জন্য। একটি সুপরিচিত উদ্ধৃতি দিই 'কথামৃত' হইতে: "ভক্তিশাস্ত্রে এই সংসারকেই 'মজার কুটি' বলেছে। রাম-প্রসাদের গানে আছে, 'এই সংসার ধোঁকার টাটি'। তাই একজন জবাব দিয়েছিল, 'এই সংসার মজার কুটি'।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তি-শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তির মহান আচার্য শ্রীরামানুজ বলিতেছেন: অন্তহীন নিরতিশয় সুখ যাঁহার স্বরূপ, সেই ব্রহ্ম অনুভূত হইলে অনুভব-কর্তা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই দর্শন করেন না তিনি নিরতিশয়-সুখস্বরূপ ব্রহ্মকেই অনুভব করিতে থাকেন বলিয়া এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু থাকে না বলিয়াই অন্য কিছুই দর্শন করেন না। অনুভবগোচর সমস্তই সুখস্বরূপ হওয়ায় দুঃখও দর্শন করেন না, কারণ অনুভবিতার যাহা অনুকূল অর্থাৎ প্রিয় মনে হয়, তাহাই সুখপদবাচ্য।[২] অর্থাৎ সুখ-দুঃখ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। ভগবান-লাভ হইলে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়—তখন 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'।

'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'—এই ধরণীর ধূলি মধুময়! কত আশার কথা—কত আনন্দের কথা! সুখদুঃখময় এই ধরণী যেমন আছে, তেমনই থাকিবে, সৃষ্টি যেমন আছে, তেমনই থাকিবে, তথাপি আমরা সর্বদাই আনন্দে থাকিব—ভাবিতেও আনন্দ! সুতরাং পরিবর্তিত হইবে দৃষ্টি—সৃষ্টি নহে।

এই নিঃসীম আনন্দে অবস্থিতির দুইটি পথ—একটি নিজেকে জানা, অপরটি ভগবানকে জানা। লীলাপ্রসঙ্গকারের ভাষায় একটি 'নেতি, নেতি' পথ, অপরটি 'ইতি, ইতি' পথ। পথ দুইটি হইলেও গন্তব্য একই। কারণ, মানুষ নিজেকে জানিতে পারিলে ভগবানকে জানিতে পারে; পক্ষান্তরে ভগবানকে জানিতে পারিলে নিজেকেও জানিতে পারে।

প্রথম পথটি মুখ্যতঃ সন্ন্যাসীদের জন্য। কারণ, এই পথের পাথেয়রূপে উল্লেখিত শম দম তিতিক্ষা উপরতি শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ষট্-সম্পত্তির অন্তর্গত 'উপরতি' শব্দটির অর্থ—আচার্য শংকরের মতে—সন্ন্যাস। ইহলোক ও পর-

২ 'অনবধিকাতিশয়-সুখরূপে ব্রহ্মণি অনুভূয়মানে ততঃ অন্যৎ কিমপি ন পশ্যতি অনু-ভবিতা···নিরতিশয়-সুখরূপং ব্রহ্ম অনুভবন্ তদ্‌ব্যতিরিক্তস্য বস্তুনঃ অভাবাৎ এব কিমপি অন্যৎ ন পশ্যতি; অনুভাব্যস্য সর্বস্য সুখরূপত্বাৎ এব দুঃখং চ ন পশ্যতি; তৎ এব হি সুখং, যৎ অনুভূয়-মানং পুরুষানুকূলং ভবতি।'—শ্রীভাষ্য, ১।৩।৭

লোকের যাবতীয় ভোগ্য বস্তুর প্রতি তীব্র বৈরাগ্য, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক এবং মুমুক্ষুত্বও এই সাধনার উপকরণ। যখন এই সকল উপকরণ সহায়ে বিরল কোন মানুষ স্বীয় আনন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, তখনই তাঁহার সর্বেন্দ্রিয় প্রসন্ন হয়, আস্য সহাস্য হয়, তিনি কৃতকৃত্য নিশ্চিন্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ হন৩, কারণ অন্তিম বিশ্লেষণে আত্মজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। এইরূপ ব্যক্তি কিরূপ আনন্দময় হইয়া যান, তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় পাওয়া যায়:—

"একবার এক সাধু এল, তার মুখখানিতে বেশ একটি সুন্দর জ্যোতিঃ রয়েছে। সে কেবল বসে থাকে আর ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে! সকাল সন্ধ্যা একবার ক'রে ঘরের বাহিরে এসে সে গাছপালা, আকাশ, গঙ্গা সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো ও আনন্দে বিভোর হয়ে দু হাত তুলে নাচতো; কখন বা হেসে গড়াগড়ি দিতো, আর বলতো, 'বাঃ বাঃ ক্যায়া মায়া—ক্যায়সা প্রপঞ্চ বনায়া!'"

এই প্রথম পথটি কঠিন, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত সহজ। আর প্রধানতঃ সেই সহজ পথটি দেখাই-বার জন্যই নির্বিশেষে যিনি আনন্দস্বরূপ এবং সবিশেষে যিনি আনন্দময়—আনন্দস্বরূপ হইতে বিচ্যুত না হইয়াই আনন্দময়—সেই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, যাহাতে তাঁহার সমাশ্রিত হইয়া মানুষ সহজে আনন্দময় অবস্থা লাভ করিতে পারে।

এই সেদিন তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বাংলার এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে—কামারপুকুরে, আজ যাহা বিশ্বখ্যাতির বৈজয়ন্তীতে বিভূষিত। আনন্দস্বরূপ জীবকে নিরানন্দ দেখিয়া তাহাকে আনন্দময় করিতেই তাঁহার অবতরণ। 'ফুল্ল-কানন-মলয়ানিল-কম্পনে কোকিল-কুল-কূজিত মুখরিত অলি-গুঞ্জনে' শুভ ফাল্গুনে তিনি আসিলেন—

'হেরি ধরণী রঞ্জিতা, উৎসব-উল্লসিতা'।—
'আজি কী আনন্দ জাগিল প্রাণে।
প্রাণের দেবতা এলো, সব দুখ দূরে গেল
গগন ভরিল গানে গানে।'

কবিকল্পনা কি? মনে হয় না। কবির কল্পনা নহে—কবির ভাষা। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন: শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে নদীসমূহ প্রসন্নসলিল, হ্রদসমূহ পদ্মশোভিত, বনরাজি বিহগ ও ভ্রমরের কলরবে পরিপূর্ণ ও পুষ্পস্তবকে শোভিত এবং সুখস্পর্শ পুণ্যগন্ধবহ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়াছিল।৪ আর 'যে, রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ'—ইহাও তো অবতীর্ণ ভগবানেরই শ্রীমুখের কথা! সুতরাং আনন্দময় আদিপুরুষের শুভ জন্মলগ্নে প্রকৃতিদেবী যে অভিনব উৎসব-সাজে সুসজ্জিতা হইয়াছিলেন, ইহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারা যায়।

তাহার পর সারাটি জীবন এই আনন্দময় পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অকাতরে আনন্দ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। শৈশবে ও বাল্যে শুধু যে স্বীয় জনকজননীরই হৃদয়ে তিনি আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পল্লী-রমণীগণ এক দুর্বার আকর্ষণে নিত্য তাঁহার জননীর নিকট আগমন করিতেন দেবশিশুটিকে

৩ প্রসন্নেন্দ্রিয়ঃ প্রহসিতবদনশ্চ নিশ্চিন্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিদ্ ভবতি।'—ছান্দোগ্য উ., ৪।৯।২, শাংকরভাষ্য।

৪ 'নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ। দ্বিজালি-কুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ॥ ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।'—ভাগবত, ১০।৩।৩-৪

দর্শন করিয়া উল্লসিতা হইতে এবং বালক গদাধরের হাস্য-পরিহাস, অপরের হাবভাবের হুবহু অনুকরণ, সঙ্গীত, অভিনয় ও ক্রীড়াদি গ্রামবাসী স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকাদের অন্তরে অপার্থিব আনন্দের সঞ্চার করিত।

পরিণত বয়সে—আমরা দেখি—ফুলুই-শ্যামবাজার গ্রামে তিনি তিন দিবারাত্র আনন্দের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মুহুর্মুহুঃ দিব্যভাব ও আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রী দর্শন করিতে ও তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইতে চতুষ্পার্শ্বস্থ দূরদূরান্তরের বহু গ্রাম হইতে দলে দলে অসংখ্য লোক উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়াছিল। ফলে ঠাকুর স্নানাহারের অবকাশ পর্যন্ত পান নাই। অগত্যা তাঁহার ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয় তাঁহাকে লইয়া লুকাইয়া সিহড় গ্রামে পলাইয়া আসিলে ঐ আনন্দমেলার অবসান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিয়াছিলেন কালনায় ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে। আনন্দময় পুরুষটিকে দর্শন করিবার পূর্বেই সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ অনুভব করিয়াছিলেন যে, আশ্রমে যেন কোনও মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে। বাবাজী মহারাজের 'আমি লোকশিক্ষা দিব, এইজন্যই আমি মালা-তিলকাদি ত্যাগ করি নাই' ইত্যাদি উক্তি শুনিয়া দিব্য ভাবাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বাস্তবিকই এ জগতে ঈশ্বর ভিন্ন আর দ্বিতীয় কর্তা নাই, লোকশিক্ষাও তিনিই দেন। তাহার পর ভগবৎ-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুহুর্মুহুঃ ভাবাবেশ ও উদ্দাম আনন্দ দেখিয়া বিস্মিত ও মোহিত বাবাজী মহারাজ বুঝিলেন যে, যে-মহাভাবের কথা গ্রন্থাদিতেই তিনি লিপিবদ্ধ দেখিয়াছেন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে নিত্য প্রকাশিত।

পাণিহাটির মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনেক বার যোগদান করিয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। একবারের বিস্তারিত বিবরণ লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন। মহোৎসবে প্রাণহীন কীর্তন, কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গি হুঙ্কার ও নৃত্যাদি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রীতি লাভ করেন নাই। সহসা ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি এক লম্ফে কীর্তনদলের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়া অর্ধবাহ্যদশায় সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে লাগিলেন। লীলাপ্রসঙ্গকার সে অপূর্ব নৃত্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন।...প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে-দুলিতে ছুটিতে থাকিত, তখন ভ্রম হইত, উহা বুঝি কঠিন জড়-উপাদানে নির্মিত নহে, বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে।"

আর দক্ষিণেশ্বরে তো ভগবৎপ্রসঙ্গে কীর্তনে নৃত্যে গীতে ভাবে সমাধিতে ও ভগবানের নামোচ্চারণে নিত্য আনন্দের হাটবাজার বসিয়া যাইত! সেইসকল মহানন্দময় দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়া পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: 'দক্ষিণেশ্বরে কি সব দিনই গেছে, মা! ঠাকুর কীর্তন করতেন, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের ঝাপড়ির ভিতর দিয়ে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, হাতজোড় ক'রে পেন্নাম করতুম। কি আনন্দই ছিল! দিনরাত লোক আসছে, আর ভগবানের কথা হচ্ছে।' শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী যোগীন-মাও বলিয়াছিলেন: 'সে যে কি আনন্দ, তা কি মুখে বলা যায় গো! মনে করলে আজও প্রাণ কি রকম ক'রে ওঠে!'

দক্ষিণেশ্বরের আনন্দলীলায় একটি বিশেষ দিনের কথা আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতে পারি। যে পুণ্যতিথিটির স্মরণে আমাদের এই অনুধ্যান-রচনা, সেই শুভ ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া

তিথি সে-দিনটিকে মহিমান্বিত করিয়াছিল। শ্রীম লিখিয়াছেন, 'চতুর্দিকে আনন্দের সমীরণ বহিতেছে।' ভবনাথ ও কালীকৃষ্ণ গান গাহিতেছেন: 'ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী / সবে মিলি তব সত্যধর্ম ভারতে প্রচারি।' ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পরে কালীকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন—তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন: 'ওর কপালে নেই! আজ হরিনামে কত আনন্দ হবে, দেখ্‌তো। ওর কপালে নেই!'

আনন্দের দিনে ভক্তকে বৈষয়িক কার্যে অন্যত্র যাইতে হইল, আনন্দ হইতে সে বঞ্চিত হইল—দেখিয়া ভগবানেরও আক্ষেপোক্তি! নিজে তিনি আনন্দময়। তাই অপরকে আনন্দিত দেখিতে সদাই ব্যগ্র। 'সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ' স্তবটি শুনিয়া একদিন বলিয়াছিলেন: "সংসারকূপ, সংসারগহন—কেন বলো? ও প্রথম প্রথম বলতে হয়। তাঁকে ধরলে আর ভয় কি? তখন 'এ সংসার মজার কুটি।'" তিনি চাহিতেন, 'দুঃখ', 'দুঃখ' না করিয়া সকলে আনন্দ করুক—আনন্দে থাকুক। তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর কথায় অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে: 'তিনি যে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন—আনন্দে অট্টহাস্য করতেন—সকলকেই সেই আনন্দের অধিকারী করতে পারছেন না ব'লে তিনি কতই না দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তিনি যে আনন্দসাগরে ভেসে থাকতেন—জীবকেও সেই আনন্দের ভাগী করবার জন্য তাঁর অন্তর সদাই ব্যাকুল ছিল।'

কত মানুষকে যে তিনি আনন্দ দিয়াছেন, কত মানুষের নিকট স্বকীয় আনন্দময় রূপটি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে! যাঁহারা প্রসিদ্ধ—গ্রন্থগুলিতে যাঁহাদের উল্লেখ আছে, মাত্র তাঁহাদেরই কয়েকজনের কথা আমরা স্মরণ করিতে পারি।

শ্রীমা সারদাদেবী বলিয়াছিলেন: 'ঠাকুর আমার হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপন ক'রে দিয়েছেন, সেই আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেছি!... তিনি ছিলেন আনন্দময় পুরুষ।... তাঁকে কখনও নিরানন্দ দেখিনি। পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি, আর বুড়োর সঙ্গেই বা কি, সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে আছেন। কখনও বাপু নিরানন্দ দেখিনি।... কি সদানন্দ পুরুষই ছিলেন! হাসি কথা গল্প কীর্তন চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকতো। আমার জ্ঞানে তো আমি কখনও তাঁর অশান্তি দেখিনি।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সান্নিধ্যে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, তিনি সর্বদাই এক আনন্দময় জগতে বাস করিতেন। সেই নিত্যসিদ্ধ শ্রীশ্রীমহারাজও বলিয়াছিলেন: 'ঠাকুরের কাছে কি আনন্দেই ছিলুম! এখন ধ্যান-ধারণা ক'রে যা না হয়, তখন তা আপনিই হতো।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধর সেন একজন স্কুল সাব-ইন্‌স্‌পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া প্রায়ই শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের নিকটে আসিতেন। একদিন তাঁহারা আসিবার কিছু পরেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হন। তাঁহার শ্রীমুখে এমন হাসি, মনে হইতেছিল যেন আনন্দ আর ধরে না। উদ্বেলিত আনন্দের পরিচয়বহ সেই অপূর্ব মধুর হাসি সন্দর্শন করিয়া অধর সেন তাঁহার সঙ্গীটিকে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরের আনন্দ দেখিয়া তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল। সঙ্গীটির প্রায়ই ভাব হইত, কিন্তু সে-ভাব দেখিয়া অধর সেনের মনে হইত, তাঁহার ভিতরে যেন কত যন্ত্রণা। অধর

সেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাব দেখিয়াই প্রকৃত ভাব যে কী আনন্দময় অবস্থা তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্যই সঙ্গীটিকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

ঈশ্বরপ্রেমিক দেশনেতা শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ মধুর হাসির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, শ্রীমকে লিখিত তাঁহার স্মৃতিচারণায়: "ঠাকুরের সঙ্গেও মাত্র চার পাঁচ দিনের দেখা,...ঐ ক'দিনেই যা দেখেছি ও পেয়েছি, তাতে জীবন মধুময় ক'রে রেখেছে। সেই দিব্যামৃতবর্ষী হাসিটুকু যতনে পেটরায় পুরে রেখে দিয়েছি। সে যে নিঃসম্বলের অফুরন্ত সম্বল গো! আর সেই হাসিচ্যুত অমৃতকণায় আমেরিকা অবধি অমৃতায়িত হচ্ছে—এই ভেবে 'হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ', 'হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ'।"

কাশীপুরে নিদারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব আনন্দেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার সেবকদের নানা কথায় ও রঙ্গরসে আনন্দে রাখিতেন। বলিতেন, 'একটু আনন্দ না পেলে ওরা কেমন ক'রে পারবে?' শিষ্য হরিনাথ (ভাবী স্বামী তুরীয়ানন্দ) একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কেমন আছেন। ঠাকুর জানাইলেন যে, তিনি কিছু খাইতে পারিতেছেন না, অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা হইতেছে। ঠাকুরের দিব্য সান্নিধ্যে হরিনাথের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল—তিনি দেখিলেন, ঠাকুর আনন্দের সাগর। ঠাকুর পুনরায় তাঁহার অসহ্য কষ্টের কথা বলা সত্ত্বেও হরিনাথের একই প্রকার দিব্যানুভূতি হইতে লাগিল এবং তিনি বলিলেন, 'আপনি যাই বলুন না কেন, আমি দেখছি আপনি অসীম আনন্দের সমুদ্র।' ইহা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব সস্মিতবদনে স্বগতোক্তি করিলেন, 'শালা, ধ'রে ফেলেছে রে!'

বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে 'সহাস্য'। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে তদপেক্ষা শতগুণ সহাস্য ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী অদ্ভুতানন্দজীর উক্তিতে। এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কিরূপ দেখিয়াছিলেন। উত্তরে অদ্ভুতানন্দজী বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দকে ত দেখেছো? কী দেখেছো?' প্রত্যুত্তরে ঐ ব্যক্তি বলেন যে, স্বামীজী আনন্দময় পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিলে, তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিলে, তাঁহার কথা শ্রবণ করিলে এক অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যাইত। ইহা শুনিয়া অদ্ভুতানন্দজীর মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'খুব আনন্দময় পুরুষ ছিলেন—না? ঠাকুরকে মনে করো—ওর একশ গুণ আনন্দময় পুরুষ। সে আনন্দের তুলনা নেই!'

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা: আচার্য শংকর; টীকাকার: স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক: স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা: জ্ঞানং মন-আদি-সাক্ষি-চৈতন্যং চ মহতি দেশ-কালাদি-পরিচ্ছেদ-শূন্যে আত্মনি ব্রহ্মণি নিযচ্ছেৎ নিরুন্ধ্যাৎ একীকুর্যাৎ ইতি অর্থঃ। তৎ তং মহান্তম্ আত্মানং সাক্ষিত্ব-ব্রহ্মত্ব-বিকল্প-ত্যাগ-পূর্বকং শান্তে সর্ব-ব্যাপারাতীতে—'অন্যত্র

ধর্মাদন্যত্রাধর্মাৎ' (কঠ উ. ১।২।১৪) ইত্যাদিনা প্রক্রান্তে—আত্মনি নিযচ্ছেৎ। অহং ব্রহ্ম অস্মি ইতি বৃত্ত্যুল্লেখং ত্যক্ত্বা স্বতঃ-প্রকাশমান-পরমানন্দ-পরিপূর্ণ-ব্রহ্মাত্মনা অবতিষ্ঠেত ইতি অর্থঃ। তদুক্তং—'দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ। যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্মন্ ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্'* ইতি পরাশরং প্রতি বসিষ্ঠেন ॥ ৬ ॥

'তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।' (বৃ. উ. ৪।৪।২১)—তং পরমাত্মানং বিজ্ঞায় বিশেষেণ জ্ঞাত্বা ধীরঃ ধীমান্ বিষয়ানাকৃষ্ট-চিত্তো বা প্রজ্ঞাং প্রত্যয়-সন্ততিং কুর্যাৎ; 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥' (গীতা ৯।২২), 'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা' (গীতা ১৩।২৪) ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতয়ঃ অপি ইমম অর্থং বদন্তি ইতি আহ—

(মূলস্তোত্রম্ঃ) যং ব্রহ্মাখ্যং দেবমনন্যং পরিপূর্ণং
হৃৎস্থং ভক্তৈর্লভ্যমজং সূক্ষ্মমতর্ক্যম্।
ধ্যাত্বাত্মস্থং ব্রহ্মবিদো যং বিদুরীশং
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৭ ॥

যম্ ইতি। **দেবং** স্বপ্রকাশম্ 'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ' (বৃ. উ. ৪।৩।৯) ইতি শ্রুতেঃ; **অনন্যম্** অন্যবস্তুশূন্যম্—'যস্মাৎ পরং নাপরম্' (শ্বে. উ. ৩।৯) ইতি শ্রুতেঃ। **পরিপূর্ণং** পরিতঃ সর্বেষু দেশেষু কালেষু চ বর্তমানম্—'ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতম্' (মু. উ. ২।২।১১) ইতি শ্রুতেঃ, 'স এবাদ্য স উ শ্বঃ' (কঠ উ. ২।১।১৩) ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।

অনুবাদ: (পূর্বোক্ত শ্রুতির শেষাংশের অর্থ—) জ্ঞানকে (জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে) অর্থাৎ মন আদির সাক্ষিচৈতন্যকে মহত্তম অর্থাৎ দেশকালাদি-পরিচ্ছেদ রহিত আত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মে সমর্পণ করিবে, অর্থাৎ তাঁহার সহিত একীভূত করিবে—ইহাই অর্থ। (ইহার পর) সেই মহত্তম আত্মাকে সাক্ষিত্ব-ব্রহ্মত্ব-আদি সর্ব বিকল্প পরিত্যাগপূর্বক 'শান্তে' অর্থাৎ সর্বব্যাপার-রহিত—'অন্যত্র…অধর্মাৎ'—ধর্ম, অধর্ম হইতে ভিন্ন—ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা কথিত—আত্মাতে সমর্পণ করিবে। তাৎপর্য এই যে, 'আমি ব্রহ্ম', এইরূপ বৃত্তির উল্লেখও[১] পরিত্যাগ করিয়া স্বতঃ প্রকাশমান পরমানন্দস্বরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্মাত্মারূপে অবস্থান করিবে। এই বিষয়ে পরাশরের

* তুলনীয় মুক্তিকোপনিষৎ, ২।৬৪

১ 'আমি ব্রহ্ম'—এই আকারের চিত্তবৃত্তিতে 'আমি' এবং 'ব্রহ্ম', এই দুইটি শব্দের সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে। ইহাই নাম 'উল্লেখ'। এই 'উল্লেখ'ও পরিত্যাগ করিতে হইবে। টীকাকারের অভিপ্রায় এই যে, স্থূল হইতে সূক্ষ্মে উপনীত হইতে হইলে প্রথমতঃ বাহ্যেন্দ্রিয়গুলিকে তাহাদের অপেক্ষা সূক্ষ্ম মনে বিলীন করিতে হইবে। তাহার পর মনকে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম সাক্ষিচৈতন্যে, সাক্ষিচৈতন্যকে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম 'আত্মা'-শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মে বিলীন করিতে হইবে অর্থাৎ সমস্ত শব্দের সম্পর্কশূন্য স্বপ্রকাশ তুরীয়চৈতন্যে অবস্থিত হইতে হইবে।

প্রতি বশিষ্ঠের উক্তি রহিয়াছে—'দর্শনাদর্শনে…স্বয়ম্'—দর্শন ও অদর্শন[২] পরিত্যাগ করিয়া যিনি নিজে কেবলস্বরূপে অবস্থান করেন, হে ব্রহ্মন্! তিনি স্বয়ং ব্রহ্মই, ব্রহ্মবিৎ নহেন।

'তমেব ধীরো…ব্রাহ্মণঃ'—সেই পরমাত্মাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া (অর্থাৎ দৃঢ় পরোক্ষভাবে জানিয়া) ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিমান বা বিষয়াসক্তিরহিত-চিত্ত পুরুষ প্রজ্ঞা[৩] অর্থাৎ ('আমি ব্রহ্ম', এইরূপ) বৃত্তিধারার (ধ্যানের) অভ্যাস করিবেন। 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো… আত্মনা'—অনন্যচিত্ত হইয়া যাহারা আমার উপাসনা করে, নিত্য সমাহিতচিত্ত সেই সব ব্যক্তিদের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ) আমি বহন করিয়া থাকি। কেহ কেহ ধ্যান-পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারা বুদ্ধিতে আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন।—ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিসমূহও এই অর্থই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, আচার্য ইহাই বলিতেছেন: (মূলস্তোত্র, শ্লোক ৭; পৃঃ ৬৪ দ্রষ্টব্য)।

অন্বয় (টীকানুযায়ী): যং দেবম্ অনন্যং পরিপূর্ণং ব্রহ্মাখ্যং ভক্তৈঃ লভ্যম্ অজং সূক্ষ্মম্ অতর্ক্যম্ আত্মস্থং ধ্যাত্বা ব্রহ্মবিদঃ ভবন্তি, যং (চ) হৃৎস্থম্ ঈশং বিদুঃ, সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং তং হরিম্ ঈড়ে।৭।

স্তোত্রানুবাদ: ভক্তগণকর্তৃক (শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের দ্বারা) লভ্য, জন্মরহিত, সূক্ষ্ম (ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য), তর্কের অবিষয় (কেবল তর্কের দ্বারা অলভ্য), অনন্য (স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-শূন্য), পরিপূর্ণ (সর্বদেশে এবং সর্বকালে বর্তমান, অতএব ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য), ব্রহ্মনামক যে দেবকে (স্বপ্রকাশচৈতন্যকে), আত্মস্থরূপে (দেহ-ইন্দ্রিয়-অন্তঃকরণ প্রভৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট জীবাত্মারূপে) ধ্যান করিয়া (মুমুক্ষুগণ) ব্রহ্মবিদ হন (এবং) যাঁহাকে হৃদয়স্থিত (অন্তর্যামী) ঈশ্বররূপে জানেন, সংসারের (কারণীভূত অজ্ঞান-) অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি।৭।

টীকানুবাদ: যং—যে **দেবং**—স্বপ্রকাশ বস্তুকে (স্বপ্রকাশত্বে শ্রুতি-প্রমাণ—) 'এই স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতি-রূপে প্রতিভাত হন' **অনন্যং**—অন্যবস্তুশূন্য (এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—) 'যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বলিয়া কিছুই নাই' **পরিপূর্ণং**—সর্বদেশে ও সর্বকালে বিদ্যমান (এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ—) 'সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে, দক্ষিণে ও উত্তরে, অধঃ ও ঊর্ধ্বে বিস্তৃত, যাহা কিছু দৃশ্যমান, সে সকলই অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ।' 'তিনিই অদ্য বা বর্তমান কালে ও আগামী বা ভবিষ্যতে বিদ্যমান'—এই শ্রুতিও এ বিষয়ে প্রমাণ।

২ এখানে দর্শনের অর্থ 'জানা', অদর্শনের অর্থ 'না-জানা'। এই 'জানা' ও 'না-জানা'রূপ উভয় অনুভবই বৃত্তিসাপেক্ষ, যেমন ঘটকে জানি অথবা জানি না—উভয়ই বৃত্তিসাপেক্ষ। কিন্তু সমগ্র বৃত্তি পরিত্যক্ত না হইলে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি হয় না। এই বিষয়ে পাতঞ্জল যোগদর্শনের বক্তব্য স্মরণীয়। সমগ্র চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই পুরুষ স্বস্বরূপে অবস্থান করে -'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্' (১৷৩)। সুতরাং যাবতীয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি হয়। তখন বৃত্তি না থাকায় সেই ব্যক্তিকে 'ব্রহ্মজ্ঞানী' বলা যায় না, কিন্তু 'ব্রহ্মস্বরূপ'ই বলিতে হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি—'স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি…।' (মুণ্ডক উ. ৩৷২৷৯)

৩ বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শংকর 'প্রজ্ঞা'-শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যাহাতে শাস্ত্র এবং আচার্যের উপদেশ হইতে বিজ্ঞাত বিষয়ে আর কোন জিজ্ঞাসা অর্থাৎ সন্দেহ প্রভৃতি দূর করিবার ইচ্ছা না হয়, এইরূপ জ্ঞানই 'প্রজ্ঞা'। কিন্তু টীকাকার 'প্রজ্ঞা' শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন।　বৃ. উ. ৪৷৪৷২১, শাংকরভাষ্য দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

আগের দিন আমরা পড়েছি, ঠাকুর শশধর পণ্ডিতকে বলেছেন যে, মোটামুটি যোগ তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ আর ভক্তিযোগ। জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে ঠাকুর যা বলেছেন তার বিস্তারিত আলোচনাও আমরা আগের দিন করেছি। এখন আমরা দেখবো ঠাকুর কর্মযোগ সম্বন্ধে কি বলছেন। (পাঠ:)

'কর্মযোগ—কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। তুমি যা শেখাচ্ছ। অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি কর্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি অনাসক্ত হ'য়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে, তাঁতে ভক্তি রেখে, সংসারের কর্ম করে, সেও কর্ম-যোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা-জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ। ঈশ্বরলাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।'

(১ম ভাগ, ১১শ খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

সাধারণ অর্থে কর্ম বন্ধনের কারণ। কিন্তু এমন একটি কৌশল আছে, যে-কৌশল অবলম্বন করলে, যে-কর্ম বন্ধনের কারণ, তা আবার মুক্তির কারণ হয়। সেই কৌশলটি হ'চ্ছে—কর্ম-ফলে আসক্তি না রেখে কর্ম করা। এইভাবে কর্ম করাকে কর্মযোগ বলে। ঠাকুর কিন্তু এখানে বলছেন, মাত্র অনাসক্ত হয়ে কর্ম করাই সব নয়, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে হবে, আবার ঈশ্বরে ফলসমর্পণ ক'রে, তাঁতে ভক্তি রেখে, কর্ম করতে হবে। এরই নাম কর্মযোগ, বলছেন।

কর্ম মানুষকে বদ্ধ করে এই জন্য যে, মানুষ ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে। যদি ফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্ম করা যায়, তা হ'লে কর্মের যে বন্ধনের শক্তি, তা থাকে না। কিন্তু এভাবে কর্ম করা বড় কঠিন। ঠাকুরও এখানে একটু পরে সেই কথাই বলবেন। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা বড় কঠিন। কারণ, ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে, যে-কর্ম করবে মানুষ, সেই কর্মে তার প্রবৃত্তি কেন হ'বে? ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকলে সে-কর্মে প্রবৃত্তি হতে পারে না। সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হ'য়ে কর্ম করা—এ একটি বিশেষ কোন শ্রেণীর সাধকদের পক্ষেই সম্ভব।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন:

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্‌॥

(৩।২৫)

—হে অর্জুন, জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা কর্মফলে আসক্ত হয়ে যেমন কর্ম করে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনাসক্ত হয়ে ঠিক সেইরকম ভাবে—খুঁটিয়ে নিপুণ-ভাবে—কর্ম করবেন। কেন করবেন? না, লোকসংগ্রহ ইচ্ছা ক'রে। অর্থাৎ তাঁদের কর্মের দ্বারা জগতের কল্যাণ হবে। তাই তাঁরা ঐভাবে কর্ম করবেন। এ তো খুব বড় অধিকারীর কথা! খুব বড় অধিকারী, যাঁরা আচার্যশ্রেণীর, তাঁদের কথা। তাঁরাই জগৎ-কল্যাণের জন্য এইভাবে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে পারেন, অপরে নয়।

সুতরাং সাধারণ মানুষ সাধনা হিসাবে এইভাবে কর্ম করতে পারে না। সেইজন্যই 'বিদ্বাংসঃ'—জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেইরকম ভাবে কর্ম করেন।

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট)।

সুতরাং সেটি কর্মযোগ নয়। জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত - ফলাকাঙ্ক্ষারহিত। তিনি যে কর্ম করেন, সে কর্ম তিনি কেবল লোকসংগ্রহের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য ক'রে থাকেন। সুতরাং সেটি কর্মযোগের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। 'যোগ' মানে সিদ্ধিলাভের উপায়। সিদ্ধিলাভের পরে যে কর্ম করা যায়, সেটাকে 'যোগ' বলা যায় না।

আবার অন্য জায়গায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন:

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥
(২।৪৮)

—হে অর্জুন, তুমি যোগস্থ হয়ে কর্ম করো, আসক্তি ত্যাগ ক'রে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাব রেখে। এই যে 'সমত্ব', সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমভাব—একেই 'যোগ' বলে। এই সমভাব একটি অবস্থা, যেটি মানুষের সাধনার পরিণতিতে লাভ হবে, সেই অবস্থা লাভ করতে হ'লে সাধনাও তার অনুরূপ হতে হবে। সুতরাং সেই অনাসক্তি-যোগ অভ্যাস করতে হবে—ফলে আসক্তিশূন্যতা। ঠাকুর কিন্তু এখানে এই রকম কর্মযোগের উপর খুব জোর না দিয়ে, ভক্তিমিশ্রিত কর্মযোগের কথা বললেন। কী রকম? না, অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফলসমর্পণ ক'রে, তাঁতে ভক্তি রেখে সংসারে কর্ম করা। এখানে যে কর্মযোগটি বলছেন—এটি ভগবদ্-ভক্তি-আশ্রিত কর্মযোগ।

আমরা যে যোগের এই রকম বিভাগ করি —জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি, বাস্তবিক কিন্তু মানুষের জীবনে এই যোগগুলি এত বিভক্ত নয়। একটির সঙ্গে আর একটি মিশ্রিত থাকে। তাই মানুষের স্বভাবকে অবলম্বন ক'রে, তার অনুরূপ ভাবে ঠাকুর কর্ম-যোগের ব্যাখ্যা করলেন। ভক্তি-মিশ্রিত অনাসক্ত কর্মের কথা বললেন।

এখন এই যে অনাসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ভক্তি রেখে, ঈশ্বরে ফলসমর্পণ ক'রে কর্ম করা—এগুলি তো ভক্তির চিহ্ন! হ্যাঁ, ভক্তির চিহ্ন, সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে কর্ম মুখ্য, ভক্তি রয়েছে কর্মের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। এইজন্য একে কর্মযোগ বলা হয়েছে, ভক্তিযোগ বলা হয় নি। যদিও ভক্তিকে অবলম্বন ক'রে এই কর্মযোগ, তা হ'লেও একে নাম দেওয়া হয়েছে কর্মযোগ। কারণ, কর্মের উপর এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বস্তুটি এখানে কর্ম, আর বিশেষণরূপে বলা হয়েছে, ভগবানে ভক্তি রেখে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে। আমরা আগেই বলেছি যে, ভক্তি কর্ম জ্ঞান—এগুলি আমাদের জীবনে পরস্পর মিশ্রিত থাকে। এদের অত্যন্ত পৃথক্‌রূপে চিহ্নিত করা আমাদের সম্ভব হয় না। যখন আমরা জ্ঞানযোগী, তখন ভক্তিকে উপেক্ষা করে চলতে পারি না। জ্ঞানযোগ হ'লো বিচার-প্রধান। বিচারের সেখানে প্রাধান্য আছে, কিন্তু তার সঙ্গে ভক্তি মিশ্রিত আছে, কর্মও আছে।

আবার যেখানে কর্মযোগ বলছি, সেখানে ভক্তি মিশ্রিত আছে, বিচারও আছে। আমরা যদি কর্মের সঙ্গে সঙ্গে বিচার না রাখি, তা হ'লে কর্মযোগ ঠিক করছি কি না, কি করে বুঝবো? কাজেই বিচার সঙ্গে সঙ্গে রাখতে হয়। কর্মটি করছি, সেটি যোগবুদ্ধিতে হচ্ছে কি না, বিচারের দ্বারা তা আমাকে স্থির করতে হয়। সুতরাং কর্মের সঙ্গে সঙ্গে বিচারেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেখানে বিচার প্রধান নয়, গৌণ। এইজন্য তাকে জ্ঞানযোগ না বলে কর্মযোগ বলা হচ্ছে। এখানেও সেই রকম যেহেতু ভক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়া নেই, ভক্তিকে অবলম্বন ক'রে কর্ম, কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এইজন্য এটি কর্মযোগ।

আমরা গীতার ভিতরেও এইরূপ কর্মযোগের উল্লেখ দেখতে পাই। 'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।' (১৮।৪৬) —নিজের কর্ম দ্বারা ভগবানের অর্চনা করে মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। ভগবদ্-অর্চনা হচ্ছে এখানে কর্মের দ্বারা। সুতরাং একদিক দিয়ে এটি যেমন কর্মযোগ, আর একদিক দিয়ে এটি ভক্তিযোগ। ঈশ্বরে ফলসমর্পণ ক'রে কর্ম করা—ঠাকুর যা বললেন, তা-ই হচ্ছে ঐ স্বকর্ম দ্বারা তাঁর অর্চনা করা। সুতরাং ঈশ্বরে ফলসমর্পণ কর্মযোগের আনুষঙ্গিক উপায়। ঈশ্বরে ফলসমর্পণ করতে হলেই 'তাঁতে ভক্তি রেখে' কর্ম করতে হয়। কিন্তু ভগবদ্-ভক্তি মাত্র সেখানে নেই, তার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম রয়েছে। এইজন্য একে কর্মযোগ বলা হচ্ছে।

ঠাকুর আরও বলছেন, 'ঈশ্বরে ফলসমর্পণ ক'রে পূজা-জপাদি কর্ম করার নামও কর্মযোগ।' আগে বললেন, সংসারের কর্ম করার কথা; আর এখন বলছেন, পূজাজপাদি কর্ম করার কথা। সংসারের কর্ম বলতে মানুষের বর্ণাশ্রম-বিহিত যাবতীয় কর্ম। এমনকি নিজের জীবিকার জন্য যে কর্ম, তা-ও এর ভিতরে পড়ে।

গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
(৯।২৭)

প্রথমে বললেন, 'যৎ করোষি'—যা কিছু করো। তারপর কথাটা বিস্তার ক'রে বলবার জন্য বললেন, 'যৎ অশ্নাসি', 'যৎ জুহোষি' ইত্যাদি। অর্থাৎ সব রকমের কর্মের কথা বললেন। 'যৎ অশ্নাসি'—যা খাও, অর্থাৎ স্বাভাবিক কর্ম—দেহ-ইন্দ্রিয়াদির তাগিদে যা মানুষকে করতে হয়। এগুলি সাধারণ কর্ম, স্বাভাবিক কর্ম। তারপর ধর্মকর্মের কথা বলছেন, 'যৎ জুহোষি'—যা কিছু হোম করো, 'যৎ দদাসি'—যা দান করো, 'যৎ তপস্যসি'—যা তপস্যা করো—এই লৌকিক এবং শাস্ত্রীয় সকল কর্মের ফল আমাতে অর্পণ করো।

ঠাকুর কর্মগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে বললেন। 'সংসারের কর্ম' আর '? কর্ম। সংসারের কর্ম বলতে—দেহরক্ষার জন্য কর্ম, আত্মীয়-পরিজনদের পালনের জন্য কর্ম। সংসারের কর্ম মানুষকে করতে হয়; মানুষ বলে আমরা কর্মে ব্যস্ত, সুতরাং ভগবানের চিন্তা করার অবকাশ কোথায়? ঠাকুর বলছেন, এই সব কর্মগুলিকে, ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করো। তা হ'লে সেটি কর্মযোগ হবে। আবার পূজা-জপাদি, এসব কর্মও ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করার নামও কর্মযোগ। অর্থাৎ স্বাভাবিক কর্ম এবং শাস্ত্রীয় কর্ম, যা কিছু করা যায়, সে সবের ফল ভগবানে সমর্পণ ক'রে করলে কর্মযোগ হয়।

তারপর ঠাকুর বলছেন, 'ঈশ্বরলাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য।'

কর্মযোগের উদ্দেশ্য কী?—গীতায় বলা হয়েছে—বন্ধন থেকে মুক্তি (গীতা ২।৩৯,৫।৩)। আর ঠাকুর এখানে কর্মযোগের উদ্দেশ্য বলছেন—ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরলাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য। যেমন ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য হ'লো ঈশ্বরলাভ, তেমনি কর্মযোগেরও উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। আর জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্য কী? না, অজ্ঞানের নিবৃত্তি—স্বস্বরূপের প্রাপ্তি স্বরূপটি কী? যদি স্বরূপটি ঈশ্বর হন, তা হ'লে যেমন কর্মযোগের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, ঠিক তেমনি জ্ঞানযোগেরও উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।

আমরা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। ঈশ্বরও ব্রহ্মস্বরূপ। নিজের স্বরূপের প্রাপ্তি আর ঈশ্বরপ্রাপ্তি—একই

কথা। নিজেকে জানা আর ঈশ্বরলাভ—একই কথা। শব্দের হেরফের মাত্র, বস্তুতে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং যা আমরা জ্ঞানযোগের দ্বারা চাইছি, তা-ই কর্মযোগের দ্বারা চাইছি, তা-ই আবার ভক্তিযোগের দ্বারা চাইছি। উদ্দেশ্য ভিন্ন নয়। তাকে ব্যাখ্যা করার শব্দ ভিন্ন ভিন্ন। প্রকাশ করি একই বস্তুকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। যাকে স্বস্বরূপ বলছি, তাকেই ঈশ্বর বলছি। যাকে যোগে অবস্থান বলছি, তাকেই ঈশ্বরে স্থিতি বলছি। আমাদের সাধন-পথের দিক থেকে দেখে বা রুচির দিক থেকে দেখে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করা। এইটি বুঝতে হবে। সুতরাং প্রথমে জ্ঞানযোগের কথা ব'লে এখন কর্মযোগের কথা বললেন এবং শেষে উদ্দেশ্যের কথা বললেন—ঈশ্বর-লাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য। ঠাকুর এই কথা বলার খুব প্রয়োজন বোধ করছেন। কর্ম-যোগের আর অন্য উদ্দেশ্য নেই। আমরা আপাতদৃষ্টিতে দেখি যারা কর্ম করে—যাগ-যজ্ঞাদি করে, তাদের উদ্দেশ্য হল স্বর্গাদিলাভ করা। 'স্বর্গকামো যজেত'—স্বর্গ কামনা ক'রে যজ্ঞ করবে। তা হ'লে উদ্দেশ্য দাঁড়ায় স্বর্গ। এই রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা মনে আসে, ঠাকুর সেটি দূর করবার জন্য বলছেন: স্বর্গাদি নয়, ঈশ্বরলাভই উদ্দেশ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য কর্মযোগের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, যদি কেউ নাস্তিক হয়—যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস একেবারেই না করে, তাহলেও সে কর্মযোগের দ্বারা কল্যাণ লাভ করবে। স্বামীজী গীতার অনাসক্তি-যোগের অনুসরণ ক'রে ঐ কথা বলেছেন। ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হ'য়েও মানুষ কর্মযোগী হ'তে পারে। তাকে কর্মযোগী কেন বলবো?—যেহেতু সে কর্মের ফল চায় না।

'আমি কর্তা নই, দেহেন্দ্রিয়াদিই কর্ম করছে, আমি নির্বিকার নির্লিপ্ত অকর্তা আত্মা'—এই বুদ্ধিতে যদি কেউ কর্ম করতে পারে, তাহলে সে জ্ঞানযোগী হ'য়ে গেল। আর ফল না চেয়ে যদি কেউ কর্ম করতে পারে, তাহলে সে কর্ম-যোগী হ'য়ে গেল। কারণ, ঐভাবে কর্ম করলে তার অহঙ্কার দূর হবে। এই অহঙ্কার থেকে মুক্তি, পরিণামে অজ্ঞান থেকে মুক্তিতে দাঁড়াবে। সুতরাং এখানে কর্মযোগীও জ্ঞানযোগীর পর্যায়ে পড়ে যাবে। কিন্তু সেরকম অধিকারী অত্যন্ত বিরল। তাই ঠাকুর এখানে ভক্তিকে অবলম্বন ক'রে যে কর্মযোগ, তারই উল্লেখ করছেন। স্বামীজীর কর্মযোগে যে ভক্তিকে অস্বীকার করা হচ্ছে তা নয়। স্বামীজী কর্মের বৈশিষ্ট্য দেখাবার জন্য বলেছেন, যদি কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে, তবু সে পরকল্যাণে অনাসক্তভাবে কর্ম করলে কর্মযোগী হ'তে পারবে। কারণ, গীতায় বলা হয়েছে 'সমত্বং যোগ উচ্যতে'—সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমত্ব—সিদ্ধিতে মনে হর্ষ হবে না, অসিদ্ধিতে মনে দুঃখ হবে না—এই যে সমত্ব, এই সমত্বের নামই হচ্ছে যোগ।

এই সমত্ব জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয়, কর্মের দ্বারা লাভ হয়, ভক্তির দ্বারা লাভ হয়। সুতরাং, আমরা যে বিভিন্ন ফল পাচ্ছি তা নয়—একই ফল পাচ্ছি। ভক্তির দ্বারা সমত্ব কি ক'রে লাভ হয়?—না, ভালমন্দ ভগবানের দান—এই মনে ক'রে সুখ বা দুঃখ যাই আসুক না কেন, ভক্ত তাতে অচঞ্চল থাকে। ভক্তির দ্বারাই এই অচঞ্চলতা তার লাভ হয়। সুতরাং, ভক্তির দ্বারা যা লাভ হচ্ছে, জ্ঞানের দ্বারা তাই লাভ হচ্ছে, কর্মের দ্বারাও তাই লাভ হচ্ছে।

(পাঠ:) **'ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্তন এইসব ক'রে তাঁতে মন রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।'**

ঈশ্বরের নাম-গুণ-কীর্তন, ধ্যান-ধারণা, এই সব ক'রে ভগবানে মন রাখার নাম হলো ভক্তিযোগ।

ঠাকুর বলছেন, 'কলিযুগের পক্ষে ভক্তি-যোগ সহজ পথ।' কেন সহজ পথ? বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারি, বিচার করবার মত মনের স্থিরতা আমাদের নেই ; যে-মন দিয়ে বিচার করা সম্ভব, সে-মন সাধারণের নেই। যদি রাগ-দ্বেষশূন্য মন না হয়, তা দিয়ে বিচার করা যায় না। রাগদ্বেষযুক্ত মন কখনও সত্যে পৌছতে পারে না বিচারের দ্বারা। সুতরাং, বিচারের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে, রাগদ্বেষ থেকে মুক্তি প্রয়োজন। অন্ততঃ অনেকাংশে রাগদ্বেষ-নিবৃত্তি প্রয়োজন। তাই জ্ঞানযোগ কঠিন পথ।

আর কর্মযোগে অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করতে হয়। আসক্তিরই নাম রাগ। গোড়ায় তা' থাকে। সুতরাং, অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে অভ্যাস করতে হবে। ক'রে ক'রে যখন অনা-সক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবো, তখনই কর্মযোগের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হবে। কিন্তু এরূপ করা কঠিন। ঠাকুর একথা এর পরেই বলবেন। কর্মযোগ—স্বাভাবিক কর্ম বা শাস্ত্রীয় কর্ম ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করা কঠিন। শাস্ত্রীয় কর্ম—বিধিনিষেধাত্মক কর্ম—এত বিশাল তার ক্ষেত্র যে, সাধারণ মানুষ চেষ্টা করেও তা করতে পারে না। শাস্ত্র বলছেন, ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠবে। তারপর কি কি করবে সে-সম্পর্কে প্রত্যেক মুহূর্তে শাস্ত্র মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করছেন। এত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করছেন যে, মহাশক্তিশালী লোকও হাঁপিয়ে যায়। এইজন্য শাস্ত্রীয় কর্ম করা বড় কঠিন। একে তো লৌকিক কর্মেরই চাহিদা মেটাতে আমরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, তার উপরে শাস্ত্রের চাহিদা মেটাতে গেলে আর আমাদের ধৈর্য ও সামর্থ্য থাকে না।

পরিণাম কী দাঁড়াচ্ছে? না, লৌকিক কর্মও ঠিক মত হচ্ছে না, শাস্ত্রীয় কর্মও ঠিকমত হচ্ছে না। সুতরাং কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম-গুণ-কীর্তন ক'রে তাঁতে মন রাখা—এই ভক্তিযোগ খুব সহজ পথ। তাই ঠাকুর বলছেন ভক্তিযোগই যুগধর্ম। এই যুগের পক্ষে উপযোগী ধর্ম - জ্ঞানযোগও নয়, কর্মযোগও নয়। জ্ঞানযোগেরও আমাদের সামর্থ্য নেই, কর্ম-যোগেরও আমাদের সামর্থ্য নেই। ভক্তিযোগের সামর্থ্য আছে? তাঁর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে থাকার সামর্থ্য আমাদের আছে? নেই। কিন্তু তা অভ্যাস করতে পারি। এবং সেটা অপেক্ষা-কৃত সহজ। আমাদের আরো সহজ করে দেওয়া হয়েছে—বলা হয়েছে, 'হেলয়া শ্রদ্ধয়াপি বা'—হেলা ক'রে বা শ্রদ্ধা ক'রে ভগবানের নাম করলেও নামের ফল হবেই। তাছাড়া এই করার ভিতরে গোড়া থেকেই অন্তরে স্বাদ পাওয়া যায়। তাঁর আকর্ষণ মানুষ অনুভব করে, তাতে সহজে এগিয়ে যেতে পারে। এইজন্য ভক্তিযোগই যুগধর্ম।

ভাগবতে জ্ঞানযোগ কর্মযোগ ও ভক্তি-যোগের অধিকারী সম্পর্কে আলোচনা আছে। সেখানে বলা হয়েছে :

নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
(১১।২০।৭,৮)

—যাঁরা অতিশয় বৈরাগ্যবান, সমস্ত বিষয়ে যাঁদের তীব্র বৈরাগ্য হয়েছে, সুতরাং যাঁরা সমস্ত কর্মকে পরিত্যাগ করেছেন—সমস্ত কর্ম মানে ইহকালে ও পরকালে যে কোন ভোগের উপায়-রূপ যে কর্ম, সে সমস্ত কর্মকে পরিত্যাগ করেছেন—তাঁরাই জ্ঞানযোগের অধিকারী।

এই ছোট্ট ব্যাখ্যা থেকে আমরা বুঝতে পারি জ্ঞানযোগের অধিকারী কত বিরল। তার পরে বলছেন কর্মযোগের অধিকারীর কথা। কর্ম সম্বন্ধে যাঁদের চিত্তে বৈরাগ্য আসে নি, সেই কামনাপরায়ণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মযোগ। কেন না তাঁরা কর্ম করবেনই। সেই কর্ম যদি তাঁরা যোগেতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য করেন, তা হলে তাঁদের পক্ষে কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। কর্ম তাঁরা ছাড়তে পারছেন না। কর্মে তাঁরা নিযুক্ত হয়ে আছেন। বৈরাগ্য তাঁদের নেই। শাস্ত্র বলছেন, আচ্ছা, কর্ম কোরছো, করো; কিন্তু এমন একটি কৌশল ব'লে দিচ্ছি, যে কৌশলে কর্ম করলে, কর্ম তোমার বন্ধনের কারণ হবে না। সুতরাং এই কৌশল ক'রে যে কর্ম করা এটির নাম কর্মযোগ। যাঁরা তীব্র বৈরাগ্যবান নন এবং তীব্র কর্মের জন্য যাঁরা সব কিছু নস্যাৎ ক'রে দিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন না, তাঁদের জন্যে কর্মযোগের বিধান। আর, ভক্তিযোগ কার জন্যে? 'যদৃচ্ছয়া'—কোনক্রমে ভগবৎকৃপায়ই হোক বা তাঁর পূর্ব সুকৃতিবশেই হোক, ভগবানের কথা প্রভৃতিতে যাঁর শ্রদ্ধা জেগেছে, যিনি জ্ঞানীদের মতো অত্যন্ত বৈরাগ্যবানও নন, আবার কর্মীদের মতো অত্যন্ত আসক্তও নন, তাঁর জন্য ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগেই তাঁর সিদ্ধিলাভ হয়।

এটি হচ্ছে মধ্যম পন্থা—তীব্র বৈরাগ্যেরও নয়, আবার তীব্র আসক্তিরও পন্থা নয়। দুই-এর মাঝামাঝি। ভগবানের পথের পথিক যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই এই মাঝামাঝি পর্যায়ে পড়ে যান। অত্যন্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তির কর্মযোগ ছাড়া কোন গতি নেই। আর অত্যন্ত বৈরাগ্য বান যিনি, তিনি এক কথায় সংসারকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে, মাত্র বিচারের দ্বারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন। সুতরাং জ্ঞানযোগই তাঁর পথ। কিন্তু মধ্যবর্তী যাঁরা, তীব্র বৈরাগ্যও নেই আবার অত্যন্ত বিষয়াসক্তিতে ডুবে রয়েছেন এমনও নন, তাঁরাই ভক্তিযোগী।

ঠাকুর বলছেন, ভক্তিযোগই যুগধর্ম। যুগধর্ম কেন? না, যে-যুগে বেশীর ভাগ মানুষ যে-ভাবাপন্ন হয়, সেই যুগকে সেই ভাবের দ্বারা বিশেষিত করা হয়। যে-যুগে অধিকাংশ মানুষ সত্ত্বগুণী, তাকে সত্যযুগ বলে। যে-যুগে অধিকাংশ মানুষ রজোগুণী, তাকে ত্রেতাযুগ বা দ্বাপর যুগ বলে। আর যে-যুগে অধিকাংশ মানুষ তমোগুণী, তাকে কলিযুগ বলা হয়। ভাগবতে বলা হয়েছে, সত্যযুগে মানুষ শান্ত নির্বৈর সমদর্শী হয়ে তপস্যা ও শমদমাদি সাধন অবলম্বন করেন, ত্রেতাযুগে মানুষ বেদত্রয়োক্ত কর্মানুষ্ঠান করেন, দ্বাপরে তাঁরা বৈদিক ও তান্ত্রিক কর্মানুষ্ঠান করেন এবং কলিযুগে সঙ্কীর্তনরূপ যজ্ঞ করেন। (১১।৫।২২, ২৫, ২৮, ৩২)

কলিযুগটা যদি অত্যন্ত তমোময় যুগই হয়, তবে ভক্তি হ'বে কেমন করে? তার উত্তর হচ্ছে, যেহেতু এখন মানুষের বৈদিক তান্ত্রিক কর্ম করবার সামর্থ্য নেই, জ্ঞানের অনুশীলন করবার মত শুদ্ধিও নেই, সেহেতু তার ভক্তিযোগী না হ'য়ে অন্য উপায় নেই। ঠাকুর বলেছেন, আজকাল আর দশমূল পাঁচনে চলে না—এখন ডি. গুপ্ত। তখন ম্যালেরিয়ার সময় ছিল, চারিদিকে জ্বরজ্বারি হ'তো, কবিরাজের কাছে গেলে, দশমূল পাঁচন বিধান করতেন। সে পাঁচনের দশটি মূল—দশটি মূল সংগ্রহ করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে, আবার দশটি মূল যদি বা যোগাড় হোল, তা সিদ্ধ করতে হবে। এদিকে রোগীর হয়ে যায়। কাজেই ডি. গুপ্ত। বোতলে ভরা ওষুধ আছে, খাও। দু-চার দাগ খেলে জ্বর ছেড়ে যাবে। অর্থাৎ ঠাকুর বলছেন যে, এ যুগে আগের মতো যোগ-যাগ-তপস্যা

করা সম্ভব হবে না। কলির জীব অন্নগতপ্রাণ, দুর্বল মন—ভগবানের নাম করাই এ যুগের পথ এখন আর লোকের বিশাল কর্ম করার সামর্থ্য নেই। তাছাড়া জীবিকার জন্য মানুষ এত ব্যতিব্যস্ত যে, এই সব যাগাদি কর্ম করার তার সময়ও নেই, ঐশ্বর্যও নেই। ঐশ্বর্যও দরকার হ'তো। প্রভূত ঐশ্বর্যের দরকার হ'তো। তাও নেই। যাদের ঐশ্বর্য আছে, তাদের আবার ওসব করবার ইচ্ছাই নেই। আবার তীব্র বৈরাগ্য না থাকায় জ্ঞানযোগে অধিকারও নেই। সুতরাং কলিযুগে ভক্তিযোগই যুগধর্ম। যে-যুগে মানুষ বহুল পরিমাণে যে ধর্মে অধিকারী হয়, সেইটি সে যুগের ধর্ম। এইজন্য ঠাকুর বলেছেন, ভক্তিযোগই যুগধর্ম।

ভগবানের নাম করো, তাঁর গুণগান করো। আর যতটুকু পারো শুদ্ধভাবে থাকতে চেষ্টা করো। গোড়ায় সব কথা বলা হয় না। বলা হয়, হেলায় হোক, শ্রদ্ধায় হোক, ভগবানের নাম করো—নামের গুণে উদ্ধার পাবে।

নাম করতে যখন আরম্ভ করলো, তখন বলা হ'ল, একি করছো নাম ক'রে যাচ্ছো, কিন্তু এত বিষয়াসক্ত কেন? নাম ঠিক ঠিক হচ্ছে না; ঠিকভাবে নাম করো; সমস্ত মন দিয়ে একাগ্র হ'য়ে নাম করো।

এই রকম একটু একটু ক'রেই বলা হয়। গোড়ায় বলা হয়, কোনরকম ভাবে করলেই হয়; দেখ না অজামিল শেষকালে তার ছেলে 'নারায়ণে'র নাম করেছিল, তাতেই উদ্ধার হ'য়ে গেল। যখন বলে, আচ্ছা শেষ কালেই না হয় নাম করা যাবে! তখন বলা হয়, আগে থেকে অভ্যাস না করলে কি শেষকালে করতে পারবে? নিত্য অভ্যাস করো। তারপর যখন নাম অভ্যাস করছে, অথচ নিজেকে 'পাপী' 'পাপী' বলছে, তখন বলা হয়, নামে বিশ্বাস থাকা চাই—তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ!—এরকম দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে নাম করো। আরও বলা হয়, দেখো যেন নামাপরাধ না হয়। আচরণের শুদ্ধি হ'লে তবে নামাপরাধ থেকে রেহাই পাবে। সুতরাং এইভাবে একটু একটু ক'রে বলা হয় ব'লেই ভক্তিযোগ সহজ সাধন-পথ। তার মানে এই নয় যে, সকলেই পরাভক্তি লাভ করবে। মানে এই যে, আরম্ভ করতে সকলেই পারে—এ সামর্থ্য সকলেরই আছে। তারপর যেমন যেমন সে এগোবে,—তেমন তেমন, যাকে বলে 'টাইট' করা, তা-ই করা হবে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাকে বলা হবে এত করলে আরও একটু এগোও। এটি হচ্ছে মানুষের মনের পক্ষে খুব সহজ ও স্বাভাবিক উপায়। এইজন্য ঠাকুর বলছেন, 'কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।'*

* ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-আলোচনা। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

জীবনদর্শন

উপক্রমণিকা

শ্রীহরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী*

'জীবনদর্শন'—এই সামাসিক পদ বহ্বর্থ-সূচক। বস্তুতঃ ইহা বিংশ শতাব্দীতে বর্তমান যুগের অভিনব পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের[১] প্রেরণায় অধুনাতন প্রয়োগ—বিশেষ পারিভাষিক অর্থে পরিকল্পিত। 'জীবনদর্শন' বলিতে সহজ, সরল ভাষায় বুঝায় মানবজীবনসংক্রান্ত কতিপয় মূল প্রশ্নাবলীর দার্শনিক বিচার এবং সমীক্ষা। মুখ্যতঃ ভারতীয় জীবনবাদ এবং ভারতীয় দর্শন অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত; এবং এই উভয়ের নানাবিধ আনুষঙ্গিক এবং ব্যাবহারিক বিষয়-ক্ষেত্রে মূলগত প্রশ্ন এবং সমস্যাসমূহের সমাধান-কল্পে বিবিধ তত্ত্ব-প্রতিজ্ঞার সমন্বয় ও সম্মিশ্রণের ফলে এই জীবনদর্শনের উৎপত্তি ঘটিয়াছে বলা চলে। এতদ্-বিষয়ক ইউরোপীয় দর্শন এবং দার্শনিক বিচারপদ্ধতি বিশেষভাবে প্রণিধানার্হ। এই স্থলে প্রথমেই 'জীবন' এবং 'দর্শন' - এই যৌগিক শব্দদ্বয় কি কি অর্থে রূঢ় এবং 'জীবন-দর্শন' কি অর্থে কিরূপ বিকাশলাভ করিয়াছে বলা চলে এবং মূলীভূত দর্শনের ক্ষেত্রে তাহার স্থান কিরূপ—তাহা ভারতের আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জীবনের স্বরূপ এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য করিয়া সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

জীব ও জীবন

ভারতীয় দর্শনে এবং ধর্মশাস্ত্রে জীবন বলিতে জীবের সংসার-দশাই সূচিত হইয়াছে। সংসার দ্বিবিধ: (১) জগদ্রূপ সংসার যাহার মূল নিমিত্ত ও উপাদান কারণ 'ব্রহ্ম' (অদ্বৈতবাদ), 'জগদীশ্বর' (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ) এবং (২) জীবের সংসার। এই জগদ্রূপ সংসার 'অশ্বত্থ'স্বরূপ[২]—ইহার মূল উর্ধ্বে এবং শাখাসমূহ অধোদেশে অর্থাৎ নিম্নে প্রসারিত এবং যিনি এই মায়াময় সংসারবৃক্ষের মূল, তিনি শুক্র (শুভ্র, জ্যোতির্ময়) অমৃত পুরুষ, ব্রহ্ম।[৩] এই জগদ্রূপ সংসারে প্রত্যেক জীবের পৃথক্ পৃথক্ সংসারদশা রহিয়াছে; এবং এই রোগশোকাকুল সংসার-দশায় আবদ্ধ জীব কিভাবে ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে—অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি, 'বিপ্রমোক্ষ' ঘটিতে পারে—তাহাই জীবের জীবনের নিগূঢ়তম রহস্য; এবং ইহাই পারমার্থিক লক্ষ্য। প্রাণভৃৎ দেহীমাত্রই জীব

* এম. এ., ধর্মতত্ত্বাচার্য, ডক্টর ফিল্, (বার্লিন)। গ্রন্থকার।

১ তুলনীয় জার্মান 'Lebensphilosophie' এবং বহুলাংশে তদনুযায়ী ফ্রেঞ্চ 'Philosophie de la vie' এবং ইংরেজী 'Philosophy of Life'.

২ ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥ কঠ উপনিষৎ, ২।৩।১
ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্ অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ইত্যাদি। ভগবদ্গীতা, ১৫।১-২
আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করেন যে, বিশ্বসংসার ক্ষণপ্রধ্বংসী (অদ্য আছে, কল্য নাই—অ+শ্বত্থ), এই অর্থে অশ্বত্থবৃক্ষরূপে উপমিত হইয়াছে।

৩ দ্রষ্টব্য—সংসারবৃক্ষের বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য লেখক কর্তৃক বিরচিত 'অমৃতের সন্ধান' (উপনিষদের সারমর্ম) নামক গ্রন্থে সংসাররহস্য শীর্ষক অধ্যায়। (কলিকাতা, ১৩৬৩)।

অর্থাৎ জীব বলিতে বিশ্বজগতের যাবতীয় প্রাণী বুঝায়। জীব চতুর্বিধ : (১) জরায়ুজ (মনুষ্য, পশু প্রভৃতি), (২) অণ্ডজ (পক্ষী প্রভৃতি), (৩) উদ্ভিজ্জ (নানাবিধ উদ্ভিদ) এবং (৪) স্বেদজ (মশক, মক্ষিকা প্রভৃতি)—অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি সমস্তই জীবসংজ্ঞাবাচ্য। স্বীয় কর্মফল ভোগের নিমিত্ত জীব স্বকর্ম ও জ্ঞান অনুযায়ী বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন যোনিতে নানা প্রকার বিভিন্ন দেহে সংসারাবর্তে নিপতিত হয়, পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতে থাকে এবং মোক্ষলাভ না হওয়া পর্যন্ত জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া তাহার সংসারদশা চলিতে থাকে।[৪] কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার (প্রলয়) মূলক বিশ্বসংসারের স্রোতঃপ্রবাহ অনাদি অনন্ত —ইহা যেন বিশ্বসংসারের অধিপতির নির্নিমিত্ত লীলাস্বরূপ। এই স্থলে জীবের স্বরূপ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা আলোচ্য নহে; তাহার জীবন বা জীবদ্দশা সম্পর্কে কতিপয় মূল প্রশ্নাবলীই বিচার্য।

পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তানুসারে জীবন এবং জীব বলিতে বুঝায় : পরিবেশে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ামূলক যে কোন প্রকার সত্তা-প্রবাহ যাহার উৎপাদিকা শক্তি (প্রাণ) আছে; এবং যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক সত্তার লক্ষণে প্রাণ-ভৃৎ, তাহাই প্রাণী, জীব। প্রাণিজীবন তথা সচেতন জীবজীবন মূলতঃ কিভাবে সঞ্চালিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই সম্বন্ধে বহুধা মতানৈক্য, বিপ্রতিপত্তি রহিয়াছে। তবে তাহা ভারতীয় কর্মবাদমূলক, জন্মনিয়ন্ত্রণসূচক জন্মান্তর মতবাদ নহে, যদ্যপি নানাকারণবশতঃ পারম্পর্যাগত নিয়ন্ত্রণ-(hereditary control) বাদ স্বীকৃত হইয়াছে। কিভাবে আদিতে জীবনের উৎপত্তি ঘটিয়াছে তাহা বহুলাংশে অনির্ণেয়; এবং সগুণ ব্রহ্ম বা জগদীশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি স্বীকার করিলেও এই সৃষ্টি প্রহেলিকা। এই বিশ্বজগতের উপাদান আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আবর্তমান বিদ্যুৎকেন্দ্র (ইলেকট্রন্); এবং নিরন্তর ইহাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক সম্মিশ্রণ-বিশ্লেষণ-জনিত বিকারাত্মক সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়াছে। এই প্রবহনশীল জীবনস্রোতঃ নিয়ন্ত্রণ-মূলক কিনা তাহা বলা যায় না এবং পাশ্চাত্য জীবনদর্শন বহুলাংশে যুক্তি-পরীক্ষামূলক জ্ঞান অর্থে আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপন্থী; তাহা খণ্ডশঃ এবং অংশতঃ প্রতিভাসমান, যদ্যপি সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটিতে থাকে এবং যুগে যুগে নব নব সংস্কৃতির অভ্যুদয় ঘটে[৫]। পাশ্চাত্য জীবন-দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, জীবনের মূল্য জীবনের সার্থকতা ও অভ্যুদয় দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও বিবেচিত হয় এবং জীবনের লিঙ্গ আপেক্ষিক—মানবের সংস্কৃতিতে তাহার

৪ যথা :—যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥ কঠ উপ. ২।২।৭
দ্রঃ বৃহ. আ. উপনিষৎ ৪।৩।৯; ছা. উপ. ৬।১০।২

মুমূর্ষুর জ্ঞান ও কর্ম অনুসারে দেহ হইতে প্রাণের ইন্দ্রিয়বর্গসহ উৎক্রমণ ঘটে এবং প্রাক্‌কালীন সংস্কার সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিয়া থাকে ("……তদ্ বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ)। (বৃ. আ. উপ. ৪।৪।২)

৫ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য জার্মান মনীষী Oswald Spengler এর গ্রন্থ 'Untergang des Abendlandes' (প্রাদোষিক দেশের অধঃপতন, ইং, Downfall of the Evening Land)

বিকাশ ও অভিব্যক্তি। যথাস্থলে এবংবিধ মতবাদের আলোচনা করা হইবে।

উপনিষৎ-শাস্ত্রে 'দর্শন' শব্দার্থ

সম্প্রতি উপনিষৎ-শাস্ত্রে কি অর্থে 'দর্শন' শব্দ রূঢ় এবং মৌলিক, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কিভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং পরবর্তী কালে কি ভাবে দর্শনশাস্ত্রের পারিভাষিক সংজ্ঞা 'দর্শন' দাঁড়াইয়াছে, এবং 'দর্শন' শব্দটি কিরূপ অর্থসূচক—তাহাই এইস্থলে বিচার্য। এই অতিগহন, পরমনিগূঢ় উপনিষৎ-শাস্ত্র প্রাগ্-বৌদ্ধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া খণ্ডশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে কিংবা পরবর্তী কালে চরম আকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। তৎপূর্বে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ঋগ্বেদে[৬] মাত্র কয়েকটি স্থলে 'দর্শন' শব্দ যৌগিক অর্থে অর্থাৎ বীক্ষণ নিরীক্ষণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অথর্ববেদে[৭] কতিপয় স্থলে 'দর্শন' শব্দের উপলব্ধি অর্থে প্রয়োগ রহিয়াছে। উপনিষৎ-শাস্ত্রে প্রাচীনতম বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সকল স্থলে 'দর্শন' শব্দের রূঢ় প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহাদের প্রয়োগ সমীক্ষাপূর্ব্বক অর্থ নিরূপণ করিয়া দেখান হইতেছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে 'দর্শন' শব্দ আদিতে 'আত্মদর্শন' অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি (আত্ম-সাযুজ্যলাভ) অর্থেই অধিকাংশ স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে; ইহা ঐন্দ্রিয়ক চাক্ষুষব্যাপার-জনিত দর্শন নহে। প্রথমেই একটি লাক্ষণিক ঔপচারিক প্রয়োগ উল্লেখ করা হইতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ[৮] বলেন যে, (ধ্যানাবস্থায়) অক্ষিতে যে পুরুষের 'দর্শন' হয় (ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়, কেননা তিনি বস্তুতঃ অদৃশ্য), তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম অর্থাৎ নিবৃত্তচক্ষু বিবেকী পুরুষগণ আত্মোপলব্ধি ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া থাকেন। তিনিই 'চক্ষুষশ্চক্ষুঃ' (চক্ষুর চক্ষু) ব্রহ্ম, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এবং তিনিই ঈক্ষিতৃরূপে 'দর্শন' করিয়া আপনাকে বহুরূপে প্রজনন করিলেন।[৯] তিনি সর্বভূতের অণ্ডজ, জীবজ এবং উদ্ভিজ্জ এই ত্রিবিধ দেবতাত্মক বীজস্বরূপ জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্যাকৃত করিলেন।[১০] এই ত্র্যাত্মক মূলই সত্য—অন্য সবকিছু বাঙ্‌মাত্র, বিকার-বিশেষ, 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্'।[১১] তিনিই 'ভূমা'—যেখানে প্রকৃত দ্রষ্টা অন্য কিছু 'দর্শন' করেন না, শ্রবণ করেন না, জানেন না,[১২] অর্থাৎ তাঁহার অনুরূপ দর্শন প্রতিষেধপূর্ব্বক 'আত্মদর্শন' লাভ হয়। আত্মাই যাবতীয় কিছু এবং তাঁহাকেই 'দর্শন' করিয়া, তাঁহাকেই মনন করিয়া, তাঁহার বিজ্ঞানলাভ করিয়া তিনি 'আত্মরতি', 'আত্মানন্দ', 'স্বরাট্' হইয়া থাকেন।[১৩]

৬ যথা: ঋগ্বেদসংহিতা, ১।১১৬।১১, ২৩; ৫।৮০।২

৭ তুলনীয়: আপশ্যতি প্রতি পশ্যতি পরা পশ্যতি পশ্যতি।
দিবমন্তরীক্ষমাদ্ভূমিং সর্বং তদ্দেবি পশ্যতি॥　অ. বে. সংহিতা, ৪।২০।১
দর্শোঽসি দর্শতোঽসি সমগ্রোঽসি সমন্তঃ।　„　, ৭।৮৬।৪

৮ 'য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি'।
ছা. উপ. ৪।১৫।১, ৮।৭।৪

৯ 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি…।'
ছা. উপ. ৬।২।২-৩

১০ ছা. উপ. ৬।৩।১-৪　১১ ছা. উপ. ৬।৪।১-৪　১২ ছা. উপ. ৭।২৪।১

১৩ 'আত্মৈবেদং সর্বমিতি স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি।' ছা. উপ. ৭।২৫।২

এবংবিধ তত্ত্বদর্শী রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি কিছুই দেখিতে পান না অথচ তিনি সবই দেখিয়া থাকেন। 'সৎ' (যাহা নিত্য অস্তিত্বশীল) যথাবগত হইলে ধ্রুবা অবিচ্ছিন্না স্মৃতি জন্মে এবং তাহা হইতে হৃদয়-গ্রন্থিসমূহ বিনষ্ট হয়—ইহাই ভগবান্ সনৎকুমার 'মৃদিতকষায়' (যাঁহার সমস্ত দোষ জ্ঞান ও বৈরাগ্যদ্বারা ক্ষালিত হইয়াছে) নারদকে পরমার্থতত্ত্ব, অন্ধকারের পরপার (তমসস্পারম্) প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তিনি কিছু ভোগ্য বস্তু দর্শন করেন না।[১৪] তিনি দৈব চক্ষু দ্বারা মনঃসংযোগে কাম্য দর্শন করিয়া ব্রহ্মলোকে রমণ (আনন্দের সহিত বিহার) করেন।[১৫]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মোপলব্ধি অর্থে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। উপনিষদের ঋষি 'দর্শন' করিয়া বলিলেন—তিনি (ইন্দ্র, পরমেশ্বর) স্বরূপ প্রতিদর্শনের জন্য রূপে রূপে প্রতিরূপ হইলেন এবং তিনি তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা বহুরূপে প্রকটিত হইলেন (বস্তুতঃ নহে)।[১৬] অন্য কিছু নাই (নেহ নানাস্তি কিঞ্চন)—ইহা মনের দ্বারা অনুদ্রষ্টব্য (উপলব্ধব্য)। যিনি নানা 'দর্শন' করেন, তিনি মৃত্যু হইতে পুনর্মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে থাকেন। সেই নিত্য অপ্রমেয় একই রূপে অনুদ্রষ্টব্য। আকাশ হইতে পরম জ্যায়ান্—সেই অজ, বিরজ, মহান্, সনাতন আত্মা; যাঁহারা ইহা জানেন, উপলব্ধি করেন, তাঁহারা শান্ত, সংযত, তিতিক্ষু, উপরত ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে 'আত্মদর্শন' (আত্মোপলব্ধি) করেন, সমস্ত কিছুই আত্মা বলিয়া দর্শন করেন।[১৭] যাঁহাদের 'আত্মদর্শন' হয় না, তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না।[১৮] আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, ধ্যাতব্য (নিদিধ্যাসিতব্য)—'আত্মদর্শন', আত্মশ্রবণ, আত্মমনন, আত্মবিজ্ঞান লাভ হইলে সমস্তই বিদিত হয়—ইহা যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে ঋষি কর্তৃক মৈত্রেয়ীকে অনুশাসন দেওয়া হইয়াছে।[১৯] যেখানে যেন দ্বৈতবোধ হয়, সেখানেই একে অপরকে দেখে, আঘ্রাণ করে, শ্রবণ করে—যাহা দ্বারা সব কিছু বিজ্ঞাত হয়, কিসের দ্বারা সেই বিজ্ঞাতাকে জানিবে? দৃষ্টির দ্রষ্টাকে, শ্রুতির শ্রোতাকে, মননের

১৪ 'তস্য হ বা এতস্যৈবং পশ্যত এবং মন্বানস্যৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণঃ· ··ইদং সর্বমিতি।' ছা. উপ. ৭।২৬।১

'···সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি······সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষস্তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ···।' ছা. উপ. ৭।২৬।২

১৫ 'স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে য এতে ব্রহ্মলোকে···।' ছা. উপ. ৮।১২।৫

১৬ 'তদেতদৃষিঃ পশ্যন্নবোচদ্রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। বৃ. আ. উপ ২।৫।১৯

১৭ মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥
একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥ বৃ. আ. উপ. ৪।৪।১৯-২০

১৮ বৃ. আ. উপ. ৪।৩।১৪, ৪।৩।২৩, তুলনীয় বৃ. আ. উপ. ৪।৪।২

১৯ 'আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্।' বৃ. আ. উপ. ৪।৫।৬

মন্তাকে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না; এই আত্মা সর্বান্তর।[২০] শ্রুতি বলেন এই সত্যের মুখ হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা আবৃত রহিয়াছে; হে পূষণ, সত্যধর্মদর্শনের জন্য তাহা তুমি অপনয়ন কর।[২১]

ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ব্যতীত অন্যান্য প্রধান উপনিষদে কি স্থলে কি ভাবে 'দর্শন' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বিচার করা হইতেছে। ঈশোপনিষদে 'দর্শন' বলিতে কি বুঝায় তাহা সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি আত্মাতে সর্বভূত 'দর্শন' করেন এবং সর্বভূতে আত্মাকে 'দর্শন' করেন, তাঁহার বিজুগুপ্সা (ঘৃণা) থাকে না। যাঁহাতে সর্বভূত আত্মবৎ জ্ঞান হয়, সেখানে আত্মার একত্ব 'দর্শন' (উপলব্ধি) করিয়া কোথায় মোহ, কোথায় শোক থাকে—অর্থাৎ উহা নির্মূল হয়।[২২] যাঁহারা (যে আচার্যগণ) ইহা 'দর্শন' করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'বিদ্যার' (জ্ঞানের) ফল এবং 'অবিদ্যার' (কর্মের) ফল পৃথক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং কর্মানুষ্ঠান দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমৃত ভোগ করেন।[২৩] তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা (যেন) দর্শন করি সেই 'পুরুষ' অর্থাৎ যিনি সর্বব্যাপক সর্বপ্রসারী আমিই তিনি, 'সোঽহমস্মি'।[২৪] যাঁহার (চক্ষু দ্বারা) দর্শন-লাভ হয় না, যিনি চক্ষুসমূহ দেখেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে—যাঁহাকে তুমি উপাসনা করিতেছ, তিনি নহেন।[২৫] যিনি ধর্মাধর্মের অতীত, কার্যাকার্যের ঊর্ধ্বে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই ত্রিকালাতীত—তাঁহাকে নিষ্কাম পুরুষ বীতশোক হইয়া ধাতুপ্রসাদ-হেতু সাক্ষাৎ 'দর্শন' করেন।[২৬] যেমন দুর্গম প্রদেশে বর্ষিত বারি নিম্নস্থ প্রদেশে প্রবাহিত হয়, তেমনি যিনি আত্মা হইতে ধর্মসমূহ (জগদ্‌বিধায়ক উপাদান-সমূহ) প্রতিদেহে পৃথক্ দর্শন করেন, তিনি দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করেন। এক নিয়ামক

২০ 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি······বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ—।'
বৃ. আ. উপ. ২।৪।১৪
তুলনীয় „ „ ৪।৫।১৫
'ন দৃষ্টে র্দ্রষ্টারং পশ্যে র্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং···এষ তে আত্মা সর্বান্তরঃ—।'
বৃ. আ. উপ. ৩।৪।২

২১ হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥ বৃ আ. উপ. ৫।১৫।১

২২ 'যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ঈশ উপ. ৬, ৭

২৩ দ্রঃ ঈশ উপ. ১০-১৪

২৪ '··· যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।'
ঈশ উপ. ১৬
(পূর্ণং বানেন প্রাণবুদ্ধ্যাত্মনা জগৎ সমস্তমিতি পুরুষঃ পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ -
শাঙ্কর ভাষ্য)

২৫ কেন উপ. ১।৭

২৬ কঠ উপ. ১।২।২০

সর্বভূতান্তরাত্মা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা একই রূপকে বহুধা (অনেক প্রকার) নির্মাণ করেন, যে ধীমান্ ব্যক্তি তাঁহাকে হৃদয়াকাশে বুদ্ধিতে চৈতন্যাকারে অভিব্যক্ত 'দর্শন' করেন, তাঁহার সুখ শাশ্বত, অন্যদের নহে; তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা 'দর্শন' করা যায় না, মন সংযত নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়। তুরীয়ে নিশ্চিতমনা (নিমগ্ন) ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। যাহা কিছু তৎসমস্তই সচরাচর জগৎ 'মনোদৃশ্য'। তত্ত্বদর্শী বাহ্যতঃ সমস্ত কিছুই আধ্যাত্মিক সত্তা দর্শন করিয়া 'তত্ত্বীভূত' (তত্ত্বে মন-সংযোগ-পূর্বক অনুধ্যান অর্থাৎ সত্যের স্বরূপ অনুশীলন করিতে করিতে আত্মভূত) হইয়া তত্ত্ব হইতে অপ্রচ্যুত হন, অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। যাহা 'চিত্তদৃশ্য' তাহা উৎপন্ন হয় না, তাহার উৎপত্তি যাঁহারা দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা অদৃশ্য বস্তু আকাশে দর্শন করেন, কেন না যাহা 'চিত্তদৃশ্য' তাহা 'অবস্তুক' (সত্তাবিহীন)।[২৭]

ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে 'দর্শন' শব্দার্থ

সম্প্রতি ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে 'দর্শন' শব্দের এবংবিধ রূঢ় প্রয়োগ কিরূপ আছে, তাহা নিরূপণ করা হইতেছে। শ্রীভগবান্ 'ভূতভাবন' (যাবতীয় ভূতবর্গের উৎপাদক), 'ভূতভৃৎ' (ভূতবর্গের পোষক); কিন্তু তিনি 'ভূতস্থ' (ভূতবর্গে অন্তঃস্থ) নহেন। তিনি অর্জুনকে তাঁহার দিব্য 'ঐশ্বরযোগ' দেখাইতে চাহিয়াছেন, যাহা শত সহস্ররূপে নানাবিধ; এবং অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, কৃৎস্ন (সমগ্র) চরাচর[২৮] জগৎ সমস্ত কিছুই অর্জুন তাঁহার দিব্য দেহে 'দর্শন' করিতে পাইবেন। এবংবিধ রূপ দর্শনের জন্য অর্জুনকে দিব্যচক্ষু দেওয়া হইতেছে কেননা অর্জুন তাঁহার স্বচক্ষুদ্বারা ইহা 'দর্শন' করিতে পারিবেন না এবং তিনি চিত্তের চাঞ্চল্যহেতু সাম্যভাব অনুশীলন করিতে পারেন না এবং শ্রীভগবদ্রূপ দর্শন লাভ হয় না।[২৯] সর্বভূতের (সর্বপ্রাণীর) নিকট অর্থাৎ অজ্ঞদের নিকট যাহা নিশাতুল্য, সেই ঘোর রজনীতে সংযমী পুরুষ জাগ্রত থাকেন; এবং যখন সর্বভূত জাগ্রত থাকে, তখন তাহা দ্রষ্টা মুনির (মননশীল পুরুষের) নিকট রাত্রিস্বরূপ[৩০] অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব অজ্ঞদের নিকট অন্ধকার রাত্রির ন্যায় অগোচর। যোগযুক্ত সমদর্শী পুরুষ সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি করেন এবং আত্মাতে সর্বভূত 'দর্শন' (উপলব্ধি) করিয়া থাকেন। যিনি সর্বত্র ভগবৎ-সত্তা 'দর্শন' (উপলব্ধি) করেন এবং সমস্ত কিছু সমভাবে শ্রীভগবানে অবস্থিত বলিয়া 'দর্শন' (উপলব্ধি) করিতে পারেন, তাঁহার বিনাশ নাই।[৩১] ('উপলব্ধি' শব্দের যৌগিক অর্থ 'সাযুজ্যলাভ' এবং এই সকল স্থলে 'দর্শন' শব্দ ঈদৃশ অর্থ-

২৭ দ্রঃ মুণ্ডক উপ. ১।১।৬, ১।২।৭, ৩।১।২-৫, ৩।১।৭-৮
বিশেষভাবে—মাণ্ডূক্যকারিকা, ২।৩৮; ৩।২৮।৩১; ৩।৩১-৩৬

২৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯।৫, ১১।৫

২৯ " ১১।৫-৮; ৬।৩২-৩৩

৩০ 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ভ. গী. ২।৬৯

৩১ ভ. গী. ৬।৩০, ১৩।২৭-২৯

সূচক)। এই 'আত্মদর্শনে'র বিকল্প সাধনমার্গ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলেন, কেহ কেহ ধ্যানযোগে আত্মার দ্বারা আত্মাতে 'আত্মদর্শন' করেন, আবার কেহ কেহ জ্ঞানযোগের কিংবা কর্ম-যোগের দ্বারা আত্মোপলব্ধি করেন।[৩২] নির্গুণ বলিয়া পরমাত্মা অকর্তা হইলেও এবং মায়া বা প্রকৃতির দ্বারা সমস্ত ক্রিয়মাণ হইলেও তাঁহার 'দর্শন' লাভ হয়।[৩৩] বিমূঢ় অবিবেকী ব্যক্তিগণ তাহা 'দর্শন' করিতে পারে না—যাঁহারা চক্ষুষ্মান, তাদৃশ যোগিগণ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত কিছু 'দর্শন' লাভ করেন।[৩৪]

আত্মদর্শন (আত্মোপলব্ধি); পাশ্চাত্য দর্শনের স্বরূপ

উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপনিষচ্ছাস্ত্রে তথা ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে 'দর্শন' শব্দ 'আত্মদর্শন' অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি (আত্মার সাযুজ্যলাভ) অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'উপলব্ধি' শব্দের মূল অর্থই সাযুজ্যলাভ। সম্প্রতি এই স্থলে অতি সংক্ষেপে পাশ্চাত্য দর্শনে 'দর্শনে'র লক্ষণ সম্বন্ধে ঈষৎ আভাস দেওয়া হইতেছে। অতঃপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 'জীবনদর্শন' সম্বন্ধে বিচার আলোচনা করা হইবে। পাশ্চাত্য দর্শনে দর্শন বলিতে বুঝায় জীব ও বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে বিবিধ প্রাকৃতিক ও জৈব বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্তাবলীর সমন্বয়মূলক বিশ্ববোধ বা বিশ্বদৃষ্টি (অর্থাৎ বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দার্শনিক পদ্ধতিতে যতদূর সম্ভব সমন্বিত মতবাদ) এবং জীবনবোধ বা জীবনদৃষ্টি (জীবন সম্বন্ধে তাদৃশ মতবাদ) এবং বিশ্ববোধ ও জীবন-বোধ—এই উভয়ের সমীক্ষা। বিংশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ জার্মান দার্শনিকগণই এবংবিধ লক্ষণের সূচনা করেন এবং তাদৃশ ভিত্তিতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বহুল শাখা-প্রশাখাসমন্বিত প্রাক্-কালীন দর্শনবিদ্যা সুদৃঢ়রূপে গ্রথিত ও পল্লবিত করিয়া তুলেন। এবংবিধ দর্শনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইতেছে বিশ্ববোধ তথা বিশ্বদর্শন (জার্মান welt-anschauung, ইং World-view) এবং জীবনবোধ তথা জীবনদর্শন (জার্মান Lebens-anschauung, ইং (Life-view) সমগ্রভাবে যুক্তিতর্কের সাহায্যে নিরূপণ করা এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত জীবনদর্শনের স্বরূপ এবং প্রামাণ্য নির্ণয় করা। সম্প্রতি যথাস্থলে জীবনদর্শনপ্রসঙ্গে যথোচিত বিচার আলোচনা করা হইতেছে।

[ক্রমশঃ]

৩২ 'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥' ভ. গী. ১৩।২৫

৩৩ ভ. গী. ১৩।২৭-২৯
তুলনীয়ঃ 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।' শ্বেতা. উপ. ৪।১০

৩৪ ভ. গী. ১৫।১০-১১

পরলোকে রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ

গভীর দুঃখের বিষয়, গত ১১ই ফেব্রুআরি, ১৯৭৭, সকাল ৮টা ৫২ মিনিটে ভারতের পঞ্চম রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আমেদ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া মরধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

গত ৬ই ফেব্রুআরি তিনি রাষ্ট্রীয় সফরে মালয়েশিয়া রওনা হন এবং ফিলিপিনস ও ব্রহ্মদেশ হইয়া ১৬ই ফেব্রুআরি নতুন দিল্লীতে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল। কিন্তু মালয়েশিয়াতেই ৮ই ফেব্রুআরি তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। ফিলিপিনস ও ব্রহ্মদেশের রাষ্ট্রীয় সফর বাতিল করিয়া ১০ই ফেব্রুআরি তিনি নতুন দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। সেদিন তিনি বেশ সুস্থ ও প্রফুল্ল ছিলেন এবং রাত্রে তাঁহার সুনিদ্রা হয়। ১১ই সকাল ৬টা নাগাদ তিনি স্নানাগারে যান। সেখানে হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। সংবাদ পাইয়া তিন মিনিটের মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত চিকিৎসক আসেন এবং তাঁহার চেষ্টায় রাষ্ট্রপতি অল্পক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরিয়া পান। ইতিমধ্যে আরও তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আসিয়া পৌঁছান এবং রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে জ্ঞান ফিরিয়া পাওয়ায় তাঁহারা আশান্বিত হন। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তিনি দ্বিতীয়বার প্রচণ্ড হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রায় ঘণ্টা তিনেক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গত ১৩ই ফেব্রুআরি অপরাহ্নে সংসদভবনের নিকটস্থ তিন শত বৎসরের পুরাতন মসজিদের উদ্যানে পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তাঁহার মরদেহ সমাহিত করা হয়। ২৭টি বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ প্রয়াত রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে অন্ত্যেষ্টিতে যোগ দেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে ফকরুদ্দিন আলি আমেদের জন্ম হয়। আসামের অধিবাসী তাঁহার পিতৃদেব ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সারভিসের একজন আধিকারিক ছিলেন। প্রথমে উত্তর প্রদেশের গোন্‌ডার একটি বিদ্যালয়ে এবং পরে দিল্লীর সরকারী বিদ্যালয়ে পাঠান্তে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ইংলণ্ডে প্রেরিত হন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ সেণ্ট ক্যাথরিন কলেজ হইতে ইতিহাসে ট্রাইপস্ পান। লণ্ডনে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন তিনি।

ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ফকরুদ্দিন আলি আমেদ প্রথমে পাঞ্জাবের উচ্চ আদালতে এবং পরে আসামের ও কলিকাতার উচ্চ আদালতে আইনজীবী হিসাবে কাজ করেন।

১৯৩১ সালে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৩৫ সালে আসাম বিধানসভার সদস্য এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে বরদলৈ মন্ত্রিসভার অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রী হন তিনি। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করায় ১৯৪০ সালে তিনি এক বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন এবং সাড়ে তিন বৎসর নিরাপত্তা বন্দীর জীবনযাপন করিতে বাধ্য হন। ১৯৪৫ সালে তিনি মুক্তি পান এবং ১৯৪৬ হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত আসামের এ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন। দেশ স্বাধীন হইবার পর তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্যপদ লাভ করেন এবং ১৯৫৪ হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ সাল হইতে একটানা নয় বৎসর তিনি আসামের

বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হন। ১৯৬৭ সালে নির্বাচনের পর প্রথমে শিল্পোন্নয়ন ও কোম্পানী-বিষয়ক দপ্তরের এবং পরে কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৭৪ সালের ২৪শে অগস্ট তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

তাঁহার মৃত্যুতে দেশ একজন সুশিক্ষিত ক্রীড়ামোদী সুসংস্কৃত মানবতাবাদী উদার-হৃদয় ধর্মপ্রাণ দেশসেবককে হারাইল।

তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বরণারতি—শরণাগতি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মানব না হার, দেখতে যদি শিখি তোমার শিবনয়নে,
দেখতে পাব—দাও নি তুমি কোনোদিনই ভঙ্গ রণে।
আমরা দিশা হারালেও তোমার উষা জেগেই থাকে
অন্তরে মা-র স্নেহের মত, আঁধারভাঙা অরুণরাগে
তাই দেবতার ফোটে হাসি অশ্রুনভের অস্তাচলে,
গায় সে : "চেয়ে দেখ্, আলো কি ডুবতে পারে রসাতলে?
ওঠাপড়া, ভাঙাগড়া, চলাচলের দ্বৈতমাঝে
শুনিস যদি কান পেতে তোর—মুরলী তাঁর শুনবি বাজে।
এর হ'লে শেষ ও ধ'রে দেয় নাগরদোলায় ক্ষণে ক্ষণে,
এম্‌নি ক'রেই ছন্দ সাধে নন্দগোপাল বৃন্দাবনে।"
আমরা চলি উড়িয়ে নিশান : "মনই কাজী, সেরা উকিল,
হুকুমকে তার মানলে হাকিম খুলবেই সব গ্রন্থি জটিল।"
কিন্তু ভাবি—কে অগণন চিত্তে কেটে চলেছিল
নিরন্ত ছক জীবনধাঁধার? কেন হৃদয় মেতেছিল
সৃষ্টির সূর্যোদয় হ'তে অলৌকিকের আরাধনায়?
গেয়েছিলেন ঋষি : "দে ডুব অরূপেরি ধ্যানসাধনায়?"

যে বিশ্বটা দেখছি চোখে নয় কি অসম্ভব কাহিনী—
পারে না কক্ষনো হ'তে যা—তার অশেষ প্রবাহিনী?
দুটি কণার যোগে গোটা মানুষ এল কেমন ক'রে?
কে বাঁচিয়ে রাখল তাকে অন্তরালে মা-র জঠরে?
মাত্র দুটি বীজে গ'ড়ে উঠল অস্থি কেশ নখ—এ কী!
দেখলেও যা মানতে বাধে তাকেই-যে প্রত্যক্ষ দেখি!

ধুলো বালি কাঁকর মাটির তুচ্ছ ভিৎ-এই ঝল্‌কে ওঠে
মরুভূমে রাজপ্রাসাদ, কাঁটাবনে গোলাপ ফোটে!
একফোঁটা জীব—কোকিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিত ছুঁলেও—সে-ই
যৌবনে জয়ডঙ্কা বাজায়, কান্নাকাটির চিহ্নও নেই!
কাল যে মায়ের নেওটো ছিল, আজ হ'ল সে তাঁরি পালক!
কাল যে দিত হামাগুড়ি, আজ সে জাহাজ-বিমান-চালক!
দেখলে মনে হয় যা সহজ ভাবতে গেলেই প্রহেলিকা!
দুটি অণুও নয় একরকম, প্রতি নামীই অনামিকা!
যার সঙ্গে জন্ম হ'তে করেছি ঘরকন্না বিহার,
আমার মধ্যে সেই "আমি"-টিই রইল অচিন—এ কী ব্যাপার!
যাকে বলি "বন্ধু" আজ হয় কাল সে বিমুখ মতান্তরে,
মেলে না যার সাথে কিছুই চাই মালা তার কেমন ক'রে?
কোথা হ'তে কে এসেছি, চলেছি কোন্ লক্ষ্যমুখে—
কেউ জানি না—তবু ভাবি আমরা জ্ঞানী যুগে যুগে!

যেদিন এলাম কোল জুড়ে মা-র, উঠল বেজে শঙ্খ বাঁশি,
জলদ ফুলে তারায় দুলে উঠল শিশুর চাউনি হাসি!
সুন্দর মন টানে, বলি কুরূপকে: "দূর হ এক্ষনি!"
তবু যখন স্বার্থ ডাকে তার সুরই হয় কুহুধ্বনি!
পবিত্রতার গাই গুণ, আবার দেখি হঠাৎ কলোচ্ছ্বাসে
লোল লালসার মোহন ছবি ফলাই নাটক উপন্যাসে!
সরলতাই কাম্য মেনেও প্রতিপদেই উল্টো বুঝি।
শান্ত হ'তে চেয়েও তবু দন্তে অশান্তিকেই খুঁজি।
বিলাস-সরঞ্জামের পাহাড় সাজিয়ে বই বিষম বোঝা,
তবু তাকেই সভ্য বলি—এ-হেঁয়ালিও নয় তো সোজা।
সুখের চাবি কোথায় জানি, নাম তার "প্রেম" দেশবিদেশে,
বজ্রবোমার আগুন তবু জ্বালাই শ্মশান ভালোবেসে!

ঘৃণা ক'রে হই একেলা, প্রতিবেশীর হাতে তবু
চাই না রাখী বাঁধতে প্রীতির—এ কী বিড়ম্বনা প্রভু?
অফুরান ইন্দ্রিয়-ভোগের অট্টালিকার আকাশতানে
দুঃখেরি রাজধানী ঘোষি বৈজ্ঞানিকী অভিমানে।

মন বলে যা প্রাণ মানে না, প্রাণ চায় যা মন বোঝে না,
হিংসা পাপের মূল জেনেও সবাই কেন প্রেম খোঁজে না ?
অহঙ্কারে অন্ধ হ'য়ে কুবুদ্ধিকেই আদর করি,
পাতাল-বিলাসিনীকে চাই দেখেও সে নয় অমরী ?
সবার উপর, যে-তুমি নাথ সবাইকে নাও টেনে কোলে,
উজিয়ে উঠি যার করুণার গাইতে ভজন নয়নজলে,
সে-তোমাকেও এড়িয়ে ছুটি ধরতে সোনার হরিণ, মরি !
নেই কায়া যার ছায়াকে তার জড়িয়ে মায়ায় বুকে ধরি !
চিরন্তন আনন্দ তুমি, বাজাও বাঁশি গহন মনে—
জেনেও কেন চাই না প্রসাদ তোমার হৃদিবৃন্দাবনে ?

মর্ত্য হ'তে পারে স্বর্গ কালো গর্ব বিদায় দিলে—
জেনে তবু এ-কোন্ মোহে চাই না আলো এ-নিখিলে ?
সর্বনাশা রসাতলের হই প্রজা কার বিধান মানি'—
সত্যি তোমায় ডাকলে হাতে চাঁদ আসে নাথ, যখন জানি ?
পারি যখন এড়িয়ে গরল চলতে সরল পথে প্রভু,
কুটিল পথের মন্ত্র যে দেয় তাকেই কেন বরি তবু ?
বেদনা তাই চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে গুরু হ'য়ে
জাগায় গভীর চেতনা নীল নিরঞ্জনের বার্তা ব'য়ে।
এসো, তোমার রাঙা চরণ ধরব নিতে পূর্ণ শরণ,
যাই তুমি দাও করব বরণ—দুঃখ বা সুখ, জীবন মরণ।
বিশ্বে আছে অঢেল বিরোধ, আমার কেবল বংশীধারী,
গায় বাঁশি যার : "ভাবনা কেন—আছে যখন সে কাণ্ডারী ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশান্তশীল দাশ

অপরূপজ্যোতি দিব্যকান্তি নররূপধারী হেনারায়ণ,
ধরণীর দুখ-বেদনা মোছাতে করেছিলে তুমি অবতরণ।
মানুষের ঘরে মানুষের রূপ ধরে
নেমে এলে তুমি এই ধরণীর পরে ;
কত মমতায় করে গেলে তুমি আর্তজনের দুখহরণ।

জননী তোমার বিশ্বজননী মন্দিরমাঝে মৃন্ময়ী,
সাধনায় তুমি জাগালে জীবন সে-মাটি হল যে চিন্ময়ী।
সে-মায়ের কাছে পেলে কত বৈভব,
জীবনে জাগালে কত না মহোৎসব ;
অমৃতমন্ত্রে দীক্ষিত করে দিলে এ মানুষে অমেয় ধন।

অজ্ঞানতার ঘোচালে আঁধার দীপশিখা জ্বেলে অন্তরে,
ভ্রান্ত মানুষে পথের নিশানা দিলে অমানিশা দূর করে।
সব নদী গিয়ে একই সে সাগরে মেশে,
সকল মন্ত্র সে 'এক'-এরই উদ্দেশে ;
নানা জটিলতা ভেদ করে হ'ল স্বচ্ছ আলোর বিচ্ছুরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

(খাম্বাজ—একতাল বা দাদরা)

শ্রীঅঙ্গের রূপ আবরিয়া কেন মূর্খ কাঙ্গাল সাজিলে এবার
(তব) করুণা-কোমল নয়ন-কমলে তবু যে উথলে প্রেমের পাথার ॥
রূপহীন দেহে অরূপ ভাতিছে,
পণ্ডিতও তব শ্রীপদ পূজিছে,
প্রেমপ্রহরণে অসুরে নাশিয়া হরিতেছ ভার এই বসুধার ॥

ধরমস্থাপন করিছ ধরায়
নাশিয়া অশিবে যুগের উষায়
গগনে পবনে মঙ্গল-গানে মাতিল ভুবন নব আশায়।
মোর জীবনেও ধরমস্থাপন
কর কর ওগো অনাথ-শরণ
(মম) কামনা-বাসনা অসুরে নাশিয়া দাও আশ্রয় শ্রীপদে তোমার।
আমি যে তোমারি সন্তান হরি ! একথা কি মনে নাই তোমার॥

রামকৃষ্ণ স্মরণে

শ্রীমতী বিভা সরকার

যখনি আঘাত আসে জাগে চিত্তে ক্ষুব্ধ হাহাকার
হে করুণাঘন প্রভু ! ছুটে আসি স্মরণে তোমার।
প্রভাত-সূর্যের মত তামস-নাশন জ্যোতিষ্মান
স্নিগ্ধ শান্ত প্রেমদীপ্ত সুকোমল তব দুনয়ান
মুহূর্তে ঘুচায়ে দেয় যত ব্যথা যত মর্ত্যগ্লানি
ক্ষোভের উদ্ধত ফণা মন্ত্রজিত সর্পসম পরাভব মানি
ঝরা পুষ্পরাশিসম তোমার ও চরণে লুটায়
পথের কঙ্কর কাঁটা মুহূর্তে যে ফুল হয়ে যায়।
তোমার আশিস্ ঝরে আমার চলার পথে জানি,
অদৃশ্য মঙ্গল হস্ত আছে চির বরাভয় দানি—
মিথ্যার বিভ্রান্তি আসি একথা ভুলায় যদি কভু
ক্ষমা কর অক্ষমারে হে শাশ্বত জ্যোতির্ময় প্রভু !
ছোট সে বৃষ্টির কণা সমুদ্রের আশ্রয় মাগিছে
ভক্তির প্রদীপখানি জীবনের আঁধার নাশিছে।
তোমার অমৃতদীপ্ত সুকল্যাণ লভি চিরন্তন
রসে বসে বেঁধে নেবো এ হৃদয়—অরূপ-রতন !
জীবন-সমুদ্রনীরে মন চায় কুড়াতে মাণিক
দিব্যদ্যুতি জ্যোতিষ্মান প্রাণপদ্মে দাঁড়াও ক্ষণিক।

মাভৈঃ

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

কাঁঠাল ভাঙ্গিবে বুঝি ?—ভাবনা-জর্জর
বৃথাই হয়েছ, বন্ধু ! সহজ সুন্দর
যে উপায় আছে তাহা জান না যে তাই
অকারণ ভাবনার অন্ত তব নাই।
বেশ করে মেখে নাও তেল দু'টি হাতে
কাঁঠালের আঠা হবে জব্দ সাথে সাথে।

বালি-চিনি মিশে থাকে,—দেখ দেখি চেয়ে
বালি ফেলে পিপীলিকা যায় না কি খেয়ে
চিনিটুকু বেছে বেছে ? দেখো এক সাথে
মিশে আছে ক্ষীর-নীর—মরালের তাতে
কি বা বলো আসে যায় ? সে যে অনায়াসে
নীর ত্যজি ক্ষীর খায়—আনন্দে উল্লাসে।

সংসারে রয়েছ বলে কিসের ভাবনা ?
সংসার সুন্দর হয় কামনা-বাসনা-
মুক্ত হয়ে কর যদি। অনাসক্ত মনে
পালগো সংসারধর্ম পরম যতনে।
এক হাতে করো কাজ, অন্য হাতে ধরি'
ঈশ্বরের পাদপদ্ম—ভবার্ণবে তরী।

তবে আর ভয় কেন ? কেন বা হতাশা ?
রামকৃষ্ণ-উপদেশে এই সর্বনাশা
সংসারেরে করো বন্ধু, পুণ্য স্বর্গভূমি
স্বার্থবুদ্ধি তেয়াগিয়া ভবপথে তুমি
চল সুখে, হে ধীমান্ ! দেখিবে সংসার
ষোল আনা 'সং' নহে—আছে এতে 'সার'।

পটে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীনিমাইচরণ চক্রবর্তী

ছায়া কায়া ঘট পট বলেছ অভেদ।
পটে তাই নাশ কর না-দেখার খেদ॥
মরি কি রূপের ছটা অঙ্গের মাধুরী।
আসো যাও যুগে যুগে ভিন্ন নাম ধরি॥
অর্ধনিমীলিত নেত্র স্নিগ্ধ অচঞ্চল।
ব্রহ্মানন্দে সমুজ্জ্বল বদন-কমল॥

প্রেমের জমাট মূর্তি সারা দেহখানি।
'ভাবে থাক্' দিল আজ্ঞা মা ভবতারিণী॥
পটের মাঝারে তুমি জীবন্ত বিগ্রহ।
পটে তাই হেরি নিত্য ও চিন্ময় দেহ॥
বাঞ্ছা সদা গাহি তব অনন্ত মহিমা।
সেই সঙ্গে আঁকি হৃদে সোনার প্রতিমা॥

অবতারবরিষ্ঠ

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি গাহিয়াছেন :

"ত্রেতাতারী রাম, দ্বাপরের শ্যাম,
রামকৃষ্ণ দোঁহে একাধারে।
গৌতমের প্রাণ, শঙ্করের জ্ঞান,
অবতীর্ণ ল'য়ে ধরা 'পরে॥
রামানুজ গোরা, এক প্রেমে জোড়া,
কবীর নানক একডোরে।
যত অবতার সমষ্টি সবার,
রামকৃষ্ণরূপে এইবারে॥
'যত মত পথ, সব একমত',
রামকৃষ্ণ কয় ভাবভরে।
ইষ্ট আপনার, ইষ্ট সবাকার,
ভিন্নরূপে ভক্ত এক হেরে॥
মহা অবতারী রামকৃষ্ণ রায়,
নরদেহ ধরি' মধুর লীলায়,
জগতের সব ধরম মাতায়,
দেখে বুঝ ভারত অন্তরে॥"

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বমুখেও অঙ্গীকার করিয়াছেন, '···যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীমুখ হইতে স্বকীয় স্বরূপের এই স্বীকৃতি তাঁহার শিষ্য-গণ কর্তৃক বহুবার শ্রুত হইয়াছে। কিন্তু কাশীপুর উদ্যানবাটীতে মর্ত্যলীলাসংবরণের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের— তদানীন্তন 'নরেনের'—অন্তরের সংশয় নিরাকরণার্থে যে স্বীকৃতি, তাহা স্বামীজী ভবিষ্যৎ মানবের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। অতি স্পষ্ট, দ্বিধাহীন, স্বতঃস্ফূর্তরূপে ঐ স্বীকৃতি শ্রীমুখ হইতে নির্গত হয়। কোনও সন্দেহ বা বিভ্রান্তির অবকাশ তাহাতে নাই—নাই কোনও দ্ব্যর্থক বা বিকৃত ভাষ্যের সুযোগ—অতি সাবলীল ও স্বচ্ছ কিন্তু সতেজ ও মর্মস্পর্শী সেই আত্মপরিচয় —আত্মপ্রকাশ।

তিনটি মহাদেশে ধর্মপ্রচারে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করিয়া যিনি স্বল্পপরিসর জীবনে বিশ্ববিজয়ী ধর্মাচার্যরূপে স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হন, সেই মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ হাওড়া রামকৃষ্ণপুরে ভক্তপ্রবর নবগোপাল ঘোষের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসবে যে প্রণামমন্ত্র রচনা করেন, তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অবতারবরিষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন :

'ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥'

ইহা কি ভক্তি-আতিশয্যে স্বকীয় ইষ্ট বা গুরুকে শ্রেষ্ঠ আসন দান, বা ইহার অন্য কোনও তাৎপর্য আছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

অবতারমাত্রেই মানবদেহধারী মায়াধীশ পরমেশ্বর এবং তিনি সর্বদা স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন, যদিও সাধারণ জীবের ন্যায়ই তাঁহার লোকব্যবহার। গীতামুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিয়াছেন :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—হে অর্জুন, যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃত-বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্, যিনি সচ্চিদানন্দ,

অনাদি ও অনন্ত, নির্গুণ অথচ সর্বগুণাধার, যাঁহার স্বরূপ মানববুদ্ধির অগোচর, ভাষা যাঁহার ইতি করিতে পারে না, সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন অবতীর্ণ হইলে তাঁহার কি শক্তির তারতম্য—ইতর বিশেষ—হয়, ইহাই প্রশ্ন। শাস্ত্রবাক্য ও ঋষিবাক্য—প্রকাশভেদে শক্তির ইতর বিশেষ হয়। ধর্ম বিষয়ে ঔদার্য ও সার্বজনীনত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াও স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতারবরিষ্ঠ' আখ্যা দেওয়ার তাৎপর্য কি? ইহাই আলোচ্য ও বিবেচ্য।

অবতার কিছু ভাঙ্গিবার জন্য আসেন না। যুগোপযোগী মানবসভ্যতা ও সমাজব্যবস্থানুযায়ী মানবসাধারণকে শ্রেয়ের পথ দেখাইয়া লক্ষ্যে পৌঁছাইবার সহজ সরল পথের সন্ধান দেওয়াই তাঁহার কাজ। যে যুগে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তিনি সেই যুগের সমাজ-কাঠামোর উপর যে আগাছা পরগাছা গজায় তাহা উন্মূলিত করিয়া সত্যের পথ দেখাইয়া দেন। তিনি গঠন করিতেই আসেন, কুসংস্কার ও দুর্নীতি হইতে মানবকে মুক্ত করিয়া নীতি ও সত্যের পথ নির্দেশ করেন।

শ্রীরামচন্দ্র একজন মহাবীর, আদর্শ প্রজারঞ্জক নৃপতি, অভূতপূর্ব পিতৃভক্তির উদাহরণস্থল, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, আশ্রিতবৎসল, সর্বগুণালঙ্কৃত আদর্শ গৃহস্থ। যুগোপযোগী ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে তিনি পূর্বদক্ষিণ এশিয়ার মানবগোষ্ঠীর একজন অনমুকরণীয় আদর্শ মহাপুরুষ। আপন কর্তব্যপালন ও যুগপ্রয়োজনে অবতীর্ণ হইবার যে উদ্দেশ্য তাহা অনাসক্তরূপে সম্পাদন, এই সকলই তাঁহার চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। গুহককে আলিঙ্গনে ও শবরীর প্রতীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত কার্য ও আশ্রিতবাৎসল্যেরই তিনি পরিচয় দিয়াছেন। প্রজাপালনে তাঁহার এতদূর সাফল্য যে অদ্যাবধি সুশাসিত রাজ্যকে 'রামরাজ্য' আখ্যা দেওয়া হয়।

জীবন জটিলতর। কিন্তু সেখানেও দৃষ্ট হয় একই চিত্র। কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগী, এমন কি রাজযোগীও এই অসাধারণ চরিত্র হইতে উপকৃত হইতে পারেন। সর্ববিষয়ে শাস্ত্রসম্মত ও শাস্ত্রানুমোদিত কার্যকলাপ তাঁহারও জীবনে পরিলক্ষিত হয়। বৃন্দাবনে দরিদ্র সরলপ্রাণ রাখাল বালকদিগের খেলার সাথী, গোপগোপী-প্রেমে ভরপুর প্রেমঘনমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ, অমিতবিক্রম ও উদ্যমসমম্বিত কর্মযোগী তথা ধর্মোপদেষ্টা ও নীতিপথপ্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণ, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিবিশারদ এবং গার্হস্থ্য জীবনেরও আদর্শস্থল। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে ও সর্বত্র সর্বদা বলদর্পী ক্ষাত্রশক্তি ধ্বংসের ব্যবস্থায় এবং অনাসক্ত দ্রষ্টারূপে স্বীয় আত্মীয়বর্গ ও বংশধরগণের বিনাশ পর্যন্ত অচঞ্চল চিত্তে পর্যবেক্ষণেও সেই একই কারণ—ধর্মসংস্থাপন—সজ্জন-পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতবিনাশ পরিলক্ষিত হয়।

এই দুই পূর্বগ অবতারজীবনে নানা বিস্ময়কর ঘটনার বহুল সমাবেশ দৃষ্টিগোচর হয় নিঃসন্দেহ। তবুও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি জাগতিক দৃষ্টিতে নিতান্ত সাধারণ মানুষ ও যাঁহার জীবনে আপাতদৃষ্টিতে কোনও বিস্ময়কর বা অলৌকিক ঘটনার দৃষ্টান্তের একান্তই অভাব—তাঁহাকেই স্বামীজী অবতারবরিষ্ঠ বলিলেন কেন? শুধু তাহাই নহে, ৩।৩।৯৪ খ্রীঃ কিডিকে লিখেন, '...শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই।' ঐ সালেই স্বামী শিবানন্দকে লিখেন, '...দাদা, বেদ-বেদান্ত পুরাণ-ভাগবতে যে কি আছে, তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বোঝা যাবে

না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence of India (তাঁহার জীবন অনন্তশক্তিপূর্ণ একটি সন্ধানী আলো; ইহা ভারতের সমগ্র ধর্মভাবের উপর বিচ্ছুরিত হইয়াছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যরূপ ছিলেন এবং এক জীবনে ভারতের জাতীয় ধর্মজীবনের সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করিয়াছেন।)

'…ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect (সবচেয়ে আধুনিক এবং সবচেয়ে পূর্ণবিকশিত চরিত্র)—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিত-চিকীর্ষা, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়?'

১৮৯৫ খ্রী: স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখেন, '… What the whole Hindu race has thought in ages, he lived in one life. His life is the living commentary to the Vedas of all the nations' (সমগ্র হিন্দুজাতি যুগ যুগ ধরিয়া যে চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, তিনি এক জীবনেই সেই সমুদয় ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সকল জাতির শাস্ত্রসমূহের জীবন্ত ভাষ্য।)

ঐ সালেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেন, '…রামকৃষ্ণ পরমহংস কোন নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আইসেন নাই—প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে, অর্থাৎ He was the embodiment of all past religious thoughts of India. His life alone made me understand what the Shastras really meant, and the whole plan and the scope of the old Shastras.' (তিনি ভারতের সমগ্র অতীত ধর্মচিন্তার মূর্তবিগ্রহ-স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য, তাহারা কি প্রণালীতে—কি উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা আমি কেবল তাঁহার জীবন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি।)

প্রমদাবাবুকে লিখিত ৩।৩।৯০-এর পত্রে আছে, '…রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই।'

৩।৭।৯৭ তারিখে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে সংস্কৃত ভাষায় চিঠিতে লিখেন:—

যস্য বীর্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্॥

(যাঁহার শক্তিতে আমরা এবং সমগ্র জগৎ কৃতার্থ, সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।)

প্রাচ্য ভূখণ্ডে ধর্মের আদর্শ ত্যাগভিত্তিক এবং আধ্যাত্মিকতার অর্থ অপরোক্ষানুভূতি। আচার-অনুষ্ঠান বা কোনও মতবাদে বিশ্বাস বা আনুগত্য প্রাচ্যদেশীয়ের নিকট ধর্মের কিণ্ডার-গার্টেনরূপে স্বীকৃতি লাভ করে মাত্র। তাহাদের ধারণা অবতার স্পর্শ দ্বারা বা ইচ্ছামাত্র অপরে ধর্মভাব সঞ্চারিত করিতে পারেন। স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনাতে পরিণত হয়, অবতারের স্পর্শে বা ইচ্ছায় যে কোন মানুষ ধার্মিক হইয়া যায়, তা সে মানুষ যতই না কেন কুপথের পথিক বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন হউক না। ইহাই হিন্দু ভারতের অবতার সম্বন্ধে বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইহাও বলিয়াছেন—এবার

ছদ্মবেশে আসা, যেমন রাজাও কখন কখন ছদ্মবেশে বাহির হন। স্বামীজী ঠাকুরের অতুলনীয় ত্যাগ, অচিন্তনীয় পবিত্রতা সম্বন্ধে বলিয়াও কিন্তু তাঁহার সর্বগ্রাসী প্রেমকেই তাঁহার বিশেষত্ব বলিয়া নির্ণীত করিয়াছেন। কবিবর গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন যে, এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণামাস্ত্রে সকলকে জয় করিয়াছেন। অর্থাৎ ঠাকুর সকলকেই উপযুক্ত মর্যাদা দান করিতে কখনও ভুলিতেন না। 'তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা'—এই বৈষ্ণবোচিত গুণ যেন ঠাকুরের সহজাত ছিল।

যে-কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তাহা যত জটিলই হউক, হাতে তোলা বোলের ন্যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ, সরল ও নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, যাহাতে একটি বালকেরও বোধগম্য হইতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় ইনি জাগতিক দৃষ্টিতে প্রায় নিরক্ষর, তবুও বিশিষ্ট স্বনামধন্য পণ্ডিতগণও এই স্থানে অসার পাণ্ডিত্যাভিমান ভুলিয়া তাঁহার আশ্রয়লাভের প্রত্যাশী হইতেন। শুধু স্বদেশী পণ্ডিতই নয়, পাশ্চাত্যবিদ্যাবিশারদ-গণেরও একই অবস্থা হইতে দেখা গিয়াছে।

অপরদিকে—লোকশিক্ষার জন্য, নিজ প্রয়োজনে নয়—সকল প্রকার সাধন দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছিয়া তিনি বলেন, 'যত মত, তত পথ'। এই এক অপূর্ব বাণী এ যুগের মানবজাতির মধ্যে ধর্মে ধর্মে দ্বেষ-বিদ্বেষ দূরীকরণার্থ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হয়। তিনি বলেন কোনও পথই ভুল পথ নয় বা তুচ্ছ নয়—কোনও পথ হয়তো প্রকাশ্য রাজপথ, কোনও পথ বাড়ির পিছন দিকের আবর্জনা-সমাকীর্ণ পথ, কোনও পথ সহজ সরল, কোনও পথ বক্র ও বন্ধুর—এই একমাত্র প্রভেদ।

তাঁহার দর্শনে, কথায় বা স্পর্শে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, ইহার ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তাঁহার স্পর্শে যে কি আমোঘ শক্তি স্বামীজী স্বয়ং তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। ১৮৮৬ খ্রীঃ ১লা জানুআরি কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সমবেত ভক্তমণ্ডলী তাঁহার বাক্য ও ইচ্ছাশক্তির পরিচয়-লাভে কৃতকৃতার্থ হয়। বর্তমান মানবসাধারণ ঐ সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে ত্যাগীর বাদশা বলা হইয়াছে। ইহা যে-কেহ তাঁহার জীবনী পাঠ করিলেই অতিশয়োক্তি মনে করিবে না। ঠাকুরের খুব প্রিয় উপদেশ ছিল মনমুখ এক করা ও ভাবের ঘরে চুরি না করা। নিজ জীবনে কার্যক্ষেত্রে এই দুইটিই দেখাইয়াছেন একেবারে নিক্তির ওজনে -- একটুকুও এদিক ওদিক হইবার উপায় ছিল না। সত্যের প্রতি তাঁহার আঁট জীবনী-পাঠক মাত্রেই অবগত।

চরম অদ্বৈতভূমিতে আরূঢ় হইলে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (সব ব্রহ্মময়) জ্ঞান হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুর উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, কাঞ্চন-লোষ্ট্র, খাদ্যাখাদ্য, শুচি-অশুচি সমজ্ঞান করিবারও প্রমাণ রাখিয়াছেন বাস্তব জীবনে।

তাঁহার অপর একটি অভিনব বাণী 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। এই বাণীর তাৎপর্য স্বামীজীই প্রথম সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হন ও পরবর্তী কালে উহা বাস্তবে রূপদান করেন। 'জীবে দয়া' কিছু নূতন কথা নয়, কিন্তু ঠাকুর ভাবমুখে বলিলেন, '...জীবে দয়া নয়, দয়া করবার তুমি কে?—শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। এই নবীন বাণী মানবসমাজে অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে এবং সনাতন বাণীর মধ্যে যুগান্তকারী ভাবধারা অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং ফলে মানবমনে নবীন আলোকের সন্ধান দেয়।

যখন পাশ্চাত্য জড় সভ্যতার প্লাবনে ভারত-

বাসীর ধর্মভাব—যাহা তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য—একেবারে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হয়, যখন অন্ধ পাশ্চাত্যানুকরণই প্রগতি ও সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া ভারতবাসী ধারণা করিয়া বসিয়াছিল, যখন প্রাচীন মুনিঋষির নামোল্লেখ করিলেই হাস্যাস্পদ হইতে হইত, যখন বেদোপনিষদাদি পর্যন্ত পাগলের প্রলাপ বলিয়া অবজ্ঞাত হইত, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী হিন্দু ভারতবাসী যখন পাশ্চাত্যবাসীর বাহবা ও সমর্থন যাহাতে তাহাই প্রশংসনীয় ও শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করিত, সেই যুগসন্ধিক্ষণে অবতীর্ণ হইলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এক নিষ্ঠাবান দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে অখ্যাত এক পল্লীগ্রামে। তাহার পর প্রায় নিরক্ষর এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে পূজারীর পদে আসীন হইয়া এবং পরবর্তী কালে যে লীলাভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাতে পাশ্চাত্যপদলেহী পাশ্চাত্যানুকরণে সিদ্ধহস্ত ও পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানে দক্ষ তদানীন্তন অগণিত গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া গর্বিত সমুন্নত শির ঐ ব্রাহ্মণেরই পদতলে অবনত করিতে বাধ্য হইত, তাঁহার অমার্জিত গ্রাম্য ভাষায় উপদেশামৃত পান করিয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিত এবং ঐ কারণে পুনঃ পুনঃ তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইত। এইরূপ অভাবনীয় ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইল, তাহাই বিবেচ্য।

তদানীন্তন স্বনামধন্য পণ্ডিত পদ্মলোচন—বর্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত, বৈষ্ণবসমাজের সাধক পণ্ডিতপ্রবর বৈষ্ণবচরণ, বৈদান্তিক ও ন্যায়শাস্ত্রবিদ্ নারায়ণ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য, পণ্ডিত জয়নারায়ণ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া নিজেদের জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ভরসা পাইয়াছিলেন। অনেকে প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে তাঁহাকে যুগাবতাররূপে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন।

ইঁদেশের গৌরীপণ্ডিত—যাঁহার পাণ্ডিত্য ও সিদ্ধাই-এর বিশেষ খ্যাতি ছিল—ঠাকুরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সাধকোচিত উপলব্ধির নিদর্শন। গৌরীপণ্ডিতের কথা :—

"...আপনাকে অবতার বলে, তবে তো ছোট কথা বলে। আমার ধারণা যাঁহার অংশ হইতে যুগে যুগে অবতারেরা লোক-কল্যাণসাধনে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাঁহার শক্তিতে তাঁহারা ঐ কার্য সাধন করেন, আপনি তিনিই!"

ব্রাহ্মসমাজনেতা বাগ্মিপ্রবর কেশবচন্দ্র সেন, ব্রাহ্ম আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ সমাজের বহু শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহারই নির্দেশিত পথে অগ্রসর হইয়া অভীষ্টলাভে যত্নপর হন। শুধু তাহাই নয় কেশবচন্দ্র সেন এতই প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন যে, তিনি এই পূজারী ব্রাহ্মণকে লোকসমক্ষে প্রচার করিতে ব্রতী হন এবং নিজেও সদলে তাঁহার সঙ্গলাভে যত্নপর হন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কালনার ভগবানদাস বাবাজীর কথা উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুকুটমণি, সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবের গুরুস্থানীয় ও সকলের শ্রদ্ধাস্পদ ভগবানদাস বাবাজী—যাঁহার নির্দেশ সকল বৈষ্ণবের নিকটই গুরুর আদেশের ন্যায় নির্বিচারে ও নতশিরে পালনীয় ছিল—তিনি যখন শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করেন নাই, তখন তিনি কলুটোলায় বৈষ্ণবদিগের আখড়ায় শ্রীচৈতন্যের আসনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবস্থায় আসীন হইবার কথা শ্রবণ করিয়া খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং খুব বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতে থাকেন। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে যখন তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎলাভ করিলেন তখন শুধু যে তাঁহার

বিরুদ্ধ মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল তাহাই নহে, ঠাকুরই চৈতন্যাসনে বসিবার উপযুক্ত ব্যক্তি, এই প্রকার মত প্রকাশ করেন এবং নিজের পূর্বের ভ্রম সংশোধন করেন। অবশ্য তাঁহার সাধকোচিত উন্নত অবস্থা এই ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করে সন্দেহ নাই

এবার ধনুর্বাণ, রাক্ষসবধ, বালীবধ, লঙ্কা-ভিযান, কংসশিশুপালবধ, কালীয়দমন, গোবর্ধন-ধারণ, কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন অথবা সুদর্শন, গরুড়, মোহন বেণু, যমুনা-পুলিন নাই। তবুও কী সেই মহাশক্তির লীলা যাহা অসম্ভবকেও সম্ভব করিল ?

৯ই এপ্রিল ১৮৯৪ স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে লিখেন, 'সত্যযুগ এসে পড়েছে এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমস্ত জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্য যুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে।' ২৬।৫।৯০ তারিখে স্বামীজী প্রমদাবাবুকে লিখেন, 'তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) জন্মে আমাদিগের বাঙালীকুল পবিত্র ও বঙ্গভূমি পবিত্র হইয়াছে - যিনি এই পাশ্চাত্য বাক্‌ছটায় মোহিত ভারত-বাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ...'। ২৯।১।৯৪ তারিখে জুনাগড়ের দেওয়ানকে লিখেন, "...যে পুরুষপ্রবর জীবনে চিন্তায় বা কর্মে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেন নাই, যাঁহার অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অন্য সকল এক-দেশী ধর্মগুরু অপেক্ষা উর্ধ্বতর স্তরে বিদ্যমান... দর্শন বিজ্ঞান বা অপর কোন বিদ্যার সহায়তা না লইয়া এই মহাপুরুষই জগতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব প্রচার করিলেন যে, 'সকল ধর্মেই সত্য নিহিত আছে, শুধু ইহা বলিলেই চলিবে না, প্রত্যুত সকল ধর্মই সত্য'। তাহা ছাড়া এইরূপ সত্যের আঁট, পবিত্রতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ইত্যাদি গুণালঙ্কৃত মহাপুরুষ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নাই।"

যে শক্তির সন্ধান করা হইতেছিল সেই শক্তি ঠাকুরের সর্বানুস্যূত প্রেম, জ্বলন্ত ত্যাগ ও অবিচলিত সত্যসন্ধতায়। অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধা থাকিলে জীব জগৎ সবই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়। ঐ জ্ঞানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকায় ঠাকুরের কার্যকলাপ এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হইতে দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত এবং বিস্ময়াভিভূত ও আকৃষ্ট হইত। মহান্‌ ও পবিত্র চরিত্রের উদাহরণই একমাত্র সচ্চিন্তা ও সৎকর্মের জনক। বার্ট্রাণ্ড রাসেলও বলিয়াছেন, 'অহংভাব থেকে মানুষ যতখানি মুক্ত হয়েছে সেই অর্থে ও সেই মানদণ্ডেই মানুষের সত্যিকার মূল্য যাচাই হয়।' ঠাকুরের মধ্যে লেশমাত্র 'আমি আমার' ভাব ছিল না। সকল প্রকার যাচাই-এর কষ্টি-পাথরে তিনি খাদশূন্য খাঁটি সোনা প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। সুতরাং কোনও বাহ্য শক্তির প্রকাশ না থাকিলেও তাঁহার আত্মিক শক্তির অমোঘ আকর্ষণে মানুষের সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব পাণ্ডিত্যাভিমান পদগৌরব কোথায় ভাসিয়া যাইত এবং জনে জনে তাঁহার সকাশে আসিয়া কৃতকৃতার্থ হইত।

অপর দিকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে চিরন্তন বিবাদ, তাহাও ঠাকুরের যুগোপযোগী নবীন বাণীতেই নির্মূল হইতে বাধ্য। স্বামীজীর কথা—বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী স্বীয় ধর্ম বা মতবাদ সমর্থনে এবং নিজ ধর্মই ঠিক ও অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে যে রক্তপাত ও ধ্বংসলীলা সংঘটিত করিয়াছে, তাহা আর কোন কারণেই জগতে ঘটে নাই। ঠাকুরের নবীন বাণী—সকল ধর্মই সত্য, মানুষের বিভিন্ন রুচি ও ক্ষমতা, সুতরাং যে যাহার রুচি ও সামর্থ্যানুযায়ী আন্তরিকভাবে যে পথেই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে তাহাতেই শেষে লক্ষ্যে পহুঁছিতে পারিবে— প্রয়োজন

শুধু অকপটতা— (ঠাকুর যাহাকে 'মন মুখ এক করা' বলিতেন), দৃঢ়নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়। ইহাই ঠাকুরের ভাষায়—'যত মত তত পথ'। এযুগের সকল জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিই এখন ভবিষ্যৎ জগতে শান্তি ও মৈত্রীর পথপ্রদর্শকরূপে স্বাগত জানাইতেছেন এই বাণীকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমতের—যাহা সর্বসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে—মূলভাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:

বেদান্ত—সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান। (Consciousness of the Self as All.)

ইহুদীধর্ম—জীবহত্যা করিও না (Thou shalt not kill.)

জরথুষ্ট্রধর্ম—সুখ তাহারই লভ্য যাহার নিকট হইতে অপরে সুখ সংক্রামিত হয়। (Happiness comes to one from whom happiness goes to others.)

বৌদ্ধধর্ম—সকল জীব সুখী হউক। (May all beings be happy.)

তাওধর্ম—তাও সর্বত্র বিদ্যমান। (The Tao is everywhere.)

কংফুছে ধর্ম—মানবসাধারণকে ভালবাসাই প্রকৃত মহত্ত্ব। (True goodness is loving your fellow-men)

জৈনধর্ম—অহিংসা একমাত্র ধর্ম। (Non-injury is the only religion.

শিন্টোধর্ম—ঈশ্বর একটি কচি দূর্বা ও একটি পাতাতেও প্রকাশিত হন। (The Deity manifests itself in a tender blade and in a single leaf.)

খ্রীষ্টধর্ম—তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালবাস। (Love thy neighbour as thyself.)

ইসলাম—কেহই ঠিক বিশ্বাসী নয়, যতদিন না সে নিজে যাহা ভালবাসে তাহার ভ্রাতার জন্যও তাহা ভালবাসে। (No one is a believer until he loves for his brother what he loves for himself.)

আফ্রিকার সাঙ্গোধর্মমত—ওগাওঁ সর্বত্র বর্তমান—স্থলে, জলে, বাতাসে, খাদ্য ও বৃক্ষলতায় আছেন ওগাওঁ। (Ogaun is everywhere in the earth, the water, the air, the food and the trees.)

উপর্যুক্ত সকল ভাবই যে সত্য, তাহা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর আলোকে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার জীবনের প্রতিপদক্ষেপে প্রতিমুহূর্তে প্রতি কার্যে ধর্মসমূহের সার সত্য প্রতিফলিত হইতে দেখা গিয়াছে। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়' এই বাক্যের তাৎপর্য বাস্তব জীবনে রূপায়িত করিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বক্ষণ সর্বপরিস্থিতিতে—কোনও ব্যতিক্রম কখনও দেখা যায় নাই।

যে জ্বলন্ত ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, অগাধ প্রেম ও অহংশূন্যতা—সর্বোপরি পরদুঃখকাতরতা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা অন্য অবতার-চরিত্রে এমন পরিস্ফুট দেখা যায় নাই। তাঁহার সত্যে প্রতিষ্ঠা, ত্যাগমহিমা, নিরন্তর ভাবতন্ময়তা অথচ সাধারণ ভূমিতে মন অবতরণ করা মাত্রই—যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন লোকব্যবহার এবং সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়েও ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সর্বজীবে প্রেম ও সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান বাস্তবে কি রূপ পরিগ্রহ করে, আত্মা ও পরমাত্মা অভেদ ইত্যাদি মহাবাক্যের নিগূঢ় তাৎপর্য কি, তাহা তাঁহার পূত জীবনে কার্যতঃ পরিস্ফুট।

ঠাকুর বলিতেন, স্বর্ণাদি ধাতুতে খাদ না

মিলাইলে যেমন গড়ন হয় না, সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্বগুণের সহিত রজঃ এবং তমোগুণের মলিনতা কিছুমাত্র মিশিত না হইলে কোনপ্রকার দেহ-মন গঠিত হওয়া অসম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'কথামৃতে' ঠাকুরের কথা: 'দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্বগুণের ঐশ্বর্য।' ইহাও প্রণিধানযোগ্য। শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনে রজোগুণের ভাব বেশ বিকশিত দেখা যায়। শ্রীরামনামসংকীর্তনের স্তবে আছে:

আর্তানামার্তিহন্তারং ভীতানাং ভয়নাশনম্।
দ্বিষতাং কালদণ্ডং তং রামচন্দ্রং নমাম্যহম্॥

(আর্তগণের ক্লেশহারী ভীতগণের ভয়হারী এবং শত্রুগণের যমদণ্ডতুল্য সেই রামচন্দ্রকে নমস্কার করি।) কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে এই কালদণ্ডের কোনও চিহ্নই নাই। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে এমন অনেক কার্যের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে যাহা আপাতদৃষ্টিতে হয়তো সমর্থন-যোগ্য মনে হইবে না। অবশ্য একটি ইংরেজী প্রবাদ আছে: 'the end justifies the means' (কার্যপ্রণালী শুধু পরিণাম-ফল দেখিয়াই বিচার্য)। এই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম-সংস্থাপন-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া উক্ত দুই অবতার যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা সদুদ্দেশ্য-মূলক, সন্দেহ নাই। যাহা হউক শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কার্যই এমন ছিল না যাহা কোনও রূপ আপত্তিজনক বোধ হইতে পারে। সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহার ছিল বালকের ন্যায় স্বভাব এবং সংসারে আবদ্ধ সঙ্কীর্ণপ্রাণ ভোগলোলুপ মানুষের নিকট তাঁহার কোন কোন কার্য উন্মাদের কার্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে পারে। তবে ঐ প্রকার লোকও তাঁহাকে সাংসারিক হিসাবে অল্পবুদ্ধি ভাবিলেও তাঁহার সারল্যের প্রশংসাও করিতে বাধ্য হইত, সন্দেহ নাই।

ভালকে সকলেই ভালবাসিতে পারে, দুষ্টকে সকল ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই ছলেবলে দমন করিতে পারে,—যেমন শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ঘটিয়াছিল—কিন্তু শুধু ভালবাসা দ্বারা যিনি মন্দকে আপন করিতে পারেন, মন্দলোকের জীবনের মোড় ফিরাইয়া ভাল দিকে টানিয়া আনিতে পারেন, তিনিই মহান ও বরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে 'দ্বিষতাং কালদণ্ডং' ভাব আদৌ নাই, বরং ভালবাসা দ্বারা আপনার করিবার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।

আধ্যাত্মিকতা হইল প্রশান্তি, ঐক্য, সৌহার্দ ও সেবামাধ্যমে চৈতন্য প্রস্ফুটিত হওয়া। (Spirituality is the flowering forth of consciousness through tranquillity, unity, fellowship and service) বর্তমান জগতের জটিল পরিস্থিতি বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা-সংকট সভ্যতা ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া যে অপরাধ করিয়াছে তাহারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। এই সংকটের হাত হইতে ত্রাণের উপায় আধ্যাত্মিক-নৈতিক-সাংস্কৃতিক অনুশীলন—নান্যঃ পন্থাঃ। এই অনুশীলনের প্রথম ও প্রধান কথাই পরমতসহিষ্ণুতা—ঠাকুরের যুগবাণী।

তাঁহার অন্য একটি বিশেষত্ব—যাহা উপরি-উক্ত সহিষ্ণুতা ও 'যত মত তত পথ' বাণী হইতে স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই উদিত হয়—এই যে, তিনি কাহারও ভাব নষ্ট করিতেন না। যে যে-ভাবের ভাবুক তাহাকে সেই ভাবেই চলিতে দিতেন এবং সেই ভাবেই তাহার পথ নির্দেশ করিতেন।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত সুদূর ইংলণ্ডে বাস করিয়াও মনীষী মোক্ষমূলর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা সামান্য তথ্য অবগত হন তাহা হইতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে অবতার তাহা স্থির-নিশ্চয় করেন। শুধু তাহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া জগতের মানব-সাধারণে এই তথ্য 'A Real Mahatman'

(প্রকৃত মহাত্মা) এই শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচার করেন। সৎলোকের স্বভাবই এই যে, যাহাতে তাঁহারা আনন্দলাভ করেন তাহা সাধারণে বিতরণ করিতে উন্মুখ হন। এই ঘটনা সম্বন্ধে শুধু এই বলা যায় যে, দক্ষিণেশ্বরে যে মহাশক্তির অপূর্ব ও অভূতপূর্ব বিকাশ ও লীলা প্রকট হইয়াছিল তাহা জগতের সকল মানুষের শুদ্ধচিত্তে প্রতিফলিত হইয়াছে—অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়ার লীলা মানববুদ্ধির অগোচর, ইহা ব্যতীত আর কিছুই বলা সম্ভব নয়।

ভক্তরাজ কবিবর গিরিশচন্দ্র— ঠাকুর যাঁহার বিশ্বাস পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বলিতেন— ঠাকুরের প্রশ্নোত্তরে কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুরের পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি?' সুতরাং আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের সেই অনন্তভাবময় ঠাকুর সম্বন্ধে আলোচনা, বামনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের ন্যায় মাত্র। তবুও ভরসা আপ্তবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য—'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্'। তাঁহার কৃপা হইলে বোবাও বাচাল হয়, পঙ্গুও পর্বত লঙ্ঘন করে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার স্মরণ মনন সর্বাবস্থায়ই কল্যাণপ্রদ।

ইহা সর্ববাদিসম্মত যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার অন্তরঙ্গ ঈশ্বরকোটি শিষ্যদের মধ্যেও স্বামী বিবেকানন্দই সর্বাগ্রে ও সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম ছিলেন।

সর্ব দিক বিবেচনায় ইহা মোটেই অসঙ্গত কথা নহে যে, স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতারবরিষ্ঠ' আখ্যাদানে সমীচীন, ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসম্মত তথ্যই জগতে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন —মানবজাতির কল্যাণের জন্য। স্বামীজীকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রামাণিক ও শ্রেষ্ঠ ভাষ্য বলা চলে। তাঁহার কথাই আমাদের ন্যায় জীবগণের আলোকবর্তিকারূপে পথপ্রদর্শক।

২৮শে মে ১৮৯৪ তারিখে আলাসিঙ্গাকে লিখেন, '···যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে—অদম্য, অনন্ত, সর্বগ্রাসী।' ৩১শে অগস্ট ১৮৯৪ তারিখে ঐ ব্যক্তিকেই লিখেন,···'সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে।—উৎসুক নয়নে তার জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।···জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে (হিন্দু) নানা দুঃখদুর্বিপাকের মধ্য দিয়েও আজ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন সময় হয়েছে।'

প্রথমোক্ত গানটির শেষ কলিটি আবার উদ্ধৃত করি,—'দেখে বুঝে ভারত অন্তরে'—শুধু ভারত নয়, জগতের সকলেই বুঝিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বুঝিবে। স্বামীজীর কথায় এখন মাত্র আরম্ভ, পরে এই ধর্মবন্যা পৃথিবীর মানবসমাজকে প্লাবিত করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মর্ত্যলীলাবসানের ১০ বৎসরের মধ্যেই প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে তাঁহার মহিমা ও বাণী ঘোষিত হইয়াছে দুন্দুভি-নিনাদে—ইহা ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

সমালোচনা

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) ১৯৭০, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এম. এ., ডি. ফিল, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। **প্রকাশক :** মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২। মূল্য ২৫ টাকা।

দেশ, কাল ও জনজীবনকে প্রেক্ষাপটরূপে ব্যবহার করে ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্য ও সমকালীন য়ূরোপীয় সাহিত্যকে তুলনামূলক পটভূমিকায় রেখে বাংলা সাহিত্যের যে নতুন ধারার ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়েছে ডঃ অসিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' নামক বহু খণ্ডে বিভক্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চার কোষগ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি নিঃসন্দেহে সে-ধারায় প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে এবং ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এজাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসচর্চার পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। কবি ঈশ্বরগুপ্ত থেকে শুরু করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামগতি ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চার যে সূত্রপাত হয়েছিলো ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় সেই ধারায় তথ্য, প্রমাণ, বিবরণ ইত্যাদি যুক্ত হয়ে যথার্থ ইতিহাস-চর্চার পথ সুগম করে। ডঃ সুকুমার সেনের সুবৃহৎ 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' এই ধারারই একটি অগ্রগতির পরিচয় বহন করে। কিন্তু ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' রচনার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ধারার সূত্রপাত হয়েছে। সেটি হচ্ছে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস-এর প্রেক্ষাপটে প্রাদেশিক ও বিদেশী সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারে বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাসচর্চা। কারণ দেশ কাল ও জনজীবনকে বাদ দিয়ে যেমন সাহিত্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, তেমনি সমকালীন অন্যান্য প্রাদেশিক ও বিদেশী সাহিত্যের কষ্টিপাথরে একটি সাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ অবশ্যম্ভাবী।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও ডঃ সুকুমার সেনের ইতিহাসচর্চার মূল ভিত্তিই ছিল পুঁথির বিচার। এই পুঁথিভিত্তিক প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চাকে আরো বৈজ্ঞানিক-ভাবে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইতিবৃত্তের মধ্যে। বস্তুতপক্ষে পুঁথিকে উপেক্ষা করে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চা অতীব কঠিন। কারণ এই মুদ্রিত গ্রন্থের পুঁথির বিভিন্ন পাঠের ফলে প্রায়শই নতুন নতুন তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার বহু পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যায় সত্যের এবং তথ্যের অভাবে। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে যে-সব নবতর সত্যের সন্ধান দিয়েছেন তা সব সময়ই তথ্য-ভিত্তিক।

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের ১ম খণ্ডে দশম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত ৫০০ বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এই কাল ১ম ও ২য় পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আদিযুগ (খ্রীঃ দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) এবং দ্বিতীয় পর্বে প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের (খ্রীঃ ১৩শ থেকে ১৪৯৩ অব্দ) আলোচনা উপস্থিত করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের উন্মেষপর্বে ভারতের অন্যান্য

প্রাদেশিক সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সাহিত্যের আলোচনা। এর ফলে বাংলা সাহিত্যের একান্ত প্রাদেশিক আলোচনা একটি সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় পর্যবসিত হয়েছে। এই দিকটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর ফলে সাহিত্যের ইতিহাসচর্চায় এটি একটি বিশিষ্ট প্রশস্ততর ভূমিকায় উপনীত হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশের প্রথম পর্বের উপসংহারে ইতিহাসকার প্রাচীন যুগে রচিত গ্রন্থাদির আলোচনা করেছেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকাটি বিশ্লেষণ করেছেন, তৃতীয়তঃ প্রাচীন য়ুরোপীয় সাহিত্য ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এবং চতুর্থতঃ অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা উপস্থিত করেছেন। দ্বিতীয় পর্বের উপসংহারেও তিনি এইভাবে সমকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক ইতিহাস ও আলোচনার সংযোজন করেছেন। এইভাবে লেখক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনাকে সর্বভারতীয় এবং বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় পৌছে দিয়েছেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় সন-তারিখের বিভিন্ন গোলযোগ আছে। কারণ নির্ভরযোগ্য পুঁথির বড়ই অভাব। আর যে সব পুঁথি সুলভে প্রাপ্য তা হচ্ছে কেবলই পুঁথির নকল। এ ছাড়া বহু কবিরই আত্ম-পরিচয় কাব্যের মধ্যে অনুপস্থিত কিংবা অসম্পূর্ণ। ফলে এক এক কবিকে প্রাচীন যুগের কোন্ অংশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা নিয়ে যে-সব বিতর্ক চলে আসছে এই গ্রন্থের লেখক অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান গবেষণার মাধ্যমে তথ্যাদি সহকারে নবতর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। যেমন জয়দেবকে বাংলা সাহিত্যের আদি কবিরূপে স্থির করে জয়দেবগোষ্ঠী ও জয়দেবের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন। আবার অপর দিকে শৈব নাথসাহিত্য, কথাসাহিত্য, শূন্যপুরাণ, ডাক ও খনার বচনকে আদিযুগের অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধাগ্রস্ত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের তিনজন কবি বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস ও চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল, কাব্যপ্রতিভা, পুঁথির প্রামাণিকতা ও পাঠভেদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গ্রন্থমধ্যে লেখক এক একটি বিতর্কের আসর বসিয়েছেন। বহু যুক্তি তর্কের ঝড়, প্রমাণ তথ্যাদির প্রয়োগে, বিচার বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতায় উক্ত অধ্যায়গুলি একদিকে বুদ্ধিদীপ্ত, অন্যদিকে ইতিহাস-আলোচনার ধারায় নতুনত্বের স্বাদ বহন করে এনেছে। এইদিক দিয়েও লেখক আমাদের কাছে শ্রদ্ধার ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে উঠেছেন।

প্রথম তিনটি অধ্যায়ে লেখক তথ্যাদি সহকারে প্রাচীন বাংলার দেশপরিচয়, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, জনজীবনধারা, প্রাচীন বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা, জয়দেব ও জয়-গোষ্ঠীর বিশদ পরিচয় এবং প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের সুবিস্তৃত আলোচনা উপস্থিত করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা লিপির আলোচনায় তিনি পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞান-রীতির আশ্রয় নিয়েছেন, এবং ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব যে ভারতবর্ষেই একথা তিনি যুক্তি সহকারে উপস্থিত করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়টি ১ম পর্বের একটি বিশিষ্ট রচনা এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই অধ্যায়ে চর্যাগীতিকার আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বিবর্তনের একটি সারগর্ভ ইতিহাস উপস্থিত করেছেন। যেখানে

তিনি বিস্তারিতভাবে বৌদ্ধধর্মের পটভূমিকা, বৌদ্ধতত্ত্বের মূলকথা, বৌদ্ধসঙ্ঘে মতান্তর, হীনযান ও মন্ত্রযান সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন সেখানে কেবল সাহিত্যই নয়, দর্শনেও তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। এই দর্শন আলোচনার পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাগীতির আলোচনা একদিক দিয়ে যেমন জ্ঞানগর্ভ হয়েছে, অপরদিকে কোন্ ধর্ম ও দর্শনের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনগুলি লিখিত হয়েছিলো তারও একটি ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই অধ্যায়-এর দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে চর্যাপদগুলির আলোচনা। এই অংশে চর্যাপদের কবিদের ঐতিহাসিকতা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন, এবং তথ্য ও বিশ্লেষণাদির সাহায্যে চর্যাপদের ভাষা ও ছন্দ, চর্যার বিষয়বস্তু ও তত্ত্বদর্শন, চর্যার কাব্যরস এবং বাঙালীর সমাজজীবনের কি পরিচয় চর্যাগীতিতে উপস্থিত হয়েছে তার একটি সরস ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় সমগ্র অধ্যায়টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে লেখক দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাস প্রাক্-চৈতন্যযুগ শুরু করেছেন। এই পর্বের সূচনায় ইতিহাসের সঙ্কেত এবং বাংলা দেশের সমাজ সংস্কৃতি, সংস্কৃত ও শাস্ত্রানুশীলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা তৈরী করেছেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা। সেখানে তিনি বেদে এবং উপনিষদে বিষ্ণুর স্থান, প্রত্নতত্ত্বে ও প্রাচীন গ্রন্থে বিষ্ণু-কৃষ্ণ-বাসুদেবের পরিচয়, দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায় এবং দ্বৈতবাদী দর্শনে ভক্তিবাদের স্থান সম্পর্কে যে তথ্যপূর্ণ আলোচনা উপস্থিত করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে একেবারে অভিনব, এরই পটভূমিকায় তিনি পর পর কয়েকটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ, শ্রীকৃষ্ণবিজয় ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত করেছেন। এই-সব গ্রন্থ ও কবিদের পরিচয় উক্ত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সুতরাং পরিসমাপ্তিতে বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) নিঃসন্দেহে অভিনব। বর্তমানে সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্ব জুড়ে দেশ কাল জনজীবন-এর প্রেক্ষাপটে যে ইতিহাস চর্চার সূচনা হয়েছে, সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সেই নতুন ধারার পথিকৃৎরূপে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তের প্রথম খণ্ডটিকে গণ্য করা চলতে পারে।

ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Meditation and its Methods by Swami Vivekananda. Edited by Swami Chetanananda. Published by Vedanta Press, 1946 Vedanta Place, Hollywood, California 90068, (1976), pp. 127, Price 3·50 dollars.

শীতল মুদ্রণে তিরিশ বছরের ব্যবধানেও যে শব্দরাশির সংযোগে তিনি তড়িৎশিহরণ অনুভব করেছিলেন সেইসব বজ্রবাণী বক্তার মুখ থেকে নিঃসৃত হয়ে কী পুলক, কী বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করতো—মনীষী রমাঁ রলাঁর কাছে তা ছিল এক বিস্ময়াবহ বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দের সেই বিদ্যুদ্‌গর্ভ বচনের কিছু

কিছু চয়ন করে সাজানো হয়েছে ধ্যান-সম্বন্ধীয় এই বইখানিতে। মুখবন্ধে যশস্বী কবি (প্রাচীন ও অর্বাচীন উভয় অর্থেই) ইসারউড বলেছেন: মনে হয় বইটিতে ধ্যানশিক্ষা দিতে স্বামীজী সশরীরে সমাসীন। কথাটি স্বামীজীর সকল গ্রন্থ সম্পর্কেই প্রযোজ্য। বিবেকানন্দের সকল কথা ও লেখাতেই—তাঁর তিরোভাবের চুয়াত্তর বছর পরেও—তাঁর বিদ্যুৎশক্তিসঞ্চারী ব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত শুধু কানে তাঁর বাণী নয়, প্রাণে তাঁর পরশও মেলে

সুস্থতালাভ, রক্তের চাপবৃদ্ধি ইত্যাদি রোগ-উপশমের জন্যে ইদানীং দেশে-বিদেশে আশু ফলপ্রসূ যে ধ্যানের প্রচুর চল হয়েছে (এক আমেরিকাতেই ছ'লক্ষ নরনারী নাকি ধ্যানচর্চা করেন!) ধ্যানের সে শরীরসর্বস্ব প্রয়োগ-প্রক্রিয়া এ বইয়ের বিষয়বস্তু নয়। যোগসূত্র, গীতা ও সাধারণভাবে বেদান্তদর্শন অবলম্বনে স্বামীজী ধ্যানের যে নবীকৃত তত্ত্ব ও রীতিপদ্ধতি প্রতিপাদন করেন, এ বই মোটামুটি তারই সার-সঙ্কলন।

গ্রন্থটির সঙ্কলক ও সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীপ্রবর স্বামী চেতনানন্দ, যিনি বর্তমানে সংঘের হলিউড শাখায় কর্মরত। হীরকখণ্ডের মতো দ্যুতিময় ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুচ্ছেদে গ্রথিত করে, প্রত্যেকটিকে ব্যঞ্জনাময় শিরোনামে ভূষিত করে, দুরূহ সংস্কৃত শব্দের সরল সংজ্ঞা সংযোজন করে তিনি এই রত্নখনির মতো বই-খানি উপহার দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর লেখা একটি সমুজ্জ্বল ভূমিকা ও স্বামীজীর একটি সংক্ষিপ্ত-সুন্দর জীবনী যোগ করে তিনি গ্রন্থটিকে আরো সম্মোহক করেছেন। তাছাড়া, ইসার-উডের প্রাগুক্ত মুখবন্ধটি বইটিকে এক আশ্চর্য অতিরিক্ত আয়তন দিয়েছে।

গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও সম্পাদনার জন্যে স্বামী চেতনানন্দ মহারাজকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়ে, কিন্তু দুটি সামান্য সংশয় সংকেতিত না করে পারছি না। বইখানি দু' ভাগে বিভক্ত: যোগানুযায়ী ধ্যান ও বেদান্ত-বিহিত ধ্যান। অখিলশাস্ত্রের নির্যাস আপন অলৌকিক বুদ্ধি ও বোধির রসায়নে জারিত করে—বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন মানুষের কাছে—বক্তৃতায় চিঠিতে ও গানে স্বামীজী ধ্যান সম্পর্কে যে সকল স্বকীয় চিন্তা ও উপলব্ধি উৎসারিত করেছেন সেগুলিকে দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সমান্তরাল শ্রেণীতে আবদ্ধ ও চিহ্নিত করার চেষ্টা না করলেই, মনে হয়, ভালো হতো। এই বিভাজনের সীমারেখা সর্বত্র সুস্পষ্ট নয়, প্রায়শ পরস্পর-অনুব্যাপ্ত। দ্বিতীয়ত, মেছুনীর গল্প, সন্ন্যাসী ও নষ্টা স্ত্রীলোকের গল্প, আমবাগানের গল্প (পৃ ১১৭-৯) ইত্যাদি কয়েকটি অংশের ধ্যানবিষয়ক গ্রন্থে স্থান পাবার কারণও সহজবোধ্য নয়। বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বা ভাবের পারম্পর্য নয়, হয়তো নিছক আকর্ষণসৃষ্টি বা কলেবরবৃদ্ধির তাগিদেই এগুলি গ্রন্থভুক্ত হয়েছে বলে মনে হতে পারে।

ধ্যান সম্বন্ধে স্বামীজী যে সকল উপদেশ দিয়েছেন তা শুধু এক তুলনারহিত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে নয়, ধ্যানসিদ্ধ আদিষ্ট শিক্ষাগুরুরূপে। তাঁর নির্দেশগুলি কেবল তাঁর অকল্পনীয় মেধা ও মননের ফসল নয়, জীবনজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, ধ্যানের তাৎপর্য প্রয়োজন ও পদ্ধতি সম্পর্কে বইখানিতে বিধৃত স্বামীজীর অমৃতসমান বাণীর কিছু কিছু অংশের ভাবানুবাদ দিই:

ধ্যান অধ্যাত্মজীবনের সবচেয়ে বড় সহায়ক। ধ্যানের মধ্যে আমরা আমাদের জড় অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের ব্রহ্মভাব অনুভব করতে পারি (পৃঃ ৪৭)।…ধ্যান আমাদের

সামনে অনন্ত আনন্দের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে। প্রার্থনা আচার-অনুষ্ঠান ও অন্যান্য পূজা-পদ্ধতি ধ্যানের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী মাত্র (পৃঃ ৩২)। …মনের চিন্তাতরঙ্গগুলোকে সংযত করার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় হলো ধ্যান। ধ্যানের সাহায্যে তুমি মনকে দিয়ে এইসব তরঙ্গকে দমন করাতে পারবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধ্যানের অভ্যাস করলে, এটা যখন স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে, স্বতঃস্ফূর্ত হবে, তখন ক্রোধ ও দ্বেষ নিয়ন্ত্রিত হবে (পৃঃ ৪৩)।…তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের পক্ষে ধ্যানাভ্যাসের জন্যে একটি আলাদা ঘর রাখা ভালো। সে ঘরে ঘুমিয়ো না। ঘরটিকে পবিত্র রাখতে হবে। স্নান না করে, দেহেমনে সম্পূর্ণ নির্মল না হয়ে কখনও সে ঘরে ঢুকবে না। ঘরটিতে সর্বদা ফুল রাখবে। ফুল যোগীর সবচেয়ে ভালো পরিবেশ। তাছাড়া এমন ছবি রাখবে যা দেখলে মনে আনন্দ হয়। সকালসন্ধ্যে ধূপ-ধুনো জ্বালবে। সে ঘরে ঝগড়াঝাটি রাগারাগি বা অপবিত্র চিন্তা করবে না। অবশ্য যাদের একটা ঘর আলাদা করে রাখবার মতো অবস্থা নয় তারা যে কোন জায়গায় ধ্যান করতে পারে (পৃঃ ৩৬-৭)।… যখন শরীর ক্লান্ত অসুস্থ কিংবা মন যখন খুব ক্লিষ্ট বিষণ্ণ থাকবে তখন ধ্যান করো না। এমন কোন নিভৃত স্থানে যাও যেখানে লোকজন ধ্যানের বিঘ্ন না ঘটায়। কোন নোংরা জায়গায় যেয়ো না। বরং বেছে নাও কোন সুন্দর দৃশ্য বা তোমার নিজের বাড়ির মধ্যে কোন সুন্দর ঘর। ধ্যান করতে বসে প্রথমে পুরাকালের যোগীগণকে, তোমার গুরুদেবকে এবং ঈশ্বরকে প্রণাম করবে; তারপর আরম্ভ করবে (পৃঃ ৩৭)। …প্রত্যহ অন্তত দু'বার ধ্যান করবে। সকাল ও সন্ধ্যার দিকটাই সবচেয়ে প্রশস্ত সময় (পৃঃ ৩৮)। …মনে মনে বার বার বলবেঃ সমস্ত লোক সুখী হোক; সকলে শান্তিলাভ করুক, আনন্দময় হোক। তারপর, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তারা প্রার্থনা করবে—অর্থের জন্যে নয়, স্বাস্থ্যের জন্যে নয়, স্বর্গের জন্যেও নয়; প্রার্থনা করবে জ্ঞান ও আলোকের জন্যে। অন্য সব প্রার্থনাই স্বার্থদুষ্ট (পৃঃ ৩৮-৯)।

*   *

বইখানি এই রকম অজস্র মণিমুক্তোর ভাণ্ডার, যা যাবতীয় মতপার্থক্য ও রুচিবৈচিত্র্য সত্ত্বেও, সর্বজনের সার্বিক উৎকর্ষসাধনের উদার আমন্ত্রণে উন্মুক্ত। ইংরিজিজানা সকল মানুষের বইটি পড়া উচিত—একটু একটু করে, বার বার, —রোমন্থন করা উচিত বহুক্ষণ। তবেই বইটির মর্মগ্রহণ করা যাবে; তবেই ধ্যানে মন লাগবে। আর, ধ্যানমুখী হলে আনন্দধারা প্রবাহিত হবে মনে—ভুবনে। এই এ বইয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির অমোঘ অঙ্গীকার। **বকলম**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

বেদান্ত-সম্মেলন

গত ২৩শে জুলাই (১৯৭৬) হইতে শুরু করিয়া চারিদিন উত্তর আমেরিকায় প্রথম বেদান্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্কের ৪৫ মাইল দূরবর্তী এল্লিকট ভিল নামক একটি ছোট শহরে শিকাগো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ এবং ডঃ ও মিসেস কেনেথ পিলারের যৌথ উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

২৩শে জুলাই, সভাগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের বৃহৎ প্রতিকৃতিত্রয় সুসজ্জিত রাখা হয়। সম্মেলনে যোগদান করেন বস্টন ও প্রেভিডেন্স কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বগতানন্দ, বার্কলি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দ, সানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ, নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ. শিকাগো বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ এবং তাঁহার সহকারী স্বামী কালিকানন্দ. স্বামী যোগেশানন্দ ও স্বামী অনামানন্দ। প্রধান অতিথি ছিলেন দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার বেদান্ত কেন্দ্রগুলির-অধ্যক্ষ স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ। লণ্ডন হইতেও একজন প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। বেদান্ত-আন্দোলনে অনুরাগী বহু বিদ্বজ্জন ও মনীষী ফিনিক্স এরিজোনা ক্যালগারি এলবার্টা কারাকাস ভেনেকোয়েলা ফিলাডেলফিয়া ওয়াশিংটন টরণ্টো পিটস্‌বার্গ ক্লিভ্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানগুলি হইতে সম্মেলনে যোগদান করেন।

সম্মেলনে ভজন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন তিনটি গায়ক-গোষ্ঠী। কানাডার পণ্ডিত রণদেব সরোদে ভারতীয় সঙ্গীত এবং ক্লিভ্‌ল্যাণ্ডের জনৈক শিক্ষিকা মিস মারগারেট নোসেক ইংরেজীতে অনূদিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর দশটি গান পরিবেশন করেন। কয়েকজন স্বামীজী ও ব্রহ্মচারী হারমোনিয়াম ও গিটার সহযোগে ভজন পরিবেশন করেন।

২৪শে জুলাই প্রাতে স্বামী যোগেশানন্দ ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার্চনা করেন। তাহার পর স্বামী সর্বগতানন্দের নেতৃত্বে সমবেত স্তোত্রপাঠ, প্রার্থনা ও ধ্যান হয়। প্রাতরাশের পর বক্তৃতা আরম্ভ হয়। স্বামী ভাষ্যানন্দ একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমাগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে বেদান্ত-সম্মেলন আহ্বানের উপযোগিতা ও পাশ্চাত্ত্যে বেদান্ত-আন্দোলনের অতীত বর্তমান এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলেন। শিকাগো সোসাইটির শ্রীযুত উইলিয়াম সালকিন সম্মেলনের কার্যসূচী উপস্থাপিত করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের শুভেচ্ছা ও সাফল্য-কামনার বাণী এবং ভারতের অন্যান্য বিশিষ্ট স্বামীজীদের সদিচ্ছাপূর্ণ বাণী সম্মেলনে পঠিত হয়।

প্রধান অতিথি স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ 'বহুমুখি-সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজে বেদান্তের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা' বিষয়ে তাঁহার অভিভাষণে বলেন: প্রাত্যহিক জীবনে বেদান্তের উদার ভাব সাধন করিতে সামাজিক মর্যাদা, বৃত্তি প্রভৃতি বিচার করিলে চলিবে না। এবিষয়ে মহাভারতে বর্ণিত মাংসবিক্রেতার কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ ক রা

যাইতে পারে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দিব্য জীবন ও শিক্ষাদীক্ষায় এই আদর্শ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাঁহারা সকল ধর্মের, সকল মতের সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন। জগজ্জননীর সন্তানভাবে অবস্থান করিয়াও অদ্বৈত-ভাবে থাকা সম্ভবপর, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ অবস্থান করিতেন। সমাজের অগ্রগতি হয় সম্প্রীতি, সদ্ভাব ও সমন্বয়ের দ্বারা, বিরোধিতা বা বিভেদের দ্বারা নয়।

বৈকালীন অধিবেশনে স্বামী সর্বগতানন্দ 'যোগ—সত্য ও মিথ্যা' সম্বন্ধে ভাষণে বলেন: বেদান্তে প্রকৃতপক্ষে 'মিথ্যা যোগ' বলিয়া কিছু নাই, তথাপি আমি জানি বস্টনের ছাত্রসমাজে যোগের ব্যবসাদারী চলে; সেখানে শুধু যোগের ক্লাশ ও ক্লাবই যে আছে তাহা নয়, যোগের রেঁস্তোরাও আছে। অবশ্য যোগের অর্থ ধর্মের সহিত—আত্মার সহিত সংযোগ বা মিলন। আন্তরিক যোগসাধনের দ্বারা তিন রকমের মিলন হয়—অন্তরের, বাহিরের (পারিবারিক, সামাজিক, মানবিক) ও ঐশ্বরিক। ক্রমবিকাশের অর্থ আত্মচেতনার বিকাশ। আমাদের শক্তি আছে, কিন্তু আধুনিক জগতে প্রয়োজন সৌভ্রাত্র। যোগের দ্বারা ইহা লাভ হয়—যোগের শক্তি আছে আমাদিগকে ঐ অবস্থায় উন্নীত করিবার। আত্মচেতনা আমাদের শিক্ষা দেয়—মন আমাদের, আমরা মনের নই। সংযমই যোগ। যম নিয়ম আসন ও প্রাণায়ামাদি যোগসাধনের আচরণ-বিধি। ধ্যান ধারণা ও আত্মসমীক্ষার অভাবেই পৃথিবীতে অধিকাংশ পাপ তাপ অন্যায় অনিষ্ট সাধিত হয়।

দ্বিতীয় বক্তা স্বামী আদীশ্বরানন্দ 'বৈদান্তিক অধ্যাত্ম-জীবনচর্যা' বিষয়ে বলেন: বেদান্ত সমগ্র জীবনে অনুস্যূত। এক কথায় বলিতে হয়—উপলব্ধিই বেদান্ত। নীরবতার দ্বারা ইহা শেখা যায়—কথা দ্বারা নয়। অতি কঠিন কাজ। এই উপলব্ধির উপায় তিনটি—শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব। শুধু শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা নয়, গুরুর সহায়তায় এ তিনের সমবায়ে সিদ্ধিলাভ হয়। কর্মযোগ ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ ও রাজযোগের সাধনা দ্বারা বস্তুলাভ হয়। সাধনার চরম পরিণতি উপলব্ধিতে। প্রেম ও ত্যাগ আধ্যাত্মিক জীবনের অত্যাবশ্যক উপাদান। হৃদয়হীন মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কহীন হৃদয় উভয়ই সমভাবে বিপজ্জনক।

সন্ধ্যায় স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ 'অধ্যাত্ম-জীবনচর্যা' প্রসঙ্গের অনুসরণ করিয়া বলেন: আধ্যাত্মিকতা জীবনকে শক্তিময় বিকাশশীল ও সম্প্রসারিত করে। বেদান্ত আত্মজ্ঞানের শিক্ষা দেয়। আমাদের আদর্শ আত্মজ্ঞানলাভ ব্রহ্মানুভূতি। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন এই আদর্শের পরিপূর্ণ বাস্তবায়িত রূপ—তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করিতেন, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলিতেন। আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতে আমরা পূজার্চনা ধ্যান ধারণা মনঃসংযম তপস্যা ও কঠোরতা করিব আবার কর্তব্যগুলি নিষ্কামভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য সচেষ্ট হইব অর্থাৎ কর্মফল ভগবানে অর্পণ করিব, তাহা হইলে ভক্তি যোগ জ্ঞান ও কর্ম যে-কোন পথে আমরা অগ্রসর হই না কেন, সেই পথেই বস্তুলাভ হইবে।

তৃতীয়দিন প্রত্যূষে ধ্যানের পর ধর্মালোচনা আরম্ভ হয়। এইদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বেদীতে তাঁহার প্রতিকৃতি রাখা হয়। স্বামী স্বাহানন্দ তাঁহার ভাষণে বলেন: আমি বার বৎসর মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠে কাটাইয়াছি। দক্ষিণ ভারতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের তাপস জীবন ধর্মপ্রচার ও সেবাকর্মের অপূর্ব কাহিনী ও ইতিহাসের কথা সম্যক্‌রূপে শুনিয়াছি এবং অবগত

আছি। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের গভীর ভক্তি বিশ্বাস ইষ্টনিষ্ঠা সংকল্পের দৃঢ়তা বাগ্‌বিভূতি প্রভৃতি দৈবীসম্পদ আমাদের অধ্যাত্মজীবনে অনুকরণীয়।

ইহার পর স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ ৯২০ খৃঃ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে-সকল পার্ষদের দিব্যসাহচর্যলাভের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা উল্লেখ করেন এবং দক্ষিণ-ভারতে রামকৃষ্ণানন্দজীর ধর্মজীবনের বহুমুখী প্রভাবের বিষয় বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বৈকালীন অধিবেশনে প্রতিনিধিগণ আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রস্তাবগুলি আলোচনা করেন।

সভাপতি স্বামী স্বাহানন্দের আহ্বানে প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। ভবিষ্যতে এরূপ বেদান্ত-সম্মেলন আহ্বানের যৌক্তিকতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিগণ সকলেই একমত হইয়াছেন —শুধু স্থান কাল দূরত্ব প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি যথাসময়ে বিবেচনা করিতে হইবে।

চতুর্থদিন প্রাতঃকালীন ধ্যানের পর বিদায়ী প্রতিনিধিগণ ভগবানের কৃপায় সম্মেলনের সার্থকতায় আনন্দ এবং ভবিষ্যতে দুই-এক বা চার-পাঁচ বৎসর অন্তরই হউক আবার পরস্পর যোগাযোগ-স্থাপনের আশা ব্যক্ত করেন। স্বামী ভাস্যানন্দ প্রতিনিধিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সম্মেলনে উচ্চারিত আধ্যাত্মিক বাণী-গুলি সকলকে স্মরণ রাখিতে বলেন।

এই সম্মেলনে ৩৫০ জন বেদান্ত-অনুরাগীর সমাবেশ হয়।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

তপন (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সংঘ কর্তৃক ১০ই মে ১৯৭৬ হইতে চারি দিবস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ও স্বামী বিকাশানন্দ। কৃষ্ণনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ রাগরঙ্গম্ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্রহ্মচারী শক্তিচৈতন্য সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন। উৎসবে অন্যূন চারি সহস্র ভক্ত নরনারীর সমাবেশ হয়।

পূর্ণিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১০ই মে ১৯৭৬ ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয়। মধ্যাহ্নে দুই শতাধিক ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির পর ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী অনুপমানন্দ এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী ভজনানন্দ।

আগরতলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ই আশ্বিন হইতে দিবসত্রয় ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সুসম্পন্ন হইয়াছে। মহাষ্টমীর দিন প্রায় দুইসহস্রাধিক ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ১২ই আশ্বিন ৭৭ জন শিশু-নারায়ণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ৫ই কার্তিক, সারা রাত্রি শ্যামাসঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীতের মাধ্যমে এক ভাব-গম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা সুসম্পন্ন হয়।

খিদিরপুর সুরবিতান কর্তৃক গত ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৭৬) শ্রীমা সারদাদেবীর এবং গত ১২ই জানুআরি (১৯৭৭) স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু 'সারদা-বন্দনা' ও 'বিবেক-বন্দনা' ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং 'সাক্ষাৎ ভগবতী মা সারদা' শীর্ষক ভাষণ দেন।

আলোচনা সভা

কলিকাতা পার্থসারথি চক্রের উদ্যোগে ৩০শে জুন ১৯৭৬ একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীপরিমল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রারম্ভে চক্রের সম্পাদক শ্রীনীরেন মৈত্র সকলকে স্বাগত জানান। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 'বর্তমান সংকটে স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে আলোচনা করেন।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি মঠের সহিত যুক্ত ছিলেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত পাঁচগাঁও গ্রামে তাঁহার জন্ম। কলমা স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাশেষে কলিকাতায় আসিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে কলেজের ছাত্রাবস্থা কাটান। সেই সময়েই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ করেন। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য কয়েকজন সন্তানেরও বিশেষ স্নেহলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য **বিমানবিহারী বসু** গত ২৮. ১১. ৭৬ তারিখে রাত্রি ১১-৫৫ মিনিটে ৭৭ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচরগণের মধ্যে অনেকেরই স্নেহধন্য ছিলেন। হুগলী জেলায় আরামবাগের অন্তর্গত বায়ু গ্রামে তাঁহার জন্ম। কলিকাতা জেনারেল পোস্ট অফিসে তিনি কর্ম করিতেন এবং ১৯৫৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিতা সেবিকা কন্যা **যামিনীবালা দেবী** দুই তিন মাস নানা অসুখে ভুগিয়া প্রায় ৭৮ বৎসর বয়সে জয়রামবাটীর অনতিদূরে গোপীনাথপুর গ্রামে তাঁহার ভাইয়ের বাড়ীতে গত ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধির পরও তিনি বহু বৎসর জয়রামবাটী আশ্রমে ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ডাঃ শীতলচন্দ্র কোলে** গত ৯ই কার্তিক ১৩৮৩ সজ্ঞানে তাঁহার সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তিনি ঝিখিরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন এবং পল্লীর অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া উন্নতির জন্য আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৯১ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন

[১ম বর্ষ।] ১৫ই অগ্রহায়ণ। (১৩০৬ সাল) [২২শ সংখ্যা।]

আসামের কথা।

(বাবু প্রবোধচন্দ্র দে।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

আবার সেই পার্ব্বতীপুর হইতে কাউনিয়ার দিকে যে লাইন গিয়াছে, তাহাই আসামে যাইবার পথ ; এবং বরাবর সোজা উত্তরাভিমুখে যে পথ গিয়াছে, তাহাই দার্জ্জিলিঙ্গের পথ। এই খানে বলা আবশ্যক যে, শিয়ালদহ-লাইন বা ইষ্টার্ন-বেঙ্গল-রেলওয়ে লাইনের গাড়ীর অপেক্ষা, নর্দার্ন-বেঙ্গল-ষ্টেট-রেলওয়ের গাড়ী ছোট, আবার কাউনিয়ার গাড়ী তাহাপেক্ষা ছোট,—অনেকটা কলিকাতার ট্রামকারের ন্যায়। শস্য-শ্যামলা রঙ্গপুর-জেলার ভিতর দেখিতে দেখিতে এবং স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পার হইতে হইতে ক্রমে বেলা প্রায় ১১টার সময় যাত্রাপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমি যে সময় আসি, তখন গ্রীষ্মকাল, নদীর জল অনেক হটিয়া গিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ষ্টেশন পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাইতে পারে না ; সুতরাং ষ্টেশন হইতে প্রায় আধ পোয়া রাস্তা বা 'মেঠো' পথ ভাঙ্গিয়া ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। যে ষ্টীমার গোয়ালন্দ হইতে দুইদিন আগে ছাড়িয়াছিল, তাহাই—এখানে অপেক্ষা করিতেছিল। ষ্টীমার ঘাটে কয়েকখানি দেশী হোটেল আছে ; যাহার ইচ্ছা, সে সেখানে স্নানাহার করিয়া লইতে পারে। পথে দুইদিন ষ্টীমারে থাকিতে হইবে এবং অন্ন জুটিবে না জানিয়া, সেখানে স্নানাহার করিয়া লইলাম।

ষ্টীমারে উঠিয়া শিলং-যাত্রী জনৈক বাঙ্গালী-ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি কলিকাতার সন্নিকট আমতা-নিবাসী। তাঁহার সহিত আলাপ হওয়ায় পথের কষ্ট অনেকটা লাঘব হইয়াছিল। পর দিবস রাত্রি প্রায় ১২টার সময়ে তিনি গৌহাটী নামিলেন ; কারণ, গৌহাটী হইতে শিলং যাইতে হয়। পরদিন সকালে আবার জাহাজ ছাড়িল। এক্ষণে আমি একাকী ; বিস্তীর্ণ নদী, তাহার দুইপার্শ্বে বন-শোভা, বিরাজিত পর্ব্বতশ্রেণী, সুবিস্তীর্ণ পতিতজমি ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে আসিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা প্রায় আট ঘটিকার সময়, তেজপুরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

আসামের পথ যদিও কষ্টদায়ক, তথাপি কিন্তু ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণ মন মোহিত হয়। কোথাও ব্রহ্মপুত্র গিরিরাজির পদপ্রান্ত চুম্বন করিতে করিতে চলিয়াছে ; আবার

---

* মাঘ, ১৩৮৩ সংখ্যার পর।—বর্তমান সঃ

কোথাও বা নদীর জল আকাশের সহিত মিলিত হইয়া অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অসীমত্বের ছায়া মানবের প্রাণে প্রতিবিম্বিত করিতেছে! বাস্তবিক ভ্রমণ না করিলে ব্রহ্মাণ্ডপতি যে কত বড়, কত মহান্, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কোন কোন স্থলে—বিশেষতঃ গৌহাটী-পদ-প্রান্ত-প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রবক্ষোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগিরিসমূহ, নানাবিধ বৃক্ষলতা-গুল্ম-পরিশোভিত হইয়া যে কি অপরূপ শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া পাঠকবর্গের তৃপ্তিসাধন করা মৎসদৃশ ক্ষুদ্র জনের কার্য্য নহে। এই স্থানে আসিয়া মনে হয়, যেন কোন কাব্যের জগতে আসিয়া পড়িলাম। মরি মরি, এমন শোভা দেখিবার জিনিষ!

গুয়াহাটী বা গৌহাটী-সহর ব্রহ্মপুত্রের উপর। এই সহর জেলার সদর; সুতরাং, এখানে অনেক লোকের বাস আছে, অনেক সাহেব সুবা আছেন, উকিল মোক্তার আছেন, দোকান পসার আছে। আবার, এই সহরই—আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ের প্রধান আড্ডা-স্থান। এই রেলের কার্য্য অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং লমডিং নামক স্থান পর্য্যন্ত রেল চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। অল্পকাল মধ্যেই যে এই সহর আসামের মধ্যে একটা প্রধান সহররূপে পরিগণিত হইবে, তাহা এইক্ষণ হইতেই বুঝা যায়। এই রেল-পথ খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অন্তর্ব্বাণিজ্য হুহু করিয়া যে বাড়িবে, তাহার সন্দেহ নাই।

তেজপুর সহরে যখন আসিয়া পৌছিলাম, তখন ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কয়েকদিনের ক্লান্তির পর, একে শরীর অবসন্ন তাহাতে আবার ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি ও তজ্জন্য রাত্রি-কালে আঁধার প্রভৃতি কারণে মনটা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন তেজপুরে আমার কোন বন্ধুবান্ধবের সহিত আলাপ পরিচয় ছিল না; সুতরাং, সেই রাত্রিতে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইব —ইহাও চিন্তার বিষয় হইল। ইতিপূর্ব্বে কখনও সে দেশে যাই নাই। এবার যে তেজপুরে গিয়াছি, সে কোন সাহেবের নিকট। আমার উচিত ছিল একেবারে সাহেবের বাটী গিয়া উঠা; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সাহেবকে কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই, সুতরাং রাত্রিকালে হঠাৎ সাহেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলে একে ত নিতান্ত বেয়াদবি হয়, অপরন্তু তাহাকে রাত্রিতে বিরক্ত করা হয়। তবে তথাকার জনৈক ভদ্রলোকের নাম আমার জানা ছিল; সুতরাং তাঁহার বাসাতে প্রথমে যাওয়া স্থির করিয়া একটা কুলি সঙ্গে লইয়া তাঁহার আলয়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাসায় গিয়া শুনিলাম যে, বাটীর মালিক মহাশয় বেড়াইতে গিয়াছেন। বাটীতে কয়েকটী বালকবালিকা আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সৌজন্যসহকারে আমাকে বসিতে বলিল এবং জলখাবার খাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিল। বালকবালিকাদিগের আতিথেয়তায় আমি বাস্তবিক অত্যন্ত পুলকিত হইলাম। বাটীর মালিক উপস্থিত নাই, সুতরাং সেস্থলে—বিশেষতঃ আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া—কোনরূপ জলযোগ করা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ মনে করিয়া কিছু খাইতে নারাজ হইলাম। ক্ষণকাল মধ্যে দুইজন বাবু আসিলেন এবং পরিচয়ে জানিলাম যে, ইহাদিগের মধ্যে একজন, বাটীর কর্ত্তাটীর কনিষ্ঠ, ও অপরটী আত্মীয়। তাঁহারাও আমাকে চিনিলেন। কর্ত্তাটীর নিকট তাঁহারা খবর পাঠাইলেন যে, অমুক-নামধেয় জনৈক ব্যক্তি কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। উত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, আমাকে আশ্রয় দেওয়া হউক। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমি ত আশ্রয় বিশেষরূপে লইয়াছি,

এক্ষণে তাহা সুদৃঢ় হইল। রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতে থাকায় উক্ত বন্ধুদ্বয়ের সহিত একত্রে আহার করিয়া যথাসময়ে শয়ন করিলাম, কিন্তু অনেকক্ষণ জাগ্রত ছিলাম। জাগ্রত থাকিয়া ইহাদিগের আতিথেয়তা ও সৌজন্যের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। বালকবালিকাদিগের সদাচরণ দেখিয়া বাস্তবিক যে আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের সদাচার, সদ্ব্যবহার প্রভৃতি অন্তঃপুরমহিলাগণের সুশিক্ষা সৌজন্য ও সদাশয়তার প্রতিবিম্বমাত্র, এবং সেই প্রতিবিম্ব ক্রমে অভ্যাস হইতে স্বভাবে পরিণত হইয়া থাকে। পরদিন প্রাতে বাটীর মালিকমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল, আলাপ হইল। ক্রমে পরস্পর পরস্পরকে চিনিলাম।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেন মহাশয় যে কে ও কি, তাহার পরিচয় দিব না। যাহা হউক, সকালে তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া সহর দেখাইতে চলিলেন। যাইতে আসিতে অনেকগুলি ভদ্রলোকের সহিত আপাততঃ আলাপ হইল, এবং ক্রমে তাহা এতই ঘনীভূত হইয়াছিল যে, দিনান্তে একবার তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে যেন প্রাণে কি একটা জিনিষের অভাব হইত, কিন্তু সে জিনিষটা যে কি, তাহা কবি বলিতে পারেন,—আমি পারি না।

যাহা হউক, যোগেশ বাবু আমাকে—সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন। সাহেবের বাঙ্গালা পাহাড়ের উপরে। সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তা শেষ হইলে আমরা উভয়ে ফিরিয়া আসিলাম। বৈষয়িক কার্য্যহেতু সাহেবের সহিত যোগেশ বাবুর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ৮।১০ দিবস সেই বাবুদিগের বাটীতে থাকিবার পরে, সাহেবের পাহাড়ের এক অংশে 'একখানি কুটীরে আসিয়া আশ্রয় লইলাম। কয়েকদিন মধ্যে প্রথম দিনের সেই বাবুদিগের সহিত এত আত্মীয়তা জন্মিল যে, তাঁহারা আর আমাকে অপর লোক ভাবিতেন না, আমিও তাঁহাদিগের নিকট নিতান্ত বশীভূত হইয়া পড়িলাম। তাঁহাদিগের সেই যত্ন, সেই অমায়িকতা, সেই অনুগ্রহ জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না।

তেজপুর সহরখানি একটী প্রাকৃতিক উদ্যান (Landscape Garden) বিশেষ। লোকে কত অর্থ ব্যয়, কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া একখানি উদ্যান রচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত সহর স্বভাবে রচিত, স্বভাবে শোভিত। সহরটী উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত, ইহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ গিরিশ্রেণী বিরাজ করিতেছে। উত্তরে হিমালয় উচ্চ হইতে উচ্চতর রজত ও শ্যামলশৃঙ্গ সুদূর দৃষ্টির গতিরোধ করিতেছে, অপরাপর দিকে ভিন্ন ভিন্ন আসামী পাহাড় মধ্য আসামকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। সহরের পদপ্রান্ত দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ আপন মনে, কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া হু-হু-হু বেগে প্রবাহিত হইতেছে। পার্ব্বত্যদেশের সহর যেমন হইয়া থাকে,—ইহার পথ-ঘাট উচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা; রাস্তার ধারে কোন স্থানে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়, কোন স্থানে রাস্তার উভয় পার্শ্বে শাশি সদৃশ গাছ, বিস্তৃত হ্রদ বায়ুর হিল্লোলে তর-তর করিতেছে! স্থানে স্থানে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপরে সাহেবদিগের 'বাঙ্গালা' সহর-কোলাহল-বিবর্জ্জিত নিভৃত-সৌন্দর্য্যরাশি-বিভূষিত হইয়া উকিঝুঁকি মারিতেছে। [ক্রমশঃ।]

ভগবদ্‌গীতা শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

[গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০ হইতে ৪৬ সংখ্যক শ্লোক, অন্বয়, মূলের অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যের অনুবাদ। —বর্ত্তমান সম্পাদক]

[১ম বর্ষ।] ১লা পৌষ। (১৩০৬ সাল) [২৩শ সংখ্যা।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ)

১। বালক যেমন এক হাতদে খোঁটা ধরে বন্ ২ করে ঘুর্‌তে থাকে, একবারও ভয় করে না, কিন্তু তার মন সেই খোঁটার দিকে সর্ব্বদা পড়ে আছে; সে মনে জানে যে, খোঁটাটি ছাড়্‌লেই আমি পড়ে যাব। সংসারেও সেই রকম, ভগবানের দিকে মন রেখে সকল কায কর, কিন্তু মন যেন তাঁর প্রতি সর্ব্বদা থাকে, তাহ'লে নিরাপদে থাক্‌বে।

২। সূর্য্যের কিরণ সব জায়গায় সমান পড়লেও জলের ভিতর, আর্সিতে ও সকল স্বচ্ছ জিনিষের ভিতর বেশী প্রকাশ দেখায়। ভগবানের সকল হৃদয়ে বিকাশ সমান হলেও সাধুদের হৃদয়ে বেশী প্রকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

৩। সকল পিঠের এটেল এক জিনিষের হলেও কিন্তু পুর ভেদে পিঠে ভাল মন্দ স্বাদ হয়ে থাকে। সকল মানুষের শরীর এক জিনিষে গড়া বটে, কিন্তু হৃদয়ের পবিত্রতা অনুসারে মানুষ ভাল মন্দ হয়।

৪। গুটি পোকা যেমন আপনার নালে ঘর ক'রে আপনি বদ্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার কর্ম্মেই আপনি বদ্ধ হয়। যখন প্রজাপতি হয় তখন ঘর কিন্তু কেটে বেরোয়, তেমনি বিবেক বৈরাগ্য হলে বদ্ধ জীব মুক্ত হয়ে যায়।

৫। চক্‌মকি-পাথর শত বৎসর জলের ভিতর পড়ে থাক্‌লেও তার কোন আগুন নষ্ট হয় না, তুলে লোহার ঘা মার্‌বা-মাত্রই আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত হাজার ২ কুসঙ্গের মধ্যে পড়ে থাক্‌লেও তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎ-কথা হলে তখনি আবার সে ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হয়।

বিলাতযাত্রীর পত্র।

(স্বামী বিবেকানন্দ প্রেরিত।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

হাঙ্গর ধরা।

সেকেণ্ড ক্লাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজী লোক। তার ত উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ-খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়্‌সির জোগাড় কর্‌লে। সে "কো'র ঘটি তোলা"র ঠাকুরদাদা। তাতে সের খানেক মাংস আচ্ছা-দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হলো। হাত চার বাদ দিয়ে, একখান মস্ত কাঠ ফাতার জন্য লাগান হ'ল। তারপর, ফাতা শুদ্ধ বঁড়সি, ঝুপ করে জলে ফেলে দেওয়া হ'ল। জাহাজের নীচে, একখান পুলিশের নৌকা, আমরা আসা পর্য্যন্ত, চৌকি দিচ্ছিল ;—পাছে ডাঙ্গার সঙ্গে, আমাদের কোন রকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হয়ে উঠলো। হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা, চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে, কোমর আঁটবার যোগাড় করছেন, এমন সময়ে বুঝতে পারলেন যে, অত হাঁকাহাঁকি, কেবল তাঁকে কড়ি কাষ্ঠরূপ হাঙ্গর ধরবার ফাতাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরাইয়া দিবার অনুরোধধ্বনি। তখন তিনি নিশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণ বিস্তার হাঁসি হেঁসে, একটা বল্লির ডগায় ক'রে, ঠেলে ঠুলে ফাতাটাকে ত দূরে ফেল্‌লেন ; আর আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে, বারাণ্ডায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে—শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম ; এবং যার জন্য মানুষ ঐ প্রকার ধড় ফড় করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো। অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো'। কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দু'শ হাত দূরে, বৃহৎ ভিস্তির মুষকের আকার কি একটা ভেসে উঠলো ; সঙ্গে সঙ্গে, ঐ হাঙ্গর ঐ হাঙ্গর রব। চুপ চুপ—ছেলের দল! —হাঙ্গর পালাবে। বলি, ওহে! সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙ্গরটা যে ভড়্‌কে যাবে ; ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে, তাবৎ সহাঙ্গর লবণ সমুদ্রজন্মা, বঁড়িসলগ্ন শোরের মাংসের তালটী উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্য পালভরে নৌকার মত সোঁ ক'রে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত—আর হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকে ; সে ভীম পুচ্ছ একটু হিললো—সোজাগতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ হাঙ্গর চলে গেল যে হে! আবার পুচ্ছ একটু বাঁকলো, আর সেই প্রকাণ্ড শরীর ঘুরে, বঁড়সি-মুখো, দাঁড়ালো। আবার সোঁ করে আস্‌ছে—ঐ হাঁ করে, বঁড়সি ধরে ধরে ; আবার সেই পাপ লেজ নড়লো, আর হাঙ্গর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চল্‌লো। আবার ঐ চক্র দিয়ে আস্‌ছে, আবার হাঁ কর্‌ছে ; ঐ—টোপটা মুখে নিয়েছে, এইবার, ঐ ঐ চিতিয়ে পড়লো ; হয়েছে, টোপ খেয়েছে। টান্ টান্ টান্। ৪০।৫০ জনে টান্, প্রাণপণে টান্। কি জোর মাছের ; কি ঝটাপট, কি হাঁ ; টান্ টান্। জল থেকে এই উঠ্‌লো, ঐ যে জলে ঘুরছে, আবার চিতুচ্ছে, টান্ টান্। যাঃ টোপ খুলে গেল! হাঙ্গর পালাল। তাইতো হেঁ, তোমাদের কি তাড়াতাড়ি বাপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে ; যেই চিতিয়েছে অমনিই কি টান্‌তে হয়? আর 'গতস্য শোচনা

নাস্তি'। হাঙ্গর ত বঁড়সি ছাড়িয়ে চোঁচাঁ দৌড়। আড়কাটি মাছকে, উপযুক্ত শিক্ষা দিলে—কিনা, তা খবর পাইনি। মোদ্দা হাঙ্গর ত চোঁচা। আবার সেটা ছিল "বাঘা"।—বাঘের মত কাল কাল ডোরা কাটা। যা হক্, "বাঘা" বঁড়সি-সন্নিধি পরিত্যাগ করবার জন্য—স-"আড়কাটি"-"রক্ত চোষা"—অন্তর্দ্ধে।

কিন্তু নেহাৎ হতাশ হবার প্রয়োজন নাই।—ঐ যে পলায়মান "বাঘার" গা ঘেঁসে আর একটা প্রকাণ্ড 'থ্যাবড়ামুখো' চলে আস্‌ছে! আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই! নইলে "বাঘা" নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিত। নিশ্চিত বল্‌ত "দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে বড় সুস্বাদ সুগন্ধ মাস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গর-গিরি কর্‌ছি, কত রকম জানোয়ার,—জেন্ত, মরা, আধমরা, উদরস্থ করেছি; কত রকম হাড় গোড়, ইট পাথর, কাঠ কুঠরো, পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে—মাখম"। "এই দেখনা আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা, কি হয়েছে" ব'লে একবার সেই আকটিদেশ বিস্তৃত মুখ ব্যাদান ক'রে, আগন্তুক-হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীন বয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে—চ্যাঙ্গ মাছের পিত্তি, কুঁজো ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠাণ্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোন না কোনটা ব্যবহারের উপদেশ দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না, তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না। অতএব যতদিন না কোন প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন করে হয়? অথবা, "বাঘা" মানুষ ঘেঁসা হয়ে, মানুষের ধাত পেয়েছে; তাই "থ্যাবড়া"কে আসল খবর কিছু না বলে, মুচ্‌কে হেঁসে, 'ভাল আছ ত হে' ব'লে সরে গেল।—"আমি একাই ঠক্‌বো"?

"আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে পাছু পাছু যান গঙ্গা……"—শঙ্খধ্বনি ত শোনা যায় না, কিন্তু আগে আগে চলেছেন "পাইলট ফিস", আর পাছু পাছু প্রকাণ্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন "থ্যাবড়া"; তাঁর আশে পাশে নেত্য করছেন "হাঙ্গর চোসা" মাছ। আহা ও লোভ কি ছাড়া যায়;—দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্ ঝিক্ করে তেল ভাসছে; আর খোস্‌বু কতদূর ছুটেছে, তা "থ্যাবড়াই" বলতে পারে। তার উপর সে দৃশ্য কি! সাদা, লাল, জরদা,—এক জায়গায়; আসল ইংরেজী শুয়ারের মাংস, কাল প্রকাণ্ড বঁড়্‌সির চারিধারে বাঁধা, জলের মধ্যে—রঙ্গ বেরঙ্গের গোপীমণ্ডল-মধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায়—দোল খাচ্চে!!

এবার সব চুপ,—ন'ড়ো চ'ড়ো না; আর দেখ,—তাড়াতাড়ি ক'রো না। মোদ্দা—কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ,—বঁড়সির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে—নেড়ে চেড়ে দেখচে; দেখুক। চুপ্ চুপ্,—এইবার চিৎ হলো;—ঐ যে আড়ে গিলছে; চুপ্—গিলতে দাও। তখন "থ্যাবড়া" অবসর-ক্রমে, আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ ক'রে যেমন চলে যাবে, অমনি প'ড়লো টান্! বিস্মিত থ্যাবড়া, মুখ ঝেড়ে চাইলে—সেটাকে ফেলে দিতে, উল্‌টো উৎপত্তি!! বঁড়সি গেল বিঁধে, আর উপরে—ছেলে, বুড়ো, জোয়ান,—দে টান্;—কাছি ধ'রে—দে টান্। ঐ হাঙ্গরের মাথাটা জল ছাড়িয়ে উঠ্‌লো,—টান্ ভাই টান্; ঐ যে—প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের ওপর। বাপ্ কি মুখ! ও যে সবটাই মুখ—আর গলা—হে! টান্ ঐ সবটা জল

ছাড়িয়েছে। ঐ যে বঁড়সিটা বিঁধেছে—ঠোঁট এ ফোঁড় ও ফোঁড়, টান্। থাম্ থাম্। ও আরব পুলিস মাঝি! ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও ত; নইলে যে—এত বড় জানোয়ার, টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙ্গে যায়। আবার টান্,—কি ভারি হে? ওমা, ওকি? তাইত হে, হাঙ্গরের পেটের নীচে দিয়ে, ও ঝুলচে কি? ও যে—নাড়ি ভূঁড়ি। নিজের ভারে নিজের নাড়ি ভূঁড়ি বেরুলো যে; যাক ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুগ,—বোঝা কমুক; টান্ ভাই টান্। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে; আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্ এই এলো। এইবার জাহাজের ওপর ফেল; ভাই হুঁসিয়ার, খুব হুঁসিয়ার,—তেড়ে এক কামড়ে, একটা হাত ওয়ার। আর ঐ ল্যাজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড়,—ধূপ্। বাবা, কি হাঙ্গর! কি ধপাৎ করেই জাহাজের ওপর পড়্লো! সাবধানে মার্ নেই। ঐ কড়ি কাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মার।—ওহে ফৌজি ম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কায।—"বটে ত"। রক্ত মাখা গায়, কাপড়ে, ফৌজি যাত্রী, কড়ি কাঠ উঠিয়ে, দুম দুম দিতে লাগলো হাঙ্গরের মাথায়। আর মেয়েরা, আহা কি নিষ্ঠুর, মের না, ইত্যাদি চিৎকার কর্তে লাগলো।—অথচ দেখ্তেও ছাড়্বে না! তারপর সে বীভৎস কাণ্ড এই খানেই বিরাম হোক্। কেমন করে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন অন্ত্র, ভিন্ন দেহ, ছিন্ন হৃদয়, হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নড়তে লাগলো; কেমন করে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, কাঠ, কুঠরো, এক রাশ বেরুলো, সে সব কথা থাক্। এই পর্য্যন্ত যে, সে দিন আমার খাওয়া দাওয়ার দফা প্রায় মাটি হয়ে গিয়েছিলো। সব জিনিষেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগলো। [ক্রমশঃ]

বেদান্ত ও ভক্তি।

(স্বামী সারদানন্দ।)

বাঙ্গালাদেশে জ্ঞান ও ভক্তির ধারণা কিরূপ?

ভক্তির প্রাধান্য এদেশে। কোমলাঙ্গ কোমলস্বভাব বাঙ্গালী—ভক্তির ধর্ম্ম'ই বোঝে;—ভক্তিশাস্ত্রের শব্দাবলী (যথা—দর্শন, ভাব, প্রেম, সাত্ত্বিকবিকার, ইত্যাদি) প্রয়োগে সুচতুর। বাঙ্গালার কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি ভক্তি ভালবাসার কথাই গাহিয়াছেন। আধুনিক কবিরাও "মহাজনো যেন গতঃ" বলিয়া, প্রধানতঃ সেই পথেই নৌকা চালাইয়াছেন। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যে মহাপুরুষ বঙ্গদেশ ধন্য করিয়াছিলেন, অপূর্ব প্রেম ও অলৌকিক ত্যাগের মিলনভূমি যাঁহার জীবন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার পবিত্রতা বুঝিবার প্রধান সহায়,—তিনিও, ভিতরে যাহাই থাক বাহিরে ভক্তির কথাই জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন এবং ভক্তির প্রভাবেই বাঙ্গালীর হৃদয়ে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর দেশ, শরীর, স্বভাব, ভাষা, কবিতা ও পূর্ব্বেতিহাস, ভক্তির বিশেষ উপযোগী না হইলে কখনই আমাদের ভিতর ভক্তাবতার—ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীর আবির্ভাব হইত না।

বাঙ্গালায় ভক্তি-ধৰ্ম্ম যেমন প্রবল, জ্ঞান ও জ্ঞানের চর্চ্চাও আবার তেমনি বিরল। "ইনি বড় জ্ঞানী ও বিচারবান্" একথা বলিলে, দেশের অধিকাংশ লোকে ভাবে—সে আবার কি?—ইনি ত কীর্ত্তনে নাচেন না?–কৈ ভগবৎ-প্রেমে ত ইঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি উপস্থিত হয় না। আবার যদি কেহ জ্ঞানশাস্ত্র-পরিচিত—সমাধি, অস্তি, ভাতি, প্রিয়, পঞ্চকোষ, সপ্তভূমিকা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেন তাহা হইলেই চক্ষুস্থির! —অধিকাংশ শ্রোতা এদিক ওদিক দেখিয়া পাশ কাটাইতে ব্যস্ত হন। কেহ বা বলেন 'শুষ্ক মার্গ'। কেহ বা—গোঁড়ামির স্রোতে গা ঢালিয়া, আর একটু অগ্রসর হইয়া—'বেদান্ত', 'অদ্বৈতবাদ', 'নাস্তিকতা', 'ঈশ্বরাবমাননা', 'নরকে যাইবার পথ'—সব একই কথা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, নাসিকা উত্তোলন ও ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

বাস্তবিক কি তবে, ভক্তি ও জ্ঞান-পথের সামঞ্জস্য নাই? জ্ঞান ও ভক্তির মিলনভূমি কি কেহই স্পর্শ করিতে পারেন না?

ধর্মশাস্ত্রাদিতে জ্ঞান ও ভক্তির অদ্ভুত সামঞ্জস্য।

শাস্ত্র-পাঠে অবগত হই, ভক্তিশাস্ত্রের ভিতরে কতই জ্ঞানের কথা! ভক্তি-প্রধান শাস্ত্র বিষ্ণুভাগবতে, পদে পদে জ্ঞান ও অদ্বৈতবাদের অবতারণা। নারদাদি ভগবদ্‌ভক্তেরা ব্রহ্মজ্ঞানের নিন্দা করা দূরে থাকুক, তাহার জন্য কত যত্ন, কত তপস্যাই করিতেছেন! পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থানের জন্য, স্বয়ং প্রয়াসী; ভক্তাগ্রণী উদ্ধবকে একান্ত, তুষারধবলিত, সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের উদ্বাহভূমি বদরিকাশ্রমে, জ্ঞান-সাধনার্থ পাঠাইতেছেন; ভক্তি ও প্রেমের মূর্ত্তিরূপিণী ব্রজাঙ্গনাদের ধ্যান ও জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার জন্য, 'কোকিলকূজিত কুঞ্জ' মধ্য হইতে অন্তর্দ্ধান হইতেছেন। আবার, অনন্যচিন্ত্য তন্মনস্ক গোপিকাগণ, কিশোর ভগবানের কমনীয় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে, 'আমি বাসুদেব' ইত্যাকার একতা-জ্ঞানের আভাস অনুভব করিতেছেন। এমন কি, প্রেমের উজ্জ্বলভূমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, স্বয়ং, কেশব ভারতীর নিকট হইতে, "তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণস্বরূপ" এই মহামন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।

অন্যদিকে আবার কুমার-সন্ন্যাসী, ত্যাগ ও জ্ঞানের জ্বলন্তমূর্ত্তি, ভগবান শঙ্করাচার্য—বৌদ্ধ বিপ্লবের পর যিনি সমগ্র ভারতে বেদ-ধর্ম্মের সনাতন ধ্বজা পুনরুত্তোলন করেন—শিবাবতার সেই মহাবীরের, ভক্তিসুধাপ্লুত হরি হর, গিরিজা ও গঙ্গা-স্তোত্রাদি পাঠে কে না বিমোহিত হইয়া থাকেন? মায়াগন্ধহীন পরমহংসাগ্রণী, মহাতেজা ভগবান্ শুক স্বয়ং—ভাগবদ্বক্তা। সনক সনাতনাদি আত্মারাম মুনিগণ ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিতেছেন। বেদমূর্ত্তি মহাজ্ঞানী ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ভগবদ্ভক্তির উচ্ছ্বাস লিপিবদ্ধ করিয়া, শান্তি লাভ করিতেছেন। এমন কি 'জ্ঞানসিন্ধু' 'জগৎ-গুরু' মহাদেব—যিনি স্বয়ং ভক্তি-তত্ত্বের প্রধানাচার্য্য—হরিভক্তি প্রদান করিয়া মহামুনি নারদের জীবন চিরকালের জন্য ধন্য করিতেছেন।

অতএব আমাদের পূর্ব্ব প্রশ্নের সামঞ্জস্য নিশ্চিত আছে। –স্থির মনে শ্রদ্ধার সহিত পূর্ব্ব-পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদ-প্রান্তে জিজ্ঞাসু হইয়া বসিলেই বুঝিতে পারিব। [ক্রমশঃ]

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ৮'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই); ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী—পৃঃ ৩১৮, মূল্য ২'২৫

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ১২৭, মূল্য ১'৫০

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ২০০, মূল্য ৩'০০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—(ছাপা নাই)

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১৬; মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ১'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'২০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৮০, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ প্রসঙ্গ— (ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২০১, মূল্য ৩'০০

তিব্বতের পথে হিমালয়ে— স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন—পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৫২, মূল্য ৩'৩০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা, ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০, শোভন ৬'০০

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।
১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। পৃঃ ১৫৮, মূল্য ২'০০

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ—স্বামী ধীরেশানন্দ (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি—স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬০, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০; ৩য় অঃ ১৩'০০; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৬, মূল্য ১'০০

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮২, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ-চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃঃ ২৭৪, মূল্য ১০'০০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ২'০০ (ছাপা নাই)

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৬২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৯তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥০টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৮৩

সূচীপত্র

পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জী
সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

সূচীপত্র

ভাল চা বলতে
টসের
চা
TOSH'S
TEA
AIR TIGHT
এ, টস এণ্ড সন্স
কালকাতা—১

অফিসের সময়: সকাল—৭-৩০ হইতে ১১-০০; বিকাল—মার্চ হইতে সেপ্টেম্বর ৩-০০ হইতে ৫-৩০; অক্টোবর হইতে ফেব্রুআরি ২-৩০ হইতে ৫-০০।

অফিস বন্ধ থাকে: প্রতি রবিবার। ১লা ও ২৬শে জানুআরি, ১৫ই অগস্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির দিন; শ্রীশ্রীমা ও স্বামী সারদানন্দের জন্মতিথির দিন ও তার পর দিন। সরস্বতী পূজা, স্বামীজীর তিথিপূজা, দোলযাত্রার দিন ও ১লা বৈশাখ। শিবরাত্রি, ফলহারিণী কালিকাপূজা ও কালীপূজার পরদিন। দুর্গাপূজার সপ্তমী হইতে দশদিন।

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন,
কলিকাতা ৭০০ ০০৩

Statement about ownership and other particulars of

UDBODHAN

FORM IV

According to Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

(1)	Place of Publication	..	1, Udbodhan Lane, Baghbazar, Calcutta-700003
(2)	Periodicity of its Publication	..	Monthly
(3)	Printer's Name ..	..	Swami Vishwashrayananda
	Nationality ..	..	Indian
	Address ..	..	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
(4)	Publisher's Name	..	Swami Vishwashrayananda
	Nationality ..	..	Indian
	Address ..	..	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
(5)	Editor's Name ..	..	Swami Vishwashrayananda
	Nationality ..	..	Indian
	Address ..	..	1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003
(6)	Names and addresses of individuals who own the newspaper		Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal

1.	Swami Vireswarananda	*President*	-do-
2.	Swami Nirvanananda	*Vice-President*	-do-
3.	Swami Bhuteshananda	,,	-do-
4.	Swami Kailasananda	,,	-do-
5.	Swami Gambhirananda	*General Secretary.*	-do-
6.	Swami Hiranmayananda	*Asst. Secretary*	do-
7.	Swami Atmasthananda	,,	-do-
8.	Swami Gitananda	*Treasurer*	-do-
9.	Swami Abhayananda		-do-
10.	Swami Dayananda		-do-
11.	Swami Pavitrananda		-do-
12.	Swami Bhaswarananda		-do-
13.	Swami Ranganathananda		-do-
14.	Swami Adidevananda		-do-
15.	Swami Tapasyananda		-do-
16.	Swami Gahanananda		-do-
17.	Swami Vandanananda		-do-

I, Swami Vishwashrayananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Sd.) Swami Vishwashrayananda
Signature of Publisher

Date 1st March, 1977

দিব্য বাণী

ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি॥
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৪।২২,২৩

(উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

সত্যদয়াশ্রিত ধর্ম-অনুষ্ঠান
অথবা কঠোর-তপোযুক্ত জ্ঞান
যে-মন আমাতে ভক্তি-বিরহিত
তাহারে সম্যক্ করে না শোধিত।

শরীরে রোমাঞ্চ মনে দ্রবীভাব
আনন্দাশ্রুধারা—ভক্তি-আবির্ভাব
বিনা এ সকল মনের শোধন
ধর্ম-অনুষ্ঠানে হয় কি কখন ?

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীচৈতন্যের পথ

ভক্তিপথ আর জ্ঞানপথ। ভক্ত ভগবানের একটা আকার চায়। কখন রূপ দেখছে, তাঁকে ডাকছে, ভজন করছে কাঁদছে ইত্যাদি। জ্ঞানীরা জ্যোতিঃ চায়। কত রকম জ্যোতিঃ দেখে। শেষে দুই এক। এই ভক্তিপথ, এতেও সেই অজ্ঞানের ধ্বংস হয়, আর জ্ঞানপথেও অজ্ঞান, অবিদ্যার ধ্বংস হয়। ·· উপনিষদ বলে, ভক্তও ঠিক, জ্ঞানীও ঠিক। উভয়েরই পথ বলা আছে, তবে জ্ঞানের কথাই বেশী দেখা যায়। ভাগবত গ্রন্থে প্রথমে অবতারাদির কথা বলেছে। ভক্তের বেশ মনে লাগে। তাঁতে ভালবাসা আসে। আবার কত মূর্তির কথাও বলা আছে। কিন্তু একাদশ স্কন্ধে জ্ঞানের চূড়ান্ত—একেবারে বেদান্ত। যোগবাশিষ্ঠ, অষ্টাবক্র-সংহিতা পুস্তকগুলি জ্ঞানের আদর্শ। এই সব গ্রন্থে জ্ঞানের পথ পরিষ্কার ক'রে রেখেছে।—কথাগুলি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানস-পুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর।

সাধারণতঃ কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান—এই ত্রিবিধ পথেরই কথা বলা হইয়া থাকে। ভাগবতের একাদশ স্কন্ধেও এই ত্রিবিধ যোগেরই উল্লেখ আছে; শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন যে, মানবগণের কল্যাণের জন্য তিনি জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন এবং এই ত্রিবিধ উপায় ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই[১] মহাভারতকে কর্ম উপাসনা ও জ্ঞান—এই কাণ্ডত্রয়াত্মক বলা হয় এবং মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে কর্মযোগ, মধ্যবর্তী ছয়টি অধ্যায়ে ভক্তিযোগ এবং শেষ ছয়টি অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ বর্ণিত হইয়াছে, টীকা-ভাষ্যকারগণ এইরূপ বলেন। অবশ্য আমরা গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে এবং ষষ্ঠাধ্যায়ে রাজযোগের কথাও পাই। ইহা সুবিদিত যে, স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগ ভক্তিযোগ রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ—এই চারিটি পথের কথা বহু বক্তৃতায় বলিয়াছেন এবং সেগুলি গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত।

তথাপি আলোচ্য স্থলে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী যে কেবলমাত্র ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথের উল্লেখ করিয়াছেন—অবশ্য অন্যত্র তিনি যে কর্মযোগের কথা বলেন নাই, তাহা নহে—তাহার কারণ এইভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে যে, ভক্তি ও জ্ঞান ফলরূপ, কিন্তু কর্ম বা যোগ ফলরূপ নহে। কেহই বলেন না যে, অমুকের যোগলাভ হইয়াছে অথবা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের প্রসঙ্গে কেহই বলেন না যে, অমুকের কর্মলাভ হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভক্তিলাভ বা জ্ঞানলাভের কথা সুপ্রসিদ্ধ। সাধনা হিসাবে কর্মের উপর যথেষ্ট জোর দিলেও মানবজীবনের উদ্দেশ্য যে ভক্তি বা জ্ঞান—কর্ম বা যোগ নহে—ইহা চতুর্বিধ যোগের অভিনব সমন্বয়ের মহান আচার্য স্বামী বিবেকানন্দেরও সুচিন্তিত অভিমত।

যাহা উপেয়, তাহার দ্বারা উপায়কে চিহ্নিত করা খুবই সমীচীন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যতঃ ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথেরই প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। পরা ভক্তি ও পরম জ্ঞান ভিন্ন নহে;

১ যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥—ভাগবত, ১১।২০।৬

এইহেতু উভয় পথ সাধকগণকে একই লক্ষ্যে উপনীত করিলেও, পথ হিসাবে উভয়ের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। শংকরাচার্য জ্ঞানপথের প্রবক্তা। জ্ঞানের সহিত কর্মের সমন্বয়ের তিনি বিরোধী। তাঁহার মত এই যে, কর্মযোগ গৃহে থাকিয়াই সাঙ্গ করিতে হইবে, গৃহত্যাগী হইলে একটিই পথ উন্মুক্ত—জ্ঞানবিচারের পথ। অবশ্য বিবিদিষু সন্ন্যাসী যে একেবারেই ভক্তিকে বিসর্জন দিবেন, তাহা নহে। শংকরাচার্যের সুস্পষ্ট নির্দেশ এই যে, বিবিদিষু সন্ন্যাসী ভগবানে দৃঢ় ভক্তি অবলম্বন করিবেন।[২] তথাপি শংকরাচার্য-প্রচারিত পন্থায় জ্ঞানবিচারেরই প্রাধান্য, ভক্তির স্থান গৌণ। এইজন্য উহা জ্ঞানমার্গ নামে সুপরিচিত। পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামী শ্রীরূপ গোস্বামী প্রমুখ আচার্যগণ ভক্তিমার্গের সহিত কর্ম ও জ্ঞান-বিচার, উভয়েরই সমন্বয়ের বিরোধী। তাঁহাদের মতে একটিই পথ—শুদ্ধা ভক্তির পথ। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার রচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

> অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
> আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় :

> অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম।
> আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

অবশ্য ইহা শ্রীচৈতন্যদেবেরই কথা এবং শ্রীরূপ ইহা ভাষান্তরিত করিয়া গ্রন্থভুক্ত করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, 'পঞ্চরাত্র ভাগবতে' ভক্তির উক্ত লক্ষণ কথিত হইয়াছে। শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুরও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'য় অনুরূপভাবে লিখিয়াছেন :

> অন্য অভিলাষ ছাড়ি, জ্ঞানকর্ম পরিহরি
> কায়মনে করিব ভজন।
> সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা, না পূজিব দেবীদেবা
> এই ভক্তি পরম কারণ॥

শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক প্রচারিত এই শুদ্ধা ভক্তির পথ আপাতদৃষ্টিতে খুবই সুগম পন্থা মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহা যত সহজ মনে হয়, তত সহজ নহে। শাস্ত্রীয় বা লৌকিক কোনও কর্মের আড়ম্বর নাই, কূট দার্শনিক বিচার লইয়া মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করিবার প্রয়োজন নাই, অন্য দেবদেবীর ঘটা করিয়া পূজার্চনা নাই—অফুরন্ত অবসর সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণভজনের, সুতরাং ইহা অপেক্ষা সহজতর পথ আর কী থাকিতে পারে! এইরূপ ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু মানুষের মনে রহিয়াছে জিজ্ঞাসা ও কর্মপ্রবণতা। উহাদের নিরুদ্ধ করিয়া শুধু ভাবভক্তি লইয়া থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী তিনিই, যাঁহার অন্তর হইতে স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা ও কর্মপ্রবণতা বিলীন হইয়াছে

এইরূপ অধিকারী সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, শুদ্ধা ভক্তির থাক একটি আলাদা থাক এবং এই থাকের মানুষ যদি অধিক কর্মের ভিতর পড়েন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করেন যে, ঈশ্বর যেন তাঁহার কর্ম হ্রাস করিয়া দেন, কারণ অন্যথা যে মন অহর্নিশ ঈশ্বরে লগ্ন থাকিবে, তাহা ব্যর্থ ব্যয়িত হইয়া যায়—শুদ্ধভক্তের মনের গতি কেবল ঈশ্বরের দিকে, তিনি আর কিছু কামনা

---

২ সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাং, শাস্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্।—সাধনপঞ্চক, ২

করেন না, আর কিছুই তাঁহার প্রীতিকর বলিয়া মনে হয় না।

এইজন্য যখন জোর করিয়া জিজ্ঞাসা বা কর্মপ্রবণতাকে দমন করা হয় অথবা যখন কর্মের শক্তিই নাই, জানিবার বুঝিবার বিচার করিবার সামর্থ্যই নাই, তখন শুধু হরিনাম করিয়া একটু উদ্দীপনা হইলেই নিজেকে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত শুদ্ধা ভক্তির উত্তম অধিকারী মনে করিয়া আত্ম-সন্তুষ্ট থাকিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

অনেকেই এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক প্রচারিত পথ হইতেছে মধুরভাবের পথ এবং ঐ ভাব অবলম্বন ব্যতিরেকে শ্রীচৈতন্যদেবের যথার্থ অনুগামী হওয়া যায় না। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া মনে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের অবতরণ প্রসঙ্গে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি 'দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ' লইয়া প্রেমাবিষ্টচিত্তে ব্রজধামে যথেচ্ছ লীলা করিয়া অবশেষে অপ্রকট হইয়াছিলেন, তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, জগৎকে প্রেমভক্তিদান করা হয় নাই; বর্তমানে বৈধী ভক্তি অবলম্বনেই বিশ্ববাসী চলিতেছে; কাজেই নামসংকীর্তনরূপ যুগধর্মের প্রবর্তন করিব, দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর, এই চতুর্বিধ[৩] ভাবাশ্রিত রাগানুগা ভক্তির দ্বারা সমগ্র জগৎ মাতাইব এবং নিজেও ঐ চারিভাবাশ্রিত ভক্তি আচরণ করিয়া সকলকে শিখাইব, কারণ স্বয়ং আচরণ না করিলে অপরকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। এইরূপ চিন্তা করিয়া গোলোকবিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত 'সম্ভবামি যুগে যুগে', এই অঙ্গীকার রক্ষা করিতে কলিকালে শ্রীচৈতন্যরূপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন।

সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব যে কেবলমাত্র মধুরভাবেরই প্রচারক, এইরূপ মনে করিবার কোনই হেতু নাই। উচ্চ ভাবভূমিতে আরূঢ় থাকিয়া মধুররস তিনি মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গ পার্ষদগণেরই সহিত আস্বাদন করিতেন এবং বাহ্যভূমিতে মন অবতরণ করিলে তিনি যে দাস্যভাবেই থাকিতেন, ইহা আমরা পদে পদে শ্রীচৈতন্যভাগবতে লক্ষ্য করি। সর্বসাধারণের জন্য তিনি দাস্যভাব ও নামসংকীর্তন প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'শিক্ষাষ্টকে'ও প্রথমে ভগবৎ-কৈঙ্কর্যের এবং সর্বশেষে মধুরভাবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব ভগবানের নামকীর্তনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন এবং বলা হয়, ইহা খুব সহজ উপায়। নামকীর্তন সহজ হইতে পারে, কিন্তু নামকীর্তনের আনুষঙ্গিক যে বিধির নির্দেশ তিনি দিয়াছেন, তাহা পালন করা খুব সহজ নহে। এবং সহজ নহে বলিয়াই অনেক নামকীর্তন করিয়াও উহা ফলপ্রসূ হইতে দেখা যায় না। অবশ্য নামের ফল অব্যর্থ, সুতরাং কালে সেই ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। কিন্তু বিধি অনুযায়ী নাম করিলে ফলপ্রাপ্তি ত্বরান্বিত হয়। সেই বিধির উল্লেখ আছে 'শিক্ষাষ্টকে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে:

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

৩ যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম-সংকীর্তন। চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥
—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, তৃতীয় অধ্যায়

—তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ হইয়া, তরুসদৃশ সহিষ্ণু হইয়া, নিজে মান না চাহিয়া এবং অপরকে মান দিয়া সর্বদা হরিকীর্তন করণীয়। শ্লোকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন : 'উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।' সনাতন গোস্বামীও অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, বৈষ্ণবীয় দীনতায় হীনতার স্থান নাই, অনেক মহৎ গুণের আধার হইলেই যথার্থ দীনতা আসিয়া থাকে। অনেক সময়ে বাহ্যিক দীনহীনভাবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অহংকার বিদ্যমান থাকে। সুতরাং 'তৃণাদপি সুনীচে'র প্রকৃত মর্ম অবধারণ করা প্রয়োজন। 'তরোরিব সহিষ্ণুনা'—বৃক্ষকে কাটিলেও বৃক্ষ যেরূপ নীরবে আঘাত সহ্য করিয়া থাকে, শুষ্ক হইলেও জল প্রার্থনা করে না এবং রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিয়াও অপরকে শীতল ছায়া দিয়া রক্ষা করে ও ফলপুষ্পাদি প্রদান করে, হরিকীর্তনের অধিকারী হইতে হইলেও অনুরূপ গুণসম্পন্ন সহনশীল মানুষ হইতে হইবে। 'অমানিনা মানদেন'—এখানেও কবিরাজ গোস্বামী 'উত্তম' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। 'উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।' অর্থাৎ অশেষগুণ-সম্পদে ভূষিত হইয়াও নিরভিমান হইতে হইবে; সর্বোপরি 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।'

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : অতএব ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদ-শূন্যতয়া **ব্রহ্মাখ্যং** ব্রহ্ম ইতি আখ্যা অভিধা যস্য তম্। **ভক্তৈঃ** নিরন্তরং শ্রবণাদিনা আত্মানং ভজমানৈঃ পুরুষৈঃ, **লভ্যং** প্রাপণীয়ম্ 'তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ' (মু. উ. ৩।২।৫) ইতি শ্রুতেঃ। শ্রবণাদিভিঃ যুক্তঃ নিয়তঃ আত্মা চিত্তং যেষাম্ ইতি অর্থঃ। **অজং** জন্মরহিতম্ 'মহানজঃ' (বৃ. উ. ৪।৪।২৪) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। **সূক্ষ্মম্** ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং 'সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরম্' (কৈ. উ. ১।১৬) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। **অতর্ক্যম্** কেবল-তর্কাগম্যং, কিন্তু উপনিষদ্‌গম্যম্ 'তং ত্বৌপনিষদম্' (বৃ. উ. ৩।৯।২৬) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। **আত্মস্থম্** আত্মনি কার্য-কারণসংঘাতে জীবত্বেন প্রবিশ্য স্থিতম্ 'তদেবানুপ্রাবিশৎ' (তৈ. উ. ২।৬), 'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য' (ছা. উ. ৬।৩।২) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। এবম্ভূতং বিষ্ণুং **ধ্যাত্বা ব্রহ্মবিদঃ** ভবন্তি। যং চ **হৃৎস্থং** সর্বপ্রাণিনাং হৃদয়ে অন্তর্যামিতয়া স্থিতম্ **ঈশং বিদুঃ**। তত্র চ শ্রুতিঃ—'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূত-ভব্যস্য' (কঠ উ. ২।১।১২) ইত্যাদিনা হৃদয়োপাধিনা অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ, স্বতঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ। মধ্যে দেহমধ্যে আত্মনি হৃদয়ে ইতি অর্থঃ। ৭।

এবং তাবদ্ ভক্ত্যাদি-সাধন-সম্পন্নৈঃ এব অবগ্রাহ্যং তত্ত্বং স্তুত্বা অধুনা তৎ-ত্বং-পদার্থ-বিবেক-সম্পন্নৈঃ এব অবগ্রাহ্যং বিষ্ণুং স্তোতুম্ উপক্রমতে—

(মূলস্তোত্রম্ ঃ)

মাত্রাতীতং স্বাত্মবিকাশাত্মবিবোধং
জ্ঞেয়াতীতং জ্ঞানময়ং হৃদ্যুপলভ্যম্।
ভাবগ্রাহ্যানন্দমনন্যং চ বিভুর্যং
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৮ ॥

মাত্রা ইতি। মীয়ন্তে অর্থাঃ আভিঃ ইতি মাত্রাঃ চক্ষুরাদ্যাঃ, তাভ্যঃ **অতীতং** চক্ষুরাদ্যগ্রাহ্যম্ ইতি অর্থঃ। অত্র শ্রুতিঃ—'ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা / নান্যৈ দেবৈস্তপসা কর্মণা বা' (মু. উ. ৩।১।৮) ইতি। অন্যৈঃ বাক্‌চক্ষুর্ভ্যাম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ, তপসা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিনা, কর্মণা অগ্নিষ্টোমাদিনা চ ন গৃহ্যতে জ্ঞাতুং ন শক্যতে। রূপজাত্যাদি-রাহিত্যাৎ ইতি অর্থঃ। তর্হি চক্ষুরাদিনা অগ্রহণাৎ ন অস্তি এব ইতি ন বাচ্যম্ ইতি আহ—**স্বাত্মবিকাশাত্মবিবোধম্** ইতি। স্বস্য প্রতীচঃ, আত্মা স্বরূপং, তস্মাৎ বিকাশঃ অভিব্যক্তিঃ যস্য তস্মিন্ আত্মনি অন্তঃকরণে, বিবোধঃ বিশেষবোধঃ যস্য স তথা উক্তঃ।

অনুবাদ ঃ অতএব ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদশূন্য হওয়ায় **ব্রহ্মাখ্যং**—'ব্রহ্ম', ইহা আখ্যা অর্থাৎ বাচক নাম যাঁহার তাঁহাকে, **ভক্তৈঃ**—নিরন্তর শ্রবণমননাদির দ্বারা আত্মার ভজনকারী পুরুষগণ-কর্তৃক, **লভ্যং**—প্রাপণীয় (এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ—) 'তে···যুক্তাত্মানঃ'—সমাহিতচিত্ত সেই ধীর ব্যক্তিগণ সর্বব্যাপী তাঁহাকে সর্বত্র প্রাপ্ত হইয়া (সর্বস্বরূপেই প্রবেশ করেন); ('যুক্তাত্মা' শব্দের অর্থ—) শ্রবণাদির সহিত যুক্ত অর্থাৎ নিয়ত—সর্বদাই ব্যাপৃত—আত্মা অর্থাৎ চিত্ত, যাঁহাদের, তাঁহারা ; **অজং**—জন্মরহিত, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—তিনি মহান্ ও জন্মরহিত ; **সূক্ষ্মং** - ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য—এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ —তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ; **অতর্ক্যম্**—কেবল তর্কের অগম্য, কিন্তু উপনিষদ্‌গম্য[১] ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন – উপনিষদের দ্বারাই

---

১ মৌলিক কোন সত্যকে স্বীকার না করিয়া মানবিক বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত তর্ক কোন স্থলেই বস্তুর তত্ত্ব নির্ধারণ করিতে পারে না। তাহার কারণ মানবীয় বুদ্ধির কোন শেষ সীমা নাই। সুতরাং যে-কোন তার্কিক অনন্যসাধারণ বুদ্ধির প্রভাবে তর্কের দ্বারা কোন মত প্রতিষ্ঠিত করিলেও, তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান তার্কিক সেই মত খণ্ডন করিতে পারেন। কিন্তু বস্তুর মূলস্বরূপ কোন অবস্থায়ই পরিবর্তিত হয় না। আচার্য শংকর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—'সম্যগ্‌জ্ঞানম্ একরূপং বস্তুতন্ত্রত্বাৎ' (ব্র. সূ. ২।১।১১, শাংকর ভাষ্য)। তাৎপর্য এই যে, বস্তুর স্বভাব সর্বদাই একভাবে অবস্থিত বলিয়া বস্তুবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানও এক প্রকারেরই হইবে। সুতরাং কেবল বুদ্ধি-প্রতিভার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ নির্ধারিত হয় না। কিন্তু শ্রুতি অনুসরণ করিয়া যুক্তির সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ নির্ধারিত হয়। বিশেষতঃ ব্রহ্ম রূপরসাদিবর্জিত বলিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় নহেন, এবং নির্ধর্মক বলিয়া অনুমানাদিরও বিষয়

জ্ঞাতব্য, তাঁহাকে (আত্মাকে) (আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি); **আত্মস্থং**—আত্মা অর্থাৎ কার্যকারণসংঘাত, এই দেহে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—'তদেব ...অনুপ্রবিশ্য'—তিনি জীবশরীর নির্মাণ করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হইলেন; এই আত্মা হইতে অভিন্ন প্রাণবিধারক চৈতন্যরূপে (তেজ, জল ও পৃথিবীর মধ্যে) প্রবেশ[২] করিয়া (নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিব।)। এই প্রকার বিষ্ণুকে **ধ্যাত্বা ব্রহ্মবিদঃ**—ধ্যান করিয়া (মুমুক্ষুগণ) ব্রহ্মবিদ্ হন। অধিকন্তু **যং**—যাঁহাকে, **হৃৎস্থং**—সমস্ত প্রাণীদিগের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত, **ঈশং**—ঈশ্বর বলিয়া **বিদুঃ**—জানেন; এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ -'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ ... ভূতভব্যস্য'—কালত্রয়ের নিয়ন্তা, অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ (দেহ-) মধ্যে হৃদয়ে অবস্থান করেন। এইজাতীয় শ্রুতির দ্বারা হৃদয়রূপ উপাধিবশতই (তিনি) অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ, (কিন্তু) তিনি স্বভাবতঃ পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ (পূর্ণত্বাৎ পুরুষঃ)। মধ্যে অর্থাৎ দেহমধ্যে, আত্মাতে অর্থাৎ হৃদয়ে—ইহাই অর্থ। ৭।

এই পর্যন্ত ভক্তি আদি সাধনসম্পন্ন (পুরুষগণ) কর্তৃকই জ্ঞেয়, তত্ত্বের স্তুতি করিয়া (আচার্য) সম্প্রতি 'তৎ-ত্বং' পদার্থ-বিচারসম্পন্ন (অধিকারিগণের) লভ্য বিষ্ণুকে স্তব করিতে আরম্ভ করিতেছেন[৩]: (মূলস্তোত্র, শ্লোক ৮, পৃঃ ১১৮ দ্রষ্টব্য)।

নহেন। অতএব একমাত্র শ্রুতিই ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ। সুতরাং আগম বা শ্রুতি ব্যতীত ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না—'নহি ইদম্ অতিগম্ভীরং ভাবযাথাত্ম্যং মুক্তিনিবন্ধনম্ আগমম্ অন্তরেণ উৎপ্রেক্ষিতুম্ অপি শক্যম্।' (ব্র. সূ. ২।১।১১, শাংকর ভাষ্য)

২ বলা হইয়াছে, সর্বব্যাপক আত্মা ভৌতিক দেহে প্রবেশ করিয়া জীব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু সর্বব্যাপক আত্মা দেহে প্রবেশ করিতে পারেন না, এইজন্য এখানে 'প্রবেশ' শব্দের অর্থ প্রতিবিম্বই বুঝিতে হইবে। জলে যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব এবং দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনই আত্মাও বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীব নামে আখ্যাত হন।

৩ আচার্য শংকর সগুণ এবং নির্গুণ, এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের বিষয় অবতারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, সগুণ ব্রহ্ম উপাস্যরূপে এবং নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয়রূপে নির্ধারিত। ('এবম্ একম্ অপি ব্রহ্ম অপেক্ষিতোপাধি-সম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধম্ উপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষু উপদিশ্যতে।'—ব্র. সূ. ১।১।১২, শাংকর ভাষ্য)। সুতরাং আচার্য শংকর এই স্তোত্রেও প্রথমতঃ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বর্ণনা করিয়া অষ্টম শ্লোক হইতে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিতেছেন। অধিকারিভেদে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা এবং নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধান করা যায়, ইহাই তাৎপর্য। ভক্তি প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার সাধন, কারণ গুণবিশিষ্ট ধ্যেয়বস্তু আলম্বনরূপে গ্রহণ না করিলে ধ্যানাদি সম্ভব হয় না। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা চিত্ত নির্মল হইলেই 'ত্বং' ও 'তৎ' পদার্থের বিচার করিয়া জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সিদ্ধ হয়। সুতরাং প্রাথমিক অধিকারীর পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য এবং উচ্চতর অধিকারীর পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট।

অন্বয় : (মুমুক্ষবঃ) মাত্রাতীতং স্বাত্ম-বিকাশ-আত্মবিবোধং জ্ঞেয়াতীতং জ্ঞানময়ং হৃদি-উপলভ্যং ভাব-গ্রাহ্য-আনন্দম্ অনন্যং চ যং বিদুঃ, সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং তং হরিম্ ঈড়ে। ৮।

স্তোত্রানুবাদ : (যিনি) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, প্রত্যগাত্মার চৈতন্তের দ্বারা উদ্ভাসিত অন্তঃকরণে যাঁহার বিশেষ প্রকাশ, (যিনি) (বৃত্তি-) জ্ঞানের অবিষয়, (যিনি) জ্ঞান-স্বরূপ, (যিনি) হৃদয়ে (প্রতিবিম্বিতরূপে) উপলব্ধির বিষয়, (যিনি) ভাবগ্রাহ্য (অর্থাৎ সৎপদার্থ-রূপে গ্রাহ্য) এবং আনন্দস্বরূপ ও অদ্বিতীয়, যাঁহাকে (মুমুক্ষুগণ উক্তরূপে) উপলব্ধি করেন, সংসারের (কারণীভূত অজ্ঞান-) অন্ধকারবিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি। ৮।

টীকানুবাদ : ইহাদের দ্বারা বিষয়সমূহ নির্ধারিত হয়—এই অর্থে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়) **মাত্রা** (-পদবাচ্য), তাহাদের **অতীত**—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইহাই অর্থ। এ বিষয়ে শ্রুতি: 'ন চক্ষুষা…বা'— (ব্রহ্ম) চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্যের দ্বারাও নহেন। অপর ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা অথবা কর্মের দ্বারাও গৃহীত হন না। (ইহাই শ্রুতিটির অর্থ)। (এ বিষয়ে টীকাকারের ব্যাখ্যা :) (বাক্ ও চক্ষুর দ্বারা তো নহেই) অন্য অর্থাৎ বাক্ ও চক্ষু ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যার দ্বারা এবং অগ্নিষ্টোমাদি কর্মের দ্বারাও তাঁহাকে জানা যায় না ; কারণ, (ব্রহ্ম) রূপ, জাতি প্রভৃতি রহিত, ইহাই অর্থ। চক্ষু প্রভৃতির দ্বারা গৃহীত হয় না বলিয়া (তাহা) নাই—ইহাও বলা যায় না, এইজন্য (আচার্য) বলিতেছেন—**স্বাত্মবিকাশাত্মবিবোধম্**। 'স্বস্য' অর্থাৎ প্রত্যকের অর্থাৎ পরমাত্মার, 'আত্মা' অর্থাৎ স্বরূপ (সুতরাং 'স্বাত্ম'=পরমাত্মস্বরূপ) ; তাঁহা হইতে বিকাশ অর্থাৎ অভিব্যক্তি যাঁহার, সেই আত্মায় অর্থাৎ অন্তঃকরণে, বিবোধ অর্থাৎ বিশেষ প্রকাশ যাঁহার তিনিই (হরি), এইরূপ কথিত হন।[৪] [ক্রমশঃ]

---

৪ তাৎপর্য এই যে, আত্মা অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হওয়ার ফলেই জড় অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত হয় এবং অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত হওয়ার ফলেই ব্যবহারিক যাবতীয় বোধ জন্মে। সুতরাং জড় অন্তঃকরণ স্বয়ং অপ্রকাশিত বলিয়া তাহার প্রকাশক চৈতন্য রহিয়াছে, ইহা সহজেই সিদ্ধ হয়।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥
—মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৬

কঠোপনিষৎপ্রসঙ্গ

স্বামী ভূতেশানন্দ*

আমরা পড়েছি নচিকেতা যখন যমলোকে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন যমরাজ অনুপস্থিত ছিলেন। নচিকেতাকে তিন রাত্রি অনাহারে থাকতে হয়েছিল যমপুরীতে। ব্রাহ্মণ অতিথি ত্রিরাত্র উপবাসী থাকায়, যমরাজ ফিরে এসে নচিকেতাকে প্রতি রাত্রির জন্য একটি ক'রে বর দিতে চেয়েছিলেন। নচিকেতা যে তিনটি বর চেয়েছিলেন, তার প্রথম এবং দ্বিতীয় বর যমরাজ নচিকেতাকে দিয়েছেন এবং তাঁর মেধা দেখে প্রীত হয়ে আরও একটি বর অধিকন্তু দিয়েছেন,—সেটি গণনার মধ্যে না আনলে, 'তৃতীয়' বরটি এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। তাই যমরাজ বলছেন : নচিকেতা, তুমি তৃতীয় বরটি চাও। তিনটি বরের দুটি বর দেওয়া হয়ে গেছে। এখন তৃতীয় বর কি চান নচিকেতা ?

এককথায় নচিকেতা তৃতীয় বরে আত্মার স্বরূপ কি তা জানতে চাইলেন। আমরা আগে দেখেছি প্রথম বরে নচিকতা যা চেয়েছেন, সংক্ষেপে বললে এই বলা যায় যে, তা হ'ল ইহলোকের সুখ। দ্বিতীয় বরে চেয়েছেন পরলোকের সুখ। এখন এ দুটি বর চাওয়ার পর আর আমরা কল্পনা করতে পারি না ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর মধ্যে এমন কিছু বাকী আছে, যা চাওয়া হয়নি এবং আরো চাওয়া যেতে পারে। সমস্ত সুখের কল্পনার এখানে পর্যবসান হয়ে গেছে, এই দুটি বর চাওয়ায়। এখন তৃতীয় বরে নচিকেতা জানতে চাইছেন অন্য জিনিস এই যে অন্য জিনিস জানতে চাইছেন, তার দ্বারা জিজ্ঞাসা একটা ভিন্ন ধারায় প্রবর্তিত হচ্ছে।

যে সুখ প্রায় সকল মানুষেরই কাম্য, সেই রকম সুখই নচিকেতা চেয়েছেন প্রথম দুটি বরে এবং যমরাজ সঙ্গে সঙ্গে সে দুটি বর দিয়েছেন। কিন্তু নচিকেতা বুঝতে পারছেন যে, যা পেয়েছেন তিনি, তাতেই সমস্ত পাওয়া মিটে যায়নি। পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তখনও রয়েছে। পরিপূর্ণতা এর ভেতর দিয়ে লাভ হয়নি। কেন লাভ হয়নি, তার উত্তর আমরা এখানেই পাব। নচিকেতা বলছেন : যা পেয়েছি আমি, এ যথেষ্ট নয়। আমি আত্মাকে জানতে চাই, যে আত্মার সম্বন্ধে লোকের এত সংশয়, যে আত্মার সম্বন্ধে কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারে না তাঁর স্বরূপ কি, এবং প্রশ্ন করে, মরবার পর কী হয় ? মরবার পর অস্তিত্ব বলে কিছু থাকে কি না ? এখানেই কি সব শেষ, না এর পরেও কিছু আছে ?

অনেক দার্শনিক বলেন, এই দেহের নাশের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর নাশ হয়ে যায়, খেলা শেষ হয়ে যায়,—সেই প্রাচীনকালে যেমন চার্বাকেরা বলেছিলেন। সেই চার্বাকদের আধুনিক কালেও অভাব নেই, বরং তাঁদের সংখ্যা আরো বেড়েছে। তাঁরা বলছেন যে, মরবার পর আর কিছু থাকবার সম্ভাবনা নেই। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের প্রণালীতে গবেষণা ক'রে আর কিছু পাচ্ছেন না। তাঁরা বলছেন যে, যে-উপাদানে শরীর তৈরী, সেই সব উপাদান মৃত্যুর পর তাদের স্বস্থানে ফিরে যায়, যেমন চলতি বাংলায় আমরা বলি পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশে যায়। শরীরটা একটা মিশ্র বস্তু —বিভিন্ন জিনিসের মিশ্রণে তৈরী। এখন এই

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ (ভাইস্-প্রেসিডেন্ট)।

মিশ্রণটা যখন ভেঙ্গে যায়, যখন এটা disintegrate করে, তখন কী হয়? বিভিন্ন উপাদানগুলি তাদের নিজের নিজের স্থানে অর্থাৎ নিজ নিজ ধাতুতে ফিরে যায়। তারপর? তারপর কি হয়, এ সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন যেন থেকেই যায়—কোথাও যেন উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। উত্তর পাবার নিশ্চিত একটা পথ, অসন্দিগ্ধ একটা পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্বেষণ কোন্ পথে যাবে? মৃত্যুর পর কি থাকে প্রত্যক্ষের দ্বারাও তা বোঝা যায় না, অনুমানের দ্বারাও বোঝা যায় না।

প্রত্যক্ষের দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে দেখিয়েছেন, একটি মোমবাতি নিঃশেষে জ্বালিয়ে, তার বিভিন্ন উপাদানগুলি কিভাবে রূপান্তরিত হয়ে স্বস্থানে ফিরে যায়। সুতরাং যাকে মোমবাতি বলছিলুম, সেটি একটি compound অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর সংহতি মাত্র। সেই সংহতি ভেঙ্গে যাওয়ায় বিভিন্ন উপাদানগুলি তাদের স্ব-স্বরূপে ফিরে যায়, মোমবাতি ব'লে কোনও বস্তু আর থাকে না। ঠিক সেই রকম এই শরীর যে বিভিন্ন উপাদানে তৈরী, সেই বিভিন্ন উপাদানগুলির সংহতি যখন ভেঙ্গে যায়, সেগুলি যখন বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, তখন তারা নিজের নিজের স্বরূপে ফিরে যায়—যে যে ধাতু দিয়ে শরীর তৈরী সেই সেই ধাতুতে ফিরে যায়। অবশিষ্ট কী থাকে? অবশিষ্ট আবার কি থাকবে! মানুষের একটা কল্পনা 'আমি' ব'লে, সেই কল্পনাটার তখন অবসান হয়ে যায়। কাকে আশ্রয় ক'রে কল্পনা হবে? এখন দেহকে আশ্রয় ক'রে আমি' এই কল্পনা চলছে। যখন দেহরূপ আশ্রয় আর থাকবে না, তখন 'আমি'র কল্পনাও আর সম্ভব নয়। সুতরাং 'আমি' সেখানে নিঃশেষিত হয়ে গেল। শুধু চার্বাকেরাই নয়, অনেক বড় বড় দার্শনিকেরা পর্যন্ত এই মত পোষণ করেন।

এই মতের খণ্ডনে সিদ্ধান্তী বলবেন, কর্মের নিয়মকে মানতে হ'লে আমাদের বলতে হয় যে, মরবার পরেও কিছু থাকে, তা না হ'লে আমি যে এ জীবনে এত কাজ করলুম তার ফল কোথায় যাবে? যদি কর্মফল বিনাশশীল হয়, দেহের সঙ্গে কর্মফলেরও নাশ হয়, তা হ'লে কর্মের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যায়। অভুক্ত কর্মফল নিঃশেষিত হয় না। 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি।' ভোগ না ক'রে শতকোটি কল্পেও কর্মের ক্ষয় হয় না—এটি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্তের হানি হয়।

চার্বাকশ্রেণীর দার্শনিকেরা এবং অনেক বৈজ্ঞানিকেরা প্রত্যুত্তরে বলবেন, সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হবে, তবে তো তার হানি হবে। সিদ্ধান্তের যে প্রতিষ্ঠাই হ'ল না, তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, শরীর নষ্ট হয়ে গেলে সব চলে গেল। সিদ্ধান্ত তোমার হাওয়ায় দাঁড় করানো চলে না। সুতরাং, সিদ্ধান্তের আবার হানি কি!

সিদ্ধান্তী এঁদের প্রতিপ্রশ্ন করবেন, শরীরনাশের পর আর কিছু থাকে না, এ বিষয়ে তোমাদের কোন প্রমাণ আছে? এঁরা জবাব দেবেন, না, প্রমাণ নেই। তবে প্রমাণ করবার ভার তো আমাদের উপর নয়। যদি বলো কিছু থাকে, তা হ'লে তা প্রমাণ করতে হবে তোমাকেই। তুমিই প্রমাণ করো। যে বলছে কিছু থাকে, তাকেই প্রমাণ করতে হবে, প্রমাণ করা তারই দায়িত্ব।

এখন সিদ্ধান্তী কি ক'রে প্রমাণ করবেন? প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রমাণিত হবে না। কারণ, পরলোক কেউ প্রত্যক্ষ করেনি। আমরা পরলোক সম্বন্ধে কল্পনা করছি মাত্র এই জগতের মত ক'রে, কিন্তু পরলোক কেউ দেখেনি। সুতরাং সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ চলতে পারে না।

অনুমানও চলে না। কেন চলে না? এ সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম যুক্তি আছে। সেটা একটু ন্যায়ের কথা হ'লেও এখানে সাদা ভাষায় বলছি, দুর্বোধ্য বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যেখানে যে বস্তুটা দেখতে পাচ্ছি না, সেখানে সে-বস্তুটা অনুমানের দ্বারা আমরা জানতে পারি। অনুমানও একটা প্রমাণ। যেমন পাহাড়ের উপরে আমি ধোঁয়া দেখছি, আগুন দেখছি না। ধোঁয়া দেখে আমি অনুমান করতে পারি যে, ওখানে আগুন আছে। কেন? —না, যেখানে যেখানে আমি দেখেছি ধোঁয়া, সেখানে সেখানে আগুনও দেখেছি। যেমন রান্নাঘরে। রান্নাঘরে যখন ধোঁয়া ওঠে, দেখেছি সেখানে তখন আগুন থাকে। আর এমন কোন ক্ষেত্র দেখিনি যেখানে ধোঁয়া আছে, অথচ আগুন নেই। যেখানে যেখানে ধোঁয়া, সেখানে সেখানেই আগুন। পাহাড়ের উপরে ধোঁয়া দেখছি, সুতরাং ওখানেও আগুন। এরই নাম অনুমান। ওখানে আগুনটা আমি প্রত্যক্ষ করছি না। দূরত্বের জন্য দৃষ্টিপথের বাইরে সেটা। কিন্তু না দেখা গেলেও, প্রত্যক্ষ না হলেও, অনুমান হচ্ছে। সেই রকম পরলোকে আত্মা আছে কিনা প্রত্যক্ষ না হলেও অনুমানে বলবো। কিন্তু এখানে অনুমানও চলবে না। কেন চলবে না? কারণ, যেখানে অনুমান করবো, তার প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার। যেমন পাহাড়ে আগুন অনুমান করছি, পাহাড়টা প্রত্যক্ষ না করলে তা'তে আগুনের অনুমান হয় না। এই সব দৃষ্টান্তে ন্যায়শাস্ত্রে 'সাধ্য', 'ব্যাপ্য', 'পক্ষ' ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করা হয়। এই শব্দগুলির ভেতরে মারাত্মক কিছু নেই। 'সাধ্য' অর্থাৎ যা সিদ্ধ করতে হবে, এক্ষেত্রে আগুন; অনুমানের সাধনভূত লিঙ্গ বা হেতুকে বলে 'ব্যাপ্য', এখানে 'ব্যাপ্য' হল ধোঁয়া। যে পদার্থে 'সাধ্যে'র সংশয় থাকে তাকে বলে 'পক্ষ', এখানে 'পক্ষ' হ'ল পাহাড়। 'পক্ষ'টি আছে ব'লে আগুনের অনুমান হচ্ছে। পরলোক তো প্রত্যক্ষই হচ্ছে না, সুতরাং আত্মার অনুমান হবে কেমন করে! এখানে 'পক্ষে'রই অনুভব নেই। সুতরাং, অনুমানও চলতে পারে না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ—এইগুলি বেশীর ভাগ দার্শনিকরা প্রমাণরূপে মানেন। আরো দুটি আছে—অর্থাপত্তি আর অনুপলব্ধি, যে দুটি সকলে মানেন না। 'শব্দ' ছাড়া আত্মা সম্বন্ধে আর কোনই প্রমাণ নেই। 'শব্দে'র অর্থ আপ্তবাক্য। কাজেই নচিকেতা যমরাজকে বলছেন, আমার তো অন্য আর কোন উপায় নেই জানবার, আপনিই ব'লে দিন। এই যে পরের কাছ থেকে শুনে জানা, এর নাম হচ্ছে শাব্দ প্রত্যক্ষ। নচিকেতা যমরাজের কাছ থেকে শুনে জানবেন। যমরাজ অতীন্দ্রিয়-অনুভবসম্পন্ন। নচিকেতা তাঁকে পেয়েছেন। সুতরাং, তাঁর কাছে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন। নচিকেতা বুঝেছেন যে, এমন সুযোগ আর হবে না, এমন লোক আর পাবেন না, যিনি এই আত্মতত্ত্ব তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। সুতরাং, যমরাজের কাছ থেকেই আত্মতত্ত্ব জানতে চান।

আগেই বলেছি ইহলোক এবং পরলোকের সমস্ত সুখ পাওয়ার পরেও অপূর্ণতা থাকে। কেন থাকে?—না, আমি যদি নিজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হই, তা হ'লে ভোগসম্পদ আমার কী কাজে লাগবে? দুদিনের আনন্দ তাতে পেতে পারি, কিন্তু তা তো, বিচার ক'রে দেখলে, দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। সুতরাং, আমার স্বরূপকে না জানা পর্যন্ত কোন ভোগই আমাকে নিত্য তৃপ্তি দিতে পারবে না। আমিই যদি অনিশ্চিত হই, তা হ'লে এসব ভোগ কার জন্যে? কার জন্যে এই ইহলোক এবং পরলোকের

সুখ সঞ্চয় করবো? কী লাভ আমার? এই সব প্রশ্ন মনে জাগে। সুতরাং আত্মাকে না জানা পর্যন্ত কোন সুখই মানুষকে নিত্য তৃপ্ত করতে পারে না। আসল কথা আত্মাকে জানা দরকার, যিনি হচ্ছেন খুঁটি, আমার কেন্দ্র। আমার কেন্দ্রকে, আমার 'আমি'কে যদি না জানি, তা হ'লে আর অন্য হাজারটা জিনিস জেনে আমার লাভ কী? যদি একের পরে শূন্য অনেক বসান যায়, তার মূল্য অনেক বাড়ে। এক-টি যদি পুঁছে দেওয়া যায়, তা হ'লে সমস্ত মূল্য শেষ হয়ে যায়। কোন দামই নেই। ঠিক সেই রকম যতকিছু আমরা জ্ঞান বলি, ভোগের বস্তু বলি, ঐশ্বর্য বলি, ঐ 'আমি'কে যদি পুঁছে দেওয়া যায়, তো সব গেল। কাজেই 'আমি'কে জানা দরকার, আর সেই 'আমি'কে যদি স্পষ্টরূপে জানা যায়, তা হ'লে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়—জানবার আর কিছু বাকী থাকে না। সুতরাং সব কিছু নির্ভর করছে, এই প্রশ্নের উপর—আমার স্বরূপ কী?

প্রশ্ন উঠবে— নচিকেতা যদি এতই বুদ্ধিমান, তো গোড়ায় কেন ওসব চাইলেন? তার উত্তর হচ্ছে—মানুষের বুদ্ধি ক্রমশঃ বিকশিত হয়। নচিকেতা গোড়া থেকেই যে আত্মজিজ্ঞাসু হয়েছিলেন, একথা মনে করবার কোন কারণ নেই। তাঁর ভেতরে অন্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। যখন সে আকাঙ্ক্ষাগুলি মিটলো, তখন তাঁর মনে নতুন ক'রে জিজ্ঞাসা জাগলো। এই জিজ্ঞাসা আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা। আমরা এর আগের দিন আলোচনা করেছি যে, প্রত্যেক মানুষের ভেতরে কোন না কোন সময়ে আত্মজিজ্ঞাসা জেগে ওঠে। মানুষ চিরকাল নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না। তার 'আমি'কে জানবার ইচ্ছা হয়। প্রথম হয়তো নিজেকে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে ধ'রে নিয়ে জিজ্ঞাসা করবার আকাঙ্ক্ষা জাগে না, কিন্তু তারপর সন্দেহ ওঠে। প্রশ্ন ওঠে যে, আমার 'আমি'কে যদি না জানি, তা হ'লে এসব নিয়ে কী করব! এই সব সম্পত্তি আর অন্য যা কিছু নিজের ব'লে মনে করছি—এসব কার জন্য? এসব পেয়ে লাভটা কী? এইজন্য 'আমি কে'? —এই প্রশ্ন মনে জাগে। নচিকেতার মনেও জেগেছে। নচিকেতা তাই প্রশ্ন করলেন:

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ (১।১।২০)

'মনুষ্যে প্রেতে'—মানুষ মারা গেলে, 'যা ইয়ং বিচিকিৎসা'—এই যে বিচিকিৎসা, এই যে সন্দেহ, এই যে সংশয়—কী সংশয়? 'অস্তি ইতি একে, ন অয়ম্ অস্তি ইতি চ একে'—কেউ বলেন ইনি আছেন, কেউ বলেন ইনি নেই অর্থাৎ কেউ বলেন পরলোকে আত্মা আছেন, কেউ বলেন নেই; 'এতৎ'—এটি অর্থাৎ আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিষয়টি, 'অহং বিদ্যাম্'—আমি জানতে চাই, 'ত্বয়া অনুশিষ্টঃ' —আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে। 'বরাণাম্ এষঃ তৃতীয়ঃ বরঃ'—বরগুলির মধ্যে এইটি তৃতীয় বর।

যে মরেছে, তার কথা হচ্ছে না, যারা থাকে, তাদের এই প্রশ্ন জাগে, যে গেল, সে কি আছে, না নেই? যারা একটু বিচারশীল, তাদেরই এই প্রশ্ন জাগে। যে লোকটা ছিল, যাকে নিয়ে এত দিন কাটলো—এত আলাপ, পরিচয়, ব্যবহার,—যাকে কেন্দ্র ক'রে হয়তো একটা ইতিহাস রচিত হতে চলেছে, মৃত্যু কি চিরকালের জন্য একটা ছেদ টেনে দিল? আর কি সে রইল? আর যদি থাকে তো কীভাবে রইল? এই প্রশ্ন যারা বেঁচে থাকে, তাদের মনে

ওঠে। যে চলে গেল, আমরা জানি না তার মনে কী উঠছে। যারা থাকে, তাদের মনে ওঠে। কী সুন্দরভাবে নচিকেতা এই প্রশ্নটি এখানে তুলেছেন! মা তাঁর সন্তানকে হারিয়েছেন। মায়ের মনে প্রশ্ন—সে কি আছে? স্ত্রী স্বামীকে বা স্বামী স্ত্রীকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রশ্ন—সে কি আছে? এই প্রশ্ন মানুষের চিরন্তন। অন্য কোন প্রাণীর মনে এ প্রশ্ন ওঠে কিনা আমরা জানি না, তাদের মন আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু মানুষ মাত্রেরই, যারা একটু বিচারশীল তাদেরই, এই প্রশ্ন—সে কি আছে?

আমরা কল্পনা ক'রে নিই, সে আছে এবং কল্পনা অনুসারে সে যা যা ভালবাসত সেই সব জিনিস শ্রাদ্ধাদিতে তার উদ্দেশে অর্পণ করি। তবু প্রশ্নটি রয়েই যায়। উত্তর তার পাই না। এই যে উত্তর পাই না, এর থেকেই সন্দেহ জাগে সত্যি আছে কিনা এখানেই কি সব শেষ?

এখানেই যদি সব শেষ হয়, তা হ'লে মানুষের সব নীতি ভূমিসাৎ হয়ে যায়। কোন প্রয়োজন নেই ভালভাবে চলবার। যে যে-রকম ক'রে পারি চলবো। 'হেসে নাও দুদিন বৈ ত নয়।' কিন্তু তাতে কি সত্যি সত্যি প্রশ্নটা শেষ হয়ে যাচ্ছে? যতই হাসি, সেটা হচ্ছে কান্নারই একটা রূপান্তর মাত্র। সত্যি সত্যি হাসি নয়। কাজেই প্রশ্ন আমাদের শেষ হচ্ছে না। জিজ্ঞাসার অবসান হচ্ছে না। তাই নচিকেতা যমরাজকে বলছেন: এই প্রশ্নের উত্তর কি, তা আমাকে ব'লে দিন।

আমরা তো পরলোকগত আত্মার সম্বন্ধে কত রকম শুনি, planchette করি, দৈবজ্ঞের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, ওঝা নামিয়ে জিজ্ঞেস করি, আরও কত কি করি! কেন? —না, মানুষের এই প্রশ্ন চিরন্তন। যা দেখতে পাই না, যা শুনতে পাই না, যা দেখবার শোনবার জানবার কোন উপায়ই আমাদের নাগালের ভেতরে নেই, তাকে জানবার কিন্তু অদম্য আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তাই আমরা নানা পথে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। নচিকেতা বলছেন, এই প্রশ্নের উত্তরটিই আমার তৃতীয় বর।

আমরা আগেই বলেছি যে, এই প্রশ্ন হয়তো যমরাজ অনেকের কাছ থেকে শুনেছেন। কিন্তু উত্তর দেবার দরকার হয়নি। কারণ, উত্তর শোনবার জন্য কেউ ছিল না, উত্তর ধারণা করবার কেউ ছিল না। সকলেই জিজ্ঞাসা করেছে, ক'রেই পথ চলতে আরম্ভ করেছে, অপেক্ষাও করেনি উত্তরের জন্য। যেমন বাইবেলে আছে Pontius Pilate যীশুখ্রীষ্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'What is truth?' কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই চলে গিয়েছিলেন (John 18 : 38)। সত্য কি—এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা মনে ওঠে, প্রশ্ন মনে ওঠে, কিন্তু ধৈর্য নেই সে প্রশ্নের সমাধান জানবার জন্য। আগ্রহ নেই। সুতরাং মানুষ নিজের নিজের কাজে আবার চলে যায়। মা সন্তানকে হারিয়ে প্রশ্ন করলেন, সে কি আছে? তার পরে আর অপেক্ষা নেই। জীবনযাত্রা চালিয়ে যেতে হবে। যত আঘাতই হোক, জীবনযাত্রাকে স্তম্ভিত ক'রে দিতে পারলে না। জীবনযাত্রা চললো। প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে গেল। প্রায় সব মানুষেরই এই অবস্থা। সুতরাং, যমরাজের কাছে কেউ প্রশ্ন করলেও তাঁর উত্তর দেবার দরকার হয় না। নচিকেতা কিন্তু সে রকম নন। তিনি উত্তর না নিয়ে নিবৃত্ত হবেন না। এটা আমরা পরে দেখবো। যমরাজ এখন নচিকেতাকে পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, তিনি কি ঐ রকম লোকেদের ভেতর একজন, যারা প্রশ্ন ক'রেই পথ চলতে আরম্ভ করে উত্তরের জন্য

অপেক্ষা না ক'রে, অর্থাৎ যাদের উত্তর না দিলেও চলে। নচিকেতা কি সে রকম? তাই যমরাজ বলছেন:

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥
(১।১।২১)

'দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা'—প্রাচীন কালে দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয় করেছিলেন। দেবতারাও সন্দিহান এ সম্বন্ধে। আমরা জানি মানুষের চেয়ে দেবতারা অনেক বেশী জ্ঞান-সম্পন্ন। কিন্তু সেই দেবতারাও, অর্থাৎ মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চশ্রেণীর জীব যাঁরা, তাঁদেরও এ সম্বন্ধে সংশয় মেটেনি। আর বাস্তবিকই এই তত্ত্বটি বড় সূক্ষ্ম। 'অণুরেষ ধর্মঃ'—এই ধর্ম অর্থাৎ আত্মরূপ ধর্ম—আত্মতত্ত্ব 'অণু', অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম। অতিশয় সূক্ষ্ম কেন? না, আগেই যেমন বলা হয়েছে আমাদের জানা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলি এক্ষেত্রে কাজ করছে না। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়টি জানতে পারছি না। আর মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রেও এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারছি না। সুতরাং এই বিষয়টি সহজবোধ্য নয়—'ন হি সুবিজ্ঞেয়ম্'। অতএব, 'নচিকেতঃ'—হে নচিকেতা, তুমি এই অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে এত আগ্রহশীল না হয়ে 'অন্যং বরং বৃণীষ্ব'- অন্য বর চাও। অন্য কিছু বর চাও যা তোমার কাজে লাগবে। যমরাজের বলার তাৎপর্য: এটি এত সূক্ষ্ম জিনিস যে, তোমার কেন দেবতাদেরও যখন এ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছে, তখন তুমি শুনলেও হয়তো বিষয়টি বুঝতে পারবে না। সুতরাং তুমি যে তৃতীয় বরটি পাবে, সেটি বৃথা নষ্ট কোরো না। এইভাবে তুমি যদি জেদ কর, আমাকে হয়তো বলতে হবে। কিন্তু বললে তোমার বোধ হয় কোন লাভ হবে না। কারণ, তুমি হয়তো বুঝতেই পারবে না। দেবতারাই পারেন না, আর তুমি তো মানুষ এবং তার ভেতরে আবার একটি ছোট ছেলে! তুমি কী বুঝবে এ সম্বন্ধে? সুতরাং, তুমি অন্য বর চাও। যমরাজ আরও আগ্রহ ক'রে বলছেন, 'মা'—আমাকে, 'মা উপরোৎসীঃ'—উপরোধ কোরো না। 'অতি মা সৃজৈনম্'। 'মা'—আমার প্রতি, 'এনম্'—এটি অর্থাৎ এই বরটি, 'অতিসৃজ'—ছেড়ে দাও। জবরদস্তি ক'রে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য কোরো না। অন্য বর চাও। এই প্রশ্নটি নিয়ে জেদ কোরো না। কেন বলছেন এসব কথা? আগেই বললুম যে, যমরাজ নচিকেতাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা না ক'রে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিতে প্রস্তুত নন। ভাল ক'রে যাচিয়ে বাজিয়ে দেখে নিতে হবে যে, নচিকেতা সত্যি সত্যি এই আত্ম-তত্ত্ব শোনবার মত অধিকারী কি না। এই অধিকারী বিচার না ক'রে যমরাজ এত সূক্ষ্ম তত্ত্ব হঠাৎ দিয়ে ফেলতে চান না। কাজেই এত ক'রে বুঝিয়ে বলছেন এবং আরও বলবেন। নচিকেতা কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তাই বলছেন:

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল
ত্বং চ মৃত্যো যন্ন সুজ্ঞেয়মাত্থ।
বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো
নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ॥
(১।১।২২)

'দেবৈঃ অত্র অপি বিচিকিৎসিতং কিল'—দেবতারাও নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন, 'ত্বং চ মৃত্যো যৎ ন সুজ্ঞেয়ম্ আত্থ'—হে মৃত্যু, হে যমরাজ, আপনিও বলছেন যে, এই আত্মতত্ত্ব সুজ্ঞেয় নয়, সহজবোধ্য নয়। 'বক্তা চ অস্য ত্বাদৃক্ অন্যঃ ন লভ্যঃ'— এবং আপনার মতো (আত্মতত্ত্বের) অন্য বক্তাও পাওয়া যাবে না।

'ন অন্যঃ বরঃ তুল্যঃ এতস্য কশ্চিৎ'—(সুতরাং) এর তুল্য অন্য কোনও বর নেই।

অতএব আপনি যে বলছেন, এ ছেড়ে আর একটা চাইব, আর কী চাইব? এর মতো এত প্রয়োজনীয়, অতি আবশ্যক বিষয় আর কিছুই নেই। আমাকে এটি জানতেই হবে। আর আমি কিছু চাই না। অন্য কোন জিনিস নচিকেতা এর বদলে চেয়ে নিন—যমরাজ এই চাইছিলেন। কিন্তু নচিকেতা বলছেন—না, এর বদলে আর কিছু চাইবার মত দেখছি না। আত্মজ্ঞান যদি না থাকে, তা হ'লে পৃথিবীর বা স্বর্গের কোন জিনিসই আমার কাম্য নয়। আমি এইটিই চাই। এই বলে নচিকেতা আগ্রহ দেখালেন। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলছেন, এর মতো আর কিছু নেই, কারণ, এই আত্মজ্ঞানের দ্বারাই মানুষের মুক্তি সম্ভব। নচিকেতা এখনও মুক্তির কথা বলেননি; জিজ্ঞাসু হয়ে বলছেন। ভাষ্যকার ভাব পূরণ ক'রে দিয়ে বলছেন যে, এটি হ'ল নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তির হেতু। নিঃশ্রেয়স শব্দের অর্থ শ্রেয় শুধু নয়, 'নিতরাং শ্রেয়ঃ'—পরম কল্যাণ। যাকে বলা হয়েছে মুক্তি। তার প্রাপ্তির এইটি কারণ। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই নিঃশ্রেয়স হবে, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। সুতরাং এই বরের তুল্য অন্য আর কিছু নেই; ভাষ্যকার বলছেন, 'অনিত্যফলত্বাদ্ অন্যস্য সর্বস্য এব'—যেহেতু অন্য সব বরেরই ফল অনিত্য।

নচিকেতা আত্মতত্ত্ব জানতে দৃঢ়সংকল্প। তিনি কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হচ্ছেন না। তাই তাঁকে লোভ দেখিয়ে যমরাজ বলছেন:

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব
বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব,
স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি॥

(১।১।২৩)

'শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব'— শতবর্ষ আয়ু-বিশিষ্ট পুত্রপৌত্র কামনা করো, প্রার্থনা করো। 'বহূন্ পশূন্ হস্তি-হিরণ্যম্ অশ্বান্'—বহু (গবাদি) পশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ—যেসব ঐশ্বর্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় আছে, যেসব ঐশ্বর্য মানুষ কামনা করে, সেগুলি তুমি প্রচুর পরিমাণে চাও। 'ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব'— এ পৃথিবীতে তুমি বিশাল রাজ্য চাও। এ সবই আমি তোমায় দিতে প্রস্তুত। যদি বলো যে, এ সমস্ত ঐশ্বর্য ফেলে একদিন চলে যেতে হবে, সুতরাং দুদিনের এই ঐশ্বর্য নিয়ে কী হবে, তা হ'লে 'স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি'—তুমি নিজে যত বছর ইচ্ছে বেঁচে থাকো—সে বর আমি দিচ্ছি। কারণ, মৃত্যুর রাজা আমি। সুতরাং, কোন চিন্তা নেই। যত দীর্ঘ পরমায়ু চাও, আমি দেব।

আরো বলছেন:

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং
বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি॥

১।১।২৪)

যদি এর তুল্য অন্য বর মনে করো, তাও চাও। ঐশ্বর্য এবং চিরজীবনও চাও। চাওয়া মাত্রেই যমরাজ দিতে প্রস্তুত। 'মহাভূমৌ নচি-কেতস্ত্বমেধি'—হে নচিকেতা, তুমি মহাভূমি, বিশাল রাজ্যের উপরে আধিপত্য কর। 'কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি'—তোমাকে সমস্ত কাম্যবস্তুর ভোগসমর্থ ক'রে দেব। অর্থাৎ দিব্য এবং পার্থিব যাবতীয় কাম্যবস্তুর যথেচ্ছ ভোগের ক্ষমতা তোমাকে আমি দিতে প্রস্তুত। এ সবই যমরাজ দিতে পারেন, কারণ তিনি সত্যসংকল্প দেবতা।

কাম্যবস্তুগুলি আরও বিস্তার ক'রে পরের শ্লোকে বলছেন:

যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মাঽনুপ্রাক্ষীঃ॥

(১৷১৷২৫)

'যে যে কামাঃ দুর্লভাঃ মর্ত্যলোকে' যেসব কাম্যবস্তু এই মনুষ্যলোকে দুর্লভ, সেসব তুমি 'ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব'—ইচ্ছামত প্রার্থনা কর। যা চাই তোমার, যা তোমার ইচ্ছা হয়, চেয়ে নাও। 'ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যাঃ'—রথে আরোহণ ক'রে এবং বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এই সমস্ত অপ্সরাগণ—প্রলোভনের বস্তুগুলি যেন সামনে ধরে দিচ্ছেন যমরাজ—'ন হীদৃশাঃ লম্ভনীয়াঃ মনুষ্যৈঃ'—এদের মতো রমণী মানুষের লভ্য নয়। 'আভির্মৎ-প্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব'—আমার প্রদত্ত এদের দিয়ে তোমার পরিচর্যা করাও। 'নচিকেতঃ মরণং মা অনুপ্রাক্ষীঃ'—হে নচিকেতা, মরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন কোরো না। মৃত্যুর পর কী হয়; আত্মা থাকে কি না; যদি থাকে, তো আত্মার স্বরূপ কী—এ সব প্রশ্ন কোরো না।

ছেলে যখন কাঁদে, দুরন্তপনা করে, মা সব খেলবার জিনিস দেন। ছোট্ট হ'লে চুষিকাঠি দেন, বড় হ'লে আরও কত সব খেলনা দেন। আধুনিক খেলনা বেরিয়েছে নানান্ রকম! সবই মনে রাখতে হবে খেলনা—যমরাজ যা দিতে চাইছেন, তাও। তা সেই খেলনা দিয়ে নচিকেতাকে ভোলানো হচ্ছে। তবে এ খেলনা অত সস্তা খেলনা নয়। বিশাল রাজ্য, জগতের যত ঐশ্বর্য সব যেন একেবারে সংগৃহীত ক'রে সামনে দেখিয়ে বলছেন, এই সব তোমার, তুমি নাও, ভোগ করো। বাইবেলে আছে, ভগবান যীশু যখন চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাসী থেকে তাঁর সাধন শেষ করেছেন, তখন শয়তান এসে তাঁকে একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য সামনে দেখিয়ে বলছে,—এই দেখ, এই সমস্ত তোমাকে দেব, যদি তুমি আমার ভজনা করো। যমরাজও সমস্ত ভোগ্যবস্তু যেন নচিকেতার সামনে ধরে দিচ্ছেন—'ইমা রামাঃ' ব'লে। নচিকেতাকে একেবারে চরম পরীক্ষার ভেতরে ফেলছেন। নচিকেতা তার উত্তরে কি বলছেন? উত্তরে বলছেন: যমরাজ, আপনি আমাকে ভোলাচ্ছেন কিন্তু আমি ভুলছি না। আমি বিচার ক'রে দেখেছি যে, আপনি যা দিতে চাচ্ছেন, তাতে মানুষের তৃপ্তি হ'তে পারে না। বলছেন নচিকেতা:

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥

(১৷১৷২৬)

হে অন্তক, হে যমরাজ, আপনি যা দিতে চাচ্ছেন—এইসব অপ্সরা নৃত্যগীত ঐশ্বর্য—এগুলি 'শ্বোভাবাঃ', কাল থাকবে কিনা সন্দেহ। অতি নশ্বরতা বোঝাবার জন্য 'শ্বোভাবাঃ' শব্দটি প্রয়োগ করা হ'ল। আর কার বস্তু এগুলি? 'মর্ত্যস্য'—যে মানুষ নিজে মরণশীল, তার ঐশ্বর্যগুলিও নশ্বর, আর যে মানুষকে দেবে, তারও জীবন নশ্বর। তা ছাড়া 'সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ'—সর্বেন্দ্রিয়াণাং যৎ এতৎ তেজঃ (তৎ) জরয়ন্তি—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এই যে শক্তি তা ভোগ্যবস্তু-গুলি জীর্ণ করে। ভোগ করতে করতে মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয় জীর্ণ হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয় ভোগ ক'রে যে সুখে থাকবো, সে আশা নেই। প্রথম হচ্ছে ভোগ্যবস্তুগুলি নশ্বর, দ্বিতীয় হচ্ছে আমি নশ্বর আর তৃতীয় হচ্ছে ভোগের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয় জীর্ণ হয়, তাদের শক্তিক্ষয়

হয়। সুতরাং, এসবের ভেতর দিয়ে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। আর যে বলছেন যমরাজ দীর্ঘ জীবন দেবেন, তার উত্তরে নচিকেতা বলছেন, 'অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব'—যত দীর্ঘই জীবন হোক, অনন্ত কালের তুলনায় তা অল্পই, যেহেতু তা সীমিত—তার একটা সীমা আছে। অসীম জীবন হয় না, যেমন সোনার পাথরবাটি হয় না। বাটিটা যদি সোনারই হয়, তা হ'লে আবার পাথরের হতে পারে না। ঠিক সেই রকম যদি জীবন হয়, তো তা অনন্ত হতে পারে না। আমাদের পরমায়ু হয়তো পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি—বড় জোর একশ। কিন্তু একশ বছর অনন্ত কালের মধ্যে কতটুকু! অনন্ত কালের সঙ্গে যদি তুলনা করি আমরা, একশ বছরই বা কি, হাজার বছরই বা কি! কতটুকু! অতএব 'তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে'—এই সব রথ নৃত্য গীত, এসব আপনারই থাক। এ সব আমি চাই না। এ সবে আমার প্রয়োজন নেই, কারণ আমি বুঝেছি এ সবে আমার আনন্দ হবে না। এই কথাই পরের শ্লোকে বিস্তার ক'রে বলছেন :

ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা।
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥

(১।১।২৭)

'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'—মানুষ বিত্তের দ্বারা, ঐশ্বর্যের দ্বারা কখনও তৃপ্ত হতে পারে না। কেন? এটা আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখলেই বুঝতে পারি। ঐশ্বর্য পেয়ে কে কবে সন্তুষ্ট হয়েছে? ঐশ্বর্য পেলুম, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখকে, অনন্ত দুঃখকে বরণ করে নিতে হচ্ছে। সুখ আসে দুঃখের মুকুট মাথায় পরে। সুখকে নিলে, তার মাথার মুকুটটিকে অবশ্য নিতে হবে। সুতরাং, রেহাই নেই। মানুষ বিত্তের দ্বারা, ঐশ্বর্যের দ্বারা তৃপ্ত হতে পারবে না। কেউ এ জগতে আজ পর্যন্ত বিত্তের দ্বারা সুখী হতে পারেনি। যে সুখ আমরা দেখি, সেটা ক্ষণিক, সাময়িক মাত্র। যদি এই বিত্ত, ঐশ্বর্য আমার প্রচুর পরিমাণে হয়, তা হলেও মনে হবে যে, আর একজনেরও তো এরকম ঐশ্বর্য আছে। সুতরাং তৃপ্তি হবে না। আর যদি আমার চেয়েও ঐশ্বর্যশালী একজন থাকে তো কথাই নেই! আরো যদি এই কথা মনে ওঠে যে, এই ঐশ্বর্য চিরকাল থাকবে না, অথবা চিরকাল আমি বেঁচে থাকবো না, তা হ'লে ঐশ্বর্যের সব আনন্দ চলে গেল। কাজেই বলছেন যে, ঐশ্বর্যের দ্বারা মানুষ তৃপ্ত হতে পারে না। আরো বলছেন, 'লপ্স্যামহে বিত্তম্ অদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা'—আর আমি আপনাকে যখন দেখেছি,—আপনি হচ্ছেন একজন শ্রেষ্ঠ দেব—আপনাকে যখন দেখেছি, তখন বিত্ত আমি এমনিই পাবো। চাইবার দরকার নেই। আপনার দর্শনে বিত্ত আমার এমনিই হবে! এ একটা মস্ত লাভ হয়েছে যে, আমি আপনাকে পেয়েছি। সুতরাং কোন চিন্তা নেই। না চাইলেও বিত্ত আপনি দেবেন। আর যে বলেছেন দীর্ঘ জীবন দেবেন, তাও আমি পাবো। 'জীবিষ্যামো যাবৎ ঈশিষ্যসি ত্বং'—আপনি যতদিন যমপদে আছেন, ততদিন তো এমনিই আমি বেঁচে থাকবো। নচিকেতা হিসেবী ছেলের মত কথা বলছেন। 'বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব'—যে বর আমি চেয়েছি, সেই বরই আমার প্রার্থনীয়।

আরো বলছেন নিজের মনের বিচারকে স্পষ্টতর ক'রে :

অজীর্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।

অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥
(১।১।২৮)

'অজীর্যতাম্ অমৃতানাম্ উপেত্য'—জরামৃত্যুহীন দেবতাদের সান্নিধ্য লাভ ক'রে 'জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্'—জরামরণশীল মানুষ, স্বর্গাদির অধোভাগে অবস্থিত এই পৃথিবীর অধিবাসী—সে যখন জানতে পারে যে, দেবতাদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট প্রয়োজনান্তর সিদ্ধ হতে পারে—অন্য ভাল জিনিস, অমূল্য জিনিস পাওয়া যেতে পারে, তখন 'অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্'—অপ্সরাদির রূপ, তাদের সঙ্গে ক্রীড়া এবং তার ফলে যে সুখ, সে সম্বন্ধে বিচার ক'রে দেখলে অর্থাৎ ও সব অসার ব'লে জানলে 'অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত'—অতি দীর্ঘ জীবনে কে আনন্দিত হবে ?

আমরা ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধে বিচার ক'রে দেখি না। আমরা বিচার করি না যে, এই ভোগের বস্তুগুলি সত্যি সত্যি আমাদের কতটুকু সুখ দিতে পারে। যে ঠিক ঠিক বিচার করবে, তার কিছুতেই এতে মন উঠবে না। দীর্ঘ জীবন দিলেও নয়। ভোগ্যবস্তুর নশ্বরত্ব শুধু প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে তাদের তুচ্ছত্ব। জিনিসগুলি যে শুধু নশ্বর, তাই নয়, সেগুলি তুচ্ছও এবং পরম তত্ত্ব ভুলিয়ে রাখে। ছোট ছেলে জানে না তাকে খেলনা দিয়ে ভুলানো যায়। কিন্তু যে বিচারশীল, যার মন জাগ্রত, বিষয়গুলির মূল্য যে হিসেব ক'রে দেখতে শিখেছে, চাকচিক্যে যে মুগ্ধ নয়, তার কাছে সেগুলি তুচ্ছ বোধ হবে। খুব রঙচঙে একটা চুষিকাঠি দিলে ছোট ছেলে সোনার গয়না হয়তো ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু নচিকেতা সেই রকম শিশু নন। নির্বোধ নন। তিনি বস্তুগুলিকে বিচার ক'রে দেখেছেন। যমরাজ যা দিতে চাচ্ছেন, সেগুলির মূল্য তিনি হিসেব ক'রে দেখেছেন। তার পরে বলছেন :

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যং তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥
(১।১।২৯)

এই মন্ত্রটির প্রথমার্ধে নচিকেতা বলছেন, 'মৃত্যো'—হে মৃত্যু, হে যমরাজ, 'যস্মিন্ ইদং বিচিকিৎসন্তি'—মানুষ মারা গেলে লোকে যে বিষয়ে সংশয় করে, অর্থাৎ আত্মা আছেন অথবা নেই, এ রকম সংশয় করে, 'যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নঃ তৎ'—'মহতি' অর্থাৎ মহৎ প্রয়োজনের নিমিত্তভূত অর্থাৎ মুক্তির হেতুভূত সেই পরলোক-বিষয়ক আত্মজ্ঞান আপনি আমাদের উপদেশ করুন। 'সাম্পরায়ে' অর্থাৎ পরলোকবিষয়ে। নচিকেতা আগেও মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের প্রশ্ন তুলেছেন, এখানেও সেই একই কথা বলছেন। তাই পরলোকবিষয়ক আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন। নতুবা শুধু আত্মজ্ঞান বললেই হয়।

মন্ত্রটির শেষার্ধে শ্রুতি বলছেন, 'যঃ অয়ং বরঃ গূঢ়ম্ অনুপ্রবিষ্টঃ'—এই যে বর, তৃতীয় বর, যা গহনে প্রবিষ্ট, যেন পর্বত-গহ্বরের মধ্যে লুকানো, অর্থাৎ যে বিষয়টি দুর্জ্ঞেয়, 'ন অন্যং তস্মাৎ নচিকেতা বৃণীতে'—নচিকেতা তা ছাড়া আর অন্য কিছু চায় না।

মানুষ যখন অন্য আর কিছু চায় না, তখন তাকে আর প্রতিরোধ করা যায় না, তাকে আর কিছু দিয়ে তখন ভোলানো যায় না। নচিকেতাকে ভোলাবার মত যমের কাছে আর বস্তু নেই। যা কিছু ছিল ঐশ্বর্য, দীর্ঘ জীবন ইত্যাদি,—সব বস্তু দিয়ে তিনি প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছেন এবং যে তত্ত্ব নচিকেতা জানতে চাচ্ছেন, তার দুর্জ্ঞেয়ত্বের কথাও বলেছেন

অর্থাৎ নচিকেতার যে আত্মজ্ঞান নাও হতে পারে —এ রকম ধারণা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন যমরাজ। কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই ভোলেননি। নচিকেতা বুঝেছেন চাইবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল এই আত্মজ্ঞান। এর মত আর দ্বিতীয় কিছু নেই। সুতরাং নচিকেতা এই আত্মজ্ঞানই চাইছেন, অন্য আর কিছু তিনি চান না। শ্রুতি একথা এখানে ব'লে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বল্লীর উপসংহার করেছেন।

নচিকেতাকে প্রলোভিত করা শেষ হয়ে গেল। যমরাজ বুঝলেন যে, নচিকেতা সাধারণ মানুষের মত নন, যাকে ঐশ্বর্য দিয়ে ভোলানো যায়, যার মনকে ধ্যেয় বস্তু থেকে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করা যায়। আমাদের পুরাণাদিতে বেশ একটি দৃষ্টান্ত আছে: কেউ যদি তপস্যা করে, ইন্দ্র তার কাছে অপ্সরা টপ্সরা সব পাঠিয়ে দেন, তাকে ভোলাবার জন্য। কেন? তা না হ'লে পাছে ইন্দ্রত্বটা সে কেড়ে নেয়! কী ভয়! আমার ঐশ্বর্য তা হ'লে কেড়ে নেবে, কারণ তপস্যার প্রভাবে কী না করতে পারে সে! এই রকমের ভয়ে তপোভঙ্গ করবার জন্য অপ্সরাদি পাঠিয়ে দেওয়া—এ যেন একটা গতানুগতিক প্রথা।

পুরাণে এই সব কথা আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থেও রয়েছে। যখন বুদ্ধদেব বোধিলাভ করবার জন্য উন্মুখ হয়েছেন, শেষ সংগ্রাম হিসেবে মার সসৈন্যে এসে আবির্ভূত হলেন। আমরা যাকে কামদেব ব'লে বলি, তারই যেন রূপ নিয়ে, তারই যেন বহু শক্তি নিয়ে মার আবির্ভূত হলেন তপস্যার বিঘ্ন করবার জন্য। কামনা থেকেই মানুষ তপোভ্রষ্ট হয়—এইটি দেখাবার জন্য পুরাণাদিতে নানান রকমের প্রলোভনের বর্ণনা করা হয়েছে। মারও অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিলেন বুদ্ধদেবকে। ঠিক সেই রকম বাইবেলেও আছে—আগে যে কথা বলেছি—শয়তান যীশুকে প্রলুব্ধ করেছে, তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। এ যেন একটা চিরন্তন প্রথা। একজন এগিয়ে যাচ্ছে তো তার বিরুদ্ধে, তার সেই অগ্রগতি প্রতিহত করবার জন্য, যত রকমের বিপরীত শক্তি যেন সক্রিয় হচ্ছে। এই শক্তি বাইরের নয়, ভেতরের। মানুষের ভেতরের অশুভ শক্তিগুলি, তার শুভ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম না ক'রে পরাজয় স্বীকার করে না। মানুষ যখন সাধনপথে এগিয়ে যায়, তখনই মাত্র সে তার অশুভ শক্তির বল সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে। তারা যে কত প্রবল, তারা যে কতখানি তার সাধনাকে ব্যর্থ ক'রে দিতে পারে, কত প্রবল যুদ্ধ ক'রে যে তাদের জয় করতে হয়—যখন সাধক সাধনপথে এগোয়, তখনই তার তা অনুভব হয়। তার আগে নয়। যখন মানুষ স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন স্রোত কতটা প্রবল তা সে বুঝতে পারে না। যখনই সে স্রোতের বিপরীত দিকে চলার চেষ্টা করে, তখনই বুঝতে পারে কতখানি শক্তির প্রয়োজন বিপরীত দিকে যাবার জন্য। বুঝতে পারে স্রোতের শক্তিকে প্রতিহত ক'রে এগিয়ে যেতে কতখানি বল দরকার হয়। সেইজন্য সাধনপথে যখন খুব এগিয়ে যায় কেউ, তখনই তাকে এই বিপরীত শক্তির সম্মুখীন হতে হয়। যাকে আমরা বলি 'ভগবানের পরীক্ষা', যাকে আমরা বলি, 'দেবতাদের প্রলোভন', তাকেই আমরা বলতে পারি, সাধকের শুভ শক্তিকে পরাভূত করবার জন্য তারই অন্তর্নিহিত অশুভ শক্তির প্রচণ্ড প্রয়াস। যখন কামনা-বাসনা মনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা চরিতার্থ করতে আমরা প্রস্তুত থাকি, তখন তার বেগ কতখানি তা আমরা বুঝি না। যখনই আমরা চেষ্টা করি যে, না আমরা এতে ভুলবো না, পরাভূত হবো না, তখনই বোঝা যায় কী সংগ্রাম প্রয়োজন।

যতক্ষণ আমরা কামনা-বাসনার দাস, ততক্ষণ ইন্দ্রের প্রয়োজন হয় না অপ্সরা পাঠিয়ে দেবার। ইন্দ্র জানেন, তাঁর হাতেই আছি, কব্জার ভেতরেই আছি। যখন তিনি দেখেন যে, আমরা তাঁর কব্জার বাইরে চলে যাচ্ছি, তখনই প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ সাধনপথে শুভ সংস্কারগুলি যখন অশুভ সংস্কারগুলিকে পরাভূত করতে যায়, তখনই অশুভ সংস্কারগুলি সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে চেষ্টা করে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে এবং সেই অন্তিম সংগ্রামে সাধক যদি জয়ী হন, তা হ'লে সিদ্ধি তাঁর সুনিশ্চিত।*

* ১১ই মে, ১৯৭৫ কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে কঠোপনিষদ্‌-ব্যাখ্যা। শ্রীসমীরকুমার রায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী*

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ †

আজকের এই পুণ্যতিথিতে আমরা সমবেত হয়েছি বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে স্বামী বিবেকানন্দের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার জন্য এবং তাঁর জীবন ও বাণীর আলোকে নিজ নিজ জীবন গঠন করবার জন্য অনুপ্রেরণা যাতে লাভ করতে পারি সেইজন্য।

স্বামী বিবেকানন্দের যে বিরাট ব্যক্তিত্ব, সে-ব্যক্তিত্বের কথা আমরা অনেকেই পড়েছি, অনেকে শুনেছি এবং সেই ব্যক্তিত্বের পাদমূলে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছি। শুধু আমরা নই, জগতের বহু বিশিষ্ট চিন্তানায়ক—রোমাঁ রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মনীষিবৃন্দ—এই মহা বীরের, বীরেশ্বরের যে-উক্তি, যে-বক্তৃতা, সেগুলি পাঠ ক'রে গভীর-ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং তাঁর প্রতি তাঁদেরও অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

স্বামীজীর আবির্ভাব—যুগক্রান্তিকারী এক বিরাট আবির্ভাব, যে-আবির্ভাব নতুন জগৎ-গঠনের স্বপ্ন আমাদের সামনে ধরে দিয়েছে। একথা কেবল আমরা বলছি না। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধুনাতন অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী সুপ্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ্‌ গ্রন্থকার ডঃ ব্যাসম্‌ও বলেছেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ নতুন জগতের নির্মায়কমণ্ডলীর অন্যতম প্রধান। এই যে নতুন জগৎ গড়ে উঠছে তাতে স্বামী বিবেকানন্দের যে অবদান, সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে। এবং এই চিন্তা করায় আমাদের লাভ এই যে, যে-যুগপ্লাবন এসেছে, সেই প্লাবনের স্রোতে আমাদের নিজেদের কর্ম-শক্তিকে মিলিয়ে দিয়ে, নতুন জগতের দিকে, নতুন সৃষ্টির দিকে, নতুন উষার উন্মেষের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। কাজেই স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর অনুধ্যানের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের নিজেদেরই জন্য, নতুবা তাঁর বাণী এমনই যে, তার সার্থকতা কোন মানুষের প্রচেষ্টার অপেক্ষা করে না। নতুন নতুন বীরের সৃষ্টি হবে, যারা স্বামীজীর

* ১২ই জানুআরি ১৯৭৭, স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় সভাপতির অভিভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।—সঃ

† রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহসম্পাদক

বাণীকে রূপায়িত করবে কিন্তু আমরা অধন্য হয়ে যাবো, অসফল থেকে যাবো, যদি আমরা এই সুযোগকে প্রত্যাখ্যান করি। এইজন্যই স্বামীজীর জীবন ও বাণীর অনুশীলনের প্রয়োজন এবং সেইভাবে নিজেদের জীবন গঠন করা প্রয়োজন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের দিকে আমরা যখন তাকাই তখন আমরা দেখতে পাই, ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ধর্মমহাসভায় গৈরিকমণ্ডিত এক যুবক সন্ন্যাসী হিন্দুধর্মের প্রবক্তারূপে আবির্ভূত। যে-যুগে সাগরপারে গমন ছিল নিষিদ্ধ, সে-যুগে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যের দ্বারে গিয়ে আঘাত হানলেন ধর্মপ্রচারকরূপে। এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা, কারণ যুগ যুগ পরে ভারতবর্ষের এক সন্ন্যাসী সনাতন ধর্মের প্রতিভূ হ'য়ে ভারতবর্ষের যে বক্তব্য বস্তু রয়েছে, সেই বস্তু নিয়ে ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু কী সে-বস্তু? কী সে-বাণী? আজ আমরা চুরাশি বছর পরে তাঁর বক্তৃতা প'ড়ে, তার বিষয়বস্তু যখন আলোচনা করি, তখন মনে হয়, কথাগুলি কত সহজ; শিকাগো ধর্মমহাসভায় তাঁর আবির্ভাব ও বক্তৃতা অত্যন্ত সহজ সরল ব্যাপার ব'লে মনে হয়। কিন্তু সেই সময়ের কথা একবার অনুধাবন করুন।

তাঁর দেওয়ার বস্তু কী ছিল? হিন্দুধর্মের প্রবক্তা তিনি। কিন্তু হিন্দুধর্ম বলতে কোন্ ধর্মকে সমগ্র বিশ্বের সামনে উপস্থাপিত করবেন তিনি? এটা কি শাংকর বেদান্ত? এটা কি রামানুজীয় বেদান্ত? এটা কি শৈবসিদ্ধান্ত? এটা কি তান্ত্রিকদের বাদ?—কোথায় ছিল হিন্দুধর্মের সংহত রূপ? যে-হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আজ আমরা এত গর্বিত, নানা জায়গায় ব'লে বেড়াচ্ছি আমাদের হিন্দুধর্ম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধর্ম—কোথায় ছিল তার সুস্পষ্ট পরিপূর্ণ রূপরেখা স্বামী বিবেকানন্দের আগে? অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলতে আমি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেও স্মরণ করছি। কোথায় ছিল হিন্দুধর্মের একটা সুসংহত রূপ, যখন স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসভায় বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হলেন? সেইজন্য ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ যখন বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, তখন তাঁর বিষয়বস্তু ছিল হিন্দুদের ধর্মভাবসমূহ, কিন্তু যখন তিনি শেষ করলেন, তখন হিন্দুধর্ম নতুনভাবে নির্মিত হয়ে গেল। শিকাগো ধর্মমহাসভায় পঠিত স্বামীজীর 'Paper on Hinduism'—হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ—যদি আপনারা পাঠ করেন, দেখবেন হিন্দুধর্মের সমস্ত মতামত গ্রহণ ক'রে তিনি তাদের মধ্য থেকে একটি সাধারণ গুণিতক আবিষ্কার করেছেন।

স্বামীজী বলেছিলেন, হিন্দু কেবল মতবাদ বা শাস্ত্রবিচার নিয়ে থাকতে চায় না; সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির পারে যদি কিছু থাকে, হিন্দু তা উপলব্ধি করতে চায়—অপরোক্ষানুভূতিই হিন্দুর মূলমন্ত্র। পড়ে বা শুনে কোন মতবাদ বা বদ্ধমূল ধারণায় বিশ্বাস করা নয়, সেই বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিজের অনুভূতির গোচরে নিয়ে আসা—এই হ'ল লক্ষ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন এবং ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ ক'রে শেষ করেছিলেন, তখন তাঁর মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছিল: শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ তত্ত্বগুলি কি সত্য? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি পেয়েছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে। তিনি দেখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বহিঃশিক্ষা বর্জন করেও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করেছিলেন। দেখেছিলেন, তিনি মুহূর্তের মধ্যে ঊর্ধ্বাকাশে চলে যাচ্ছেন—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত ভূমিতে—এবং সেই

ভূমি থেকে জ্ঞানরাশি আহরণ ক'রে জগতে তা বিতরণ করছেন। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবে স্বামী বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন জীবন ও ধর্ম বোঝবার কুঞ্জি।

স্বামীজী দেখেছিলেন, ভারতবর্ষ ভৌগোলিক সীমায় বদ্ধ একটা ভূখণ্ড মাত্র নয়—সমগ্র ভারতবর্ষ হচ্ছে একটা জৈব পদার্থ, যে জৈব পদার্থ আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ। একথা আমরা পাই বিষ্ণুপুরাণেও। সেখানে বলা হয়েছে :

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু তে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ ॥

দেবতারা গান গাইছেন—ধন্য তাঁরা, যাঁরা স্বর্গ ও অপবর্গরূপ প্রাপ্য স্থানের দ্বারস্বরূপ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁরা দেবতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

অন্যান্য লোক ভোগভূমি, সেখানে ভোগ পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতবর্ষ কর্মভূমি, এখানে কর্মের দ্বারা মুক্তি পর্যন্ত পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ মুক্তিতীর্থ।

মুক্তির তীর্থক্ষেত্র এই ভারতবর্ষে স্বামীজী জীবন্ত এবং জাগ্রত আধ্যাত্মিক একটি জৈব পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন, যার ক্ষুদ্র প্রতিরূপ ছিল তাঁর গুরুর জীবন। এইভাবে তাঁর যে প্রস্তুতি, তা শেষ হয়েছিল। হিন্দুধর্মের উপর স্বামীজীর যে লিখিত বক্তৃতার কথা আমি পূর্বে বলেছি, সেই বক্তৃতার উপাদান এই প্রস্তুতি থেকেই তিনি পেয়েছিলেন। তিনি বেদকে সংজ্ঞায়িত করলেন সেই বক্তৃতার ভিতরে। আমরা বলি বেদ অপৌরুষেয়, কিন্তু স্বামীজী বললেন জ্ঞানমাত্রেই অপৌরুষেয়। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন মানুষের সৃষ্ট নয়—আবিষ্কৃত মাত্র, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেই রকম। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে য আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার ক'রে গেছেন, বেদ সে সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ। কর্মকাণ্ড—কর্মসম্বন্ধীয় রীতিনীতি আইনকানুন বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা সর্বথা অপ্রতিহত। এই জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ বেদান্তই সার্বলৌকিক সার্বভৌমিক এবং সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

বেদান্তের শাশ্বত বাণীসমূহের মধ্যে একটি বাণী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যার উল্লেখ পূর্ববর্তী দুই বক্তা করেছেন। সেটি হচ্ছে মানুষ তৈরী করার বাণী। ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামীজী বলেছিলেন, 'The older I grow, the more everything seems to me to lie in manlines. This is my new gospel.'—যতই দিন যাচ্ছে, ততই আমার মনে হচ্ছে যে, সব কিছুই পৌরুষেই রয়েছে। এইটি আমার নতুন 'সুসমাচার'।

কিন্তু এটা কোন্ পৌরুষ? এটা কি কোন মল্লবীরের পৌরুষ বা কোন রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক নেতার পৌরুষ? না, তা নয়। সেই পৌরুষ কী, তা বুঝতে হ'লে স্বামী বিবেকানন্দ যে-তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন শ্রীগুরুর জীবন দেখে এবং তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে ব'সে, সেই তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীগুরুর কৃপায় অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে স্বামীজী বললেন, মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে হবে। এটি নতুন বাণী নয়। এ বাণী উপনিষদে আছে। কিন্তু উপনিষদ্ ছিল অরণ্যের অন্তরালে—ঋষিরা তার অনুশীলন করতেন। শংকর তা ব্যাখ্যা করলেন, প্রচার করলেন, কিন্তু আবদ্ধ রাখলেন একটি গণ্ডীর ভেতর। সাধারণ্যে প্রচার সম্ভব হ'ল

না। শংকর অধিকারবাদের কথা বললেন। বললেন, সকলে এর অধিকারী নয়—যে-মানুষের নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক আছে, ইহামুত্রফলভোগে বিরাগ আছে, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি আছে, এবং মুক্তির তীব্র ইচ্ছা আছে, বিরল সেই মানুষই এর আলোচনার অধিকারী, অপরে নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর নির্দেশক্রমে বললেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে, তাই কর।' বললেন, জীবনের ধারা যে পথেই চলুক না কেন—ত্যাগী হও, গৃহী হও, মা ষষ্ঠীর পূজা করো, মা কালীর পূজা করো, যে-কোন নাম জপ করো, যে-কোন রূপ ধ্যান করো, যে-কোন দেবতার উপাসনা করো, জীবনের সকল কাজের ভিত্তিভূমি করো অদ্বৈতজ্ঞানকে। এই অদ্বৈতজ্ঞান, এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে আবদ্ধ রাখলে চলবে না, সমগ্র জগতে এই জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে—বললেন স্বামীজী।

কী সেই জ্ঞান? না—সকলেরই ভিতর নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন। স্বরূপতঃ সকলেই নিত্যশুদ্ধ নিত্য-বুদ্ধ নিত্যমুক্ত। খৃষ্টানরা অনন্ত নরকের ভয় দেখিয়েছেন, হিন্দুরাও অনেক নরকের নানা রকম বিভীষিকা দেখিয়েছেন, কিন্তু তার ফলে মানুষের কি কোন উন্নতি হয়েছে? হয়নি। সুতরাং মানুষকে শিক্ষা দাও তার অদ্বৈতস্বরূপ সম্বন্ধে। বলো তাকে—তুমি পাপী নও, দুর্বল নও, অনন্ত শক্তি রয়েছে তোমার ভিতরে। তুমি যা কিছু কাজ করো, যে-কোন সাধনা করো, সবেতেই এই শ্রদ্ধা— নিজের ওপর এই বিশ্বাস —নিয়ে এসো। এ যদি করো, তা হ'লে তোমার জীবন সার্থক হবে। এই হ'ল স্বামীজীর বাণী—স্বামীজীর নব ধর্ম। এই নব ধর্মকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

স্বামীজীর স্মৃতিপূজার দিন বেলুড় মঠে এসেছি, ঠাকুরকে প্রণাম করেছি—অশেষ কল্যাণকর সেই প্রণাম। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী হৃদয়ে বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে—আমি হীন নই, দীন নই, আমি অনন্ত-শক্তির উৎস, কারণ আমি অদ্বিতীয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা।

স্বামীজীর এই বাণীকে ভিত্তি ক'রে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করুন। দেখবেন, জীবনে অপার শান্তি আসবে, হৃদয়ে অসীম শক্তি আসবে এবং যে নতুন যুগের সূচনা স্বামীজী করেছেন, সেই নতুন যুগের নির্মাণে নিজেদের সহায়ক ব'লে মনে ক'রে ধন্য হতে পারবেন।

স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন:

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ ॥

হে সখা, কেন কাঁদছো? তোমাতেই তো সব শক্তি রয়েছে। হে ভগবন্, তোমার ঐশ্বর্যশালী স্বরূপকে জাগ্রত করো। এই অখিল ত্রিভুবন তোমারই পাদমূলে। আত্মারই প্রভাব ক্রিয়া করে জড়ের কখনও নয়।

ঐ চিঠিতেই স্বামীজী আরও লিখেছিলেন:

ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যন্ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যন্ত্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্ ॥

দেহকেই যারা আত্মা ব'লে মনে ক'রে আতুর হয়, সেই মূঢ় লোকেরা সকরুণভাবে বলে, আমরা ক্ষীণ, আমরা দীন,—এরই নাম নাস্তিক্য।

আমরা রামকৃষ্ণের দাস, আমরা নির্ভীক,

আমরা বীর, যেহেতু আমরা অভয়পদে প্রতিষ্ঠিত—এরই নাম আস্তিক্য। এই আস্তিক্যই আমরা চয়ন করবো।

এই হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী। যদি আপনারা রামকৃষ্ণের ভক্ত হন, তা হ'লে এই বাণী অনুসরণ ক'রে চলুন—নিজেকে কখনও দুর্বল ভাববেন না।

স্বামীজী আরও একটি সুন্দর শ্লোক লিখেছিলেন। সেটি ব'লেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

কুর্মস্তারকচর্বণং ত্রিভুবনম্ ,
উৎপাটয়ামো বলাৎ।
কিং ভো ন বিজানাস্যস্মান্
রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্ ॥

আমরা তারা চিবিয়ে খাবো, ত্রিভুবন সবলে উৎপাটিত করবো, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণের দাস।

যদি আপনারা রামকৃষ্ণের দাস হন, তা হ'লে এই শ্রদ্ধা, এই ভক্তি, এই আত্মবিশ্বাস হৃদয়ে সর্বদা জাগিয়ে রাখুন।

গান

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

[ইমন কল্যাণ—একতাল]

রামকৃষ্ণের বেদীতলে মোরা মিলিয়াছি এক প্রাণ।
পরা অপরা বিদ্যা সাধিয়া লভিব দিব্য জ্ঞান ॥

শৌর্যে করিয়া অঙ্গ-ভূষণ সত্যের তরে ধরিব জীবন
সর্ব শক্তি আছে অন্তরে, জানিয়াছি সন্ধান ॥

'ত্যাগ ও সেবা'র সাধনা সহায়ে মানুষ হইব মোরা
তাই যে মোদের জাতির সাধনা, সেই সনাতন ধারা।
'বিবেকে'র সেনা আমরা সবাই, উন্নতশির মোদের সদাই
উচ্চকণ্ঠে মোরা গেয়ে যাই মহামিলনের গান—

'বিবেকে'র জয় গান
গাহি আনন্দে, জয় মহামায়া, জয় জয় ভগবান
জয় জয় ভগবান! জয় জয় ভগবান!! জয় জয় ভগবান!!!

প্রার্থনা

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য

দুরিতনাশনং কামশাসনং
পরমসুখাবহং কল্মষাপহম্ ।
চরণপঙ্কজং মঙ্গলালয়ং
শরণমস্তু মে রামকৃষ্ণ ! তে ॥ ১ ॥

বুধগণার্থিতং যোগিবন্দিতং
মুনিজনার্চিতং সিদ্ধসেবিতম্।
দ্যুতিময়ং মহানর্থতামসে
তব পদাম্বুজং মেঽস্তু মানসে ॥ ২ ॥

কুমতিখণ্ডনং বিশ্বমণ্ডনং
হৃদি মদাপহং সজ্জনাশ্রয়ম্ ।
পরপদার্থিনাং কল্পপাদপং
শিরসি মেঽস্তু তে পাদপঙ্কজম্ ॥ ৩॥

বিরচিতাভয়ং বন্ধনাত্যয়ং
শুভনিকেতনং ধর্মকেতনম্ ।
পররসামৃতাপাদনং সতাং
শরণমস্তু তে পাদপঙ্কজম্ ॥ ৪ ॥

বিষয়নাগিনীদংশনোদ্ভবং
বিষয়কামনাপ্রোচ্ছলং বিষম্ ।
নিজকথাসুধাসিঞ্চনৈ র্নৃণা-
মপনয়ন্ ভবান্ বিশ্বতো গুরুঃ ॥ ৫ ॥

ধ্রুবমিহেশ্বরো দ্বৈতবর্জিতো
বিবিধমার্গতো লভ্যতে জনৈঃ ।
স্বকৃতসাধনালব্ধতত্ত্ববিৎ
কথিতবান্ ভবানেক এব হি ॥ ৬ ॥

তৃণবদুজ্ঝিতং কামকাঞ্চনং
পরবিরাগতস্ত্যাগিনা ত্বয়া ।
তব কৃপাবলাদস্তু মে মনো
বিগতবাসনং নির্মলং সদা ॥ ৭ ॥

ত্রিদিববিচ্যুতং দিব্যমদ্ভুতং
হৃদয়কন্দরালোককারণম্ ।
পতিতপাবনং ত্বাং ধরাতলে
স্মরতু মে মনঃ সর্বদা ভৃশম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জীবানন্দ

বিশ্বের গগন যবে অবিদ্যার মেঘ
তীব্রবেগে ঢেকে দিতে হ'ল সমুদ্যত,
জগতের ভগবান রামকৃষ্ণ-রূপে
করুণামণ্ডিত হয়ে পূর্ণ আবির্ভূত !
দেননি রামের মতো ধনুকে টঙ্কার,
বাজাননি পাঞ্চজন্য শ্রীকৃষ্ণের মতো,
শিল্পী গড়ে মাটি দিয়ে প্রতিমা যেমন
দিলেন মানব-মনে গড়ন যে কত !

অপরা বিদ্যার প্রতি বিনা দৃষ্টিপাতে
পরাবিদ্যা-দান ভবে আশ্চর্য ব্যাপার,
সুসভ্য শিক্ষিত জন পরম বিস্মিত,
আপামর সকলের হ'ল সমুদ্ধার !
যিনি রাম যিনি কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণ,
যুগলীলা-তরে তাঁর শরীরধারণ !

পরিত্রাতা

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

চিরকাল চেয়ে থাকে ওরা সেই পথ পানে—
কোথায় সমাপ্তি তার—সীমা কত দূর
চেয়ে ভাবে স্থবির আতুর
পথটা কে জানে!

শুনেছে কাহিনী তারা যুগে যুগে লোকে লোকে
পথ নয়, ওটা মহাপারাবার
পথই ওটা, কেউ বলেছে আবার।

চলিয়াছে পঙ্গু বৃদ্ধ—যদি কেউ ধরে হাত তার
শুনেছে কাহিনী—আসে পাটনী বা নিয়ে
ডুবু ডুবু খেয়া তরী বেয়ে
উত্তরিয়া দিতে পরপার।

আরো কবে কে সে এসেছিল ছু' হাত বাড়ায়ে
পিঠে নিয়ে ধরেছে জড়ায়ে
দেহখানি অন্ধ ও পঙ্গুর!

কিন্তু নাম তার জানায় না—জানায় না ঠিকানাটি তার!
কেউ বলে হরি—কেউ গুরু কর্ণধার।
ক্ষণে ক্ষণে আসা যাওয়া তার!

প্রণতি

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

অয়ি নিবেদিতা !
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে সর্ব-সমর্পিতা !
বিশ্বজিৎ যজ্ঞভূমে সমাকীর্ণ অন্ধধূমে
আলোক-শিখার মত
তুমি সমুত্থিতা
অয়ি নিবেদিতা !
তোমার মানসকোলে শাশ্বত ভারত দোলে
রূপ দিতে কথা কাজে
প্রাণ-সংকল্পিতা
অয়ি অনিন্দিতা !
গার্গী মৈত্রেয়ীর দেশে ব্রহ্মবাদ গেল ভেসে
কণ্ঠে নিলে প্রেমাবেশে
সাবিত্রী-ছন্দিতা
ঋষি-প্রকল্পিতা !
নিজেরে উজাড় করে আলো দিলে ঘরে ঘরে
মূক ম্লান অন্তঃপুরে
বাণী উদ্বোধিতা—
হোল মুখরিতা !
স্বার্থ-তিক্ত ধরণীতে এনেছে প্লাবন-গীতে
অদম্য সুরের তন্ত্রে
আশার সংহিতা
যৌবনের গীতা !
অভীঃ অভীঃ মন্ত্র যাঁর পদধূলি নিলে তাঁর
আনন্দের বিচ্ছুরণে
প্রজ্ঞাপারমিতা
হোলে নিবেদিতা
তোমারে প্রণাম করি—স্বামীজী-দুহিতা !

আশ্রয়

বকলম

যা গেছে তা গেছে, যা নেই তা নেই ঃ
বেঁচে থাকতে হবে এটা মেনেই।
মেনে নেওয়াটাই মোদ্দা কথা ;
মেনে নাও, ক্ষেপে যাবে অন্যথা।

মেনে না নিয়ে, বলো, কী বা উপায় ?
ধরবে কোন্ প্রতিকারকের পায় ?
লড়ে যাবে কতো জনের সঙ্গে ?
কতো মুরোদ আছে বিকল অঙ্গে ?

আসলে, তা নিজের সঙ্গে লড়া ;
তার চেয়ে ভালো একটা বোঝাপড়া।

মানাটাই এ বোঝাপড়ার শর্ত,
হোক সমূহ ক্ষতি, সংবর্ত।

যা গেছে তাতো গেছেই উড়েপুড়ে ;
কী আর হবে তা নিয়ে মন খুঁড়ে ?
যা আছে তাই বা থাকবে কতো কাল ?
চতুর্দিকে নাশক বেড়াজাল।

এই সর্বগ্রাসী অবরোধে
আশ্রয় আছে এক প্রবোধে ঃ
যা গেছে, যা আছে—সব অস্থায়ী ;
যে দেয় সে নেয়, তুমি ভারবাহী।

শাশ্বত আশ্রয়

শ্রীমতী বীণা সেনগুপ্ত

চঞ্চল বিহঙ্গ এক সারাদিন ধরে
আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরে অশান্ত সাগরে।
কোথা তীর, কোথা কূল, কোথা শ্যামরেখা
শ্রান্ত বিহঙ্গের চোখে নাহি দেয় দেখা।
দৃষ্টি হয়ে আসে ক্ষীণ ক্লান্তি দেহ ছায় ;
হৃদয় কাঁদিয়া কহে কোথায় কোথায় ?
দিবসের কোলাহল ধীরে গেল থামি,
চাহিল পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্তগামী।
ভাসমান তরী এক—তারি শীর্ষ 'পরে
গুটায়ে আপন পক্ষ বসিল সে ধীরে।
সর্বকর্ম সর্বচিন্তা সর্বদুঃখ হতে
আপনারে সঁপি দিল শান্তির জগতে।
উর্ধ্বনভ পানে চাহি গাহিল নির্ভয়
আপনারি মাঝে মম আপন আশ্রয়।

সুখে রাখো, দুখে রাখো

শ্রীসুসময় রায় চৌধুরী

সুখে রাখো, দুখে রাখো
সম্পদে বিপদে রাখো
যেখানে সেখানে রাখো নাথ।
শুধু মনে রেখো, তোমারি চরণতলে
প্রাণ মন হৃদি দিয়ে
করেছি যে আমি প্রণিপাত।

তোমার যেখানে ইচ্ছা রাখো মোরে সেথা
আমি যেন জানি নাথ শুধু এই কথা—
সুখ দুখ দিয়ে তুমি আমারি কল্যাণে
নিয়ত টানিছ মোরে তোমার চরণে।

১৯৭৬ সালের নোবেল পুরস্কার

ডক্টর ধ্রুব মার্জিত*

১৯০১ সাল হতে শুরু-হওয়া নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে এই প্রথম এমন একটি ঘটনা ঘটলো এবং এই ঘটনা ঘটালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন অতি বিশিষ্ট নাগরিক। সাত-সাতজন পদার্থবিজ্ঞানী রসায়নবিজ্ঞানী চিকিৎসক অর্থনীতিবিদ এবং সাহিত্যিক সম্মিলিতভাবে সৃষ্টি করলেন এই অভিনব ইতিহাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গবেষণাগারগুলিতে চলে গেল ১৯৭৬ সালের সব ক'টি নোবেল পুরস্কার। সম্ভ্রান্ত এবং মূল্যবান বাৎসরিক এই পুরস্কার-বিতরণকে কেন্দ্র ক'রে প্রতি বৎসর বিশ্ব জুড়ে এক আশ্চর্য শিহরণ লক্ষ্য করা গেছে বিগত ৭৬ বছর ধ'রে। অবশ্য বিজ্ঞানের সাধনায় রত জ্ঞানতপস্বিগণ তাঁদের আরাধনাকালে যে বিষাদময় ব্যর্থতা এবং হতাশাকে একান্তভাবে অনুভব করতে অভ্যস্ত—সেইসব বিজ্ঞানীদের কাছে হয়তো কোন পুরস্কারই শিহরণ জাগাতে পারে না—একমাত্র তাঁদের আবিষ্কারের সফল পরিসমাপ্তি ছাড়া।

প্রখ্যাত সুইডিস বিজ্ঞানী স্যার আলফ্রেড নোবেলের উইল অনুসারে তাঁর নাম-সংবলিত এই পুরস্কারটি ১৯০১ সাল হ'তে পদার্থবিদ্যা রসায়নশাস্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্র সাহিত্য এবং বিশ্ব-শান্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্ত জাতিধর্মনির্বিশেষে বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রতি বৎসর মোট পাঁচটি বিষয়ে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

স্টকহলমের 'সুইডিস্ সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্কে' স্যার আলফ্রেড নোবেলের সঞ্চিত ৯০ লক্ষ স্টার্লিং পাউণ্ডের সুবিশাল অর্থভাণ্ডারের সুদ হতেই পাঁচটি বিষয়ে এই সম্ভ্রান্ত পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে থাকে। পরে ১৯৬৮ সালে 'সুইডিস্ সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্কে'র দু'শো বৎসর পূর্তি উপলক্ষে অর্থনীতিতেও অনুরূপ আরেকটি বাৎসরিক পুরস্কারের কথা ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন। এই পুরস্কারকেও ব্যাঙ্ক-কর্তৃপক্ষ স্যার আলফ্রেড নোবেলের নামে উৎসর্গ করেন। সুতরাং বর্তমানে অর্থনীতিকে ধ'রে নোবেল পুরস্কারের সংখ্যা মোট ছ'টি। সঞ্চিত অর্থের উপর ব্যাঙ্কে যতখানি অর্থ সুদ হিসাবে জমা পড়ে, সেই অর্থই প্রতি বৎসর পুরস্কারজয়ীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়; ফলে প্রতি বৎসর পুরস্কার হিসাবে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ একই অঙ্কের হয় না। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে গত বৎসর সাত জন নোবেল পুরস্কার-বিজয়ীর প্রত্যেককে এক লক্ষ ষাট হাজার স্টার্লিং পাউণ্ড পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়েছে।

যে সাত জনকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন স্যামুয়েল সি. সি. টিং ও বার্টন রিখটার (পদার্থবিদ্যা); উইলিয়ম লিপস্‌কম্ (রসায়নশাস্ত্র); বারুচ ব্লুমবার্গ ও চার্লটন গাজড্‌সেক (চিকিৎসাশাস্ত্র); মিল্টন ফ্রিড্‌ম্যান (অর্থনীতি) এবং সল বেলো (সাহিত্য)।

---

* পদার্থবিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি.। স্পেকট্রোস্কপি সম্পর্কে লেখকের উচ্চতর গবেষণা দেশে বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "ফরেনসিক সায়েন্স গবেষণাগারে" পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত।

বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এ'বছর কাউকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়নি। এই সাতজন নোবেল পুরস্কার-বিজেতাকে ধ'রে এ পর্যন্ত মোট ১৪১ জন মার্কিন নাগরিক এই পুরস্কার পেলেন।

বর্তমান প্রবন্ধে সাহিত্য অর্থনীতি পদার্থ-বিদ্যা রসায়নশাস্ত্র এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার-বিজয়ীদের কাজ সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে

সাহিত্য :

শিকাগোর প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ৬১ বছর বয়স্ক সল বেলো গত বছর (২১শে অক্টোবর, ১৯৭৬) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন। নোবেল পুরস্কার বিচারকমণ্ডলীর অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত ছিলো সল বেলোর পক্ষে। বেলো তাঁর সুদীর্ঘ কালের রচনায় স্বকীয়তা প্রদর্শনে আশ্চর্যরকমভাবে সফল। তাঁর প্রতিটি রচনাই রসোত্তীর্ণ এবং বলা চলে সেগুলি একান্তভাবেই 'বেলো স্টাইলে' লিখিত। তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মে মানবজীবন এবং মানুষের মূলগত অদম্য প্রকৃতির যে জয়গাথা তিনি গেয়েছেন, তার স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার। তাঁর রচনা-বলীতে বিধৃত মানুষের পারস্পরিক বোধ এবং সমসাময়িক সাংস্কৃতিক চেতনার বিশ্লেষণই বিচারকদের মুগ্ধ করেছে সবচেয়ে বেশী। এছাড়া তাঁর লেখায় যে অ্যাডভেঞ্চার এবং ট্র্যাজিডির ঘনিষ্ঠ সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায় তাও কম অপরূপ নয়।

সল বেলোর রচনাশৈলীতে দুটি পর্যায়কে আশ্চর্যভাবে চিনে নেওয়া যায়। প্রথম দিকে বেলোর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে প্রখ্যাত ফরাসী ছোটগল্পকার মোপাসাঁ, হেনরি জেমস্ এবং ফ্লবেয়ার-এর জীবনদর্শন ও কাব্যচেতনা। তারই সুন্দর অভিব্যক্তি চোখে পড়ে বেলো-রচিত 'ড্যাংগলিং ম্যান', 'দি ভিকটিম' ও 'সীজ দি ডে' প্রভৃতি উপন্যাসে। এই উপন্যাস-গুলিতে বেলো কোনপ্রকার অতিনাটকীয়তা বা উদ্দামতাকে অবলম্বন করেননি, বরং তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন মুখ্য চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব।

তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টি শুরু হয়—১৯৫৩ সালে প্রকাশিত 'দি অ্যাডভেঞ্চার্স অব অগি মার্চ' উপন্যাস থেকে। এক তরুণের হতাশাজনক কল্পনার ছবি ফুটে উঠেছে আশ্চর্য সুন্দরভাবে এই উপন্যাসটিতে। তরুণ মনের হতাশার এই ধারাটি অব্যাহত রইল পরবর্তী আরও কতকগুলি কালোত্তীর্ণ রচনার মধ্যে, যেমন—'হেণ্ডারসন দি রেন কিং', 'হেরজগ', 'মিঃ স্যামলার্স প্ল্যানেট' ও 'হামবোলড্‌টস গিফট' গ্রন্থে।

বেলো চিরদিনই সাধারণ মানুষের দলে। যাঁদের পায়ের তলায় শক্ত মাটি নেই—যাঁরা নিতান্তই সাধারণ—তাঁদেরই পক্ষ নিয়েছেন বেলো তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে। এরা হলেন সেই সব মানুষ যাঁরা এই 'নড়বড়ে ভবের হাটে এসে নিশ্চিন্তে দাঁড়াবার জায়গাটুকু খুঁজে পেতেই প্রাণান্ত হন'। এই সব মানুষের এগিয়ে যাবার চেষ্টা থামে না—এঁরা বারে বারে ধরাশায়ী হন, তবুও এঁরা এ বিশ্বাস কিছুতেই ছাড়তে পারেন না যে, জীবনের মূল্যবোধ আসলে নির্ভর করে জীবনবোধের মর্যাদার উপর, তার জাগতিক এবং অর্থনৈতিক সাফল্যের উপর নয়। সল বেলোর পুরস্কার-প্রাপ্ত উপন্যাস 'হেরজগ' গ্রন্থে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্বচ্ছ এবং প্রাঞ্জল। তাঁর রচনার এবং ঘটনার পটভূমিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ এই গ্রন্থটিতে।

কানাডায় জন্মগ্রহণকারী সল বেলো মাত্র ন'বছর বয়সে শিকাগোয় এসেছিলেন। শিকাগোর নগরজীবন বেলোর সাহিত্য মেজাজের সঙ্গে আশ্চর্যরকম ভাবে মিশে আছে। শিকাগোর রাস্তায় রাস্তায় লক্ষ্য করলে বেলোর পদচিহ্ন খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। শিকাগো মানে বেলো, বেলো মানে শিকাগো—একথা বেলো নিজেও স্বীকার ক'রে থাকেন।

১৯৭৬ সালের নোবেল পুরস্কার ছাড়াও সল বেলো পুলিৎজার পুরস্কারও লাভ করেন 'হামবোলড্‌টস গিফট' নামক গ্রন্থটির জন্য। তিনি মোট তিন তিনবার ন্যাশনাল বুক এওয়ার্ড লাভ করেন। ন্যাশনাল বুক এওয়ার্ড হ'ল সাহিত্যে সর্বোচ্চ মার্কিন সম্মান। ১৯৬২ সালে জন স্টেইনবেকের পর আবার এক যুগ পর (দীর্ঘ চোদ্দ বছর বাদে) মার্কিনদের মধ্যে সল বেলোই সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন। ১৯৬২ সালের আগে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মার্কিন সাহিত্যিকদের তালিকায় যাঁরা আছেন, তাঁরা হলেন সীনক্লিয়ার লুই, ইউজিন ও'নীল, পার্ল এস. বাক, উইলিয়ম ফকনার এবং আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। সদাচঞ্চল ও নিত্যনতুন ভাবধারার বাহক ও ধারক সল বেলোর নিজের সম্পর্কে ধারণাটি বড়ই বিচিত্র—তিনি মনে করেন, 'তিনি একজন নিতান্তই সাদামাটা প্রাচীনপন্থী সেকেলে এক লেখকমাত্র'।

সম্প্রতি তাঁর বহুপঠিত ও বহুপ্রশংসিত 'হেণ্ডারসন দি রেন কিং' গ্রন্থটি অপেরায় রূপান্তরিত হয়েছে। অপেরায় রূপান্তর করেছেন পুলিৎজার পুরস্কারবিজয়ী মার্কিন সুরকার লিঅন কার্চনার। অপেরাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'লিলি'। ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে 'নিউইয়র্ক সিটি অপেরায়' এটি প্রথম উপস্থাপিত করা হবে।

অর্থনীতি :

মিল্টন ফ্রিডম্যানকে গত বছর (১৪ই অক্টোবর, ১৯৭৬) অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সুপরিচিত অর্থনীতিবিদ বলে স্বীকৃত। ফ্রিডম্যান মনে করেন বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে সুদের হার এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুদ্রামূল্য বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন অনুসারেই নির্ধারিত হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক মুদ্রার বাজারে তাঁর এই সুচিন্তিত মতামতের যাথার্থ্য লক্ষ্য করা গেছে। নোবেল কমিটি ফ্রিডম্যানের পুরস্কারের প্রশস্তিতে বলেছেন, উপযোগ-সম্পর্কিত বিশ্লেষণ, মুদ্রাসম্পর্কিত ইতিহাস ও তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব এবং স্থিতিশীলতা অর্জনের নীতির জটিলতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের স্বীকৃতি হিসাবে এই পুরস্কার। অর্থাৎ ফ্রিডম্যানকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তিনটি মুখ্য কারণে: প্রথমতঃ অর্থ-রোজগার এবং তার খরচের মধ্যে যে যোগসূত্র আছে এবং তাদের মধ্যে যে সাম্য বিদ্যমান, তার ব্যাখ্যার জন্য। দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসের মধ্যে যে নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে, তা দেখানোর জন্য এবং তৃতীয়তঃ স্থায়ী কোন অর্থনৈতিক তত্ত্বের জটিলতা যে অবশ্যম্ভাবী, সে সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে আলোকপাত করার জন্য।

সম্প্রতি তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—'খাদ্যবস্তুকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করা কোন দেশের উচিত নয়।' বিশ্বের প্রতিটি দেশ পরস্পরের মধ্যে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে চালাতে পারে সে ব্যাপারেও তিনি উৎসাহী খুব এবং একান্ত প্রয়াসীদের একজন।

৬৪ বছর বয়স্ক ফ্রিডম্যান নিউইয়র্কের অন্তর্বর্তী ব্রুকলীন শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিকাগো এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে তিনি যথাক্রমে তাঁর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। স্ত্রী শ্রীমতী রোজ ফ্রিডম্যানও একজন স্বনামধন্যা অর্থনীতি-বিদ। এঁর জন্ম রাশিয়ায়।

মিল্টন ফ্রিডম্যানের অনেক বিখ্যাত প্রবন্ধ এবং গবেষণাপত্র বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে ১৯৪৬ সাল হ'তে। তাঁর সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠতম রচনা হ'ল 'মনিটারি হিস্ট্রি অব দি ইউনাইটেড স্টেটস—১৮৬৭-১৯৬০'। পুস্তকটির সহ-লেখিকা হলেন—অ্যানা জেকবসন শোয়ার্ৎস। তাঁর লেখা অন্যান্য প্রখ্যাত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'এ থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অব মনিটারি অ্যানালিসিস', 'সোস্যাল সিকিউরিটি', 'অ্যান ইকনমিস্টস্ প্রোটেস্ট' ইত্যাদি।

মিল্টন ফ্রিডম্যান কলম্বিয়া উইস্কনসিন্ এবং মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফুলব্রাইট লেকচারার হিসাবেও তিনি কাজ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অর্থনীতিতে এ পর্যন্ত মোট আটবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং তার মধ্যে মার্কিন নাগরিকগণই কেবলমাত্র এককভাবে বা যুক্তভাবে ছ'বার এই পুরস্কার লাভ করেছেন।

পদার্থবিদ্যা ঃ

ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (M.I.T.) অধ্যাপক স্যামুয়েল সি. সি. টিং এবং স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার এ্যাকসিলেটর সেণ্টারের (S.L.A.C.) অধ্যাপক বার্টন রিখটারকে যুগ্মভাবে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হ'ল। পুরস্কার দেওয়া হ'ল সুইডেনের রাজধানী স্টক্হলমে গত বছর ২১শে অক্টোবর। নতুন ধরনের একটি 'মৌলিক কণিকা' (Fundamental particle) আবিষ্কারের জন্য তাঁদের এই পুরস্কারটি দেওয়া হ'ল। বস্তুতঃ মৌলিক কণিকাটি একটি হ'লেও এবং এর যাবতীয় ধর্মাবলী এক হ'লেও এর দুটি নামকরণ হয়েছে। অধ্যাপক টিং কণিকাটির নাম দিয়েছেন 'জে' (J) এবং অধ্যাপক রিখটার এর নাম দিয়েছেন 'সাই' (ψ)। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে টিং এবং রিখটার এই কণিকাটিকে আবিষ্কার করেন মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে।

আমরা জানি পরমাণুতে খুঁজে পাওয়া অতি ক্ষুদ্র কণিকাগুলিকে যেমন—ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন ইত্যাদিদের মৌলিক কণিকা বলা হয়। বিগত সাত দশক ধ'রে ঘটানো পদার্থবিজ্ঞানীদের নানা ধরনের পরীক্ষালব্ধ তথ্য হ'তে দেখা যাচ্ছে—মৌলিক কণিকাগুলির সংখ্যা 'ভীতিপ্রদভাবে বেড়ে চলেছে'। এই 'ভীতিপ্রদভাবে বেড়ে যাওয়া'—কথাটি ব্যবহার করেছেন নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী পল ডিরাক। বর্তমান পরমাণু-বিজ্ঞান অবশ্য প্রোটন নিউট্রন ইত্যাদি কণিকাদের মৌলিক কণিকা ব'লে স্বীকার করে না। কারণ এ ধরনের কণিকাগুলিকে ভেঙে আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কতকগুলি কণিকা পাওয়া যে সম্ভব—একথা আজ পরীক্ষামূলকভাবে এবং তত্ত্বগতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বেশ কয়েক বছর কণা পদার্থবিদ্যা (Particle Physics) নামক বিজ্ঞানের এই কিঞ্চিৎ নবীন বিভাগটি চুপচাপ থাকার পর ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে আবার সক্রিয় হ'ল। বলা চলে সক্রিয় হ'ল টিং-রিখটার আবিষ্কৃত 'জে' অথবা 'সাই' নামক মৌলিক কণিকাটির আত্ম-প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। পদার্থগঠনকারী সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম কণিকাগুলি—যাদের কিনা মৌলিক কণিকা বলা হয়, তাদের সম্পর্কে জানার কৌতূহল

বিজ্ঞানীদের শুরু হয়েছে সেই ১৮৯৬ সালে, যখন কেম্‌ব্রিজের ক্যাভেনডিস্ ল্যাবরেটরিতে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী টম্‌সন্ ও রাদারফোর্ড ইলেকট্রনের অস্তিত্ব নিরূপণ এবং পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টায় ব্যস্ত। তারও কয়েক বছর পরে কোপেনহেগেনে অধ্যাপক নীলস্ বোর পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আরও স্পষ্ট এবং বিজ্ঞানসম্মত একটি ব্যাখ্যা বিজ্ঞানকে উপহার দেন। বোর প্রদত্ত পরমাণুর মডেলে বলা হয়েছে—প্রতিটি পরমাণু গঠিত হয়েছে একটি কেন্দ্রক (Nucleus) দ্বারা এবং সেই কেন্দ্রককে বেষ্টন ক'রে নিরবচ্ছিন্ন এক প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতে ব্যস্ত এক ঝাঁক ইলেকট্রন। পরমাণুর কেন্দ্রক গঠন হয়ে থাকে পরমাণুতে থাকা ইলেকট্রনের সমান-সংখ্যক প্রোটন এবং প্রোটনের চেয়ে সংখ্যায় কিছু বেশী-সংখ্যক নিউট্রন দ্বারা। পরবর্তী কালে পরীক্ষাগারে বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে ইলেকট্রনকে ভেঙ্গে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু বিজ্ঞানীগণ একাজে বিফল হয়েছেন এবং স্বীকার করেছেন ইলেকট্রন সত্যই একটি মৌলিক কণিকা। বিজ্ঞানের ভাষায় ইলেকট্রন হ'ল 'লেপটন'[১] (Lepton) গোষ্ঠীভুক্ত মৌলিক কণিকা। অপরদিকে কিন্তু প্রোটনকে অতি উচ্চ শক্তির ত্বরণ যন্ত্রে (high energy accelerator) গতিশীল ক'রে এবং তাকে বম্বার্ড ক'রে দেখা গেছে সেটি আরও কতকগুলি অতিক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত। সুতরাং তথাকথিত মৌলিক কণিকাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যে মৌলিক নয়, সেটা বুঝতে বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা করতে হল ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত। আজ হতে মাত্র বছর দশেক আগে বার্কলের, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক মারে গেলম্যান এবং অধ্যাপক জর্জ জাইগ্ তত্ত্বগত-ভাবে প্রমাণ করলেন যে, প্রোটন নিউট্রনগুলি আরও কতকগুলি অন্য ধরনের অতি সূক্ষ্ম কণিকার দ্বারা গঠিত এবং এই সূক্ষ্ম কণিকাগুলিই তাঁদের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে মৌলিক কণিকা; যেগুলির নাম তাঁরা দিলেন কোয়ার্ক (Quark)। বলা হ'ল কোয়ার্ক—এক পরম কণিকা। বিশ্বসৃষ্টির 'ইট'। কোয়ার্ক তত্ত্ব—বিজ্ঞানীদের এতদিনের সত্য-বলে-জানা ধ্যান-ধারণাকে আঘাত করায় স্বভাবতই বিজ্ঞানীরা প্রথমদিকে কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করা গেল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গবেষণাগার-গুলিতে এই তত্ত্বের তত্ত্বগত এবং পরীক্ষামূলক উভয় দিক যাচাই করার জন্য বিজ্ঞানীকুল উঠে পড়ে লেগেছেন। এ বছরের নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী টিং-রিখটারের গবেষণায় লব্ধ 'জে' অথবা 'সাই' কণিকাটি এই কোয়ার্ক তত্ত্বেরই পরীক্ষামূলক প্রমাণ বলা চলে।

কোয়ার্ক সম্পর্কে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেল্ডন গ্লাসহাউ এবং স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেমস্ জরকেন্ বললেন, কোয়ার্ক—এই পরম কণিকার সংখ্যা প্রকৃতিতে চারটির বেশী থাকা সম্ভব নয়। তাঁরা আরও বললেন, এই চারটির মধ্যে মাত্র দু'টিকে পাওয়া যাবে আমাদের সামনে ছড়িয়ে-থাকা বর্ণময় প্রকৃতিতে এবং মানবসভ্যতার বিচিত্র অস্তিত্বের মধ্যে; আর বাকী দু'টি কোয়ার্ককে পাওয়া সম্ভব কেবলমাত্র উচ্চশক্তিসম্পন্ন ত্বরণযন্ত্র-গবেষণাগারে যেখানে কণাপদার্থ-বিজ্ঞানী-গণ ত্বরণযন্ত্রে প্রোটন-নিউট্রন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণায় রত। বস্তুতঃ এই চারটি মাত্র কোয়ার্কের দ্বারাই গঠিত হয়েছে যাবতীয় সৃষ্টি।

[১] লেপটন (Lepton) : ইলেকট্রন ; মিওন (Muons) এবং দু'টি শ্রেণীর নিউট্রিনো (N[illegible])।

শেষের দু'টি কোয়ার্কের নাম দেওয়া হয়েছে—'স্ট্রেন্‌জ' (Strange) এবং 'চার্ম' (Charm)। টিং-রিখটারের আবিষ্কারের পূর্বেই 'স্ট্রেন্‌জ'-কোয়ার্কটির অস্তিত্ব নিরূপণ এবং সেটির গঠন তথা ধর্মাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞানীগণ আলোকপাত করেন। কিন্তু এতদিনেও 'চার্ম'-কোয়ার্ক সম্পর্কে কোনকিছু পরীক্ষালব্ধ তথ্য বিজ্ঞানীদের পক্ষে আহরণ করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ অবশ্যই বিজ্ঞানীদের অমনোযোগিতা নয়। যাইহোক অবশেষে টিং-রিখটার আবিষ্কৃত 'জে' অথবা 'সাই' কণিকাটির আবিষ্কার বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজকে বিস্ময়াহত করেছে। তাঁদের আবিষ্কৃত কণাটির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই 'চার্ম'-কোয়ার্ক সম্পর্কে হতবাক্-করা তথ্যের এক প্লাবন আসতে শুরু করেছে বিজ্ঞানীদের কাছে। এই কণিকাটির জীবনকাল (life-period) এক সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশ। যদিও এটির ভর একটি প্রোটনের ভরের চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশী (3 Gev.)।

অধ্যাপক টিং এবং তাঁর অপর সহযোগিবৃন্দ ব্রুকাভেন ত্বরণযন্ত্রে শক্তিশালী প্রোটন রশ্মিকে বেরিলিয়াম টার্গেটে বম্বার্ড ক'রে নতুন ধরনের একটি 'ইলেকট্রন-প্রোটন' যুগ্ম পান। যুগ্ম-গুলিকে পরে তিনি একটি বিশাল দ্বিবাহু বর্ণালীবীক্ষণযন্ত্রে (spectrometer) পরীক্ষা করেন এবং সেগুলির গঠন সম্পর্কে অনেক তথ্য লাভ করেন। অপরদিকে অধ্যাপক রিখটার এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ একটি বৃহৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রোটনরশ্মিকে বেরিলিয়াম টার্গেটে বম্বার্ড ক'রে ঐ একই ফল পান। যদিও গত দু'দশকে বেশ কয়েক ডজন তথাকথিত মৌলিক কণিকার সন্ধান বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে পাওয়া গেছে, তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে টিং-রিখটার আবিষ্কৃত 'জে' অথবা 'সাই' কণিকাটির বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানী সমাজকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে। টিং-রিখটারের আবিষ্কারের ফলে পরমাণু বিজ্ঞানীদের এতদিনের প্রচলিত চিন্তা এবং কার্যপদ্ধতি আজ পরিবর্তন হওয়ার সম্মুখীন হয়েছে। পদার্থের গঠন সম্পর্কে এই নতুন আলোকপাতের ফলে কোয়ার্ক তত্ত্বের রিইন-ফোর্সড্ ভিত্তি গঠিত হয়েছে। 'জে' অথবা 'সাই' কণিকাটি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি হল 'চার্ম-বিহীন বন্ধন-অবস্থা' (charm-less bound state—cc) যেখানে চার্ম এবং বিপরীত চার্ম (anti-charm) এই দু'ধরনের কোয়ার্কই অবস্থান করে।

অধ্যাপক স্যামুয়েল টিং মাত্র ৪২ বছর বয়সের একজন তরুণ উজ্জ্বল গবেষক। তাঁর পিতামাতা আমেরিকায় বসবাসকারী চৈনিক। টিং-এর জন্ম আমেরিকায় ১৯৩৫ সালে—যদিও তাঁর শৈশব এবং কৈশোরের অনেকখানি কেটেছে চীনদেশে নিছক উদ্বাস্তু হিসাবে। ভাবতে অবাক লাগে টিং-এর বয়স যখন বারো বছর তখনও তিনি স্কুলশিক্ষা হ'তে বঞ্চিত সম্পূর্ণ অশিক্ষিত এক উদ্বাস্তু বালক মাত্র। কুড়ি বছর বয়সে তিনি পুনরায় মার্কিন মুলুকে ফিরে আসেন এবং আশ্চর্য এক জ্ঞানতৃষ্ণা নিয়ে তিনি একে একে তাঁর স্কুলের পাঠ, কলেজের পাঠ শেষ করেন এবং '৯৬২ সালে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে টিং মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে ইনি আমেরিকার M. I. T.-তে এবং জেনেভায় অবস্থিত ইউরোপীয়ান নিউক্লীয়ার রিসার্চ সেণ্টারে (E.N.R.C.) একই সঙ্গে কর্মরত। এর আগে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিরত ছিলেন।

অধ্যাপক বার্টন রিখটার একজন প্রতিভাধর

পদার্থবিজ্ঞানী। বর্তমানে তাঁর বয়স ৪৬ বছর। নিউইয়র্কে ১৯৩১ সালে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। M. I. T হ'তে ১৯৫৬ সালে তিনি পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর হ'তে আজ পর্যন্ত তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কণা পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণায় রত আছেন। এখানে তিনি নিজ প্রতিভায় 'স্টোরেজ রিং' (storage ring) নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন—যেটি কিনা স্ট্যানফোর্ড লিনিয়ার এ্যাকসিলেটর সেণ্টারের ৩'২ কিলো-মিটার লম্বা একটি রৈখিক ত্বরণযন্ত্রে (linear accelerator) যুক্ত করা হয়েছে। এটা খুবই আনন্দের কথা যে, রিখটার-আবিষ্কৃত 'সাই' কণিকাটি তাঁর নিজ উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যেই তিনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

রসায়নশাস্ত্র ঃ

রসায়নশাস্ত্রে ১৯৭৬ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন ৫৬ বছর বয়স্ক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাধর বিজ্ঞানী অধ্যাপক উইলিয়ম এন. লিপস্‌কম্। গত ১৮ই অক্টোবর তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হ'ল। পুরস্কার দেওয়া হ'ল বোরণ নামক মৌলিক পদার্থটির (element) এবং 'বোরণ-হাইড্রোজেন' যৌগ (compounds of boron and hydrogen)গুলির গঠন সম্পর্কে অতি বিশিষ্ট অবদানের জন্য। বোরণের বিভিন্ন প্রকার যৌগগুলির মধ্যবর্তী রাসায়নিক বন্ধনের (chemical bonds) বিষয়টি বিজ্ঞানীদের কাছে দীর্ঘদিনের এক সমস্যা ছিল। কিন্তু গত কুড়ি বছর ধ'রে অধ্যাপক লিপস্‌কম্ এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সেই জটিল সমস্যা আজ দূরীভূত হয়েছে। লিপস্‌কম্ প্রবর্তিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা—'ত্রি-কেন্দ্র বন্ধন' (three-centre bonds) বোরণ যৌগগুলির গঠন সম্পর্কে আজ বিজ্ঞানগ্রাহ্য হয়েছে।

বোরণ এবং বোরণ-হাইড্রোজেন যৌগ-সমূহের সঠিক গঠনপ্রণালী "সিঙ্গল ক্রিসট্যাল এক্স-রে ডিফ্র্যাকসন" (single crystal x-ray diffraction) পদ্ধতির সাহায্যে তিনি নির্ণয় করেন। এছাড়াও তিনি কিছু কিছু জটিল বোরণ যৌগের গঠন সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। তাঁর এই গবেষণাকে বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ ব'লে ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক লিপস্‌কমের রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ 'বোরণ' এবং 'বোরণ-হাইড্রোজেন' যৌগসমূহের গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট তত্ত্ব প্রণয়ন করা ছাড়াও 'এনজাইমের' (enzymes) কার্যপ্রণালী সম্পর্কেও তিনি সুন্দর এবং সুস্পষ্ট একটি মতবাদ প্রণয়ন করেন। প্রসঙ্গতঃ এই বিষয়টিতে বিজ্ঞান একটু পিছিয়ে ছিল এতদিন। লিপস্‌কমের এই আবিষ্কারের প্রেরণা হিসাবে তিনি প্রখ্যাত রসায়নবিজ্ঞানী অধ্যাপক লাইনোস্ পাউলিং-এর গবেষণার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন। (ক্যালি-ফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির এই প্রবীণ অধ্যাপক লাইনোস্ পাউলিং হলেন বিশ্বের সেই বিরল তিন প্রতিভার একজন, যাঁরা কিনা দু'বার ক'রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।) ক্যানসার, ব্রেনটিউমার এবং মানসিক অসুখসমূহ—যেগুলি কিনা অত্যধিক কষ্টকর অসুখ ব'লে সমধিক পরিচিত—তাদের দূরীকরণের জন্য এই প্রথম বিষাক্ত এবং বিস্ফোরক পদার্থ হ'তে পাওয়া বোরণকে কাজে লাগানো হ'ল। তাঁর আবিষ্কারের সফল পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক লিপস্‌কম্ বলেছিলেন—'এটা ঠিকই যে বোরণ এবং বোরণ-যৌগ হ'তে খুঁজে পাওয়া তথাকথিত 'বিষ' নিয়ে কাজ ক'রে আমরা কিছুটা হয়তো অগ্রসর হতে

পেরেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের যেতে হবে আরও অনেক দূর। বহু বহু দূর।' দীর্ঘ কুড়ি বছর যাবৎ এই জটিল বিষয়ে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা চালাবার পরেও—এধরনের কথা তিনি বলেছেন।

লিপস্‌কমের গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু জানতে হলে 'কো-ভ্যালেণ্ট বণ্ড' (co-valent bonds) কাকে বলে আমাদের জানা দরকার। এমন কিছু কিছু পরমাণু আছে যারা অণুর গঠন কালে তার বহির্বৃত্তে থাকা (outer shell orbit) ইলেকট্রনগুলিকে ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে থাকে। একেই বলে ইলেকট্রন 'শেয়ার' (sharing pairs) ক'রে থাকা। আমরা জানি হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটিমাত্র ইলেকট্রন থাকে। এবং যখন দু'টি এই ধরনের হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটি হাইড্রোজেন অণু গঠন করে তখন প্রকৃতপক্ষে ঐ দু'টি পরমাণুর ইলেকট্রন দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক-যুগলের দ্বারা সৃষ্ট যৌথ তড়িৎ ক্ষেত্রে (combined electric field of the two nuclei) চলাচল করে। অণুতে 'শেয়ার করা' ইলেকট্রনগুলি যে বৃত্তাকার পথে চলাচল করে, তাকে আণবিক বৃত্ত বলে (molecular orbitals)। কার্বন পরমাণুর বহির্বৃত্তে থাকে চারটি ইলেকট্রন—সেজন্য সাধারণতঃ চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর চারটি ইলেকট্রন, একটি কার্বন পরমাণুতে-থাকা চারটি ইলেকট্রনের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি বিশেষ ধরনের জৈব অণুর সৃষ্টি করে। জৈবরসায়ন-শাস্ত্রে (organic chemistry) যার নাম মিথেন (CH_4), সেই মিথেন অণুতে চারটি 'কো-ভ্যালেণ্ট বণ্ড' অর্থাৎ ভাগাভাগি-করা বন্ধন লক্ষ্য করা যায়।

১৯১২ সালে আলফ্রেড স্টক বোরণ এবং হাইড্রোজেন পরমাণুদের দ্বারা সৃষ্ট অণু সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি কতকগুলি বোরণ-হাইড্রোজেন যৌগের অস্তিত্বের কথা বলে গিয়েছেন, যার মধ্যে সরলতমটি হ'ল B_2H_6। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে ইথেন (C_2H_6)-এর গঠনের সঙ্গে এই সরল বোরণ হাইড্রোজেন যৌগটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সমস্যা হ'ল বোরণকে নিয়ে। বোরণের ধর্ম কার্বনের ধর্ম হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেখা গেছে যে, দ্বি-কেন্দ্রিক আণবিক বৃত্তে অবস্থানকারী সাতটি ইলেকট্রন বণ্ড বোরণ-হাইড্রোজেন যৌগের মধ্যে বিদ্যমান, যদিও বোরণ এবং হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গঠন অনুসারে সেখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা হওয়া উচিত বারোটি। এইসব সমস্যার জন্য বোরণ-হাইড্রোজেন যৌগগুলির রাসায়নিক গঠন নিয়ে বিজ্ঞানীগণ প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। অধ্যাপক প্রাইস (W. C. Price) ১৯৪২ সালে একটি 'ব্রীজ মডেলের' সাহায্যে বোরণযৌগের এই সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করেন এবং আংশিক সফল হন। তারপর 'লোকালাইজড্‌ মলিকুলার অরবিটাল' তত্ত্বের সাহায্যে অনেক চেষ্টা করা হয়েছে সমস্যা সমাধানের, কিন্তু অধ্যাপক লিপস্‌কমের গবেষণাকেই এ পর্যায়ের সফলতম উত্তরণ ব'লে স্বীকার করা হয়েছে। তিনি দীর্ঘ কুড়ি বছর যাবৎ এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে গবেষণায় নিরত আছেন। তীক্ষ্ণমেধাবী, ছাত্রসুহৃদ অধ্যাপক উইলিয়ম লিপস্‌কম্‌ ওহিও শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি হ'তে তিনি পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ১৭ বছর যাবৎ অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র :

আমেরিকার মেরিল্যাণ্ডের ইউনাইটেড

স্টেটস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর নিউ-রোলজিক্যাল ডিজীজের অধ্যাপক ডি. চার্লেটন গাজডুসেক এবং পেন্‌সিলভেনিয়া মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক বারুচ এস. ব্লুম্‌বার্গ যুগ্মভাবে ১৯৭৬ সালে শারীরবিদ্যা তথা চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেলেন। গত ১৪ই অক্টোবর (১৯৭৬) তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হ'ল। মানবদেহে সংক্রামক ব্যাধিসমূহের উৎপত্তির কারণগুলি সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক নতুন চিন্তাধারা এবং ঐ ব্যাধিগুলি নিরাময়ের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। উভয় বিজ্ঞানীই দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিতে বসবাসকারী প্রাচীন মানব উপজাতিদের কতকগুলি কষ্টকর এবং দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ অক্লান্ত এবং সফল গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁরা উভয়েই এই সম্ভ্রান্ত পুরস্কারটি পেয়েছেন ভাই-রোলজিতে তাঁদের সফল গবেষণার জন্য।

অধ্যাপক গাজডুসেকের গবেষণার বিষয় ছিল—মানুষের মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে '‘ধীরগতি ভাইরাসের’ (slow virus) প্রভাব এবং সেগুলির ক্রিয়াসমূহ। অপরদিকে অধ্যাপক ব্লুমবার্গের গবেষণার বিষয় ছিল এক প্রকার ন্যাবাতে (jaundice) যকৃতের (liver) উপর (হেপাটাই-টিস-বি) ভাইরাসের ক্রিয়া এবং তার ব্যাখ্যা। উভয় বিজ্ঞানীই তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্রে অতি কৃতিত্বের সঙ্গে এটা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, উপরি-উক্ত রোগগুলি মূলতঃ ভাইরাস-জনিত রোগ। এই দুই শ্রেণীর অসুখের ক্ষেত্রেই এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এধরনের রোগীদের দেহে দীর্ঘদিন যাবৎ কোন প্রকার রোগের লক্ষণ দেখা যায় না। যদিও ভাইরাসগুলি অর্থাৎ রোগ-বিস্তারকারী জীব-পরমাণুর দল সেই রোগীর দেহে সুপ্তভাবে বর্তমান থাকে। এই বিশেষ চরিত্রের ভাইরাস-দেরই ‘ধীরগতি ভাইরাস’ বলে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেশায় মত্ত প্রখর প্রতিভাবান বিজ্ঞানী চার্লেটন গাজডুসেক ১৯৫৭ সাল হ'তে নিউগিনির গহন অরণ্য-অধ্যুষিত আদিম অধিবাসী সমাজে গবেষণায় রত আছেন। এই কষ্টকর গবেষণার মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ প্রতিভার উন্মেষকে তিনি হয়তো দেখতে পেয়েছিলেন। অদ্ভুত এক স্নায়বিক বিকৃতি-জনিত এক ধরনের অসুখ এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের জীবন বিভীষিকাময় ক'রে তুলেছিল। অধ্যাপক গাজডুসেকের ছাত্রাবস্থা হ'তেই তিনি সেই কষ্টকর অসুখ সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে এবং অসুখটি নির্মূল করতে প্রয়াসী ছিলেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন-পর্ব সমাপ্ত ক'রেই তিনি বের হলেন ‘অন্ধকার দ্বীপে’র উদ্দেশে—এক ‘বিভীষিকাময় রোগে’র মূল উৎপাটন করার তীব্র বাসনা নিয়ে। নিউগিনি এবং তৎসংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী সমাজে এটা দেখা গেছে যে, এই অসুখ হলে রোগীর দেহে কাঁপুনির সৃষ্টি হয় এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ তার দেহ একসময় শক্ত হয়ে যায়। তখন সে মাতালের মতো টলে টলে পড়ে যায়, অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং অবশেষে হতভাগ্যের মৃত্যু ঘটে। নিউগিনির এই বিভীষিকাময় অসুখটির নাম দেওয়া হয়েছে ‘কুরু’ (Kuru) অর্থাৎ ‘কম্পনের ভীতি’।

আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে থেকে, তাদের কষ্টকর এই রোগটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে অধ্যাপক গাজডুসেক তাঁর দীর্ঘদিনের সফল গবেষণার পর বলেছেন যে, অসুখটি কেবলমাত্র পূর্ব-নিউগিনির অতি অসভ্য আদি-বাসীদেরই হয়, যারা কিনা মৃত মানুষের মাংস খেতে অভ্যস্ত। এইসব আদিম উপজাতি

তাদের মৃত আত্মীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য মৃত ব্যক্তিদের মাংস এবং তাদের মস্তিষ্ক (brain) অর্থাৎ ঘিলু খেয়ে থাকে। গাজডুসেক্ প্রমাণ করেন, আদিবাসীগণ মৃতদেহের মাংস এবং মস্তিষ্ক খায় ব'লেই তাদের মধ্যে 'কুরু' নামক ভয়াবহ এই অসুখটি এত প্রকটভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি মৃত রোগীদের দেহ হ'তে বিশেষ ধরনের সিরাম (serum) ও মস্তিষ্ক সংগ্রহ করেন এবং সেগুলিকে তিনি ভাইরোলজিক্যাল ও নিউরো-প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য আমেরিকার মেরিল্যাণ্ডের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর নিউরোলজিক্যাল ডিজীজেস নামক প্রখ্যাত গবেষণাগারে পাঠান। মেরিল্যাণ্ডে তিনি ডঃ ক্লারেন্স গিবস-এর সহযোগিতায় কুরু-রোগীর পরিস্রুত মস্তিষ্ক কতকগুলি সুস্থদেহী শিম্পাঞ্জির মস্তিষ্কে 'ইনজেক্ট' করেন এবং লক্ষ্য করেন, যে সব শিম্পাঞ্জিদের ঐ ইনজেকসন প্রয়োগ (Inoculation) করা হয়েছিল, তারা দ্বিতীয় বছরের প্রথমদিক হ'তে আট বছরের মধ্যেই স্নায়ুর গোলযোগে গভীরভাবে আক্রান্ত হ'ল। শিম্পাঞ্জির দেহে প্রকটিত অসুখটির চরিত্র আশ্চর্যভাবে কুরু-রোগাক্রান্ত মানুষের রোগের লক্ষণগুলির সদৃশ।

আগে মনে করা হ'ত কুরু অসুখটি বংশানুক্রমে হয় অথবা হয় খাদ্যাল্পতাজনিত গোলযোগ হ'তে। কিন্তু গাজডুসেকের গবেষণার পর জানা গেল কুরু একটি সংক্রামক রোগ এবং ভাইরাস-জনিত অসুখ। তিনি কুরু রোগের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আরও কতকগুলি কষ্টদায়ক রোগের কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করেন—'ক্রজফেল্ট-জেকব', 'স্পঞ্জিফর্ম-এনকেফালোপ্যাথি' ইত্যাদিগুলিও যে ভাইরাস-জনিত রোগ তা জানা গেল তাঁর গবেষণার দ্বারা। এটিও জানা গেল যে, 'স্ক্র্যাপি' (scrapie) নামক মানসিক তথা স্নায়বিক বিকৃতি-রোগটি হয়ে থাকে ভেড়ার লোমের মধ্যে সৃষ্ট একশ্রেণীর জীবপরমাণুর দ্বারা। এই সব রোগগুলি মানবদেহে এবং অন্যান্য প্রাণীদেহে সংক্রামণের বেশ কয়েক মাস অথবা বছর পরে সৃষ্টকারী ভাইরাসগুলিকে পরীক্ষার সাহায্যে খুঁজে পাওয়া যায় এবং এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে রোগগুলি সৃষ্টি হচ্ছে 'ধীরগতি' কতকগুলি ভাইরাস দ্বারা।

এবার আসা যাক্ ডাঃ ব্লুমবার্গের আবিষ্কার প্রসঙ্গে। অষ্ট্রেলিয়া এ্যান্টিজেন (Australia antigen) নামক একধরনের রক্তের উপাদান অধ্যাপক বারুচ ব্লুমবার্গ লক্ষ্য করেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ান উপজাতিদের দেহে। শরীরে রক্ত দিলে অর্থাৎ দেহে বহিরাগত রক্তকণিকার আগমন ঘটলে আমাদের দেহে এ্যান্টিবডি (antibody) তৈরী হয়, অর্থাৎ একধরনের প্রতিরোধক পদার্থের সৃষ্টি হয় মানবদেহে। ১৯৬৩-৬৪ সালে অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে কাজ করবার সময় প্রখ্যাত চিকিৎসক তথা জেনিটিক বিদ্যা-বিশারদ অধ্যাপক ব্লুমবার্গ একটি বিশেষ ধরনের এ্যান্টিবডি আবিষ্কার করেন। বহুবার রক্ত দেওয়া হয়েছে এমন একটি হিমোফিলিক রোগীদেহ হ'তে তিনি ঐ এ্যান্টিবডি সংগ্রহ করেন। (রক্তের এক বিশেষ ধরনের অসুখকে হিমোফিলিয়া বলে।) অষ্ট্রেলিয়ার ঐ আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের রক্তের সেরাম এবং এই নব সৃষ্ট এ্যান্টিবডির মধ্যে এক বিক্রিয়া (reaction) ঘটিয়ে তিনি পেলেন এক অদ্ভুত চরিত্রের এ্যান্টিজেন[২] (Antigen)। ১৯৬৭ সালে ডাঃ ব্লুমবার্গের

২ এ্যান্টিজেন: অসুখের প্রতিষেধক হিসাবে যে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ

নেতৃত্বে প্রতিভাবান চিকিৎসকদের একটি দল তাঁদের সফল গবেষণার শেষে প্রমাণ করলেন যে, এই বিশেষ ধরনের এ্যান্টিজেনটি ভাইরাস হেপাটাইটিস্ (hepatitis) এবং সেরাম হেপাটাইটিসের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে ক্রিয়াশীল। বিশেষত হেপাটাইটিস-বি নামক অসুখটির ক্ষেত্রে এটির ক্রিয়া করার ক্ষমতা আশ্চর্যজনক ক্ষিপ্র। বিশেষ ধরনের এই এ্যান্টিজেনটির নাম ডাঃ ব্লুম্‌বার্গ রাখলেন 'অষ্ট্রেলিয়া এ্যান্টিজেন'। বিগত দশ বছরের অতি বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং গবেষণাগারের জটিল পরীক্ষার দ্বারা ডাঃ ব্লুম্‌বার্গ লক্ষ্য করেছেন যে, এই অষ্ট্রেলিয়া এ্যান্টিজেনটি হলো—হেপাটাইটিস ভাইরাস্ কণিকার উপর একটি অতি সূক্ষ্ম প্রলেপ মাত্র, যাকে তিনি বললেন, ভাইরাস্‌দের গায়ের প্রোটিন কোট (protein coat of virus)। আরও লক্ষ্য করা গেছে, ভাইরাস্ হেপাটাইটিস্ অসুখ ছাড়াও কতকগুলি বিশেষ ধরনের ক্যানসার এবং কুষ্ঠরোগের (লিউকিমিয়া ও লেপ্রোমেটাস লেপ্রসি) ক্ষেত্রেও অষ্ট্রেলিয়া এ্যান্টিজেন অর্থাৎ এই হেপাটাইটিস-বি এ্যান্টিজেনটি আশ্চর্যরকম সুফল দেয়।

ভারতবর্ষসহ গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, হাসপাতালে রোগীদের দেহে রক্ত দেওয়ার সময় এক দেহ হ'তে অন্য দেহে হেপাটাইটিস-বি অসুখটি ছড়িয়ে পড়ে। আরও দেখা গেছে যে, স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীর চেয়ে পেশাদার রক্তদাতাদের দেহে হেপাটাইটিস-বি অসুখের জীবপরমাণু বেশী বিদ্যমান এবং শুধু তাই নয় পেশাদার রক্তদাতাদের দেহে থাকা জীবপরমাণুগুলি আবার অসুখটিকে দ্রুত সংক্রামিত করতে খুব বেশী মাত্রায় সাহায্য করে। এইসব ভাইরাসজনিত অসুখগুলির প্রতিরোধক হিসাবে ভাইরাস টিকার কথা চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ দীর্ঘদিন ধ'রে ভেবে আসছেন, কিন্তু ভাইরাসকে টিস্যু tissue) কালচার দ্বারা উৎপন্ন করা যায় না ব'লেই ভাইরাস টিকা সৃষ্ট করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে এতদিন সম্ভব হয়নি। সুতরাং ভাইরাসজনিত এই অসুখগুলির প্রতিরোধ তথা সুচিকিৎসার ক্ষেত্রে অসুবিধা এতদিন ছিলই। ডাঃ ব্লুম্‌বার্গ তাঁর নিজ সৃষ্ট এক বিশেষ ধরনের পদ্ধতির সাহায্যে হেপাটাইটিস-বি অসুখের জীবপরমাণু আছে এমন রোগীর প্লাজমা থেকে একটি টিকার উদ্ভাবনে সক্ষম হন। পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে অষ্ট্রেলিয়া এ্যান্টিজেন থেকে উদ্ভূত এই টিকাটি রোগ প্রতিরোধ তথা নিরাময়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকরী।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের জনগণের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া এ্যান্টিজেন অর্থাৎ হেপাটাইটিস-বি অসুখের প্রভাব অত্যন্ত কম এবং তা হ'ল যথাক্রমে ০'১ শতাংশ এবং ০২ শতাংশ মাত্র। অপরদিকে ভারতবর্ষসহ কতকগুলি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই অসুখের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী (শতকরা ২'১ ভাগ)। অবশ্য অসুখটির সৃষ্টিকারী দুই ধরনের জীবপরমাণুর মধ্যে একধরনের জীবপরমাণু কোন অসুখ সৃষ্টি না ক'রে মানবদেহে

মানবদেহে দেওয়া হয়ে থাকে তাকে এ্যান্টিজেন বলে। বস্তুত এই এ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশ ক'রে এ্যান্টিবডি তৈরী করতে সাহায্য করে। যেমন ডিপথেরিয়া, হুপিংকাফ এবং টিটেনাস এই তিনটি রোগের প্রতিরোধক হিসাবে ট্রিপ্‌ল এ্যান্টিজেন ইঞ্জেকসন দেওয়া হয়।

সুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে। অপরদিকে আরেক-প্রকার জীবপরমাণু মানবদেহে ক্রিয়াশীল থেকে অসুখটিকে প্রকটিত করে। এই ধরনের ক্রিয়াশীল জীবপরমাণুগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'কোর এ্যান্টিজেন'। প্রকৃতপক্ষে এগুলিই হ'ল সংক্রামক ভাইরাস-কণিকা। এই ভাই-রাসগুলিকে আবার 'ডেনি কণিকাও' (Dane particle) বলা হয়—আবিষ্কারক ডাঃ ডেনির (Dr. K. S. Dane) নামানুসারে।

হাঙ্গেরীয়ান বংশোদ্ভব অধ্যাপক গাজ্‌ডুসেক্ নিউইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স ৫৩ বছর। শিশুবিদ্যা, জেনেটিকবিদ্যা স্নায়ুবিদ্যা, জীবপরমাণুবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে কৃতবিদ্ এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানী স্ব-আবিষ্কৃত 'ধীরগতি ভাইরাস' সম্পর্কে এখনও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণায় রত আছেন। প্রথমে রচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে এবং পরে ১৯৪৬ সালে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল হ'তে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর হ'তে এখন পর্যন্ত মেরিল্যাণ্ড ন্যাশনাল ইনিস্‌টিটিউট অফ নিউরোলজিক্যাল ডিজীজেস নামক গবেষণাগারে তিনি কর্মরত আছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অবিবাহিত এবং উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বিজ্ঞানী হলেও, ষোলটি দত্তক পুত্র-কন্যার স্নেহময় পিতাও আবার তিনি। নিউগিনি এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হ'তে কতকগুলি উপজাতি কিশোর-কিশোরীকে নিয়ে এসে তিনি তাঁর কাছে রেখে তাদের মানুষ করার মহান ব্রত নিয়েছেন। নোবেল পুরস্কারের সম্পূর্ণ টাকা তিনি ঐসব অনুন্নত আদিবাসী কিশোর-কিশোরীদের লেখাপড়ার জন্য এবং তাদের সু-স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করবেন ব'লে জানিয়েছেন। স্বীকার করতে বাধা নেই, সত্যই ডাঃ গাজ্‌ডুসেক্ একজন মহাপ্রাণ মানব-প্রেমিক।

অপরদিকে অধ্যাপক বারুচ ব্লুমবার্গ সুরিনাম, নাইজিরিয়া, সিঙ্গাপুর, এবং ভারতবর্ষের কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলের অধি-বাসীদের নিয়ে এক কষ্টকর এবং দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা চালানোর সময় কার্যতঃ তিনি একজন চিকিৎসক তথা প্রত্নতত্ত্ববিদে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি একজন সু-চিকিৎসক হলেও কার্যতঃ তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু তাঁকে প্রত্ন তত্ত্ববিদে রূপান্তরিত করেছে। তাঁর গবেষণার বিষয় হ'ল—ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলে সৃষ্ট এবং সেই সঙ্গে বংশানু-ক্রমিতার কুফল হিসাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি বিশেষ চরিত্রের অসুখের উৎপত্তির কারণ-নির্ণয়, সেগুলির প্রতিরোধ এবং নিরাময়ের জন্য চেষ্টা চালানো। বর্তমানে তিনি পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'চিকিৎসা-প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা' (Medical anthropology) নামক এক অতি নবীন বিজ্ঞানের শাখায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। তিনিও নিউইয়র্ক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স হ'ল ৫১ বছর। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

সমালোচনা

Manu and Modern Times by Nitya Narayan Banerjee. Published by Hindutva Publications, A-14 Green Park, New Delhi 110016, (1975), pp 170, price Rs. 21/-.

Neitzche মনুসংহিতাকে বাইবেলেরও ওপরে স্থান দিয়েছিলেন ; সেজন্যে Keith তাঁর ওপরে খুব চটেছিলেন। কিন্তু Keith নিজেও একথা না ব'লে পারেননি যে শুধু আইনের বই হিসেবেই এটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, এর মধ্যে একটি জীবনদর্শন প্রোথিত আছে, একটি বৃহৎ জনসমাজের আত্মা নিহিত আছে। Thoreau বলেছিলেন, তাঁর সমস্ত রচনা মনু থেকে পুনর্মুদ্রিত। আমেরিকার সেনেট হলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আইন-প্রণেতা ব'লে মনুর নাম উল্লেখিত আছে।

এহেন মহাগ্রন্থের ওপর লেখা আলোচ্য বইখানি অবশ্যই বরণীয় ও মননীয়। লেখক শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থকার ও হিন্দু মহাসভার নেতারূপে সুপরিচিত। তিনি মনুস্মৃতির অবিমিশ্র প্রশংসা করেছেন এবং এর কিয়দংশের ইংরিজি অনুবাদ দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন (পৃঃ ১৬), ভাষান্তর কিছুটা তিনি নিজে করেছেন, কিছুটা George Buhler-কৃত। কিন্তু Buhler-এর তরজমা কতটা কোথায় জমা পড়েছে তার হদিস দিতে কোন উদ্ধৃতিচিহ্ন তিনি দেননি !

বইয়ের গোড়াতে মনুর প্রশস্তি-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখেছেন : মনুর সন্তানসন্ততি পৃথিবীতে Man, মানব ইত্যাদি নামে অভিহিত (পৃঃ ১)।...আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল আর্যাবর্ত, অর্থাৎ ভারতবর্ষ (পৃঃ ১)।...হিন্দুরা পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি (পৃঃ ২)। না বললেও চলে, উক্তিগুলি মুখরোচক হলেও ইতিহাসসম্মত নয়। এরকম শিথিল মন্তব্য আরো অনেক আছে।

ভারতে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনধারা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এখন যে ঠিক মনুর বিধানে চলে না এজন্যে লেখক অনেক আপসোস করেছেন (পৃঃ ৩, ৭)। মনুর ওপরে কলম চালিয়ে স্বাধীন ভারতে বিবাহ-বিচ্ছেদ, অসবর্ণ বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু আইনের যে-সব সংশোধন সংযোজন করা হয়েছে তার জন্যে লেখক যৎপরোনাস্তি অপ্রসন্ন। সমসময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রীতি-নীতির পরিবর্তন বা বিবর্তন হবে, না সেগুলি শাশ্বত সত্য, অলঙ্ঘ্য বিধান ব'লে গণ্য হবে ? সমাজব্যবস্থা অচলায়তনের মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে, না যুগের (বা হুজুগের ?) হাওয়াবদলের সঙ্গে সঙ্গে তারও রদবদল হবে ? —এ বিতর্ক আগেও হয়েছে, এখনও চলেছে, ভবিষ্যতেও চলবে।

সে তর্ক চলুক। কিন্তু লেখকের নিরাপস মতামতে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাধান্যই বেশী। তাতেও আপত্তি ছিল না, যদি ভাষা বানান ও ছাপার ভুল সম্বন্ধে তিনি আরও একটু সতর্ক হতেন। furnitures (পৃঃ ৪), hairs (পৃঃ ১০), the God (পৃঃ ২), the Parliament (পৃঃ ১৫), with a view to give। acquaint (প্রস্তাবনা, পৃঃ ১৬), littarateur-এর পরিবর্তে literateur

(প্রচ্ছদপটের পশ্চাদ্‌বর্তী পরিচয়পত্র) ও literatures (পৃ: ৮), Buhlery, translarion (পৃ: ১৬) ইত্যাদি অশুদ্ধি চোখে লাগে।

উপরন্তু, ১১০ পৃষ্ঠার বইখানিতে মনুস্মৃতি সম্পর্কে রচনা ১২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। বাকীটা জুড়ে আছে Hinduism at a glance নামে লেখকের একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ ও শ্রীলঙ্কার জনৈক Dr. Kewal Motwani-এর লেখা Is Hinduism (and Buddhism) compatible with the notion of secular society? নামক আর একটি নিবন্ধ! (বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে 'and Buddhism' গ্রন্থে মুদ্রিত!) Manu and Modern Times নামধারী গ্রন্থে এ দুটি রচনা যোগশূন্য মনে হয়।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের আদি ও সনাতন শিক্ষাগুরু মনুর প্রশংসাপত্র নিষ্প্রয়োজন। বর্তমান আলোচনার সীমিত পরিসরে তাঁর নবমূল্যায়নের অবকাশও অল্প। শুধু এটুকু বলা যায়, তিনি শুধু ঐহিক রীতিনীতি আচার-আচরণ সম্বন্ধে কতকগুলি অনুশাসন ও সুভাষিত দিয়ে যাননি; তাঁর সংহিতার পরিশেষে তিনি এই সার প্রবচন দিয়েছেন: শ্রেষ্ঠ জ্ঞান 'আত্মজ্ঞান' এবং 'নিঃশ্রেয়স'-লাভের উদ্দেশ্যে সম্পন্ন কর্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম। মহর্ষি মনুর এই দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিকটায় লেখক তেমন মনোযোগ দেননি।

যাই হোক, গ্রন্থকারের বলিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠা, ভারতের সনাতনধর্মের প্রত্যয়ান্বিত প্রচারণে তাঁর দুর্মর উৎসাহ ও অধ্যবসায় শ্লাঘনীয়। বইটি অবশ্যই মনু-অনুরাগীদের কাছে সমাদৃত হবে এবং যাঁরা আধুনিকতা মানে শুধু অন্ধ পরানুকরণ মনে করেন, স্বদেশের ঐতিহ্যবাহী এই বইখানি পড়লে তাঁরাও উপকৃত হবেন। প্রত্যেক সদ্‌ গ্রন্থাগারে বইটি সংরক্ষণযোগ্য। কিছু ভুলচুক থাকলেও এটি একখানি মর্যাদাবান পুস্তক।

বকলম

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৬, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। বিগত বৎসরের অধিবেশনের বিবৃতি পাঠ, মিশনের গভর্নিং বডির ১৯৭৫-৭৬ সালের প্রতিবেদন পাঠ (নিম্নে প্রদত্ত), ১৯৭৫-৭৬ সালের হিসাব ও হিসাব-পরীক্ষকের প্রতিবেদন পাঠ, ১৯৭৬-৭৭ সালের হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ এবং নূতন সদস্যদের নামের তালিকা পাঠ ইত্যাদির পর সভাপতি স্বামী ভূতেশানন্দজী বলেন:

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের এক অতি মহান আদর্শ দিয়ে গেছেন—শিবজ্ঞানে জীবসেবার ক্রান্তিকারী আদর্শ। তাই যে-সেবার কাজই আমরা করি না কেন, কী মনোভাব নিয়ে কাজটি করছি, আদর্শ অনুযায়ী করছি কি না, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। নতুবা আমাদের মধ্যে অহংভাবের সঞ্চার হবে। ত্যাগের আদর্শকে আমাদের সামনে প্রোজ্জ্বল রাখতে হবে। আমাদের ওপর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কাজ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, কিন্তু কর্মীর সংখ্যা কম। কাজের স্বভাবই হচ্ছে বেড়ে যাওয়া। তাই সর্বাবস্থায় সেবার মূল আদর্শকে

ধ'রে থাকতে হবে।

ভারতের এবং ভারতের বাইরের বিভিন্ন জায়গা থেকে জনগণ চাইছেন যে, আমরা সেই সব জায়গায় মিশনের কেন্দ্র স্থাপন করি। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আমাদের অভাব আছে কর্মীর ও সঙ্গতির। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস এই যে, যদি আমরা সর্বতোভাবে নিবেদিতপ্রাণ হই, প্রভু আমাদের শক্তিসামর্থ্য দিবেন ও সকল অভাব দূর করবেন।

এই সেবার কাজে শুধু ত্যাগী সদস্য নয়, গৃহী সদস্যদেরও দায়িত্ব রয়েছে। আমরা অল্পই করতে পেরেছি—এখনও বহু কাজ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করতে হবে। যদি আমরা প্রভুর শ্রীপদে মন রেখে আদর্শ অনুযায়ী কাজ ক'রে যেতে পারি, তা হ'লে সবই ঠিক হবে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে, অহংভাব যেন আমাদের মধ্যে এসে কাজে বাধাস্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়। যদি এইভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, তা হ'লেই আমরা প্রভুর কাজ করবার যোগ্য হবো।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী আমাদের শক্তি দিন—আমরা যেন তাঁদের কাজের যোগ্য হতে পারি, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৫-৭৬ সালের কার্যবিবরণী

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৭৬, বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পঠিত গভর্নিং বডির প্রতিবেদনের বঙ্গানুবাদ

"বন্ধুগণ, এক বছর পরে আবার আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৭তম সাধারণ সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে আপনাদের সানন্দে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটির জীবনে প্রতিটি বছরই উল্লেখযোগ্য উন্নতির চিহ্নফলকস্বরূপ এবং যদিও কখনো কখনো বাহ্য অবস্থার উত্থান-পতন ঘটেছে, তবু এর দৃঢ় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি আমরা প্রতি বছরই লক্ষ্য করেছি। অতীতে আমাদের বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য বছরটি সেগুলি থেকে মুক্ত ছিল। ফলে সর্বক্ষেত্রে মিশনের কাজের সমন্বয়সাধন ও উন্নয়ন নির্বিঘ্ন হয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন সেখানে সেবার কাজ সম্পর্কে আমাদের চরম উৎকণ্ঠাময় অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলেছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সমস্যা ততটা জটিল হয়নি, যতটা আমরা আশঙ্কা করেছিলাম।

কিন্তু অনুকূল পরিস্থিতিতেও আত্মসন্তুষ্টি সমীচীন নয় এবং আরামেরও অবকাশ নেই। সামনে সুদীর্ঘ পথ। আমাদের প্রভু, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময়ী বাণী পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছে দিতে হবে। এই কাজে আমাদের সকলেরই অকুণ্ঠ ও সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। গৃহী এবং ত্যাগী—উভয়বিধ ভক্তেরই মিলিত ও সহযোগিতাপূর্ণ কাজের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ এই মিশন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সুতরাং, আসুন আমরা সকলেই আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হই এবং মিশনের সেবায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করি।

সংযোজন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

আলোচ্য বছরে রায়পুর আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবনির্মিত মন্দিরের উৎসর্গ এবং বেলুড় সারদাপীঠে শিল্পবিদ্যালয়ের একটি নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হয়। মঠ ও মিশনের প্রধান কার্যালয়ের কয়েকটি বিভাগের জন্য, কিছুসংখ্যক ত্যাগী শিক্ষার্থীর আবাসের জন্য এবং পীড়িত সাধুদের আরোগ্যভবনের জন্য কর্তৃপক্ষ পুরাণো শিল্পবিদ্যালয়-স্থানটি অধিগ্রহণ করেন। বেলঘরিয়া বিদ্যার্থী আশ্রমের অতিথি ভবনের এবং মাদ্রাজ বালক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের শিলান্যাস করা হয়। পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে দাতব্য চিকিৎসালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

হায়দরাবাদের মঠকেন্দ্রে একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার উৎসর্গীকৃত হয়।

সদস্য ও পদাধিকারিগণ

আলোচ্য বছরে মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী কর্মসচিব স্বামী চিদাত্মানন্দের দেহত্যাগ গভীর দুঃখের বিষয়।

মিশনের গত বছরের অধিবেশনে জানানো হয়েছে যে, ১লা এপ্রিল ১৯৭৫ থেকে স্বামী ভূতেশানন্দ ও স্বামী কৈলাসানন্দ সহাধ্যক্ষ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও স্বামী আত্মস্থানন্দ সহকারী কর্মসচিব এবং স্বামী গীতানন্দ কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন।

আলোচ্য বছরে মিশনের ৯ জন ত্যাগী এবং ৩ জন গৃহী সদস্যের দেহান্ত হয়েছে। বছরের শেষে ত্যাগী ও গৃহী সদস্যদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৬৩ ও ৩৭৮।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যাবলী

১৯৭৬-এর মার্চে মিশনের মোট শাখাকেন্দ্র ছিল ৭৫—বাংলাদেশে ৭টি, ব্রহ্মদেশ ফ্রান্স ফিজি সিঙ্গাপুর শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে একটি ক'রে এবং বাকী ৬২টি ভারতে (বেলুড় প্রধান কেন্দ্র বাদে)। আলোচ্য কার্যবিবরণীতে আমরা রামকৃষ্ণ মঠের ভারত ও ভারতেতর দেশগুলিতে অবস্থিত ৬৫টি (বেলুড় প্রধান কেন্দ্র বাদে) কেন্দ্রের বিস্তারিত কার্যাবলীর উল্লেখ করছি না।

মিশনের নিঃস্বার্থ সেবার মূল ভিত্তি হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী—যেভাবে তা স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হয়েছে। মিশনের সেবাকার্য মোটামুটি পাঁচটি ধারায় শ্রেণীভুক্ত করা যায়: (১) ত্রাণকার্য (২) চিকিৎসা (৩) শিক্ষা (৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার এবং (৫) গ্রামে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে কাজ।

ত্রাণকার্য: বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের সহযোগিতায় মিশন ভারতে যে ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছে, তার উল্লেখ নীচে করা হ'ল। এতে মোট খরচ হয়েছে ৪,৪৪,২১২ টাকা এবং উপকৃত হয়েছেন ৬,০০০ পরিবারের ১৮,৯০০ নরনারী।

(ক) বন্যাত্রাণ—(১) করিমগঞ্জে করিমগঞ্জ সেবাসমিতি (২) পাটনা ও মানেরে পাটনা আশ্রম ও রাঁচী (মোরাবাদী) আশ্রম (৩) মেদিনীপুরে তমলুক সেবাশ্রম ও মেদিনীপুর আশ্রম এবং (৪) (দক্ষিণ) ২৪ পরগণায় মনসাদ্বীপ আশ্রম।

(খ) খরাত্রাণ—(১) পুরুলিয়ায় পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ এবং (২) উড়িষ্যায় পুরী মিশন আশ্রম।

(গ) খাদ্যাভাবত্রাণ—২৪ পরগণায় কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম এবং মনসাদ্বীপ আশ্রম।

(ঘ) পুনর্বাসন—পাটনা জেলার মানেরে মিশনের প্রধান কার্যালয়, বেলুড়।

বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ অব্যাহত থাকে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ বাগেরহাট বরিশাল দিনাজপুর ফরিদপুর শ্রীহট্ট হবিগঞ্জ ও বালিয়াটি শাখাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে। ৭৭,৯০০ পরিবারভুক্ত প্রায় ৩,০৯,৪০০ লোক নানাভাবে ত্রাণসাহায্য পায়। এতে মোট খরচ হয় ৬৩৪,৭৬০ টাকা। অধিকন্তু অভাবগ্রস্তদের মধ্যে প্রায় ১৭,০০,০০০ টাকা দামের নানারকম জিনিসপত্র বিতরিত হয়।

উল্লেখ্য যে, গরীবরা বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে নগদ টাকা ও অন্যবিধ সাহায্যও পায়। মিশনের প্রধান কার্যালয়ও ৮৯টি পরিবার ও ৩০৬ জন ছাত্রকে নিয়মিত এবং ৭৭টি পরিবার ও ১৬৮ জন ছাত্রকে সাময়িক সাহায্য করে—এতে মোট ৪৭,৬৪১ টাকা খরচ হয়। কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ, গরম চাদর, কম্বল, ধুতি এবং শাড়িও বিতরিত হয়।

চিকিৎসা ঃ ভারতে মিশনের বহু শাখাকেন্দ্র অনেকগুলি অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতাল ও বহির্বিভাগীয় ডিসপেনসারি পরিচালিত করে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে রোগীদের সেবার জন্য। আলোচ্য বছরে ৮টি হাসপাতালে রোগীর শয্যা ছিল ১,২৯৪ এবং ২৯,৫২৯ জন রোগী চিকিৎসিত হন। ৬০টি ডিসপেনসারির মাধ্যমে ৩৪,৮১,৬৮১ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। রাঁচীর স্যানাটোরিয়াম ও নতুন দিল্লীর টি. বি. ক্লিনিকে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসা করা হয়। কলিকাতার সেবাপ্রতিষ্ঠান অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও একটি নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষণ বিদ্যালয় যথাপূর্ব পরিচালনা করে। বিদ্যালয়টিতে 'সাহায্যকারী' ও 'সাধারণ'—এই দুই শাখাতে মোট শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ছিল ২০৭। অধিকন্তু সেবাপ্রতিষ্ঠান নেত্ররোগ-চিকিৎসা শিশুস্বাস্থ্য স্ত্রীরোগচিকিৎসা ও ধাত্রী-বিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত একটি ইন্স্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস পরিচালনা করে। এতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩।

মঠকেন্দ্রগুলির ৫টি হাসপাতালের ৩৩১টি শয্যায় মোট ১১,৭৭০ এবং ১৭টি ডিসপেনসারিতে ৫,৭১,২৮২ জন রোগী চিকিৎসিত হন। এ ছাড়া ৩০ জন নার্স শিক্ষণপ্রাপ্ত হন।

শিক্ষা ঃ—আলোচ্য বছরে মিশন পরিচালনা করেছে ৫টি ডিগ্রি কলেজ, ২টি বি. এড্. কলেজ, ১টি স্নাতকোত্তর বেসিক শিক্ষণ কলেজ, ৪টি জুনিয়র বেসিক শিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১টি বেসিক শিক্ষণ বিদ্যালয়, ১টি শারীর শিক্ষা কলেজ, ১টি গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা কলেজ, ১টি কৃষি বিদ্যালয়, ৪টি পলিটেকনিক, ৮টি জুনিয়র কারিগরী ও শিল্প বিদ্যালয়, ৮২টি বিদ্যার্থী ভবন, ছাত্রাবাস ও অনাথাশ্রম, ১টি চতুষ্পাঠী, ২৬টি বহুমুখী, মাধ্যমিক ও উচ্চতর বিদ্যালয়, ১৩৪টি অন্যান্য পর্যায়ের বিদ্যালয়, ৩৪টি বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র বা কমিউনিটি সেণ্টার, ১টি অন্ধ-বালক বিদ্যালয়, ২টি বাণিজ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ১টি ভাষাশিক্ষা বিদ্যালয়, ১টি মানবিক ও আন্তঃসাংস্কৃতিক বিদ্যালয়, ১টি বিশ্বধর্ম বিদ্যালয় এবং ১২টি অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭২,১৬০। এদের মধ্যে ৫১,১৮৬ জন ছাত্র এবং ২০,৯৭৪ জন ছাত্রী।

মঠকেন্দ্রগুলির পরিচালিত ২৫টি বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬,২৪২।

সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার ঃ এই বিভাগে বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, বক্তৃতা ও আলোচনা-সভা, ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, নৈমিত্তিক প্রদর্শনী, নিয়মিত ক্লাস এবং সর্বজনীন উৎসব অনু-

ষ্ঠানাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। কলিকাতার ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং বিভিন্ন শাখা-কেন্দ্রের গ্রন্থ-প্রকাশন বিভাগগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মঠকেন্দ্রগুলিও বড় বড় প্রকাশন-কেন্দ্র এবং মন্দির ও প্রার্থনাভবন পরিচালনা ক'রে বক্তৃতাদিরও ব্যবস্থা করে।

গ্রামে এবং উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে সেবাকার্য: সীমিত অর্থবল ও লোকবল নিয়ে মিশন দরিদ্র ও অনগ্রসর লোকদের এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপ-জাতিদের মধ্যে সেবার কাজ করে। লক্ষ লক্ষ গরীব ও অনুন্নত মানুষ মিশন-পরিচালিত হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সেবায় উপকৃত হয়েছে। মিশনের ত্রাণকাজও এদেরই জন্য। বিভিন্ন আশ্রম কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানগুলি হাজার হাজার মানুষকে জীবনে নৈতিক মূল্যবোধে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

এই বিভাগের কাজের প্রসঙ্গে আরো বলা যায়, কমপক্ষে ১০টি বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত। ৯টি বহুমুখী বিদ্যালয়, ৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪৭টি উচ্চ বেসিক, নিম্ন বেসিক, উচ্চ প্রাথমিক ও মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়, ৪৫টি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩১টি বয়স্কদের সাক্ষরতা ও কমিউনিটি সেণ্টার, ২২টি দাতব্য ঔষধালয়, বহু গ্রন্থাগার, যাদের মধ্যে ৩টি ভ্রাম্যমাণ, ১৩২টি দুগ্ধ-বিতরণ কেন্দ্র, ১১টি চলচ্চিত্র ইউনিট, ৭টি কারিগরী শিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষণ কেন্দ্র প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে ও অনগ্রসর এলাকাগুলিতে রয়েছে। এ ছাড়া ৫টি ভ্রাম্যমাণ ডিসপেনসারির মাধ্যমে ১,১০,৭৪৬ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। নরেন্দ্রপুরে গ্রাম-পর্যায়ে কর্মি-শিক্ষণ কেন্দ্র এবং রাঁচীতে দিব্যায়ন উপজাতীয় ও গ্রামের যুবকদের কৃষি দুগ্ধাগার হাঁস-মুরগী-পালন ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষণ দিয়েছে। শিলচর আশ্রম কুকী মিজো ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে নানা রকমের কল্যাণমূলক কাজ করেছে। চেরাপুঞ্জি আলঙ ও নরোত্তম নগর এই তিনটি কেন্দ্র উপজাতীয় বালক-বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে প্রশংসনীয় সেবার কাজ করেছে

বিদেশে প্রচার

ব্রহ্মদেশ শ্রীলঙ্কা সিঙ্গাপুর ফিজি মরিসাস এবং ফ্রান্সে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচারের সঙ্গে শিক্ষা- ও সংস্কৃতি-মূলক কাজও করছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড আরজেন্টিনা এবং সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত ১৫টি মঠকেন্দ্র বক্তৃতা আলোচনা ও গ্রন্থ-প্রকাশনের মাধ্যমে প্রচার-কাজ করছে।

বাংলাদেশে অবস্থিত মঠ ও মিশনের ১০টি শাখাকেন্দ্র গ্রন্থাগার ছাত্রনিবাস বিদ্যালয় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির মাধ্যমে সেবার কাজ করেছে।

উপসংহার

রামকৃষ্ণ মিশনের বহুমুখী সেবাকাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হ'ল। স্বামী বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তাঁর ভাবসমূহ অন্ততঃ আট শ বছর কাজ করবে। সুতরাং ৭৯ বছরের জীবৎকাল এবং বিস্ময়কর উন্নতির পরও আমাদের সংঘ তার শৈশবাবস্থাতেই রয়েছে। যতই দিন যাবে আরও বড় বড় কাজ হবে। কিন্তু প্রভুর এই দিব্য লীলায় উপযুক্ত অংশভাগী হ'তে হ'লে আমাদের বিনম্রভাবে এগোতে হবে এবং জানতে হবে যে, আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র

মাত্র। শ্রীভগবান আমাদের উপর যে-ভার ন্যস্ত করেছেন, তা বহন করতে তিনি আমাদের পর্যাপ্ত শক্তি ও সাহস দিন—এই তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা।"

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ২৮শে পৌষ ১৩৮৩, ১২ই জানুআরি ১৯৭৭, বুধবার, পুণ্য কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ১১৫তম জন্মতিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি বেদপাঠ ভজন বিশেষ পূজা শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ কঠোপনিষৎপাঠ কালীকীর্তন এবং ধর্মসভা উৎসবের অঙ্গ ছিল। মধ্যাহ্নে প্রায় বিশ হাজার নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী প্রভানন্দ (বাংলায়), শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় (ইংরেজীতে) এবং সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ (বাংলায়) সুচিন্তিত ভাষণের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠে গত ৮ই ফাল্গুন ১৩৮৩, ২০শে ফেব্রুআরি ১৯৭৭, রবিবার শুভ শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪২তম জন্মতিথি মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি বেদপাঠ উষাকীর্তন শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ পাঠ কালীকীর্তন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৩০,০০০ নরনারায়ণ হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী ভাব্যানন্দ, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, স্বামী ঋতজানন্দ, স্বামী বন্দনানন্দ ও সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্পর্কে ভাষণ দেন।

২৭শে ফেব্রুআরি সারাদিনব্যাপী সাধারণ উৎসবে প্রায় ৪৫,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং প্রায় ৪,০০,০০০ লোকের সমাগম হয়।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছে যে, **স্বামী নীরজানন্দ** গত ১২ই ফেব্রুআরি সকাল ৬-৪০ মিনিটের সময় বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। তিনি ১৩ই জানুআরি মস্তিষ্কে রক্ত-ক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হইয়া সেবাশ্রমের হাসপাতালে ভর্তি হন। ক্রমশঃ তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইতেছিল, কিন্তু সহসা চিকিৎসকদের সর্বপ্রকার প্রযত্ন সত্ত্বেও তাঁহার দেহাবসান হয়। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৩ বৎসর। তিনি শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সংঘের রেঙ্গুন সেবাশ্রম কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। রেঙ্গুন সেবাশ্রম ব্যতীত সারদাপীঠ কালাডি সিঙ্গাপুর ও বারাণসী সেবাশ্রমেও তিনি কর্মী ছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময়ই বারাণসীতে অতিবাহিত করেন। সদানন্দ স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

খোয়াই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৬, শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি পালিত হয়। বিশেষ পূজাদির পর প্রায় ৬০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান। বৈকালে শ্রীদেবব্রত রায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা পাঠ ও আলোচনা করেন। পরদিন শিশুরা একটি একাঙ্ক নাটিকা পরিবেশন করে।

রায়গঞ্জ (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৬, শ্রীমা সারদা-দেবীর জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি ঊষাকীর্তন ভজন বিশেষ পূজা ও হোম এবং শ্রীশ্রীচণ্ডী ও গীতা পাঠ হয়। প্রায় ৬০০ ভক্ত ও শিশুদের বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা হয়।

খুলনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের মহিলা সদস্যা-গণের উৎসাহে ও উদ্যোগে গত ১৩ই ডিসেম্বর নবনির্মিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর শুভ আবির্ভাবতিথি প্রথম পালিত হয়। মঙ্গল আরাত্রিক ষোড়শোপচারে পূজা ভোগ-নিবেদন আরাত্রিক ও হোম হয়। সংঘের ভক্ত মহিলা ও পুরুষ শিল্পিবৃন্দ মাতৃভজন ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। দ্বিপ্রহরে প্রায় চারি-শতাধিক ভক্ত নরনারী বালক-বালিকা এবং দরিদ্রনারায়ণ প্রসাদধারণ করেন। অপরাহ্ন হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত সংঘের মহিলা সদস্যাগণ স্ব স্ব লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের পূত জীবনচরিত ও উপদেশামৃত অবলম্বনে প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বামী কালিকাত্মানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের কথা অবলম্বনে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

পূর্ণিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৬, পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি ঊষাকীর্তন ভজন বিশেষ পূজা, ভোগারতি ও হোম হয় এবং প্রায় দুই হাজারের অধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, স্বস্তিকা সোম, কাজরী ব্যানার্জি, মনা রুদ্র, ছবি ঘোষাল ও আরও অনেকে ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী পাঠ করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দ।

১৭ই ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের জন্মতিথি এবং ২৬শে ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ভোগ ও আরতির পর বহু ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় তাঁহাদের জীবনী পাঠ হয়। ২৪শে ডিসেম্বর ভগবান যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে তাঁহার জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী স্বানুভবানন্দ। ভক্তি-মূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বস্তিকা সোম, ছবি ঘোষাল ও মাষ্টার খোকন।

পরলোকে

পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উৎসাহী ও দীর্ঘকালের ভক্ত **স্নেহেশ মিত্র** গত ২৮শে মাঘ, শুক্রবার, সন্ধ্যায় ৭০ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ সালে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করেন। স্বামী রামানন্দ ও স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ প্রবর্তিত Vivekananda Boys' Association নামক স্বেচ্ছাসেবকদলের তিনি একদা তরুণ অধিনায়ক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পাটনা শাখার সর্ববিধ কার্যে সর্বপ্রকার সহযোগিতাদানে তিনি সর্বদাই অগ্রণী ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে তাঁহার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা পৌষ। (১৩০৬ সাল) [২৩শ সংখ্যা।]

বেদান্ত ও ভক্তি।

(স্বামী সারদানন্দ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]*

জ্যোতির্ম্ময় আত্মপক্ষী অনন্ত চিদাকাশে উড়িবার প্রয়াস পাইতেছে। জ্ঞান ও ভক্তি তাহার বিস্তারিত পক্ষদ্বয়; এবং যোগ—গতি-নিয়ামক পুচ্ছ। তিনটী অঙ্গ সবল ও সমানভাবে পরিবর্দ্ধিত না হইলে, উড়িবার চেষ্টা বৃথা। পক্ষদ্বয় না থাকিলে গতি-শক্তিই সম্ভবে না। আবার সংযমপুচ্ছ না থাকিলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া শক্তি অন্যদিকে ব্যয়িত হয়, অভীষ্ট ফল প্রদান করে না; বেদমূর্ত্তি তপোধন ব্যাস এই মহাসত্যের উপদেশ করিয়াছেন। যে কোন যুগে, যে কোন দেশে, যে কোন ধর্ম্মে যত ধর্ম্মবীর, অবতার, আচার্য্য, মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ধরা ধন্য করিয়াছেন; কামকাঞ্চন-স্বার্থপরতার উন্মত্ততা ও কোলাহলের মধ্যে যাঁহাদের অলৌকিক জীবন 'সূর্য্যকোটিপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং' ধর্ম্মালোক বিস্তার করিয়া, হতাশ-মানবের নয়ন মন স্তম্ভিত ও প্রবুদ্ধ করিয়াছে; বসন্তাগমে বৃক্ষলতিকার ন্যায়, যাঁহাদের আগমন, মৃত মনে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া মরুভূমির ধূসরতা হরিৎ-পুঞ্জে পরিণত করিয়াছে;—তাঁহাদের জীবনবেদ পাঠ করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির কি বিচিত্র সম্মিলনই দেখিতে পাওয়া যায়! 'রাজযোটকে জ্ঞান ও ভক্তির পরিণয়'—তাঁহাদের জীবনে কি মহান্ উদারতা প্রসব করে, তাহা জগতের ধর্ম্মেতিহাস-পর্য্যালোচনায় সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়। এই উদারতার বলেই শ্রীচৈতন্য যবন-হরিদাসকে শিষ্য করিতে এবং আচণ্ডালে প্রেম দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; এই উদারতার বলেই ভগবান ঈশামসি সামারিটান্-কন্যার জলপান, বেশ্যা মেরীর সেবা-গ্রহণ এবং য়াহুদী ও অন্য জাতিকে সমানভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন; ইহার প্রভাবেই ভগবান শাক্যসিংহ জ্ঞানের সুদৃঢ়স্তম্ভ-স্বরূপ হইয়া বিম্বসার যজ্ঞে একটি ক্ষুদ্র, অসহায়, নগণ্য প্রাণীর জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে প্রসন্ন চিত্তে উদ্যত হইয়াছিলেন। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের অপূর্ব্ব সম্মিলন, তেজ ও মাধুর্য্যের বিচিত্র সমাবেশ, ভারতের পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুণ্যভূমি-কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, 'মানুষ কেহই আমায় ছাড়িয়া নাই; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে আমার দিকে আসিতেছে; যে যেদিক দিয়াই যাক্ না কেন, আমি তাহাকে সেই দিক্ দিয়াই ধরি'।

* ফাল্গুন, ১৩০৩ সংখ্যার পর।—বর্ত্তমান সঃ

হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমান ভাবে বর্দ্ধিত, এমন লোক জগতে অতীব বিরল। একটি অপরটির ব্যয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে, একটি বাড়িয়া অপরটিকে আওতায় ঘিরিয়াছে,—ইহাই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে যেমন হৃদয়—ভাবের সাগর,—সমস্ত জগতকে আপনার করিয়া লইয়াছে অথচ মস্তিষ্কের পর্ব্বত-কঠিন বেলাভূমি উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতেছে না—অত্যল্পমাত্র ভাবস্পন্দে বাজিয়া উঠে; অপরদিকে তেমনি, মস্তিষ্কও—কূট জটিল প্রশ্ন সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভিতরের সারবস্তু গ্রহণে সমান পারদর্শী।—ইহাই আদর্শ এবং দেবগুরুর বিশেষ প্রসাদ ভিন্ন পাওয়া অসম্ভব। জ্ঞান ও ভক্তির আবহমান কাল ধরিয়া যে বিবাদ, তাহার প্রধান কারণ ঠিক এইখানে পাওয়া যায়। 'গোঁড়ামি', 'অজ্ঞতা', 'হীনবুদ্ধি', 'একদেশীভাব', এ সকলই হৃদয়-মস্তিষ্কের অযথা সংস্থানের ফল, এবং ধৈর্য্য, বীর্য্য, শ্রদ্ধা, উদারতা, এমন কি জীবন্মুক্তিও ইহাদেরই যথাযথ সংস্থানের ফল। মুক্ত হওয়া আর কিছুই নহে, এই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হওয়া মাত্র।—ধর্ম, নীতি, চরিত্র প্রভৃতি তখন আর প্রয়াস করিয়া রক্ষা করিতে হয় না —নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালনাদির ন্যায় স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া আসে। তখনই মানুষের আপন মন গুরু হইয়া দাঁড়ায়; যাহা ভাল বলিয়া গ্রহণ করে তাহা নিঃসংশয় ভাল হয় এবং যাহা মন্দ বলে তাহা তেমনি নিশ্চিত মন্দ হয়। তখন "মা আর তার পা বে-তালে পড়িতে দেন না"।

জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ কোথায়?

জ্ঞান ভক্তির আর বিরোধ কোথায়?—পথে ও কথায়। কথার বিবাদ মিটিয়া গেলে বোধ হয় জগতের চারি ভাগের তিন ভাগ ঝগড়া মিটিয়া যায়। এক শব্দে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু লক্ষ্য করিয়া, বা এক শব্দে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ভাব লক্ষ্য করিয়া আমাদের যত বিবাদ উপস্থিত হয়। আমেরিকার সুবিখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিত জন্ ফিস্ক্ বলেন, বিরুদ্ধ পক্ষের ভাব ও দৃষ্টি লইয়া দেখিবার শক্তিহীনতাই যত বিবাদ-বিসম্বাদের কারণ। হারবর্ট স্পেন্সর আর একটু অগ্রসর হইয়া এই রোগের কারণ ও ঔষধ নির্দেশ করিয়াছেন।—"জয়ের আদর কমিয়া হৃদয়ে যত সত্যের আদর বাড়িবে, আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ কেন এত দৃঢ়তার সহিত স্বমত পোষণ করে তাহার কারণ-অন্বেষণের চেষ্টাও তত বলবতী হইবে। এবং 'লক্ষ্য-বিষয়ে তাহারা এমন কিছু দেখিয়াছে যাহা আমরা এখনও দেখিতে পাইতেছি না' এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা যতটুকু সত্য পাইয়াছে তাহা ও আমরা যতটুকু পাইয়াছি তাহার সহিত, সংযোগের চেষ্টা হইবে"। পরমহংসদেব এ বিষয়ে তাঁহার সেই সুমিষ্ট গ্রাম্য ভাষায় বলিতেন "ওরে কোনও জিনিষের 'ইতি' করিস্নি,—ভগবান ত দূরের কথা। 'ইতি করা', 'এটা এই—এ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না' মনে করা হীনবুদ্ধির কায"।

অনন্ত ঈশ্বরে 'ইতি'—অসম্ভব।

অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের খেলাই—এই ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম ইহার এক একটি অংশ সেই অনন্তের পরিচয় দেয়। এক গাছি তৃণ, একটি বালুকা-কণা, বা বিশেষ শক্তিশালী অনুবীক্ষণ-গ্রাহ্য একটি প্রাণি-বীজের শরীরগঠন ও গুণ ইত্যাদির ইয়ত্তা কে করিতে পারে? সেই জন্যই বেদ বলিয়াছেন "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"। পূর্ণ তিনি, পূর্ণ তাঁর জগৎ; সেই পূর্ণানন্ত-স্বরূপ হইতেই এই অসীম জগৎ প্রসূত,

কিন্তু তাহাতে তাঁহার হানি বা হ্রাস হয় নাই। কারণ, অনন্ত-পদার্থ হইতে অনন্ত-পদার্থ নির্গত হউক না কেন—যে অনন্ত সেই অনন্তই থাকে।

মানব বাস্তবিক নিজেও অনন্ত এবং অনন্তের সহিতই চিরকাল খেলিতেছে, 'করতল আমলকবৎ' অনন্তকেই সে ধরিতেছে, ছুঁইতেছে, দেখিতেছে, শুনিতেছে। কেবল তাহার ভিতর কি একটু কোথায় গোলমাল হইয়াছে যাহার জন্য সে তাহাতে সান্ত বুদ্ধি করিতেছে। পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব, জড় চেতন, উচ্চ নীচ, ক্ষুদ্র মহান্ সকল স্থানে একবার সেই অনন্ত বুদ্ধি আন দেখি,—ধরা স্বর্গ হইবে; শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু কোথায় লুকাইবে; ধর্ম্ম, ভক্তি, মুক্তি—আর কাল্পনিক ধোঁয়া ধোয়া শব্দ মাত্র থাকিবে না; আর দেখিবে—সেই জীবন্ত বিশ্বরূপী বিরাট, সেই 'সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখং', সেই ভীষণ হইতেও ভীষণ এবং শোভন হইতেও শোভন, নিবিড় আঁধার ও অনন্ত জ্যোতি-হিল্লোলের বিচিত্র সমাবেশ, করালবদনা শবশিবা! এই দেবদুর্ল্লভ পূর্ণ দর্শনের প্রথম সোপানই হইতেছে—'ইতি না করা'।

'আমি' ও 'তুমি'।

'আমি', 'তুমি'—এ দুটি অতি সোজা কথা। জন্মাবধি মানুষ বোধ হয় এ দুইটির যতবার উচ্চারণ করে ততবার আর কোনটির করে না। এ দুইটির পৃথক্ ভাব, জীবনে প্রথমেই শিক্ষা হয়, আবার এতই বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, এ দুইটিতে গোল হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ বোধ হয় এ দুইটি শব্দ হইতে যত হইয়াছে, এত আর কিছুতে হয় নাই।

'তুমি' ও ভক্তি।

ভক্ত বলেন—'ঠাকুর! আমি কিছু নই, তুমিই সব। রোগে, শোকে জর্জ্জরীভূত, কাম ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়, যশ মানের কাঙ্গালী, বায়ুর ন্যায় অস্থির-মতি,—এ 'আমি'র আবার শক্তি আছে? এ 'আমি'র দ্বারা আবার সাধন হবে, ভজন হবে,—তোমায় পাব? জলে শিলাভাসা, বানরের সঙ্গীত, আকাশ-কুসুমও, কোন কালে সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই নগণ্য 'আমার' শক্তি আছে এবং সেই শক্তিতে তোমায় ধরিব—ইহা কখন সম্ভবে না। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বস্ব ধন; তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক। "নাহং নাহং—তুঁহু তুঁহু তুঁহু তুঁহু"। ভক্ত দেখেন এক মহান্ 'তুমি',—যাহার নিয়মে সূর্য্য তারকা ফিরিতেছে, অগ্নি—জ্যোতি দিতেছে, মৃত্যু—সমুদায় গ্রাস করিতেছে। ভক্ত দেখেন সেই 'তুমি' আবার প্রাণের প্রাণ, নয়নের জ্যোতি, বাহুর শক্তি; প্রেমই তাঁহার স্বরূপ, তিনি পরম সুন্দর!! সে সৌন্দর্য্যের কাছে আর সকল সৌন্দর্য্য অন্ধকারে পরিণত, সে বীর্য্যের কাছে অন্য সকল পরাহত। এই মহান্ তুমি—নিকট হইতেও নিকটে, আপনার হইতেও আপনার। মোহিত ও স্তম্ভিত হইয়া, ভক্ত ইঁহাকেই ইষ্ট-দেব বলিয়া বরণ করেন এবং 'তুমি'-নাম-মহামন্ত্রে মহোৎসাহে দীক্ষিত হন।

'আমি' ও জ্ঞানী।

জ্ঞানী দেখেন—শরীর প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল; মনও তদ্রূপ,—ফিরিতেছে, ঘুরিতেছে, বাড়িতেছে, কমিতেছে। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র-বারির ন্যায়, ভাবরাশি কখন উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া গভীর গর্জ্জনে ছুটিতেছে, আবার কখনও বা অস্তমিত শক্তি,—ফল্গুর ন্যায় ক্ষুদ্র ধারা,—বাকালু

ভেদ করিতে না করিতে শুকাইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যের ভিতর,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির ভিতর,—শরীর, মন, বুদ্ধির ভিতর,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের ভিতর,—এক অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয় নির্মল নিত্যস্রোত বহিতেছে, যাহার আঘাত অন্তরে লাগায় অবিরত 'অহং' 'অহং' ধ্বনি উঠিতেছে; বুদ্ধি—দোলায়মান চিত্তবৃত্তিকে বিশেষ বিশেষ রূপসম্পন্ন করিয়া নিশ্চয়াকৃতি করিতেছে; প্রাণচক্র পরিবর্ত্তিত হইয়া, ইন্দ্রিয় সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে। জ্ঞানী, এই অনিত্যের ভিতর সেই নিত্যের, অচেতনের ভিতর সেই সচেতনের, অশক্তিকের ভিতর সেই পরিপূর্ণ শক্তিকের দর্শন পাইয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। আবার দেখিলেন সেই নিত্যের ছবি, স্ত্রী পুরুষ, জীব জন্তু, গ্রহ নক্ষত্র, জড় চেতন, সমুদায় জগতে বর্ত্তমান। দেখিলেন, এই ক্ষুদ্র 'আমির' যথার্থস্বরূপ—মহান্ ও নিত্য। মহোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন "আমাতেই এই জগৎ উঠিতেছে, ভাসিতেছে, লীন হইতেছে। আমিই জ্ঞান ও শক্তির একমাত্র আকর। আমিই নারায়ণ। আমিই পুরান্তক মহেশ। মৃত্যু ও শঙ্কা কি আমায় স্পর্শ করিতে পারে? জন্ম জরা বন্ধনই বা আমার কোথা?"—

"ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ,
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যঃ,
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

ভক্ত ও জ্ঞানীর লক্ষ্য একই।

তবে ভক্তের 'মহান্ তুমি' ও জ্ঞানীর 'মহান্ আমির' মধ্যে আর প্রভেদ কোথায়?—কেবল মাত্র বাক্যে। দুই জনেই এক বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করেন মাত্র। উভয়েই বলেন—ইন্দ্রিয় সকল সংযত কর, নিত্য পদার্থে বিশ্বাস কর, এবং এই 'ক্ষুদ্র আমি', 'কাঁচা আমি', ছাড়িয়া দাও—উহাই যত দুঃখ ও বন্ধের কারণ। কাঁচা আমিকে, ভক্তি বা বিবেক-বৈরাগ্যের জলন্ত আগুনে, পোড় খাওয়াইয়া, মহান্ আমি বা তুমির সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া, 'পাকা' করিয়া লও। আবার,—জোর করিয়া সম্বন্ধ পাতাইতেও হইবে না;—পরস্পর আকর্ষণ ও সখ্যতা উভয়ের নিত্যকাল বর্ত্তমান দেখিতে পাইবে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে,
তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।"

রামানুজ চরিত।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।)

[১ম ভাগ, ৯ম অধ্যায়ের কিয়দংশ—বর্ত্তমান সঃ]

গত ১৫ই আশ্বিনের

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(সমালোচনা)

কলিকাতায় "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ" নামে একটী সভা আছে। ইহার কার্য্যালয় গ্রে-ষ্ট্রীটের ১০৬/১ নং ভবনে। কলিকাতার অনেকানেক গুণী মানী ধনী এবং জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই সভার সদস্য। অধুনা ইহার সভাপতি বহুমান্যবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভার উদ্দেশ্য :—প্রথমতঃ, বাঙ্গালা ব্যাকরণ-প্রণয়ন ও অভিধান-সঙ্কলন ; দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাষা সংগ্রহ ও সংগঠন ; তৃতীয়তঃ, অন্যান্য ভাষার ভাল ভাল পুস্তকাদি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা ; চতুর্থতঃ,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তকাদির প্রকাশ ও চর্চ্চা। পঞ্চমতঃ, সাহিত্য-পরিষদের একখানি পত্রিকা সুচারুরূপে পরিচালনা করা ; এই পত্রিকার নাম সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ; কাগজখানি ত্রৈমাসিক, আজ দুই বৎসর বাহির হইতেছে। সাহিত্য-পরিষদের মোট উদ্দেশ্য হইতেছে—বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত উন্নতি যাহাতে হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ।

উহার উদ্দেশ্য।

আমাদের বাঙ্গালা ভাষা একটী সম্পূর্ণ-ভাষা নহে। ইহার অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। অনেক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কথার অভাব বিশেষ অনুভব করা যাইতেছে। যাহাতে বাঙ্গালা-ভাষা পড়িয়াই যাবতীয় বিদ্যায় যথোচিত জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, সাহিত্য পরিষদের তাহাই উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য-সাধন-দ্বার (Organ) হইতেছে—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বাঙ্গালা ভাষা অসম্পূর্ণ।

গত ৪ঠা বৈশাখে সাহিত্য পরিষদের এক বার্ষিক উপবেশন হয়। পরিষদের সভাপতি——দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়—সেই সভায় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার গত সংখ্যায় (২য় সংখ্যা ১৩০৬) ঐ বক্তৃতা বাহির হয়। বক্তৃতাটী যথার্থই সভাপতি-সমুপযোগী। উন্নতিশীল বঙ্গীয় সাহিত্যানুরাগী মাত্রই ইহা পাঠ করিয়া পরম প্রীতি ও উপকার লাভ করিবেন সন্দেহ নাই।

সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাহিত্য-পরিষদের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সভাপতি মহাশয় অনেক উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উপায়গুলি অতি সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত। কেহ কেহ কিন্তু আরও একটী উপায়কে বিশেষ ফলদায়ক বিবেচনা করেন :—

বাঙ্গালা সাহিত্যোন্নতির আর একটী উপায়।

প্রতি জেলায় একটী করিয়া সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সভা স্থাপন করা হইলে ভাল হয়। সেখানে কলিকাতার প্রধান "সাহিত্য-পরিষৎ" সভার যাবতীয় নিয়মাবলী পালন যেন করা হয়। সেই সকল সভার সভ্যেরা সেই সেই জেলার যাবতীয় স্থানীয় বিশেষ বিশেষ কথোপকথনের ভাষা লিপিবদ্ধ করুন। বাঙ্গালা

সাহিত্য-পরিষদের জেলা-সভা।

দেশের অনেক জেলায় বিশেষ বিশেষ শিল্পচর্চ্চা আজও প্রচলিত আছে। তত্রস্থ ভদ্রগণের নিকট হইতে (এমন কি 'চাসাভুসার' নিকট হইতেও) সেই সেই শিল্প এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় ভাষা ও পরিভাষা সংগ্রহ করুন। পরে, কলিকাতার প্রধান সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক বৃহৎ সভায়, প্রত্যেক জেলার শাখা সাহিত্য-সভা হইতে প্রতিনিধি আসিয়া, লিখিত পঠিত ভাবে, ভাষা ও পরিভাষার এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় আদান প্রদান করুন। ইহাতে সাহিত্য-পরিষৎ অভিধান-সঙ্কলনে নিশ্চয়ই বিশেষ সাহায্য পাইবেন।

সাহিত্য-পরিষদের যেরূপ উদ্দেশ্য, তাহাতে কেবল মাত্র এক রাজধানীতে জড়ীভূত হইয়া থাকিলে কতদূর ইহা ফলদায়ক হইবে বলা যায় না। রাজধানীস্থ সভাকে এক মহৎ কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাসার্দ্ধ (radii) স্বরূপ প্রতি জেলায় সাহিত্য-পরিষদের "জেলা-সভা" সংস্থাপিত হউক। তত্তদ্-জেলা-সভার অধীনে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যের উপনগর-সভা (Sub-divisional associations) সঙ্গঠিত হউক। এইরূপ হইলে বাঙ্গালা ভাষাকে পূর্ণ-কলেবর করিতে বেশী বিলম্ব ও কষ্ট হইবে না। সাহিত্য-পরিষদে অনেক দেশপূজ্য খ্যাতনামা গুণশালী ও ধনাঢ্য সদস্য আছেন; তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে জেলা-সভা ও উপনগর-সভা সংস্থাপন করিতে পারেন, এবং সাহিত্য-পরিষদ্‌কে রীতি-মত কার্য্যক্ষম ও প্রকৃত প্রণালীবদ্ধ (really organized) করিয়া তুলিতে পারেন।

উপনগর-সভা।

এক ক্ষুদ্র সভার ন্যায়, তাঁহাদিগের মহৎ উদ্দেশ্যকে, কি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা, সাহিত্য-পরিষদের শোভা পায়?—না ইহাতে কার্য্য হয়? দুই হস্তে চতুর্দ্দিকে দূরে দূরে সাহিত্য-বীজ ছড়াইয়া দিন; উদ্দেশ্য ও তৎ-সাধনপ্রণালী বঙ্গ-দেশের সর্ব্বত্র স্পষ্ট বুঝাইয়া দিন; প্রতি সহরে, নগরে, উপনগরে প্রবর্ত্তন করিয়া দিন,—দেখুন অল্পদিনেই কত ফললাভ হয়। সময়ে সময়ে পরিষদের পতাকা লইয়া সুযোগ্য সাহিত্য-প্রচারকগণ অবকাশমতে ভ্রমণে বাহির হউন; উচ্চরবে উদ্দেশ্য ঘরে ঘরে প্রচার করুন; হৃদয় ভেদ করিয়া লোকের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিন; সকলকে মাতাইয়া বদ্ধপরিকর করিয়া তুলুন; অবিলম্বে উপায়-অবলম্বনে জনসাধারণকে প্রবর্ত্তন করিয়া ফেলুন। সাহিত্যানুরাগী চাসাভুসাগণের ভিতর যথেষ্ট পারিতোষিক বিতরণ হউক এবং প্রকৃত সাহিত্যসেবক ও পরিষদের নিঃস্বার্থ কার্য্যকারকগণকে তা-বড় তা-বড় উপাধি প্রদান করা হউক।—দেখুন কার্য্যের মত কার্য্য হয় কি না।

সাহিত্য প্রচার।

পারিতোষিক ও উপাধি-প্রদান।

প্রচারকের কথা উত্থাপন করা গেল: কেন? কারণ আছে; একখানি অভিধান বা একখানি ব্যাকরণ অথবা খানকতক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পুস্তক কিম্বা দুই চারি খানি লুপ্তপ্রায় পুরাতন পুঁথি প্রকাশ করিলেই যে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য শেষ হইল, তাহা নহে; দশ বিশ বৎসর কার্য্য করিলেই যে সাহিত্য-পরিষদের পরমায়ু বিলুপ্ত হইবে ইহা কি কোনও হৃদয়বান সাহিত্যানুরাগী সহ্য করিতে পারেন? যতদিন বঙ্গের জীবন, যতকাল ধরাতলে বঙ্গবাসিগণের বিচরণ, না—যাবৎ অবনী-মণ্ডলের অস্তিত্ব, তাবৎ বঙ্গীয় সাহিত্য স্থিরগৌরবান্বিত যেন থাকে;—এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্ব

সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যভার।

লাভ করাইয়া দেওয়াই সাহিত্য-পরিষদের চরম উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। এইরূপ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গেলে রীতিমত প্রচার আবশ্যক এবং সেইমত প্রচারকেরও প্রয়োজন। প্রতি বিদ্যালয়ে, প্রতি পাঠশালায়, বঙ্গের ঘরে ঘরে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে যাহাতে স্বদেশীয় সাহিত্য-চর্চ্চা হইতে থাকে তাহারই চেষ্টা আবশ্যক। অসীম সাহিত্য-জগতে তবেই কখন যদি বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রাধান্যলাভ সম্ভবপর হয়। সাহিত্যের তারতম্যেই, অনেকে সভ্যতার তারতম্য বিচার করিয়া থাকেন।

প্রচারের আবশ্যকতা।

সাহিত্য-পরিষদের যদি এইরূপ উচ্চ আশা না থাকিল, এইরূপ "মহতো মহীয়ান" উদ্দেশ্য তাঁহাদিগের তীব্রদৃষ্টিপথে যদি না রহিল, তবে বিদ্যালয়ের কতিপয় বালক-কর্ত্তৃক "পরিষৎ" পরিচালিত হইলেই ছিল ভাল। অথবা, দু-একটি বাক্য-সর্বস্ব বঙ্গীয় বৃদ্ধ কর্ত্তৃক তচ্চির-স্বভাবসিদ্ধ বিশ মাসে-বৎসরান্তে পরিষদে, উর্দ্ধসংখ্যা অর্দ্ধঘণ্টার জন্য, কষ্টেসৃষ্টে বারেক বাতিজ্বালা হইলেই ছিল ভাল। সাহিত্য-পরিষদে যে সকল সুবিখ্যাত বিচক্ষণ ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য যথেষ্ট প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; এবং উন্নতি-কল্পে, যে সকল কার্য্য জনসাধারণের সাধ্যাতীত, এমত চিরস্থায়ী জগৎব্যাপী কীর্ত্তিসমূহ তাঁহাদিগের নিকট হইতে লাভ করিতে বাঞ্ছা করেন।

সাহিত্য-পরিষদের নিকট প্রত্যাশা।

সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বক্তৃতাটী পাঠ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "সভাপতির অভিভাষণ"। সভাপতি "সভাস্থ সজ্জনগণ" এই বাক্য দ্বারা সভাকে সম্বোধন করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিতেছেন। বক্তৃতাটীর ভাষা অতি স্বাভাবিক, সুললিত, মধুর এবং নূতন-ধরণের। এরূপ ধরণ বাঙ্গালা গদ্যের যথেষ্ট উন্নতি করিবে। ভাষা যতই স্বাভাবিক হইবে, ততই মিষ্ট ও প্রশংসনীয়। যে ভাষায় মন ও মুখ এক করিয়া বলা বা লেখা যায় না, সে ভাষা ভাষাই নয়। সে ভাষা সরল ভাষা নয়—কপট। মনে ভাব্‌ছি এক,—হয়ত মুখে কইছি এক—আর লেখ্‌বার সময় লিখ্‌ছি আর এক। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সভ্য ক'রে হয়ত এমন এক লিখ্‌তে হইল যে, যাকে লিখ্‌ছি সে মূর্খতাবশতঃ বুঝ্‌তেই পারিল না; হয়ত, এমনও হইতে পারে,—ভাব্‌ছি যা, লেখ্‌বার সময় আর তা বেরুচ্ছে না; কেমন ক'রে বেরুবে বলুন, বল্‌বার ভাষা এক রকম, আর লেখ্‌বার ভাষা আর এক রকম কিনা,—লেখবার সময় একটু সভ্য করিয়া ভাল কথা দিয়া লিখ্‌তে হবে কিনা; আমার এখন সেভাবের একটী ভাল কথা মনে এসে যুগুচ্ছে না। অথবা, সে ভাবের ভাল শুদ্ধ কথা আপনাদের বাঙ্গালা ভাষাতেই নেই,—হয় কটমট সংস্কৃত কথা, না হয় অন্য বিদেশীয় কথা; না হয়ত বা আমার সেই গাঁওয়ারী কথাই ব্যবহার করিতে হয়। এরূপ স্থলে ভাষাকে অথবা লেখককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক, তা না হ'লে ভাষার উন্নতি হয় না, ভাষা সম্পূর্ণ বিকাশ পায় না, বিশেষ, ভাষার শৈশব অবস্থায়। আগে

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা —সভাপতির অভিভাষণ।

ভাষার সরলতা আবশ্যক।

ইহাকে গা ছাড়িয়া উঠিতে দিন, তারপর ডাল পালা বা অদরকারী অথবা অনিষ্টকারী পদার্থগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে চলিতে পারে।

আর এক কথা,—আমাদের হচ্ছে মাতৃভাষা, আমাদের নিজের ভাষা, আমরা যেমন করে পারি বল্‌ব কইব ও লিখ্‌ব। যাঁহাকে লিখিব, তিনি বুঝিতে পারিলেই হইল,—ভাষার আদৎ কার্য্য এইখানেই হইয়া গেল। তারপর, শুদ্ধাশুদ্ধ কথা বিচার করিয়া, অলঙ্কারাদি প্রয়োগ করিয়া, অলকা তিলকাদি দিয়া, ভাষাকে সাজান যায়,—সে খুব ভাল কথা;—অধিকন্তু ন দোষায়, বরং সেটা গৌরব বৃদ্ধিরই কারণ হইবে।

রীতিমত ভাষাকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে গেলে, প্রত্যেক ভাষাই প্রায় প্রধানতঃ চার রকম মূল ধরণে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা,- (১) উচ্চধরণের, (২) মধ্যম ধরণের, (৩ চলিত, এবং (৪) গ্রাম্য বা গাঁওয়ারী। যেমন, (১)- সূর্য্য! অন্ন ভক্ষণ করিয়াছ?—উচ্চধরণের; (২)—"সূর্য্য, ভাত খাইয়াছ?"—মধ্যম ধরণের; (৩) "সূর্য্যি, ভাত খেয়েছ?"—চলিত ধরণের; (৪) ও সুয্যু, ভাত খাইচু (ইহা বাঁকুড়া এবং হুগলী জেলার কতিপয় গ্রামের কথা)?—গাঁওয়ারী ধরণের। উচ্চধরণের বাঙ্গালা ভাষায় নানা প্রকার অলঙ্কারাদি ও সংস্কৃতভাঙ্গা দুরূহ শব্দাদির ব্যবহার হইয়া থাকে, চলিত ধরণের ভাষায় নানাপ্রকার বিদেশীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়। এই ত গেল ভাষার চারিটী মূল ধরণ।

ভাষার ধরণ সাধারণতঃ সর্ব্বশুদ্ধ আট প্রকার।

ইহা ছাড়া আরও কয়েক রকমের ধরণ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা মিশ্র ধরণ। তাহাদিগকে এইরূপ আখ্যা দিলেও চলে:—(১) উচ্চমিশ্র, অর্থাৎ উচ্চ ও মধ্যম ধরণের মিশ্রিত ভাষা; এই ধরণে লিখিতে গেলে, কখন খুব উচ্চ রকমের অলঙ্কারাদি এবং দুরূহ দুরূহ শব্দযুক্ত ভাষার প্রয়োগ হইতেছে, আবার কোন স্থলে বা মধ্যম ধরণেরও ভাষা বাহির হইতেছে; মাসিক বা সংবাদপত্রাদি এবং সাধারণ পুস্তকাদিতে প্রায় এই ধরণেরই লেখা দেখা যায়। (২) মধ্যম মিশ্র, অর্থাৎ —মধ্যম ও চলিত ধরণের মিশ্র ভাষা; এইরূপ ভাষায় সচরাচর সকলে পত্রাদি লিখিয়া থাকেন:—দু-দশটা শুদ্ধকথাও থাকে এবং দশ বিশটা 'হচ্চে' 'যাচ্চে'-গোছ চলিত কথাও থাকে। (৩) চলিত মিশ্র, অর্থাৎ চলিত ও গাঁওয়ারী মিশ্রিত ভাষা, এইরূপ ভাষা প্রায় ছোট বালকবালিকা কর্ত্তৃকই পত্রাদি লিখিবার কালীন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং (৪) উচ্চ বিমিশ্র অর্থাৎ ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ধরণই ব্যবহার হয় - উচ্চ, মধ্যম, চলিত এবং এমন কি স্থল বিশেষে গাঁওয়ারী পর্য্যন্তও ব্যবহার হইয়া থাকে।

[ক্রমশঃ।]

কোলে
বিস্কুট
লজেন্স
জ্যাম জেলী আচার
স্কোয়াশ
ORANGE SQUASH
GUAVA JELLY
নির্মাতা :
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৭০০ ০১০
K B—3/74/B.

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১৯.০০। ২য় ভাগ ১৭.০০

সাধারণ ১ম খণ্ড ৩.৫০ ; ২য় খণ্ড ৭.৮০ ; ৩য় খণ্ড ৫.২০ ; ৪র্থ খণ্ড ৭.০০ ; ৫ম খণ্ড ৭.৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১.৬০ ; কাপড়ে বাঁধাই ১.৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩.৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২.৫০

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। (ছাপা নাই)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ —স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬ ; সাধারণ ৬.০০

বাঁধাই ৭.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। মূল্য ৫.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২২৯, মূল্য ৪.০০

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ১.৭৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ০.৭০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭.০০, ২য় ভাগ ৬.৫০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬। মূল্য ৬.০০ টাকা

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য—১৫.০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ৮.০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪.২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১০৬, মূল্য ২.৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ছেলেদের উপযোগী। পৃঃ ৬৪, মূল্য ০.৭০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(একত্রে) শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। পৃঃ ২৬২, মূল্য ৪.৫০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩৬৯, মূল্য ৬.০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১.২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র) স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২.৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ৮'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই) ; ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী—পৃঃ ৩১৮, মূল্য ২'২৫

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ১২৭, মূল্য ১'৫০

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ২০০, মূল্য ৩'০০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরত্রিক-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১৬; মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ১'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'২০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৮০, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ প্রসঙ্গ— (ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২০৯, মূল্য ৩'০০

তিব্বতের পথে হিমালয়ে— স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৫২, মূল্য ৩'৩০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০, শোভন ৬'০০

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।
১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি — স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। পৃঃ ১৫৮, মূল্য ২'০০

বৈরাগ্যশতকম্ — স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ— স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি — স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র —স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৫, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০ ; ৩য় অঃ ১৩'০০ ; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি — পৃঃ ৬৬, মূল্য ১'০০

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮২, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব —স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ-চরিত — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃঃ ২৭৪, মূল্য ১০'০০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ২'০০ (ছাপা নাই)

ছোটদের বিবেকানন্দ — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৬২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

সামাজিক প্রগতি

গত আঠারো মাসে দেশের সামাজিক ও অর্থনীতিক ক্ষেত্রে একটা শান্তিপূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেছে।

** ১৯৭৬-এর নভেম্বর শেষ হওয়ার আগে প্রায় একাত্তর লক্ষ পরিবারকে বাস্তু জমি দেওয়া হয় (এই ধরনের জমি পাওয়ার কথা মোট ১১৩,৬ লক্ষ পরিবারের)।

** ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সব কটি রাজ্য আইন প্রণয়ন করেছে।

** এগারোটি রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পল্লী-ঋণ মকুব করার জন্য (ঋণ আদায়ের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া সমেত)
আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছে।

** ৮৯,১৯৮ জন বেগারখাটা বা মুচলেকা মজুরকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

উৎপাদনে সর্বকালীন রেকর্ড

১৯৭৫-এর পয়লা জুলাই-এ অর্থনৈতিক কার্যসূচী ঘোষিত হবার পর থেকে দেশ কৃতসংকল্প হয়ে কাজে নামে আর তার পুরস্কার :

** খাদ্যোৎপাদন ১১৮ মিলিয়ন টনের রেকর্ড মাত্রা ছুঁয়েছে এবং ভাণ্ডারে মজুত রয়েছে ১৮ মিলিয়ন টন।

** ১৯৭৬-৭৭-এর প্রথম ছ'মাসে শিল্পোৎপাদনের মাত্রা যেখানে বারো শতাংশ সেখানে তার আগের বছরের ঐ ক'মাসের মাত্রা ছিল মাত্র তিন শতাংশ।

** ১৯৭৬-এর প্রথম সাত মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ৩৩·৯ শতাংশের রেকর্ড হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতীয় অর্থনীতি ব্যাপক বিকাশের দ্বারপ্রান্তে উপনীত

ভারতে অর্থনীতির দ্রুত বিস্তার ঘটছে, মুদ্রাস্ফীতি শাসনে এসেছে (শূন্যাঙ্কের পর্যায়ে নেমেছে) এবং মূল্যমান স্থিতিশীল হয়েছে ঃ

* খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১১৮ মিলিয়ন টনের সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁচেছে ; বর্তমানে দেশে ভাণ্ডারে—মজুদ খাদ্যশস্যের পরিমাণ হল ১৮ মিলিয়ন টন।
* আর্থিক বছরের প্রথম ছ' মাসে শিল্প-বিকাশের মাত্রা ছিল প্রায় ১২ শতাংশের মতো ; গত বছরের ঐ সময়ে তা ছিল মাত্র ৩ শতাংশ—১৯৭৬-৭৭-এ শিল্পোৎপাদন তার আগের বছরের তুলনায় দশ শতাংশের মতো বেশি হবে বলে অনুমান।
* ১৯৭৫-এর এপ্রিল-সেপ্টেম্বরের তুলনায় ১৯৭৬-এর ঐ সময়ে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মাত্রা ১৬'৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
* ১৯৭৬-এর এপ্রিল-অক্টোবরে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ৩৩'৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে ··· ঐ সময়ে আমদানী কমে এসেছে ৯ শতাংশের মাত্রায়।
* অন্যান্য দেশের প্রাপ্য পরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ; স্বাধীনতালাভের পর এই প্রথম বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা ভাণ্ডারে ২৫,০০০ মিলিয়ন টাকা সঞ্চিত হয়েছে।
* সরকারী ক্ষেত্রে বিকাশের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ১২ শতাংশের মতো।
* টাকার ক্রয়ক্ষমতা ১৭ থেকে ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের এই বিশাল প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সর্ব সম্ভাবনা কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত করার জন্য সরকার ও জনগণের দৃঢ় সংকল্পের বাস্তব অভিব্যক্তি হল এই সাফল্যগুলি।

Udbodhan—Phone : 55-2447 MARCH 1977 Regd. No. WB/NC-19

COVER PRINTED BY

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্ট্রীগণের পক্ষে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২·০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ১·২০ টাকা

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্‌
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৯তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনাঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭৷৷০টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫৷৷০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৮৪

সূচীপত্র

পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জী
সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

সূচীপত্র

গোপাল

বেনারসী
সিল্ক
স্যাড়ী
পোষাক
শৈললাল মণিলাল
স্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট • কলি-১২
(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)
বহুবাজার
৩৫-৮৬৩৭
শ্যামবাজার
৫৫-২০০৭
কাশ্মিরী
শাল
বিছানা
হোসিয়ারী

টসের
চা
এ, টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা—১

দিব্য বাণী

মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যুপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং
তমেব মার্গং তব নির্দিশামি॥

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু॥

—শংকরাচার্য : বিবেকচূড়ামণি, ৪৩, ৪৫

তোমার বিনাশ নাই, শুন হে বিদ্বান্
অকারণ ভীত নাহি হও মতিমান্।
যতিগণ যে-পথেতে করিয়া গমন
এই ভবপারাবার সমুত্তীর্ণ হন,
সেই পথ উপদেশ করিব তোমায়
ভবসিন্ধু তরিবার রয়েছে উপায়।

উপনিষদের অর্থ করিলে নিশ্চয়
মোক্ষের উপায়ভূত হয় জ্ঞানোদয়।
সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞান করে
সংসারদুঃখের নাশ চিরকাল তরে।

কথাপ্রসঙ্গে

শংকরাচার্যের পথ

আগে মত, তাহার পর পথ। একটি কবিতায় আছে:

'যখন যেভাবে চলে, সেইমতো কথা বলে
নিজ মত করি সমর্থন।
অন্য মত যবে পায়, পূর্বমত ছেড়ে দেয়
সভা ক'রে বুঝায় তখন।'

মানুষ যে-মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, সেই মতের অনুসরণে পথ অবলম্বন করে এবং সেই মতের সমর্থক ও প্রচারক হয়; আবার অন্য মতকে সত্য বলিয়া মনে হইলে পূর্ব মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন মতের সমর্থক ও প্রচারক হইয়া থাকে—ইহা আমরা পদে পদে দেখিতে পাই। কথায় বলে 'বদলে গেল মতটা, ছেড়ে দিলুম পথটা।' মতের পরিবর্তনে অবলম্বিত পথেরও পরিবর্তন হয়, কারণ পথ মতের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কোন সন্দেহ নাই, আগে মত, তাহার পর পথ এবং কথাটি রাজনৈতিক শিক্ষানৈতিক অর্থনৈতিক সমাজনৈতিক ইত্যাদি লৌকিক ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, মহান ধর্মাচার্যগণ কর্তৃক প্রচারিত আধ্যাত্মিক মত ও পথ সম্বন্ধেও তেমনই সত্য। এমন কি ভক্তিপথে যেখানে শুষ্ক তত্ত্ববিচারের স্থান নাই, সেখানেও উপাস্যের তত্ত্ব আগে জানিতে হয় এবং তাহার পর উপাস্যের প্রাপ্তির উপায় অর্থাৎ পথের কথা উঠে, তৎপূর্বে নহে। ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়া সাধক যাঁহাকে লাভ করিবেন, তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু জ্ঞান না থাকিলে ভক্তি করা সম্ভব হয় না। অবশ্য দেখা যায়, শাস্ত্রাদি না পড়িয়াও বা গুরুমুখে উপাস্যের তত্ত্ব না শুনিয়াও অনেকে ভক্তিপথের পথিক হন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও সহজাত সংস্কারের বশে বা অন্য যে-প্রকারেই হউক, উপাস্য সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব মত বা ধারণা থাকে, যাহার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা ভক্তিপথ অবলম্বন করেন। সেই অস্ফুট ধারণা যাহাতে দৃঢ়ভিত্তিক হয়, সেই উদ্দেশ্যে ভক্তির আচার্যগণ উপাস্যের স্বরূপ, উপাসকের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহাদের মতসমূহ সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার পর অবলম্বনীয় পথের কথা বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারও লিখিয়াছেন:

'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর আলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥'

ভক্তিপথ অপেক্ষা জ্ঞানপথে আবার সিদ্ধান্তের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। নানা আনুষঙ্গিক বিচারের মধ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়া মূল সিদ্ধান্তগুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়া সেগুলি ধারণা করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়া থাকে। এইজন্য শংকরাচার্যের নির্ধারিত পথ সম্বন্ধে জানিতে হইলে প্রথমেই তাঁহার মত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। শংকরাচার্যের মত একদিকে যেমন অতি সরল, অন্যদিকে তেমনই অতি জটিল। একটি সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকার্ধেই তাঁহার মত ব্যক্ত করা হইয়াছে—'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই, ব্রহ্ম-ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই তত্ত্বই শংকরাচার্য উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্যে এবং স্বরচিত কয়েকটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে নানা-

ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আবার দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ আভাসবাদ প্রতিবিম্ববাদ অবচ্ছেদবাদ উপাধিবাদ ইত্যাদি নানা মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যেগুলির মধ্যে প্রবেশ করা সাধারণ মানুষ কেন, অতি বিদগ্ধ ব্যক্তিদের পক্ষেও সহজ নহে। সুতরাং তত্ত্বগত জটিলতার গহনে অণুমাত্র প্রবেশ না করাই নিরাপদ পন্থা। সহজ কথায় আমরা বলিতে পারি, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে যখন বাস্তব কোনও ভেদ নাই, তখন অন্তিম বিশ্লেষণে উপাসনারও কোনও স্থান নাই। এক অদ্বিতীয় সত্তামাত্রই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উপাস্যেরও স্বরূপ যাহা, উপাসকেরও স্বরূপ তাহাই, সুতরাং কে কাহার উপাসনা করিবে? তবে নির্গুণ ব্রহ্ম অনির্বচনীয় মায়ার দ্বারা সগুণ হন এবং উপাসনা সেই সগুণ ব্রহ্মেরই হইতে পারে, নির্গুণ ব্রহ্মের নহে। বলা যাইতে পারে, শংকরাচার্যের এই মতটিই তাঁহার প্রদর্শিত ও প্রচারিত পথের ভিত্তিস্বরূপ।

শংকরাচার্য দেখিলেন, এই অতি কঠিন নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব গৃহীদের পক্ষে ধারণা করা অসম্ভব। এইজন্য তিনি গৃহীদের জন্য একটি পথ এবং সন্ন্যাসীদের জন্য আরেকটি পথ নির্দিষ্ট করিলেন। অথবা বলা যায়, পথ একটিই—উহার কিছুদূর মাত্র গার্হস্থ্য-আশ্রমে এবং অবশিষ্ট অংশ সন্ন্যাস-আশ্রমে অতিক্রম করিতে পারা যায়।

গৃহস্থগণ সম্পূর্ণ পথটি কেন অতিক্রম করিতে পারিবেন না, শংকরাচার্য তাহা নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুণ্ডক উপনিষদ্ বলেন, আত্মাকে লাভ করিতে হইলে সর্বদা সত্যবাদী হইতে হইবে, সর্বদা চিত্তের একাগ্রতারূপ পরম তপস্যায় নিরত থাকিতে হইবে, সর্বদা ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে ইত্যাদি।[১] ইহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শংকরাচার্য প্রশ্নোপনিষদের একটি মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, গৃহস্থদের পক্ষে সর্বদা সত্যাদি-সাধন-সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহাদের নানা প্রকারের লোকব্যবহারের প্রয়োজনে কুটিলতার আশ্রয়-গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী এবং প্রমোদ ও রঙ্গকৌতুকেও মিথ্যাকথন অবর্জনীয়।[২] সুতরাং গৃহস্থগণ কিভাবে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন? মুণ্ডক উপনিষদের আরেকটি মন্ত্রের ব্যাখ্যায়ও শংকরাচার্য লিখিয়াছেন যে, সন্ন্যাসরহিত জ্ঞানের দ্বারা আত্মবস্তু লাভ করা যায় না।[৩] গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যোগী ব্যক্তি সর্বদা একান্তে অবস্থিত, একাকী, বীততৃষ্ণ ও পরিগ্রহরহিত হইয়া আত্মার ধ্যান করিবেন। ইহার ব্যাখ্যায় শংকরাচার্য লিখিয়াছেন, 'একান্তে অবস্থিত' এবং 'একাকী'—এই দুইটি বিশেষণ হইতেই বুঝা যায় যে,

১ সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা / সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্। —মু. উ. ৩।১।৫

২ গৃহস্থানাম্ অনেকবিরুদ্ধ-সংব্যবহার-প্রয়োজনবত্ত্বাৎ জিহ্মং কৌটিল্যং বক্রভাবঃ অবশ্যম্ভাবি ···· গৃহস্থানাং ক্রীড়ানর্মাদিনিমিত্তম্ অনৃতবর্জনম্ অবর্জনীয়ম্।
—প্র. উ. ১।১৬, শাংকরভাষ্য।

৩ নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো / ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। —মু. উ. ৩।২।৪
তপঃ অত্র জ্ঞানম্। লিঙ্গং সন্ন্যাসঃ। সন্ন্যাসরহিতাৎ জ্ঞানাৎ ন লভ্যতে ইতি অর্থঃ।
—ঐ, ভাষ্য।

সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াই ঐভাবে আত্মধ্যান করিতে হইবে।[৪]

সুতরাং গৃহস্থগণ যদি নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতির অধিকারী না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের পথ কী? শংকরাচার্য বলিতেছেন: গৃহস্থগণ নিত্য বেদ অধ্যয়ন করিবেন, বেদোক্ত কর্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান করিবেন এবং সেই কর্মের দ্বারাই ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। তাঁহারা কাম্য কর্ম পরিহার করিবেন। এইভাবে বেদবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহারা নিষ্পাপ হইবেন এবং জাগতিক সুখে দোষ-দর্শন করিবেন। গৃহস্থগণের ইহাই পথ। তাঁহারা যদি আর একটু অগ্রসর হন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে গৃহে থাকা আর সম্ভব হয় না। আত্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হইলে—এবং ঐরূপ হওয়াই বিধেয়—তাঁহারা অবিলম্বে গৃহত্যাগী হইবেন।[৫]

গৃহী ব্যক্তি কোন্ অবস্থায় গৃহত্যাগের অধিকারী তাহা মোটামুটি বলা হইলেও আরও স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি সন্ন্যাস ব্যতীত সম্ভব নহে—অতএব 'যেন তেন প্রকারেণ' সন্ন্যাসী হইয়া যাই, এইরূপ মনোবৃত্তি কোন কাজেরই নহে। শংকরাচার্যের অভিমত এই যে, নিত্যা-নিত্যবস্তুবিবেক শমদমাদিসাধনসম্পত্তি ইহলোকে ও পরলোকে যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর প্রতি তীব্র বৈরাগ্য এবং মুক্তির তীব্র ইচ্ছা ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করা অসমীচীন। এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন না হইলে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে কাহারও অধিকার জন্মে না। সুতরাং সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে দেখিতে হইবে যে, এইসকল সাধনসম্পত্তি অর্জিত হইয়াছে কিনা।

যথোচিত অধিকারী হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণের পর সন্ন্যাসীর কী পথ? শংকরাচার্য তাঁহার রচিত 'সাধনপঞ্চকে'র তিনটি শ্লোকে সেই সেই পথের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। সংক্ষেপে বলা যায়, নির্গুণব্রহ্ম-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সন্ন্যাসী সর্বপ্রকার কর্ম পরিত্যাগ করিবেন, ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ভিক্ষান্নরূপ ঔষধ সেবন করিবেন, স্বাদু ভোজ্যবস্তু যাচ্ঞা করিবেন না, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকিবেন, শীতোষ্ণাদি শান্তমনে সহ্য করিবেন, বৃথাবাক্য উচ্চারণ করিবেন না, ভগবানে দৃঢ় ভক্তি করিবেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্যের শরণাগত হইয়া ভক্তিসহকারে বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিবেন এবং বাক্যার্থ বিচার করিবেন, কুট তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি-অনুকূল তর্কের অনুসরণ করিবেন, 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ'—এইরূপ চিন্তা করিবেন, এবং অহরহঃ গর্ব ও দেহাভিমান পরিত্যাগ করিবেন।[৬]

সাধনপঞ্চকের শেষ শ্লোকে জ্ঞাননিষ্ঠার

৪ যোগী যুঞ্জীত সততম্ আত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥
—গীতা, ৬।১০

রহসি স্থিতঃ একাকী চ ইতি বিশেষণাৎ সন্ন্যাসং কৃত্বা ইতি অর্থঃ। —ঐ, ভাষ্য।

৫ বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম স্বনুষ্ঠীয়তাং / তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্।

পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তাম্ /আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্॥
—সাধনপঞ্চক, ১

৬ সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তি দৃঢ়াধীয়তাং / শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্।

অন্তিম পর্যায়ে পথের শেষে পূর্ণ জ্ঞানপ্রাপ্তির কথাই বলা হইয়াছে। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী একান্তে সুখাসীন হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়া অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিবেন। সমগ্র জগতের মিথ্যাত্ব তখন নির্ণীত, সাধক সিদ্ধ ও কৃতকৃত্য—পরব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। দেহপাতাবধি তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম-মাত্রই অবশিষ্ট থাকে, সঞ্চিত কর্ম ফলপ্রসূ হয় না এবং জ্ঞানোৎপত্তির পরে ক্রিয়মাণ কর্মের ফলও তাঁহাকে স্পর্শ করে না।[৭]

মনুপ্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ ও মহাভারত-কারও গার্হস্থ্য-আশ্রমের সবিশেষ প্রশস্তি গাহিয়াছেন এবং চরম পুরুষার্থ মোক্ষের অব্যবহিত হেতুভূত বলিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমও ভারতীয় ঐতিহ্যে চির-সম্মানিত। সুতরাং এই দুইটি মুখ্য আশ্রমের কৃত্য সম্পর্কে শাংকর ভাষ্যে বিশদ আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্মে এই দুইটি আশ্রমের অতিরিক্ত ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমও বিদ্যমান। সুতরাং শংকরা-চার্যের মতানুসারে ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থাশ্রমীর পথ সম্পর্কেও উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই দুই আশ্রমীর পক্ষেও ঐ একই কথা অর্থাৎ তাঁহারা নিজ নিজ আশ্রমোচিত কর্ম ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে সম্পন্ন করিবেন এবং তাহার ফলে চিত্তশুদ্ধি পর্যাপ্ত হইলে যখনই তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, তখনই সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিবেন, কারণ শ্রৌত নির্দেশ এইরূপই।[৮]

এইভাবে শংকরাচার্য তাঁহার রচনা ও প্রচারের মাধ্যমে বৈদিক মার্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সুন্দর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। কোন পথকেই বাদ দেওয়া হয় নাই এবং সকল মানুষকেই স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে—যাহার যেরূপ ইচ্ছা ও সামর্থ্য সে তদনুযায়ী কর্ম ভক্তি

সদ্বিদ্বানুপসৃপ্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাং / ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরো-বাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং / দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্ত-র্কোঽনুসন্ধীয়তাম্।

ব্রহ্মাস্মীতি বিভাব্যতামহরহর্গর্বঃ পরিত্যজ্যতাং / দেহেঽহংমতিরুজ্ঝ্যতাং বুধজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং / স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্।

শীতোষ্ণাদি বিষহ্যতাং ন তু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্যতাম্ / ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্যমুৎসৃজ্যতাম্॥ —সাধনপঞ্চক, ২, ৩, ৪

৭ একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং / পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্।

প্রাক্কর্ম প্রবিলাপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শ্লিষ্যতাং/প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্॥ —সাধনপঞ্চক, ৫

৮ ব্রহ্মচর্যাৎ এব প্রব্রজেৎ, গৃহাৎ বা, বনাৎ বা · যদহঃ এব বিরজেৎ, তদহঃ এব প্রব্রজেৎ। —জাবাল উপনিষৎ, ৪

বা জ্ঞানপথের পথিক হইতে পারে, অবশ্য বর্ণাশ্রমধর্মেরই পরিপ্রেক্ষিতে। গৃহস্থের পক্ষেও জ্ঞানচর্চা করিতে বাধা নাই[১], কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি করিতে হইলে সন্ন্যাস ভিন্ন যে গত্যন্তর নাই, ইহা শংকরাচার্যের স্থির সিদ্ধান্ত। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। শংকরাচার্য সন্ন্যাসের উপর বিশেষ জোর দিলেও, ব্রাহ্মণগণের মধ্যেই সন্ন্যাস সীমাবদ্ধ রাখিয়া সন্ন্যাসের পরিধি সংকুচিত করিয়াছিলেন। যদিও শংকরাচার্য যে সময় আসিয়াছিলেন, তখন বর্ণাশ্রমধর্ম একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয়, তথাপি যেটুকু ছিল, তাহা হইতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই তাঁহাদের সহজাত সংস্কারবশে ত্যাগ তিতিক্ষা ক্ষমা আদি দিব্য গুণে ভূষিত, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষেই সন্ন্যাস-অবলম্বন সম্ভব স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ফলতঃ শংকরাচার্যের মতে সমাজের বিপুলসংখ্যক মানুষই কর্ম ও ভক্তির পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য এবং মুষ্টিমেয় মানুষই সন্ন্যাসী হইয়া জ্ঞানপথের পথিক হইতে পারেন।

১ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবে অপি গৃহস্থানাম্ আত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি, কিন্তু অতীব শ্রেয়ো ভবতি। —আত্মানাত্মবিবেকঃ, ৫৯

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : তর্হি বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ ইতি প্রাপ্তং, ন ইতি আহ—**জ্ঞেয়াতীতম্** ইতি। জ্ঞেয়ং জ্ঞানবিষয়ং বস্তু অতীত্য বর্তমানম্। নহি জ্ঞেয়াতীতং জ্ঞেয়ং ভবতি—'অন্যদেব তদ্বিদিতাৎ' (কেন উ. ১।৪), 'অপ্রমেয়মনাদিং চ' (ব্রহ্মবিন্দু উ. ৯) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। বিদিতাৎ বেদনবিষয়াৎ। অপ্রমেয়ং প্রমায়াঃ বুদ্ধিবৃত্তেঃ বিষয়ঃ ন ভবতি ইতি অর্থঃ। অত্র হেতুম্ আহ—**জ্ঞানময়ম্** ইতি। জ্ঞানস্বরূপম্ ইতি অর্থঃ। 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' (তৈ. উ. ২।১।৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ননু তর্হি জ্ঞেয়াতীতস্য কথম্ অন্তঃকরণে বিশেষবোধঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—**হৃদি উপলভ্যম্** ইতি। হৃদি বুদ্ধৌ ভাস্যাতীতস্য অপি সূর্যস্য আদর্শে স্ফুটং প্রতিবিম্বতয়া ভানবৎ জ্ঞেয়াতীতস্য অপি বিষ্ণোঃ বুদ্ধৌ স্ফুটং প্রতিবিম্বতয়া স্বতঃ স্ফুরণং সম্ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ—'মনসৈবেদমাপ্তব্যং' (কঠ উ. ২।১।১১), 'এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ' (মু. উ. ৩।১।৯) 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা' (কঠ উ. ১।৩।১২) ইত্যাদিনা। ন চ এষু বাক্যেষু আত্মনঃ বুদ্ধিগ্রাহ্যত্বং প্রতীয়তে ইতি বাচ্যম্,— 'অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈ. উ. ২।৯), 'ন মতে র্মন্তারং মন্বীথাঃ, ন বিজ্ঞাতে র্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ' (বৃহ. উ. ৩।৪।২), 'মনসৈবেদমাপ্তব্যম্' (কঠ উ.

২।১।১১) 'যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্' (কেন উ. ১।৬) ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ-প্রসঙ্গাৎ। কঃ তর্হি শ্রুতিদ্বয়স্য পরস্পরাবিরোধার্থঃ ইতি চেৎ, শৃণু,—মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যম্ ইত্যাদেঃ আত্মনঃ বৃত্তিব্যাপ্যত্বং বিবক্ষিতম্। অপ্রমেয়ম্ ইত্যাদি শ্রুত্যা ফল-ব্যাপ্যত্বং নিষিধ্যতে। আত্মনঃ বৃত্তিব্যাপ্যত্বং নাম অন্তঃকরণবৃত্তৌ প্রতিবিম্বতয়া স্বতঃ এব স্ফুটং ভাসমানত্বম্। ফলব্যাপ্যত্বং ফলেন তদ্‌গত-চিদাভাসেন ভাস্যত্বম্। তথা চ ন শ্রুতিদ্বয়বিরোধঃ। তৎ উক্তং ভারতীতীর্থৈঃ—'স্বপ্রকাশোঽপি সাক্ষ্যেষ ধীবৃত্ত্যা ব্যাপ্যতেঽন্যবৎ। ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্‌ভি র্নিবারিতম্॥' (পঞ্চদশী, ৭।৯০), 'অপ্রমেয়মনাদিং চেত্যত্র শ্রুত্যেদমীরিতম্। মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি ধীব্যাপ্যতা শ্রুতা॥' (পঞ্চদশী, ৭।৯৫) ইতি। অতঃ অবিষয়স্য অপি বোধঃ সম্ভবতি ইতি ভাবঃ। 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ' (বৃহ. উ. ৪।৩।৭, ৪।৪।২২) ইত্যাদি অবান্তর-বাক্যেন দেহাদি-ব্যতিরিক্তত্বেন 'অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি র্ভবতি' (বৃহ. উ. ৪।৩।৯) ইত্যাদিনা স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বেন 'অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ' (বৃহ. উ. ৪।৩।১৫,১৬) ইত্যাদিনা চ অসঙ্গত্বেন, 'যদ্বৈতন্ন পশ্যতি' (বৃহ. উ. ৪।৩।২৩) ইত্যাদিনা অলুপ্তচিত্ত্বেন প্রতিপদ্যমানং ত্বংপদার্থং হৃদি উপলভ্যং **যং বিদুঃ** ইতি সম্বন্ধঃ। তৎপদার্থম্ আহ—**ভাবগ্রাহ্যানন্দম্** ইতি। ভাবরূপেণ গ্রাহ্যঃ চ অসৌ আনন্দঃ চ অসৌ ভাবগ্রাহ্যানন্দঃ তম্,—'যুবা স্যাৎ সাধু-যুবাধ্যাপকঃ' (তৈ. উ. ২।৮।১) ইত্যাদিনা সার্বভৌমম্ উপক্রম্য মনুষ্য-গন্ধর্বাদি-স্থানেষু উৎকর্ষেণ শ্রূয়মাণঃ আনন্দঃ যত্র কাষ্ঠাং প্রাপ্তঃ সঃ অস্তি নিরতিশয়ানন্দঃ। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন' (তৈ. উ. ২।৯) ইতি বাঙ্‌মনসঃ অগোচরত্বেন শ্রূয়মাণঃ ইতি এবং ভাবগ্রাহ্যানন্দম্ ইতি অর্থঃ। **অনন্যম্**। অন্যৎ দ্বিতীয়ং যস্মাৎ ন সঃ অনন্যঃ। তম্ অদ্বিতীয়ং নিরতিশয়ানন্দং তৎপদার্থম্ ইতি অর্থঃ। ৮।

অনুবাদ : (শঙ্কা :) তাহা হইলে তিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য, ইহাই পাওয়া গেল ? (এই শঙ্কার উত্তরে আচার্য বলিতেছেন—) না, তাহা নহে, কারণ (তিনি) **জ্ঞেয়াতীতং**—তিনি জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়বস্তু অতিক্রম করিয়া বর্তমান। জ্ঞেয়াতীত বস্তু কখনও জ্ঞেয় হয় না, (কারণ) শ্রুতি বলিয়াছেন—'অন্যদেব…অনাদিং চ'—তিনি বিদিত (জ্ঞেয়) বস্তু হইতে ভিন্ন ; প্রমাণের অগোচর এবং অনাদি, ইত্যাদি। (উক্ত শ্রুতিদ্বয়ে 'বিদিতাৎ' ও 'অপ্রমেয়ং' শব্দদ্বয়ের অর্থ—) 'বিদিতাৎ'—বেদন অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হইতে (তিনি ভিন্ন) ; 'অপ্রমেয়ং'—প্রমা অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় যিনি হন না, ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে হেতু বলিতেছেন - **জ্ঞানময়ম্**। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, (কারণ) শ্রুতি হইতে জানা যায়—'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম', ইত্যাদি—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত। তাহা হইলে জ্ঞেয়াতীত বস্তুর অন্তঃকরণে বিশেষরূপে প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয় কিরূপে ?—এই আশঙ্কার উত্তরে (আচার্য) বলিতেছেন—**হৃদি উপলভ্যম্**। হৃদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধিতে যাহা প্রকাশ্য, তাহার অতীত হইলেও সূর্যের যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বরূপে

স্পষ্ট প্রকাশ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের অবিষয় বিষ্ণুরও বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বরূপে স্পষ্ট প্রকাশ স্বভাবতই সম্ভব হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি: 'মনসা ··· বুদ্ধ্যা'—মনের দ্বারাই এই আত্মাকে লাভ করিতে হইবে; এই অতি সূক্ষ্ম আত্মা চিত্তের দ্বারাই জ্ঞাতব্য; অতি সূক্ষ্ম একাগ্র সুসংস্কৃত বুদ্ধির দ্বারাই (আত্মা অপরোক্ষরূপে) দৃষ্ট হন, ইত্যাদি।

(শঙ্কা:) এই সকল শ্রুতিবাক্যে আত্মা বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য, ইহাই প্রতীত হয়, একথা বলা যাইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে—'অপ্রাপ্য···মতম্'—মন সহ (বাক্য যাহাকে) বিষয় করিতে না পারিয়া (প্রত্যাবৃত্ত হয়); বুদ্ধিরও প্রকাশক চৈতন্যকে বুদ্ধির দ্বারা বিষয় করা যায় না; বিজ্ঞাতারও বিজ্ঞাতা অর্থাৎ প্রকাশককে বিজ্ঞাতা জানিতে পারে না; (এই সকল শ্রুতিবাক্যের সহিত) মনের দ্বারাই ইঁহাকে লাভ করিতে হইবে; মন যাহাকে মনন করিতে অর্থাৎ বিষয় করিতে পারে না, যাহার দ্বারা মন বিষয়ীভূত হয় বলিয়া কথিত;—এই সকল শ্রুতির বিরোধ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। (প্রশ্ন:) তাহা হইলে এই উভয়বিধ শ্রুতিবাক্য-সমূহের পরস্পরের অবিরোধী অর্থ কি হইবে? (উত্তর:) শ্রবণ করো। 'মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যম্'—মনের দ্বারাই আত্মাকে লাভ করিতে হইবে, ইত্যাদি (শ্রুতির) দ্বারা আত্মার বৃত্তিব্যাপ্যত্ব বিবক্ষিত। (পক্ষান্তরে) 'অপ্রমেয়ম্'—আত্মা সর্বপ্রমাণের অবিষয়, ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা (আত্মার) ফলব্যাপ্যত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে। (বৃত্তিব্যাপ্যত্ব ও ফলব্যাপ্যত্ব কি, তাহা বলিতেছেন—) অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিতরূপে স্বতই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়াই আত্মার বৃত্তিব্যাপ্যত্ব। (পক্ষান্তরে) ফল অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিস্থ চিদাভাসের দ্বারা (বৃত্তির বিষয়ীভূত বস্তুর) প্রকাশই ফলব্যাপ্যত্ব[1]। এইরূপ স্বীকার করিলে (পূর্বোক্ত) উভয়বিধ শ্রুতির বিরোধ থাকে না। ভারতীতীর্থও এই কথাই বলিয়াছেন: 'স্বপ্রকাশোঽপি···শ্রুত্বা' — স্বপ্রকাশ হইলেও এই সাক্ষী প্রত্যগাত্মা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অন্য পদার্থের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হন। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ প্রত্যগাত্মার ফলব্যাপ্যত্ব নিষেধ করিয়া থাকেন। 'ব্রহ্ম অপ্রমেয়'—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের ফলব্যাপ্তিই নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং 'মনের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়'—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের বুদ্ধিবৃত্তিব্যাপ্যতা কথিত হইয়াছে। অতএব (ইন্দ্রিয়াদির) অবিষয়েরও (অবিষয় বস্তুরও) বোধ (অপরোক্ষানুভূতি) সম্ভব হয়, ইহাই তাৎপর্য। 'যোঽয়ং···

১। অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া বিদ্যমান। এইজন্যই ব্রহ্মে অধ্যস্ত জাগতিক বিষয়ও অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কের ফলে আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) ইন্দ্রিয়-প্রণালিকার মাধ্যমে বিষয় পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া বিষয়াকার ধারণ করে। তাহার ফলে বিষয়ের আবরক অজ্ঞান অপসারিত হয়। ইহার নাম বৃত্তিব্যাপ্যত্ব। জড়বস্তু নিজে প্রকাশশীল নহে বলিয়াই আবরণ বিনষ্ট হওয়ার পর চিদাভাসের দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়। ইহার নাম ফলব্যাপ্যত্ব। আত্মা স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া অজ্ঞানের আবরণ দূর হইলে নিজেই প্রকাশিত হন। অতএব আত্মা ফলব্যাপ্য নহেন। কিন্তু আবরক অজ্ঞানের অপসারণের জন্য আত্মার বৃত্তিব্যাপ্যত্ব স্বীকার করা হয়।

পুরুষঃ'—এই যিনি বিজ্ঞানময় অর্থাৎ বুদ্ধিতে উপহিত, প্রাণসমূহের মধ্যে (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) অবস্থিত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে পৃথক্), হৃদয়ের (অর্থাৎ বুদ্ধির) অভ্যন্তরে বিরাজিত (অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে পৃথক্), (স্বয়ং-) জ্যোতিঃ পুরুষ (অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ)—ইত্যাদি অবান্তর বাক্য (জীবের প্রত্যগাত্মস্বরূপ-বোধক বাক্য) দ্বারা দেহাদি হইতে ভিন্নরূপে উক্ত; 'অত্র অয়ং…ভবতি'—এই স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ হন—ইত্যাদি শ্রুতিসহায়ে স্বয়ংজ্যোতিঃ-রূপে কথিত; 'অসঙ্গো…পুরুষঃ'—এই পুরুষ অসঙ্গ—ইত্যাদি শ্রুতিতে অসঙ্গরূপে উল্লেখিত; 'যদ্ বৈ তৎ ন পশ্যতি'—(সুষুপ্তিতে) তিনি যে দেখেন না (বলিয়া মনে হয়, তখন তিনি বস্তুতঃ দেখিয়াও দেখেন না ![2])—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা অলুপ্তচৈতন্যস্বরূপে প্রতিপদ্যমান, হৃদয়ে (সাক্ষাৎ) উপলব্ধব্য, যাঁহাকে 'ত্বং'-পদের অর্থরূপে (মুমুক্ষুগণ) অবগত হন, এইরূপে (শ্লোকস্থ পদসমূহের) সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। (সম্প্রতি) 'তৎ'-পদের অর্থ বলা হইতেছেঃ **'ভাব-গ্রাহ্যানন্দম্,**—যাহা ভাব অর্থাৎ সদ্‌রূপে গ্রাহ্য এবং আনন্দস্বরূপ (ইহাই 'ভাবগ্রাহ্যানন্দম্' শব্দের অর্থ), তাহাকে; 'যুবা স্যাৎ সাধু-যুবাধ্যাপকঃ'—যদি (কেহ) যুবক, (শুধু যুবক নহে) সাধুযুবক এবং অধ্যাপক[3] হয়—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা সার্বভৌম আনন্দের উপক্রম (অর্থাৎ ঐ আনন্দের বর্ণনার আরম্ভ) করিয়া মনুষ্য, গন্ধর্ব আদি লোকে (ক্রমশঃ) উৎকৃষ্ট-উৎকৃষ্টতর-রূপে শ্রূয়মাণ আনন্দ যেখানে কাষ্ঠা অর্থাৎ চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই নিরতিশয় আনন্দ (অবশ্যই) আছে। 'যতো বাচো…কুতশ্চন'—মন সহ বাক্য (যাঁহাকে) বিষয় করিতে না পারিয়া যাঁহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, (সেই) আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া বিদ্বান্ কোন কিছু হইতেই ভীত হন না—ইত্যাদি শ্রুতিতে বাক্যমনের অগোচররূপে শ্রুত (উল্লেখিত) (যে আনন্দ তাহাই) 'ভাবগ্রাহ্যানন্দ', ইহাই অর্থ। **'অনন্যম্'**—যাঁহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ দ্বিতীয় অন্য কিছুই নাই, তিনিই অনন্য। সেই অদ্বিতীয় নিরতিশয়-আনন্দস্বরূপ 'তৎ'-পদার্থকে—ইহাই অর্থ। (এই 'তৎ'-পদার্থরূপ সংসার-অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশী হরিকে স্তব করি।)। ৮।

২। আত্মা সর্বদাই প্রকাশস্বরূপ বলিয়া সুষুপ্তিতেও প্রকাশমান থাকেন। কিন্তু দর্শনের কারণ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার না থাকায় আত্মাকে ঐ অবস্থায় দর্শনকর্তা বলা যায় না। অন্ধ ব্যক্তিও স্বপ্ন দেখে বলিয়া আত্মদৃষ্টির বিলোপ হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ। সুতরাং সুষুপ্তিকালেও আত্মদৃষ্টি বিলুপ্ত না হওয়ায় আত্মা দর্শন করেন, কিন্তু তখন দৃশ্য দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় এবং ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার না থাকায় তাঁহাকে দর্শনকর্তা বলা যায় না। ইহাই শ্রুতিটির তাৎপর্য।

৩ মূল শ্রুতিতে 'অধ্যায়কঃ' শব্দ আছে। উহার অর্থ—যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পৌষ, ১৩৮৩ সংখ্যার পর]

কংস-কারাগারে বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে ভগবান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গ-প্রভায় অন্ধকার কারাগৃহ উদ্ভাসিত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী জ্যোতির্ময় ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া পিতামাতার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। তাঁহারা দিব্যচক্ষে সেই পরাৎপর সর্বজগদধিষ্ঠান শুদ্ধব্রহ্মকে প্রত্যক্ষানুভব করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার স্তব করিতেছেন। যাঁহার সঙ্কল্পমাত্রে নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি বিলয়, সেই অহেতুক কৃপাময় সর্ববিঘ্নবিনাশক অভয়-দাতাকে সম্মুখে দেখিয়া দেবকী পরমানন্দিত, প্রেমপুলকাশ্রুধারা নয়নে প্রবাহিত হইতেছে। লীলাময় মুহূর্তের মধ্যে সদ্যোজাত বালকরূপে কাঁদিয়া উঠিলেন, আর অমনি দেবকী সব ভুলিয়া গিয়া সন্তানকে বক্ষে করিয়া স্তন মুখে দিলেন। জননী শিশুসন্তানকে স্তন্যপান করাইতেছেন আর ভয়ে প্রাণ সন্ত্রস্ত, পাছে কান্না শুনিয়া প্রহরীরা টের পাইয়া দুষ্ট কংসকে খবর দেয় আর নৃশংস তৎক্ষণাৎ আসিয়া তাঁহার প্রাণপুত্তলীকে ছিনাইয়া লইয়া হত্যা করে! মায়ের প্রাণ আতঙ্কে অস্থির, কিরূপে তাঁহার অসহায় বাছাকে রক্ষা করিবেন!

যোগীন-মা, গোলাপ-মা প্রভৃতি মায়ের অন্তরঙ্গ একান্ত আশ্রিতাগণের অবস্থাও সেই প্রকার। মায়ের নির্বিকল্প সমাধি, দেহাত্মবুদ্ধির বিলোপ, ভাবাতীত ভাবে অবস্থিতি, আবার ইন্দ্রিয়াতীত ভূমি হইতে অবরোহণকালেও স্বীয় পাঞ্চভৌতিক দেহের অনুপলব্ধি, উচ্চ ভাব-ভূমিতে অবস্থান করিলে দিব্য প্রকাশে দেহমনের বিবর্তন, অলৌকিক রূপ ও ভাববিকাশ! জগজ্জননীর শরণাগত সন্তানকে স্নেহামৃত পান করাইয়া প্রাণ সুশীতল করা, মনের সর্বসংশয়-সন্দেহ-ভঞ্জনকারী বেদবাণী শুনাইয়া অভয়প্রদান করা—এসব দেখিয়া শুনিয়া সময় সময় তাঁহারা বিস্মিত স্তম্ভিত অত্যন্ত পুলকিত আনন্দিত হন; আবার অসুখের সংবাদ শুনিয়া, খাওয়া-থাকার অসুবিধা বুঝিয়া, স্বাস্থ্যহানি দেহের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া অতীব উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত দুঃখিতও হইয়া পড়েন, ছট্‌ফট্‌ করেন। তখন তাঁহাদের মায়ের প্রাণ ধড়ফড় করিতে থাকে মা-রূপী মেয়ের দুঃখে। বাৎসল্যরতির এই ধর্ম—বড়কে ছোট দেখায়। উচ্চকোটির ভক্ত রাগানুগমার্গে অগ্রসর হইয়া যে উজ্জ্বল অপার্থিব ভগবদানন্দ-রসাস্বাদন করেন, তাহাতে সুখদুঃখ উভয়ই অতিশয় তীব্র তীক্ষ্ণ হইয়া পরস্পরের পুষ্টিসাধন করে; প্রেম-ভক্তি—'তপ্ত ইক্ষু চর্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন'। অন্তরাত্মা ভগবানের স্ফুরণ, অনুভবই অপ্রাকৃত সুখ-দুঃখ বা দুঃখ-সুখের মুখ্য বিষয়-আশ্রয়, আশ্রয়-বিষয়, সেইজন্য এই দুঃখের অন্তঃস্থলে গভীর আনন্দরসই প্রবাহিত থাকে এবং প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে মধুর-বাৎসল্যাদি ভাবাশ্রয়ে ঐ রসাস্বাদনের ফলবতী স্পৃহাও দেখা যায়। বিরহে অদর্শনে দৈহিক ক্লেশাদি দর্শনে রসের স্ফূর্তি হয় সমধিক। 'বাহিরে বিষজালা হয়, অন্তরে আনন্দময়।'

অসুখে-বিসুখে মায়ের বালিকাভাব অধিকতর প্রকাশিত হইত। সকল মানুষই অসুখের সময় দুঃখে কষ্টে পড়িলে কাতর হইয়া অপরের সাহায্যাভিলাষী হইয়া থাকে, অন্তর দ্রব হয়। মায়ের কিন্তু অন্তরের দ্রবভাব

সর্বাবস্থাতেই প্রকাশ থাকিলেও উহাতে দুর্বলতা বা কাতরতা কখনও দেখা যাইত না, উহা শিশুর স্বাভাবিক অধিকার, স্নেহের আবদারের ন্যায়ই অতীব সহজ সরল ও সুন্দর মনে হইত—কোমল-হৃদয় ছোট মেয়ে যেমন মা-বাপের স্নেহ-মমতা আস্বাদন করে। সেইবার মায়ের অসুখ অনেকটা সারিয়াছে, জ্বর বন্ধ হইয়াছে, তবে এখনও খুব দুর্বল—শয্যাশায়ী। কোয়ালপাড়ার কেদারের মা প্রায়ই আসিয়া দেখিয়া যান, বিশেষভাবে খোঁজখবর লন। কেদারের মা মাতাঠাকুরানীকে সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, প্রাণপণে সেবাযত্ন করেন, কিন্তু অপার ভক্তিশ্রদ্ধার সঙ্গে অন্তরে অতুল বাৎসল্যরসও মিশ্রিত আছে। এতদূর হাঁটিয়া বৃদ্ধা আসেন মাকে দর্শন করিতে আর মেয়ের দেহ কেমন আছে, কোন অসুবিধা কষ্ট হইতেছে কিনা, তাঁহার বিশেষভাবে খোঁজ-খবর লইতে, স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে। কোয়ালপাড়া হইতেই বাজার-হাট জিনিসপত্র আসে, বৃদ্ধা সব খোঁজ রাখেন, দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থা করিয়া দেন। মায়ের ভীষণ অসুখে খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন, এখন অনেকটা ভাল দেখিয়া কিঞ্চিৎ সোয়াস্তি পাইয়াছেন। আসিলেই বিছানার পাশে কাছে কাছে ঘেঁষিয়া বসেন, পায়ে হাতে গায়ে হাত বুলান, স্নেহ আদরের কথা বলেন, কি খাইতে ভাল লাগে, কোন্‌টি খাওয়া ভাল, এইসব অনেক কথা হয়। অদ্য আসিয়া মেয়েকে একটু ভাল দেখিয়া যদিও মন একটু প্রফুল্ল হইয়াছে, তথাপি আহারে তেমন রুচি নাই জানিয়া খুবই চিন্তিত হইলেন। সেবক-সেবিকাকে নানা পরামর্শ দিয়া মায়ের কানে কানে চুপি চুপি বলিয়া গেলেন, তিনি একটি খাবার জিনিস তৈয়ার করিয়া দিবেন, উহা খুব মুখরোচক, খাইলে রুচি জন্মিবে। কেদারের মা পাকা গৃহিণী, কত কি জানেন, সেকালের প্রাচীন অভিজ্ঞা মহিলা।

মায়ের অসুখের সময় হইতে একটি সন্তান রোজ রাত্রে শুইবার আগে এবং ভোরবেলা মায়ের ঘরে গিয়া খোঁজ-খবর লন—মা কেমন আছেন। মায়ের ঘরের নীচে সেবিকারা শয়ন করেন। অদ্য ভোরে গিয়া মাকে কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিতেই মা বলিলেন, 'বাবা, ভাল আছি। একটু ক্ষিদে পাচ্ছে।' কচি খুকীর চাহনি, আবদার করার মতো কথা। সন্তান কি দিবেন ভাবিতেছেন! পূজনীয় শরৎ মহারাজ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, ডাক্তার, সেবক-সেবিকা সকলেই রহিয়াছেন, খাবার জিনিস কত কি আছে, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াই কিছু দেওয়া ভাল মনে হইল। মা ইতিমধ্যে মৃদুহাস্যে পাশেই ঘরের ভিতর মেঝেতে শায়িতা জনৈক সেবিকাকে আস্তে আস্তে একটি কথা বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া একটি ছোট টেকোয় (মুড়ি খাবার বেতের বাসনে) করিয়া অল্পপরিমাণ ছাতুজাতীয় একটি জিনিস সন্তানের হাতে আনিয়া দিলেন। মা সন্তানের দিকে মুখ করিয়া আগ্রহের সহিত বলিলেন, 'খাইয়ে দাও'। সন্তান কিংকর্তব্যবিমূঢ়, টেকো হাতে লইয়া বুঝিলেন না কি পদার্থ, জিনিসটি তাঁহার অচেনা। কি করেন, মায়ের শরীরের এই অবস্থা! কলিকাতা হইতে ডাক্তার, ঔষধ-পথ্যাদি আসিয়াছে, শরৎ মহারাজ স্বয়ং আসিয়াছেন, তাঁহাদের মত না লইয়া একি খাওয়ানো ভাল? জিজ্ঞাসা করিবার সময়ও নাই, উপায়ও নাই; মা বালিকার মতো ক্ষুধায় কাতর, অধীরা খাইবার জন্য আবদার করিয়া মুখ বাড়াইয়া আছেন। না, আর অপেক্ষার সময় নাই! রোগীকেও এই কয়দিন খাওয়াইবারই জন্য যত্ন করা হইতেছে—আজ স্বয়ং খাইতে

ইচ্ছুক। মাকেই মনে মনে স্মরণ ও আশ্রয় করিয়া সন্তান বিছানার উপরেই বসিয়া টুক টুক করিয়া সেই খাবার মায়ের মুখে দিতে লাগিলেন। খাইয়া মায়ের মুখে চোখে বালিকার মতো তৃপ্তি ও আনন্দ ফুটিল, দেখিয়া সন্তানেরও খুব আনন্দ হইল। মধ্যে মধ্যে দুই-একটি হর্ষের কথাবার্তা বলিয়া খাওয়া শেষ হইলে জল পান করিয়া মা পরম তৃপ্তি প্রকাশ করিলেন। সন্তান মুখ মুছাইয়া দিয়া গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া ঢাকা দিয়া বিদায় লইলেন। শুনিলেন সেবিকাদের মুখে ছাতুর মতো দ্রব্যটির নাম 'ময়না কোটা'। কেদারের মা স্বহস্তে তৈয়ার করিয়া আনিয়া লুকাইয়া দিয়া গিয়াছেন, মাকে ভোরে ভোরে দুটি দুটি খাওয়াবার জন্য, উহা খাইলে মুখে রুচি আসিবে, দেহে রক্ত ও বল বাড়িবে। উহা, টাট্‌কা ভাজা খৈয়ের ভিতর যে আধ কোটা মুড়ির মতো খৈ থাকে, সেগুলি বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া উহার সঙ্গে পরিষ্কৃত ভাজা তিল মিশাইয়া খুব মিহি চূর্ণ করিয়া, অল্প ঝাল ও নুন মিশাইয়া তৈরী। খুব মুখরোচক, লঘুপাক, সুস্বাদু খাবার, মা পছন্দ করেন। কাহারও নিকট উহা প্রকাশ না করিয়া কয়েকদিন ভোরে ভোরে সন্তান এই ভাবে মাকে খাওয়াইয়া দিলেন। কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং ভালই হইল, বুঝিয়া সন্তান পরমানন্দিত। আর মা বালিকার মতো হর্ষে তাঁহার হাত হইতে উহা খাইয়া অন্তরে অক্ষয় নতুন স্নেহের ছবি মুদ্রিত করিয়া দিলেন। সে-স্নেহমূর্তি বাৎসল্য-উচ্ছ্বসিত চোখমুখ কি কেহ ভুলিতে পারে?

কোয়ালপাড়া শ্রীজগদম্বা আশ্রমে মা ম্যালেরিয়াতে অসুস্থা, সংবাদ পাইয়া জনৈক সন্তান তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। মা শুইয়া আছেন, জ্বর আসিয়াছে। সন্তান বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা কেমন আছেন?' মা কচি খুকীর ন্যায় কাতরস্বরে জবাব দিলেন, 'বাবা, ভাল নয়, খুব জ্বর, বড় জ্বালা গায়ে, হাত দিয়ে দ্যাখো।' সন্তান নানা কারণে দেবদেহ স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া নামে মাত্র একটু হাত লাগাইলেন। অভিমানে বালিকার ভাবে মা কান্নার সুরে বিষণ্ণ বদনে বলিয়া উঠিলেন, 'ওকি! ভাল ক'রে গ্যাখো।' সন্তান বুঝিতে পারিলেন, মায়ের মনের ভাব তখন ছোট খুকীর মতো; তাই সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া কাছে বসিয়া ভাল করিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিলেন, প্রবোধ ও সান্ত্বনার কথা একটি-দুটি বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, 'কোন ভাবনা নাই', 'অসুখ শীগ্‌গির সেরে যাবে' ইত্যাদি। মা মনে ভরসা পাইলেন, প্রফুল্ল হইলেন, তিনিও আশ্বস্ত বোধ করিলেন।

মায়ের মধ্যে অসুখের সময় ব্যতীত অন্য সময়েও এই বালিকাভাব কখন কখন প্রকট হইতে দেখা যাইত। ভুটিয়া ভক্ত মেয়েদের প্রদত্ত মায়াবতী হইতে প্রেরিত সুন্দর গালিচাসনের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আসন দেখিয়া মায়ের মন প্রফুল্ল হইয়াছে, সেই হিমালয়ের পাহাড়ী মেয়েদের কারুকার্য ও ভক্তিভাবের খুব প্রশংসা করেন এবং সেই আসনে বসিয়া পূজা করেন। একদিন সকালবেলা গিয়া জনৈক সন্তান দেখিতে পাইলেন, মা অতি বিমর্ষভাবে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন—অতীব চিন্তিতা। পাশে একখানা বঁটি ও দুইদিকে দুইখানা আসন পড়িয়া আছে। সন্তানকে দেখিয়াই মা কাতরভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা, গ্যাখো কি ক'রে ফেলেছি!' হাতে করিয়া আসন দুইখানা তুলিয়া ফেলিয়া দেখাইয়া খুব আপশোস করিয়া

বলিলেন, 'সেই পাহাড়ী মেয়েদের দেওয়া সুন্দর আসনখানা খুব বড়, বিছালে ঘর অনেকটা জুড়ে যায়। আর বসার জন্য এতটা দরকার হয় না। দু' ভাঁজ ক'রে দেখলাম ভিতরদিকে ভাঁজ করলে এমন সুন্দর কারুকার্যটা আর দেখতে পাওয়া যায় না, বাইরের দিক শক্ত, বসতেও আরাম লাগে না। বাইরের দিকে ভাঁজ করলে অর্ধেকটা কারুকাজ দেখা যায় বটে, বাকী অর্ধেকটা নীচে মাটিতে লেগে নষ্ট হয়। আবার ভাঁজ করলে অনেকটা উঁচু মোটা হয়ে যায়, দেখতে বসতে ভাল হয় না। ভাবলাম, দু'খানা করলে ছোটও হবে, আবার দু'জনে বসতেও পারবে। তাই ভেবে বঁটি দিয়ে কেটে দু' টুকরা ক'রে দিয়েছি, সোজা সমান কাটা হয়নি; দু'খানারই একদিক চওড়া, একদিক সরু হয়ে গেছে! কি করলাম ভেবে মনে বড় দুঃখ হচ্ছে! সরলা ছিল, তাকে বললেই সুন্দর সমান ক'রে কেটে দিত। কি অন্যায় করেছি—যে দেখবে, সেই হাসবে!' নির্বোধ বালিকার ন্যায় মা একেবারে বোকা বনিয়া গিয়া আপশোস করিতেছেন দেখিয়া সন্তান দুইটুকরাই হাতে লইয়া ভাল করিয়া দেখিলেন এবং সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়া বলিলেন—'দু'খানা হওয়াতে ভালই হ'ল, খুব কাজে লাগবে। একটু অসমান হয়েছে বটে, তবে কেটে ছেঁটে ভাল ক'রে কিনারা মুড়ে দিলেই হয়ে যাবে—কিছুই লোকসান হয়নি, এজন্য কিছুই ভাবনা চিন্তা নেই, এখনই সরলাদিকে ডেকে সব ঠিক করা হবে।' সরলাদি আসিলেন, মা তাঁহাকেও আসনের ‍টুকরা দেখাইয়া বলিলেন, 'দেখ্ মা, কি ক'রে ফেলেছি। এখন একটু ঠিক ক'রে দে, যাতে লোকে না হাসে।' তিনিও প্রবোধ দিয়া মাকে শান্ত করিয়া আসনের টুকরা দুইখানা লইয়া চওড়ার দিকে একটু বাদ দিয়া কাটিয়া শাড়ীর পাড় দিয়া কিনারা মুড়িয়া সেলাই করিয়া দিলেন। সুন্দর দুইখানা আসন হইল। আনিয়া মাকে দিলেন। দেখিয়া মায়ের মন প্রফুল্ল হইল, সহর্ষে সন্তানকেও আদরে ডাকিয়া দেখাইলেন। 'দ্যাখো, সরলা কেমন সুন্দর ক'রে দিয়েছে। এখন বেশ কাজে লাগবে।'

সংসারে সকল মানুষই এরূপ ভুল, ত্রুটি বা নির্বোধের মতো অনেক কাজ করিয়া ফেলে, শেষে আপশোসও করে—ইহা অতি সাধারণ কথা। অবতারলীলায় ঐসকলের সার্থকতা কি? মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার অতীত বিষয়ের সন্ধান দেওয়ার জন্যই তো ভগবানের আবির্ভাব, কাজেই এইসকল সাধারণ লোকব্যবহার অনেকের নিকট অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। আপাতদৃষ্টিতে ঐরূপ নিরর্থক বোধ হইলেও ভক্তহৃদয়ে ঐসকলের চমৎকারিত্ব ও আকর্ষণ খুবই বেশী। ভক্তহৃদয়ে রসস্ফুরণ, মমত্ববোধ উদ্দীপনের জন্য ভগবান মানুষ হইয়া আসেন, এবং ভগবানকে আমাদেরই মতো এবং অতি আপনজনবোধের আতিশয্যেই দূরত্ব পৃথক্ত্ব ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়া চরমে তাঁহার সহিত একত্বানুভূতি পর্যন্ত হইয়া থাকে। দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রাকৃত নরবৎ নরলীলাতেই অবতার-লীলার মাধুর্য বিচ্ছুরিত হয় সমধিক। জ্ঞানস্বরূপের অজ্ঞতা, পূর্ণানন্দের দুঃখ, ভূমার ক্ষুদ্রাভিলাষ, ভয়হারীর ভীতি এসকল দেখিলেই তাঁহার প্রতি মমত্ববোধ বাড়ে, অন্তর বিগলিত হইয়া তাঁহার চরণে মিলিয়া যায়। ঐ অন্তরকে কি আবার কঠিন সংসারে ফিরাইয়া আনা সম্ভব? ফিরাইতে চাহিলেও ফেরে না। "কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে, কাজ কি আমার গৃহবাসে! / সে যার হৃদয়ে বাসে, আবাসে কি সে থাকতে পারে?"

সকল মা-ই তাঁহাদের সন্তানদের চাঞ্চল্য, দুষ্টুমিপনা অনিমেষ নয়নে দেখেন, দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হয়। তাই মা যশোদার ন্যায় ভগবানকেও দুলালরূপে নিজ শিশুরই অনুকরণ করিতে দেখিলে মাতৃগণের প্রাণমন উল্লসিত হইয়া উঠে, অতৃপ্ত নয়নে তাঁহার লীলা-চাঞ্চল্য দেখিতে দেখিতে আরও অধিক পুলকিত ও আনন্দিত হন। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী গীতা-উপদেশক অপেক্ষা মায়েদের বেশী ভাল লাগে 'নন্দের ছাওয়াল'কে যে দইয়ের ভাঁড় ভাঙ্গে, মাখন চুরি করিয়া খায়, ধরিতে গেলে দৌড়াইয়া পলায়। ভক্তের কাছে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী রূপ হইতে কষ্টেসৃষ্টে নন্দের পিঁড়াবহনকারী বালকরূপের সৌন্দর্য মাধুর্য কত অধিক! অনন্ত-পর্যঙ্কশায়ী শ্রীদেবীসংবাহিতপদযুগল নারায়ণ-মূর্তি অপেক্ষা 'ঠমকি চলত রামচন্দ্র বাজত পৈজনিয়া' কৌশল্যানন্দনের রূপ সমধিক চিত্তাকর্ষক। যশোদা বারংবার তাঁহার নন্দনের অলৌকিক ঐশ্বর্য দেখিলে কি হইবে, গোপাল 'মা' বলিয়া যখন ডাকে, তখন কি আর কিছু মনে থাকিত তাঁহার? কৌশল্যা কত শুনিয়াছেন —ভগবান রামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রাক্ষসকুল সংহার করিয়া ধরার ভার হরণ করিবার জন্য, কিন্তু তাহা কি মনে আসে যখন রামকে বুকে করিয়া মুখচুম্বন করেন!

শীতের বিকাল। মা আহারের পর শুইয়া বিশ্রাম করিতেছেন। বাহির বাটিতে ডিস্‌পেনসারিতে অপরাহ্ণে একটি সন্তান কাজ করিতেছিলেন, হঠাৎ খবর আসিল 'মায়ের পেটে ব্যথা—খুব কষ্ট হইতেছে'। ছুটিয়া গিয়া বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চাহিলেন, 'কিরূপ ব্যথা, কখন হয়েছে, কেন হয়েছে, কোথায় কামড়াচ্ছে' ইত্যাদি। হোমিও ঔষধ দিবেন। মা অতি কাতরস্বরে জবাব দিলে তাড়াতাড়ি ঔষধ আনিয়া খাওয়াইয়া দিলেন। কিন্তু মায়ের তাহা'তে মন মানিল না। কাতরস্বরে বলিতেছেন, 'বাবা! বড় ব্যথা, খুব কষ্ট হচ্ছে, পেটে হাত বুলিয়ে দাও।' মা আবদার ধরিলেন। কি উপায়? খাটের উপর লেপের নীচে দেয়ালের বিপরীত দিকে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন। হাত পা গুটাইয়া 'কুচিমুচি' হইয়া আছেন। খাটের নীচে বসিয়া পেটে হাত বুলানো সুবিধা হইবে না। মায়ের বিছানার উপর বসা কি ঠিক! কি করা যায়! মা অস্থির, খুব কষ্ট, ভীষণ ব্যথা। পূর্বে একদিন মায়ের ঘরে তাড়াতাড়ি বসিতে গিয়া হাতের কাছে একখানা আসন দেখিয়া উহা মেলিয়া বসিতে চাহিলে মা অতীব ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'ওখানা রেখে দাও, বাবা। ওতে আমি বসি। ঐ দেখো আসন আছে, ওতে বস।' অন্য আসনে বসাইলেন। গুরুর আসনে বসা মহা অপরাধ, পাছে ছেলের অকল্যাণ হয়। তাই মায়ের ভয়-ব্যস্ততা। কিন্তু আজ উহা ভাবিবার সময় নাই, অন্য কোন উপায়ও দেখা যায় না। কাজেই সন্তান বিছানার উপরেই বসিয়া হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে দুই-একটা সান্ত্বনার কথাও বলিতেছেন। দেখিতে দেখিতে ব্যথা একটু কম হইল—বালিকার মুখও প্রসন্ন হইল এবং স্বস্তির নিশ্বাস বহিল। অতঃপর 'হট-ওয়াটার' ব্যাগ লইয়া আস্তে আস্তে সেঁক দিতে আরম্ভ করিলে বেদনার অনেকটা উপশম দেখা গেল। তৎপর মায়ের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে দেখিয়া তিনি নীরবে চুপি চুপি সরিয়া আসিলেন। মা সুখে ঘুমাইতেছেন দেখিয়া গৃহবাসী সকলেরই মন আশ্বস্ত হইল। গৃহস্থেরা জানে হঠাৎ ছোট শিশুর পেটে ব্যথা ধরিলে কি মুস্কিল উপস্থিত হয় বাড়ীতে, বাড়ীশুদ্ধ

সকলে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, কিভাবে শিশুকে আরাম করা যায় ; সকলের এই এক চেষ্টা হয়। মাও অসুখের সময় এইসব শিশুদেরই মতো হইয়া যাইতেন।

অনেক ছোটখাটো ব্যাপারেও মায়ের এই বালিকার মতো ভাব দেখিয়া অতীব বিস্ময় জন্মিত, বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করিত। একদিন একজন সন্তান এক ঘড়া দুধ লইয়া অতি বিষণ্ন মনে মায়ের বাড়ীতে আসিয়াছেন। মায়ের নিকটে দুধের ঘড়া ভয়ে ভয়ে নামাইয়া প্রণাম করিয়া কাতরস্বরে তিনি নিবেদন করিলেন যে, খাঁটি দুধ পাইবার জন্য বেশী দাম দিয়া তাঁহার বন্ধু একটি নিম্নশ্রেণীর লোকের ঘর হইতে এই দুধ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আসিতে আসিতে নজরে পড়িল দুধে একটি শুক্‌নো সরু মৌরলা মাছ ভাসিতেছে। দেখিয়াই তো মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, দুধ ফেলিয়া দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে লইয়া আসিয়াছেন, মা যেরূপ আদেশ করেন, ফেলিবার হয় তো ফেলা হইবে, রাখিবার হয় তো রাখা হইবে। তাঁহার বন্ধুটির মনে খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল খাঁটি দুধে ঠাকুরের পায়েস ভোগ হইবে। মা একটু মুখে দিবেন। হায়! সব সাধে বাদ পড়িল! শুনিয়া মা-ও ব্যথিতা হইলেন, বিষণ্ন-বদনে বলিলেন, 'বাবা! ফেলে দিতে হবে না, ছেলেপিলে আছে তারা তো খেতে পারবে।' ঠাকুরের ভোগে দুধ লাগিবে না, ছেলেরা কতদূর হইতে কত কষ্ট করিয়া আনিয়াছে !— মা বাড়ীর সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, দুধে পায়েস করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া চলিবে কি-না। অবুঝ বালিকার মতো মা একে, ওকে, রাধুনীকে, মায় ঝিকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন ; বিষণ্ন-বদনে প্রশ্ন করিতেছেন, 'হ্যাগা, এ দুধ কি ঠাকুরকে দেওয়া চলবে না?' কেহ কেহ গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'তা কি হয়! মাছ পাওয়া গেছে দুধের ভেতর, ও দুধ তো ভোগের অযোগ্য হয়ে গেছে!' মা খুবই দুঃখিত হইয়া মলিন বদনে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে তাঁহার মুরুব্বী, যেন বাড়ীর গিন্নী ঠাকরুন নলিনীদিদি বাহির হইতে আসিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই মা তাহাকেও দুধের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। নলিনীদিদি সব কথা শুনিয়াই গলা হাঁকাইয়া, হাত ঝাড়াইয়া তাঁহার মুরুব্বিয়ানা ভালভাবে ফলাইয়া রায় দিলেন, 'কি হয়েছে, পিসীমা, দুধের? কি ক'রে চাষীবাসীর ঘরে একটা ছোট্ট শুক্‌নো মাছ পড়ে গিয়েছিল, তাকে তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দুধের কি হয়েছে তাতে? ঠাকুরকে কেন দেওয়া চলবে না? খুব চলবে। কলকাতার গয়লারা দুধে কত কি মেশায়, কে তার খোঁজ রাখে? সেই দুধেই তো সব মিষ্টি হয়, পায়েস হয়, ঠাকুর-দেবতাকে ভোগ দেয় সবাই!' 'নলিনী ঠিক বলেছে, কলকাতার দুধের কি কিছু বিচার আছে! কত কি মেশায় তাতে! তা যখন ঠাকুরকে দেওয়া যায় তখন এদুধও ঠিক চলবে। এ তো আরও ভাল দুধ।'— নলিনী-দিদির যুক্তিপূর্ণ কথায় মা এই বলিয়া সায় দিয়া খুব খুশী ও নিশ্চিন্ত হইয়া ঠাকুরের পায়েস-ভোগের ব্যবস্থা করিলেন। ছেলেদের এত কষ্ট করিয়া এতদূর হইতে বহিয়া আনা দুধ পায়েস করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিয়া সকলকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া মায়ের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না! সত্যসত্যই তিনি বালিকার মতো উল্লসিত আজ, বলিয়া কহিয়া বার বার পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেছেন।

[ক্রমশঃ]

বাঁশির সুরে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সাধুর কাছে সুধার বাণী, কবির কাছে প্রেমের প্রেরণা
চাইলে আঁধার রাত পোহাবেই, হবেই হবে সফল সাধনা।
মন বলে: "সে কোথাও তো নেই।" প্রাণ বলে: "না, আছে রে সে আছে,
দূর আকাশে নয়, হৃদয়ের বৃন্দাবনেই শোন্ বাঁশি তার বাজে।"
মন বলে: "চায় শুনতে সে কে?" প্রাণ বলে: "চায় সে-ই যে বাসে ভালো।"
মন গায়: "কে ভালোবাসে?" প্রাণ গায়: "যে জ্বালে প্রেমের আলো,
যে-আলোতে শুভদৃষ্টি হয় সাথে তার, দর্শন তার নাম,
যার উল্লাসে পঙ্কে ফোটে তার মিলনের পঙ্কজ অভিরাম।
নয় সে-ফুলফোটানো সহজ। প্রতি রক্তবিন্দু যখন দোলে
তার মুরলীর সুরে তালে, তখনই সে ফুলের আঁখি খোলে।
চাইতে হবে সেই দোলনের ছন্দ সাধা, মন্ত্র জপি' তার—
যার দীক্ষায় বিষাদ গ'লে হয় পরমানন্দ বন্দনার!
নয় নয় এ তো কল্পনা ভাই, কান পেতে যে শুনেছি তার বাঁশি
দিনে রাতে, নেশায় যার আজ অন্তর আমার উচ্ছল, উদাসী।"

প্রার্থনা

স্বামী জীবানন্দ

হৃদয় আমার ভরুক সদা তোমার দিব্য মধুর সুরে,
দিব্য তোমার আলোর ছটা আলোক আনুক হৃদয়পুরে।
সকল কর্মে চালাও আমায় তোমার আপন যন্ত্র ক'রে,
তোমার পূজায় তোমার সেবায় জীবন কাটুক তোমার তরে।
তোমার পূর্ণ শান্তি আমার সকল অভাব ফেলুক দূরে,
তোমার বিশ্বপ্রেমের পরশ করুক প্রেমিক বিশ্ব জুড়ে।
অসীম ঠাকুর সসীম হয়ে বিরাজো আমার হৃদয়পুরে,
মনটি আমার কৃপায় তোমার ধরেছে চরণ জগৎ ঘুরে।

সাগরসঙ্গমে

শ্রীশান্তশীল দাশ

সব নদী মেশে ওই সাগরের বুকে :
নানা পথ ধ'রে চলে বন্ধুর মসৃণ,
কোথাও বা জনপদ কত কোলাহল,
কোথাও নির্জন বড়, জনপ্রাণীহীন—
চলে তারা পূর্ণ বেগে, বাধায় মন্থর
সে-গতি কখনো হয় ; তবু নিরলস
চলে এক লক্ষ্য ধ'রে—সাগরসঙ্গমে—
সাগরের বুকে ঠাঁই, পরম আশ্রয়।
আমরাও চলেছি তো সেই পরমের
পায়ে লীন হয়ে যেতে, নানাপথ ধ'রে ;
সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ বিরহ-মিলন—
সব খেলা সাঙ্গ ক'রে, আগে কিংবা পরে
সেই সে 'একে'র কাছে—যেখানে আশ্রয়
একান্তে পরমা শান্তি, পূর্ণ নির্ভাবনা।

লীলা

মৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী

নিখিল বিশ্বের মাঝে তুমি বিশ্বনাথ
তোমারি সৃজিত বিশ্ব তোমারি অধীন ;
সমভাবে সর্বজীবে তুমি বর্তমান
ব্রহ্মাণ্ড চালিত প্রভো তোমারি ইচ্ছায়।
অদৃশ্য ভাবেতে তুমি কর্তা কর্ম ক্রিয়া
বিদ্যা ও অবিদ্যা তুমি, আলো ও আঁধার ;
তোমারি অনন্ত শক্তি হইয়া খণ্ডিত
লক্ষভাবে লক্ষদিকে অলক্ষ্যে ধাবিত।
তব মহিমায় পুষ্ট জীব ও জগৎ
তোমারি ইচ্ছার বশে জীবন মরণ ;
তোমারি মায়ায় জীব খেলে কত খেলা
ওই মায়াস্রোতে ভাসে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ।
লীলারঙ্গে কর লীলা তুমি লীলাময়
লীলান্তে লীলার সৃষ্টি তোমাতেই লয়।†

† কবিতাটি যখন প্রকাশের অপেক্ষায়, তখন কবির ইহলীলা সাঙ্গ হয়। পৃঃ ২১৬ দ্রষ্টব্য।—সঃ

বকলম

সে দাঁড়িয়েছিল বছরের সিংদরজায়,
তাকে বললাম : 'আমায় একটা আলো দাও,
যাতে অন্ধকারে নির্বিঘ্নে চলা যায়।'
সে বললে : 'অজানার মধ্যেই পা বাড়াও
হাত বাড়িয়ে ঈশ্বরের হাতখানি ধরো ;
আলোর দীপের চেয়ে তা হবে অনেক শ্রেয়,
চেনা-জানা কোন পথের চেয়ে অধিকতর
নিরাপদ সেই অচেনা পথেই যেও।'*

* একটি ইংরেজী নববর্ষের প্রার্থনার তরজমা।

কামারপুকুর দিব্যধাম

শ্রীশেফালিকা দেবী

(১)

নিশি অবসান হিমেল কুহেলী
এখনো ঘিরিয়া পূর্বাকাশ,
তৃণশিরে শোভে শিশির-কণিকা
বাতাসে ফুলের মিষ্ট বাস।
ধীর পায়ে এসো এ বিজন পথে
যদিও অধীর ও অন্তর,
হের তরুশিরে আলোক-আভাস
উষারাগে রাঙা দিগন্তর।
নীল নভপটে অরুণ-কিরণে
ভাতিছে স্নিগ্ধ দেউলচূড়,
কোলাহলহীন প্রভাত আকাশে
ওঠে বিহগের মধুর সুর।
দাঁড়াও আসিয়া অঙ্গন-তলে
নতশিরে নমি পুণ্যভূমি,
জুড়াবে পরাণ শীতল সমীর
যবে যাবে তব ললাট চুমি।
শ্বেত মর্মরে গড়া বিগ্রহ
দৃষ্টি সে কোন্ জগৎ পানে,
কি মাধুরী ঝরে নয়নে অধরে
জানে শুধু তাহা হৃদয় জানে।
ফুলের সুবাস চন্দন-বাস
বায়ুভরে পূজাকক্ষে ফিরে,
কুণ্ডলীকৃত ধূপের সুরভি
ওঠে দুটি পাদপদ্ম ঘিরে।
অরুণ উষার রক্তিম রাগ
রাঙায়ে দিয়াছে দিব্যকায়,
কোমল বসন সাদরে দোলায়
ধীরে প্রেমভরে স্নিগ্ধ বায়।
এ মোহন ছবি প্রেমতুলিকায়
হৃদিপটে মন লহ আঁকি,
দুখ জ্বালা তাপ পলকে মিলাবে
যখনি হেরিবে মেলি আঁখি।
জানাও প্রণতি লুটায়ে ভূতলে
হৃদয় আজিকে পূর্ণকাম,
শত স্বরগের সুধাধারা ঝরে
কামারপুকুর দিব্যধাম।

(২)

এসো বাহিরিয়া সমুখেতে হের
স্নিগ্ধ শ্যামল যে প্রান্তর,
তারি একপাশে ক্ষুদ্র দেউলে
রাজিছেন শিব যোগীশ্বর।
বিহগ-কাকলি গাহে স্তবগাথা
ব্যজন করিছে প্রভাতী বায়,
বস হেথা আসি শান্ত হৃদয়ে
করগো প্রণতি লুটায়ে কায়।
চন্দ্রা মাতার সেই দরশন
নিমীলিত আঁখি কর স্মরণ,
কি জ্যোতিপ্রবাহ আসিল ছুটিয়া
পলকে চেতনা করে হরণ।
পাশে ছিল ধনী বক্ষে তাহার
অচেতন দেহ লুটায়ে পড়ে,
বুঝিল না কেহ জানিল না কেহ
কি সে অনুভূতি পরাণ ভরে।
মনে মনে শুধু জানিলেন মাতা
দেবশিশু এল জঠর মাঝে,
যুগে যুগে যেবা আসে বারেবার
সে আসে এবার নূতন সাজে।

কভু যে উদিল কারাগার মাঝে
কভু বা আসিল রাজার ঘরে,
ব্যথিত পীড়িত আর্তের তরে
সে এবে আসিছে দুখিনী-ক্রোড়ে।
সেই জ্যোতিরাশি আজিও বিরাজে
কৃপা হলে তার পরশ পাবে,
আঁধার হৃদয় হবে আলোকিত
মোহতমোরাশি নিমেষে যাবে।
অমর, কেদার, পশুপতিনাথ
কোথা সোমনাথ, রামেশ্বর,
হৃদয় তোমার সুধারসে ভরি'
দিবে এই শিব যোগীশ্বর।
তরুমর্মরে শোন পাতি কান
বায়ু ফিরে গাহি' কাহার নাম,
স্বরগের জ্যোতি ঝরে হেথা নিতি
কামারপুকুর দিব্যধাম।

(৩)

ওই হের দূরে হালদার দীঘি
চল এইবার তাহার তীরে,
সোপান বাহিয়া এস নামি ধীরে
ঝলিছে আলোক স্বচ্ছনীরে।
গঙ্গা যমুনা গোদাবরী বেণী
সকল তীর্থ মিলেছে হেথা,
ললাটে পরশি শুচি হও মন
বৃথা ঘুরোনাক হেথা ও সেথা।
বীচি-কম্পিত সরসী-বক্ষ
কমল-পত্র শোভিছে তায়,
জলজ কুসুমে মধুকরদল
গুন্ গুন্ রবে ঘুরিয়া যায়।
ডাহুক ফিরিছে জলের কিনারে
মাছরাঙা তীরে বিটপিশাখে
স্তব্ধ আকাশ স্পন্দিত হয়
শঙ্খচিলের তীব্র ডাকে।
পিতা ক্ষুদিরাম প্রতিদিন প্রাতে
আসিতেন হেথা স্নানের তরে,
(তাঁর) রক্তিম বুক আরও হত রাঙা
অরুণ উষার কোমল করে।
এ ঘাটে আসিত বালিকা সারদা
কলস কোমল কক্ষে রাখি,
রাঙা পায়ে বাজে নূপুর মধুর
আগে পিছে চলে অষ্ট সখী।
বালক গদাই লয়ে সাথীদল
ঝাঁপাই ঝুড়িত ইহার নীরে,
তরঙ্গদল পুলকে উলসি
নাচিত কোমল অঙ্গ ঘিরে।

এ সকল লীলা আজো চলে হেথা
হের তাহা মেলি ভাবের আঁখি,
চাওয়া ও পাওয়ার ঘুচিবে দ্বন্দ্ব
জীবনে কিছুই রবে না বাকী।
যত কামনার অবসান হেথা
যতেক বাসনা লভে বিরাম,
ঝরে অবিরল শান্তি কান্তি
কামারপুকুর দিব্যধাম।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(প্রথম পর্যায়)

শঙ্করের 'কেবলাদ্বৈতবাদ'

'বেদান্ত'! আপাতদৃষ্টিতে, একটি অতি ক্ষুদ্র সামান্য সাধারণ চাকচিক্যবিহীন শব্দ—কিন্তু প্রকৃতকল্পে, অতি বৃহৎ অসামান্য অসাধারণ জ্যোতির্ময়-স্বরূপবিশিষ্ট, যার মধ্যেই নিহিত হয়ে রয়েছে যুগযুগান্তব্যাপী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন, সাধনা ও আরাধনার মূল-মন্ত্রটি। 'বেদান্ত' শব্দটির প্রথম ও প্রধান অর্থ হ'ল এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থটিই—অর্থাৎ 'বেদের অন্ত' অথবা উপনিষদ। বেদের তিনটি অংশ হ'ল—মন্ত্র ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ। দেবদেবীর স্তুতিমূলক 'মন্ত্র' এবং যাগযজ্ঞাদিমূলক 'ব্রাহ্মণ'সমূহকে বেদের প্রথম অংশ, অথবা 'কর্মকাণ্ড'রূপে, এবং দর্শন-মূলক 'উপনিষদ'সমূহকে বেদের শেষ অংশ, অথবা 'জ্ঞানকাণ্ড'রূপে অভিহিত করা হয়। 'ব্রাহ্মণ'সমূহের শেষাংশ 'আরণ্যক' নামে খ্যাত, এবং কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে সংযোগসূত্র-রূপে পরিগণিত। এই 'জ্ঞানকাণ্ড' বা উপনিষদ-সমূহই 'বেদান্ত', পারিভাষিক দিক্ থেকে। কিন্তু কালক্রমে, এই অর্থ পরিত্যক্ত হয়, এবং 'বেদান্ত' বললে বর্তমানে 'বেদের অন্ত' বেদান্ত বা উপনিষদ আর বোঝায় না।—বরং বোঝায় উপনিষদাশ্রয়ী মতবাদ। বৈদিক যুগের পরে 'সূত্রযুগের' উদ্ভব হয়। অর্থাৎ, গ্রন্থবিহীন এবং কেবলমাত্র মৌখিক শিক্ষায় অভ্যস্ত বিদ্যার্থীদের সুবিধার্থে, বেদোপনিষদের প্রধান ও প্রকৃষ্ট সত্য বা তত্ত্ব-সমূহকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য, অথবা 'সূত্রের' আকারে গ্রথিত করা হয়। এরূপে, ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত প্রখ্যাত 'ষড়দর্শন': সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, মীমাংসা-বেদান্ত এরূপ সূত্রের ভিত্তিতেই গঠিত। একইভাবে, মহর্ষি বাদরায়ণও বেদের 'জ্ঞানকাণ্ড', অথবা উপনিষদের মূল তত্ত্বসমূহ মতভেদে ন্যূনাধিক পাঁচশ-পঞ্চাশ সূত্রে গ্রথিত করেন। (শঙ্করমতে—৫৫৫, রামানুজমতে—৫৪৫, নিম্বার্কমতে—৫৪৯ ইত্যাদি)। এই সুবিখ্যাত সূত্রাবলীর ব্যাখ্যারূপ বিভিন্ন 'ভাষ্য', সেই ভাষ্যসমূহের ব্যাখ্যা 'টীকা', সেই 'টীকা'-সমূহেরও ব্যাখ্যা—এই ধারায় 'বেদান্ত-দর্শন' প্রধানতঃ গঠিত হয়ে উঠেছে; অবশ্য সেই সঙ্গে রয়েছে বহু মূল্যবান স্বতন্ত্র গ্রন্থও সমভাবে। বর্তমানে 'বেদান্ত' বলতে আমরা এইভাবে রূপায়িত মতবাদই বুঝি।

সর্ববাদিসম্মতক্রমে, বেদান্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন দার্শনিক মতবাদসমূহের মধ্যে সময়ের দিক্ থেকে যেমন সর্বশেষ, তেমনি তত্ত্বের দিক থেকেও সর্বশ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ, সাধারণতঃ, 'ভারতীয় দর্শন' বলতে দেশী বিদেশী অনেকেই কেবল 'বেদান্ত-দর্শন'কেই বোঝেন। সত্যই বেদান্ত-দর্শন সমগ্র জগতের দর্শন-শাস্ত্রে একটি অতুলনীয় গৌরবোজ্জ্বল কেন্দ্রীভূত স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে; এবং পুণ্যভূমি ভারতের শাশ্বত আত্মা এই মহিমমণ্ডিত দর্শনে যেরূপ পরিপূর্ণ সুস্পষ্ট ও রমণীয় ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেরূপ অন্যত্র কোথাও নয়। সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বেদান্ত-দর্শনের অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা ও সৃষ্টি-শক্তির তুলনা ভারতে নেই। অনু-প্রেরণার দিক থেকে, বেদান্ত-দর্শন যেভাবে আমাদের সকলেরই সমগ্র জীবনের সঙ্গে ওত-প্রোতরূপে বিজড়িত হয়ে গিয়েছে, তা' সত্যই

অত্যাশ্চর্য। কারণ, কেবল জ্ঞানী গুণী সাধক তাপস মুনিঋষিদের ক্ষেত্রেই নয়—অতি সাধারণ অজ্ঞ অশিক্ষিত জনদের ক্ষেত্রেও সমভাবে, এই অনুপম বেদান্ত-দর্শন তার মঙ্গলময় মহিমময় মধুময় প্রভাব বিস্তার করেছে সহস্র সরস সতেজ ধারায়। পৃথিবীতেও এরূপ দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় নেই নিশ্চয়ই।

'বেদান্ত-দর্শনে'র তুল্য অভিনব সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ আমরা দেখেছি তার বহু 'সম্প্রদায়ে'র মধ্যে। বস্তুতঃ, বেদান্ত-দর্শনই একমাত্র দর্শন যার দশটি বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে—প্রত্যেকটিই স্ব স্ব আলোকে সমুজ্জ্বল, স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে সুসমৃদ্ধ, স্ব স্ব দানে সুধন্য। সেই একই 'ব্রহ্মসূত্রসমূহ'কে দশটি বিভিন্ন দিক্ থেকে ব্যাখ্যা ক'রে দশটি স্বতন্ত্র মতবাদ ও সম্প্রদায় সুস্থাপিত করা অল্প কৃতিত্ব ও সৃজনীশক্তির কথা নয়; এবং সর্বজনপ্রিয় সর্বজনবন্দিত সর্বজনকাম্য বেদান্ত-দর্শনের এই অন্তর্নিহিত শাশ্বত প্রাণশক্তি আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষকে, এবং ভারতবর্ষের বাইরের বহু দেশকেও আজও প্রচুরভাবে সঞ্জীবিত করে রেখেছে।

বেদান্ত-দর্শনের এই 'দশ-সম্প্রদায়' হ'ল নিম্নলিখিতরূপ: (১) শঙ্করের 'কেবলাদ্বৈতবাদ'; (২) রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'; (৩) নিম্বার্কের 'স্বাভাবিকদ্বৈতাদ্বৈতবাদ'; (৪) মধ্বের 'দ্বৈতবাদ'; (৫) বল্লভের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'; (৬) ভাস্করের 'ঔপাধিকভেদাভেদবাদ; (৭) শ্রীকণ্ঠের 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ'; (৮) বিষ্ণুস্বামীর 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'; (৯) শ্রীপতির 'বিশেষাদ্বৈতবাদ' এবং (১০) বলদেব বিদ্যাভূষণের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'।

অবশ্য, এই দশজন জগদ্বরেণ্য, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও ভক্তপ্রবর নিজেদের কোনো দিনও, কোনো স্থানেই 'সম্প্রদায়-প্রবর্তক'রূপে দাবি করেননি, যা সাধারণতঃ অন্যান্য ক্ষেত্রে করা হয়—বরং ঠিক তার বিপরীত। বস্তুতঃ, ভারতীয় মতে 'সত্য' যখন শাশ্বত—অর্থাৎ অনাদি-অনন্ত, তখন 'সত্যের' প্রারম্ভও নেই, পরিশেষও নেই; এবং সেজন্য, এ কথা বলা ভুল হবে যে, ব্যক্তিবিশেষ সর্বপ্রথম সেই সত্যকে আবিষ্কার প্রকাশিত প্রচারিত প্রবর্তিত করেন; এবং তারপরে তা' আর অন্য কারো নিকট সেরূপ প্রকাশিত হতেই পারে না, এবং সেজন্য পরিসমাপ্ত হয়ে যায়। উপরন্তু, অনাদি অনন্ত কাল ধ'রে প্রবাহিত 'সত্য'কে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানী গুণী জন স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ প্রতিভাবলে, কালক্রমে বিশেষভাবে প্রকাশ করেন—এইমাত্র। সেজন্য ধর্মভূমি ভারতবর্ষের শান্ত-স্নিগ্ধ-সমাহিত তপোবনের প্রতি ধূলিকণা এরূপ পুণ্যশ্লোক সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের পূতপদধূলিস্পর্শে ধন্যাতিধন্য হয়েছিল মানবসভ্যতার প্রথম অরুণোদয়ের শুভ মুহূর্ত থেকেই—যাঁরা গভীরতম শ্রদ্ধা-ভক্তি-কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অতি নম্র-নত ভাবে তাঁদের নিকট উদ্‌ভাসিত সেই পরমসত্যকে অতি মধুর মোহন ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হিতার্থে মন্ত্রাবলীর মাধ্যমে দিগ্‌বিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করেছিলেন সানন্দে সাদরে সাগ্রহে সানুগ্রহে। কি মহাসৌভাগ্য আমাদের!

শঙ্করের 'কেবলাদ্বৈতবাদ।'

সামান্য ২।৩ পাতার মধ্যে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্করের অপরূপ অভিনব অত্যাশ্চর্য মতবাদের পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা নুনের পুতুলের সমুদ্র পরিমাপের প্রচেষ্টার ন্যায়ই হাস্যকর ও সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু তা' সত্ত্বেও, অন্যদিক থেকে এ কথাও কি সত্য নয় যে, যাঁরা তাঁর দর্শন সম্বন্ধে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থরাজি রচনা করেছেন, তাঁরাও 'যে তিমিরে, সেই তিমিরেই?' কারণ, শঙ্কর নিশ্চয়ই জগতের একটি অতি বিভ্রান্তিকর

হেঁয়ালি, প্রহেলিকা বা রহস্য—তাঁকে সত্যই বুঝতে পেরেছেন কে? সুস্থ মস্তিষ্কে, দৃঢ়পদে, উন্নত শিরে এই পৃথিবীর ভূমিতেই দণ্ডায়মান হয়ে সেই পৃথিবীকেই তার অসংখ্য জীব-জড়বস্তু সহকারে, এক নিমেষেই 'মায়া-মিথ্যা' ব'লে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া—সে কি কম স্পর্দ্ধা ও সাহসের কথা? কিন্তু জগতের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্ববন্দ্য দার্শনিক ও নৈয়ায়িক শঙ্কর এই অত্যদ্ভুত কার্যটিই করেছেন,—ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে নয়, স্বপ্নবিলাসের মায়ামোহে নয়, কল্পনা-সঞ্চারের রামধনুতে নয়—কিন্তু স্থির-ধীর, দৃঢ়-দৃপ্ত দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের প্রস্তরসম কঠিন কুঠার, ক্ষুরসম শাণিত ছুরিকা, এবং সূচীসম সুতীক্ষ্ণ শরের দ্বারা আমাদের মায়ামোহজাল নিমেষে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিয়ে—যে জালে আবদ্ধ সাংসারিক জীব আমরা এতদিন সংসার-সমুদ্রে জালবদ্ধ মৎস্যের ন্যায় 'ছট্‌ফট্‌' ক'রে বেড়াচ্ছিলাম, মুক্তিলাভের কোনোরূপ উপায় না পেয়ে; এবং এখন সেই জালমুক্ত হয়ে আমরা কি দেখলাম? দেখলাম সাশ্চর্যে সানন্দে যে, আমাদের এতদিনের ধারণা তো সম্পূর্ণ ই ভ্রান্ত। এতদিন আমরা স্থির জানতাম যে, আমরা দীনহীন ক্ষুদ্রক্ষীণ সংসারপঙ্কলীন পাপী তাপী জন; এবং আমাদের পরমাদরের জগৎও জড়-ময় অপূর্ণ-অশুদ্ধ ক্লেশ-ক্লেদক্লিষ্ট। কিন্তু আজ হঠাৎ অঙ্গের জাল, চক্ষের আবরণ ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে রোমাঞ্চিত চিত্তে দেখলাম—অন্তরে বাহিরে কেবল তিনিই বিরাজিত—জীবও নেই, জগৎও নেই, আছেন কেবল সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম একাকী তাঁর অনির্বাণ, অবিনশ্বর সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্যে। কি অসম্ভব, অবিশ্বাস্য অগ্রাহ্য তত্ত্ব এটি, নয় কি? কিন্তু সত্যই কি তাই? আমাদের সেই অবিদ্যার আবরণ, সেই মোহের জাল বিদূরিত হ'লে—'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে'—সেই অপূর্ব অবস্থাই কি হয় না আমাদের? নিশ্চয়ই। তখনই প্রাণ-মনজীবন ভ'রে আমরা উপনিষদের সেই পরমা বাণীর পূর্ণ সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি, যে—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৩।১৪।১), 'ব্রহ্মেদং সর্বম্' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৫।১), 'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।৮।৭), 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৫।১৯), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ১।৪।১০) 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম', 'ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড', 'তিনিই তুমি', 'এই আত্মাই ব্রহ্ম', 'আমিই ব্রহ্ম।'

এইবারে পেলাম শঙ্কর-দর্শনের মূল কথাটি—একত্ব—নির্ভেজাল—নিঃসর্ত আপোসবিহীন 'একত্ব'। এই 'একত্বের' মধ্যে দ্বিত্ব বা বহুত্বের বিন্দুমাত্রও স্থান নেই; এই 'একত্বের' সঙ্গে দ্বিত্ব বা বহুত্বের বিন্দুমাত্রও 'রফা' হতে পারে না; এই 'একত্ব' কেবল একত্বই, বিন্দুমাত্রও আর অন্য কিছুই নয়। পরবর্তী রামানুজাদি শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিকগণও 'একত্বের' সঙ্গে দ্বিত্ব-বহুত্বের 'রফা' করতে গিয়ে বহু বিপদে পড়েছেন। কিন্তু শঙ্কর চলেছেন কেবলমাত্র সেই 'একত্বে'রই, 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' (কঠোপনিষদ ১।৩।১৪)—শাণিতক্ষুরের ধারার ন্যায় অতি দুর্গম সেই পথ ধ'রে, যতদূর পারেন চলেছেন একমাত্র সেই 'একত্ব'কেই সম্বল ক'রে—অবশ্য পরিশেষে তাঁকেও, তাঁর মত যোদ্ধাকেও 'মায়া'র আশ্রয় নিতে হয়েছিল নিরুপায় হয়েই। তা হ'লেও, রামানুজাদি যেমন প্রথম থেকেই 'একত্বে'র সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছেন দ্বিত্ব-বহুত্বকে, শঙ্কর তা' একেবারেই করেননি। উপরন্তু, নিজের তেজে, নিজের জেদে, নিজের দর্পে, নিজের বিশ্বাসে, সর্বোপরি নিজের আনন্দে, তিনি

কেবলমাত্র সেই 'একত্ব'কেই আশ্রয় ক'রে দিগ্বিজয়ী হয়েছেন।

কি সেই একতত্ত্ব? 'ব্রহ্ম'—বরেণ্য ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্মের একমাত্র লক্ষণ হ'ল, তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।২।১)—'এক ও অদ্বিতীয়'। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় তত্ত্ব বা সত্য আর কিছুই নেই। সেজন্যই তিনি 'নির্বিশেষ'—সম্পূর্ণরূপেই ভেদবর্জিত ভেদ তিন প্রকারের—সজাতীয় (একই শ্রেণীর বস্তুসমূহের মধ্যে পরস্পর ভেদ—যথা, এক বৃক্ষ থেকে অপর বৃক্ষের ভেদ), বিজাতীয় (বিভিন্ন শ্রেণীর বস্তুসমূহের মধ্যে পরস্পর ভেদ, যথা এক বৃক্ষ থেকে এক প্রস্তরের ভেদ), এবং স্বগত (একই সমগ্র বস্তুর মধ্যে অংশ-অংশী ভেদ, যথা, একই বৃক্ষের পত্র-পুষ্পাদি ভেদ)। বলাই বাহুল্য যে, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের ক্ষেত্রে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ কিছুই থাকতে পারে না—যেহেতু তাঁর বাইরে সমজাতীয় (ব্রহ্ম, দেবতাদি) বা ভিন্নজাতীয় (দৈত্যদানবাদি) কোনো কিছুই থাকতে পারে না। কিন্তু তাঁর অন্তর্নিহিত গুণ-শক্তিরূপ স্বগত ভেদও নেই, অংশও নেই—তাঁর আছে কেবলই সত্তা, কেবলই স্বরূপ—আর অন্য কিছুই নয়, একেবারেই নয়। এই থেকে পেলাম তাঁর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম লক্ষণ—নিগু'ণত্ব নিষ্ক্রিয়ত্ব নির্বিকারত্ব। তাঁর স্বগত ভেদ নেই ব'লে, গুণ-শক্তিও নেই, যা একটু আগেই বলা হ'ল—সেজন্য তিনি নিগু'ণ। তাঁর মধ্যে কর্তা কর্ম লক্ষ্যাদির ভেদও নেই, সেজন্যই তিনি নিষ্ক্রিয়—পরমেশ্বরের যে দুটি প্রধান কার্য অন্যান্য মতানুসারে—অর্থাৎ সৃষ্টি ও মুক্তি—তা' তাঁর ক্ষেত্রে নেই, একেবারেই নেই। এরূপে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ তিনি এক নির্বিশেষ নিগু'ণ নিষ্ক্রিয় নির্বিকার নিত্য নিরঞ্জন।

তা হ'লে জীব-জগৎ? তারাও ব্রহ্ম—উপরেই তো বলা হ'ল—তারাও ব্রহ্ম, ব্রহ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্ন সম্পূর্ণরূপেই; এবং সেজন্যই এই মতবাদের সুন্দর নাম 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বা 'অদ্বৈতবাদ'।

কিন্তু তা হ'লে জীব-জগৎ এল কি করে? তাদের তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—তারা তো রয়েছে আমাদের সামনেই আদ্যন্ত কাল। তা হ'লে? তা হ'লে আন 'মায়া', আন 'অজ্ঞান বা অবিদ্যা'—তা হ'লেই হবে সব সমস্যার সমাধান। একটি অতি সাধারণ উদাহরণ নেওয়া যাক—রজ্জু-সর্প-ভ্রম। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হ'লে কি হয়? রজ্জুর সম্বন্ধে অজ্ঞান রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপটি আমাদের নিকট আবৃত ক'রে তৎস্থলে একটি মিথ্যা সর্পের যেন সৃষ্টি করে—অজ্ঞানের প্রথম শক্তির নাম 'আবরণশক্তি' ও দ্বিতীয় শক্তির নাম 'বিক্ষেপশক্তি'। একই-ভাবে অনাদি অজ্ঞানও ঐ উভয় শক্তি-বলে একমাত্র সত্য তত্ত্ব ব্রহ্মকে আবৃত ক'রে তৎস্থলে একটি মিথ্যা জগতের যেন সৃষ্টি করে। এই মতবাদের নাম 'বিবর্তবাদ'—অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে বোধ হচ্ছে যেন কারণরূপী ব্রহ্ম কার্যরূপী জীবজগতে সত্যই স্বয়ং পরিণত হচ্ছেন—যেমন মনে হচ্ছে রজ্জুটি যেন সত্যই সর্প হয়ে গেল—যা আমরা তখন দেখছি। কিন্তু জীবজগৎসংবলিত ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের 'পরিণাম' বা সত্য রূপান্তর নয়, 'বিবর্ত' বা ভ্রান্তিমূলক আপাতদৃষ্ট রূপান্তরই মাত্র।

সেজন্য মোক্ষের অর্থ হ'ল, এই অবিদ্যা দূর ক'রে ব্রহ্ম ও জীবজগতের প্রকৃত স্বরূপ সাক্ষাৎ ও শাশ্বতভাবে উপলব্ধি করা—অর্থাৎ জীব-জগৎ যে স্বয়ং ব্রহ্ম তা সাক্ষাৎ ও শাশ্বতভাবে উপলব্ধি করা। এরূপে, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের সম্বন্ধ—যদি সম্বন্ধের কথা বলতেই হয়—সম্পূর্ণরূপেই

অভেদ সম্বন্ধ—যা এই অত্যাশ্চর্য মতবাদের যোগ্য নামটি থেকেই জানা যায়।

অতএব মোক্ষের সাধন কেবল জ্ঞান—তত্ত্ব-জ্ঞান সত্যজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান আত্মজ্ঞান।

এস্থলে মূলীভূত প্রশ্ন হ'ল—'মায়া' এল কোথা থেকে? তা কি অদ্বৈত ব্রহ্মে দ্বিত্ব এনে দিচ্ছে না? অদ্বৈতবাদের মূল সমস্যা তো এই একটিই—কত আলোচনা-প্রপঞ্চনা—বাদ-বিসংবাদ ঐ নিয়ে—এস্থলে তার স্থান কোথায়? তবে মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ব ব্যাখ্যাই হয়তো এর শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা—'Maya is not a **theory**, it is simply a statement of **facts** about the universe as it exists.' (C. W. 1963, II. 105) 'মায়া **তত্ত্ব** নয়, কিন্তু **তথ্য**।'

পাতা ফুরিয়ে গেল—জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন অদ্বৈতবেদান্তের সম্বন্ধে বলা হল কি? কেবল পরিশেষে একটিমাত্র কথা না বললে অন্যায় হবে—সেটি হ'ল এই যে, শঙ্করকে মিথ্যা-মায়াবাদী রূপে চিহ্নিত ক'রে 'misanthrope' অথবা মানববিদ্বেষী ব'লে চিত্রিত করা হয় বহু ক্ষেত্রেই—এবং তা হ'ল আদ্যোপান্ত ভ্রান্তিজনক ও অন্যায়মূলক। শঙ্কর জীব-জগৎ-সংবলিত সংসারকে অবজ্ঞাও করেননি, ঘৃণাও করেননি—কেবল বারংবার বলেছেন, তাদের প্রকৃত স্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপত্ব জান। বস্তুতঃ নঞর্থক (Negative) দিক্ থেকে জীবজগৎ মিথ্যা কারণ সেদিক্ থেকে আমরা তাদের ব্রহ্ম থেকে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখি। কিন্তু সদর্থক (Positive) দিক্ থেকে, জীবজগৎ সত্য, স্বয়ং ব্রহ্মরূপে অতি সত্য। নঞর্থক থেকে সদর্থকে উন্নীত হওয়াই তো 'সাধনা'। নঞর্থক দিক্ থেকে জগতের রয়েছে ব্যবহারিক (Phenomenal বা Empirical) সত্তা—সেই দিক্ থেকে জগৎ 'মিথ্যা' 'অসত্য' নয়। মিথ্যা হল তা'ই যা আপাতদৃষ্টিতে সত্যরূপে প্রতিভাত হ'লেও সত্যজ্ঞানোদয়ে বিলীন হয়ে যায়—'মিথ্যাত্বং নাম প্রতীয়মানত্বপূর্বক-যথাবস্থিত-বস্তু-জ্ঞান-নিবর্ত্যত্বম্' (রামানুজের 'শ্রীভাষ্য' ১।১।১)। যথা—রজ্জু-সর্প-ভ্রমকালের রজ্জু। কিন্তু 'অসত্য' কোনদিনও সত্যরূপে প্রতিভাতও হয় না। যথা—আকাশকুসুম। সদর্থক দিক্ থেকে জগতের রয়েছে পারমার্থিক (Noumenal) সত্তা। সেজন্য, প্রকৃতকল্পে শঙ্কর-বেদান্তে জীব-জগৎকে যে সম্মানদান করা হয়েছে—তা অন্যত্র কোথাও নেই—জীবও ব্রহ্ম, জগৎও ব্রহ্ম—কি রমণীয় রোমাঞ্চকর কথা এটি! অন্যে কে বলেছেন এ'কথা এরূপ স্থির ন্যায়ের ভিত্তিতে?

সেজন্য শঙ্কর-দর্শন আদ্যোপান্ত অমৃত-আনন্দ-দর্শন। জীব যে মর নয়, অমৃতস্বরূপ; দুঃখী নয়, আনন্দস্বরূপ; ক্ষুদ্র নয়, ভূমাস্বরূপ—এই মহিমময়ী বাণীই শঙ্কর-বেদান্তের মর্মোত্থ বাণী। কি নেই এতে? এতে রয়েছেন ব্রহ্ম, সেই সঙ্গে রয়েছেন ব্রহ্মরূপী জীবজগৎ। এতে রয়েছে জ্ঞান, সেই সঙ্গে রয়েছে জ্ঞানসোপানরূপ ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম। এক কথায়, এতে রয়েছে সব—সব কিছুই—কারণ—

'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে॥' (রবীন্দ্রনাথ)

জীবনদর্শন

শ্রীহরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরী*

[পূর্বানুবৃত্তি]

২

এই নিবন্ধের প্রারম্ভেই সূচিত হইয়াছে যে, জীবনদর্শনরূপে সংজ্ঞিত দার্শনিক মতবাদ পাশ্চাত্যদর্শনের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতেই বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে; তত্রত্য দর্শনের একটি মুখ্য শাখারূপে ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং দার্শনিক পদ্ধতিতে বিচার-আলোচনা ও বাদানুবাদের ফলে ইহা বহুলাংশে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এইস্থলে পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের অর্থ কি প্রকার অর্থাৎ কি কি অর্থে রূঢ় এবং ইহার স্বরূপ কীদৃশ অর্থাৎ ইহার পরিণামপ্রবাহ কি ভাবে চলিয়াছে—তাহাই প্রথমে বিচার্য। কিন্তু তৎপূর্বে ভারতীয় জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তথা সংস্কৃতির সংস্থিতিতে জীবনদর্শন কি কি অর্থে সূত্রিত হইয়াছে, তাহার আভাস দেওয়া হইতেছে, অগ্রে তাহা করা হয় নাই; অতঃপর ইউরোপীয় ভাবধারার মূলগত জীবনদর্শন-সংক্রান্ত মতবাদ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে বিচার-আলোচনা করা হইবে।

ভারতীয় জীবনে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জীবন-দর্শন সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্রমূলক স্মৃতিগ্রন্থাদিতে নিবদ্ধ অনুশাসনই প্রামাণ্যমূলক এবং তাহা পূর্ণতঃ শ্রুত্যুক্ত আদর্শানুযায়ী—স্মৃতিতে বিশদরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে মানব-জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ আত্মদর্শন বলিয়াই সূচিত হইয়াছে।[১] যজ্ঞানুষ্ঠান ('ইজ্যা'), আচারব্যবহার ('আচার'), ইন্দ্রিয়সংযম ('দম'), কায়মনোবাক্যে হিংসাপ্রবৃত্তি হইতে বিরতি ('অহিংসা'), নিষ্কাম, নিঃস্বার্থভাবে স্বার্থাকাঙ্ক্ষা পরিহারপূর্বক যোগ্যপাত্রে উপযোগী বস্তু ইত্যাদি সম্প্রদান ('দান'), বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ('স্বাধ্যায়')—ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্মাঙ্গ, যাহা দ্বারা বাহ্য চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্বক 'আত্মদর্শন' লাভ হয়। 'আত্মদর্শন' হইলে 'যাথাতথ্যজ্ঞান', সত্যোপলব্ধি সঞ্জাত হয়।[২] মনুস্মৃতিতে ধর্মলক্ষণ এবংবিধ রূপেই সূচিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রাদিগত তত্ত্বজ্ঞান ('ধীঃ') এবং আত্মদর্শন ('আত্মজ্ঞানম্') বিদ্যা বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে।[৩] সর্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্বভূতের উপলব্ধি—ইহাই

* এম্. এ., ধর্মতত্ত্বাচার্য, ডক্টর ফিল্, (বার্লিন)। গ্রন্থকার।

১ ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্মণাম্।
অয়ং তু পরমো ধর্মো যদ্যোগেনাত্মদর্শনম্॥ যা. স্মৃ. ১।৮

সাধারণ ধর্মাঙ্গ :

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তিঃ সর্বেষাং ধর্মসাধনম্॥ ঐ ৫।১২২

২ ইজ্যাদীনাং কর্মণাময়মেব পরমো ধর্মো যদ্যোগেন বাহ্যচিত্তবৃত্তিনিরোধেনাত্মনো দর্শনং যাথাতথ্যজ্ঞানম্। ঐ, মিতাক্ষরাব্যাখ্যা।

৩ ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥ ম. স্মৃ. ৬।৯২
(শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞানং ধীরাত্মজ্ঞানং বিদ্যা। মন্বর্থমুক্তাবলী টীকা।)

সর্বভূতে সমদর্শন অর্থাৎ সর্বজীবে সাম্যভাবের অনুশীলন এবং ইহাই আত্মজ্ঞান (আত্মদর্শন) এবং ইহা অবশ্য অনুষ্ঠেয়। যিনি আত্মমননপূর্বক সর্বভূতে অবস্থিত আত্মাকে 'দর্শন' করেন, তিনি 'আত্মদর্শন' করিয়া সকলের প্রতি সাম্য-ভাব লাভ করেন এবং পরমপদ, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সংসার হইতে মোক্ষলাভ করেন।[৪] শ্রুতিতে বিশেষতঃ ঈশোপনিষদে[৫] যে ভাবে 'আত্মদর্শন'তত্ত্ব সূত্রিত হইয়াছে এবং অগ্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই স্মৃতিতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

মহাভারতে শান্তিপর্বের বিভিন্ন স্থলে 'দর্শন' আত্মদর্শন অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। এই স্থলে কতিপয় নিদর্শন মাত্র উল্লেখ করা হইতেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখার্হ যে, মহাভারতের, বিশেষতঃ শান্তিপর্বের সংকলন-কাল কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইহার চরম সংকলন ঘটিয়া থাকিবে। এই স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, 'দর্শন' শব্দের অর্থ 'আত্মদর্শন' প্রাচীনতর প্রয়োগ বলিয়া অনুমান করা যায় এবং তন্ত্ররূপে প্রসিদ্ধি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন প্রয়োগ। ইহা আলোচনা করা হইতেছে। প্রথমে 'আত্মদর্শন' অর্থে 'দর্শন' শব্দের যে প্রাচীনতর প্রয়োগ রহিয়াছে, ইহার কতিপয় নিদর্শন উল্লেখ করা হইতেছে। যখন 'আত্মজ্যোতি' পুরুষ, যিনি আত্মদীপ্তিতে দীপ্তিমান্, নিজের কামনা অভিলাষ প্রতিসংহৃত করিতে পারেন, যেমন কূর্ম তাহার অঙ্গসমূহ সংহৃত করিয়া রাখে, তখন তিনি আত্মদর্শন লাভ করেন। পরমাত্মা সর্বভূতে অন্তর্গূঢ়রূপে বিরাজমান। তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ পরম সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার এইরূপ 'দর্শন' (উপলব্ধি) করিয়া থাকেন অর্থাৎ আত্মসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। সংযত বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ আত্মাতে আত্মদর্শন করেন। যখন জীব সর্বভূতে আত্মা অনুস্যূত এবং আত্মাতে সর্বভূত বিলীন রহিয়াছে —ইহা 'দর্শন' করিয়া থাকেন, তখন (অসম্প্র-জ্ঞাত সমাধি অবস্থায়) তাঁহার ব্রহ্মভাবের স্ফুরণ হয়। সলিলে বারিচরের ন্যায় তাদৃশ

অব্যাপকভাবে সাধারণ ধর্ম অর্থাৎ ধর্মাঙ্গ :

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥ ম. স্মৃ. ১০।৬৩

৪ সমদর্শন : সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥ ঐ, ১২।৯১

আত্মজ্ঞান সর্বমাত্মনি সংপশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ।
সর্বং হ্যাত্মনি সংপশ্যন্নাধর্মে কুরুতে মনঃ॥ ঐ, ১২।১১৮

আত্মদর্শন অনুষ্ঠেয়

এবং যঃ সর্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥ ঐ, ১২।১২৫

(যঃ সর্বেষু ভূতেষবস্থিতমাত্মানমাত্মনা পশ্যতি স ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাৎ পরং শ্রেষ্ঠং পদং স্থানং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি। তত্রাত্যন্তং লীয়তে মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। মন্বর্থমুক্তাবলী টীকা।)

৫ দ্রঃ উপক্রমণিকাতে উপনিষদে 'দর্শন' শব্দের উল্লেখ ও ব্যাখ্যান। (উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৮৩, পৃঃ ৭৫-৭৮)

মুক্ত পুরুষ সংসারে লিপ্ত হন না।[৬] এই ভাব ঈশোপোনিষৎ হইতে গৃহীত হইয়াছে[৭]; অগ্রে যথাস্থলে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 'বিপ্র' অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে তন্ময়, অনুপ্রাণিত পুরুষ[৮] যিনি মনের ঈশিতা ('মনীষী') মনঃসহযোগে আত্মাতে 'আত্মদর্শন', আত্মোপলব্ধি অর্থাৎ আত্মসাযুজ্য লাভ করেন।[৯] যাহা 'সাংখ্য'গণ (জ্ঞানিগণ) 'দর্শন' করেন, তাহা যোগিগণও 'দর্শন' করিয়া থাকেন। যিনি 'সাংখ্যমার্গ' এবং 'যোগমার্গ' অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনিই তত্ত্ববিৎ।[১০] সাংখ্যতুল্য জ্ঞান নাই এবং যোগসম শক্তি নাই—তাহারা উভয় সমতুল্য এবং অবিনাশক।[১১] 'আত্মদর্শন' অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি যে প্রক্রিয়া বা সাধনমার্গ দ্বারা হয়, তাহাই যোগ। যোগের অন্য লক্ষণ আর কি? আত্মজ্ঞ, আত্মদর্শী পুরুষগণ অজর পরমাত্মাকে এইভাবে 'দর্শন' করিয়া থাকেন।[১২] জ্ঞানী কিংবা জ্ঞাননিষ্ঠ সংন্যাসী অর্থে সাংখ্য-শব্দের প্রয়োগ প্রাচীনতর এবং কাপিল সাংখ্য অর্থে প্রয়োগ পরবর্তীকালীন, ইহাই অনুমেয়। 'দর্শন' শব্দের 'আত্মদর্শন' অর্থে প্রয়োগের উদাহরণ বাহুল্যভয়ে এইস্থলে দেখান হইল না।[১৩] 'তন্ত্র' কিংবা দর্শনের প্রস্থানরূপে শাস্তি-

৬ দ্রঃ যদা সংহরতে কামান্ কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
তদাঽঽত্মজ্যোতিরাত্মাঽয়মাত্মন্যেব প্রপশ্যতি॥ মহা. শা. প. ১৭৪।৫১ (পুনা সং)

এবং সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়শ্চরতি সংবৃতঃ।
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
লঘ্বাহারো বিশুদ্ধাত্মা পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥ } ঐ, ১৮৮।২৮-২৯

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
যদা পশ্যতি ভূতাত্মা ব্রহ্ম সংপদ্যতে তদা॥ ঐ, ২৩৯।২১
সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্নোপলিপ্যতে জলে বারিচরো যথা॥ ঐ, ৩২৭।২৯

৭ তুলনীয়ঃ যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ঈশোপ. ৬-৭

৮ √বিপ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'বিপ্র' শব্দের প্রাচীন অর্থ ঈশ্বরভাবে তন্ময় পুরুষ—জাতিতে ব্রাহ্মণ নহে।

'মনীষী' শব্দের আদি অর্থও প্রণিধানার্হ।

৯ মনীষী মনসা বিপ্রঃ পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি। মহা. শা. প. ২৩৯।১৫ (পুনা সং)

১০ দ্রঃ যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি সাংখ্যৈস্তদনুগম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্॥ ঐ, ৩০৫।১৯

১১ নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্।
তাবুভাবেকচর্যৌ তাবুভাবনিধনৌ স্মৃতৌ॥ ঐ, ৩১৬।২

১২ যোগ এব হি যোগানাং কিমন্যদ্যোগলক্ষণম্।
এবং পশ্যং প্রপশ্যন্ত্যাত্মানমজরং পরম্॥ ঐ, ৩০৬।২৫

১৩ দ্রঃ আরও কতিপয় উদাহরণ –
শা. প. ৩১৮।৫৬, ৭১-৭৩, ৮৫-৮৬, ৩২০।৩২

পর্বে 'দর্শন'শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। বেদ আরণ্যক সাংখ্য যোগ ও পঞ্চরাত্র—এই পঞ্চবিধ জ্ঞান লোকে প্রচারিত।[১৪] সাংখ্যের বক্তা পরমর্ষি কপিল; যোগবিৎ স্বয়ং 'হিরণ্যগর্ভ'—অন্য কেহ নহেন। বেদাচার্য অপান্তরতমা, কেহ কেহ এই ঋষিকে প্রাচীনগর্ভ বলিয়া থাকেন। সমগ্র বেদ, সনাতন সাংখ্য ও যোগ—এই সমস্ত ঋষিগণ কর্তৃক নিরুক্ত হইয়াছে; শ্রীনারায়ণ এই পুরাতন বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।[১৫]

পাশ্চাত্য জীবনদর্শন – ইহার অর্থ এবং স্বরূপ

ইতঃপূর্বেই যথাস্থানে উক্ত হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য **জীবনদর্শন** পারিভাষিক অর্থে দর্শনরূপে বিংশ শতাব্দীতেই গড়িয়া উঠিয়াছে এবং আধুনিক কালে ইহা দর্শনের একটি প্রধান শাখারূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্রথমে 'জীবন' এবং 'দর্শন' কি কি অর্থে রূঢ় এবং জীবনদর্শন এই সামাসিক পদ কি কি অর্থে প্রযোজ্য হয়, তাহার ব্যাখ্যা করা হইতেছে এবং অতঃপর জীবনদর্শন সম্বন্ধে দার্শনিক পদ্ধতিতে বিচার-আলোচনা করা হইবে। উপক্রমণিকাতে জীব ও জীবন বলিতে কি বুঝায়, তাহা অতি সংক্ষেপে ঈষৎ বিবৃত হইয়াছে।[১৬] বর্তমান স্থলে জীবনসংক্রান্ত পদার্থের শ্রেণীবিভাগ দেখান হইতেছে—যাহা বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক মহলে স্বীকৃত। দার্শনিক পরিভাষায় 'জীবন' পদার্থ-সংজ্ঞান্তর্গত।

(১) প্রথমতঃ প্রকৃতি-বিজ্ঞানের এবং জৈব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জীবন বলিতে বুঝায় যে-কোন প্রকার জৈব ব্যাপার (life function), যাহা মূলতঃ এবং ব্যবহারতঃ অজৈব ব্যাপার হইতে পূর্ণতঃ বিভিন্ন এবং যাহার মধ্যে কোন প্রকার জীবনের অভিব্যক্তি রহিয়াছে। এই লক্ষণ সহজ সরল ভাষায় অতিশয় সুনির্দেশ্য নহে, তাহা যথাস্থলে বিচার করা হইবে; এই স্থলে উল্লেখ্য যে, প্রাণতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের দিক্ দিয়া এই গুরুতর জটিল বিষয়ে বহুধা বিপ্রতিপত্তি আছে। মূল লক্ষ্যে পৌঁছাইলে জীবনব্যাপারের নিবৃত্তি ঘটে এবং না পৌঁছান পর্যন্ত তাহার অনুবৃত্তি চলে এবং তদবধি নানাবিধ বিকারের

১৪ জনমেজয় উবাচ :
সাংখ্যং যোগঃ পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ।
জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রচরন্তি হ॥ শা. প. ৩৪৯।১

১৫ সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতন॥
অপান্তরতমাশ্চৈব বেদাচার্যঃ স উচ্যতে।
প্রাচীনগর্ভং তমৃষিং প্রবদন্তীহ কেচন॥ ঐ, ৩৪৯।৬৫-৬৬
দ্রঃ ঐ, ৩৪৯।৬৭-৭২
সাংখ্যং চ যোগং চ সনাতনে দ্বে বেদাশ্চ সর্বে নিখিলেন রাজন্।
সর্বৈঃ সমস্তৈ ঋষিভির্নিরুক্তো নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্॥ ঐ, ৩৪৯।৭৩

তুলনীয় :
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ভ. গী. ৫।৫

১৬ দ্রঃ উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৮৩, পৃঃ ৭৩-৭৪

বা বিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। শেষোক্ত বিলয় অবস্থা স্বাভাবিক হইতে ব্যাবৃত্তিসূচক এবং বহুলাংশে অস্বাভাবিক বলিয়া সাধারণতঃ প্রতীতি হয়। কোন প্রকার স্বভাব বা নিয়মানুযায়ী ব্যবহারের সীমা কিছুটা নির্ধারিত হয়, যদিও তাহা কার্য-কারণ-সম্বন্ধ দ্বারা সম্যক্ নিরূপণ করা যায় না।[১৭]

(২) আন্বীক্ষিকী ক্ষেত্রে[১৮] মানুষের প্রতীতি ও অনুভূতির মূলে এই বিশ্ব কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থাসংক্রান্ত চিন্তা ও পরিকল্পনা জীবনে অদৃষ্ট-স্বরূপ অর্থাৎ বহুলাংশে প্রবৃত্তির নিমিত্তকারণ হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবেই জীবনের অর্থ, মূল্য ও উদ্দেশ্যের জিজ্ঞাসা জাগে এবং তৎসম্মুখীন প্রাগ-বস্থার ভিত্তিতে এই মূল প্রশ্নগুলির উত্তর নিরূপিত হয়।[১৯] ইহাতে সূচিত হয় যে, অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই জীবনের অর্থ, মূল্য ইত্যাদি আপেক্ষিক (relative), অর্থাৎ দেশে কালে রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রচলিত মতবাদ-সাপেক্ষ।

(৩) মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে জীবন বলিতে বুঝায় সব্যাপার-নির্ব্যাপার জীবন-প্রক্রিয়া অর্থাৎ চেতনাবচেতন মানসিক ভাব ইত্যাদির কথঞ্চিৎ সমন্বয়মূলক কিংবা বিসদৃশ সমাহার—যাহার বাহ্যিক অভিব্যক্তি ঘটে এবং যাহা মূলতঃ এবং ব্যবহারতঃ ব্যক্তির প্রকৃতিগত নিয়মাবলী দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অধুনা মনস্তাত্ত্বিক দিক্ দিয়া মানসিক ব্যাপার সম্পর্কে কার্য-কারণবাদ কিংবা প্রাণবাদ—এই উভয় মতবাদই মূলতঃ অনুপপন্ন দেখা যায়।

(৪) ইতিহাস এবং সংস্কৃতির দিক্ দিয়া জীবনের অর্থ, মূল্য ইত্যাদির নিকষগ্রাবা ইতিহাসতত্ত্ব এবং সংস্কৃতিতত্ত্ব যাহা জীবনদর্শনের ভিত্তিস্বরূপ এবং ব্যক্তির জীবন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। এই মতবাদ আংশিক সত্য হইলেও পূর্ণতঃ গ্রহণীয় নহে, কেননা ইহা ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পরিপন্থী।

(৫) ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক সজ্ঞান-নির্জ্ঞান অবস্থার জীবনে প্রতিফলন এবং তাহাই জীবনদর্শনের ভিত্তি। প্রত্যেক ব্যক্তির 'জীবন-দর্শন' অর্থাৎ জীবনের প্রতি তাহার দৃষ্টিভঙ্গী, তাহার স্বকীয় জীবনে ঘাত-প্রতিঘাতমূলক ব্যাপারসমূহে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজনিত অনুভূতি ও মূল্যবোধের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীতে জীবনদর্শন সম্বন্ধে খণ্ডশঃ বিচার-আলোচনার সূত্রপাত হয়। তৎপূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ইংলণ্ডে এবং প্রায় সমকালীন ফ্রান্স ও জার্মানীতে যে সাহিত্যকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কল্পনাভিত্তিক (Romantic) আন্দোলন চলে, তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবনদর্শনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে বলা যায়। আদি হইতে জীবনদর্শনের বহুলাংশে প্রতিভূরূপে উল্লেখার্হ—শ্রেষ্ঠ জার্মান

১৭ তুলনীয় প্রাণবাদ (vitalistic theories) এবং তৎপরিপন্থী জড়বাদ এবং যান্ত্রিকতাবাদ (materialistic and mechanistic theories)

১৮ Sphere of Logic and Metaphysics

১৯ তুলনীয় ইউরোপীয় 'অস্তিত্বদর্শন' (German, Existenz-philosophie, Eng., Philosophy of Existence, Fr., L' Existenialisme) এবং 'জীবন-দর্শন' (German, Lebensphilosphie)
(Eng., Philosophy of Life)
(Fr., Philosophie de la vie)

কবি-দার্শনিক গ্যয়টে (৭৪৯-১৮৩২) হইতে কল্পনাবাদী (রোমান্টিক) লেখকগণ, দার্শনিক সোপেনহাউয়ের (১৭৮৮-১৮৬০) হইতে প্রভঞ্জন-স্বরূপ কবি-দার্শনিক নীটৎসে (১৮৪৪-১৯০০) এবং নীটৎসে হইতে ফ্রান্সে আঁরি বের্গসোঁ (১৮৫৯-১৯৪১)। যাঁহারা আধুনিক লেখকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য, প্রসঙ্গতঃ যথাস্থলে তাঁহাদের উল্লেখ করা হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জনৈক জার্মান দার্শনিক তৎকালীন নব্য জীবনদর্শনের বিচার-প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন:[২০] "জীবন"—এই প্রত্যয় (concept) দ্বারা কি জীবনের চরম মূল্য নিরূপিত হইতে পারে এবং ইহাই কি সংস্কৃতির পরিবাহকরূপে পরিগণিত হইতে পারে? প্রত্যেক দর্শনের মূল ভিত্তি বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কবি-দার্শনিক গ্যয়টের যুগ হইতে এই জীবনদর্শনের মূল ভিত্তি প্রাণিবিদ্যা এবং ইহার বিষয়াধিকরণ সর্ববিধ প্রাণ ও প্রাণভৃৎ দেহী বা অবয়বী—যেমন (১) জরায়ুজ (মনুষ্য, পশু প্রভৃতি), (২) অণ্ডজ (পক্ষী প্রভৃতি), (৩) স্বেদজ (মশক, মক্ষিকা প্রভৃতি) এবং (৪) উদ্ভিজ্জ (নানাবিধ উদ্ভিদ্)। এই সর্ব-বিধ প্রাণি-জাতি সম্বন্ধে জীবনসম্পর্কে সর্বতো-মুখ বিচার অসম্ভব না হইলেও অতি দুষ্কর। এই বিশ্বে জীবনের সত্তা এবং স্বরূপই জীবনের মূল্য নিরূপণ করে অর্থাৎ যাহা জীবনের পরিপোষক এবং জীবনের দৃঢ়তা ও স্বরূপের উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাই চরম লক্ষ্য এবং তাহারই পরম মূল্য। তিনি যুক্তিতর্কের সাহায্যে সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাণিবিদ্যার ভিত্তিতে নির্মিত জীবনদর্শন উন্মার্গগামী; প্রাকৃতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবন এই উভয়বিধ জীবনের মধ্যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে এবং তাহা অতিক্রম করিয়া চলাই যথার্থ জীবনদর্শনের লক্ষ্য। তাঁহার পরবর্তী কালে জীবনের অর্থ এবং লক্ষ্য কীদৃশ এবং শুধু জীবনরূপে জীবনের মূল্য কিরূপ—ইহাই তাঁহার স্বপক্ষীয় এবং প্রতিপক্ষিগণের মধ্যে মূল বিচার-বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।[২১] জীবনদর্শনের মুখ্য লেখকগণের দৃষ্টিভঙ্গীর বিভেদবশতঃ জীবনদর্শন-মূলক ভাবধারার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ইহা দর্শনের বিশিষ্ট তন্ত্ররূপে যথা-পদ্ধতি উপন্যস্ত করা সুকঠিন। অতঃপর জীবন-দর্শনসংক্রান্ত বিভিন্ন ভাবধারা মুখ্য জীবনদার্শ-নিকগণের রচনা হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের মতবাদ বিচারকালে দেখান হইবে। এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জীবনদর্শন যেভাবে দাঁড়াইয়াছে, তাহা যেন নানাদিকে আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপন্থী, যেহেতু ইহার মূলসূত্র হইল যে, জীবন জ্ঞান অপেক্ষা অধিক গুরুতর, বিশিষ্ট জ্ঞান অর্থে বিজ্ঞান অপেক্ষা জীবনে অভিজ্ঞতা-লব্ধ প্রজ্ঞা গরীয়সী। জীবন-দার্শনিক সাক্ষাৎ-ভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে সংঘর্ষে সংলিপ্ত নহেন বটে, তথাপি জীবন-দার্শনিক মাত্রই জীবনকে জীবনের অনুভূতিকে যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করিবার প্রয়াসের বিরোধী, অর্থাৎ ইঁহারা বুদ্ধি-গম্য অনুভূতি এবং হেতু-কারণবাদ বহুলাংশে সমর্থন করেন না। তাহাতে ফল দাঁড়ায় যে, জীবনের স্বরূপ তথা জীবনের মূল্য অবিসংবাদি-রূপে নিরূপণ করা যায় না, কারণ তাহা ব্যবহার-মূলক পরীক্ষা ও প্রমাণসাপেক্ষ।

[ক্রমশঃ]

২০ দ্রঃ Friedrich Schlegel : Die Philosophie des Lebens (1828)
২১ দ্রঃ Heinrich Rickert : Die Philosophie des Lebens (1920)

শ্রীবুদ্ধের বাণী ও শিক্ষা

শ্রীমতী আশা রায়

বুদ্ধদেবের জন্মতিথি বৈশাখী পূর্ণিমা। এই তিথি আমাদের তাঁর আবির্ভাব স্মরণ করিয়ে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর উপদেশ। যে উপদেশ তিনি দিয়ে গেছেন, আড়াই হাজার বছর অতীত হয়ে গেলেও আজও সেই উপদেশ এ যুগের উপযোগী হয়ে রয়েছে।

মূলত তাঁর উপদেশ আমরা পাই পালি গ্রন্থ ধম্মপদে। বৌদ্ধ সাহিত্য ত্রিপিটক নামে অভিহিত। সমগ্র ত্রিপিটকের গাথা-সাগর মন্থন ক'রে যে সুধা উত্থিত হয়েছিল, তাই ধম্মপদ। এই ত্রিপিটকই বুদ্ধের বাণী। পিটক কথাটির অর্থ পেটিকা। ত্রিপিটক অর্থাৎ সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম, এই তিনটি পেটিকা। এই বিশাল ধর্মসাহিত্যের ভাষা পালি।

ত্রিপিটকের মধ্যে সুত্তপিটকের স্থান সর্বাগ্রে, কারণ একদিকে বুদ্ধের বাণী ও প্রচারিত নীতির ব্যাখ্যা, অপরদিকে বুদ্ধ ও তাঁর প্রধান শিষ্যদের পরিচয় এতে পাওয়া যায় এবং বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ধম্মপদ গ্রন্থটি এই পিটকেরই অন্তর্গত।

সুত্তপিটকের পাঁচটি নিকায় অর্থাৎ বিভাগ বা সংগ্রহ আছে। যথা, দীঘ, মঝ্‌ঝিম, সংযুত্ত, অঙ্গুত্তর এবং খুদ্দক। খুদ্দকনিকায় আবার পনেরোটি গ্রন্থের সমষ্টি এবং এর দ্বিতীয় গ্রন্থটি বৌদ্ধ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ধম্মপদ। ধম্মপদের ২৬টি বর্গ এবং গাথা বা শ্লোকসংখ্যা ৪২৩। সম্ভবত এটি জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ধর্মগ্রন্থ।

ধম্মপদ অর্থাৎ ধর্ম-পথ। এই ধর্মগাথার উপদেশাবলী যেমন প্রাঞ্জল গভীর ও উদার তেমনই সর্বকালের উপযোগী। সর্বকালের সর্বমানবের জীবনকে সুষম ও সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তোলবার বৈশিষ্ট্য এতে পরিলক্ষিত হয়। এজন্য এটি ক্ষুদ্র হ'লেও আসমুদ্র-হিমাচল ভারতে প্রচারিত হ'য়ে ভারত হ'তে নদী গিরি সাগর লঙ্ঘন ক'রে এশিয়া ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জনচিত্তকে বুদ্ধের শিক্ষার আদর্শে আকৃষ্ট প্রভাবান্বিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল।

আজ তাঁর জন্মতিথির প্রাক্‌লগ্নে তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে ধম্মপদের শিক্ষা-স্মরণে প্রবৃত্ত হই।

বুদ্ধের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে রাজগৃহে প্রথম বৈভার পর্বতে সপ্তপর্ণী গুহায় ও পরে বৈশালীর ধর্মসংগীতিতে ত্রিপিটক সংকলিত হয়। সম্রাট অশোকের (খৃঃ পূঃ ২৭২-৩২) নিকট ন্যগ্রোধ শ্রমণ কর্তৃক ধম্মপদ আবৃত্ত হয় এবং খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে রচিত বিখ্যাত পালি গ্রন্থ মিলিন্দ-পঞ্‌হোতে ধম্মপদের উল্লেখ আছে। তদনুযায়ী পণ্ডিতগণের অনুমান খৃঃ পূঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতকের পূর্বে ধম্মপদ সংকলিত হয়।

সম্রাট অশোকের শিলানুশাসন ও গিরিলেখ-গুলিতে ধম্মপদোক্ত নীতির প্রতিচ্ছায়া আমরা দেখতে পাই।

বুদ্ধ তাঁর উপদেশে চিত্তের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। নীতিমূলক শিক্ষা সকল ধর্ম-শাস্ত্রেই আছে, কিন্তু মানবদরদী বুদ্ধ আপামর সকলের শিক্ষা ও চিত্তের উৎকর্ষলাভের জন্য উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে জনসাধারণের কথ্য ভাষায় প্রাঞ্জল ক'রে যে শিক্ষা সেই কালে দিয়েছিলেন, তার সার-সংক্ষেপ ধম্মপদে বিধৃত। সে দিক দিয়ে গ্রন্থটি অতুলনীয়।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না ক'রে পালি ভাষায় লিখিত ৪২৩টি গাথার মধ্যে কয়েকটির অতি সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হ'ল।

বৈরিতার দ্বারা বৈরিতা কখনও দমন করা যায় না। প্রেমের দ্বারা বৈরিতার উপশম হয়। এ-ই সনাতন ধর্ম। (৫)

শরপ্রস্তুতকারী যেমন শরকে ঋজুভাবে প্রস্তুত করে, পণ্ডিত ব্যক্তিও তেমনি সদা চঞ্চল ও দুর্নিবার চিত্তকে ঋজু বা স্থির করেন। (৩৩)

মাছকে জলাশয় থেকে তুললে সে যেমন জলে যাবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে, বিজ্ঞ ব্যক্তির মনও তেমনি মার-ভুবন (সংসার-প্রপঞ্চ) ত্যাগ করবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে। (৩৪)

চলার পথে (সংসারে) শ্রেষ্ঠ কিংবা নিজের সমান সঙ্গী না পেলে দৃঢ়তার সঙ্গে একাকী চলা কর্তব্য, তবুও মূর্খের সাহচর্য উচিত নয়। (৬১)

আমার পুত্র আছে, ধন আছে এই ভেবে নির্বোধ ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, (সে বোঝে না যে,) সে নিজেই নিজের নয়, পুত্র কিংবা ধন কি ক'রে নিজের হবে ? (৬২)

দর্বী (চামচ) যেমন ব্যঞ্জনের স্বাদ বোঝে না, সেরূপ মূঢ় ব্যক্তি যাবজ্জীবন পণ্ডিত-সঙ্গ করলেও ধর্মলাভ করতে পারে না। (৬৪)

যে ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র সহস্র মানুষকে সহস্রবার জয় করেন, তাঁর তুলনায় যিনি কেবল-মাত্র আত্মজয় করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সংগ্রামবিজয়ী। (১০৩)

অপরের উপর জয়লাভ (অর্থাৎ অন্যের উপর আধিপত্য বা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা) অপেক্ষা যিনি নিত্য সংযমপরায়ণ হয়ে আত্ম-জয়ী হন, তিনিই শ্রেষ্ঠ বিজয়ী। (১০৪)

মহাপুরুষের আবির্ভাব দুর্লভ। তিনি সর্বত্র জন্মগ্রহণ করেন না। যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই কুল ও স্থান পবিত্র ও সমৃদ্ধ হয়। (১৯৩)

ক্ষুধা কঠিনতম ব্যাধি, পঞ্চস্কন্ধধারণ (অর্থাৎ জন্ম) মহা দুঃখজনক। যিনি এসব যথার্থরূপে জানেন, তাঁর কাছে নির্বাণ পরম সুখ ব'লে উপলব্ধ হয়। (২০৩)

আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি, নির্বাণ পরম সুখ। (২০৪)

প্রিয় হ'তে ভয় ও শোক উৎপন্ন হয়, যিনি প্রিয়বিমুক্ত অর্থাৎ মমত্ববোধহীন, তাঁর শোক নাই আর ভয় কোথায় ? (২১২)

ধর্মদান শ্রেষ্ঠ দান, ধর্মে রতি শ্রেষ্ঠ রতি, তৃষ্ণাক্ষয় সর্ব দুঃখকে পরাভূত করে। (৩৯৩)

ব্রাহ্মণজাতিতে জন্ম হ'লেই আমি তাকে ব্রাহ্মণ বলি না। রাগ-দ্বেষ-মোহমুক্ত এবং কামরহিত ব্যক্তিকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলি। (৩৯৬)

সর্বজীবের প্রতি অপ্রমেয় প্রেমের প্রেরণায় জগতের দুঃখে বিচলিত হয়ে দুঃখমুক্তির সন্ধানে রাজপুত্র গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুব্রত ধারণ করেছিলেন। তাঁর নিজের কোনও অভাব, কোনও দুঃখ ছিল না ; স্নেহময় পিতা, বাৎসল্যময়ী মাতা, অনিন্দ্য-সুন্দরী ভার্যা, প্রাণপ্রিয় পুত্র, রাজসিংহাসন— জাগতিক যা কিছু পরম কাম্য, সবই তাঁর ছিল।

অতুলনীয় ত্যাগ ও তপস্যায় মুক্তি-পথের সন্ধান পেয়ে রাজভিখারী আপামর সকলকে সে-পথের সন্ধান অকাতরে দিয়েছিলেন এবং ভিক্ষুদের অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন—'চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজনসুখায় বহুজনহিতায় . ।'— হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের সুখের জন্য, বহুজনের হিতের জন্য তোমরা দিকে দিকে পরিভ্রমণ করো।

তাই আমরা দেখতে পাই, কেবল ভারতে নয়, গিরি-সমুদ্র মরু-কান্তার অতিক্রম ক'রে

সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপের প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর মতবাদের ব্যাপ্তি ঘটেছিল।

মানব-প্রেমিক বুদ্ধের সাধনলব্ধ পথ নীতি-ভিত্তিক। যে-ব্যক্তি যে-ধর্মে আছে বা যে-মতবাদে যার শ্রদ্ধা, তাতে থেকেই সে নিজ চিত্তের উৎকর্ষ-সাধন ক'রে মুক্তির পথে এগিয়ে যাক—এটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য ও আকুতি। এই মহামানব দীর্ঘ ৪৫ বৎসর পদযাত্রায় দেশে দেশে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ—সকলের কাছে উচ্চতম নৈতিক আদর্শ ও দুঃখমুক্তির বাণী অক্লান্তভাবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচার ক'রে গেছেন।

বুদ্ধের নীতি বা মতবাদের সঙ্গে হিন্দুদের নীতি বা মতবাদের মূলগত পার্থক্য আর চোখে পড়ে না, তা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে, তার কারণ স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিতেই বলি—'শাক্যমুনি পূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন, ধ্বংস করিতে নয়; তিনি ছিলেন হিন্দুধর্মের স্বাভাবিক পরিণতি ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত—ন্যায়সম্মত বিকাশ।'

একথা সত্য যে, বুদ্ধ ঈশ্বর সম্বন্ধে নিরুত্তর ছিলেন। কেন ছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। উপনিষদের বাণী 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ।' যিনি ভাষায় অপ্রকাশ্য, ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর এবং মাত্র উপলব্ধির বিষয় তাঁর সম্বন্ধে বুদ্ধের নিরুত্তর থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ মরণশীল দুঃখক্লিষ্ট মানব ঈশ্বরের সহায়তায় বাঁচতে চায়; এই কারণে বুদ্ধের ধর্ম তাঁর জন্মভূমি থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর অবদান হারিয়ে যায়নি। তাঁর শিক্ষার মর্মবাণী—মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষার বাণী বহির্বিশ্বে প্রচারের সঙ্গে ভারতীয় কৃষ্টিও প্রসার লাভ করেছিল। আমরা দেখি ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম প্রাচীন শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বরবুদুর-দর্শনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে লিখে গেছেন—

"পাষাণের মৌনতটে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'"

সেবাধর্ম যা বেদান্তের মূল কথা, সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের বাস্তব রূপায়ণ, অপ্রমেয় মৈত্রীর আধার বুদ্ধই তা প্রথম সন্ন্যাসি-সঙ্ঘে প্রবর্তিত করেছিলেন। শ্রাবস্তীনগরে ভিক্ষু তিষ্য যখন বীভৎস চর্মরোগে পুঁজরক্তের পূতিগন্ধে সর্বজন-ত্যাজ্য হ'য়ে যন্ত্রণায় কাতর, তখন বুদ্ধ নিজহাতে তাঁর শুশ্রূষা করেন এবং রোগী ও আর্তের শুশ্রূষা, দরিদ্র ও অনাথের সেবা সঙ্ঘের অবশ্য কর্তব্য ব'লে নির্দেশ দেন। শ্রাবস্তীর দুর্ভিক্ষে ক্ষুধিতকে অন্নদানরূপ সেবার কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ ছাড়া দূরদর্শী মহাজ্ঞানী বুদ্ধ বুঝে-ছিলেন যে, দেশের আপামর জনসাধারণ শিক্ষিত না হ'লে চিত্তের উৎকর্ষ লাভ করতে পারবে না, তাই জনচিত্তকে উন্নীত করতে প্রায় প্রত্যেকটি বৌদ্ধ বিহারই শিক্ষায়তনে পরিণত হয়েছিল তাঁর অনুপ্রাণনায়। সেখানে মাত্র স্ত্রী-পুরুষের পৃথক্ বিহারে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা ব্যতীত কোনও নির্দিষ্ট জাতি বা শ্রেণীর প্রবেশাধিকারের বৈষম্য ছিল না।

তাঁর মৃত্যুর পর আমরা দেখতে পাই, বুদ্ধ-ভক্ত মহামতি সম্রাট অশোক ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিরি ও শিলালেখ প্রভৃতির মাধ্যমে বুদ্ধের শিক্ষা একই ভাষায় উৎকীর্ণ করেছেন। এতে মনে হয় তখন অশিক্ষিতের সংখ্যা ভারতে কমই ছিল এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে অল্প কিছু ভিন্ন লিপি থাকলেও একই (রাষ্ট্র?) ভাষার প্রচলন ছিল। বুদ্ধের সেবাধর্মের শিক্ষায়

অনুপ্রাণিত হ'য়ে অশোক নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করেন এবং জগতে তিনিই প্রথম মূক পশুদের দুঃখকষ্টে বিগলিত হয়ে তাদের জন্য হাসপাতাল করেছিলেন।

সেই ক্ষান্তি-মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক বুদ্ধের অপার করুণার পরিধি নেই, সামান্য ছাগশিশুর জীবন বাঁচাতে তিনি নিজ জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। সর্বজীবে মাতৃস্নেহের ন্যায় অপরিসীম স্নেহ তাঁর মনে সদা বিরাজ করত। কিন্তু রমণীসুলভ কোমলতা বা আবেগ উচ্ছ্বাসের স্থান সেখানে ছিল না। তমোহর সূর্যের ন্যায় প্রখর জ্ঞানের দীপ্তি ও অনুপম ক্ষাত্র-বীর্যের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর চরিত্রে। কারও প্রগল্‌ভতা, অলৌকিক শক্তিপ্রদর্শন ইত্যাদি তিনি সহ্য করতেন না।

প্রাণিহিংসা-বিরতি তাঁর উপদেশের প্রথম শিক্ষা হলেও আত্মরক্ষার জন্য ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের তিনি বিরোধী ছিলেন না। লোভ ও স্বার্থ-প্রণোদিত রক্তক্ষয়ী হত্যারই তিনি পরিপন্থী ছিলেন। শ্রামণ্যধর্মে ব্রতী হ'য়ে তিনি ক্লৈব্যের প্রশ্রয় দেননি। ক্ষাত্রকুলে জন্মগ্রহণের ফলে ক্ষাত্রবীর্যের অভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। রাজগৃহে সেনাপতি সিংহের সঙ্গে কথোপকথনে আমরা দেখি ধর্মযুদ্ধ ও অপরাধীর শাস্তি তিনি সমর্থনই ক'রে গেছেন।

ভারতভূমি পুণ্যভূমি, যুগে যুগে মহা-মানবগণ আবির্ভূত হ'য়ে এই ভূমিকে পবিত্র ও ধন্য করেছেন। আড়াই হাজার বছর অতিক্রান্ত হ'য়ে গেলেও কিন্তু বুদ্ধের মহিমময় ব্যক্তিত্ব আর কারও মধ্যে দেখতে পাই না—পাই শুধু স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। বুদ্ধের সে অনুজ্ঞা 'চরথ ভিক্খবে চারিকং'-এর পুনরাবৃত্তির মতই তাঁর শিষ্যদের প্রতি অনুজ্ঞা—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' জীবনোৎসর্গ করো। বুদ্ধেরই ন্যায় একাধারে অপ্রমেয় প্রেম, তীব্র বৈরাগ্য, অপরাজেয় ক্ষাত্রবীর্য, অসীম হৃদয়বত্তা, প্রখর প্রতিভা ও জ্ঞানসূর্যের চিরদেদীপ্যমান দীপ্তি আমরা লক্ষ্য করি স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে। তাই পুণ্যপুরুষ যুগাচার্য স্বামীজীই বুদ্ধের যোগ্য উত্তর-সূরী। আজ শাক্যসিংহের সঙ্গে বিশ্ববন্দিত এই পুরুষসিংহের প্রতিও অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আজকের জগৎকে গ্রাস করেছে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, অশান্তি-অসন্তোষ, লোভ-স্বার্থ, ঈর্ষা-অসূয়া; জগৎ হিংসায় উন্মত্ত, নীতিবোধের ক্রমবিলুপ্তি তাকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর্ত বসুধার অন্তরের গভীরে নীরবে-নিভৃতে গুমরে গুমরে উঠছে হাহাকার। কে তা দূর ক'রে তাকে দেবে নিষ্কৃতি? কোথায় সেই পরিত্রাতা? তাই কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রার্থনা জানাই—

'নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী।'

'আমি বুদ্ধের দাসানুদাসেরও দাস। সেই মহাপ্রাণ প্রভুর মতো কেউ কি কখনও হয়েছে? তিনি নিজের জন্য একটি কর্মও করলেন না, তাঁর হৃদয় দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেছিলেন। সেই রাজকুমার এবং সন্ন্যাসীর এত দয়া যে, তিনি একটা সামান্য ছাগ-শিশুর জন্য নিজের জীবন দিতে উদ্যত হলেন। আমি যখন সামান্য বালকমাত্র, তখন আমি তাঁকে আমার ঘরে দর্শন করেছিলাম এবং তাঁর পদতলে আত্মসমর্পণ করেছিলাম, কারণ আমি জেনেছিলাম যে, তিনি সেই প্রভু স্বয়ং।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতম্ (প্রথমো ভাগঃ)। প্রকাশক : স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, কর্মসচিব, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, কলিকাতা ৭০০০৫৬। পৃঃ ১৫৮+১৪+৫০। ফটো প্লেট ১৭ খানি। (১৯৭৬), মূল্য কুড়ি টাকা মাত্র।

বিশ্বের ধর্মসাহিত্যে 'শ্রীম' কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-গ্রন্থখানির বিশিষ্ট সমাদর রয়েছে। এতে শ্রীরামকৃষ্ণের বিভিন্ন সময়ের লীলাবিলাস ও অমৃতোপম কথোপকথনের অপূর্ব ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সমাবেশ ঘটেছে, যার ফলে ধর্মরসপিপাসু ভক্তজনের তা বড়ই আস্বাদনীয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটির এই বিশ্বজনীন আবেদনের ফলশ্রুতিরূপেই বহুভাষাভাষী জনগণের সর্বতোভাবে বোধগম্য করার জন্য গ্রন্থটির অনুবাদকরণও অপরিহার্য হয়ে ওঠে; ইংরেজী হিন্দী তামিল গুজরাটী মালয়ালি ওড়িয়া প্রভৃতি বহু ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ তার সাক্ষ্য বহন করছে। সংস্কৃত বিশ্বের এমনি একটি প্রধান ভাষা, যার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন, অথচ বর্তমান যুগেও বহতা নদীর মতো অব্যাহত-গতি তার প্রবাহ। তা ছাড়া এই ভাষা থেকেই বর্তমানের বহু ভাষার সৃষ্টি। তাই ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক ও বহু ভাষার জননীস্বরূপ সংস্কৃতের মতো ভাষায় 'কথামৃতের' মতো এমন একটি বিশ্বমানসহরণকারী উপাদেয় গ্রন্থের অনুবাদ হওয়ার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রম সংস্কৃতে এর অনুবাদ প্রকাশ ক'রে সেই অভাব পূরণ করেছেন।

স্বামীজী বলেছিলেন, 'Knowledge of Sanskrit and respect go hand in hand in India.' তাঁর এই উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বক্তৃতাতেও তিনি একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বুদ্ধ প্রভৃতি ধর্মসংস্থাপকদের সংস্কৃতকে অবহেলা ক'রে কেবলমাত্র তদানীন্তন প্রচলিত ভাষায় ধর্মপ্রচার ও উপদেশ করার জন্যই তাঁদের ধর্মের প্রভাব ভারতবর্ষে বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণীও তাই দেবভাষার মাধ্যমে যদি প্রচারিত হয়, তাহলে তা অন্যান্য সংস্কৃত শাস্ত্রের মতো পবিত্র অনুপ্রেরণাদায়ক বলিষ্ঠ ও সর্বকালে স্থিতিশীল হবে—এতে সংশয়ের অবকাশ নেই।

বর্তমান গ্রন্থটির সংস্কৃতানুবাদ বেশ প্রাঞ্জল ও সুন্দর। অনুবাদে ভাষার স্বচ্ছন্দতা এবং সহজবোধ্যতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ঠাকুরের সহজ ও সরল ভাবপ্রকাশ কোথাও এই গ্রন্থের ভাষায় ব্যাহত হয়নি। প্রয়োজনে ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত দেশী বিদেশী ও তদ্ভব শব্দের প্রয়োগ অপরিবর্তিত রাখার জন্য তার পবিত্রতা ও হৃদয়গ্রাহিতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ঠাকুর কর্তৃক ব্যবহৃত তৎসম শব্দের পরিবর্তন না ঘটানো সত্যিই প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য। বস্তুতঃ অনুবাদকার্য বড় কঠিন। মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রাখা সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তবু এর অনুবাদকদের আন্তরিক চেষ্টা অবশ্যই লক্ষণীয়। সংস্কৃত ভাষার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান যুগে প্রচলিত লঘুভাবগুলিকে প্রকাশ করায় বাধা দেয়। কিন্তু এই গ্রন্থটিতে সংস্কৃতের সেই বৈশিষ্ট্য স্বীকার ক'রেও

অন্ধ অনুগমন না ক'রে যে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রূপান্তর ঘটানো হয়েছে, তা সংস্কৃত ভাষার উপর নূতন আলোকপাত করেছে। সন্ধি ও সমাসবাহুল্য অনেকাংশেই নেই। প্রথম থেকে পাঠ করতে থাকলে ক্রমশই ভাষার সারল্য উপলব্ধ হয়। গানগুলি অনেক ক্ষেত্রেই এত সুন্দর হয়েছে যে, তা পাঠ করলেই মূলের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই অনুবাদের সৌন্দর্য উপলব্ধি করবেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে কেবল ছন্দঃ ও ভাবের অনুরোধেই দুরূহ মনে হ'তে পারে। গানগুলির গেয়ত্ব-ধর্ম প্রায় সর্বাংশেই বজায় আছে। কালানুক্রমিক বিন্যাসের জন্য ঠাকুর ও ভক্তদের ভাবের বিকাশ ও পারম্পর্য সুন্দরভাবে ধরা যায়। শব্দার্থ-সূচিকাটি বহু পরিশ্রমের ফসল। পড়তে পড়তে সামান্য অসুবিধা ও সন্দেহ বা বিশেষ জিজ্ঞাসার উদয় হ'লে তা নিরসন ও পূরণ করতে এ অংশটি বিশেষ উপযোগী। 'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত' ও 'শ্রীম-চরিতে'র সংযোজনের ফলে উভয়ের সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে বিশেষ দিবসের আলাপ ও আচরণের মাধুর্য ও সামঞ্জস্য বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ অতীব শোভন ও মনোরম। সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ এমন গ্রন্থ খুব কমই দেখা যায়। যে সমস্ত মহান্ ব্যক্তি, ঘটনা ও দৃশ্যের প্রসঙ্গ এগ্রন্থে আছে, তাদের দুর্লভ চিত্রসমাবেশে বইটি আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। সবশেষে এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত তাঁদের তো কথাই নেই, যাঁরা অল্প সংস্কৃত জানেন তাঁরাও এর মাধ্যমে কথামৃতপাঠের আস্বাদ পেয়ে ধন্য হবেন। এছাড়া, এটি সংস্কৃত সাহিত্যেরও সমৃদ্ধিসাধন ক'রে তাকে আরও জনপ্রিয় ক'রে তুলতে সাহায্য করবে। পরবর্তী খণ্ডগুলির সত্বর প্রকাশের জন্য পাঠকমাত্রেই আগ্রহী হবেন, সন্দেহ নেই।

শ্রী...

ধর্ম-সমীক্ষা : ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত। প্রকাশক : শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯। (১৩৮২), পৃষ্ঠা ১৪১, মূল্য ৮'৫০ টাকা।

দার্শনিক ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে ও চারিত্রিকতায় একজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। তিনি সুদীর্ঘকাল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি ১৯৬৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কেশবচন্দ্রস্মৃতি বক্তৃতামালা'র উদ্দেশ্যে প্রধানত লিখিত হইতেছিল। লেখক স্বয়ং নিবেদনে জানাইয়াছেন, 'আমি মনে করেছিলাম বাংলা ভাষায় 'ধর্ম' শব্দের বিভিন্ন অর্থ, ভারতীয় ধর্মের ক্রমবিবর্তন এবং বিভিন্ন যুগে নানাভাবে ধর্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করব।' বর্তমান গ্রন্থটি এই সাধু সঙ্কল্পেরই ফলশ্রুতি—যদিও অসুস্থতার জন্য বক্তৃতা দেওয়া হয় নাই।

'ধর্ম-সমীক্ষা' তিনটি ব্যাখ্যানে বিভক্ত। প্রতিটি ব্যাখ্যান একাধিক প্রসঙ্গে বিভক্ত। প্রথম ব্যাখ্যানে লেখক 'ধর্ম' শব্দের ক্রমবিকাশ, ব্যুৎপত্তি ও নানা অর্থ (১ম প্রসঙ্গ), 'ধর্ম ও রিলিজিয়ন' (২য় প্রসঙ্গ) ও 'ভারতীয় ধর্ম—সকল ধর্মের মূলগত বৈশিষ্ট্য' (৩য় প্রসঙ্গ) লইয়া গভীর আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যানে 'বিজ্ঞানের স্বরূপ' (১ম প্রসঙ্গ) ও 'বিজ্ঞান ও ধর্ম' (২য় প্রসঙ্গ) সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে দেখাইয়াছেন যে, ধর্মের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া আসিতেছে। তৃতীয় ব্যাখ্যানের ছয়টি প্রসঙ্গে লেখক 'ধর্ম ও রাষ্ট্র,' 'রিলিজিয়ন অর্থে ধর্ম-

সম্বন্ধীয় বিবাদ ও তার সমাধান', 'ধর্মে প্রতীকের স্থান' ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিয়া ধর্মকে মানব-প্রগতির অপরিহার্য উপাদানরূপে যুক্তির মাধ্যমে চিহ্নিত করিয়াছেন। সর্বত্রই প্রসঙ্গগুলি সুদীর্ঘ বাগ্‌বিন্যাসের দ্বারা অতি ভারাক্রান্ত না হইয়া স্বল্প অথচ স্পষ্ট, গভীর অথচ প্রাঞ্জল বিচারধারায় মূল লক্ষ্যে যাইয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা লেখকের দীর্ঘ জ্ঞানসাধনার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। সুশোভন প্রচ্ছদ ও ৮-পৃষ্ঠাব্যাপী টীকা ও ৯-পৃষ্ঠাব্যাপী নির্ঘণ্ট সহ এই মূল্যবান গ্রন্থখানি পণ্ডিত অপণ্ডিত সকল পাঠককেই আকৃষ্ট করিবে।

মাতৃসঙ্গীত: স্বরলিপি-সম্পাদক, অলোক চট্টোপাধ্যায়: সঙ্কলক, দাশরথি চট্টোপাধ্যায়: প্রকাশিকা, গৌরী চ্যাটার্জী, ৩/১ ই সুবলচন্দ্র লেন, কলিকাতা-৯। (১৯৭৫), পৃষ্ঠা ৪৪, মূল্য ৫'০০ টাকা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গাওয়া গানগুলির মধ্যে মাতৃবিষয়ক ১৮টি গানের সঙ্কলন আলোচ্য গ্রন্থে স্বরলিপিসহ মুদ্রিত। গানের ভাব অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সরল প্রাণস্পর্শী বাণী প্রত্যেকটি গানের শীর্ষে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে গাহিবার কালে গায়কের শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে মনে পড়িবে ও গানের নিহিত ভাবরাশি তাঁহার মনে ক্রিয়া করিতে থাকিবে—গান তখনই 'গানযোগে' পরিণত হইবে। সাধকদের রচিত ও সাক্ষাৎ অবতার কর্তৃক গীত গানের মূল্য যে কী তাহা উল্লেখের প্রয়োজন রাখে না। ভূমিকায় বলা হইয়াছে, প্রচলিত সুরের উপর ভিত্তি করিয়া গানগুলির স্বরলিপি করা হইয়াছে সহজ গায়কীর উপর, যাহাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে গানগুলি গাওয়া বা উহাদের সুরগুলি বাজানো সহজ হয়। ইহা খুবই প্রশংসনীয় উদ্যম।

প্রচ্ছদপট সুন্দর শোভন রুচিসম্মত অথচ বাহুল্যবর্জিত। কিছুকিছু মুদ্রণ-প্রমাদ সত্ত্বেও মুদ্রণ খুব ঝরঝরে। বইটি সকলেরই হৃদয় জয় করিবে, আশা করি।

জবা যেমন তোর ও-পায়: (শাক্ত ভজন-গীতি): শ্রীশিশিররঞ্জন চাকী। প্রকাশক: শ্রীপরিমলকৃষ্ণ রায়, করিম বক্স রো গভঃ হাউসিং এস্টেট, ব্লক এল—১ ফ্ল্যাট নং ৫, কলিকাতা-২। (১৯৭৫), পৃষ্ঠা ৫৬, মূল্য ছয় টাকা।

গ্রন্থটিতে পঁচিশটি ভজন-গীতি স্বরলিপি সহ মুদ্রিত। ভজনগুলির রচয়িতা ও সুরসংযোজক লেখক স্বয়ং। সঙ্গীতের বাণী ও সুরের মাধ্যমে লেখকের অন্তরের ভক্তি-ভাবটি সুব্যক্ত। কেবল ভাবভক্তিই নহে, তত্ত্বজ্ঞানের কথাও পদমাধুর্যের সহিত বিধৃত হইয়া আছে, যেমন:

অ-কার উ-কার ম-কার হ'য়ে
আছিস মাগো চরাচরে
আলো আঁধার সকল নীরব
তোর অরূপে ও রূপ ভরে।

অথবা

জীবভাবের এ আমিকে
দেব-ভাবে তরিয়ে দে
পরম ভাবের জ্যোৎস্না-ধারায়
আমারে তুই নাইয়ে নে।

সমালোচকের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়াই কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করা যাইতেছে:

গ্রন্থ-সম্পাদনার ত্রুটি যদিও সংগীতের ক্ষেত্রে একান্তই বহিরঙ্গের ব্যাপার তথাপি উপে-ক্ষণীয় নয়—(ক) 'উৎসর্গে'র প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তিতেই পাঁচটি বানান ভুল এবং উহার শেষের শ্লোকটি ও 'নিবেদনে'র প্রথম শ্লোকটিতে মোট আটটি ভুল। (খ) ভজনের মধ্যে পদচ্ছেদ যথার্থ না হওয়ায় প্রথম পাঠককে অর্থ বুঝিতে

বেগ পাইতে হয়। যেমন : ২৪ নং গানের শেষ পঙ্‌ক্তি 'অনা হতে', ১৭ নং-এ 'মহা প্রাণে', ১৫ নং-এ 'ভাব নায়', ৮নং-এ 'আয়মা' 'যেমা', ৪নং-এ 'অমু ভবের' ও ২৫নং-এ 'দেনা', প্রভৃতি আরও অনেক। (গ) এ-ছাড়া রহিয়াছে বানান-ভুল। অবশ্য এ-জাতীয় ত্রুটিতে সংগীতের মূল্য কমিবে না। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সকল ত্রুটিমুক্ত হইলে গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

শোভন প্রচ্ছদ ও ঝরঝরে ছাপা বইখানির মূল্য বাড়াইয়াছে সন্দেহ নাই। ভক্ত কবির এই ভজনগীতি সকলের নিকট সমাদৃত হউক, ইহাই সমালোচকের প্রার্থনা।

আমার ছোট্ট সমুদ্র : স্বামী শিবানন্দ গিরি। প্রকাশক : শ্রীমতী প্রতিমা কুণ্ডু ; আনন্দম্ প্রকাশন, ২১/২ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। (১৯৭৫), পৃষ্ঠা ৪৩, মূল্য—এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে ষোলটি প্রবন্ধ আছে। অধিকাংশ প্রবন্ধেই লেখক তাঁহার সাধনজীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে রূপ দিয়াছেন। লেখকের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের ভঙ্গিটি সহজ ও সুন্দর। স্থানে স্থানে নিজ বক্তব্যের সপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দের বাণী এবং গীতা, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যে ধর্মের উদার ভাবটিই সর্বসাধারণের জন্য পরিবেশিত। আশা করি সকলে ইহা পাঠ করিয়া প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপক্রমণিকা : শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজী। প্রকাশক : শ্রীশ্রীপতিকুমার ভট্টাচার্য, ১৮/১:, বালিগঞ্জ প্লেস (ঈষ্ট), কলিকাতা-১৯। (১৩৮২), পৃষ্ঠা ১১১, মূল্য দুই টাকা।

স্বামী সন্তদাস বাবাজী মহারাজের প্রণীত এই গ্রন্থখানিতে গীতায় আলোচিত প্রধান প্রধান সকল তত্ত্বই সংক্ষেপে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করিতে গেলে কেবল পণ্ডিতদিগের ভাষা সাধারণতঃ যেমন কঠিন হয়, সাধক ও সিদ্ধপুরুষগণের ভাষা সেইরূপ হয় না। দার্শনিক তত্ত্বসকল সিদ্ধগণের সাধন-মার্জিত চিত্তে স্বীয় বোধের স্পর্শে জীবন্ত রূপ লাভ করিয়া থাকে এবং তাঁহাদের প্রকাশ-ভঙ্গিও তদনুরূপ সাবলীল ও সহজ হয়। আলোচ্য গ্রন্থখানিও ভেদাভেদবাদসম্মত অনুরূপ গীতাব্যাখ্যার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

গ্রন্থখানি যদিও শ্রদ্ধেয় বাবাজী মহারাজের প্রণীত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রারম্ভিক কথা, যাহা গ্রন্থের নামকরণেই প্রকাশিত, তথাপি ইহার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণতা আছে, যে কারণে মূল গীতার সহিত যোজিত না হইলেও ইহা সকল গীতা-প্রেমিকের নিকটই আদৃত হইবে। উপক্রমণিকাটি—গীতার ঐতিহাসিক তত্ত্ব, শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মস্বরূপের বর্ণনা, গীতায় উপদিষ্ট ব্রহ্মতত্ত্ব ও গীতার প্রতি অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশের মর্ম—এই চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায় সুলিখিত এবং তাহা সুদীর্ঘকালব্যাপী গীতা-অনুধানের প্রজ্ঞাসঞ্জাত ফসল বলিয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন। বাহুল্যভয়ে বাবাজী মহারাজের রচনা হইতে উদ্ধৃতি দিবার ইচ্ছাকে সংযত করিতে হইল। অনাড়ম্বর শোভন প্রচ্ছদ সহ মোটা অক্ষরে ছাপা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রী ১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবন-চরিত—(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে) : ডক্টর শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য। প্রকাশক : শ্রীললিতকুমার বসু,

৮৬ ডি, সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪। (১৯৭৩), পৃঃ ৩৩৩, মূল্য ৬'৫০ টাকা।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য রামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ পাঁচটি ভূমির কথা বলিতেন। প্রথম ভূমিতে সাধকের অবস্থা— 'গুরু তীরথ অনুরাগ, বিষয় বিষ কর্ মান' অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি তীব্র বৈরাগ্য এবং স্বীয় গুরুতে ও তীর্থসমূহে অনুরাগ— প্রথম ভূমিলাভের লক্ষণ। শ্রীধনঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজের এই জীবনীটি পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই অল্প বয়সেই নিজ গুরুর প্রতি তাঁহার ভক্তি কত গভীর এবং তীর্থানুরাগ কত প্রবল ছিল। বস্তুতঃ ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সাধনার প্রথম ভূমিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বারবার বলিয়াছিলেন বিশ বৎসর নির্জন স্থানে বাস করিয়া একনিষ্ঠভাবে সাধন-ভজনের দ্বারা যে ফললাভ হয়, তিন বৎসর নির্বিচারে আত্ম-সমর্পণ সহকারে গুরুর আদেশ পালন করিলে তদপেক্ষা অধিক ফললাভ হয়। তাঁহার গুরু-ভক্তি ও সেবাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন— 'তুম্‌হারা খেয়া পার লগ গয়া।'

গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড (পৃঃ ১৫৯—৩১১) তীর্থ-ভ্রমণের কথা লইয়া আরম্ভ হইয়াছে। তীর্থভ্রমণ সাধনারই একটি বিশেষ অঙ্গ। স্থানমাহাত্ম্য শাস্ত্র ও সাধুমহাপুরুষগণ কর্তৃক আবহমান কাল হইতে স্বীকৃত। সুতরাং তীর্থভ্রমণে সাধকমাত্রেরই আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

শ্রীধনঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজ দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহ-দর্শনান্তে উত্তরাখণ্ডের তীর্থগুলি দর্শন করেন। প্রাণের মায়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া তিনি গোমুখী হইতে আরও ৪।৫ মাইল দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্যগণের অনেক তথ্য এই খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। রাজস্থানে সালিমাবাদে শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের এক পীঠস্থান আছে। তথায় উত্তরাধিকারী মনোনীত হইয়া যিনি মোহন্ত হইবেন তিনি বালক হওয়াতে মোহন্ত হওয়ায় অনেক বাধা উপস্থিত হয় কিন্তু শ্রীধনঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজের প্রচেষ্টায় সেই বালকের পক্ষে মোহন্ত-পদে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়। এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় তিনি যাহা ন্যায় ও সত্য বলিয়া বুঝিতেন শত বাধা সত্ত্বেও তাহা হইতে বিচ্যুত হইতেন না। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীক তেজস্বিতার অনুরূপ ঘটনা গ্রন্থটিতে আরও অনেক আছে। বাহুল্যভয়ে উহাদের উল্লেখ করিলাম না।

উপরি-উক্ত গুণাবলীর অতিরিক্ত নিরভি-মানতা তাঁহার চরিত্রকে শ্লাঘনীয় বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে এবং প্রকৃত সাধুর আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত, তাঁহার জীবনের একাধিক ঘটনায় তাহা অভিব্যক্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডে 'সাধনার কথা' শীর্ষক অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধক ও তপস্বী ব্যক্তিরা লোকলোচনের অন্তরালে যে নিভৃত সাধনা করেন, যে-কোন জীবনীকারের পক্ষেই তাহার সন্ধান করা দুঃসাধ্য। লৌকিক দৃষ্টিতে তাঁহাদের জীবনে এমন কিছু হয়তো ঘটে না, যাহাতে তাঁহাদের জীবন আমাদের অনুধ্যানযোগ্য হয়। তাঁহাদের বহির্জীবনের ঘটনাপরম্পরা তাঁহাদের সাধনজীবনের গভীরতাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই অধ্যায়টিতে গ্রন্থকার শ্রীধনঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজের সাধন-জীবনকে উদ্ঘাটিত করিবার সেই দুরূহ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সাধন-জীবনের ক্রমবিকাশ এবং সাধনার বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখিত আছে। গীতোক্ত 'আরুরুক্ষোর্মুনে র্যোগং কর্ম কারণ-মুচ্যতে' হইতে শুরু করিয়া পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ

ও নির্ভরতার ভাবটি কেমনভাবে তাঁহার চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সুপরিস্ফুট করা হইয়াছে। কঠোর নিয়মাবলম্বনে অনেক বৎসর তিনি সাধন করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ মৌন ছিলেন প্রায় ছয় বৎসর। সত্যানুরাগ ত্যাগ ও তপস্যায় তাঁহার চরিত্র অনন্যসাধারণ।

গ্রন্থটিতে আগাগোড়াই নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। ইহা অধ্যাত্ম-পিপাসুদের বিশেষতঃ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অনুরাগীদের নিকট সমাদৃত হইবে। কাগজ ছাপা ও বাঁধাই উচ্চমানের—সে তুলনায় মূল্য কম। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। **শ্রীলোকেন্দ্রনাথ বসু**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব এবং আশ্রম বিদ্যালয়-সমূহের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠান গত ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই ফেব্রুআরি ১৯৭৭, ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

১৩ই পূর্বাহ্নে মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তবপাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও কালীকীর্তন হয়। দ্বিপ্রহরে ছয়সহস্রাধিক দরিদ্র-নারায়ণ, ভক্ত, অতিথি ও কর্মিবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী অসক্তানন্দ এবং ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। সভান্তে 'রামায়ণগান' পরিবেশন করেন শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪ই অপরাহ্নে ছাত্র- ও শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় এবং উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ 'বীর শিবাজী' নাটকখানি মঞ্চস্থ করে।

১৫ই অপরাহ্নে বিদ্যালয়সমূহের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅদিতি-কুমার রায়; প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী জিতাত্মানন্দ। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তীর্থানন্দ তাঁহার প্রতিবেদনে আশ্রমের কার্যসূচী ব্যাখ্যা করেন এবং সর্বসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক আবৃত্তি, সঙ্গীত ইত্যাদি পরিবেশিত হয়। সভান্তে প্রাতঃকালীন বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ 'শবরীর প্রতীক্ষা' এবং 'অভিমন্যুবধ' মঞ্চস্থ করে।

মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২০শে ফেব্রুআরি রবিবার হইতে ২৭শে ফেব্রুআরি রবিবার পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৪২তম পুণ্য জন্মোৎসব বিশেষ আনন্দে ভাবসমৃদ্ধ পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ২০শে জন্মতিথি দিবসে ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি বেদপাঠ ও উষাকীর্তন হয়; পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতপাঠ হয়।

২৫শে সন্ধ্যারতির পর স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ২৬শে মিশন বিদ্যাভবনের বার্ষিক পুরস্কার-সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী প্রভানন্দ। সভায় স্বামীজীর আদর্শে শিক্ষালাভ প্রসঙ্গে স্বামী তীর্থানন্দ স্বামী উমানন্দ শ্রীশিব-প্রসাদ সমাদ্দার এবং শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মণ্ডল ভাষণ দেন। ২৭শে নরনারায়ণ-সেবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় ৫০০০ ভক্ত নরনারী অন্নপ্রসাদ ধারণ করেন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। স্বামী

তীর্থানন্দ সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের অবতরণ ও জগতের কল্যাণসাধন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বামী প্রত্যয়ানন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি সোবার ও শেলাস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২০শে, ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুআরি '৭৭ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ২০শে বিশেষ পূজা হোম 'কথামৃতের' খাসিয়া সংস্করণ হইতে পাঠ, ধর্মালোচনা ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। এই উপলক্ষে খাসিয়া গারো সিণ্টেং বোনাই হাজং মিজো নাগা ইত্যাদি উপজাতির লোকেরা বহু সংখ্যায় আশ্রমগুলিতে সমবেত হয়। সন্ধ্যায় চেরাপুঞ্জি আশ্রমে 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। আশ্রমের পক্ষ হইতে একটি নতুন খাসিয়া বই—'ছবিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন'—প্রকাশিত হয়।

২৪শে চেরাপুঞ্জি আশ্রমে আদিবাসী নাগাগণের এক অনুষ্ঠান হয়। অরুণাচল প্রদেশ ও আশ্রমের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী ইহাতে যোগদান করে। পরদিন চেরাপুঞ্জিতে এক বিশাল মিছিলে ছয়সহস্রাধিক আদিবাসী নারী-পুরুষ যোগদান করে। নাগা ও মিজো যোদ্ধা, খাসিয়া ও গারো নর্তক-নর্তকী, বাঙ্গালী গায়ক, অসমীয়া ও অরুণাচলবাসী নৃত্যগোষ্ঠী শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ মিছিলের সঙ্গে চলে। চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুলের খাসিয়া ছাত্রেরা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ ইত্যাদি সন্ন্যাসীদের বেশে মিছিলে যোগ দেয় বিকালে এক বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন শ্রীমাহান সিং ও চেরাপুঞ্জি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দ।

জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গত ২০শে ফেব্রুআরি ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। মঙ্গলারতি বিশেষ পূজা হোম ও ভজনগানের পর দ্বিপ্রহরে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যারতির পর হিন্দী ও ইংরেজীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী আলোচিত হয়। পরে 'কথামৃত' পাঠ ভজন ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। ২৬শে ফেব্রুআরি, পুরস্কার-বিতরণী সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের আবৃত্তি ভজন ও যোগাসন-প্রদর্শন চিত্তাকর্ষক হয়। সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় তিন হাজার নরনারীর উপস্থিতিতে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ২৭শে ফেব্রুআরি, সন্ধ্যারতির পর সাধারণ সভায় প্রায় তিন হাজার শ্রোতার সমক্ষে টিস্কোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীঅনন্ত ইংরেজীতে সভা-পতির অভিভাষণ দেন এবং স্বামী অকামানন্দ হিন্দীতে ও স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভান্তে চার হাজারেরও অধিক দর্শককে 'সিস্টার নিবেদিতা' ছায়াছবি দেখানো হয়। ২৮শে ফেব্রুআরি, আশ্রমের প্রার্থনা-মন্দিরে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং স্বামী ভর্গানন্দ ভজনগান করেন। প্রসাদ-বিতরণের পর উৎসবানুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুআরি ১৯৭৭, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ২৭শে পূর্বাহ্নে বেদপাঠ ভজন পূজা হোম ও কথামৃত-পাঠ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতি লইয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় পাঁচ

হাজার নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালীন ধর্মসভায় ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী স্বাহুভবানন্দ ও স্বামী প্রভানন্দ। রাত্রিতে ছায়াচিত্রে 'বালক গদাধর' ও 'ভক্ত হরিদাস' প্রদর্শিত হয়। ২৮শে রাত্রিতে শিল্পী শ্রীনিমাই-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামায়ণগান পরিবেশন করেন। পরে রামপুর মাজমুড়া নবনাট্য সঙ্ঘ কর্তৃক 'শিবাজী' যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীশ্রীমায়ের নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন

সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বালিকা বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে গত ২৬শে জানুআরি ১৯৭৭, জগন্মাতা শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দজী। শ্রীশ্রীমায়ের, শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং শ্রীমৎ স্বামীজীর প্রতিকৃতি যথাক্রমে স্বামী কৈলাসানন্দজী, স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী অজপানন্দ মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রস্তরবেদীতে স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে বৈদিক স্তবপাঠ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপারায়ণ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন স্বামী শ্রুত্যানন্দ। মন্দির-উদ্বোধনান্তে স্বামী কৈলাসানন্দজী সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার আশীর্বাদী ভাষণে বলেন :

'শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে পরিচালিত এই পবিত্র আশ্রমে ভক্তদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং সাধুদের সাহচর্যে গত ২২।২৩ বছর ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় তাঁদেরই কাজ চলেছে—ছেলেদের স্কুল হয়েছে, মেয়েদেরও স্কুল হয়েছে এবং আজ এই ক্ষুদ্র অথচ অতি সুন্দর মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হ'ল। অনেক সাধু ও ভক্তের আজ এখানে সমাবেশ হয়েছে। আমি শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম ক'রে প্রার্থনা জানাচ্ছি, এখানকার কাজ যেন খুব সফল হয়।

এক একটি আশ্রমকে দাঁড় করানো—কি কঠিন কাজ, কত অসুবিধা ও বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে যেতে হয়, তা তাঁরাই জানেন, যাঁরা একাজ করেছেন। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুগ্রহ যদি থাকে, সব বিঘ্ন, সব প্রতিবন্ধক দূর হয়ে যায় এবং যাকে আমরা বলি 'পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন', তাও হয়ে যায়।

যাঁরা সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরিচালনা করছেন, শুধু যে তাঁরা নিজেরাই উপকৃত হচ্ছেন তা নয়, যাঁরা এ কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ন'ন, তাঁরাও এখানে এসে অনেকভাবে উপকৃত হচ্ছেন ও হবেন, তাঁদেরও জীবন অতি সুন্দর-ভাবে চলবে। এই সিঁথিতে শ্রীশ্রীঠাকুর এসে-ছিলেন, এখানে তাঁর পূত পদধূলি পড়েছিল—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখানকার কাজ সুচারুরূপে নির্বাহ হবে এবং সকলেরই অশেষ কল্যাণ হবে।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলবার ধৃষ্টতা আমার নেই। কারণ, শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজ, শ্রীশ্রীরাজা-মহারাজ, শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ প্রমুখ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ পার্ষদরাও শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বলতে ভরসা পেতেন না—এমনই অদ্ভুত তাঁর জীবন। যাই হোক, আপনারা সকলে যখন ডেকেছেন, তখন আমাকে দু-এক কথা বলতেই হবে। আমি মায়ের সম্বন্ধে দু'টি কথা বলবো।

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু ক'রে এক বছর ধ'রে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী

উৎসব ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে তখন অনেক গ্রন্থ, প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময়ে এবং তার আগে থেকেও শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে একটু পাঠ করবার এবং যে-সব মহারাজরা শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করেছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে কিছু কিছু শোনবারও সুযোগ হয়েছিল। পড়ে এবং শুনে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে যে দু'টি কথা আমার মনে উঠছে, তাই আজ আপনাদের বলবো।

প্রথম কথা হ'ল ঈশ্বরচিন্তা। ঈশ্বরচিন্তা না করলে মানুষ হয়ে জন্মানো বৃথা- এটা আমি জোর ক'রেই বলবো। ঈশ্বরচিন্তা না করলে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে না—এ কথা আমাদের ধর্মশাস্ত্রে প্রাঞ্জলভাবে বলা হয়েছে :

'ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।'

মানুষ আর পশু, এ দু'এর প্রভেদ কেবল ঈশ্বরচিন্তায়, আর কিছুতে নয়।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও উপদেশ প'ড়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয় যে, ঈশ্বরচিন্তা না করলে জীবনধারণ বৃথা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর মা দক্ষিণেশ্বরে, জয়রামবাটীতে, কামারপুকুরে, কলিকাতায় বা ভারতের তীর্থক্ষেত্রগুলিতে যেখানেই গিয়েছেন সর্বত্র ঈশ্বরচিন্তা নিয়েই জীবন কাটিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ জপ করেছেন। কতো পূজার্চনা, কতো জপ-ধ্যান! উপদেশ দিয়ে, দীক্ষা দিয়ে, আশীর্বাদ ক'রে কতো নরনারীর জীবন ধর্মের খাতে প্রবাহিত করেছেন!

তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, মায়ের এই যে মন্দিরের আজ উদ্বোধন হ'ল—এখানে এসে ঠাকুর মা ও স্বামীজীকে ভক্তিভরে প্রণাম করবেন। নিত্য যদি পারেন তো ভালই, না হ'লে বাড়িতে ব'সেও মনে মনে নিত্য প্রণাম করবেন। অদ্ভুত শক্তি প্রণামের। আপনাদের অশেষ কল্যাণ হবে। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা না থাকলে কেউ তাঁর নাম নিতে পারে না। যতদিন বেঁচে থাকবেন মাকে জীবনের সম্বল করুন।

আর একটি কথা আমি বলবো, তা সকলের রুচিকর হবে কি না জানি না। এই যে এতো ধর্মপ্রতিষ্ঠান দেখছেন—ভারতে এবং ভারতের বাইরে—এগুলি আপনাআপনি হয়নি। বিপুল পরিশ্রম রয়েছে এগুলির মূলে। পৃথিবীর ইতিহাস যদি দেখেন, তো দেখবেন কি জাগতিক ক্ষেত্রে, কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম ছাড়া কোথাও সাফল্যলাভ হয়নি। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের একটা নিয়ম আবিষ্কার ক'রেই শুয়ে পড়েননি। অদম্য উৎসাহ নিয়ে তাঁকে পরিশ্রম করতে হয়েছে। বুদ্ধদেব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁদের সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের সকলকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। অদ্ভুত তাঁদের জীবন! গীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারবার এই কর্ম করার কথাই বলেছেন—কর্মত্যাগের চেয়ে কর্ম করা শ্রেয়স্কর বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে পর্যন্ত কাজ করতে বলেছিলেন। এবং মা-ও সারা জীবন কাজ ক'রে গেছেন। মা নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন কাজ কিভাবে করতে হয়। এতো পরিশ্রম কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি আদর্শ দেখিয়ে গেছেন, আমাদের সেই আদর্শ অনুসারে চলতে হবে। আমার অনেক সময়ে মনে হয় মায়ের উপদেশের দু'টি ভাগ—একটি হচ্ছে ঈশ্বরচিন্তা, অপরটি পরিশ্রম। 'আমি কিছু করবো না' এ বাণী মায়ের বাণী নয়।

আপনারা যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম শুনেছেন,

শ্রীশ্রীমায়ের নাম শুনেছেন, তখন আলস্যের প্রশ্রয় দেবেন না। অক্লান্ত পরিশ্রম করুন। তার ফল দেখে নিজেরাই অবাক্ হয়ে যাবেন। কথা আছে—মলয়ের হাওয়া যখন আসে, বাগানের ফুলগুলি ফুটে ওঠে। আপনাদের হৃদয় হচ্ছে বাগান, সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের বাণীরূপ মলয়ের হাওয়া এসেছে, সমস্ত সদ্‌ভাব যা আজ কোরকাবস্থায় রয়েছে ফুটে উঠবে নিশ্চয়ই।

আমেরিকা থেকে একটি মেয়ে চিঠি লিখেছে আমি তো অবাক্ হলাম তার চিঠি পেয়ে। সে মায়ের ভাবে এতো ভাবিত যে, লিখেছে— 'আমাকে এই আশীর্বাদ করুন, আমি যেন মাকে মা দুর্গা মনে ক'রে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি।' অদ্ভুত ব্যাপার! তাই মায়ের কৃপায় আমরা যদি ঈশ্বরচিন্তা আর পরিশ্রম ক'রে যেতে পারি, শুধু যে আমাদেরই উপকার হবে, তা নয়—সমস্ত বিশ্বের উপকার হবে।

জয় শ্রীগুরুমহারাজজীকী জয়! মহামায়ীকী জয়!! জয় স্বামীজীমহারাজজীকী জয়!!!'

স্বামী কৈলাসানন্দজীর ভাষণের পরে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ভাষণ দেন।* তিনি বলেন :

'আজকে সত্যিই খুব সৌভাগ্যের দিন, মাকে নতুন মন্দিরে বসানো হ'ল এবং পূজনীয় কৈলাসানন্দজী মহারাজ এখানে এসে মন্দিরের উদ্বোধন ক'রে মায়ের সম্বন্ধে আপনাদের কিছু শোনাতে পারলেন।

আমি আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে প্রথম থেকেই জড়িত। সেজন্যে আজ এখানে এসে খুবই আনন্দ হচ্ছে। স্বামীজী যে-ভাবে দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন, আপনারা এখানে সেইভাবেই শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য-আশ্রম থেকে শিক্ষিত হ'য়ে গার্গী মৈত্রেয়ীর মতো মহীয়সী নারীরা বেরিয়েছিলেন; বহু মেয়ে ঋষির নাম পাবেন বেদের মধ্যে। তাঁদের যে-প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হ'ত, সেই আদর্শ শিক্ষা-প্রথায় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক—এই দুই শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিল। এক সঙ্গে এই দুই শিক্ষার কথা স্বামীজী বারবার ব'লে গেছেন। নিত্য নিয়মিতভাবে সকালে ও সন্ধ্যায় অন্ততঃ দু'বার ক'রে ভগবানের চিন্তা প্রাচীন ভারতের শিক্ষার অঙ্গ ছিল। এটি অবশ্য যদিও আবাসিক প্রতিষ্ঠান নয়, তবু এখানে এই মন্দিরে মেয়েরা প্রতিদিন এসে প্রার্থনা ক'রে কিছু সময় সৎ-চিন্তায় কাটাবে এবং যাঁরা শিক্ষয়িত্রী আছেন, —আমি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করছি—তাঁরা যেন মেয়েদের পবিত্রতার ভাব এবং তামসিকতা অলসতা কাটিয়ে ওঠার ভাব—যে-কথা পূজ্যপাদ মহারাজজী বললেন এ দু'টির ওপর জোর দিয়ে শিক্ষা দিতে আন্তরিক চেষ্টা করেন।

আধুনিক শিক্ষা এবং প্রাচীন ভারতের যে শিক্ষা—এ দু'টিই চাই। পাশ্চাত্য জগৎ থেকে জ্ঞান ও কর্মকুশলতা এখানকার মেয়েরা আহরণ করবে, অথচ তার সঙ্গে ভেতরটা তাদের হবে ভগিনী নিবেদিতারই মতো সদা পবিত্র, সর্বক্ষণ ভগবদ্‌ভাবে পূর্ণ এবং শ্রীশ্রীমায়ের ওপর একান্ত নির্ভরশীল।

মা ঠাকরুন হচ্ছেন অবলম্বন। তিনি সাক্ষাৎ ভগবতী ছিলেন। ঠাকুর বলেছেন, 'ও সরস্বতী'। স্বামীজী তাঁকে বলেছেন 'জ্যান্ত দুর্গা'। মা

* এই সংবাদের অন্তর্ভুক্ত উভয় ভাষণই শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। সংক্ষেপিত আকারে মুদ্রিত।—সঃ

নিজেও বলেছেন, তিনি কালী, রাধা। 'রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখলেন ?'—প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেন, 'বাবা, যেমনটি রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন।' অর্থাৎ সীতাদেবী হ'য়ে যখন এসেছিলেন, তখন যেমনটি বসিয়ে গিয়েছিলেন তেমনটিই আছেন। অথচ দুটি পাগলকে নিয়ে তাঁর সংসার—অশান্তির সংসার যাকে বলে। তবু তিনি বলেছেন, 'আমি অশান্তি ব'লে তো কখনো কিছু দেখলুম না।' আর ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অজস্র কাজ ক'রেও কাজকর্মের জন্যে ভগবানের চিন্তা করবার, জপ-ধ্যান করবার সময় পাই না, একথাটি বলবার অবকাশটুকুও রেখে যাননি। প্রচণ্ড কাজের মধ্যেও নিত্য একলক্ষ বার নামজপ করেছেন। বাস্তবিকই সমস্ত কর্মকোলাহলের মধ্যে কিভাবে মনের প্রশান্তি বজায় রাখা যায়, কিভাবে ভগবানে মন রাখা যায়, তা তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আপনাদের তিনি আদর্শ। তিনি আজ নতুন মন্দিরে বসলেন। এই উপলক্ষে পূজ্যপাদ কৈলাসানন্দজী মহারাজ যে প্রার্থনাটি করলেন, সেটি নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবে না, আমিও মায়ের কাছে সেই প্রার্থনাই করছি, মায়ের কৃপায় আপনারা যেন মেয়েদের বাইরের শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আদর্শ অবলম্বন ক'রে তাদের যথার্থ মহীয়সী মহিলা হ'য়ে ওঠার শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তুলতে পারেন।'

বৈকালে দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদামঠের প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা বালিকা বিদ্যালয়ের নব-নির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। তিনি এবং শ্রীযুক্তা সত্যবতী রায় চৌধুরী মেয়েদের কর্তব্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণে বিশদ আলোচনা করেন।

প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র দে বলেন যে, সিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ জনগণের নিঃস্বার্থ সেবার উদ্দেশ্যে বিগত ২২।২৩ বৎসর বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত আছে। তন্মধ্যে বালকদের জন্য একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৬৫ সালে এবং বালিকাদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৯৭৫ সালে স্থাপিত হইয়াছে।

সঙ্ঘ-সহসভাপতি শ্রীশিবপদ মুখোপাধ্যায় সমবেত সাধু ও ভক্তবৃন্দকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উৎসব

দোমড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৬, মঙ্গলারতি প্রভাতফেরি বিশেষ পূজা ও হোম, প্রায় ২,৫০০ নরনারায়ণের মধ্যে প্রসাদবিতরণ, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা এবং মাতৃসঙ্গীত-পরিবেশনের মাধ্যমে জগন্মাতা শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি পালিত হয়।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক বিগত ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৬, পরিষদ-প্রাঙ্গণে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা সারদা-দেবীর আবির্ভাব-উৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্ণে স্তব প্রার্থনা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীপাঠ কথামৃতপাঠ এবং পূজা ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে সমবেত ভক্তমণ্ডলী ও উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে ভক্তিমূলক সংগীতের পর ধর্মসভা শুরু হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষে একটি বিরাট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাহির হয়। পূজনীয় ভূতেশানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। সারদা সঙ্ঘের সদস্যাবৃন্দ সমাপ্তি-সংগীত পরিবেশন করেন।

বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ১২১তম জন্মতিথি উপলক্ষে গত ২রা পৌষ, ১৩৮৩ (ইং ১৭. ১২. ৭৬) হইতে পাঁচদিনব্যাপী আনন্দোৎসব বিবিধ ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

প্রথম দিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজার্চনা ও হোম, স্তব-স্তুতি-আবৃত্তি, শিবমহিম্নঃ-স্তোত্রপাঠ, দোহারিয়া সংঘ কর্তৃক ভজন-সঙ্গীত প্রভৃতি হয়। পূর্বাহ্ণে বারাসত রাষ্ট্রীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে রক্ষিত মহাপুরুষজীর (বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র) প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এবং সমবেত শিক্ষক ছাত্র ও ভক্ত নরনারীগণের উদ্দেশে সময়োপযোগী বক্তৃতা দেন আশ্রমের সম্পাদক শ্রীহেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। পরে আশ্রম-প্রাঙ্গণে শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত স্বামী শিবানন্দের পুণ্য জীবন ও বাণীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ভাষণ দেন। মধ্যাহ্নে সমবেত ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের বিদ্যার্থিগণ রাম-নাম-সংকীর্তন এবং প্রেমিক-গোষ্ঠী 'মহাপুরুষ শিবানন্দ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। বৈকালীন ধর্মসভায় স্বামী জীবানন্দ শ্রীপাঁচু-গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহাপুরুষ মহারাজের দিব্য জীবন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন
ভট্টাচার্য ধন্যবাদ দেন।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত-সহযোগে কৃষ্ণার্জুন নাটকাভিনয় করেন। সন্ধ্যায় শ্রীরথীন্দ্র ঘোষ লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন। তৃতীয় দিন পূর্বাহ্ণে আশ্রম-প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা সুসজ্জিত সিংহাসনে স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সারদা-দেবী স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী শিবানন্দের বৃহৎ প্রতিকৃতিচতুষ্টয় সহ ভজন-সঙ্গীত ও কীর্তন গাহিতে গাহিতে বারাসত শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল বারাসত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যাণ্ডপার্টি। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার মিলন সংঘ, বারাসত নবপল্লীর সত্যভারতী বাণীনিকেতন, দোহারিয়া রামকৃষ্ণ ভজন সংঘ, বনমালীপুর প্রিয়নাথ ইনস্টিটিউশন এবং অশ্বিনী পল্লী উচ্চ বিদ্যালয়ের সদস্য ও বিদ্যার্থিগণ তাঁহাদের প্রতীক-চিহ্ন বাণী ও সঙ্গীত সহ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নে সমবেত সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্ণে শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃত এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শিবানন্দ-উপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের পরিচালনায় শহরের বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের মধ্যে স্বামী শিবানন্দের জীবন ও বাণী বিষয়ে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার-বিতরণ হয়। সভাপতি স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ পুরস্কার বিতরণ করেন এবং বক্তৃতা দেন রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক 'শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয় এবং শিবানন্দ গিরি দলবলসহ লীলাকীর্তন করেন।

চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে অভয় রায় এবং নিমাই ও কাশীনাথ দাস 'সাধক রামপ্রসাদ' বিষয়ে সঙ্গীতসহ কথকতা করেন। সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে 'ঠাকুর হরিদাস' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। পঞ্চম দিন অপরাহ্ণে সৌমিত্র ঘোষাল ও তাঁহার সম্প্রদায়ের ভজন-সঙ্গীত এবং শ্রীঅরুণ বিশ্বাসের 'শবরীর প্রতীক্ষা' রামায়ণগান হয়।

খুলনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নব-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে ১লা জানুআরি ১৯৭৭, শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্পতরু দিবস উপলক্ষে পাঠ ভজন কীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণ হয়।

১২ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের শুভ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি বিশেষ পূজা ও হোমাদি হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় সহস্রাধিক নরনারায়ণকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় স্বামী কালিকানন্দ শ্রীমতী দীপ্তি মুখার্জি কুমারী মুকুলিকা আইচ ও শ্রীকমলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেন। সকাল হইতে বৈকাল পর্যন্ত ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

১৫ই জানুআরি সঙ্ঘের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির-প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে পাঠ আলোচনা ভজন ও রামায়ণ-গান হয়। শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহা পালাকীর্তন পরিবেশন করেন।

রায়গঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১২ই জানুআরি ১৯৭৭, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি বিশেষ পূজা হোম ভজন কীর্তন পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি উষাকীর্তন বিশেষ পূজা হোম শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ গীতাপাঠ কথামৃতপাঠ কালীকীর্তন প্রভৃতি হয় এবং প্রায় এক হাজার নরনারীকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

কাশীপুর বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি কর্তৃক ১২ই ১৩ই ও ১৪ই জানুআরি ১৯৭৭, স্তোত্রপাঠ বিশেষ পূজা ভজন ও ধর্মসভার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ চিত্রাঙ্কন এবং স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' অবলম্বনে রচনা-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ধর্মসভায় ভাষণ দেন সভানেত্রী ডঃ রমা চৌধুরী ও প্রধান অতিথি স্বামী তীর্থানন্দ। শাহানার শিল্পিবৃন্দ সংগীত পরিবেশন করেন। ১৩ই পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতি শ্রীনির্মাল্য কুমার মুখোপাধ্যায় দুঃস্থ ও বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। আয়রনম্যান নীলমণি দাসের যৌগিক ব্যায়াম ও পরে 'সুভাষচন্দ্র' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। তৃতীয় দিনে লোকরঞ্জন শাখার শিল্পিবৃন্দ 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য এবং রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের প্রযোজনায় 'ভগিনী নিবেদিতা' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। শ্রীসবিতাব্রত দত্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পরলোকে

বিগত ২১শে অক্টোবর ১৯৭৬, বৈকাল ৪-৪৫ মিনিটে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান **রাধিকামোহন নন্দী** ৮৭ বৎসর বয়সে যাদবপুরে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন।

১৯১৯ সালে কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে তাঁহার দীক্ষা হয়। তিনি সারাজীবন নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ অনুসারে চলিয়া-ছিলেন। তাঁহার সরল ও প্রশান্ত অন্তঃকরণের জন্য তিনি ভক্তসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেন।

দেহত্যাগের প্রায় এক বৎসর পূর্বে তাঁহার শরীর খুবই অসুস্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তাঁহার বাঞ্ছিত অনুভূতিসকল না হওয়ায় মনে খুবই নৈরাশ্য দেখা দেয়। কিন্তু দেহত্যাগের দুই মাস পূর্বে তাঁহার মনের প্রশান্তি ফিরিয়া আসে এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানা যায় যে, তখন তিনি মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভ করিতেছিলেন। শরীরত্যাগের অল্প কিছুক্ষণ পূর্বেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, তখন তাঁহার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ভবেন্দ্রনাথ গুণিন্** গত ২৯শে ফাল্গুন ১৩৮৩ (ইং ১৩ই মার্চ, ১৯৭৭) সন্ধ্যায় সজ্ঞানে ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে পরলোক-গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের যথাসাধ্য সেবা করিয়াছেন এবং পল্লীবাসীদের ভিতর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারাপ্রচারে, পল্লীসঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠায় ও বহু জনহিতকর কার্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ মৎস্য-ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সদানন্দ স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মার চিরশান্তি বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

গভীর দুঃখের বিষয়, 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট **মৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী** হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১৯শে মার্চ ১৯৭৭, সকাল ৭-৩৫ মিনিটে ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সর্বাধিকারী পরিবারের বিশিষ্ট অবদানের কথা সুবিদিত। সেই বনিয়াদী বংশে ১৯০৫ সালে কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলায় এম. এ. পাস করেন এবং বারাণসী হইতে 'সাহিত্যবিশারদ' উপাধি লাভ করেন। বারো বৎসরেরও অধিক-কাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। তাহার পর ডক্টর শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে প্রায় বিশ বৎসর আশুতোষ কলেজ ও যোগমায়াদেবী কলেজে অধ্যাপনা করেন। প্রায় তিন বৎসর কাকদ্বীপস্থ সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭২ হইতে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত তিনি সুরেন্দ্রনাথ কলেজসমূহের অধ্যক্ষ-সমিতির কর্মসচিব ছিলেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মনের খেলা' (উপন্যাস), 'মর্মমুকুর' (কাব্য) ও 'মার্তণ্ড রায়ের থিয়োরী' (ছোট গল্প-সংগ্রহ) স্মরণীয়। প্রথম দুইটি গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রশংসাধন্য। পরবর্তী কালে তিনি অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে 'মাতৃভাষা বিচিত্রা' ও 'ভাষাতত্ত্ব ও প্রবন্ধবিচিত্রা' উল্লেখযোগ্য।

জীবনের শেষ এক বৎসর তিনি 'উদ্বোধন'-পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকিয়া নিঃস্বার্থ সেবা করিয়া গিয়াছেন। এইকালে তাঁহার সহজাত ধর্মভাবের সবিশেষ স্ফুরণ হয়। কয়েক মাস পূর্বে তিনি দুইবার জয়রামবাটী ও কামারপুকুর দর্শনে যান এবং প্রতিবারেই কয়েক দিন উভয় মহাতীর্থে পরমানন্দে অতিবাহিত করেন। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিকৃতিদ্বয় স্বগৃহে স্থাপন করিয়া তিনি প্রত্যহ দীর্ঘ সময় স্তবস্তুতি প্রার্থনা জপধ্যানাদিতে নিমগ্ন থাকিতেন।

আদর্শ শিক্ষাব্রতী, নির্ভীক অথচ নিরহঙ্কার এই ধর্মপ্রাণ মানুষটির দেহনির্মুক্ত আত্মা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও জগন্মাতা শ্রীসারদা-দেবীর শ্রীপাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] ১লা পৌষ। (১৩০৬ সাল) [২৩শ সংখ্যা।]

রামকৃষ্ণ মিশন।

একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারিণী ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিউইয়র্ক হইতে নবেম্বরের প্রবুদ্ধ ভারতে লিখিতেছেন,—

স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায় তিন সপ্তাহ হইল আমেরিকায় আগমন করিয়াছেন—পুরাতন বন্ধুরা তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের স্বাস্থ্য অনেকটা ভাল আছে। নবাগত তুরীয়ানন্দ স্বামীর প্রতি সকলেই ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন। ইঁহারা এক্ষণে নিউইয়র্ক রাজ্যের একটী পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি তুরীয়ানন্দ স্বামী নিউইয়র্ক হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী নিউ জারসি প্রদেশস্থ মণ্টক্লেয়ার নামক স্থানে সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এখানে তিনি বেদান্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন। স্বামী অভেদানন্দ, তাঁহার গুরুভাইগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রায় দশ দিবস তাঁহাদের সহিত অবস্থান করিয়া অদ্য মাসাচুসেট্‌স্থ ওয়ারসেষ্টার নগরে যাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ১লা অক্টোবর নিউইয়র্কে তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। সিষ্টার নিবেদিতা অদ্য ইংলণ্ড হইতে নিউইয়র্কে পঁহুছিয়াছেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে, তুরীয়ানন্দ স্বামী রিজ্‌লি ম্যানর হইতে পত্র লিখিতেছেন,—

আমরা ইংলণ্ডে এক পক্ষ মাত্র ছিলাম। স্বামীজির অনেক বন্ধুবান্ধব তখন বাহিরে থাকাতে আমাদের আমেরিকায় আসাই স্থির হয়। গ্লাসগো হইতে জাহাজে চড়িয়া ১১ দিনে নিউইয়র্ক পঁহুছান গেল। এখানে মিষ্টার লেগেট্‌ নামক স্বামীজির এক বন্ধুর গৃহে আসিলাম। আমেরিকা মহা স্বাধীনতার দেশ, তবে আমি ইহা এখনও ভালরূপ দেখি নাই। সেই দিনই বৈকালে নিউইয়র্ক হইতে :৫০ মাইল দূরবর্ত্তী এক পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইলাম। এখানে যাঁহার গৃহে আছি, তিনি অতি ভদ্রলোক—গৃহস্থ ; সপরিবারে স্বামীজির ভক্ত।...আমি এখনও কোন কার্য্য আরম্ভ করি নাই। স্বামীজির সঙ্গেই রহিয়াছি। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল, তবে মধ্যে মধ্যে একটু শরীর খারাপ হয়। তিনি এক্ষণে একজন বিখ্যাত অষ্টিওপ্যাথ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছেন। স্বামী অভেদানন্দকে ৩ বৎসর পরে দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। তিনি একজন খুব উচ্চদরের বেদান্তপ্রচারক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন — অনেক বড় বড় কাজ করিয়াছেন। তিনি এই বৎসর নিউইয়র্কে একটী স্থায়ী বেদান্ত-সমাজ স্থাপন করিতে যাইতেছেন।

স্বামী সারদানন্দ কলিকাতা, বাগবাজার, ৫৭ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে রামকৃষ্ণ মিশন সভায়, গত ১৯শে ও ২৬শে নবেম্বর এবং ৩রা ডিসেম্বরে যথাক্রমে "উপরতি বা চিত্তাবর্ত্তন", "ধারণা" এবং "ধ্যান" সম্বন্ধে তিনটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

সম্প্রতি ভাগলপুরে বন্যা হওয়ায়, অনেকে ভয়ানক কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহাদের যথাসাধ্য সাহায্যার্থ, মুর্শিদাবাদ-অনাথাশ্রম হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দ তথায় গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার সাহায্যার্থ মঠ হইতে স্বামী সদানন্দ ভাগলপুরস্থ ঘোঘা নামক স্থানে যাইয়া অনেক কার্য্য করিয়াছেন।

স্বামী শিবানন্দ দার্জ্জিলিঙের ভীষণ ল্যাণ্ডস্লিপে অনাথ ও নিরাশ্রয়গণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। তথাকার সরকারী উকিল—বহুমান্যবর মিষ্টার এম. এন. ব্যানার্জ্জি, এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, ইহার নিমিত্ত অনেক চাঁদা তুলিয়াছিলেন। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি নিজের বাটীর সম্মুখে অনেকগুলি নিরাশ্রয় ও অনাথকে লইয়া আসিয়া স্বহস্তে দুগ্ধ ও বস্ত্র বিতরণ করেন। শুনা গেল নাকি, ছোটলাট বাহাদুর উক্ত সৎ ও মহৎ কার্য্যের জন্য মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে বহু ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

বেদান্ত-সূত্রের

রামানুজভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

[সানুবাদ মূলভাষ্যের কিয়দংশ—বর্ত্তমান সম্পাদক]

১ম বর্ষ।] ১৫ই পৌষ। (১৩০৬ সাল) [২৪শ সংখ্যা।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ)

১। জল সব নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান করা যায় না। সকল স্থানে ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু সকল জায়গায় যাওয়া যায় না। যেমন কোন জলে পা ধোওয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোওয়া যায়, কোন জল বা খাওয়া যায়, আবার কোন কোন জল ছোঁয়া পর্য্যন্ত যায় না, তেম্নি কোন কোন জায়গায় যাওয়া যায় ও কোন কোন জায়গার দূর থেকে গড় করে পালাতে হয়।

২। বাঘের ভিতরও ঈশ্বর আছেন সত্য বটে, কিন্তু বাঘের সুমুখে যাওয়া উচিত নয়। কু-লোকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কু-লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

৩। গুরু এক শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে বল্লেন, সকল পদার্থই নারায়ণ, শিষ্যও তাই বুঝ্‌লেন। একদিন পথের মধ্যে একটা হাতী আস্‌ছিল, উপর হতে মাহুত বল্লে "সরে যাও"। শিষ্য ভাব্‌লে, আমি সরে যাব কেন? আমিও নারায়ণ হাতীও নারায়ণ. নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভয় কি? সে সরল না। শেষে হাতী শুঁড়ে ধরে তাকে দূরে ফেলে দিলে, তাতে তার বড় ব্যথা লাগ্‌ল। পরে সে গুরুর কাছে এসে সমস্ত ঘটনা জানালে। গুরু বল্লেন, ভাল বলেছ, তুমিও নারায়ণ হাতীও নারায়ণ, কিন্তু উপর থেকে মাহুত রূপে নারায়ণ তোমাকে সাবধান হতে বলেছিল, তুমি মাহুতনারায়ণের কথা শুন্‌লে না কেন?

৪। বড় বড় বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে আসে, তখন কত লোক তার উপরে চড়ে চলে যায়। তাতে সে ডোবে না। সামান্য একখানা কাঠে একটা কাক বস্‌লে অম্নি ডুবে যায়। তেম্নি যখন অবতারাদি আসেন, কত শত লোকে তাঁকে আশ্রয় করে তরে যায়। সিদ্ধ লোক নিজে কষ্টে সৃষ্টে যায় মাত্র।

৫। রেলের ইঞ্জিন্‌ আপ্‌নি চলে যায় ও কত মাল বোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়; অবতারেরাও সেই রকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যান।

বেদান্ত ও ভক্তি।

(স্বামী সারদানন্দ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি ॥১

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥২

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌। তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩

ঊর্দ্ধমূল অবাক্‌শাখ এই সংসারাশ্বত্থের দুই শাখায় দুইটি পক্ষী বসিয়া রহিয়াছে। দুইটিই সুন্দর এবং চিরপ্রেমে পরস্পর আবদ্ধ। তাহাদের একটি সুখদুঃখময় ফলভোগে ব্যস্ত, 'আমি আমার' জ্ঞানে নিরন্তর মোহিত ও ব্যথিত, অপরটি আপনার মহিমায় দীপ্তিমান, ভোগে আদৌ দৃষ্টি নাই। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখনই প্রথমটি ফলভোগের বাঞ্ছা ছাড়িয়া দেয়, অমনি অপরটির হিরণ্ময় রূপ এবং কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহিমা তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। আর তাহাকে সুখদুঃখ, পুণ্য-পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। কামকাঞ্চনের আবরণে তাহার অঞ্জনরহিত চক্ষু আর কখনও আবৃত হয় না। অনিত্যের মধ্যে সেই একমাত্র নিত্য পদার্থের, বহুর মধ্যে সেই একের উপলব্ধি করিয়া সে আপনাকে ও সকলকে সেই এক বলিয়াই ধারণা করে এবং পরম সমতা ও শান্তি লাভ করে।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা—দুইটী পক্ষী।

বাস্তবিক মনুষ্য কখনও ভগবান হইতে দূরে অবস্থিত নয়। নীচ সঙ্গে, নীচকর্ম্মে সে যতই নীচগামী হউক না কেন, তাহার দৃষ্টি সেই হিরণ্ময় পুরুষের 'সূর্য্যকোটিপ্রতিকাশ' রূপ হইতে কখনই একেবারে বঞ্চিত নয়। সংসারের দুঃখযন্ত্রণায় অস্থির হইলেই সে দেখিতে পায়। রোগ শোকে অভিভূত হইলেই সে উপলব্ধি করে। নতুবা শিক্ষাবিহীন, হিংসাজীবন ঘোর স্বার্থপর বন্যের ভিতর কোথা হইতে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হয়? অন্ধতমসাবৃত তাহার জীবনে কোথা হইতে শ্রদ্ধার আলোক উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে স্বার্থপরতার রজনী অপসৃত করে? ধূমকেতু হইতেও অনিয়তগতি তাহার চরিত্রে কোথা হইতে সমাজবন্ধন, বিবাহবন্ধন, স্বজনস্নেহ, দেশহিতৈষিতা ইত্যাদি উপস্থিত হইয়া পরিশেষে জগতের মঙ্গলকামনায় তাহাকে নিযুক্ত করে? কেনই বা সে উদয়োন্মুখ সূর্য্যের, শৃঙ্গবিদারী বজ্রের, বিশেষ শক্তিমৎ পদার্থের বা পরলোকগত আত্মার সম্মুখে অবনতজানু, অবনতমস্তক হয়? বলিবে অজ্ঞতা, বলিবে কুসংস্কার; বলিবে কুহকিনী কল্পনার মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া মানুষ ভৌতিক জড়শক্তিতে চেতনের ইচ্ছাময়ী লীলার তরঙ্গভঙ্গ আরোপিত করে, বলিবে ভয়ে বা ভালবাসায় অথবা অদ্ভুত স্বপ্নরাজ্যে—যেখানে দৃষ্ট অদৃষ্ট কত লোকের সহিত মিশামিশি; আলোক ও আঁধারের বিচিত্র মিলনে, স্পষ্ট, ঈষৎব্যক্ত, অপরিস্ফুট ও অব্যক্ত ছায়াময়ী মূর্ত্তিসকল, ছায়ার জগতে, ছায়ার নাম ধাম ও সম্বন্ধ পাতাইয়া, জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয় অথচ প্রখর জ্ঞানসূর্য্যের কিরণবিস্তারে কোথায় সরিয়া দাঁড়ায়—সেই স্বপ্নরাজ্যে প্রথম মানবের মনে শ্রদ্ধা ও ধর্মের বীজ অঙ্কুরিত হয়। সত্য, ধ্রুবসত্য হইলেও একথা 'ধর্মের মূল কোথায়' এ প্রশ্নের সম্যক্ তলস্পর্শ করিতে পারে না। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে কি কখন উন্নতির দ্বার খুলিয়া দেয়? কল্পনা কি কখন যথার্থ সত্য প্রসব করে? তবে ইহার নিঃসংশয় উত্তর কোথায়? মানুষের ভিতর অদম্য অনন্ত শক্তি কুণ্ডলী আকারে নিবদ্ধ। জন্ম জরা মৃত্যুও সে শক্তির নিকট পরাহত। অনন্ত বাধা বিঘ্ন ভেদ করিয়া দেশকালের সীমা অতিক্রম করিয়া 'অবাঙ্‌মনসগোচর' রাজ্যে সে শক্তির প্রখর দৃষ্টি ছুটিতে সক্ষম। তজ্জন্যই সে সেই নিত্য পদার্থের কিছু না কিছু রূপের ছায়া সকল বস্তুতে দেখিতে পায়। তজ্জন্যই সে অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলিয়া ধারণা করে, এবং যে মুহূর্ত্তে মানব সেই মহাশক্তির সঞ্চালনে, পূর্ণ সত্যের দর্শনে ঠিক ঠিক বাঞ্ছা করিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সংসারবৃক্ষের উচ্চ শাখায় অবস্থিত, হিরণ্ময়বপু, আদি কবির সত্য ও পরিপূর্ণস্বরূপের অবাধ দর্শন লাভ করিবে। জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র এই কথাই একবাক্যে ঘোষণা করিতেছে। হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ, বৌদ্ধের ত্রিপিটক এবং খৃষ্টানের বাইবেলে এখানে মতভেদ নাই। কোন্ পথে অগ্রসর হইলে এই চরমোন্নতি লাভ করা যায়, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। স্বর্গ ও সৃষ্টির বর্ণনায় মুক্তি ও মানবাত্মার তৎকালীন অবস্থাবিষয়ে মতভেদ বিস্তর। কিন্তু মানব যে পূর্ণানন্তস্বরূপ হইতে কিছুকালের জন্য এই আপাত অপূর্ণ স্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং ধীরে ধীরে পুনরায় সেই পূর্ণানন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এ বিষয়ে সকলের একবাক্য। ভক্তি বল, যোগ বল, জ্ঞান বল, কর্ম্ম বা নীতি বল, এ বিষয়ে সকলের এককথা। জগতের যাবতীয় পুরাণসকলও রূপকের পল্লবিত ভাষায় মানবকে এই

অজ্ঞানাবরণের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ।

মূল বিষয়ে সকল শাস্ত্রই অভেদ।

কথাই উপদেশ করিতেছে। দেশীয় পুরাণসমূহের কথা তো ছাড়িয়াই দি, বিদেশী য়াহুদী পুরাণ বাইবেলেও অগ্রেই বলিতেছে—প্রথম মানব নিষ্পাপ, পরিপূর্ণস্বরূপ হইয়া জন্মিয়াছিল; ভগবানের আজ্ঞা অবহেলায় সেই স্বরূপ হইতে চ্যুত হয়; আবার তাঁহার কৃপায় সেই স্বরূপ লাভ করিবে। এখনও যাবতীয় য়াহুদী নরনারী রামধনুর বিচিত্র আবরণে এই আশাপ্রদ কৃপাবাক্য ভক্তিগদ্‌গদ হইয়া পাঠ করে। "নিষ্পাপ হও, ভগবদ্ভক্তি বা জ্ঞানলাভে নিরঞ্জনত্ব লাভ কর" একথা ভক্তি বা জ্ঞানশাস্ত্র উভয়েই একবাক্যে বলিতেছে। "কাঁচা আমিকে পাকা করিয়া লও; ইন্দ্রিয়সংযম ও স্বার্থত্যাগ করিয়া পরার্থ চেষ্টা কর; ভগবানে অচল অটল বিশ্বাস ও নির্ভর রাখ"—একথা ভক্তি ও বেদান্ত উভয়েই একতানে ঘোষণা করিতেছে। তবে আর মূলবিষয়ে বিরোধ কোথায়?

বলিবে, কথার বিবাদ মিটিলেও মিটিতে পারে। ভালবাসা ও সহানুভূতিতে পরকে আপনার করিয়া লইয়া তাহার চক্ষে, তাহার ভাবে তাহার ধর্ম্ম ও ভাষার অনুশীলনে, কথার বিবাদ একদিন মিটা সম্ভব। কিন্তু পথের বিবাদ যে অতি বিষম। উহা মিটাইবার উপায় কি? কেহ তো কাহার পথ ছাড়িবে না। আবার পথ ছাড়িলেই বা তাহার ধর্ম্মের উপায় কি? তাহার ধর্ম্ম তো এককালে মিথ্যাই প্রতিপন্ন হয়। আবার এক ধর্ম্ম মিথ্যা হইলে অপর ধর্ম্মসমূহ যে সত্য, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? পরিশেষে ধর্ম্ম বৃদ্ধাস্ত্রীজল্পনা মাত্র এবং নাস্তিকতাই শ্রেয়ঃ এই ধারণা অনিবার্য্য হইবে।

পথের বিবাদ মিটিবে কিসে?

না, পথের বিবাদ মিটিবারও উপায় আছে। ভারতের পূর্ব্বতন ঋষি ও আচার্য্যপাদেরা এ বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মজগতে যে তাঁহাদের দৃষ্টি নামরূপের বিঘ্ন বাধা ভেদ করিয়া যথার্থ সত্যের পরিপূর্ণ স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হইয়াছিল, ইহাতেই তাহা প্রতীয়মান হয়। ইহাই তাঁহাদের প্রাতঃস্মরণীয় উজ্জ্বল গরিমা। ইহাই ধর্ম্মবীরপ্রসবিনী অবতারবহুল, পুণ্যভূমি ভারতের জাতীয় গৌরবের একমাত্র অত্যুচ্চ ধ্বজা। স্বদেশপ্রাণতা, সমাজবন্ধন, রাজনীতি, ব্যবহারব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধান, গৃহরক্ষা, বাণিজ্য এবং যুদ্ধবিগ্রহাদি শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদিগকে অবনতমস্তকে ইয়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহকে গুরুস্থানীয় স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আত্মা, পরলোকবাদ, ধর্ম্মসমন্বয়, ধর্ম্মপ্রাণতা, গুরু ও ইষ্টনিষ্ঠা এবিষয়ে আমাদের ঋষি ও আচার্য্যগণ এখন এবং নিত্যকাল জগতের পূজ্য ও গুরুস্থানীয় থাকিবেন; এখন এবং চিরকাল তাঁহাদের আশাপ্রদ, অমৃতময়ী ঔপনিষদিক বাণী সর্ব্বদেশের নরনারীর চক্ষুপ্রান্ত হইতে কামকাঞ্চনের যবনিকা উত্তোলন করিয়া অভয় আনন্দস্বরূপকে দেখাইয়া দিবে; এখন এবং নিত্যকাল তাঁহাদের সেই 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং' গম্ভীর নিনাদে বিষয়ের কোলাহল গুম্ভিত করিয়া নরনারীর প্রাণমন মহাবেগে অনন্ত আনন্দের দ্বারে উত্তোলিত করিবে। সেই 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—বহুনাম ও বহুপথ সেই এক নিত্য বস্তুর দিকেই প্রবাহিত হইতেছে, চিরকাল এই শিক্ষা নরনারীকে প্রদান করিবে।

একই গঙ্গা হিমাচলের নীহাররাশি ভেদ করিয়া, শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে, তথা হইতে শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্রে, 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সাগরসঙ্গমে প্রবাহিত। শত শত লোক শত

শত তীর্থে সেই জলে স্নান পান করিতেছে। সকলেই নিজ নিজ সন্নিকট তীর্থেই যাইতেছে। বহুতীর্থ হইলেও সকলে সেই একই 'গাঙ্গং বারি মনোহারি' স্পর্শে পবিত্র হইতেছে। বহুতীর্থ বলিয়া তো বিবাদ হইতেছে না। তবে ধর্ম্মজগতে পথ লইয়াই বা এত বিবাদ কেন? পথসকল 'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে' সেই এক অখণ্ড চিদানন্দসাগরে মিশিতেছে। এইজন্যই ঋষিরা স্বধর্ম্ম ও ইষ্টনিষ্ঠার উপদেশ করিয়াছেন।

বিবাদ মিটাইবার উপায়,—স্বধর্ম্ম ও ইষ্টনিষ্ঠা।

মানুষের প্রকৃতি ও মন ভিন্ন ভিন্ন। গাছের একটি পাতা যেমন অপরটির সহিত মেলে না, হাতে একটী অঙ্গুলীর যেমন অপরটির সহিত বিশেষদৃষ্টিতে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না, সেইরূপ একটি মনের সহিত অপর একটি মনের সর্ব্ববিষয়ে সমতা নাই। প্রত্যেকটির জন্মজন্মান্তরীণ কর্ম্মজনিত সংস্কারোপযোগী বিভিন্ন গঠন ও আকার। কোন শরীর ও মনে পশুভাব আবার কোনটিতে বা দেবভাব প্রবল। কোনটি বা ভ্রষ্ট তারকার ন্যায় লক্ষ্যচ্যুত; কামকাঞ্চনের আকাশে ছুটাছুটি করিতেছে। আবার কোনটি বা সমুদ্রগর্ভবিদারী পর্ব্বতপুঞ্জের ন্যায় বিষয়ের উত্তাল তরঙ্গকুলের ঘন ঘন ঘাত, অচল অটল ভাবে অকাতরে সহনে সক্ষম। এই অদ্ভুত বিচিত্রতাভূষণ ভিন্ন ভিন্ন মানবমনের কখন কি এক ধর্ম্ম উপযোগী হইতে পারে? রুগ্ন ও সবলকায় সকল বালকবালিকার জন্য মাতা কি কখন একই খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে পারেন? শিশু ও যুবার জন্য কখন কি সমপরিমাণ বস্ত্রাবরণ সম্ভবে? ধর্ম্মজগতে কি এতদিন ঠিক তদ্রূপ চেষ্টাই হইয়া আসিতেছে না? খৃষ্টান পাদরি বলিতেছেন, আমার ঈশাহি ধর্ম্ম তোমার মনের উপযোগী হউক আর নাই হউক, গ্রহণ না করিলেই তোমার অনন্ত নরক। মুসলমান বলিতেছেন, আল্লা নামের উপাসনা ও নিরাকার ঈশ্বরে দাসভাবে ভক্তি ভজনা না করিলে তোমার এ পৃথিবীতেই বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই, দেহান্তে স্বর্গলাভ তো বহু দূরের কথা। জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত সকলেরই এই এক কথা। সকলেই বলিতেছেন, আমার ধর্ম্মে সকলকে দীক্ষিত হইতে হইবে। আমার ধর্ম্ম আমার মনের উপযোগী, অতএব সকল মনের উপযোগী হইতেই হইবে। এই তুমুল কোলাহলের ভিতর দিয়া আর্য্যঋষির গম্ভীর অন্তঃসারপূর্ণ বাণী আকাশপথে উত্থিত হইয়া শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না। আপন আপন প্রকৃতি উপযোগী ধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ছাড়িও না, জগতে সকল মতই গুণদোষমিশ্রিত। 'মন মুখ এক করিয়া', চেষ্টা করিলে সকল মতেই আনন্দস্বরূপকে ধরা যায়। সকলেই সমভাবে সেই অমৃতের অধিকারী"। সসাগরা ধরা স্তম্ভিত হইয়া সে আনন্দধ্বনি শুনিতে লাগিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই আবার সেই অসার পথ লইয়া সকলে বিবাদে নিবিষ্ট হইল।

বাস্তবিক স্বধর্ম্ম ও ইষ্টনিষ্ঠা ঠিক ঠিক ধর্ম্মলাভের ও ধর্ম্মজগতে বিবাদ মিটাইবার একমাত্র সেতু। অখণ্ড স্বরূপের অনন্ত ভাব, অনন্ত কোটি মানব-মনের উপযোগী হইয়া রহিয়াছে। মানব কটা ভাবই বা তাঁহার গ্রহণ করিতে পারিয়াছে? নাস্তিকতা, অবিশ্বাস প্রভৃতি কেন মানবমনে শ্রেয়ঃ বলিয়া বোধ হয়? জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম অদ্যাবধি প্রচলিত হইয়াছে, যত প্রকার ভাবে মানুষ ভগবানের উপাসনা করিতেছে, তাহার কোনটিও সম্পূর্ণভাবে প্রাণের পিপাসা মিটাইতে না পারিলেই লোকে নাস্তিক, সংশয়াত্মা হইয়া থাকে। আরো লক্ষ লক্ষ নূতন ধর্ম্ম জগতে

উপস্থিত হউক না কেন, মঙ্গল বৈ অমঙ্গল হইবে না। আজ যাহারা সংশয় সন্দেহ লইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের শত শত লোক সেই সকল নূতন পথে তাহাদের মনের উপযোগী ধর্ম্ম ও শান্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। তোমার প্রকৃতি-উপযোগী ধর্ম্ম তুমি গ্রহণ কর, আমাকেও আমার প্রকৃতি-উপযোগী ধর্ম্ম লইতে দাও। বলিবে, তবে তো লম্পট চোরও বলিতে পারে, 'আমাদের প্রকৃতি-উপযোগী ধর্ম্ম আমাদের করিতে দাও'। তাহা হইলে সমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তি থাকে কোথায়? না, তাহারও উপায় আছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরীক্ষা করিবার একমাত্র কষ্টি প্রস্তর আছে—তাহা নিঃস্বার্থতা। যেখানে যত স্বার্থ, যত আপন শরীর মন অপরের ব্যয়ে সুখে রাখিবার চেষ্টা, সেখানে তত আঁধার, তত অধর্ম্ম। আর যেখানে যত পরার্থ চেষ্টা, আপন শরীর মনের ব্যয়ে অপর কাহাকেও সুখী করিবার উদ্যম, সেখানে তত আলোক ও ধর্ম্ম। অতঃপর স্বার্থজীবন দুষ্কৃতকারীদের আর ও কথা বলিবার পথ কোথায়? এই নিঃস্বার্থতাই যে সমস্ত নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এই নিঃস্বার্থতার ধীর বিকাশেই মানব উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে নিয়মবন্ধন এবং তাহার পূর্ণতায় নিয়মাতীত পরমহংস অবস্থায় উপনীত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন, তেমনি ব্যক্তি-সমষ্টি সমাজ ও সমাজসমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডও এই নিয়মে উন্নতির পরাকাষ্ঠার দিকে ছুটিয়াছে। নিয়মের সম্পূর্ণাভাব হইতে নিয়ম আসিয়া ব্যক্তি ও সমাজমন অধিকার করিতেছে এবং নিয়মের পূর্ণত্ব আবার নিয়মাতীত অবস্থায় তাহাদিগকে উত্তোলন করিয়া শৈশবের বিবেকরহিত মূঢ়তাকে বার্দ্ধক্যের বহুদর্শিতা এবং পরিশেষে যোগীর সংযমসহজাবস্থায় পরিণত করিতেছে। সেইরূপ অনীতি, নীতি ও নীতির অতীত অবস্থারূপ সোপানপরম্পরায় ব্যক্তি ও সমাজমন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। বলিতে পার, যুগারম্ভ হইতে পৃথিবীতে কিয়ৎসংখ্যক ব্যক্তি ভিন্ন এখনও এমন কোন একটিও সমাজ দেখা যায় নাই, যাহাতে সমাজাঙ্গ সমস্ত ব্যক্তিই এই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। উত্তরে বলা যাইতে পারে, মস্তক, হস্ত, পদাদির সমষ্টি যেমন এক সম্পূর্ণ ব্যক্তি, সেইরূপ ব্যক্তিসমূহের সমষ্টি সমাজও এক সুমহান্ শরীর ও মনবিশিষ্ট ব্যক্তি। একটি যে নিয়মে চালিত ও পুষ্ট হইয়া উন্নত হইতে থাকে, অপরটিও ঠিক সেই নিয়মে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। একটিকে যদি এই পরিপূর্ণ আদর্শ অবস্থায় উপনীত হইতে দেখিয়া থাক, অপরটিও কালে সেই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইবে, একথা কি এতই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়? সমাজের এই আদর্শ অবস্থা সকল কালেই চিন্তাশীল মনীষিগণ কল্পনায় চিত্রিত করিয়াছেন। ইহাকেই সত্যকাল, সুবর্ণযুগ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিত হারবার্ট স্পেন্সর, কোঁ কণ্ট, ফিস্ক প্রমুখেরাও ইহা বিজ্ঞানবিরোধী বা অযুক্তিকর বলিয়া স্বীকার করেন না।

ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা—নিঃস্বার্থতা।

সমাজের আদর্শ।

জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পথমাত্র। একটি 'সোঽহং সোঽহং' এবং অপরটি 'নাহং, নাহং' করিয়া মানবকে সত্যস্বরূপে পৌঁছাইয়া দিতেছে। লক্ষ্যবস্তু যতদিন না লাভ হয়, ততদিন সাধকের নিকট উভয় পথ এবং পথের লক্ষ্যও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই আর সাধকের নিকট সে ভিন্নতা প্রতীতি থাকে না। তাহার বিশদ সাক্ষ্য বেদের 'তত্ত্বমসি', সুফির 'আনলহক্'

জ্ঞান ও ভক্তির লক্ষ্য এবং ইষ্ট-নিষ্ঠা।

ও খৃষ্টের 'আমি ও আমার পিতা এক'। তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ—ভক্তিপ্রাণা ব্রজগোপিকাদের ভক্তির উন্মত্ততায় শারদোৎফুল্লমল্লিকারজনীতে গহনকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভিনয়। তবে পথিক সাধকের আপন পথে নিষ্ঠা রাখা আবশ্যক। বাতাত্মজ, বীরাগ্রণী শ্রীরামদূতের ন্যায় তাঁহার প্রাণ যেন নিরন্তর বলে,—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

জানি আমি, সেই এক পরমাত্মাই শ্রীনাথ ও জানকীনাথ উভয় রূপে প্রকাশিত, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব ধন। পরমহংসদেব তাঁহার সেই মধুর ভাষায় বলিতেন, "ইষ্টনিষ্ঠা যেন গাছের গোড়ার বেড়ার মত। ছোট গাছের গোড়ায় বেড়া না দিলে, লোকে মাড়াইয়া ফেলে; ছাগল গরুতে মুড়াইয়া খায়। সেইজন্য বেড়ার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু গাছ বড় হইয়া গুঁড়ি বাঁধিলে আর বেড়ার দরকার নাই। তখন সে গাছের গুঁড়িতে হাতি বাঁধিয়া রাখিলেও আর তার কিছুই অপকার হয় না।"

বেদান্ত কি ভগবানলাভের একটী পথমাত্র?

তবে কি 'বেদান্ত' ভগবানলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথের একটি পথমাত্র? 'হাঁ' এবং 'না' উভয়ই বটে। জনসমাজে, এমন কি, পণ্ডিতসমাজেও একটা ধারণা হইয়াছে, বেদান্ত ও অদ্বৈতবাদ একই কথা। 'সোঽহং সোঽহং' করিয়া সেই দ্বৈতাদ্বৈতের অতীত সত্যলাভ করিবার পথমাত্র বেদান্ত। একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। 'বেদান্ত' অর্থে যদি বেদের শেষ উপনিষদ্‌ভাগই বোঝা যায়, তাহা হইলেও তো সেই ভাগে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত—এ তিন মতের উপযোগী বচনপরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকারিভেদে উপদেশ করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থানে বেদ তো এ তিন মতেরই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন দেখা যায়। আবার 'বেদান্ত' অর্থে যদি বেদের সারকথা বুঝিতে হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতজ্ঞানেরও পারে অবস্থিত বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া বেদ অদ্বৈত মতই প্রচার করিয়াছেন একথা বলায় বেদে অসম্পূর্ণতাদোষ উপস্থিত হয়। তবে ইহার মীমাংসা কোথায়? মীমাংসা ঠিক এইখানে। বেদ বাক্যমনের অতীত বস্তুই উপদেশ করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির তারতম্যে মনুষ্যের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত ক্রমশঃ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই সোপানপরম্পরা অবলম্বন করিয়া মানব কালে সেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি করে। সোপানের প্রত্যেক অঙ্গটিই আবশ্যকীয়। একটি না থাকিলে অপরটিতে উঠা যায় না। সেইরূপ এ তিনটি মতই পরস্পরের সহায় – অবস্থাভেদে মানবের স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। দেশকালের সীমার মধ্যে নামরূপের রাজত্বে প্রাপ্ত যত কিছু সত্যের ন্যায় এই মতত্রয়ও অবস্থাভেদে সমান সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। এ তিন মতই বেদান্তের অন্তর্ভূত। জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম কি প্রণালীতে মানুষকে ধীরে ধীরে নামরূপের পারে লইয়া উন্নতির চরম সোপানে পরম সত্য দর্শন ও উপলব্ধি করাইতেছে—সেই প্রণালী-নির্দ্দেশই বেদের সারকথা এবং তাহাই বেদান্ত। এজন্যই বেদ ও বেদান্তজ্ঞান, কোন বিশেষ পথ বা বিশেষ মত নহে; কিন্তু সমস্ত মতের—সমস্ত ধর্ম্মের সারভূত বস্তু। এইজন্যই বেদান্ত সার্ব্বভৌমিক দর্শন বলিয়া সকলের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে, এবং ধর্ম্মের প্রথম অঙ্কুর হইতে শেষ পর্য্যন্ত উন্নতিপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট থাকায় বেদ 'পুরুষনিশ্বসিতম্', ভগবানের সহিত নিত্যকাল বর্ত্তমান ইত্যাদি হইয়া হিন্দুর চক্ষে নিত্যকাল মাননীয় হইয়া রহিয়াছে। [ক্রমশঃ]

কোলে
বিস্কুট
লজেন্স
জ্যাম জেলী আচার
স্কোয়াশ
GUAVA JELLY
ORANGE SQUASH
নির্মাতা :
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৭০০ ০১০
KB—3/74/B.

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১৯'০০। ২য় ভাগ ১৭'০০

সাধারণ ১ম খণ্ড ৩'৫০; ২য় খণ্ড ৭'৮০; ৩য় খণ্ড ৫'২০; ৪র্থ খণ্ড ৭'০০; ৫ম খণ্ড ৭'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১'৬০; কাপড়ে বাঁধাই ১'৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত - শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। (ছাপা নাই)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ —স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬; সাধারণ ৬'০০

বাঁধাই ৭'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। মূল্য ৫'০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২২৭, মূল্য ৪'০০

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ১'৭৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ০'৭০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

মায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭'০০, ২য় ভাগ ৬'৫০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬। মূল্য ৬'০০ টাকা

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য—১৫'০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ৮'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪'২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ছেলেদের উপযোগী। পৃঃ ৬৪, মূল্য ০'৭০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(একত্রে) শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। পৃঃ ২৬২, মূল্য ৪'৫০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩৬৯, মূল্য ৬'০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল ১'২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২'৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০, শোভন ৬'০০

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি — স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। পৃঃ ১৫৮, মূল্য ২'০০

বৈরাগ্যশতকম্ — স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ— স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি — স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০ ; ৩য় অঃ ১৩'০০ ; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি — পৃঃ ৬৬, মূল্য ১'০০

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮২, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব —স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ-চরিত — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃঃ ২৭৪, মূল্য ১০'০০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ২'০০ (ছাপা নাই)

ছোটদের বিবেকানন্দ — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৬২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৯তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭৷৷০টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫৷৷০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

সূচীপত্র

পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জী
সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

সূচীপত্র

বেনারসী
সিল্ক
সাড়ী
পোষাক
শৈলেনলাল মণিলাল
ষ্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট • কলি-১২
(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)
বহুবাজার
শ্যামবাজার
৫৫-২০০৭
কাশ্মিরী
শাল
বিছানা
হোসিয়ারী

"ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, তখন নির্জনে বাস ক'রবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'রবে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী

শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

দিব্য বাণী

মগ্‌গানট্‌ঠঙ্গিকো সেট্‌ঠো সচ্চানং চতুরো পদা।
বিরাগো সেট্‌ঠো ধম্মানং দ্বিপদানঞ্চ চক্‌খুমা॥
এসো ব মগ্‌গো নত্থঞ্‌ঞো দস্‌সনস্‌স বিসুদ্ধিয়া।
এতং হি তুম্‌হে পটিপজ্জথ মারস্‌সেতং পমোহনং॥

—ধম্মপদ, মগ্‌গবগ্‌গো, ১-২

মার্গমধ্যে শ্রেষ্ঠ অষ্টাঙ্গিক মার্গ
সত্যমধ্যে আর্যসত্য-চতুষ্টয়।
নরমধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান্‌ নর
বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ ধর্মমধ্যে হয়।

শুদ্ধ দর্শনের অন্য পথ নাই
এই তোমাদের পথ অবিতথ।
তোমরা সকলে মারের নাশক
এই পথ ধরি' চলো অবিরত।

কথাপ্রসঙ্গে

গৌতম বুদ্ধের পথ

মানুষের দুঃখমুক্তির উপায়ের অন্বেষণে সিদ্ধার্থ ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এবং দীর্ঘ ছয় বৎসর কঠোর সাধনার পর বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া সেই অন্বিষ্ট উপায়ের সন্ধান পান। তাঁহার নিজের কোনও অভাব ছিল না, ব্যক্তিগত কোনও দুঃখ ছিল না—জগতের দুঃখে ব্যথিত হইয়াই তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন ও তপস্যা করেন এবং এইখানেই তাঁহার লোকদুর্লভ মহাপ্রাণতার অনপনেয় স্বাক্ষর। কিন্তু তিনি কোন নূতন পথ উদ্ভাবন করেন নাই, প্রাচীন পথই আবিষ্কার করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি নিজেই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, অরণ্যচারী এক ব্যক্তি যেমন অরণ্যমধ্যে একটি পুরাতন পথ দেখিতে পাইয়া সেই পথে গমন করিয়া পথের শেষে এক পুরাতন রাজধানীতে উপনীত হয়, তিনিও সেইরূপ এক পুরাতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন—প্রাচীনকালের বুদ্ধগণ এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের আবিষ্কৃত সেই প্রাচীন পথটি কী?

প্রথমেই বলিতে হয়, সেই পথটি ভক্তিপথ নহে। কারণ, বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। সমস্ত বেদান্তবাদীরাই স্বীকার করেন যে, যুক্তি-তর্কের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না—শ্রুতিই ঈশ্বর সম্পর্কে একমাত্র প্রমাণ, অর্থাৎ শ্রুতিতে যখন ঈশ্বরের উল্লেখ আছে, তখন প্রত্যক্ষ-অনুমানাদি অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করিতে না পারিলেও 'ঈশ্বর আছেন' —ইহা আমরা মানিতে বাধ্য। কিন্তু বুদ্ধদেব শ্রুতির স্বতঃপ্রামাণ্য ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিলেন না। যে-ঈশ্বরকে যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রমাণিত করা যায় না, তাঁহাকে—শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে বলিয়াই—মানিতে হইবে, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। সুতরাং ঈশ্বরকে যখন বাতিল করা হইল, তখন আ-রতি আর্তি ও আকূতি, অর্চনা প্রার্থনা ও বন্দনা, বিরহ মিলন ও প্রেমনিবেদন, অশ্রু রোমাঞ্চ ও স্বরভঙ্গ, স্বেদ বৈবর্ণ্য ও বেপথু ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ ও সাত্ত্বিক-ভাববিকারেরও কোনও স্থান রহিল না। 'ও কে যায় নেচে নেচে আপনায় বেচে/পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে'—প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে! কথায় বলে, 'মাথা নেই, তার মাথাব্যথা' ঈশ্বরই যখন নাই, তখন ঈশ্বর-প্রেমে আবার নৃত্য! 'কত রূপের মন্ত্রে জাগানো প্রেমবিলাস / চিররঙিনের রঙে রাঙানো হৃদি-উছাস'—অসার 'কবিকথন' মাত্র! – ঐ একই কারণে। সুতরাং ভগবৎ-প্রেমে নৃত্যগীতাদিরও কোনও অবকাশ রহিল না।

ফলতঃ শ্রুতি-নির্ঝরিণী হইতে যে ভক্তিনদী প্রবাহিত হইতে উপক্রম করিয়াছিল, তাহার ধারা মরুপথেই হারাইয়া গেল। কিন্তু ঈশ্বরকে অত সহজে বিসর্জন দেওয়া যায় না। তাই পরবর্তী কালে ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যানের মরুবালুরাশি ভেদ করিয়া অবরুদ্ধ ভক্তিস্রোত দুর্নিবার বেগে সমগ্র ভারতবর্ষকে পরিপ্লাবিত করিল। কিন্তু সে অন্য কথা।

গৌতম বুদ্ধ চাহিয়াছিলেন, যক্ষ-রক্ষঃ দেব-দানব গন্ধর্ব-কিন্নর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—পরমেশ্বর কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া মানুষ নিজের

পায়ে দাঁড়াইয়া, 'আত্মদীপ' হইয়া জিতেন্দ্রিয়ত্বের জ্যোতি বিকিরণ করুক। কিন্তু ভক্তির আচার্যগণ বলেন—না, তাহা সম্ভবপর নহে। কারণ, অনাদিকাল হইতে পাপের সংস্কার পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে মানুষের মনে; তাই ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট না করিয়া স্বপ্রযত্নবলে ইন্দ্রিয়জয়ে প্রবৃত্ত হইলে মানুষ সফলকাম হয় না, বিনষ্টই হইয়া থাকে।[১]

স্বামী বিবেকানন্দও চিকাগো ধর্মমহাসভায় বলিয়াছিলেন, যতদিন জগতে মৃত্যু বলিয়া ব্যাপারটি থাকিবে, যতদিন মানবহৃদয়ে দুর্বলতা বলিয়া কিছু থাকিবে, যতদিন চরম দুর্বলতায় মানুষের মর্মস্থল হইতে রোদনধ্বনি উত্থিত হইবে, ততদিন ঈশ্বরে বিশ্বাসও থাকিবে। অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন, 'The concept of God is a fundamental element in the human constitution.' অর্থাৎ ঈশ্বরের ধারণা মানব-প্রকৃতির একটি মৌল উপাদান। এই কারণে যে-বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, যে-বুদ্ধদেব তাঁহার কোনও প্রতিকৃতি বা মূর্তি নির্মাণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে বৌদ্ধগণ সেই বুদ্ধদেবকেই ঈশ্বর করিয়া তুলিলেন, সেই বুদ্ধদেবেরই শত শত মূর্তি স্থাপিত করিয়া ঈশ্বরেরই প্রাপ্য অর্চনা-বন্দনাদি তাঁহার উদ্দেশে নিবেদন করিতে আরম্ভ করিলেন—যাহা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। কিন্তু আমরা বুদ্ধোত্তরকালীন বৌদ্ধধর্মের পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি না। আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল বুদ্ধদেবের আবিষ্কৃত পথ এবং সে-পথে যে ভগবদ্‌-ভক্তির কোনও স্থান নাই, ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

দ্বিতীয় কথা এই যে, বুদ্ধদেবের আবিষ্কৃত পথটি জ্ঞানপথও নহে। উহাতে সাংখ্যের বা বেদান্তের তত্ত্ববিচারের কোনও স্থান নাই। বুদ্ধদেব নিজে অবশ্য তাঁহার সময়ে এদেশে প্রচলিত দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও দার্শনিক বিচারে প্ররোচিত করেন নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জীব-জগৎ-ব্রহ্মের স্বরূপ লইয়া মানুষ অত্যধিক জল্পনা-কল্পনা করে, কথায় কথা বাড়ে, কিন্তু কাজ বিশেষ কিছু হয় না। আসল কাজ যে দুঃখ-নিবৃত্তি, তাহার কোনও সুরাহা হয় না। এইজন্য সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে অধিকাংশ সময়ে তিনি নিরুত্তর থাকিতেন, কদাচিৎ উত্তর দিলেও সুস্পষ্ট উত্তর দিতেন না, কারণ ঐ সকল প্রশ্ন তিনি অপ্রয়োজনীয় কৌতূহল বলিয়া মনে করিতেন। তীরবিদ্ধ ব্যক্তির দেহ তীরমুক্ত করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তীরটি কোথা হইতে আসিল, কে নিক্ষেপ করিল, কিভাবে নিক্ষেপ করিল, কেনই বা করিল – এই সকল প্রশ্নের বিচারকে অগ্রাধিকার দেওয়া শুধু হাস্যকরই নহে, মূর্খতা মাত্র। এইজন্য তিনি তাঁহার অনুগামীদের এই সকল 'বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী' হইতে দূরে থাকিয়া সকলেরই প্রত্যক্ষ যে দুঃখ, সংসারের ক্ষণিক সুখের মোহে বিভ্রান্ত না হইয়া সেই দুঃখের অস্তিত্বের পূর্ণ স্বীকৃতি, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবৃত্তি—মাত্র এই সকল বিষয়ই বিচার করিতে বলিয়াছিলেন এবং সর্বোপরি দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

কিন্তু বুদ্ধদেব বলিলে কি হয়! এ ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার! পরবর্তী কালে বৌদ্ধগণ

---

১ ময়ি (ঈশ্বরে) অনিবেশ্য মনঃ স্বযত্নগৌরবেণ ইন্দ্রিয়জয়ে প্রবৃত্তঃ বিনষ্টঃ ভবতি ·। ময়ি অনিবেশিতমনসঃ ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য অবস্থিতস্য অপি অনাদি-পাপ-বাসনয়া বিষয়-ধ্যানম্ অবর্জনীয়ং স্যাৎ।—গীতা, ২।৬২, রামানুজভাষ্য

অতি কূট দার্শনিক তত্ত্ববিচারে নিমগ্ন হইলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অন্ততঃ ত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতবাদ-সংবলিত এক বিপুল দর্শনসাহিত্যের সৃষ্টি হইল। ইহাদের মধ্যে চারিটি মতবাদ প্রখ্যাত। বৌদ্ধগণ মহাযান ও হীনযান নামে দুইটি মূল শাখায় বিভক্ত হইলেন। মহাযানিগণের দার্শনিক মতবাদ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া 'মাধ্যমক' ('মাধ্যমিক' নামেও পরিচিত) ও 'যোগাচার' নামে অভিহিত হইল। অনুরূপভাবে হীনযানী বৌদ্ধদের দার্শনিক মতবাদও 'সৌত্রান্তিক' ও 'বৈভাষিক' আখ্যা লাভ করিল। আচার্য শংকরের ভাষ্যে আমরা এই চতুর্বিধ বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদের খণ্ডন দেখিতে পাই। তথাপি ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, এই সকল মতবাদের স্রষ্টারা অদ্ভুত ধীশক্তি-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন—তাঁহাদের চিন্তাধারার প্রতিফলন শত শত বৎসর পরেও পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদসমূহে পরিলক্ষিত হয়।

যাহাই হউক, ইহা স্পষ্ট যে, বুদ্ধদেব ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে প্রসিদ্ধ এক সাধন-পথ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত পথের আটটি অঙ্গের বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। আটটি অঙ্গ হইল: সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি।[২] সমাধিকে অষ্টম ও চরম অঙ্গ বলায় প্রথমেই আমাদের অষ্টাঙ্গ পাতঞ্জল যোগদর্শনের অষ্টম ও

২ (১) সম্যক্ দৃষ্টি=মিথ্যাদৃষ্টির বিপরীত। যাহা অনিত্য ও দুঃখময়, মিথ্যাদৃষ্টিতে তাহা নিত্য ও সুখকর মনে হয়। তুলনীয় 'অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতি-রবিদ্যা' (যোগদর্শন, ২।৫)। সম্যক্ দৃষ্টিতে এই বোধ জন্মে যে, জীবন দুঃখময় এবং দুঃখের কারণ ও নিরোধ সম্বন্ধে বিচার উৎপন্ন হয়।

(২) সম্যক্ সংকল্প=মৈত্রী করুণা অহিংসা ইত্যাদি ভাবনা। তুলনীয় 'মৈত্রীকরুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্' (ঐ, ১।৩৩)।

(৩) সম্যক্ বাক্য=সত্য প্রিয় অসূয়ারহিত ও অর্থবহ বাক্য। তুলনীয় 'অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ' (গীতা, ১৭।১৫)।

(৪) সম্যক্ কর্ম=কাহারও প্রাণবিনাশ না করা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ না করা ইত্যাদি। তুলনীয় 'অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ' (যোগদর্শন, ২।৩০)।

(৫) সম্যক্ আজীব=ন্যায়সঙ্গত জীবিকা। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসা, প্রাণিবাণিজ্য, কসাই-এর কাজ ইত্যাদি না করা। সম্যক্ আজীবের মূলে আছে পূর্বোক্ত 'অহিংসা'।

(৬) সম্যক্ ব্যায়াম=যথার্থ প্রচেষ্টা। যাহাতে মলিন চিন্তার উদ্ভব না হয়, উদিত মলিন চিন্তা দূর হয়, অনুদিত মঙ্গল চিন্তা উদিত হয় ও উদিত মঙ্গল চিন্তার উত্তরোত্তর পূর্ণতাসাধন হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা। তুলনীয় 'বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্' (ঐ, ২।৩৩)।

(৭) সম্যক্ স্মৃতি=দেহ-মনের প্রতিটি অবস্থায় আদর্শ সম্বন্ধে সচেতনতা। বুদ্ধদেব এইরূপ স্মৃতিকে সর্ববিধ মঙ্গলের জনয়িত্রী বলিয়াছেন। তুলনীয় 'স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ' (ছা. উ. ৭।২৬।২)।

(৮) সম্যক্ সমাধি=ধ্যানচতুষ্টয়।

অন্তিম অঙ্গ—সমাধির কথাই মনে পড়ে। যোগদর্শনোক্ত আটটি অঙ্গ হইল : যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও সমাধি। লক্ষণীয় যে, বুদ্ধদেবের প্রচারিত সম্যক্ সমাধিতে চারিটি ধ্যান অন্তর্ভুক্ত। এই ধ্যানগুলির বর্ণনার মধ্যে আবার 'সবিচার' 'নির্বিচার' 'সবিতর্ক' 'নির্বিতর্ক' ইত্যাদি অভিধা পাওয়া যায়, যেগুলি আমাদের যোগদর্শনোক্ত 'সবিচার সমাধি' 'নির্বিচার সমাধি' 'সবিতর্ক সমাধি' ও 'নির্বিতর্ক সমাধি'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

বুদ্ধদেবের প্রচারিত অষ্টাঙ্গিক মার্গের অন্তিম অঙ্গ 'সমাধি'র সহিত যোগদর্শনের সপ্তম ও অষ্টম অঙ্গ 'ধ্যান' ও 'সমাধি'র সাদৃশ্য আমরা লক্ষ্য করিলাম। পঞ্চম ও ষষ্ঠ যোগাঙ্গ 'প্রত্যাহার' ও 'ধারণা' প্রকৃতপক্ষে 'ধ্যানে'রই প্রস্তুতি বা অব্যবহিত প্রাথমিক অবস্থা মাত্র, সুতরাং উহাদেরও 'ধ্যানে'রই ন্যায় 'সম্যক্ সমাধি'র অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাইতে পারে। 'ঈশ্বরপ্রণিধান'কে বাদ দিলে পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যম ও নিয়মের অন্তর্গত অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য অপরিগ্রহ শৌচ সন্তোষ ইত্যাদির সহিত বুদ্ধমার্গের সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীব ইত্যাদি নীতিমূলক অঙ্গগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। (পাদটীকা ২ দ্রষ্টব্য)। যোগদর্শনে উল্লেখিত মৈত্রী করুণা মুদিত ও উপেক্ষা বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক্ সংকল্পাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ যোগসূত্রগুলিতে উল্লেখিত বহু কথাই আমরা গৌতম বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গের বিশ্লেষণে পাই। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে তিনি 'মধ্যম' পথ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। গীতার 'ধ্যানযোগ'-অধ্যায়ে 'নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েও (৬।১৬, ১৭) এই মধ্য পন্থার কথাই বলা হইয়াছে।

সুতরাং কোন সন্দেহ নাই, গৌতম বুদ্ধের আবিষ্কৃত পথটি মুখ্যতঃ রাজযোগের পথ। তবে উহার সহিত কর্মযোগেরও অপূর্ব সমন্বয় রহিয়াছে। এই কর্মযোগ অবশ্য বর্ণাশ্রমধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ কর্মযোগ নহে। এই কর্মযোগের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত। কারণ, ইহাতে পরার্থে—সমগ্র জগতের হিতার্থে—কর্ম করিবার অবকাশ রহিয়াছে। হৃদয়ে অনন্ত প্রেম লইয়া 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' ভগবান তথাগত ভিক্ষুগণকে দিকে দিকে পরিভ্রমণ করিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং বুদ্ধদেবের পথটিকে সুপ্রাচীন রাজযোগ এবং নবভাবে বিন্যস্ত, নবদিগন্তে প্রসারিত কর্মযোগের সমন্বয়াত্মক পথ বলিতে পারা যায়।

আপত্তি উঠিতে পারে যে, ঐতিহাসিকগণ এবং ইতিহাস-সচেতন পণ্ডিতগণ যখন পাতঞ্জল যোগদর্শন ও গীতা বুদ্ধোত্তর কালের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তখন গীতা ও যোগদর্শনকে বুদ্ধের আবিষ্কৃত পথের দিশারী বলা ভ্রান্তিমূলক। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে অথবা পাতঞ্জল যোগদর্শনে যে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা সূত্রাকারে বিধৃত আছে, সেগুলি বুদ্ধেরও পূর্ব হইতেই এদেশে বহমান ছিল—বুদ্ধোত্তর কালে শ্লোকাকারে বা সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছিল মাত্র। কপিলের সাংখ্যদর্শনের যে-সকল গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়, সেগুলি বুদ্ধদেবের শত শত বৎসর পরে রচিত, কিন্তু উহার অর্থ ইহা নহে যে, সাংখ্যদর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল বুদ্ধদেবের পরবর্তী কালে। আচার্য শংকর বা আচার্য রামানুজের প্রসঙ্গ উঠিলেই আমাদের অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে। উহার অর্থ

ইহা নহে যে, তাঁহারা অদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের জনক। সুপ্রাচীন কালেও ঐ দুইটি মতবাদ এবং অনুরূপ মতবাদসমূহ এদেশে বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যোগদর্শন ও গীতার অনেক কথারই প্রতিধ্বনি যদি আমরা বুদ্ধদেবের কথায় পাই, তাহা হইলে আশ্চর্যের কিছুই নাই। বুদ্ধদেবের কথায় প্রতিধ্বনি গীতা ও পাতঞ্জল যোগদর্শনে পাওয়া যায়, এইরূপ বলা অপেক্ষা গীতা ও পাতঞ্জল যোগদর্শনের কথারই প্রতিধ্বনি আমরা বুদ্ধদেবের কথায় পাই, এইরূপ বলাই সমীচীন, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা ঃ আচার্য শংকর ; টীকাকার ঃ স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক ঃ স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা ঃ ননু ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বং কথং, দ্বিতীয়স্য অন্যস্য ঘটাদেঃ অনুভবাৎ ইতি আশঙ্ক্য সর্বস্য অপি দ্বিতীয়স্য দৃশ্যত্বেন শুক্তিরজতাদিবৎ তস্মিন্ আরোপিতত্বাৎ, আরোপিতস্য চ পরমার্থভূতাধিষ্ঠানমাত্রত্বাৎ; 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' (ছা. উ. ৩।১৪।১), 'আত্মা এব ইদং সর্বম্' (ছা. উ ৭।২৫।২), 'ব্রহ্ম এব ইদং সর্বম্' (মু. উ. ২।২।১১), 'ইদং সর্বং যদয়ম্ আত্মা' (বৃ. উ. ২।৪।৬), 'পুরুষঃ এব ইদং সর্বং বিশ্বম্' (মু. উ. ২।১।১০) ইত্যাদি শ্রুতেঃ চ ন ব্রহ্মণঃ অনন্যপদোক্তাদ্বিতীয়ত্ব-ক্ষতিঃ ইতি অভিপ্রেত্য আহ—

(**মূলস্তোত্রম্ ঃ**)

যদ্ যদ্ বেদ্যং বস্তুসতত্ত্বং বিষয়াখ্যং
তৎ তদ্ ব্রহ্মৈবেতি বিদিত্বা তদহং চ।
ধ্যায়ন্ত্যেবং যং সনকাদ্যা মুনয়োঽজং
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৯॥

যদ্ যদ্ ইতি। **যদ্ যদ্ বিষয়াখ্যম্**। বিষিণোতি বিশেষেণ পুরুষং বধ্নাতি ইতি বিষয়ঃ শব্দাদিঃ, তদ্ বিষয়াখ্যং **বস্তুসতত্ত্বং** বস্তুপরমার্থভূতং ব্রহ্ম এব সতত্ত্বং স্বরূপং যস্য তস্মিন্ বিষয়াখ্যস্য সর্বস্য আরোপিতত্বাৎ ইতি অর্থঃ। তত্র হেতুত্বাভিপ্রায়েণ আহ **বেদ্যম্** ইতি। বেদ্যং দৃশ্যং, দৃশ্যত্বাৎ তস্মিন্ আরোপিতত্বেন বিষয়াখ্যং বস্তুসতত্ত্বম্ ইতি অর্থঃ। অতঃ **তদ্ ব্রহ্ম এব**, ন ততঃ অতিরিক্তম্ **ইতি বিদিত্বা** জ্ঞাত্বা **তদ্ ব্রহ্ম অহম্**। চকারাৎ ব্যত্যয়েন অহং ব্রহ্ম ইতি চ। **এবম্** উক্তপ্রকারেণ **যম্ অজং** পরমাত্মানং হরিং **সনকাদ্যাঃ** সনক-সনন্দন-সনৎকুমার-সনাতন-প্রভৃতয়ঃ **মুনয়ঃ** মননশীলাঃ **ধ্যায়ন্তি তং হরিম্ ঈড়ে॥ ৯॥**

অনুবাদঃ (অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অতিরিক্ত) দ্বিতীয় ঘট প্রভৃতি অন্য বস্তু অনুভূত হওয়ায় ব্রহ্মের অনন্তত্ব (অদ্বিতীয়ত্ব) কিভাবে হইবে, ইহা আশঙ্কা করিয়া[১]—দ্বিতীয় সমস্ত বস্তুই দৃশ্য হওয়ায় শুক্তিরজতাদির ন্যায় ব্রহ্মে আরোপিত, আরোপিত বস্তু পারমার্থিক অধিষ্ঠানের অতিরিক্ত নহে ; 'ইদং' অর্থাৎ অনুভূয়মান সমস্তই ব্রহ্ম, এই সমস্ত (দৃশ্য বস্তু) আত্মাই, এই সমস্তই ব্রহ্ম, যাহা এই সমস্ত (বস্তু), (তাহা) এই আত্মা, পুরুষই (আত্মাই) এই সমস্ত বিশ্ব ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও (বুঝা যায়) 'অনন্ত'-পদের দ্বারা কথিত ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না[১], এই অভিপ্রায়ে (আচার্য) বলিতেছেন[১] : (মূলস্তোত্র, শ্লোক ৯, পৃঃ ২৩০ দ্রষ্টব্য)।

অন্বয়ঃ বিষয়াখ্যং বস্তুসতত্ত্বং যৎ যৎ বেদ্যং তৎ তৎ ব্রহ্ম এব, অহং চ তৎ ইতি বিদিত্বা সনকাদ্যাঃ মুনয়ঃ যম্ অজম্ এবং ধ্যায়ন্তি, তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে।৯।

স্তোত্রানুবাদঃ 'বিষয়' নামে প্রসিদ্ধ বস্তুসতত্ত্ব,[২] যাহা যাহা জ্ঞেয়, তাহা তাহা ব্রহ্মই এবং আমিও সেই ব্রহ্ম—ইহা (অপরোক্ষভাবে) জানিয়া সনকাদি মুনিগণ যে অজকে (জন্মরহিত পরমাত্মাকে) এই প্রকারে ধ্যান করেন, সংসারের (কারণীভূত অজ্ঞান-) অন্ধকারবিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি।৯।

টীকানুবাদঃ **যদ্ যদ্ বিষয়াখ্যং**—বিশেষরূপে পুরুষকে যাহা বন্ধন করে, তাহাই বিষয়, যথা শব্দাদি। বিষয় নামে প্রসিদ্ধ তাহা **বস্তুসতত্ত্বং**[৩] অর্থাৎ পরমার্থভূত বস্তু ব্রহ্মই সতত্ত্ব (= স্বরূপ) যাহার (এই প্রকার বুঝিতে হইবে) ; কারণ বিষয় নামে প্রসিদ্ধ সমস্তই সেই ব্রহ্মে আরোপিত, ইহাই অর্থ। উক্ত বিষয়ের হেতু প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে (আচার্য) বলিতেছেন—**বেদ্যম্** অর্থাৎ দৃশ্য। দৃশ্যত্ববশতঃ তাঁহাতে (সেই ব্রহ্মে) আরোপিত বলিয়া বিষয় নামে প্রসিদ্ধ (সমস্তই) বস্তুসতত্ত্ব (পারমার্থিকভাবে ব্রহ্মস্বরূপ), ইহাই অর্থ। অতএব **তদ্**—বিষয়াখ্য বস্তু **ব্রহ্ম এব**—বস্তুতঃ ব্রহ্মই, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, **ইতি বিদিত্বা**—এই প্রকার জানিয়া **তদ্**— সেই ব্রহ্মই **অহং**—আমি, **চ**—এবং বিপরীতক্রমে 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ (জানিয়া) **এবং** –পূর্বোক্তপ্রকারে **যম্ অজং**—যে অজকে (জন্মাদিরহিত পরমাত্মাকে) **সনকাদ্যাঃ**—সনকাদি—সনক সনন্দন সনৎকুমার সনাতন প্রভৃতি **মুনয়ঃ**—মননশীল ঋষিগণ **ধ্যায়ন্তি**—ধ্যান করেন, **তং হরিম্ ঈড়ে**—সেই হরিকে আমি স্তুতি করি।৯।　[ক্রমশঃ]

১ 'আশঙ্কা করিয়া' ('আশঙ্ক্য')—এই অসমাপিকা ক্রিয়ার সমাপিকা ক্রিয়া হইতেছে—'বলিতেছেন' ('আহ')। 'ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না' - ইহাই আশঙ্কার উত্তর।

২ বস্তু = অধিষ্ঠানভূত পারমার্থিক বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম ; সতত্ত্ব = স্বরূপ ; বস্তুসতত্ত্ব = ব্রহ্মস্বরূপ ; অতএব বিষয়াখ্য বস্তুসতত্ত্বের তাৎপর্য হইল—ব্রহ্মস্বরূপ অধিষ্ঠানসত্তার অতিরিক্ত-সত্তাশূন্য বিষয়।

৩ মূল স্তোত্রের অনুবাদ ও পাদটীকা ২ দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র*

[শ্রীমতী ফুলরাণী সেন মজুমদারকে লিখিত]

শ্রীশ্রীহরি শরণং

বাগবাজার, কলিকাতা

৭ বৈশাখ[১]

কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার পত্রখানি পাইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। তাহাকে[২] তোমাদের নিকট ভগবান দিয়াছিলেন, তিনিই আবার লইয়াছেন। যাহা হউক, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আমি এখানে আসিয়া অবধি জ্বরে বড় কষ্ট পাইতেছি, শরীর খুব দুর্ব্বল হইয়া এখন শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া আছি, দৈনিক জ্বর হইতেছে, জ্বর কিছুতেই বন্ধ হইতেছে না। ডাক্তারী চিকিৎসা হইতে সমস্ত জিনিষে অরুচি। কিছুমাত্র খাইতে পারিতেছি না। অধিক আর কি লিখিব, তোমাদের কুশল লিখিবে। বাকি মঙ্গল। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা

মাতাঠাকুরাণী

* পাটনার শ্রীআনন্দ দাশগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ১ সনের উল্লেখ নাই।

২ ফুলরাণী সেন মজুমদারের প্রথম পুত্র, দেওঘর বিদ্যাপীঠে সর্পদংশনে যাহার মৃত্যু হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সম্ভবতঃ সেই দিন কি অন্য দিন ঠিক মনে নাই, জনৈক সন্তান কর্তৃক আসাম অঞ্চল হইতে প্রেরিত বিরণ চালের ভাপে সিদ্ধ ঘি-ভাত তৈয়ার করিয়াছিলেন অন্য একটি সন্তান। সেইজন্য তিনি অনেক পরিশ্রমে যোগাড়-যন্ত্র করেন। ভাপে চাল সিদ্ধ হইয়া ভাত হইবে কিনা ইহা অনেকেরই সন্দেহের বিষয় ছিল। কিন্তু পরে যখন অতি সুন্দর ভাত প্রস্তুত হইল তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মা অত্যন্ত উল্লসিত, বালিকার মতো অধীর হইয়া সকলকে ডাকিয়া দেখাইতেছেন। (বিরণ চাল ভাপেই সুসিদ্ধ হয় এবং অতি সুস্বাদ ; ঐ চালে খই হয় চমৎকার।) আর বলিতেছেন, 'ন্যাখো, ছেলেরা কেমন সুন্দর

অন্ন ভাপে তৈরি করেছে, অতি পবিত্র আজ্য অন্ন, অতি পবিত্র আজ্য অন্ন।' ইহা বলিয়া বারংবার প্রশংসা করিয়া সহর্ষে ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। তাহার পর একটি বাটিতে কিছু লইয়া বলিলেন, 'চারটি কালীকে দিয়ে আসি, পবিত্র আজ্য অন্ন।' মা অতি উল্লসিত হৃদয়ে কালীমামার বাড়ী গিয়া স্বয়ং দিয়া আসিলেন। তাহার পর স্বয়ং পরিবেশন করিয়া খুব পেট ভরিয়া সন্তানদিগকে খাওয়াইলেন। রান্নার সময়ে ছেলেদের নিজেই জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ অন্ন কিসের সঙ্গে খাইতে ভাল হইবে জানিয়া লইয়া তদনুসারে ভাজা-তরকারী ভালভাবে করাইয়াছিলেন। ঐ অন্ন সম্বন্ধে মা আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, উহা অতি পবিত্র আজ্য অন্ন, উহাতে সকৃড়ি-ঝুটা-এঁটো-দোষ হয় না। ঘিয়ের তৈরী জিনিস ও ঘি সর্বদাই শুদ্ধ, কখনও অশুদ্ধ হয় না। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর এঁটো হাতে ঘিয়ের বাটি ধরিয়াছিলেন দেখিয়া মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'এঁ্যা কি করলে, ঘি সব ঝুটা হয়ে গেল।' ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'ঘি কখনও ঝুটা হয় না।' অতিশয় সাধারণ বিষয়ে মায়ের উল্লাস ও অবসাদ—ছোট বালিকার মতো আচরণ, কি আশ্চর্য ব্যাপার! যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে গাঁথিয়া রহিয়াছে

ভাল দুধ পাইবার আশায় চলতি দামের বেশী দর দিয়া দুধ কেনা মা পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, এরূপ দাম বাড়াইলে তো পয়সার লোভে আরও বেশী জল দিবে, তাহা ছাড়া জিনিসের দর বাড়াইয়া দিলে অপর লোকের কষ্ট হয়। পয়সা হাতে থাকিলেই এইরূপ অতিরিক্ত দামে জিনিস ক্রয় করা খুবই অন্যায়, উহাতে অন্য লোকের মনে ঈর্ষা-দ্বেষেরও সঞ্চার হয়। সেইজন্য ঐ বিষয়ে খুবই সাবধান করিয়া দিতেন এবং কখনও কেহ কিনিলে অপরের নিকট বেশী মূল্য দেওয়ার কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেন। কখন কখন সামান্য ব্যাপারে মায়ের ছেলেমানুষের মতো ভাব দেখিয়া সন্তানদের ভারি কৌতুক হইত। কোয়ালপাড়া আশ্রমে পটোলের চাষ ছিল এবং ভাল পটোল জন্মিত। জনৈক সন্তান সেখান হইতে আনিয়া মায়ের বাড়ীতে বাগানে কতকগুলি পটোলের মূল লাগাইয়াছিলেন, মা তখন কলিকাতায় ছিলেন। ঐ অঞ্চলে তখন পটোলের চাষ ছিল না এবং লোকে উহা খাইতে ভালবাসিলেও উহা চাষ করা ভয়ের চক্ষে দেখিত। মায়ের বাড়ীতে পটোল লাগানো লইয়া আলোচনা চলিল। মেয়েরা ভীত হইয়া মাকে জানাইল, 'পটোল লাগানো হইয়াছে, উহা বড়ই অমঙ্গলের কথা। পটোল তুলিবে কে?' 'পটোল তোলা' শব্দের চলতি অর্থ 'মৃত্যু'—সংসার হইতে বিদায়। মা শঙ্কিতা হইয়া পটোললতা উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে বলিলেন। সন্তানেরা মায়ের আদেশ পালন করিলেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তাঁহারা মায়ের ছেলেমানুষী, ভয়ভাবনা দেখিয়া খুব হাসাহাসি করিলেন। এখন জয়রামবাটী অঞ্চলে মাতৃমন্দিরেও খুব পটোল চাষ হয়। তখন তাঁহাদের বুঝান যায় নাই যে, পটোল তুলিলেই যদি মানুষ মরিয়া যায়, তবে বাজারে এত পটোল আমদানী হয় কিরূপে! আবার লোকে পটোলের জন্য এত লালায়িতই বা কেন?

মা জগতের সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম যন্ত্র মনুষ্য-হৃদয়কে কটাক্ষমাত্রে পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারিতেন; সেই মায়ের নিকট আবার একটি সামান্য লণ্ঠন পরিষ্কার করা বড়ই কঠিন কাজ মনে হইত! জয়রামবাটীতে মায়ের ঘরে সেকালের একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ছিল। উহার বাহিরের

তারের বেড় খুলিয়া চিমনি খোলা, পরিষ্কার করা, ছিপি খুলিয়া কেরোসিন ভরতি করা প্রভৃতি কাজ মায়ের নিকট ভারি মুস্কিল ও হাঙ্গামার ব্যাপার বলিয়া মনে হইত। তাঁহার প্রাচীন রীতি মতে পিলসুজে তৈলের প্রদীপ আর কেরোসিনের কুপি-ল্যাম্প অতি সোজা জিনিস, ঠিকঠাক করিয়া রাখিতে কোনই হাঙ্গামা নাই। কিন্তু লণ্ঠন বড়ই কঠিন ব্যাপার, সেজন্য সেটি অপরকে দিয়া পরিষ্কারাদি করাইয়া লন। যে-সকল মেয়েরা ঐটি করিয়া দেয়, তাহাদের দক্ষতা ও চাতুর্যের জন্য মা কত প্রশংসা করেন: 'ওঃ, ওরা কত কাজ জানে! কেমন চট ক'রে লণ্ঠনটা ঠিক ক'রে দিলে!' মা নিজে অতি প্রাচীন ধরনের হইলেও মেয়েদের আধুনিক কালের উপযোগী শিক্ষা কাজকর্ম পছন্দ করিতেন, তাহাতে উৎসাহ দিতেন। মাকু ও রাধু ছোট-ভাইঝিদের স্কুলে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়ে উৎসাহ দিয়া বলিতেন, 'লেখাপড়া শিখলে, কাজকর্ম শিখলে নিজেরাও সুখে থাকবে, অপরকেও সুখী রাখতে পারবে তাদের উপকার ক'রে।' তিনি নিজে অনেক উদ্যম করিয়া বাল্যকালে ও পরে দক্ষিণেশ্বরে বাংলা পড়িতে শিখিয়াছিলেন। শিক্ষাব্রতী তাঁহার জনৈক সন্তানকে ঐ অঞ্চলে (মায়ের দেশে) মেয়েদের লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখাইবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন। মায়ের বিশেষ কৃপাপাত্রী জনৈকা কন্যা সেলাইয়ের কাজ ও ধাত্রীবিদ্যা শিখিয়া অনেকের সেবা করিতেন। সেই সকল কাজের প্রশংসা শুনা যাইত মায়ের মুখে, সময়ে সময়ে তাঁহার নামও উল্লেখ করিতেন।

সময়ে সময়ে মায়ের বালিকার মতো মান-অভিমানও সন্তানদের বিশেষ আমোদের বিষয় হইত। জয়রামবাটীতে একদিন রাঁধুনী না থাকায় নলিনীদিদি রুটি সেঁকিতেছেন, মা রুটি বেলিতেছেন, সঙ্গে তাঁহার একটি সন্তানও রুটি বেলিয়া দিয়া সাহায্য করিতেছেন—সন্তানটি রুটিবেলায় দক্ষ। নলিনীদিদি প্রায় সর্বদাই প্রাচীনা শাশুড়ীর অভিনয় করিয়া মাকে শিক্ষা দেন! তিনি রুটি সেঁকিতে সেঁকিতে উঁচু গলায় বলিলেন, 'পিসীমার রুটি ভাল হচ্ছে না।' তাঁহার অনুযোগ শুনিয়া মায়ের মনে বালিকার মতো ভারি অভিমান জন্মিল, মুখ ভারি করিয়া বেলুন ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'রইল তোমার রুটিবেলা, আমার রুটি যদি ভাল বেলা না হয়, তবে আমি আর বেলবো না।' সন্তান মুস্কিলে পড়িলেন, তিনি 'বালিকা'কে প্রবোধ দিয়া রুটি-বেলা বন্ধ না করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, 'আমি সারাজীবন রুটি বেলে আসছি, আর আজ আমার রুটি খারাপ হলো।' সন্তানটি বুঝাইয়া বলিলেন, 'না মা, আপনার রুটি খুব ভালই হচ্ছে। নলিনীদিদি কি ক'রে জানলেন কোন্‌টি কার বেলা রুটি? দু'জনের রুটিই তো একত্রে আছে। মিছেমিছি আপনাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? আপনার রুটি খুব ভালই হচ্ছে।' তিনি চাকি বেলুন আবার আগাইয়া দিলেন, 'বালিকা'র মন ভারি খুশী। আবার দুইজনে কথাবার্তা বলিতে বলিতে আনন্দে রুটিবেলা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন পূর্বের মতো।

মাতাঠাকুরাণী সাধারণতঃ অতিশয় সঙ্কোচ-সম্ভ্রমশীলা ছিলেন। বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়া প্রত্যেকটি কথা বলিতেন ও কাজ করিতেন। আর লজ্জাশীলতার কথা তো বলিবারই নহে! স্বামী অভেদানন্দ তৎকৃত সারদাদেবীস্তোত্রে 'লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে' বলিয়া কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দও তৎকৃত

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রে 'ওঁ হ্রীং'—ঠাকুর ও মা উভয়ের বীজমন্ত্রে সশক্তিক ভগবানের স্তব করিয়াছেন। হ্রীংকার লজ্জাবীজ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মা লজ্জাস্বরূপিণী ছিলেন সত্যই। কিন্তু তাঁহার জগজ্জননীভাবের সঙ্গে সঙ্গে গুণাতীত পরমহংস অবস্থা, বালিকাভাবও স্বাভাবিক ছিল এবং যাঁহাদের তাঁহার সন্নিকটে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা সদাসর্বদা তাঁহার চিত্ত-মনদ্রবকারী সলজ্জ মাতৃভাব ও মাতৃ-মূর্তিদর্শনের ন্যায় সময় সময় লজ্জাশূন্যা বালিকা-মূর্তি ও বালিকাভাবের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। মায়ের বর্ষীয়সী একান্ত আশ্রিতা ভক্তিমতী মহিলাগণ তো তাঁহাকে—তাঁহাদের মা-রূপী মেয়েকে—কচি খুকীর মতোই দেখিতেন এবং বাৎসল্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়া সদাসর্বদা প্রাণ জুড়াইতেন। কোন কোন শিষ্য-সন্তানও কদাচিৎ এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেও পরমানন্দিত হইয়াছেন।

রাসবিহারী মহারাজ মায়ের বিশেষ কৃপা-ভাজন ছিলেন, উদ্বোধনে ও জয়রামবাটীতে অনেক দিন মায়ের শ্রীচরণপ্রান্তে বাস করেন ও তাঁহার গভীর স্নেহ-মমতার পরিচয় পান। তাঁহার প্রতি মায়ের বিশেষ অনুগ্রহের একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। জয়রাম-বাটীতে অবস্থানকালে এক সময়ে তাঁহার মনের শান্তি বিঘ্নিত হয়। সেজন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়া কাতরভাবে মাকে ধরিয়া পড়িলেন, তাঁহাকে কিছু করিয়া দিবার জন্য। মা তাঁহাকে ঠাকুরের শরণাপন্ন হওয়ার কথা বলিয়া অনেক বুঝাইলেন, প্রবোধ দিলেন, কিন্তু তাঁহার মন শান্ত হইল না। তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া মায়ের কাছে কাকুতি-মিনতি করিতে থাকিলে মা শেষে তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা করিলেন, মায়ের দয়াতে তাঁহার মনে এক অলৌকিক অননুভূতপূর্ব ভাব ও আনন্দ উপস্থিত হইল। আনন্দের ঘোরে দিন কাটিতেছে, বাহিরের সংসার সবই ঠিক আছে, স্নানাহার নিদ্রা কাজকর্ম সবই চলিতেছে, কিন্তু সবই যেন স্বপ্নবৎ, চোখের সামনে ভাসিতেছে মাত্র ছবির মতো। ভিতরে একটা স্বাভাবিক আনন্দের অনুভূতি সর্বক্ষণ রহিয়াছে। চলা-বসা সব যেন চলিতেছে যন্ত্রবৎ। দুইচার দিন এইভাব কাটিলে একদিন সকালে বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ পাশের গ্রামে গিয়াছিলেন। সেই স্থানে একজন লোক তাঁহাকে সাধু দেখিয়া অতিশয় ভক্তিভাবে বসাইয়া তাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। পরে নিজ শিরে কপালে ও বক্ষে রাসবিহারী মহারাজের পদদ্বয় বিশেষভাবে ঘসিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতেই রাস-বিহারী মহারাজের মনের সেই উচ্চ অবস্থা অপসারিত হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে দুই-তিন দিনের মধ্যেই তিনি স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হন। রাসবিহারী মহারাজ বিশেষ খেদ প্রকাশ-পূর্বক বলিতেন, 'আমি জানতাম, সেই লোকটির স্বভাব ভাল নয়, হীন চরিত্র, কিন্তু সে এমনভাবে কাতর হয়ে পায়ে পড়ল যে, আমার মন খুব নরম হয়ে গেল, আর নিজের কথা না ভেবে তার দুঃখেই দুঃখিত হয়ে পড়লাম।' এইরূপ মহতী কৃপা ধারণ করা খুবই শক্ত, তবে একবার অনুভূত আনন্দের স্মৃতি চির জাগরূক থাকে। আমাদের সেইরূপ সৌভাগ্য না হইলেও মায়ের অলৌকিক কৃপা সম্বন্ধে একটি ঘটনা অন্য সময়ে একদিন জনৈক সন্তান যাহা মায়ের নিকটেই বর্ণনা করিতেছিলেন, তাহা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সন্তান অশ্রুসিক্ত নয়নে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতেছিলেন, মা-ও তাঁহার 'বাক্য' খুব আগ্রহের সহিত শ্রবণ ও 'ভাব' হৃদয়ে গ্রহণ

করিয়া মধ্যে মধ্যে ‘আঃ আঃ’ বলিয়া অনুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন যে, দিন কয়েক পূর্বে তাঁহার এক সঙ্গী প্রাণপ্রিয় বন্ধু জ্বরে খুব অসুস্থ. এমন কি বিকারগ্রস্ত হওয়ায় প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। যেদিন বন্ধুটির অবস্থা সাংঘাতিক হইল, সেদিন রাত্রে তিনি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া মায়ের চরণে অন্তরের দুঃখ অতি কাতরভাবে নিবেদন করিয়া এবং অশ্রু ঢালিয়া অনেকক্ষণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন বন্ধুটির আরোগ্যের জন্য। এইভাবে কিছু সময় অতীত হইলে তাঁহার তন্দ্রার মতো ঘোর হইয়া বাহ্য সংজ্ঞা প্রায় চলিয়া যায়। হঠাৎ হুঁশ হইল; দেখেন মা জ্যোতির্ময় মূর্তিতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভয় ও সান্ত্বনা দিতেছেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ, মা অন্তর্হিতা হইলেন। ভরসা পাইয়া আসিয়া বন্ধুর পাশে শয়ন করিলেন। পরদিন হইতে বন্ধুর অবস্থা ভালোর দিকে চলিল এবং তিনি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। অদ্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মাকে প্রণাম করিতে ও তাঁহার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছেন। তাঁহার মুখে সেই অদ্ভুত বর্ণনা শুনিয়া এবং শ্রীশ্রীমাকে অতীব ঔৎসুক্যের সহিত উহা শ্রবণ ও সমর্থন করিতে এবং সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিলাম।

মায়ের অলৌকিক বিভূতি বা তাঁহার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সম্বন্ধে নিজে কখনও কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, জানিবার ইচ্ছাও হয় নাই। বাল্যকাল হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ঐশ্বর্যবিহীন মাধুর্যপূর্ণ রাগাত্মিকা ভক্তির কথা শুনিয়া মনে উহার ছাপ পড়িয়াছিল, সেইজন্যই বোধ হয় ঐ বিষয়ে কৌতূহল জন্মে নাই অথবা করুণাময়ী স্বয়ংই বুদ্ধিকে উহা হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন। তবে তিনি স্বয়ং কথাপ্রসঙ্গে কখনো কখনো অতি সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলিতেন, যাহাতে মনে হইত তাঁহার কাছে স্বাভাবিকভাবেই অতীন্দ্রিয় রাজ্য প্রকাশিত; যখন যে দিকে খুশি স্বীয় মনকে ঘুরাইতেছেন, ফিরাইতেছেন, দেখিতেছেন, অনুভব করিতেছেন। ইহলোক-পরলোকের স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ জগতের কোন ব্যবধান তাঁহার নিকট নাই।

জনৈক বিশিষ্ট ভক্ত (রাঁচীর সুরেন্দ্রনাথ সরকার) মায়ের কাছে আসিয়াছেন। তিনি সেই সময়ে মায়ের চরণপ্রান্তে অবস্থানকারী জনৈক সন্তানের সুকৃতির প্রশংসা করিয়া বলিলেন, ‘আপনারা বড়ই ভাগ্যবান, মায়ের কাছেই রহিয়াছেন।’ তাঁহার বাক্যটি হৃদয়ে আঘাত করিল—সত্যই কি কাছে! কাছে কথার অর্থ কি? খুঁজিয়া পাইলাম না। সুরেন্দ্র বাবুকে বিনীতভাবে বলিলাম, ‘আমি তো দেখছি সকলেই দূরে, কেহ অল্প দূরে, কেহ বেশী দূরে, ব্যবধান রয়েছেই।’ এই ব্যবধান বরাবরের জন্য কিভাবে দূর করা যায়? উপায় কি? মাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নিজের মধ্যে পাইতে না পারিলে তো দূরত্ব দূর হইবে না, যেখানেই যে থাকুক! যাঁহারা ভক্তিমান, আন্তরিক ভক্তিতে নিশ্চয়ই তাঁহারা যেখানেই থাকুন বেশী নিকটে সর্বদাই রহিয়াছেন। ঐশ্বর্য-বোধ ভগবানকে দূরে রাখে, আপনজন-বোধ নিকটে আনে।

মা অপর লোকের দুঃখ-শোকের ঘটনা কানে শুনিয়াই শোকাবেগে আকুল হইয়া পড়িতেন। তাঁহার সেই শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া দর্শকের হৃদয়ও দ্রব হইত। আকস্মিক মৃত্যু অথবা অন্যপ্রকার দুঃসংবাদ সহজেই মায়ের অতীব কোমল হৃদয়কে মথিত করিয়া ফেলিত, নিজেকে সামলাইতে পারিতেন না। যাহারা

শোকার্ত হইয়া মায়ের নিকট সমবেদনা, সহানুভূতি লাভের আশায় আসিত, বস্তুতঃ মা স্বয়ং তাহাদের সেই শোক হৃদয়ে টানিয়া লইয়া আপনি অনুভব করিয়া তাহাদিগের হৃদয় হালকা করিয়া দিতেন—'বিষপানে বিষহরণ'। সময়ে সময়ে পরের দুঃখ শুনিয়া তাঁহার কোমল হৃদয়ে শোকের আঘাত পাইয়া কি প্রকার অধীর হইয়া মা অসহায় বালিকার মতো রোদন করিতেন, তাহার একটু বিবরণ দিতেছি।

মা কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। পাড়াপড়সী গরীব-দুঃখী নীচ-অস্পৃশ্য সকলেরই মা তিনি। যে নিকটে আসে, দর্শন ক'রে মিষ্টবাক্য, প্রসাদ পায়; মায়ের স্নেহ-ব্যবহারে স্নিগ্ধ হইয়া তাহার প্রাণ জুড়ায়। একটি বিধবার পুত্র মারা গিয়াছে, শোকার্তা জননী মায়ের নিকট আসিয়া নিজের দুঃখভার লাঘব করিবার জন্য পুত্রের কথা বলিতে বলিতে উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার শোকা-বেগ মা নিজ অন্তরে ধারণ করিয়া নিজেও তাহারই সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, সেই রোদনধ্বনি শুনিয়া আশ্রমস্থ লোকেরা ছুটিয়া আসিল। মা পুত্রশোকার্তা জননীর মতোই সেই পুত্রহারার সঙ্গে এমনিভাবে হৃদয়বিদারক করুণস্বরে কাঁদিতেছেন যে, দেখিয়া সকলেই অবাক্। মনে হইল যেন সত্যই তাঁহার পুত্রবিয়োগ হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে পুত্রহারার শোকাবেগ অনেকটা শান্ত হইল, চক্ষু মুছিয়া মাকে প্রণাম করিয়া অনেকটা হালকা হৃদয়ে সে বিদায় চাহিল। মা-ও স্বীয় অশ্রু সংবরণ করিয়া স্নিগ্ধবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা ও প্রসাদ দিয়া 'আবার এসো' বলিয়া বিদায় দিলেন। মা তাহাকে একখানা নূতন বস্ত্রও দিয়াছিলেন মনে হয়।

দুঃখের ঘটনা শুনিলেই মায়ের কোমল মন অধীর হইয়া উঠিত। প্রথম জার্মান যুদ্ধ চলিতেছে, বস্ত্রাভাব ভীষণ, মেয়েদের লজ্জানিবারণ কঠিন হইয়াছে। মায়ের সন্তান বিভূতি বাবু একদিন আসিয়া জানাইলেন—তিনি বিষ্ণুপুরে মায়ের বিশেষ ভক্তসন্তান ৺সুরেশ্বর বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন। সুরেশ্বর বাবুর তরুণী মেয়ে ঘরের ভিতর থেকে বলিল, 'কাকা! এখান থেকেই প্রণাম কচ্ছি। পরণের কাপড়ের অবস্থা এমনি যে, বাইরে এসে আপনাকে প্রণাম করতে পারব না।' শুনিয়া বিভূতি বাবু তাঁহার চাদরখানা ঘরের ভিতর ছুঁড়িয়া দেন। তাহাই গায়ে জড়াইয়া মেয়ে বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিয়া যায়। শুনিয়া মা খুব অশ্রুবিসর্জন করিলেন। ইহার পরই পাড়ায় একজন একখানা সংবাদপত্র আনিয়া মাকে পড়িয়া শুনাইল—কোথাও কোথাও মেয়েরা কাপড়ের অভাবে লজ্জানিবারণে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এইসকল হৃদয়বিদারক ঘটনার বিবরণ ভাবিতে ভাবিতে মা কাঁদিতে লাগিলেন, প্রথম ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিলেন, শেষে একেবারে বালিকার মতো অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন, 'পরণের কাপড় না পেলে মেয়েরা কি করবে! লজ্জা-সরম বাঁচাতে গিয়ে আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় কি!'— এইসকল উক্তি করিতেছেন আর ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছেন। অবোধ বালিকাকে প্রবোধ দিবার আর ভাষা নাই! তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহাদেরও বদন বিষণ্ণ, হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সারা ভারতের সকল নারীর বস্ত্রাভাবের দুঃখ মায়ের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইয়া আর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহারা শুনিতেছেন তাঁহারাও নিজেদের নিরুপায় দুরবস্থার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। মা রাজ্য-শাসক ইংরেজরাজের দোষেই এই দুর্দিন, মনে

করিয়া তাহারা কবে এদেশ ত্যাগ করিবে, সেজন্য অধীর হইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে গো'। ইংরেজ কবে দেশত্যাগ করিবে, কবে সেই সুদিন আসিবে জানিতে মা ব্যগ্র হইয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শ্রোতারা মৌন হইয়া শুনিতেছেন, দেখিতেছেন তাঁহার আর্তি! তার-পর একটু সামলাইয়া লইয়া আপশোস করিতে লাগিলেন—দেশের লোক নিজেদের চরকায় সুতাকাটা ও বস্ত্রতৈয়ারের কাজ ছাড়িয়া দেওয়াতেই আজ এই দুঃখকষ্ট। মা বলিলেন, 'কোম্পানী সুখ দেখিয়ে দিলে— টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাউ তার উপর। ঘরে ঘরে চরকা ছিল, সব উঠে গেল, সস্তায় কাপড় পেয়ে সব বাবু হয়ে গেল, এখন সব বাবু কাবু হয়েছে!'

পুলিশের হস্তে ধৃতা হইয়া সিন্ধুবালা নাম্নী গর্ভবতী যুবতী রমণীর অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিবার সংবাদ শুনিয়াও মা অতীব অধীর হইয়া ক্রন্দন করেন; ইংরেজ-রাজত্বের অবসান কামনা করেন, এবং ঐ সকল অত্যাচারের প্রতিবিধান ও প্রতিরোধ করিতে দেশবাসীর উদ্যম প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন। মায়ের বাল্যকালে ইংরেজ-শাসনে, বিশেষতঃ ভিক্টোরিয়ার হস্তে রাজ্যভার যাওয়ার পর হইতে দেশে অনেক সুশৃঙ্খলা প্রবর্তিত হওয়ায় দেশবাসীর অন্তরে ইংরেজদের প্রতি খুব শ্রদ্ধাবিশ্বাসের ভাব বর্তমান ছিল। কিন্তু আর্থিক শোষণে দেশে দুঃখ-দুর্দশা দিন দিন বাড়িতে থাকায় লোকে উহাদের উপর অবিশ্বাসী হইয়া উহার প্রতিকার-চেষ্টা আরম্ভ করিলে বিরোধ উপস্থিত হইল এবং দেশের লোকের উপর শাসক-গোষ্ঠী ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। মা স্বচক্ষে এইসকল ঘটনা অনেক দেখিয়া, স্বকর্ণে অনেক শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে ইংরেজ-শাসনের অবসান কামনা করিতেন। নতুবা ইংরেজ জাতি বা তাহাদের ধর্মসম্প্রদায়ের উপর তাঁহার কোন বিদ্বেষের ভাব কখনও দেখা যায় নাই, বরং তিনি তাহাদিগকেও নিজের সন্তান বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার আশ্রিত ইংরেজ ও অপর খৃষ্টানেরা সমান স্নেহ-মমতা লাভ করিয়াছেন।

অপরের মনোব্যথা মায়ের হৃদয়ে কতদূর প্রবেশ করিত, তাহার আর একটি ঘটনা উল্লেখ-যোগ্য। মায়ের সন্তান জনৈক লেখক তৎপ্রণীত একখানা পুস্তক 'ধ্রুবচরিত' মাকে পাঠাইয়া-ছেন। পুস্তক পাইয়া মা খুশী হইয়া শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে একদিন সন্ধ্যার পর সেজন্য আয়োজন করা হইল। বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া মা পাঠ শুনিতে বসিলেন, সঙ্গে বাড়ীর অন্য মেয়েরাও বসিয়াছেন। একটি ছেলে একটু দূরে পৃথক্ আসনে বসিয়া পাঠ করিতেছে। পাঠ একটু অগ্রসর হইয়াছে, সকলে আনন্দে শুনিতেছেন। এক স্থানে আসিল বিষাদকর একটি ঘটনার বর্ণনা। রাজা উত্তানপাদ সিংহাসনে বসিয়া তাঁহার অতি প্রেয়সী সুরুচির পুত্রকে স্নেহে কোলে তুলিয়া আদর করিতেছেন দেখিয়া সুরুচির সতীন সুনীতির পুত্র ধ্রুবও পিতার কোলে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইল। সুরুচি ধ্রুবকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, 'দুঃসাহসী বালক, যদি রাজার কোলে উঠবার সাধ হয়, তবে আবার সুরুচির গর্ভে এসে জন্মগ্রহণ কর।' স্ত্রৈণ রাজা সুরুচির ভয়ে বালক ধ্রুবকে কোলে লইতে সাহস করিলেন না। বালক দুঃখে কাঁদিতে লাগিল। মর্মন্তুদ ঘটনা শুনিয়া মা-ও কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। পাঠক একটু অপেক্ষা করিল। মা শান্ত হইয়া চক্ষু মুছিলেন। আবার পাঠ আরম্ভ

হইল। আবার দুঃখের কাহিনী—পাঁচবৎসরের বালক ধ্রুব তপস্যা করিয়া শ্রীহরিকে তুষ্ট করিবার জন্য বনগমনে উদ্যত। সুনীতি একমাত্র পুত্রের মুখ চাহিয়া দুঃখের জীবন যাপন করিতেছেন। সেই পুত্র মাকে ছাড়িয়া বনে যাইতে চায়। সুনীতি কত বুঝাইতেছেন, ধ্রুব কিছুতেই সম্মত হইতেছে না। সুনীতির দুঃখে মায়ের হৃদয় বিগলিত হইল, তিনিই যেন সুনীতি, পুত্রকে বনে পাঠাইতে প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, কাঁদিয়া ভাসাইতেছেন। পাঠক শ্রোতা সকলে নির্বাক হইয়া স্থির নয়নে এই অদ্ভুত শোকোচ্ছ্বাস দেখিতেছেন। একটু পরে মা সুস্থির হইলে আবার পাঠ চলিল। ধ্রুব একাকী বনের পথে বাহির হইলেন। মায়ের চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। দুর্গম বনপথে ধ্রুব ভগবানের কৃপায় নানাপ্রকার সহায়তা লাভ করায় মায়ের মনে উল্লাস হইল, মুখে হাসি ফুটিল। পরে নারদের আবির্ভাব ও সদুপদেশ-প্রদানের কথা শুনিয়া অধিকতর সুখী হইয়া উল্লসিত প্রাণে সকলকে বলিলেন, 'ছাখো ছাখো, ভগবানের করুণা! তাঁকে যারা চায় তিনি তাদের কেমন সাহায্য করেন!' পাঠ অগ্রসর হইল, আসিল ধ্রুবের কঠোর তপস্যার কথা; দুর্গম শ্বাপদসঙ্কুল বনে নানাপ্রকার বিভীষিকার বর্ণনা। বালক ধ্রুবের চিত্ত ভয়ে কাঁপিতেছে, নিরুপায় অসহায় বালক একাকী কাঁদিতেছে। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা শুনিয়াই মায়ের চিত্ত বিগলিত হইয়া গেল। তাঁহার নিজ সন্তান—ক্রোড়ের শিশু জ্ঞানে ধ্রুবের জন্য কাঁদিয়া ভাসাইতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া একটু আত্মসংবরণ করিলেন। পাঠক পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার মা ধ্রুবকে স্মরণ করিয়া আকুল হইলেন এবং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মন প্রাণ যেন সেই ঘোর জঙ্গলে গভীর রাত্রিতে ধ্রুবকে রক্ষার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। অন্যান্য শ্রোতা, পাঠক, সকলেই নিস্তব্ধ, এই অদ্ভুত শোকোচ্ছ্বাস কিছুক্ষণ দেখিয়া চুপি চুপি উঠিয়া সরিয়া গেলেন। পুস্তক আর পড়া হইল না। সকলেরই হৃদয় শোকাচ্ছন্ন—কাহার জন্য? কে বলিবে?

[ক্রমশঃ]

সুনীতি।

হে অনাথ-নাথ!
ভুলনা ভুলনা বালক আশ্রয় চায়,
দীনবন্ধু নাম তব প্রভু,
দীন বালকে দুর্গমে,
করুণানয়নে
দেখো পদ্মপলাশলোচন;
তোমা বিনে অরণ্যে কে রাখে তারে,
কৃপাসিন্ধু!
দুখিনীর নিধি দুখিনী সঁপিছে পায়,
রেখো, রেখো অজ্ঞান বালকে,
ওমা এতদিনে সকলই ফুরাল মোর।

ধ্রুব। (গীত)

কোথা পদ্মপলাশলোচন!
বলেছে মা আমারে বনে পাব দরশন
কখনো ত দেখিনি তোমায়,
দেখা দিয়ে রাখ রাঙা পায়।
দয়াময়, প্রাণ তোমারে চায়;
তোমায় না ডেকে
বৃথা গিয়েছে কত জনম।
হরি, পদ্মপলাশলোচন হরি—
কোথা তুমি, দেখা দাও,
আমি অবোধ অজ্ঞান,
আমায় দেখা দাও।

—**গিরিশচন্দ্র ঘোষ** : ধ্রুবচরিত্র, ৪র্থ অঙ্ক, ষষ্ঠ ও ৭ম গর্ভাঙ্ক

কান্‌হেরি গুহায় বুদ্ধ*

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

প্রভু!

পর্বতপ্রাচীরে-ঘেরা কৃষ্ণগিরিমূলে
কোনোদিন থেমেছিল এসে
চিরপরিব্রজ্যারত ও দুটি চরণ,
অভয় শরণ!
(কে জানে! কে সে-কথা জানে!)

কৃষ্ণগিরি—কান্‌হেরির গুহা-বেদী থেকে
দিকে দিকে জেগে আছো রূপে রূপান্তরে
সেই ধ্যান, সেই তৃপ্তি, করুণা অধরে
রেখায়িত
স্তূপায়িত
পাষাণের স্তরে!

গুহা থেকে গুহা ঘুরে প্রতিধ্বনি ওই বেজে চলে—
'নিয়ত স্মরণ
জন্মে জন্মান্তরে দুটি কমল-চরণ
ত্রিতাপ-হরণ!'

যুগ থেকে যুগান্তের কালচক্রপথে
বুদ্ধ চলে,
মহাসঙ্ঘ চলে,
ধর্ম চলে,
ইতিহাস চলে!

---

* বোম্বের অদূরে কান্‌হেরি গুহা-দর্শনে।

চৈত্যে স্তূপে প্রাচীরে মন্দিরে
গুহাচিত্রে পর্বতে কন্দরে
শত বুদ্ধ বিকশিত
লক্ষ কোটি অন্তরে অন্তরে।

কান্‌হেরির নির্জন গভীরে—
আত্মদীপ বোধিসত্ত্ব
বহুরূপে
একা জেগে আছে।
(আছে, আজো বুদ্ধ আছে।)

লণ্ঠন

বকলম

রাতের আঁধারে লণ্ঠন হাতে ঘুরে বেড়াও,
ঐ লণ্ঠনে সকলের মুখ দেখতে পাও;
আমাদের পরস্পরের মুখ-দেখা আয়না—
ও আলোয় কিন্তু তোমার মুখ দেখা যায় না।

কৃপা-কিরণ ছাড়া শরণ নেইতো অতএব,
তমোহারী লণ্ঠনধারী সার্জন সাহেব!
নিজের মুখের ওপর একবার আলো ধরো—
একটিবার দেখা দিয়ে আঁধার ধন্য করো।

চিন্ময়ী দিল দেখা

স্বামী প্রত্যয়ানন্দ

[রাগ কলাবতী—তাল দাদ্‌রা]

চেন কি তাহারে যাঁর আঁখিধারা
শেখাল মায়েরে ডাকা
ভবতারিণীর প্রতিমা-পাষাণে
চিন্ময়ী দিল দেখা ॥

সাধনার যত ছোট নদীধারা
কোন্ সাগরেতে হ'ল কূলহারা
ভেদাভেদ ভুলে হ'ল একাকারা।
নবযুগ-লিপিলেখা!
ভবতারিণীর প্রতিমা-পাষাণে
চিন্ময়ী দিল দেখা—

ত্যাগ ও সেবার শেখাল মন্ত্র
নববেদ-রূপায়ণে—
জীবে দয়া নয়, জীবে শিবসেবা
নররূপে নারায়ণে।

ভালবাসা যাঁর এপারে-ওপারে
বেঁধে দিল ধরা এক পরিবারে
'যত মত তত পথে'র প্রান্তে
জ্বালায়ে মিলন-শিখা।
ভবতারিণীর প্রতিমা-পাষাণে
চিন্ময়ী দিল দেখা ॥

শরণাগতি

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

তোমারি চরণ করেছি শরণ
জীবন ভ'রে।
হে মোর ঠাকুর, অহমিকা হ'তে
বাঁচাও মোরে।

পারিনাক আর বহিতে এ ভার,
দুঃসহ জ্বালা প্রাণে অনিবার,
তোমার করুণা-পরশ হে প্রভু
দাও গো শিরে।

দয়াল যে তুমি সব লোকে বলে,
ভুলাতেছ কেন তবু নানা ছলে?
ক্ষম অপরাধ যত কিছু মোর
করুণা ক'রে।

এসেছো জগতে কৃপাঝারি হাতে
বর্ষিছ কৃপা পাপী তাপী মাথে
অনাথ আতুর সকলে রয়েছে
তোমারে ঘিরে।

তাদেরি মাঝারে স্থান দাও মোরে,
কৃপাকণাটুকু পাই যেন শিরে
শরণাগত যে তাহারে আজিকে
রেখো না দূরে।

চরণে তোমার আশ্রয় মাগি
লও প্রভু মোরে করুণা ক'রে।

অনন্ত প্রশ্ন

শ্রীমতী মাধুরী রায়

এই জগতের সৃষ্টি-লীলায়
সবই অস্থায়ী নয়,
কিছু স্থায়ী হ'য়ে রয়,
স্থায়ীও তো সব নয়!
অপরূপ এই ভাঙা-গড়া খেলা,
সব রহস্যময়।

উজ্জ্বল ওই সুনীল গগন,
উর্ধ্বলোকের ধেয়ানে মগন,
ছায়া মেলি তার ধরণীর শিরে
রহে নাই চিরদিন,
কার স্নেহ-ক্রোড়ে শিশু ধরিত্রী
হেরিল প্রথম দিন?

অনাদিকালের বিস্মৃত যুগে
আকাশ বাতাস ছিল কোন্ রূপে?
জলধি কি তার অসীমতা মাঝে
রেখেছিল সব ঢাকি?
জিজ্ঞাসা মোর পাখা মেলে যদি
উত্তর মেলে নাকি?

সৃষ্টি উষার পূর্ব নিশায়,
নাহি ছিল ভেদ রাত্রি দিবায়।
না ছিল জীবন, না ছিল মৃত্যু
যুগল প্রবাহ ধার,
শুধু ছিল এক অরূপ চেতনা
সবই যার নিরাকার।

অন্ধকারের আবরণতলে,
বিষাদের গাথা গাহি কল্লোলে,
উন্মাদ বেগে বহিত সাগর
অন্ধ আবেগ ভরে,
সৃষ্টি স্বপন দেখিত কি কেহ
বসি তারি তট পরে?

অবসান হোল সে তামসী রাত,
তারপরে এলো প্রথম প্রভাত,
সাগর-উর্মি অগ্নিশিখার
অগ্নি-কণিকা আনি,
রচিয়া তুলিল কঠিনে মধুরে
প্রকৃতির রূপখানি।

তারপরে সুরু হোল কার খেলা!
এলো গেল কত মানুষের মেলা,
শ্যাম ধরার অঙ্গন-মাঝে
নর-নর বাঁধে ঘর,
নিম্নে প্রকৃতি, উর্ধ্বে শকতি
রহে অবিনশ্বর।

তারপরে এলো কত কবিদল,
আসিল প্রেমিক, ভাবের পাগল,
অসীমের সাথে সসীমেরে তারা
বাঁধিতে চাহিল রাখি,
এত সম্পদ পেল তারা কোথা
এত রূপ-রস মাখি?

উত্তর মোরে দিবে কেবা হায়!
ভাঙন, গড়ার বাঁশী কে বাজায়?
আকাশ মৌন, বাতাস নিথর
কেহ নাহি কিছু কহে,
জিজ্ঞাসা মোর কালের বুকেতে
অনন্ত হ'য়ে রহে।*

* নাসদীয় সূক্তের (ঋগ্বেদ, ১০।১২৯) ভাবাবলম্বনে।

ভরসা

শ্রীমতী মানসী বরাট

ঠাঁই যদি পাই ঐ চরণে, ভবের হাটে ভয় কি আর।
কুড়াই যতই নিন্দা-স্তুতি লাভ কি ক্ষতির নাই বিচার।
রইল কত হারাল কি হিসাব-নিকাশ কে আর যাচে,
শ্রীশ্রীচরণ পরম সে-ধন হৃদয়মাঝে আছে আছে।
রাত্রিদিবা জপলে সে-নাম অভ্যাসেতেই নির্ভুলে
মরণকালে আসবে মনে যাব ভবের নীড় তুলে।
কৃষ্ণই রাম রামকৃষ্ণ অবিরত গুঞ্জরণ
পরম চরম ভরসা আমার কৃপাময়ের ঐ চরণ।

তোমারে চাহিয়া

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

তোমার অসীম গগন বাহিয়া অমৃতধারা ঝরিছে,
তোমার বুকের আনন্দস্রোতে ভুবন গগন ভাসিছে।
তোমার করুণা প্রেমের স্পর্শে
জীবন-প্রবাহ বহিছে হর্ষে।
তোমারে চাহিয়া তোমারে খুঁজিয়া গ্রহ তারা সব ছুটিছে।

তোমার প্রাণের গন্ধ বহিয়া কুসুম খুশীতে হাসিছে,
অযুত অনূপ-সুন্দর-রূপে মুগ্ধ পাখীরা গাহিছে।
তোমার ছন্দ নদীস্রোতে ফোটে,
আনন্দে সুখী সমীরণ ছোটে।
তোমার চরণ স্পর্শ করিতে পুলকে আলোক নাচিছে।

লক্ষ জনম তোমারে চাহিয়া লক্ষ মরণে ছুটেছি,
জীবনে জীবনে জনমে মরণে ভুবনে ভুবনে খুঁজেছি।
তোমারে চাহিয়া আসি আর যাই,
তোমারে খুঁজিয়া কোথা নাহি পাই।
মায়ার সাগরে ডুবি আর ভাসি, তোমারে চাহিয়া চলেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী—বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে*

স্বামী গহনানন্দ †

ওঁ অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়
আবিরাবির্ম এধি॥

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন যে, তিনি যুগে যুগে ধর্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হন। বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্যরূপে ভগবানই এসেছিলেন ধর্মসংস্থাপনের জন্য। আর এই গত শতাব্দীতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবও সেই একই উদ্দেশ্যে। আজকের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহৎ জীবন ও উদ্দীপনাময়ী বাণীর অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কারণ বর্তমানে আমাদের দেশে যে-সব জটিল সমস্যার কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, সেগুলির সমাধানসূত্র তাঁর জীবন ও বাণীতেই আমরা সহজে পেতে পারি।

অনেকের ধারণা শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিরক্ষর, অশিক্ষিত ছিলেন। এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। যদিও তিনি তথাকথিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, তবু নিঃসন্দেহে তিনি লিখতে ও পড়তে পারতেন এবং সর্বপ্রকার দৈনন্দিন আচারে-আচরণে তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত মনের অধিকারী ছিলেন। একথা অবশ্য সত্য যে, অর্থকরী বিদ্যার্জনের পরিবর্তে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি অধ্যাত্মসাধনায় নিয়োজিত করেছিলেন। তবু আমরা লক্ষ্য করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপরা বিদ্যারও সমাদর করতেন। 'যে একটি বিদ্যাতে নিপুণ তার পক্ষে ঈশ্বর লাভ সহজ', 'যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি', —ইত্যাদি উক্তি তাঁর উপদেশে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর নিরক্ষর শিষ্য লাটুকে (পরবর্তী কালে স্বামী অদ্ভুতানন্দ) বর্ণপরিচয় শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই আদর্শ স্মরণ ক'রে যদি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি একজনকেও কিছুটা শিক্ষিত করবার চেষ্টা করেন তাহলে শিক্ষা-প্রসারের অগ্রগতি হতে পারে।

জাতিভেদের কুফলের কথা আমরা সকলেই জানি এবং বর্তমানে এই বংশগত জাতিভেদ-প্রথা দূর করতে অনেকেই সচেষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। সে উপায় ভক্তি; ভক্তের জাতি নেই। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ পবিত্র হয়।' তিনি নিজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণবংশে জন্মেও সুবর্ণ বণিকের ঘরে খেয়েছেন এবং উপনয়নের সময় কামারকন্যা ধনীর কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁর এইসব উক্তি ও আচরণের সারমর্ম এই যে, তিনি গুণগত জাতিভেদ চাইতেন, বংশগত জাতিভেদ নয়। কে কোন্ বংশে জন্মেছে, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল কে কতটা গুণের অধিকারী এবং কত বেশী দেশের ও দশের সেবা করতে সমর্থ। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রদর্শিত পথে চলতে পারলে বংশগত

---

* ২০.২.৭৭ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথিতে আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রচারিত।

† কর্মসচিব, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, কলিকাতা।

জাতিভেদপ্রথার কুফল থেকে আমরা সহজেই মুক্ত হতে পারবো।

সদাচার ও সত্যনিষ্ঠার অভাবের ফলে কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, চোরাচালান, পণ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়া ইত্যাদি দুর্নীতিমূলক কাজ—রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের তিরিশ বছর পরেও আমাদের দেশে অব্যাহত রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'যারা বিষয়কর্ম করে—অফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যতে থাকা উচিত। সত্য কথা কলির তপস্যা', 'সত্যে আঁট থাকলে ঈশ্বরলাভ হয়' ইত্যাদি। তাঁর ধাত্রীমাতা কামারকন্যা ধনীকে তিনি ভিক্ষামাতা করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাই উপনয়নের সময়—যখন তাঁর বয়স ন বছর—বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সে সত্য রক্ষা করেছিলেন। সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে আশ্চর্য আশ্চর্য ঘটনা রয়েছে তাঁর জীবনে। সত্যনিষ্ঠার সর্বোচ্চ আদর্শ কি হতে পারে তা তিনি নিজের জীবনে দেখিয়ে গেছেন। সেই আদর্শের আংশিক অনুসরণও দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করতে পারে সন্দেহ নেই। সত্যানুরাগীর চারিত্রিক বলই আদর্শ সমাজের ভিত্তিস্বরূপ।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে যুবসমাজের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তরুণেরাই দেশের আশা-ভরসার স্থল। তাদের অশেষ প্রাণ-প্রাচুর্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত পথে সুষ্ঠু পরিচালিত হলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। এই যুবকদের শ্রীরামকৃষ্ণদেব খুবই ভালবাসতেন। ব্যাকুলতার সঙ্গে তাদের আহ্বান করতেন, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, আয়!' এসেছিলেনও সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ 'ইয়ং বেঙ্গল'। তাঁর সান্নিধ্যে এসে নরেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন ঈশ্বরতন্ময়তায় ডুবে থাকতে—নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে। তাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, 'ছি, ছি, তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম কোথায় তুই একটা বিশাল বট-গাছের মতো হবি—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে—তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস!' নরেন্দ্রনাথ বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হৃদয় কত মহান্। শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, নির্বিকল্প সমাধির চেয়েও উঁচু অবস্থা আছে। তিনি বলতেন: 'চোখ বুজলেই ভগবান আছেন, আর চোখ খুললেই নেই।' অর্থাৎ ধ্যান বা সমাধিতে ডুবে থেকে নয়—সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন সক্রিয়, সেই জাগ্রত অবস্থাতেও সর্বভূতে ভগবানকে প্রত্যক্ষ ক'রে তাঁরই সেবা করতে হবে। এইভাবে তিনি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মহিমময় দিকটি তুলে ধরলেন। যুবসমাজের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এটি চিরন্তন আহ্বান। যুবসমাজ কি সে ডাকে সাড়া দেবে না?

একবার বেরিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে সেবক মথুরামোহন বিশ্বাসের সঙ্গে। বৈদ্যনাথধামের কাছে একটি গ্রামের অধিবাসীদের দুঃখদারিদ্র্য দেখে তাঁর হৃদয় করুণাপূর্ণ হল। মথুরবাবুকে বললেন, 'তুমি তো মার দেওয়ান। এদের একমাথা কোরে তেল, একখানা কোরে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।' মথুর-বাবুকে ইতস্ততঃ করতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, 'দূর্ শালা, তোর কাশী আমি যাবো না। আমি এদের কাছেই থাকবো; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাবো না।' অগত্যা মথুরবাবু তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথামত সব ব্যবস্থাই করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুকে মা ভবতারিণীর দেওয়ান বলতেন। ধনীরা যদি

নিজেদের ধনসম্পদের একচ্ছত্র মালিক মনে না ক'রে সে-ধনকে ভগবানের সম্পদ এবং নিজেদের তার অছি (Trustee) মনে করেন এবং সেই সম্পদ 'বহুজনহিতায়' ব্যয় করেন, তাহলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে পর্বতপ্রমাণ ব্যবধান রয়েছে তার অবসান হতে পারে—শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে।

বৈষ্ণবমতে একটি প্রচলিত কথা আছে—'নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণবপূজন।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন ভক্তদের এই কথাটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। 'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলেই হঠাৎ তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরেই অর্ধবাহ্যদশায় বলতে লাগলেন, 'জীবে দয়া, জীবে দয়া ? দূর্ শালা। কীটাণু-কীট তুই জীবকে দয়া করবি ? দয়া করবার তুই কে ? না, না, জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'

ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই কথা সকলেই শুনে গেলেন, কিন্তু একমাত্র নরেন্দ্রনাথই তার তাৎপর্য বুঝলেন এবং তারই ফলস্বরূপ আজ তাঁর প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মিশন পৃথিবীর সর্বত্র এই শিবজ্ঞানে জীবসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে, নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আর্ত মানুষের ত্রাণকার্যে, রোগীদের সেবাশুশ্রূষায় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক অসংখ্য নরনারীর কাছে আধ্যাত্মিকতার উদারতম বাণী পৌঁছে দিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পথে।

সংসারীরা কি ভাবে সংসারে থাকবেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে বিষয়ে কি বলেছেন তা সকলেরই জানা দরকার। তিনি বলতেন: 'এক হাতে সংসারের কাজ করবে, অন্য হাতে ভগবানের পাদপদ্ম ধরে থাকবে'; 'তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়, তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ ক'রে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়'; 'নৌকা জলে থাক, কিন্তু জল যেন নৌকায় না ঢোকে। অর্থাৎ সংসারে থাক, কিন্তু মনের ভিতর সংসার ঢুকিও না—অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাক।' এই ধরনের সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সংসারী মানুষ কি ভাবে সংসারে থাকবে। তিনি বলতেন 'মানুষ—মানহুঁস। অর্থাৎ যার হুঁস আছে, চৈতন্য আছে'—সেই প্রকৃতপক্ষে মানুষ। যে নিজেকে হীন তুচ্ছ অকর্মণ্য মনে করে, যার নিজের উপর আস্থা নেই, সে ওই ধরনের চিন্তার ফলে ক্রমশঃ সত্যসত্যই অপদার্থ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যার নিজের উপর বিশ্বাস আছে, সে স্বভাবতই কোন হীন কাজ করতে পারে না। তার পক্ষে চরিত্রবান হওয়া সহজ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই 'মানুষ—মানহুঁস' কথাটি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এটি অনুসরণ করলে একজন ছাত্র ভাল ছাত্র হবে, একজন শিক্ষক আরও ভাল শিক্ষক হবেন; উকিল ডাক্তার সেবিকা ব্যবসায়ী শিল্পী শ্রমজীবী—প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নততর জীবনের অধিকারী হবেন। তাই এই সব কথা অনুসরণ ক'রে চললে প্রত্যেক মানুষই সংসারে থেকেও যথার্থ সুখী হতে পারবেন, অপরেরও সুখের কারণ হবেন—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আমরা সকলেই জানি আজ পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিশেষ ক'রে ভারতে তথা এশিয়া ভূখণ্ডে। তাই বেশ কিছুকাল আগে থেকেই আমাদের দেশে পরিবার পরিকল্পনার ওপর

জোর দেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা স্মরণ করতে পারি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা। তিনি বলেছিলেন: 'দু-একটি সন্তান হলেই স্বামী-স্ত্রী ভগবানে মন রেখে ভাই-ভগিনীর মত সংসারে থাকবে।' তাঁর এই একটি উপদেশ যদি আমাদের দেশ গ্রহণ করে, তাহলে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে।

মার্কস ফ্রয়েড প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীরা সমাজের মূল নিয়ন্তারূপে অর্থ ও কামের কথাই বলে গেছেন। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহ্য তা নয়। এদেশে যুগযুগান্তর ধ'রে ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের কথাই বলা হয়েছে। অর্থ ও কামকে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তাই ধর্মের স্থান সর্বাগ্রে। ধর্মব্যতিরিক্ত অর্থ ও কাম উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। তারপর আসে মোক্ষের কথা—চরম ও পরম পুরুষার্থের কথা। ধর্মই সেই চরম লক্ষ্যের অভিমুখে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রাচীন ভারতের এই বাণী যুগোপযোগী ভাষায় ব্যক্ত ও নিজ জীবনে মূর্ত করে গেছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবীও সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস সুদীর্ঘকাল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ ক'রে এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে, জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান ভারতীয় পন্থাতেই হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার সার্বভৌম বাণীর প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। ম্যাক্সমুলার রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ আরও পাশ্চাত্য মনীষী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের প্রাণপুরুষ··· যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্মপ্রবর্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টিস্বরূপ।' মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে আমাদের সহায়তা করে।'

সর্বধর্মস্বরূপ ধর্মের সংস্থাপক অবতারবরিষ্ঠ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আজ শুভ আবির্ভাব-তিথি। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে শত শত প্রণাম। প্রার্থনা করি—তাঁর জীবন ও বাণী যেন আমরা সর্বদা পুরোভাগে রেখে জীবনের পথে চলে অপার শান্তি ও অসীম আনন্দের অধিকারী হতে পারি, আমাদের মানবজীবন যেন সার্থক হয়।

ওঁ বন্দে জগদ্বীজমখণ্ডমেকং
বন্দে সুরাসেবিতপাদপীঠম্।
বন্দে ভবেশং ভবরোগবৈদ্যং
ত্বামেব বন্দে ভুবি রামকৃষ্ণম্॥ *
ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

* আকাশবাণীর সৌজন্যে

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দ্বিতীয় পর্যায়)

রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'

বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিজয়ী বিশ্বচমৎকারক শঙ্করের পরে এলেন রামানুজ—গ্রীষ্মের প্রচণ্ড প্রখর সূর্যালোকের পরে যেন ঘনিয়ে এল বর্ষার স্নিগ্ধ-শীতল মেঘমেদুর ছায়া; 'একত্বে'র অবিসংবাদী প্রভুত্বের পরে প্রথম পত্তন হ'ল 'দ্বিত্ব-বহুত্বে'র সাম্রাজ্যের; আরম্ভ হ'ল 'আপসে'র দিন; উচ্চতম নির্জনতম 'একত্ব'-শৃঙ্গ থেকে নিম্নের সানুদেশে লোকালয়ে প্রথম অবতরণের দিন; সাধারণ মানুষের বোধগম্য তত্ত্বের প্রথম অবতারণার দিন; পরিদৃশ্যমান শোভন-মোহন জগতের প্রথম রক্ষণাবেক্ষণের দিন; এবং দুর্ধর্ষ অপরাজেয় দিগ্বিজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ অদ্বৈত-যোদ্ধা শঙ্করের বিরুদ্ধে এইভাবে নির্ভয়ে সগর্বে সগৌরবে অস্ত্রধারণের যোগ্যতম সৈনিকরূপে উন্নত মস্তকে স্ফীত বক্ষে সমুপস্থিত হলেন সর্বজনবন্দ্য পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ভক্তাগ্রগণ্য তুল্য-সম্মাননীয় রামানুজ। তাঁর পূর্বে যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অজানা ছিল, তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা সর্বজন-স্বীকার্য যে, 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদে'র এরূপ পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ব্যাপক সুন্দর আলোচনা-প্রপঞ্চনা পূর্বে আর ছিল না, পরেও আর হয়নি। কেবল একটিমাত্র গ্রন্থের জন্যই—না, সেই গ্রন্থের কেবল একটিমাত্র—সূত্র-ভাষ্যের জন্যই, রামানুজ বিশ্ববিখ্যাত হতে পারতেন; শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ বরিষ্ঠ দার্শনিক ও নৈয়ায়িকরূপে সম্মানিত হতে পারতেন; অদ্বৈত-বেদান্তের স্থির সৌধের ভিত্তি-ভেদকরূপে পরিগণিত হতে পারতেন। সেই গ্রন্থটি হ'ল তাঁর সর্বজনবিদিত, সর্বজনসমাদৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য—'শ্রী-ভাষ্য'; এবং সেই সূত্র-ভাষ্যটি হ'ল ব্রহ্ম-সূত্রের প্রথম সূত্র 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র অতি বিস্তৃত, অতি বিদগ্ধ, অতি বিস্ময়কর ভাষ্য। এই একটিমাত্র সূত্রের এই অপরূপ অভিনব অত্যাশ্চর্য ভাষ্যে, 'লঘু-পূর্বপক্ষ' ও 'লঘু-সিদ্ধান্ত' এবং 'মহাপূর্বপক্ষ' ও 'মহাসিদ্ধান্ত' ব্যপদেশে, তিনি যেরূপ অদ্বৈত-বেদান্তকে পূর্বপক্ষরূপে অতি ব্যাপকভাবে ও তত্ত্বানুযায়ী স্থাপন; এবং তৎপরে, পুঙ্খানুপুঙ্খ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে খণ্ডন করেছেন, তা সত্যই অতি মনোমুগ্ধকর ও চিত্তচমৎকারক।

বস্তুতঃ তাঁর প্রচণ্ড প্রভাবে পরবর্তী সকল বেদান্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত জনই হয়ে পড়লেন তাঁরই মত 'দ্বৈত-অদ্বৈতে'র মধ্যে 'আপসকারী' মিলন-প্রয়াসী সমন্বয়বাদী; এবং শঙ্করের নির্ভেজাল নিঃসর্ত আত্মবিশ্বাসদৃঢ় ঐশ্বর্যসুসমৃদ্ধ গৌরব-গরিষ্ঠ তেজোদৃপ্ত জ্ঞানদীপ্ত অদ্বৈত-মতবাদকে জনসাধারণের নিকট ভক্তি-প্রীতির মধুরাবেশে আশ্লিষ্ট ক'রে সহজতর সরলতর কোমলতর কমনতর মধুরতর মোহনতর স্নিগ্ধতর শীতলতর রূপে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টাকারী। ফলে সুবিখ্যাত দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়ের বিশ্ববরেণ্য দশজন আচার্যের মধ্যে শঙ্কর হয়ে পড়লেন একেবারেই একা একঘরে—অবশিষ্ট নয়জনই হয়ে পড়লেন তাঁর ঘোরতর বিপক্ষে, তাঁর ভীষণ বিরুদ্ধাচারী—এবং উপরের এই 'Toning

down, compromising, placating process', অথবা, সরলীকরণ কোমলীকরণ মধুরীকরণ পদ্ধতি চরমোৎকর্ষ লাভ করল গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তের অভিনব মতবাদ 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদে',—যখন থেকে 'ভাবনা'কে বিসর্জন দিয়ে 'ভাব'কেই দেওয়া হ'ল সমধিক গুরুত্ব; 'যুক্তি'র স্থলে উদয় হ'ল 'ভক্তি'; 'ঐশ্বর্যে'র স্থলে 'সৌন্দর্য'; 'বীর্যে'র স্থলে 'মাধুর্য'; 'গাম্ভীর্যে'র স্থলে 'সৌকর্য'। এতদিনের কেবল জ্ঞানালোকে বিকশিত জীবন-শতদলটি সিঞ্চিত করতে লাগল ভক্তিরও মধু, নিষ্কাম কর্মেরও সৌরভ—'জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া' (রবীন্দ্রনাথ)। এই অপূর্ব ধারারই পূজ্যপাদ জনক রামানুজ, যাঁর পুণ্য নাম, ধন্য 'শঙ্কর'-নামের সঙ্গে চিরকাল একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে আছে ('শঙ্কর-রামানুজ') সমমর্যাদায় সমমহিমায় সমমধুরিমায়।

কোমলহৃদয় করুণাবরুণালয় রামানুজ ব্যথিত-বিক্ষুব্ধচিত্তে দেখলেন ব্রহ্মের সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে—জীবকেও যিনি গলাধঃকরণ করলেন, জগৎকেও, নির্মম নির্বিকার ভাবে নিজের মধ্যে 'স্বগত-ভেদ'টুকুও না রেখে। সেজন্য বীর-যোদ্ধা রামানুজ নির্ভয়ে করলেন মূলকেই আঘাত—সদর্পে আক্রমণ করলেন স্থিরবিশ্বাসভরে শঙ্করের বিশ্ববিশ্রুত 'ব্রহ্মবাদ'কে আদ্যোপান্ত—রাখলেন কেবল একটিমাত্র মূলসূত্রকে বাঁচিয়ে সানন্দে—ব্রহ্মের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।২।১) স্বরূপকে, কারণ, এটিকে ত কোনোক্রমেই বাদ দেওয়া চলে না। ব্রহ্ম নিশ্চয়ই 'এক' এবং 'অদ্বিতীয়'—তাঁর নিশ্চয়ই 'সজাতীয়' ও 'বিজাতীয়' কোনো প্রকারের ভেদ একেবারেই নেই, যেহেতু তিনি সর্বব্যাপী; তাঁর বাইরে 'সজাতীয়' বা একই শ্রেণীভুক্ত 'ব্রহ্ম', 'দেবতা' প্রমুখ অন্য কোনো জন; এবং 'বিজাতীয়', অথবা ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত 'দৈত্য', 'দানব', 'অসুর' প্রমুখ অন্য কোনো জন বা বস্তু থাকতেই পারে না কোনো দিনও কোনো ক্রমেই। কিন্তু তাঁর 'স্বগত' বা স্বীয় সত্তার অন্তর্ভুক্ত ভেদ নিশ্চয়ই আছে। যথা, তিনি 'দ্রব্য'-শ্রেষ্ঠ 'দ্রব্য' এবং সেজন্য তাঁর গুণ—অসংখ্য শ্রেষ্ঠ গুণ নিশ্চয়ই আছে। তিনি 'শক্তিমান'—শ্রেষ্ঠ 'শক্তিমান', এবং সেজন্য তাঁর শক্তি,—অসংখ্য শ্রেষ্ঠ শক্তি নিশ্চয়ই আছে। তিনি 'কারণ'—শ্রেষ্ঠ 'কারণ', এবং সেজন্য তাঁর কার্য,—অসংখ্য শ্রেষ্ঠ কার্য নিশ্চয়ই আছে। তিনি 'অংশী'—শ্রেষ্ঠ 'অংশী' এবং সেজন্য তাঁর অংশ,—অসংখ্য শ্রেষ্ঠ অংশ নিশ্চয়ই আছে। তা হ'লে জীব-জগৎকে যখন সরাসরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, সরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, দমিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, তখন তাদের ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন ক'রে না দিয়ে,—তা হ'লে ত তাদের বাঁচিয়ে রাখা হবে না, মেরেই ফেলা হবে জ্ঞানে অজ্ঞানে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, যে প্রকারেই হোক না কেন—তাঁর শাশ্বত 'স্বগত-ভেদ'রূপে রাখা যাবে না কেন? তাতে ত ব্রহ্মের মূলীভূত 'একত্ব-অদ্বিতীয়ত্বে'র হানি হবে না কণামাত্রও। যথা, উদ্যানে একটি মাত্র 'বৃক্ষ'ই অবশিষ্ট রয়েছে—সেজন্য, সেই স্থানে সেটি নিশ্চয়ই 'এক' ও 'অদ্বিতীয়'। অথচ, তার নিজেরই মধ্যে নিজেরই অংশরূপে রয়েছে অসংখ্য মূল কাণ্ড পত্র পুষ্প ফল শাখা প্রভৃতি—তারা ত কেউই স্বতন্ত্র 'বৃক্ষ' নয়, যে তারা ব্রহ্মের 'একমেবাদ্বিতীয়ত্ব' বিন্দুমাত্রও ব্যাহত বা প্রতিরুদ্ধ করবে। এরূপে, ব্রহ্ম 'স্বগতভেদবান্' হ'লেও 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' নিঃসন্দেহে।

অতএব ব্রহ্ম 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' হলেও স্বগতভেদবান্ ব'লে 'নির্বিশেষ' 'নির্গুণ' 'নিষ্ক্রিয়'

নন, পরিপূর্ণ এবং শাশ্বত ভাবে 'সবিশেষ' 'সগুণ' ও 'সক্রিয়'। রামানুজ 'ব্রহ্মে'র একটি সুন্দর সুসংবদ্ধ সুবিস্তৃত সংজ্ঞা দান করেছেন তাঁর প্রখ্যাত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য 'শ্রীভাষ্যে'র প্রারম্ভেই —'ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্ত-নিখিল-দোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণ-গুণগণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে। সর্বত্র বৃহত্ত্ব-গুণ-যোগেন হি ব্রহ্মশব্দঃ। বৃহত্ত্বঞ্চ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ যত্রানবধিকাতিশয়ং সোঽস্য মুখ্যোঽর্থঃ'। (শ্রীভাষ্য ১।১।১) অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা স্বভাবতই সর্বদোষবর্জিত, অসীম ও সর্বাতিশায়ী অসংখ্য মঙ্গলময় গুণে মণ্ডিত 'পুরুষোত্তম'ই অভিহিত হন। 'ব্রহ্ম' শব্দ সর্বত্রই বৃহত্ত্ব'-গুণের সম্বন্ধের জন্যই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। যাঁতে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম ও নিরতিশয় (সর্বাতিশায়ী) বৃহত্ত্ব বর্তমান, তিনিই—'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থ।

এই সুন্দর সুবিস্তৃত সংজ্ঞাটি এস্থলে উদ্ধৃত করা হ'ল এই জন্যই যে, পরবর্তী দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ সকলেই ব্রহ্মের এই সংজ্ঞাটিকেই গ্রহণ করেছেন সাগ্রহে সাদরে সানন্দে সশ্রদ্ধায়।

সুতরাং রামানুজ ও তাঁদের সকলের নিকটই 'ব্রহ্ম' শঙ্করের 'ব্রহ্মে'র ন্যায় নৈর্ব্যক্তিক 'It' নন—'He', অথবা পুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ—'পুরুষোত্তম'। যা পূর্বেই বলা হ'ল, একদিকে তিনি যেমন অসংখ্য অচিন্ত্য অবর্ণনীয় কল্যাণ-গুণ-বিমণ্ডিত, অন্যদিকে ঠিক তেমনি সম্ভাব্য সকল প্রকার হেয়গুণবিবর্জিত শাশ্বতকাল। সেজন্য তিনি 'নির্গুণ' নন; শাশ্বতভাবে,—পরিপূর্ণভাবে 'সগুণ'। পুনরায় তিনি একেবারেই 'নিষ্ক্রিয়' নন; পরিপূর্ণভাবে 'সক্রিয়'—সৃষ্টি ও মুক্তি তাঁর প্রধান কর্মদ্বয়।

এরূপে শঙ্করের নির্ভীক অত্যাশ্চর্য 'বিবর্তবাদে'র স্থলে রামানুজ আনলেন তুল্য নির্ভীকভাবে তাঁর সেই সুবিখ্যাত 'পরিণামবাদ'। পরবর্তী দ্বৈতবাদী ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সকল বৈদান্তিক কর্তৃক সাদরে গৃহীত এই অনুপম সৃষ্টিপ্রণালী-মূলক 'পরিণামবাদ' অনুসারে পরম-চরম-কারণ 'ব্রহ্ম' সত্যসত্যই কার্যরূপ জীব-জগৎ সৃষ্টি করছেন; স্বয়ং জীবজগতে পরিণত রূপান্তরিত রূপায়িত লীলায়িত হয়ে। যথা, কারণ মৃৎপিণ্ড কার্য মৃন্ময়-ঘটে পরিণত রূপান্তরিত হয়, যন্ত্রাদিসহিত শক্তিসমন্বিত কুম্ভকারের সাহায্যে। এস্থলে মৃৎপিণ্ড 'উপাদান-কারণ', কুম্ভকারাদি 'নিমিত্ত-কারণ'। কিন্তু সর্বব্যাপী ব্রহ্মের ক্ষেত্রে স্বয়ং তিনিই একাকী জীব-জগৎ-সমম্বিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের 'অভিন্ন-নিমিত্ত-উপাদান-কারণ'—তিনি উপাদান-কারণরূপ '**নিজেকেই**' নিমিত্ত-কারণ রূপে '**নিজেই**' জীবজগতে সত্যসত্যই পরিণত করেছেন, লীলাভরে। সেজন্যই উপনিষদে বলা হয়েছে—

'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ ২।৭।১)

অর্থাৎ তিনি স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করলেন। এস্থলে 'আত্মানম্' (আপনাকে) শব্দের তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্ম 'উপাদান-কারণ'; এবং 'স্বয়ং' (আপনিই) শব্দের তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্ম 'নিমিত্ত-কারণ'।

পুনরায়, সাধারণতঃ, বিদ্যাবুদ্ধিপ্রসূত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মের পশ্চাতে থাকে একটি অতৃপ্ত কামনা, অপ্রাপ্ত লক্ষ্য বা বস্তু—যে কামনা চরিতার্থ করবার জন্যই, যে লক্ষ্য বা বস্তুটি লাভ করবার জন্যই কর্তা সেই কর্মটি করেন। এরূপে, অভাবজনিত দুঃখক্লেশ দূর করবার জন্যই সাধারণ সাংসারিক কর্ম সম্পাদন করা হয়। যথা, আহারের অভাবে দুঃখক্লেশ-পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, এবং তা দূর করবার

জন্যই ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আহার্য দ্রব্য সংগ্রহে রত হন। কিন্তু অনন্ত-অচিন্ত্য-গুণ-শক্তিমান ব্রহ্ম ত নিত্যতৃপ্ত নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত নিত্যপূর্ণ আপ্তকাম—তাঁর ক্ষেত্রে কোনোপ্রকার অভাব ও তজ্জনিত দুঃখক্লেশের কোনোরূপ প্রশ্নই উঠে না কোনোদিক থেকেই কোনোদিনও। তা হ'লে তাঁর সৃষ্টিরূপ কার্যটি কোন্ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তিনি করেন? এস্থলে সাধারণ কোনো উদ্দেশ্য ত থাকতেই পারে না—সেজন্য তাঁর এই সৃষ্টিরূপ সুন্দর কার্যটি অভাব-প্রসূত নয়, স্বভাবপ্রসূত। তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—'আনন্দ'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ স্বরূপ—'সৎ' ও 'চিৎ'-এর নির্যাসস্বরূপ পরিপূর্তিস্বরূপ পূর্ণতম প্রকাশস্বরূপ। কিন্তু আনন্দের স্বভাবই হ'ল—নিজেকে বাইরের কার্যকলাপাদিতে প্রকাশিত করা। যথা, সার্বভৌম সম্রাটের কোনোরূপ অভাব নেই ব'লেই, তিনি আনন্দসহকারে খেলায় প্রবৃত্ত হন—সেই খেলা তাঁর কোনো অভাব পূরণের জন্য নয়, বরং তাঁর কোনোরূপ অভাব নেই ব'লেই, তাঁর পরিপূর্ণ আনন্দ আছে এবং সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই সুন্দর-মধুর প্রকাশ খেলা। একই ভাবে পূর্ণানন্দ-রসঘন ব্রহ্ম তাঁর সেই অনন্ত-অসীম আনন্দ প্রকাশিত করেন তাঁর জগৎসৃষ্টিরূপ খেলা বা লীলায়। সেজন্যই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে মনোরমভাবে বলা হয়েছে—

'লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্।'

(ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩)

অর্থাৎ (সৃষ্টি) লীলাই মাত্র—যেমন লোকে বা জগতে দেখা যায় (যথা, সার্বভৌম সম্রাটের ক্ষেত্রে)।

এই কারণেই আনন্দোপনিষদ তৈত্তিরীয়ে সানন্দে ঘোষণা করা হয়েছে পৃথিবীর এক আশ্চর্যতম তত্ত্ব। আনন্দভূমি ভারতবর্ষের সেই অপরূপ অনুপম 'আনন্দ-তত্ত্ব' যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের কম্বুকণ্ঠের অম্বুদনিনাদে 'শত-বীণাবেণুরবে' ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে সমগ্র জগৎকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছিল সগৌরবে। সে রোমাঞ্চকর অমৃতবাণী হ'ল—

'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ ৩।৬) অর্থাৎ আনন্দ থেকেই এই জগতের সৃষ্টি, আনন্দেই তার স্থিতি, আনন্দেই তার লয়।

কি অপূর্ব তত্ত্ব এটি— আপাতদৃষ্টিতে 'সর্বং দুঃখং দুঃখম্', 'সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্' 'সর্বং শূন্যং শূন্যম্'—পৃথিবীতে সব কিছুই দুঃখময়, সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর, সব কিছুই শূন্যগর্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে? প্রকৃতপক্ষে—

'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ
আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি।'

(মুণ্ডকোপনিষদ ২।২।৭)

'জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁরেই দর্শন
করেন জ্ঞানিগুণী যত।
আনন্দরূপে অমৃতরূপে
যিনি নিত্যই প্রকাশিত॥'

সকল বৈদান্তিকই এই রমণীয় রসঘন রোমাঞ্চকর আনন্দতত্ত্ব গ্রহণ উপলব্ধি ও প্রকাশিত ক'রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে—ব্যাবহারিক দিক থেকে শঙ্করও এই পরমসত্য স্বীকার করেছেন, তদুপরি তাঁর 'ব্রহ্মবাদ' ত আদ্যোপান্ত আনন্দ-নির্ঝর।

কিন্তু হায়, আর কতক্ষণই বা কেবল আনন্দধামে বিচরণ করা যায়? আমাদের ত নেমে আসতে হবে অচিরেই রূঢ় বাস্তব ক্ষেত্রে; এবং সেই মূলীভূত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের 'পরিণামবাদ' ও 'নির্বিকারবাদ'

পরস্পরবিরোধী, কি না। বস্তুতঃ যাঁরা দ্বৈত'দ্বৈতবাদী, অর্থাৎ যাঁরা অদ্বৈত ব্রহ্ম ও দ্বৈত জীব-জগৎকে সমান সত্য ব'লে গ্রহণ করেন, এবং সেজন্য বিশ্বাস করেন যে, পরমকারণ ব্রহ্ম সত্যসত্যই জীবজগতে পরিণত, অথবা রূপান্তরিত হন, তাঁরা ব্রহ্মকে পুনরায় নির্বিকার অথবা পরিবর্তনবিহীন ব'লে মনে করতে পারেন কিরূপে? কারণাবস্থায় ব্রহ্মের পরিণাম নেই; তখন জীব-জগৎ ব্রহ্মে 'সৎ-কার্যবাদ' অনুসারে তাঁর অপ্রকাশিত স্বগতভেদ অথবা গুণ-শক্তিরূপে নিহিত হয়ে থাকে। পরে কার্যাবস্থায়, ব্রহ্ম বাস্তবতঃ জীবজগতে পরিণত হ'লে তারা সেইভাবে প্রকটিত হয়। সেক্ষেত্রে, কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থার মধ্যে প্রকৃত ভেদ স্বীকার না করলে, অর্থাৎ, ব্রহ্ম কারণাবস্থা ত্যাগ ক'রে সত্যসত্যই কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছেন, সত্যসত্যই জীব-জগতে পরিণত ও পরিবর্তিত হয়ে,—এই কথা স্বীকার না করলে শঙ্করাদির বিবর্তবাদই ত অনিবার্যভাবে এসে পড়ে; অন্যথায়, এসে পড়ে 'সবিকারত্ববাদ', যা গ্রহণ করা যে কোনো বৈদান্তিকের পক্ষেই অসম্ভব। 'পরিণামের' অর্থ 'স্বশক্তি-বিক্ষেপ' বললেও সেই একই সমস্যা থেকেই যায়—অবস্থার পরিবর্তন—শক্তিবিক্ষেপের পূর্বের অবস্থা ও শক্তি-বিক্ষেপের পরের অবস্থা নিশ্চয়ই পরস্পর ভিন্ন। ফলে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মূলই ত হয়ে যায় উৎপাটিত; এবং সেই সুপ্রসিদ্ধ 'ঊর্ণনাভি' ইত্যাদির দৃষ্টান্তও হয় অচল—

> 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
> যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
> যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
> তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥'
> (মুণ্ডকোপনিষদ ১।১।৭)

> 'ঊর্ণনাভ থেকে যেরূপ তন্তু হয় নির্গত।
> পৃথিবী থেকে যেরূপ ওষধি হয় বিকশিত॥
> পুরুষ থেকে যেরূপ কেশলোম হয় বহির্গত।
> অক্ষর (ব্রহ্ম) থেকে সেরূপ বিশ্ব হয় সমুদ্ভূত॥'

কারণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পূর্বাবস্থা এবং তার পরের অবস্থার মধ্যে প্রকৃত ভেদ আছে নিশ্চয়ই এবং পরিবর্তনও অবশ্য-স্বীকার্য—যেমন তন্তুসহিত ঊর্ণনাভ ও তন্তুবিরহিত ঊর্ণনাভ একই ঊর্ণনাভের অবস্থাভেদ নিশ্চয়ই; এবং সেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পরিবর্তনও অবশ্য-স্বীকার্য।

সেজন্য, রামানুজাদি-বেদান্তে 'ব্রহ্মপরিণাম-বাদে'র সঙ্গে 'ব্রহ্মনির্বিকারত্ববাদ' সমন্বিত করবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে অহরহঃ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তা সফল হয়নি।

সে যাহোক, রামানুজ শঙ্করের বিশ্বব্যাপী 'একতত্ত্ববাদে'র স্থলে নির্ভয়ে সাগ্রহে সাদরে সানন্দে এনে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন 'ত্রিতত্ত্ববাদ' ব্রহ্ম-চিৎ-অচিৎ, অথবা, ঈশ্বর-জীব-জগৎ—এই হ'ল তুল্যমূল্য তুল্যসত্য তুল্যকাম্য 'ত্রিতত্ত্ব'।

ব্রহ্মের স্বরূপের কথা অতি সংক্ষেপে পূর্বেই বলা হয়েছে। শঙ্করাদির মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন, যেহেতু ব্রহ্ম পারমার্থিক, ঈশ্বর ব্যাবহারিকই মাত্র। অর্থাৎ, ব্যাবহারিক অথবা সাংসারিক দিক থেকে, সৃষ্টি আছে, সৃষ্ট জীব-জগৎও আছে, এবং সেজন্য সেই দিক থেকে একজন স্রষ্টারও প্রয়োজন; এবং সেই স্রষ্টাই হলেন সবিশেষ সগুণ সক্রিয় 'ঈশ্বর'। কিন্তু পারমার্থিক দিক থেকে সৃষ্টিও নেই, সৃষ্ট জীব-জগৎও নেই, আছেন কেবল নির্বিশেষ-নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়-নির্বিকার ব্রহ্ম। সেজন্য পারমার্থিক দিক থেকে তথাকথিত সৃষ্ট জীব-জগতের ন্যায়, তথাকথিত স্রষ্টা ঈশ্বরও 'মিথ্যা'। কিন্তু রামানুজের মতে 'ব্রহ্ম' ও 'ঈশ্বর' এক ও অভিন্ন

—যেহেতু ব্রহ্মও সর্বদাই সবিশেষ সগুণ সক্রিয় – স্রষ্টা ও মোক্ষদাতা।

চিৎ বা জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা কর্তা ভোক্তা; অণু-পরিমাণ; বহু বা অসংখ্য।

অচিৎ তিন শ্রেণীর--প্রকৃতি কাল ও শুদ্ধতত্ত্ব। ত্রিগুণাত্মিকা (সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা) প্রকৃতি পার্থিব জগতের মূল কারণ— যেমন সাংখ্য-মতানুসারে। কাল নিত্য ও নিরবয়ব। শুদ্ধতত্ত্ব ত্রিগুণাত্মক নয়, কেবল সত্ত্বগুণাত্মক এবং ব্রহ্ম ও মুক্তাত্মগণের দিব্যদেহ প্রভৃতি ও ব্রহ্মলোকের উপাদানকারণ।

তিনটি তত্ত্ব থাকলেই প্রশ্ন ওঠে, তাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধের। সুতরাং, এ বিষয়ে রামানুজাদি ত্রিতত্ত্ববাদী সকলকেই বিস্তৃত আলোচনা-প্রপঞ্চনা করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে রামানুজ চারটি প্রধান উদাহরণ দিয়েছেন—(১) দ্রব্য-গুণ (২) আত্মা-দেহ (৩) অংশী অংশ এবং (৪) কারণ-কার্য।

এইগুলির মধ্যে, প্রথমটিই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং তাঁর সুপ্রসিদ্ধ মতবাদের নামটিও এই থেকে উদ্ভূত। একটি দ্রব্য বা বিশেষ্য ও তার গুণ বা বিশেষণের মধ্যে সম্বন্ধ কি? কি সম্বন্ধ আত্মা ও দেহ, অংশী ও অংশ, কারণ ও কার্যের মধ্যে?

এক্ষেত্রে রামানুজ দুটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন—'অপৃথক্‌সিদ্ধি' এবং 'সামানাধি-করণ্য'। যেমন, দ্রব্য ও গুণ, আত্মা ও দেহ, অংশী ও অংশ, কারণ ও কার্য পরস্পরাশ্রয়ী এবং অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। পৃথিবীতে, দ্রব্য থাকলেই তার প্রকাশরূপে গুণও আছে; এবং গুণ থাকলেই তার আধাররূপে দ্রব্যও আছে। যথা রক্তপদ্ম থাকলেই, তার 'রক্তত্ব' গুণকেও থাকতেই হবে; এবং 'রক্তত্ব' থাকলেই, তার আধার রক্তপদ্মকেও থাকতেই হবে। এই একই কথা প্রযোজ্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও। এরূপ অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধই হ'ল 'অপৃথক্‌সিদ্ধি'। ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যেও রয়েছে সেই একই সম্বন্ধ—অচ্ছেদ্য অনিবার্য অবশ্যম্ভাবী অত্যাবশ্যক অপরিহার্য প্রাণের সম্বন্ধ।

পুনরায়, কারণ-কার্য উদাহরণটিও এস্থলে বিশেষভাবেই গ্রহণীয়। আমরা জানি যে, 'পরিণামবাদ' মতে স্বয়ং কারণই কার্যে পরিণত হয় ব'লে কারণ ও কার্য সমস্বরূপ হতে বাধ্য। কিন্তু অপর দিকে, কারণ ও কার্য সম্পূর্ণরূপেই অভিন্ন নয়, তাদের মধ্যে গুণতঃ ও শক্তিতঃ প্রভেদও অসংখ্য। যথা, মৃৎপিণ্ড ও মৃন্ময় ঘট স্বরূপতঃ অভিন্ন, যেহেতু উভয়ই মৃত্তিকাস্বরূপ, যা পূর্বেই বলা হ'ল—অথচ তাদের মধ্যে গুণ-শক্তির দিক থেকে কতই না রয়েছে ভেদ—যথা, মৃৎপিণ্ড বর্তুলাকার, মৃন্ময় ঘটটির আকার অন্য; মৃৎপিণ্ড ও মৃন্ময় ঘটের রংও ভিন্ন—একটি কৃষ্ণবর্ণ, অন্যটি রক্তবর্ণ; মৃৎপিণ্ড জলসিক্ত, নরম; মৃন্ময় ঘট সুদৃঢ়, কাঠিন্যযুক্ত; মৃৎপিণ্ড ও মৃন্ময় ঘটের কর্ম-সম্পাদনের শক্তিও ভিন্ন—মৃৎপিণ্ড দিয়ে গৃহ-প্রাঙ্গণ মার্জনা করা যায়, মৃন্ময় ঘট দিয়ে তা করা যায় না; মৃন্ময় ঘট দিয়ে জল আহরণ করা যায়, মৃৎপিণ্ড দিয়ে তা করা যায় না—ইত্যাদি। এরূপে কারণ ও কার্য, অংশী ও অংশ স্বরূপতঃ অভিন্ন, গুণ-শক্তিতঃ ভিন্ন। এরই নাম 'সামানাধিকরণ্য'—অথবা, একই বস্তুর দুটি বিভিন্ন আকারের মধ্যে স্বরূপতঃ অভিন্নতা।

এই তত্ত্বটি রামানুজ 'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্যো-পনিষদ ৬।৮।৭) নামক সুবিখ্যাত মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে অতি সুন্দরভাবে প্রপঞ্চিত করেছেন (শ্রীভাষ্য ১।১।১)। 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রের অর্থ হ'ল —'তিনিই তুমি', অর্থাৎ 'ব্রহ্মই জীব'। এস্থলে

'ব্রহ্ম' ও 'জীব' যদি সম্পূর্ণ অভিন্ন হন, তা হ'লে বাক্যটি অর্থহীন পুনরুক্তি মাত্রই হয়ে দাঁড়ায়—'ব্রহ্মই ব্রহ্ম', 'ক'ই ক', বলার কি প্রয়োজন, সকলেই ত তা জানেন। পুনরায়, 'ব্রহ্ম' ও 'জীব' যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন হন, তা হলেও বাক্যটি ত অসম্ভব স্ববিরুদ্ধদোষদুষ্ট হয়ে দাঁড়ায়—'ক'ই খ'—এ কি কখনও বলা যায়? তা হ'লে এই সত্য-শিব-সুন্দর মন্ত্রটির অর্থ কি? অর্থ একমাত্র এই হতে পারে যে, ব্রহ্ম ও জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন হলেও গুণতঃ ভিন্ন। যথা, 'রঘুপতিই সীতাপতি'—এই বাক্যটির অর্থ হ'ল এই যে, 'রঘুপতিত্ববিশিষ্ট রামই' 'সীতাপতিত্ব-বিশিষ্ট রাম'। রামের রঘুপতিত্ব ও সীতা-পতিত্ব এই বিভিন্ন রূপের মধ্যে রামত্বের দিক থেকে অভিন্নতাই হ'ল 'সামানাধিকরণ্য'।

এতদ্ব্যতীত, রামানুজের মূলীভূত মতবাদ 'পরিণামবাদ' ত আছেই—যে মতবাদানুসারে কারণ কার্যে পরিণত হয় ব'লে কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ অভিন্ন, গুণ-শক্তিতঃ ভিন্ন। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধও সেই একই। স্বয়ং ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয়েছেন—সেজন্য উভয়ে স্বরূপতঃ অভিন্ন, অথচ গুণ-শক্তিতঃ ভিন্ন। জগৎ জড় মর অশুদ্ধ অপূর্ণ ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য, ব্রহ্ম তা নন একেবারেই।

পুনরায়, দ্রব্য-গুণের উদাহরণানুসারে বিশেষ্য ব্রহ্ম জীব-জগৎ-রূপ বিশেষণে বিভূষিত। সেজন্য রামানুজের মতবাদের নাম 'বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ', অর্থাৎ বিশেষণরূপ জীবজগৎবিশিষ্ট বিশেষ্য ব্রহ্মই সত্য।

এই ভাবেই আরম্ভ হয়েছে ভেদ ও অভেদকে একত্রিত, সমন্বিত করার শুভ প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রারম্ভেই ত গণ্ডগোল। কারণ, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপতঃ অভিন্ন, যেহেতু স্বয়ং ব্রহ্মই ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত বা রূপান্তরিত হয়েছেন; কিন্তু গুণতঃ ভিন্ন, যেহেতু ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-ত্বাদি গুণ ব্রহ্মাণ্ডে নেই, ব্রহ্মাণ্ডের জড়ত্বাদি গুণ ব্রহ্মে নেই। বেশ ভালো কথা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত হ'ল কি? শেষ পর্যন্ত, ব্রহ্ম জীব জগৎ—এই তিনটি ভিন্ন তত্ত্বই থেকে গেল - অর্থাৎ, স্বরূপতঃ অভেদের চেয়ে গুণতঃ ভেদই বড় হয়ে গেল—স্বরূপের চেয়ে গুণই বড় হয়ে গেল। যথা, এই মতানুসারে শিশু রাম ও যুবা রাম, শায়িত রাম ও দণ্ডায়মান রাম—গুণ শক্তি আকার প্রভৃতির দিক থেকে ভিন্ন ব'লে দুটি ভিন্ন রাম বা দুটি ভিন্ন ব্যক্তি হয়ে গেলেন! কি অত্যদ্ভুত কথা! পুনরায়, ব্রহ্মে তাঁর স্বগত-ভেদ রূপে জীব-জগৎ রয়েছে—অথচ ভিন্নই হয়ে রয়েছে—একটি বস্তুর মধ্যে তার থেকে ভিন্ন বস্তু থাকেই বা কি করে? পুনরায় ভূমা মহান, চিৎস্বরূপ, অজড় ব্রহ্ম স্বয়ং জীবজগতে পরিণত হচ্ছেন; অথচ জীব তা সত্ত্বেও অণুই থেকে যাচ্ছে, জগৎ তা সত্ত্বেও জড়ই থেকে যাচ্ছে। মৃৎপিণ্ড যখন মৃন্ময় ঘটে পরিণত হয়, তখন সেই ঘটে মৃত্তিকা ব্যতীত ত আর কিছুই থাকতে পারে না। অথচ এস্থলে ব্রহ্ম জীবজগতে পরিণত হলেও জীবের জীবত্ব ও জগতের জগৎ-ত্ব থেকেই যাচ্ছে তাদের ব্রহ্মত্বেরও উপরে। কিন্তু, কি করে? এই সব স্ববিরোধ-দোষ সকল ভেদাভেদ-বাদীর জীবন অতিষ্ঠ ক'রে দিয়েছে সমানে। ব্রহ্মও থাকবেন, আমিও থাকব—ব্রহ্ম হয়েই থাকব, অথচ আমার জীবত্ব বা স্বাতন্ত্র্য থেকেই যাবে—ভাবতে অবশ্য খুবই ভাল লাগে—কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের ভ্রূকুটি কি ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয় একে-বারেই? সেজন্য মনে হয়, ভেদ ও অভেদের সহাবস্থিতি কি সত্যই সম্ভবপর? সত্যই আলোক ও অন্ধকার একত্রে অবস্থিতি করবে কি করে?

রামানুজের মোক্ষতত্ত্বও সেই একই ধারার বাহক। মোক্ষ জীবের জীবত্বের বিনাশ নয়, পরিপূর্ণ বিকাশ—অর্থাৎ, তার স্বরূপ ও গুণের চরমোৎকর্ষ। জীব জ্ঞানস্বরূপ, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় —পার্থিব দেহমনোবদ্ধাবস্থায় সেই জ্ঞানস্বরূপত্ব পূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারে না—মোক্ষাবস্থায় হয়। পুনরায়, জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব জীবের স্বাভাবিক ধর্ম ব'লে মুক্তজীবও জ্ঞাতা কর্তা ভোক্তা—এবং সেই মোক্ষকালে তার এই সকল ধর্মেরও চরম ও পরম বিকাশ হয়। সেই জন্যই, যেস্থলে বদ্ধজীব জ্ঞাতা, অথচ অল্পজ্ঞ; কর্তা, অথচ অল্পশক্তি; ভোক্তা, অথচ দুঃখশোকক্লিষ্ট —মুক্তজীবই কেবল জ্ঞাতা ও সর্বজ্ঞ; কর্তা ও সর্বশক্তিমান; ভোক্তা ও আনন্দময়। এই ভাবে নিজের স্বরূপ ও গুণের পূর্ণ বিকাশ হ'লে, জীব আত্মস্বরূপ লাভ করে—এবং তারপর ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করে। কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হলেও, দুটি বিষয়ে সে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নই থেকে যায়। অর্থাৎ, ব্রহ্ম ভূমা মহান হ'লেও মুক্তজীব অণুপরিমাণ বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র; এবং ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা হ'লেও মুক্তজীবের এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি নেই। সেজন্য মুক্তজীবও ব্রহ্মসদৃশই মাত্র, ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন নন—উপরন্তু ব্রহ্মশাসিত ব্রহ্মাশ্রিত ব্রহ্মসেবক ব্রহ্মারাধক ব্রহ্মভক্ত। ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর চিরকাল উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ।

তা হ'লে মোক্ষের সাধন কি? শঙ্কর জ্ঞানবাদী, রামানুজ ভক্তিবাদী। সেজন্য রামানুজের মতে এই হ'ল মোক্ষক্রম: নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হ'লে 'শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে'র আদর্শে ভক্তি দ্বারা, উপাসনা দ্বারা, ধ্যান দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয় এবং তার ফলে হয় শ্রীভগবানের মহিমময় সাক্ষাৎকার। এরই নাম 'মুক্তি'। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি আশ্চর্য ব্যাপার বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এটি হ'ল রামানুজীয় 'ভক্তি'। এস্থলে রামানুজ তাঁর বিশ্বপ্রখ্যাত 'ভক্তি'র বিশ্ববিশ্রুত সংজ্ঞা দান ক'রে বলছেন— 'ধ্যানং চ তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন-স্মৃতিসন্তানরূপা ধ্রুবা স্মৃতিঃ।' (শ্রীভাষ্য ১।১।১)।

একটি পাত্রের ছিদ্রপথ থেকে অনবরত নির্গত তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে একটি-মাত্র বিষয় সম্বন্ধে (এক্ষেত্রে ব্রহ্ম) অনবরত স্মরণ করাই হ'ল ভক্তি, উপাসনা বা ধ্যান—রামানুজ মতে, এ সবই সমার্থক। কিন্তু এ ভক্তি হ'ল কি করে? এ ত জ্ঞান, স্থির ধীর নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান বা নিদিধ্যাসন, যা যোগশাস্ত্রের সম্প্রজ্ঞাত-সমাধির সমতুল। বস্তুতঃ, রামানুজ নামে ভক্তিবাদী হ'লেও, তাঁর মধ্যে সাধারণ ভক্তির চিহ্নমাত্রও নেই—কোথায় সেই আবেগ, কোথায় সেই উচ্ছ্বাস, কোথায় সেই উন্মাদতা, কোথায় সেই কমন-কোমল-ললিত-মধুর-রসঘন ভাব? বস্তুতঃ, জ্ঞানবাদী শঙ্করের শ্রেষ্ঠ সমালোচক রামানুজ যেন শঙ্করের ভাবেই ভাবান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেজন্যই ভেদ ও অভেদ নিয়ে অত মাতামাতি করবার পরও, রামানুজ হয়ত শেষ পর্যন্ত ঝুঁকেছেন অভেদের দিকেই, যা তাঁর মতবাদের নামটি থেকেই বোঝা যায়; এবং সেইজন্যও তাঁর ভক্তি মস্তিষ্ক-প্রসূত স্থির ভাবনাই মাত্র; হৃদয়প্রসূত উদ্বেগ ভাব নয়।

শঙ্কর জীবন্মুক্তিবাদী—তাঁর মতে বর্তমান দেহেই, বর্তমান জগতেই জীব মুক্তিলাভ করতে পারে, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান দূর হ'লেই। কিন্তু রামানুজ বিদেহমুক্তিবাদী—তাঁর মতে, দেহপাতের পরই কেবল মুক্তিলাভ হ'তে পারে, তার পূর্বে নয়, কারণ, যতদিন দেহ, ততদিনই সঙ্কীর্ণতা জড়তা অপবিত্রতা অনিবার্যভাবেই।

শঙ্করের ন্যায় রামানুজও ছিলেন একজন

শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ন্যায়কুশল প্রাজ্ঞজন। সেজন্য তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'শ্রীভাষ্যে' (১।১।১) তিনি যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং সুতীক্ষ্ণ ভাবে শঙ্করের অদ্বৈতবেদান্ত-মতবাদের সমালোচনা করেছেন, তা সত্যই আশ্চর্যজনক। এই 'মায়াবাদখণ্ডন' 'সপ্তানুপপত্তি' (বা সপ্ত প্রকার অসংলগ্নতা) নামে খ্যাত—অর্থাৎ তিনি অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে সাতটি প্রধান আপত্তি উত্থাপিত করেছিলেন। অতি সংক্ষেপে তা হ'ল এই—

(১) আশ্রয়ানুপপত্তি—অবিদ্যার আশ্রয় বা আধার কি? জীব নয়, যেহেতু জীব স্বয়ং অবিদ্যার কার্য; ব্রহ্ম নন, যেহেতু ব্রহ্ম পরমজ্ঞানস্বরূপ। (২) তিরোধানানুপপত্তি—অবিদ্যা ব্রহ্মকে আবৃত ক'রে তাঁকে তিরোহিত ক'রে দিতে পারে না, যেহেতু তিনি নিত্যদীপ্যমান। (৩) অনির্বচনীয়ানুপপত্তি—অবিদ্যাকে 'সদসদ্ বিলক্ষণানির্বচনীয়া' বলা হয়, কারণ তা ব্রহ্মের ন্যায় সৎ নয়—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে বিনষ্ট হয়ে যায় ব'লে; আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎও নয়—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পূর্বে সত্যরূপে প্রতিভাত হয় ব'লে; কিন্তু এরূপ কোনো বস্তু হতেই পারে না, যা সৎও নয়, অসৎও নয়। (৪) প্রমাণানুপপত্তি—অবিদ্যার কোনো প্রমাণ নেই। (৫) স্বরূপানুপপত্তি—অবিদ্যার স্বরূপনির্ণয় অসম্ভব। (৬) নিবর্তকানুপপত্তি—অবিদ্যার নিবর্তক নেই। (৭) নিবৃত্তি-অনুপপত্তি—এই সব কারণে, অবিদ্যার নিবৃত্তি নেই—অর্থাৎ জীবের মুক্তি নেই।

শঙ্কর-বেদান্তের ন্যায় রামানুজ-বেদান্তও তুল্য সম্মানাস্পদ, তুল্য গৌরববিমণ্ডিত, তুল্য কল্যাণপ্রদ। একই হিমাচল থেকে উদ্ভূত গঙ্গা-যমুনাধারার ন্যায় একই উপনিষদসমূহের অমৃত-সিঞ্চনকারী এই দুটি গরিষ্ঠ মতবাদ যুগে যুগে ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে। পুনরায়, গঙ্গা-যমুনা যেরূপ মিলিত হয়ে একত্রে সাগরসঙ্গমে উপনীত হয়েছে, সেরূপই শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও মিলিত হয়ে একত্রে সেই একই ব্রহ্মের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত করেছে সকলকে সগৌরবে। যিনি যে ভাবেই ব্রহ্মকে দেখুন না কেন—নির্বিশেষ-নিগুণ-নিষ্ক্রিয় প্রভৃতি ভাবে, অথবা সবিশেষ-সগুণ-সক্রিয় প্রভৃতি ভাবে—যিনি যে ভাবেই ব্রহ্মকে পাবার প্রচেষ্টা করুন না কেন—জ্ঞানের গম্ভীর পথে, অথবা ভক্তির মধুর পথে—যিনি যে ভাবেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছা করুন না কেন—কোনো ভেদ না রেখে, অথবা ভেদ রেখে—শেষ পর্যন্ত একটি সর্বজনীন সর্বকালীন তত্ত্ব থেকেই যাচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রেই—ব্রহ্ম—একমাত্র ব্রহ্মই—তা জীবজগৎকে মিথ্যাই বলুন, অথবা, জীবজগৎকে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে অভিন্নই বলুন। ন্যায়বিচারের দিক্ থেকে, উভয় মতবাদেই ত্রুটি বিচ্যুতি নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সব কিছুই অতিক্রম ক'রে, সব কিছুরই ঊর্ধ্বে, এই দুই দেবাশীর্বাদধন্য পরম দার্শনিক একমাত্র সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের মহাবাণীই দিকে বিদিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করেছেন—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' (মুণ্ডকোপনিষদ ২।২।৭—যিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে নিত্য লীলায়িত (তাঁকে ধীরগণ বিশিষ্টজ্ঞানসহায়ে পরিপূর্ণভাবে দর্শন করেন)। এই অমেয় অমৃত এবং তারই অবশ্যম্ভাবী ফল অনিন্দ্য আনন্দই এই দুই মহাবেদান্তের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা, জীবনের জীবন। সেজন্য এই দুই আচার্য নিশ্চয়ই চিরপূজ্য চিরগ্রাহ্য চিরকাম্য।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় *

আমাদের দেশে অনেক সমস্যা আছে। সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন দরকার। এই সব পরিবর্তন দেশের জনগণই করবে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ 'মানুষ তৈরি' করার কথা বলতেন।

'মানুষ তৈরি' করার জন্য চাই আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক এবং অনুকূল পরিবেশ-সৃষ্টি। সেই সঙ্গে পাঠ্যক্রম-নির্ধারণ বিষয়েও সম্যক্ অবহিত থাকতে হবে। পাঠ্যক্রমে ঐহিক বিদ্যার্জনের সঙ্গে যাতে জাতীয় কৃষ্টির অনুপ্রবেশ ঘটে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

স্বামীজী আরও বলেছেন: 'It is man-making theories that we want. It is man-making education all round that we want. (C. W. III, 224)—আমরা যা চাই তা হচ্ছে মানুষ-গড়ার তত্ত্ব। সব দিকে মানুষ-গড়ার শিক্ষাই আমরা চাই। লক্ষণীয় যে স্বামীজী তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনায় 'মানুষ-গড়া'র শিক্ষার উপরই সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন।

স্বামীজীর সে-কথাকে আমরা অন্তর থেকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছি কিনা তা আজ শিক্ষা-সংস্কারব্রতী শিক্ষাবিদ্‌গণকে বিশেষভাবে অনুধাবন ক'রে দেখতে হবে। দেশে শিক্ষা-বৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী রেখাচিত্রটির পাশাপাশি আমাদের অ-মানবিক অ-সামাজিক মানসিকতা ও কার্যকলাপের ঊর্ধ্বমুখিতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমরা স্বামীজীর কথাকে অবহেলা করেছি—মৌখিক স্বীকৃতি দিলেও অন্তর থেকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিই নি।

আজ দেশের চিন্তাধিনায়কদের সামনে দু'টি সমস্যা: অর্থনৈতিক কাঠামোকে ঢেলে সাজানো এবং শিক্ষার কাঠামোকে ঢেলে সাজানো। এই দু'টি সমস্যাই সমান গুরুত্বপূর্ণ—এ কথা অনস্বীকার্য।

দেশের বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রসার ও অগ্রগতি দেখে মনে কতকটা বিস্ময় আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়—এটা স্বীকার করতেই হবে। কারিগরী শিক্ষার জন্য শিল্পবিদ্যালয় (Polytechnic), চিকিৎসা-বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা এবং ইন্‌জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্য কলেজগুলি ব্যতীত এক পশ্চিমবঙ্গেই সাধারণ শিক্ষার জন্য ৬।৭ হাজারের বেশী উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রায় তিনশত কলেজ এবং ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। দেশে নতুন নতুন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা চলছে। শিক্ষাখাতে প্রচুর ব্যয়ও হচ্ছে। কিন্তু এটাও আজ আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, শুধু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়ে ও পরিসংখ্যানে ব্যয়বৃদ্ধি দেখালেই দায়খালাস হবে না। সকলের আগে শিক্ষার প্রকৃতি নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

১৯৭৫ সনের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশনে

---

* প্রাক্তন অধ্যাপক. ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা।

সভাপতির ভাষণে মিশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলেছিলেন, 'স্বামীজী ব'লে গেছেন, সারা ভারতকে আধ্যাত্মিকভাবে আগে প্লাবিত করতে হবে, বাকী সব পরে আপনি হবে। ত্রাণকার্যাদির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে লোকের ভেতর আধ্যাত্মিক ভাবের অনুপ্রবেশ করানোই তার চেয়ে বড় কাজ, আসল কাজ।'

(উদ্বোধন, ৭৮।৯৯)

এই আধ্যাত্মিক ভাবের অনুপ্রবেশ করানোর মানে শুধু যোগশিক্ষার— প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-শিক্ষার ব্যবস্থা করা নয়। বনের বেদান্তকে প্রচার করতে হবে ঘরে-ঘরে পথে-প্রান্তরে প্রতিটি শিক্ষায়তনে শিল্পালয়ে। শ্রমিক ছাত্র মালিক ব্যবসায়ী বুদ্ধিজীবী জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে শোনাতে হবে স্বামীজীর উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারিত বেদান্তবাণী: 'Be and make'— নিজে মানুষ হও এবং অপরকে মানুষ হ'তে সাহায্য করো। নিজের মধ্যে যে দেবত্ব রয়েছে তাকে পরিস্ফুট করো, আবার অপরেরও দেবত্বকে পরিস্ফুট করতে অনুক্ষণ সাহায্য করো। একমাত্র আত্মবিশ্বাসের মন্ত্রই মানুষকে করতে পারে 'মান-হুঁস'। আত্মবিশ্বাসের মন্ত্রই জাতির পুনরুজ্জীবনের মন্ত্র। মানুষগঠনের জন্য এই বেদান্তভিত্তিক শিক্ষার কথাই স্বামীজী বলেছেন বহু বার।

'কথামৃত'কার 'শ্রীম' বা মাষ্টার মশায়কে স্বামীজী অশেষ শ্রদ্ধা করতেন। মাষ্টার মশায় লাভ করেছিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। 'শ্রীম'কে একজন যোগদৃষ্টিসম্পন্ন 'চিরন্তন শিক্ষক' আখ্যা দিলে অতিশয়োক্তি হবে ব'লে মনে হয় না।

বহু বছর আগে অভিনব শিক্ষক 'শ্রীম' শিক্ষা সম্বন্ধে সহজ কথায় সুস্পষ্টভাবে তাঁর যে অভিমতটি ব্যক্ত করেছিলেন, তা আমাদের সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

'শ্রীম-দর্শন' (দ্বাদশ ভাগ) গ্রন্থে 'অভিনব শিক্ষক শ্রীম' পরিচ্ছেদে আমরা পাই বাস্তব-দৃষ্টিসম্পন্ন মাষ্টার মশায়ের শিক্ষার আদর্শটি। তিনি বলেছিলেন যে, ছেলেদের চরিত্রগঠন হয়, শরীর পুষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটিও বলিষ্ঠ হয়— শিক্ষাপরিকল্পনার পিছনে এ ভাবটি চাই-ই; চরিত্র-গঠনে ঈশ্বরে বিশ্বাস একান্ত আবশ্যক; আবার কেবল চরিত্রগঠনের প্রতি দৃষ্টি রাখলে হবে না। ছেলেকে ইউনিভারসিটির পরীক্ষায় পাশ করাতেও হবে। তা নইলে সে কাজ পাবে না।

বহু বছর আগে 'শ্রীম' শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর এ অভিমতটি দিয়ে গেছেন। কী বাস্তব ও সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী! মাষ্টার মশায়ের 'ঈশ্বরে বিশ্বাস' এবং স্বামীজীর 'আত্মবিশ্বাস' একই জিনিস। 'বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপর বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস' মূলতঃ দুই-ই সমানার্থক।

স্বামীজী আরও বলেছেন, 'যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত: যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছে: যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক।' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২।২৩০)।

মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে পরিস্ফুট ক'রে মানুষ-গড়ার কথা, মানুষ তৈরি করার শিক্ষার কথা স্বামীজী বারবার বলেছেন তাঁর বহু ভাষণে। গান্ধীজন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় (১৯৬৯ খৃঃ) পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ খুবই দুঃখে বলেছিলেন: 'অনেক পরিকল্পনা হচ্ছে, সবই হয়েছে, বাদে মানুষ। মানুষ বানা-

যার পরিকল্পনা যেন কোথাও নাই।'

আমাদের রাজনীতি সমাজনীতি শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাব, আমাদের আচরণ ও দুর্ভোগ স্বামীজীর কথার অস্বীকৃতিজনিত পরিণামেরই স্বাক্ষর বহন করছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিধিবদ্ধভাবে সময়োপযোগী ক'রে 'man-making'-এর প্রবর্তন আজ সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। 'মনুষ্যত্বের অভাব ... না ঘোচাতে পারলে আমাদের বর্তমান সঙ্কটের হাত থেকে উদ্ধার পাবার আশা নেই'—এ উক্তিটি করেছেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। (নিবন্ধ 'বর্তমান সমস্যা' শারদীয়া সংখ্যা, উদ্বোধন, ১৩৭৭)। তিনি আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন উল্লিখিত প্রবন্ধে—'আমরা যে প্রতিদিন স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছি তার ফলেই আমাদের এই বর্তমান দুরবস্থা। এই কথাটি মনে রেখেই এর প্রতীকারের পথ খুঁজতে হবে। তা ছাড়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার অন্য সরাসরি বা সোজা পথ নেই।' ছয় বৎসর পূর্বে প্রবীণ শিক্ষক শ্রদ্ধেয় ডঃ মজুমদার যে মন্তব্যটি করেছিলেন তার সত্যতা আজও অক্ষুণ্ণ এবং অনস্বীকার্য। তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন বর্তমান লেখক ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগের একজন অধ্যাপক। দেশবিভাগের পর তাঁর বাসভবনে গিয়েছি বেশ কয়েক বার। কয়েক মাস আগে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আরেক সুযোগ লাভ করেছিলাম। ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক কি দেখছেন শ্রদ্ধাবনতচিত্তে জিজ্ঞাসু হয়ে সেই প্রশ্নটিই রেখেছিলাম সেদিন। আচার্যের উত্তরটি নৈরাশ্যব্যঞ্জকই ছিল। তিনি বললেন আগামী ২০ বছরেও এ আঁধার কাটবে না। স্পষ্টই মনে আছে, কিছুটা আলোচনার পর তিনি পরিশেষে বলেছিলেন: 'ভরসা আমাদের শুধু ভগবানের প্রতিশ্রুতি-বাণীতে—"সম্ভবামি যুগে যুগে"।'

এক সাংবাদিকের সহিত সাক্ষাতে শ্রদ্ধেয় ডঃ মজুমদার বলেছেন, 'এক কথায় বলা যায় সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা কোন ক্ষেত্রেই আমরা স্বাধীনতার ২৮।২৯ বছরে খুব একটা এগুতে পারি নি। বরং দিন দিন দেখছি মানুষের মরেল বড় কমে যাচ্ছে। দুর্নীতি, অযোগ্যতা, শৃঙ্খলাবোধের অভাব আমাদের জাতীয় চরিত্রে ঢুকে গেছে। জানবে পরিশ্রম, কাজের প্রতি শ্রদ্ধা আর চরিত্র—এ-ই একটা জাতিকে বড় করে।...এসব দেখে শুনে সত্যিই মাঝে মাঝে হিম হয়ে যাই—এ আমরা কোথায় চলেছি?' ('উল্টোরথ', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৮৩)।

আশার ক্ষীণ রশ্মি তুলে ধরে পরক্ষণেই তিনি বলেছেন: 'তবু বলব, আজও ভাল ছেলে আছে। কিন্তু তাদের ভাল ক'রে তৈরি করার লোকের বড় অভাব বলে আমি মনে করি।'

১৯৩০ সন থেকে আরম্ভ করে গত ৪৬।৪৭ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার pattern বদলান ব্যাপারে অনেক রকমের প্রয়াস চলছে। রাধাকৃষ্ণান কমিশন অনেক আগেই স্পষ্টাক্ষরে জানিয়েছিল, 'Our Secondary Education is the weakest link in our educational structure.' তারপর মুদালিয়র কমিশন, কোঠারী কমিশন শিক্ষা-সংস্কার বিষয়ে অনেক তথ্য দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় ডঃ রাধাকৃষ্ণান মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে এটাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যে,

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ব্যতীত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। 'University Education will be a superstructure built on sands.' ছাত্রজীবনে মাধ্যমিক শিক্ষায় কেটে যায় ১০।১১ বৎসর। ষষ্ঠ বৎসর হ'তে ষোড়শ বৎসর কালটি জীবনের ভিত্তিগঠনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। অনেক ক্ষেত্রে একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে—একই পারিপার্শ্বিকে জীবনের এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কালটি অতিবাহিত করবার সুযোগ যে জীবন-গঠনে কত বড় একটা সুবর্ণ সুযোগ, সে-বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার অধিকারী পূজনীয় আচার্যদের বেশ কয়েকজন জীবিত ছিলেন এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। যা তাঁরা বলেছেন, তা তাঁরা ক'রে দেখিয়েছেন—আচরণে প্রকাশিত করেছেন, সে জন্যই তাঁরা 'আচার্য'। এ সারিতে আছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ, আচার্য যদুনাথ—এরূপ কয়েকজন মনীষী।

এঁদের জীবন পর্যালোচনা ক'রে, এঁদের ছাত্র ও কৈশোর জীবন বিশ্লেষণ ক'রে এবং এঁদের অনুসরণ ক'রে ছাত্ররা জীবনের 'ভিত'-গঠনের আসল উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। এঁরা কিভাবে মানুষ হয়েছিলেন, মনুষ্যত্ব-লাভ ক'রে আচার্যস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, সে-সকল অনুধাবন ক'রে তারা মনুষ্যত্ব-লাভের অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে। আজও পশ্চিমবঙ্গে আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন কয়েকজন অশীতিপর আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেব-প্রসাদ ঘোষ, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন প্রভৃতি।

যে বঙ্গভূমি এখনও আচার্যজীবনস্পর্শে ধন্য, যেখানে আজও জীবিত আচার্যগণ হ'তে পারেন শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের পথের দিশারী, সেখানে আজ শিক্ষায় বিপর্যয় ও ছাত্রগণের বিভ্রান্তি সত্যই অস্বস্তিকর। শ্রদ্ধেয় ডঃ মজুমদারের সান্নিধ্য যে অনেকবারই লাভ করেছি, তা আগেই বলেছি। কয়েকমাস আগে একদিন আমার সহাধ্যায়ী আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের সান্নিধ্যে কাটিয়ে এসেছি তাঁর শান্তি-নিকেতনের বাসভবনে। বার্ধক্য তাঁর গবেষণা-কাজে ছেদ টানতে পারে নি। জ্ঞানতপস্বী ৮০ বছরের বৃদ্ধ শিক্ষক এখনও যুবকের মত সতেজ ও নিরলস। বহু বছরের ছাড়াছাড়ির পর দীর্ঘ চারঘণ্টা স্মৃতিচারণে আহরণ ক'রে এনেছি একটি মহামূল্য বাণী। তিনি আমাকে বললেন যে, তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র তাঁর জন্মদিনে শুধু দু'টি লাইন লিখে পাঠিয়েছেন—'আপনি আমা-দিগকে শুধু বিদ্যাদান করেন নি—আপনি আমাদিগকে করেছেন চরিত্রদান।' শিক্ষার মূলে আছে আত্মবিসর্জন। যে শিক্ষক নিজেকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করতে পারেন নিজের ছাত্রের মধ্যে তিনিই প্রকৃত শিক্ষক—তিনিই আচার্য। আচার্য প্রবোধ সেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরই পদাঙ্কানুসরণ ক'রে চলছেন জীবনপথে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ঐতিহ্যের অবজ্ঞা, অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞতা, শ্রদ্ধার অবক্ষয় ইত্যাদি লক্ষ্য ক'রে কেবলি মনে হয়, কবে আবার আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্বন্ধের ভিতর উপনিষদের 'সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ'—এ প্রার্থনামন্ত্রের সুরটি বেজে উঠবে। সেই দিনই হবে প্রকৃত শিক্ষার গোড়াপত্তন। শিক্ষায় শ্রদ্ধার অবলুপ্তি একটি চরম সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। স্বামীজী বহু পূর্বেই বলেছিলেন: 'আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত negative

(নেতিভাবপূর্ণ)—স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙে চুরে যায়— ফলে 'শ্রদ্ধাহীনত্ব'। যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে-'শ্রদ্ধা'র লোপ। ...তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায়—শিক্ষার প্রচার।' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭।৩২৭)।

আগেই উল্লেখ করেছি, পরিসংখ্যানের মাপকাঠিতে শিক্ষার প্রসার গত ১০।১২ বছরে যথেষ্ট বেড়েছে। তবু আজ জীবনের প্রতি অকর্মণ্যতা দুর্নীতি ও শৃঙ্খলাবোধের অভাব কেন? কেন আমাদের এ নৈতিক অবনতি? কিসের অভাবে আজ আমাদের এই দশা?

'অভাব অনেক আছে—কিন্তু সবচেয়ে বড় অভাব মনুষ্যত্বের। যতদিন এই অভাব অন্ততঃ কিছু পরিমাণে দূর না হবে, ততদিন কেবল নিয়মকানুন বদলে কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই'—বলেছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। মনুষ্যত্বের অভাব অর্থাৎ সোজা কথায় স্বামীজী-নির্দেশিত 'মানুষ-গঠনে'র শিক্ষার অভাবই আমাদের আজ এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন করেছে। কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতায় যে ভারতের মুক্তি হবে না, বহু বছর আগেই স্বামী বিবেকানন্দ তা বুঝেছিলেন।

মানুষ-গঠনের শিক্ষা চাই। সে-শিক্ষার স্বরূপটিও স্বামীজী স্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। 'যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর-সাধারণকে জীবন-সংগ্রামে সমর্থ করিতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯।১০৭)। মানুষ চাই –'মান-হুঁস'—যে মানুষ সত্য বলতে, সত্যকে জানতে ভয় করবে না, যে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ে হবে দৃঢ় আবার তেমনি বিনয়ীও।

এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দু'লক্ষ ষাট হাজার ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পাশের হার যদি পঞ্চাশ শতাংশ হয়, তখন ভেবে দেখতে হবে দশ বৎসর মাধ্যমিক শিক্ষায় অতিবাহিত ক'রে উত্তীর্ণ এক লক্ষ তিরিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে স্বামীজীর মাপকাঠিতে কতজনের প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার আসল বস্তু লাভ হ'ল এবং কতজনই বা পরের স্তরের উচ্চশিক্ষা-লাভের যোগ্যতা অর্জন করল।

আমাদের জাতীয়জীবনে 'অ-শিক্ষা'-জনিত যে অপচয় হচ্ছে, সেটা নিবারণের জন্য শিক্ষা-সংস্কারকগণকে 'গোড়ায় গলদ'টির অনুসন্ধানে কৃতসঙ্কল্প হ'তে হবে।

প্রাথমিক-শিক্ষা কলেজ-শিক্ষা স্নাতকোত্তর-শিক্ষা—এ সকল শিক্ষাকে গৌণ না ক'রেও ডঃ রাধাকৃষ্ণানের মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে অভিমতটির কথা নূতন ক'রে ভাবতে হবে। বহু দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাই জীবনের 'passport'। সে শিক্ষাকে বৃত্তিমূলক এবং সার্বভৌম মানবিকতাভিত্তিক অর্থাৎ স্বামীজী-নির্ধারিত বেদান্তভিত্তিক করতে হবে। মনুষ্যত্বের অর্থাৎ অন্তর্নিহিত দেবত্বের পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে আত্মবিশ্বাস-সৃজনের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, সে শিক্ষার 'ভিত'-গড়নের কাজ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরেই সুচিন্তিত বিধিবদ্ধভাবে নিতে হবে। এ বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত না হয়েই আমরা বিভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রে চলেছি। Class X, X plus 2, অথবা X plus 3—এটাই মাধ্যমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় কথা নয়। বড় কথা শিক্ষার 'মূল উপাদান'। মূল উপাদান

চারিত্রিক 'ভিত'-গঠনের সহায়ক হয়—শিক্ষায় জাতীয় কৃষ্টির অনুপ্রবেশ ব্যতীত তা সম্ভব নয়। শিক্ষার প্রতি স্তরে কোঠারী কমিশনের সুপারিশগুলির বাস্তব রূপায়ণের জন্য চাই সত্যিকারের প্রয়াস। কোঠারী কমিশন বলেছেন, 'Our education should be based on Science and Technology in coherence with our culture and spiritual traditions.'

শিক্ষাকে সর্বজনীন ধর্মভিত্তিক করার প্রয়োজনীয়তার কথাটা উপেক্ষা ক'রে স্বামীজীর বজ্রনির্ঘোষে উচ্চারিত 'Be and make' বাণীটিকে অবহেলা ক'রে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্কট ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রেই যাচ্ছি দিনের পর দিন। স্বামীজী-নির্দেশিত বেদান্তভিত্তিক উদার সার্বভৌম মানবধর্ম—যেখানে মন্দির মসজিদ গীর্জার সমন্বয়—তাই হওয়া চাই শিক্ষার ভিত্তি।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত একটি ভাষণ। সেখানে তিনি বলেছেন, 'শিক্ষা এমন হওয়া উচিত, যাতে জাতির বংশধর তরুণদের ভেতর জাতীয় কৃষ্টি অনুপ্রবিষ্ট হয়, যার ফলে তারা জাতির যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারে—এর সঙ্গে অবশ্য যাবতীয় ঐহিক বিদ্যাকেও সাদরে গ্রহণ করতে হবে। এভাবে না হলে শিক্ষা নিষ্ফল হবে।' (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী, পৃঃ ৯-১০)।

অনুরূপ কথাই বলেছেন আচার্য বিনোবাজী তাঁর 'Pauner'এ প্রদত্ত এক ভাষণে। সেখানে দেশের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী সমাজকে স্পষ্টাক্ষরে তিনি বলেছেন, 'Secularism does not mean absence of religion in our national life. In fact it should mean equal respect for all religions.'—ধর্ম-নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মশিক্ষাকে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ধর্ম-শূন্যতার দিকে ঠেলে দিচ্ছি কি-না, সেটা শিক্ষা-সংস্কারকগণের গভীরভাবে চিন্তা ক'রে দেখা উচিত।

কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তর সকল প্রদেশে প্রযোজ্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার এক বিধিবদ্ধ পাঠ্যক্রম-নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে শিক্ষার কাঠামোতে স্বামীজীর 'man-making education' বিকিরণের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা যে জাতীয় কল্যাণের জন্য অতীব প্রয়োজন—একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

'A teacher is the pivot of civilisation'—উক্তিটি করেছেন আদর্শ শিক্ষক শ্রদ্ধেয় স্বর্গত ডঃ রাধাকৃষ্ণান। শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয়-গ্রস্ত এ দেশে আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একদল খাঁটি শিক্ষকের। এঁরা হবেন শিক্ষায়তন-গুলিতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ একনিষ্ঠ পূজারীর দল। মানুষ-গঠনের শিক্ষার জন্য চাই আদর্শ শিক্ষক, যাঁরা স্বামীজীর নির্দেশিত পথে 'মানুষ-গড়ার' কাজে আত্মোৎসর্গ করবেন।

পুনরায় উল্লেখ করি শ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথাটি—তাঁর মতে আজও দেশে ভাল ছেলে আছে, কিন্তু তাদের তৈরি করার লোকের বড় অভাব।

স্বার্থ, দেনা-পাওনা এসব বড় বেশী আজ শিক্ষাক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে। তদুপরি পাশ্চাত্যের মতো আমাদেরও এখন রাজনীতিতে পেয়ে বসেছে। বিদ্যায়তনগুলিকে রাজনীতিমুক্ত ক'রে 'মানুষ-তৈরি'র কাজে শিক্ষকদের ব্রতী হতে হবে।

মানুষ-তৈরির শিক্ষার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বামীজীর নির্দেশিত ত্যাগ ও সেবাধর্মের

আদর্শে উদ্বুদ্ধ শিক্ষকমণ্ডলী; দ্বিতীয়তঃ স্মরণীয়দের স্মরণোপলক্ষে সাংস্কৃতিক সম্মেলনসহ কতিপয় উৎসবদিবস-উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা এবং তৃতীয়তঃ সকল ধর্মের সার সঙ্কলন ক'রে একটি স্বল্পায়তন গ্রন্থ-রচনা এবং মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পাঠ্যক্রমে তার অন্তর্ভুক্তি—এ 'তিনে'র সহায়তায় সর্বজনীন ধর্মভিত্তিক কৃষ্টিপুষ্ট শিক্ষাবিকিরণ সম্ভব হতে পারে।

সুস্থ পরিবেশ, ঔপনিষদিক প্রার্থনা, সঙ্গীত ও আবৃত্তি-সংবলিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান ও মনীষীদের স্মরণের মাধ্যমে শিক্ষকগণই বিদ্যার্থীদের সার্বভৌম মানবিকতা-ধর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি একটি অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক সঙ্গীত ছিল কবিগুরুর 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর।' অনুষ্ঠানটি সত্যিই কিছুক্ষণের জন্য 'আনন্দলোক' সৃজন করেছিল। বিদ্যায়তনে পাঠাগারে যুবকেন্দ্রে এরূপ অনুষ্ঠান যে স্বামীজী-কথিত মানুষ-গড়ার শিক্ষার বিকিরণের সহায়ক—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শই হোক শিক্ষকগণের জীবনপথে আলোক-দিশারী এবং নৈরাশ্যের মুহূর্তে আশা ও উৎসাহের উৎস।

সমালোচনা

রামকৃষ্ণচরিত: স্বামী অমৃতত্বানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, বাংলাদেশ। প্রকাশক: শ্রীসত্যনারায়ণ আগরওয়ালা। (১৯৭৭), পৃষ্ঠা ৩৬; মূল্য দুই টাকা।

'শ্রীরামকৃষ্ণচরিত' পুস্তিকাটিতে স্বামী অমৃতত্বানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন অতি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে শুরু করিয়া তাঁহার সর্বধর্মমতে সাধন পর্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া লেখক সর্বধর্মেরই অন্তর্গত ধর্মের সর্বজনীন মূল সত্যটি যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও বাণীতে প্রকাশিত তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশও পুস্তিকাটির শেষে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

পাতঞ্জল ব্যাকরণ-মহাভাষ্য: শ্রীনমিতা রায়চৌধুরী ও শ্রীপূর্ণিমা বসু কর্তৃক বাংলায় অনূদিত ও আলোচিত। প্রকাশক: শ্রীনগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৫/২ একডালিয়া প্রেস, কলিকাতা ১৯। (১৯৭৬), পৃষ্ঠা ৪৮+৭, মূল্য ছয় টাকা।

এই গ্রন্থটি মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকের বাংলায় অনুবাদ ও আলোচনা। মহামুনি পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্য, ভাষার দিক্ থেকে যেমন সরল, অর্থের দিক্ থেকে কিন্তু মোটেই সেরূপ নয়। এর অর্থ অতলস্পর্শ মহাসমুদ্রের মতো বড়ই দুরবগাহ। সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের বীজ এর মধ্যে নিহিত আছে। বাক্যপদীয়ের টীকাকার পুণ্যরাজ বলেছেন, সমস্ত ন্যায়ের (যুক্তির) মূল কথাগুলি এই গ্রন্থে নিবদ্ধ থাকায় এবং অর্থের গাম্ভীর্য- ও ভাষার সৌষ্ঠব-বশতঃ একে মহাভাষ্য বলা হয়। নাগেশ ভট্ট মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্যোতে বলেছেন, মহাভাষ্যটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ হলেও এতে স্বতন্ত্রভাবে বচন আছে ব'লে একে মহাভাষ্য বলে। এই একটি ভাষ্য ব্যতীত আর কোন ভাষ্যকে মহাভাষ্য বলা হয় না।

পতঞ্জলি এই মহাভাষ্যে স্ফোটকেই শব্দের স্বরূপ বলেছেন। বর্তমান অনুবাদে কিন্তু স্ফোট এবং ধ্বনিকে এক ক'রে ফেলে ধ্বনিকেই শব্দের স্বরূপ বলা হয়েছে। এটা একটা অপ-সিদ্ধান্ত। এই মহাভাষ্যের অর্থ করতে মহা-মহোপাধ্যায়দেরও হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িকভাবে অধ্যয়ন ও মনন ব্যতীত সঠিক অনুবাদ ও তাৎপর্য-নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। ফলতঃ বহু অপসিদ্ধান্ত ও ভুল অনুবাদ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে দিলাম।

'পতঞ্জলি 'মঙ্গল' অর্থে 'অথ' শব্দ গ্রন্থের আদিতে ব্যবহার করিয়াছেন।' (পৃঃ ২)।

'পতঞ্জলির মতে মানুষের মুখবিবর হইতে যাহা নিঃসৃত হয়, তাহাই শব্দ।' (পৃঃ ৩)।

'তাহা হইলে কি যাহা ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, ছিন্ন হইয়াও অচ্ছিন্ন সামান্যভূত, তাহাই শব্দ?' (অনুবাদে ভুল)। (পৃঃ ৪)।

'অথবা যে ধ্বনির সুস্পষ্ট অর্থ থাকে পৃথিবীতে তাহাকেই শব্দ বলে।' (অনুবাদে ভুল)। (পৃঃ ৫)।

টীকা—'একদা বৃত্র নামক এক অসুর তাহার শত্রু ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য পুত্র কামনা করিয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে।' (পৃঃ ৮)। মহাভারতে, বেদের আখ্যায়িকায়—সর্বত্রই আছে, ত্বষ্টা, ইন্দ্র কর্তৃক বিশ্বরূপ নামক পুত্র হত হ'লে, ইন্দ্রের বধের জন্য যজ্ঞ ক'রে বৃত্রাসুরকে উৎপাদন করেছিলেন। যজমান ত্বষ্টা, বৃত্র নয়।

'প্রাচীন কল্পে (সূত্রে) ছিল—' (অনুবাদে ভুল)। (পৃঃ ১৮)।

'কিং পুনরাকৃতিঃ পদার্থঃ, আহোস্বিদ্ দ্রব্যম্'-এর অনুবাদ 'শব্দ কি? পদার্থ (জাতি) অথবা দ্রব্য?' ঠিক নয়। (পৃঃ ২২)।

৩১ পৃষ্ঠায় অনুবাদ হাস্যকর। মহাভাষ্যকার পূর্বপক্ষরূপে বলেছেন—'উষ, তের, চক্র, পেচ' এই-জাতীয় অনেক শব্দ আছে, অথচ এদের প্রয়োগ হয় না। অনুবাদে 'উষা', 'তেরা', 'চক্রে' ও 'পেচা' এইরূপ লেখা হয়েছে। বস্ + লিট্ + অ = উষ; তৃ + লিট্ + অ = তের; কৃ + লিট্ + অ = চক্র; পচ্ + লিট্ + অ = পেচ—এইটুকু জ্ঞান তাঁদের থাকা দরকার যাঁরা মহাভাষ্যের অনুবাদ ও টীকা করতে অগ্রসর হবেন।

আরো প্রচুর ভুল ও অপসিদ্ধান্ত আছে, সেগুলির উল্লেখ ক'রে সমালোচনা দীর্ঘ করতে চাই না। তবে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, মহাভাষ্যের অনুবাদ ও টীকা করতে হ'লে বিশেষ সাবধান হয়ে করা উচিত এবং বিশেষজ্ঞ-দের দেখিয়ে নিয়ে তবেই ছাপা উচিত। কারণ, অপসিদ্ধান্তগুলি অজ্ঞ পাঠকের মাথায় ঢুকলে, সেগুলি দূর করা কঠিন হবে। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করা হবে।

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

মরিশাস কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭৬, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের মরিশাস কেন্দ্রের নবনির্মিত মন্দিরটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে উৎসর্গ করেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৪ঠা শীতের প্রত্যুষে আশ্রমের মন্দির-সংলগ্ন স্থানে একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা বাহির হয়।

পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দ মহারাজও এই শোভা-যাত্রায় নগ্নপদে যোগদান করেন। সন্ন্যাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিত্রয় পুরাতন পূজাবেদী হইতে বহন করিয়া নবনির্মিত মন্দিরের বেদীতে স্থাপন করেন। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ভক্তগণ বৈদিক শান্তিপাঠ করিতে থাকেন। শ্রীদৌলত শর্মা ও শ্রীবেণীমাধব শর্মা আচার্যদ্বয় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। নূতন মন্দিরে দুইটি হোম অপরাহ্ন অবধি অনুষ্ঠিত হয়। উভয় হোমানুষ্ঠানেই পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী যোগ-দান করেন। সন্ধ্যায় বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত ভজন-মণ্ডলী কর্তৃক পরিবেশিত ভক্তিমূলক গান কীর্তন ও ভজন বহু ভক্ত নরনারীকে আকৃষ্ট করে। রাত্রিতে ভারতীয় দূতাবাসের ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র ইউনিট কর্তৃক কয়েকটি ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে ভিত্তি করিয়া রচিত ইংরেজী ও হিন্দী দুইটি ছায়াছবি দর্শকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করে।

পরদিন প্রাতে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দজী তাঁহার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, নবনির্মিত ও উৎসর্গীকৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরটির দ্বার জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নরনারীর জন্যই উন্মুক্ত হইল। তিনি বলেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের সকল ধর্মের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন। যাঁরা এই মন্দিরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে ধনসম্পদ ও সুখসমৃদ্ধি প্রার্থনা করবেন, তাঁরা তাই পাবেন। আর যাঁরা শান্তি ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করবেন, তাঁরা শান্তি ও মুক্তি লাভ করবেন। আমি আশা করবো মরিশাসের সকল শ্রেণীর নরনারীই এই সর্বজনীন দেবায়তনে আসবেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সহিষ্ণুতা ও শান্তির ভাবে উদ্বুদ্ধ হবেন।'

এই সভায় মরিশাসের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ স্যার শিউসাগর রামগুলাম প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে উল্লেখ করেন যে, মরিশাসে রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটির সহিত তিনি সুদীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯৩৯ হইতে ৯৪৪ সাল পর্যন্ত, যখন স্বামী ঘনানন্দ মরিশাসে ছিলেন, তখন তিনি মিশনের ডিস্‌পেনসারিতে ডাক্তার হিসাবে রোগীদের সাক্ষাৎভাবে সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। সমগ্র রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজের দর্শন লাভ করিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মিঃ আর. রামদীনী এবং মরিশাস কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অপরানন্দ।

সভায় মহাত্মা গান্ধী ইনস্‌টিটিউটের গায়কগণ রাগ-সঙ্গীত পরিবেশন ক'রে সকলকে মুগ্ধ করেন। রাত্রিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ মন্দিরের হলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ক'রে সকলের আনন্দবর্ধন করেন।

সুবর্ণ-জয়ন্তী

বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব ও তৎসহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গত ১১ই মার্চ ১৯৭১ হইতে ১৭ই মার্চ পর্যন্ত উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্নে স্থানীয় মহকুমা-প্রশাসক জনাব গোলামবারী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম খান চৌধুরী সাহেব উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-সংবলিত চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। অপরাহ্নে স্বামী অক্ষরানন্দের সভাপতিত্বে এক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন বাগেরহাট মহকুমার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কায়ুম ঠাকুর সাহেব। প্রথমে রামকৃষ্ণ

মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মসচিব স্বামী গম্ভীরানন্দজী এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব সৈয়দ আলী আহ্সান সাহেব প্রমুখ সুধী ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী পঠিত হয়। পরে 'বিশ্বকল্যাণ-সাধনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অবদান' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন জনাব এম. এ. সবুর, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে, শ্রীরঞ্জিতকুমার চক্রবর্তী ও স্বামী যোগদানন্দ। সভান্তে বাগেরহাট শুকলাল বিদ্যাপীঠের শিল্পিগণ কর্তৃক ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও একাঙ্কিকা নাটিকা পরিবেশিত হয়।

১২ই অপরাহ্নে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাণ্ডের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন শ্রীসুধাংশুশেখর হালদার শ্রীঅসিতবরণ ঘোষ ডাঃ নরেশচন্দ্র পাল শ্রীবিমলচন্দ্র বসু স্বামী অক্ষরানন্দ এবং মাননীয় মৌলনা সাহেব। সভান্তে খুলনার বেতারশিল্পিগণ কর্তৃক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবন অবলম্বনে গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

১৩ই অপরাহ্নে আশ্রমের সম্প্রসারিত 'ব্রহ্মানন্দ ভবনে' গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত মহিলাকবি বেগম সুফিয়া কামাল। পরে অধ্যাপক বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। 'অধ্যাত্মিকতায় নারীসমাজ ও শ্রীসারদাদেবী' বিষয়ক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী মুকুলিকা আইচ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাণ্ডে শ্রীবিমলচন্দ্র বসু ও স্বামী অমৃতত্বানন্দ। সভান্তে বাগেরহাট শুকলাল বিদ্যাপীঠের শিল্পিগণ কর্তৃক 'দুই ভাই' নাটক অভিনীত হয়।

১৪ই অপরাহ্নে স্বামী অমৃতত্বানন্দের পৌরোহিত্যে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনও প্রধান অতিথি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য মহা-পুরুষদের বাণীর উদ্দেশ্য মানব-কল্যাণসাধন' বিষয়ক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জনাব সামশুল আলম ও অধ্যাপক বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য। সভান্তে বাংলাদেশের প্রখ্যাত বেতারশিল্পী শ্রীরথীন রায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১৫ই অপরাহ্নে স্বামী যোগদানন্দের পৌরোহিত্যে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য শ্রীবিনোদবিহারী সেন ডাঃ নরেশচন্দ্র পাল ও স্বামী অমৃতত্বানন্দ। সভান্তে শ্রীনারায়ণচন্দ্র সাহা 'রামায়ণ-গান' পরিবেশন করেন।

১৬ই অপরাহ্ন হইতে রাত্রি পর্যন্ত শ্রীনারায়ণ-চন্দ্র সাহা 'রামায়ণ-গান' পরিবেশন করেন। অতঃপর রহিমাবাদ নাট্যগোষ্ঠীর শিল্পিগণ কর্তৃক 'দায়ী কে ?' নাটক অভিনীত হয়।

১৭ই উষাকীর্তন এবং বেলা ১টা পর্যন্ত বিভিন্ন দলের পদাবলী-কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় চার হাজার ভক্ত নরনারীকে বসাইয়া খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে পুনরায় বিভিন্ন দলের পদাবলী-কীর্তন আরম্ভ হইয়া রাত্রি পর্যন্ত চলে।

সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবের স্মরণকল্পে বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের লেখায় সমৃদ্ধ একখানি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

দিনাজপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২০শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি

বেদপাঠ ভজন-কীর্তন মন্দির-পরিক্রমা ধর্মগ্রন্থ-পাঠ পূজা হোম প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। এই উৎসবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই অংশ গ্রহণ করেন। প্রায় ৩,৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে ২৫শে ও ২৬শে ফেব্রুআরি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ২৫শের ধর্ম-সভায় প্রধান অতিথি মাননীয় এস. এ. বারী তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সনাতন ধর্মে যে পরিবর্তন আনেন তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সভাপতি জনাব মাহ্‌মুদ মোকাররম হোসেন তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শুধু হিন্দুদের নয় মুসলমানদেরও চেতনা আনিয়াছেন এবং তাঁহার উদার মতেই সকল ধর্ম-বিরোধ দূর হইতে পারে। স্বামী পরদেবা-নন্দও ভাষণ দেন। ২৬শের ধর্মসভায় সভানেত্রী অধ্যাপিকা দিলরুবা রহমান তাঁহার ভাষণে বলেন যে, সতীত্ব ও মাতৃত্ব এই দুইটি নারীর যথার্থ আদর্শ। এই আদর্শ দুইটির সার্থক ও পরিপূর্ণ রূপায়ণ আমরা পাই শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে। ভাষণান্তে তিনি আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। আলহজ্জ গিয়াসুদ্দীন আহাম্মদ তাঁহার ভাষণে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার মতের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও সকলকে স্ব-স্ব-ধর্মনিষ্ঠ থাকিতে বলেন। অন্যান্য বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন শ্রীশান্তিনারায়ণ চক্রবর্তী শ্রীমতী মীনা ভট্টাচার্য ও কুমারী সন্ধ্যারাণী ভট্টাচার্য। প্রতিদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোষ ও তাঁহার সহশিল্পি-বৃন্দ লীলাগীতি পরিবেশন করেন।

ফরিদপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১২ই জানুআরি ১৯৭৭, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব প্রভাতফেরি মঙ্গলারতি ভজন বিশেষ পূজা হোম চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। বহু ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় একটি জনসভায় স্বামীজীর সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীবিনোদলাল ভদ্র শ্রীযতীশচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার। স্থানীয় স্কুল-কলেজের বিদ্যার্থীদের মধ্যে স্বামীজীর শিক্ষা-নীতি সম্পর্কে রচনা-প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়। ৮ই ফেব্রুআরি তারিখে আয়োজিত জন-সভায় পৌরোহিত্য করেন জনাব সরোয়ার জান সাহেব ও প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শ্রীদেবরঞ্জন চক্রবর্তী। স্বামীজীর জীবন-দর্শন আলোচনা করেন শ্রীমৎ ধর্ম রক্ষিৎ ভিক্ষু ও স্বামী অক্ষরানন্দ। পরদিন স্বামী পরদেবানন্দ স্বামীজীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় শিল্পিগণ শ্রীসুধীর চক্রবর্তী-সংকলিত 'স্বামীজী' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন শ্রীকরুণাময় অধিকারীর পরিচালনায়। শ্রীহরিপদ সাহা সকলকে ধন্যবাদ দেন।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে গত ১১ই মার্চ হইতে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হয়। ১১ই মার্চ প্রভাতফেরি সানাই-বাদন ও বিশেষ প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পূজা হোম কথামৃতপাঠ, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পরিবেশিত শ্রীরামকৃষ্ণ গীতি-আলেখ্য, শ্রীরথীন ঘোষ ও সম্প্রদায়ের কীর্তন, পটলডাঙ্গা শক্তি সঙ্ঘের কীর্তন, চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী, শ্রীপূর্ণ-চন্দ্র দাসের বাউল গান, শ্রীবিশ্বনাথ দাসের 'ব্যায়াম নাটিকা', আশ্রম বালকদের 'প্রহ্লাদ' যাত্রাভিনয়, পণ্যপ্রদর্শনী ইত্যাদি তিনদিন-ব্যাপী উৎসবের অঙ্গ ছিল। ১২ই মার্চ ধর্ম-সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনা করেন

স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ স্বামী বন্দনানন্দ শ্রীঅজিত-নাথ রায় ও সভাপতি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। রহড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রায় ৬০।৭০ হাজার দর্শক ও শ্রোতা বিভিন্ন দিনে উৎসবে যোগদান করেন।

নরোত্তমনগর (অরুণাচল প্রদেশ) রাম-কৃষ্ণ মিশনে গত ১৩ই ডিসেম্বর '৭৬, ১২ই জানু-আরি ও ২০শে ফেব্রুআরি '৭৭ যথাক্রমে শ্রীমা সারদাদেবী স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের জন্মতিথি সানাই-বাদন, মঙ্গলারতি বেদপাঠ ও ভজন প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। তিন দিনই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা হোম হয়। বিশেষ পূজার পর স্বামী প্রমথানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও উপদেশ আলোচনা করেন। শ্রীপবিত্র আচার্যের পরিচালনায় ছাত্ররা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর গান এবং বিভিন্ন ভাষায় ভজন-সঙ্গীত পরিবেশন করে। এই উপলক্ষে তিরাপ জেলা হইতে প্রায় দুইশতাধিক গ্রাম-বাসী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে সমবেত হন। তাঁহারা এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত ভক্তবৃন্দ সকলেই বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর ধর্মসভা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, চলচ্চিত্রে স্বামীজীর জীবনী-প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গত ৫ই ফেব্রু-আরি তিরাপ জেলার স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী বিনীতা রায়। স্বামী প্রমথানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সভান্তে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। নরোত্তমনগর বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ও খনসা রামকৃষ্ণ-সারদা মিশনের ছাত্রীরা পৃথক্‌ভাবে ভজন-সঙ্গীত পরিবেশন করে। শ্রীটি. এল. রাজকুমার ও শ্রীওয়াংলিয়াম রাজকুমার —এই আদিবাসী যুবকদ্বয় তাঁহাদের মাতৃভাষা 'নোকতে'তে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন। বহু আদিবাসী এই উৎসবে যোগদান করেন।

দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, **স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ** (সুরেন মহারাজ) গত ১৯শে এপ্রিল ১৯৭৭, সন্ধ্যা ৭টায় বেলুড় মঠে ৭৩ বৎসর বয়সে শ্বাস- ও হৃদ্‌-যন্ত্রের বিকলতাহেতু দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯২১ সালে সংঘের ঢাকা কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯২৫ সালে স্বীয় মন্ত্রগুরুর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। তিনি কারুকলায় প্রশিক্ষণে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং ধানবাদ ও দমদম অঞ্চলে দরিদ্র জনগণের মধ্যে কারুশিল্পবিদ্যার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার জীবনের প্রায় বিশ বৎসর নর্মদাতীরে তপস্যায় অতিবাহিত হয়। 'বনের ডাক' নামক তাঁহার গ্রন্থটি হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়া উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

আবির্ভাব-তিথি ও পূজা-তিথির সূচী

বাংলা ১৩৮৪ সাল, ইংরাজী ১৯৭৭-৭৮খ্রীঃ

আবির্ভাব-তিথি

শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	১০ বৈশাখ	শনিবার	২৩ এপ্রিল	১৯৭৭
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	২০ বৈশাখ	মঙ্গলবার	৩ মে	„
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	২৯ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার	১৪ জুলাই	„
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১২ ভাদ্র	রবিবার	২৮ আগষ্ট	„
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	২০ ভাদ্র	সোমবার	৫ সেপ্টেম্বর	„
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৭ ভাদ্র	সোমবার	১২ সেপ্টেম্বর	„
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	২০ আশ্বিন	বৃহস্পতিবার	৬ অক্টোবর	„
স্বামী অখণ্ডানন্দ	মহালয়া	২৬ আশ্বিন	বুধবার	১২ অক্টোবর	„
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৬ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	২২ নভেম্বর	„
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৮ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতিবার	২৪ নভেম্বর	„
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	৩ পৌষ	রবিবার	১৮ ডিসেম্বর	„
		৯ পৌষ	শনিবার	২৪ ডিসেম্বর	„
	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৭ পৌষ	রবিবার	১ জানুয়ারী	১৯৭৮
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	২১ পৌষ	বৃহস্পতিবার	৫ জানুয়ারী	„
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	৩০ পৌষ	শনিবার	১৪ জানুয়ারী	„
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	৯ মাঘ	সোমবার	২৩ জানুয়ারী	„
	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৭ মাঘ	মঙ্গলবার	৩১ জানুয়ারী	„
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২৬ মাঘ	বৃহস্পতিবার	৯ ফেব্রুয়ারী	„
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৮ মাঘ	শনিবার	১১ ফেব্রুয়ারী	„
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	১০ ফাল্গুন	বুধবার	২২ ফেব্রুয়ারী	„
শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২৬ ফাল্গুন	শুক্রবার	১০ মার্চ	„
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		৫ চৈত্র	রবিবার	১৯ মার্চ	„
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	১০ চৈত্র	শুক্রবার	২৪ মার্চ	„
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	১৪ চৈত্র	মঙ্গলবার	২৮ মার্চ	„

পূজা-তিথি

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	৩ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	১৭ মে	১৯৭৭
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	১৮	বুধবার	১ জুন	
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	২ কার্তিক	বুধবার	১৯ অক্টোবর	„
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২৪ কার্তিক	বৃহস্পতিবার	১০ নভেম্বর	„
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	২৯ মাঘ	রবিবার	১২ ফেব্রুয়ারী	১৯৭৮
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৩ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	৭ মার্চ	„

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

পোর্টব্লেয়ার রামকৃষ্ণ কেন্দ্রে ১৬ই জানুআরি ১৯৭৭, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে বাংলা হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় স্বামীজীর জীবনী ও উপদেশাবলীর একটি বাগ্মিতা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বাগ্মিতার গুণগত বিচারে প্রত্যেক বিভাগের প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের স্বামীজীর উপদেশাবলী-সংবলিত পুস্তক পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির ও শ্রীমতী গীতা কৃষ্ণাত্রী প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন। প্রধান অতিথি পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি মহোদয় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

রাজারহাট-বিষ্ণুপুর রামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে গত ৬ই ফেব্রুআরি ১৯৭৭, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলা-পার্ষদ ঈশ্বরকোটি শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের জন্মজয়ন্তী গ্রামপরিক্রমা বিশেষ পূজা হোম নারায়ণসেবা কথামৃতপাঠ কীর্তন ধর্মসভা, মাকড়দহ 'রামকৃষ্ণ সাধনালয়ে'র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণনামকীর্তন, শ্যামবাজার 'সুহৃদ্ সম্মিলনী'র কালীকীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে সাড়ম্বরে পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ এবং প্রধান অতিথি স্বামী তীর্থানন্দ। সভাপতি মহারাজ পরিকল্পিত নির্মীয়মাণ মন্দিরের রূপায়ণ ত্বরান্বিত করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ' গীতি-আলেখ্য কথকতা করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সঙ্গীতাংশে ছিলেন শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরে স্থানীয় শিশুদের 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটকাভিনয় হয়। আড়াই হাজারের বেশী নরনারায়ণ খিচুড়ি প্রসাদ পান। উৎসব উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচনা-চক্র কর্তৃক গত ২০শে ফেব্রুআরি ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি প্রভাতফেরি বিশেষ পূজা চণ্ডীপাঠ হোম ও মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ হয়। অপরাহ্ণে কথামৃত-পাঠ ও পরে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় সভাপতি ডঃ অতুলচন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভান্তে ভজন ও শ্যামাসঙ্গীত হয়। সন্ধ্যারতির পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিপাঠ ও পুনরায় ভক্তিসঙ্গীত হয়। রাত্রিতে ১১ বৎসর বয়স্ক শ্রীবুদ্ধদেব সূত্রধর রামায়ণের 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' পালাগান পরিবেশন করে। ১৩ই ডিসেম্বর ও ১২ই জানুআরি শ্রীমা সারদাদেবীর ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিও পালিত হয়।

পাণ্ডু বিবেকানন্দ পাঠচক্র প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব গত ২০শে ফেব্রুআরি মঙ্গলারতি ভজন বিশেষ পূজা হোম চণ্ডীপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ৭০০ ভক্ত হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালীন ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন সভাপতি শ্রী জি. এইচ. কেশোয়ানী শ্রী এ. ভি. সুব্রহ্মনিয়াম ও স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। ১১ই মার্চ হইতে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ উৎসব পালিত হয়। মঙ্গলারতি পূজার্চনা কথামৃতপাঠ প্রসাদ-বিতরণ, ছাত্রদের দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে কবিতা-প্রতিযোগিতা অসমীয়া নামকীর্তন ও পদাবলীকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল।

১১ই সন্ধ্যারতির পর ধর্মসভায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন সভাপতি শ্রী এস. কে. সুদান শ্রীভবানী সরকার স্বামী প্রমথানন্দ ও স্বামী ইজ্যানন্দ। ১২ই সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে ভাষণ দেন সভানেত্রী শ্রীমতী লীলা কেশোয়ানী শ্রীমতী অঞ্জলী চক্রবর্তী স্বামী প্রমথানন্দ ও স্বামী ইজ্যানন্দ। ১৩ই শ্রীশ্রীঠাকুরের শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীউপাধ্যায় স্বামী প্রমথানন্দ ও সভাপতি শ্রীভবানী বড়ুয়া।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘে গত ১০ই হইতে ১৩ই মার্চ ১৯৭৭ পর্যন্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রত্যহ মঙ্গলারতি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সন্ধ্যারতি এবং দ্বিপ্রহরে বৈকালে ও সন্ধ্যার পর বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন দ্বিপ্রহরে বালক-বালিকাদের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার পর শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক পুরস্কার বিতরিত হয়। সন্ধ্যারতির পর রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে 'ভক্ত হরিদাস' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিন প্রব্রাজিকা দেবপ্রাণার ভাষণ, তৃতীয় দিন রাধারমণ কীর্তন সমাজ কর্তৃক 'নৌকাবিলাস' কীর্তন এবং চতুর্থ দিন শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় ও চতুর্থ দিন যথাক্রমে শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ গীতি-আলেখ্য ও শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামায়ণগান হয়। শেষ দিন নগর-পরিক্রমা ও বিশেষ পূজার পর প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ পান।

পশ্চিম রাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গত ১১ই মার্চ ১৯৭৭ হইতে চারিদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব-উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বিশেষ পূজা ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ১১ই ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে ভাষণ দেন সভানেত্রী প্রব্রাজিকা স্বরূপপ্রাণা এবং শ্রীমতী সুধীরা দত্ত। সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও পাঠচক্র কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। ১২ই ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী উমানন্দ ও ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। সভান্তে অনির্বাণ মণিমেলা কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ১৩ই ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ ও অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী। সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরিত হয়। ১৪ই সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির কর্তৃক 'রাণী রাসমণি' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

পরলোকে

গত ১৭ই মার্চ ১৯৭৭, রামকৃষ্ণ মিশনের বালিয়াটী শাখাকেন্দ্রের সহ-সভাপতি **রমণীরঞ্জন অধিকারী** ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ১৯০১ সালে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমাধীন বালিয়াটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের বালিয়াটী শাখাকেন্দ্রের নির্বাহী পরিষদে বিভিন্ন সময়ে সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক ও সহ-সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সুষ্ঠুভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত কেন্দ্রের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের অবৈতনিক চিকিৎসকেরও কার্য করিয়া গিয়াছেন।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

১ম বর্ষ।] ১৫ই পৌষ । (১৩০৬ সাল) [২৪শ সংখ্যা।]

বেদান্ত ও ভক্তি।

(স্বামী সারদানন্দ।)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

জ্ঞান ছাড়িলে ধর্ম্মলাভ হয় না।

বেদান্তের আর একটী কথা—জ্ঞান ছাড়িলে ধর্ম্মলাভ হইবে না। ভক্তিশাস্ত্রে অহেতুকী ভক্তিই প্রধান ও উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত থাকিলেও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই যে, তাহা লাভের উপায়, একথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। ভক্তির প্রধানাচার্য্য-প্রমুখেরাও একথা বুঝাইয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেবও গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সহিত কথোপকথনের সময় একথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আজকাল অনেকেই জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া একেবারে অহেতুকী ভক্তিলাভ করিতে প্রয়াসী হন। বলা বাহুল্য যে, ইহা তাঁহাদের বাতুলের চেষ্টার ন্যায় কখনই অভীষ্ট ফল প্রদান করিবে না।

উপসংহার—আচার্য্যদেবের উপদেশ।

পরিশেষে সেই গঙ্গাবারিবিধৌত বিশাল উদ্যানবাসী, এক সময়ে সেই 'সৌম্যাৎ সৌম্যতরা' শবশিবা মূর্ত্তির তন্ময় সেবক, সেই মাধবীহারগ্রথিত চিরপরিণীত অশ্বত্থবটের নিবিড় আলিঙ্গনে পঞ্চবটী ও তন্মধ্যস্থ তপস্যাজাগ্রত ভূমি ও সাধনকুটীরে ধ্যানশীল সেই বালস্বভাব সরলতা মাধুর্য্য ও তেজের অপূর্ব্ব সম্মিলন আচার্য্যদেবের সেই গ্রাম্য ভাষায় হৃদয়ের সংশয়চ্ছিন্নকারী উপদেশ—যাহার প্রতিপংক্তিতে বেদ, বেদান্ত, দর্শনের নিগূঢ় ও জটিল সত্যসকল জীবন্ত ও জ্বলন্ত হইয়া সুকুমারমতি বালকেরও মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিত—তাহার দুই চারিটী কথা স্মরণ করিয়া আমরা অদ্যকার উপসংহার করি।

"ভক্ত হবি, কিন্তু তা বোলে বোকা হবি কেন? বোকা হলেই কি ভগবানে বেশী ভক্তি হবে?"

"ভক্ত হোস্, কিন্তু গোঁড়া বা একঘেয়ে হোস্‌নি। একঘেয়ে হওয়া অতি হীনবুদ্ধির কাজ।"

"যত মত তত পথ। আপনার মতে নিষ্ঠা রাখিস্, কিন্তু অপরের মতের দ্বেষ বা নিন্দা করিস্ না।"

১

সমালোচনা।

"সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"—পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।*

আজকাল প্রায় মিশ্রধরণের লেখারই চলন হইয়া আসিয়াছে। উচ্চ বিমিশ্রধরণের লেখায় সর্ব্বপ্রকার রসেরই আস্বাদ পাওয়া যায় এবং অতি সুমধুর লাগে। উহারই মধ্যে যাঁহারা একটু বিশেষ প্রতিভাশালী লেখক, তাঁহারা প্রায়ই এই 'উচ্চ বিমিশ্র' ধরণে লিখিয়া ভাষার শ্রী ও গৌরব বৃদ্ধি করেন এবং অনেক পাঠকের মন প্রাণ কাড়িয়া লয়েন। কেনই বা না লইবেন? তাঁহারা উচ্চচেতা, তাঁহাদিগের প্রশস্ত হৃদয়; সকলকেই তাঁহারা স্থান দিয়া থাকেন। উচ্চ, মধ্যম, চলিত ও গ্রাম্য ভাষার সকল প্রকার ধরণকেই সমান আদর করেন এবং ব্যবহারও করেন। কেনই বা না করিবেন? আদর করিতে জানেন, ব্যবহার করিতে জানেন,—তাই করেন। যিনি বাজাতে জানেন, তিনি মাটির হাঁড়িই এমন বাজাইবেন যে, তাক্ লাগাইয়া দিবেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলিতেছেন "ব্যাকরণ যদি একখানি গড়িয়া তুলিতে হয়, একদিকে সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণ; আর একদিকে দেশীয় চাসাভুসা এবং অন্তঃপুর মহলের ব্যাকরণ; সংক্ষেপে বঙ্গীয় প্রাকৃত ব্যাকরণ; আর একদিকে খাস্ সংস্কৃত ব্যাকরণ; এই তিন ব্যাকরণের ত্রিবেণী সঙ্গমকে আদর্শ করিয়া একখানি সুপাঠ্য এবং সমীচীন ব্যাকরণ গড়িয়া তোলা হইলে ভাল হয়"। আর একস্থলে বলিতেছেন "আর তাহার মহৎ দোষ হচ্ছে—চলিত কথোপকথনের ব্যবহারোপযোগী দীন হীন শব্দ গুলির প্রতি হতশ্রদ্ধা"। আরও একস্থলে বলিতেছেন "বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দগুলিকে বর্ব্বর ভাষা বলিয়া উপেক্ষা করা নিতান্তই অজ্ঞলোকের কার্য্য; যেহেতু সেগুলা প্রকৃতপক্ষেই সংস্কৃতের সন্তান সন্ততি"।

বাঙ্গালা ভাষার উপর
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আরও বলিতেছেন "স্থলবিশেষে সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত কথোপকথনের ভাষা মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে বেশী কার্য্যকারী হয়। কেহ যদি বলে যে, "অমুক কথাটার বন্ধন শিথিল" তবে সে বাক্যটির অর্থ উহারই মধ্যে একটু কষ্ট করিয়া বুঝিতে হয়; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে সে যদি বলে যে "অমুক কথাটির বাঁধুনি আলগা" তবে তাহার অর্থ বুঝিতে শ্রোতার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না।" কথাগুলি যাহা বলিয়াছেন—অতি সমীচীন।

চলিত কথার উৎপত্তি যে প্রায়ই সংস্কৃত হইতে হইয়াছে, তাহার উদাহরণ কতকগুলি দেখাইতেছেন,—

চলিত	সংস্কৃত	চলিত	সংস্কৃত	চলিত	সংস্কৃত
আলগা,—	অলগ্ন।	কাপড়,—	কর্পট।	কুলো,—	কুল্য।
কাটন,—	কর্ত্তন।	কাঁকড়া,—	কর্কট।	ঢেঁকি,—	ঢক্ক।

* চৈত্র, ১৩৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।—বর্ত্তমান সম্পাদক

চলিত	সংস্কৃত	চলিত	সংস্কৃত	চলিত	সংস্কৃত
বোঁটা,—বৃন্তন।		ডাগর,—দীর্ঘ।		শাঁপ,—শাপ।	
ডলন,—দলন।		বাড়ন,—বর্দ্ধন।		আঁকড়ানো,—আকর্ষণ।	
ড্যাটা,—দণ্ড।		ঠাণ্ডা,—স্নিগ্ধ।		হাঁসি,—হাসি।	
লপেট,—লিপ্ত।		দেওর,—দেবর।		ময়ূর পঙ্খী,—ময়ূর পক্ষী।	
চর্কা,—চক্র; ইং "সর্ক্‌ল্"		ঠাওর,—স্থাবর।		চাক্‌লা, ইং "সাইক্‌ল"—চক্র।	

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা ("সভাপতির অভিভাষণ" নামক পঠিত বক্তৃতা) "উচ্চবিমিশ্র" ধরণের। এই ধরণে লেখার আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—উদ্বোধনে স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত "বিলাতযাত্রীর পত্র"। উভয়েরই লেখার দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। আজকাল অনেক লেখকই এই ধরণ অবলম্বন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঙ্গালা লেখার ধরণ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের :—

(১) "আমি এক প্রকার খোঁ'য়ে বন্ধনে আটক পড়িয়া গিয়াছি"।

(২) "সেই আরণ্যক পতিত ভূমিতে কোথাও বা ফুলের মালঞ্চ, কোথাও বা সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবনের ছায়াময়ী বীথিকা কোথাও বা ফলের উদ্যান উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার বিহিত প্রণালী পদ্ধতি কতক বা আমি দেখিয়া শিখিয়াছি, কতক বা আমি ঠেকিয়া শিখিয়াছি, কতক বা হাতে কলমে করিয়া কম্মিয়া শিখিয়াছি, আর তা যাহা শিখিয়াছি তাহাতে জো শো করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে কাজ চালানো যাইতে না পারে এমন নহে"।

(৩) "পরিষৎ যদি সুবুদ্ধির পরামর্শ শোনেন, তবে এই বেলা তিনি সিরাজুদ্দৌলাদিগের নিকট-হইতে-শেখা অকেজো নবাবি চাল্ দূরে বিসর্জ্জন করিয়া ক্লাইব এবং তাঁহার তুখোড় বুদ্ধিমান্ চেলাদিগের নিকট হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক্ষম পাকা চাল শিক্ষা করুন"।

(৪) "...এই ল্যাজামুড়া বিহীন, ক্রিয়াকারকের উল্লেখ বিহীন খণ্ড বচনটি নাটকের শিরোভাগে সন্নিবেশিত দেখিয়া ভট্টাচার্য্যব্যাকরণ অবাক্!"

(৫) চলিত ভাষায় কতকগুলি কেমন সুমিষ্ট বচন বা বাক্যাংশ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা দেখান যাইতেছে:—অন্ধি সন্ধি, তোলা পাড়া, মোটামুটি, এলাহি কারখানা, অলগ্ থাকা, পৃথিবীর এমুড়ো হইতে ওমুড়ো পর্য্যন্ত, একজন মাথালো ব্যক্তি, একটা সুব্যবস্থা ফাঁদি, আইন জারি, ভয়ে জড়সড়, পারৎপক্ষে এগো'বে না, উঠন্তি ভাষার কচি বয়সে, একটা যা' তা' ব্যাকরণ, বেশীদিন টেঁকে না, চোঁচা দৌড়, ফোড়ার তাড়সে, জল থিতিয়ে থিতিয়ে, নেশায় ভোঁ, লাবণ্য ঠিক্‌রাইয়া, দম্‌কা বাতাস, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি টঙ্ক, নেহাত ভট্টাচার্য্য-অভিধান, বড্ড অভাব, গোটা চার পাঁচ, মনে ধরুক্ বা না ধরুক্, বেচারী জন্মের মতো গেল, বাজে কাগজপত্রের ঝুড়ি, ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর, অন্তর্নিহিত অন্ধি সন্ধি এবং খোঁচ

দ্বি. ঠা. কর্ত্তৃক ব্যবহৃত চলিত ভাষার বচন।

খাঁচ গুলা ঠাহর করিয়া সমঝিয়া, খুঁচাইয়া তুলিয়া, দর্শকের তাক্ লাগিয়া, স্মরণ হইতে সরিয়া পালাইয়া বারেক, ইহারই জুড়ি ধাঁচার, ছোটো খাটো, আড়ালে আবডালে, উঁকি ঝুঁকি, ডাহা সংস্কৃত, উল্টাপিট, ইহার অর্থ মুচড়াইয়া, মিথ্যা কহিতে ডরায়, যা' তা' খেলো সামগ্রী, আমাদের ভাগ্যে তাহাই ঢের, আমার ঘাট হইয়াছে, Spirit ফলানো, দেশীয় লোকের চোকে।

(৬) চলিত ভাষায় কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা কিরূপ আকারে ব্যবহার করিয়াছেন:—হচ্চে, হ'চ্চে; হচ্ছেন, হ'চ্ছেন; হোক্, হো'ক; কখনো, এখনো, কোনো, তো, মতো (মনের মতো) কাহারো কাহারও; আরেকটা; অকেজো, কাজ; শোনেন; কদাচ্; করা'র (অভিনন্দন করা'র সময়), যা' তা' এ'র।

তৎকর্ত্তৃক কতিপয় শব্দ-ব্যবহারের ধরণ।

এইরূপ, 'হচ্চে' 'যাচ্চে' প্রভৃতি প্রকারে নিতান্ত ঘরোয়া-চলিত ধরণের লেখা, উচ্চ-ধরণের বঙ্গভাষায় সুশিক্ষিত অনেক পণ্ডিতগণের রুচিবিরুদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। এই সকল অপভ্রষ্ট স্থানীয় শব্দ, কেবল কলিকাতা ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ কতিপয় জেলায় মাত্র ব্যবহৃত হয়; দূরবর্ত্তী পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের নিবাসিগণ এ সকল শব্দ সহজে বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। তবে এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে কলিকাতায় অর্থাৎ প্রধান রাজধানী-সহরে, যেরূপ ধরণে সচরাচর কথাবার্ত্তা কহা যায় বা লেখা যায়, সেই ধরণই বঙ্গের সর্ব্বত্র অনুকরণীয়। পল্লিগ্রামে সহরের আচার-ব্যবহারাদিরও অনুকরণ হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের চলিত উচ্চারণাদি শুনিলেই সহরের লোকে অনেকেই উপহাস করেন; অন্য স্থানের উচ্চারণাদি রাজধানীতে কেহ কখনও নকল করেন না। ইংলণ্ডেও এইরূপ; ইংলণ্ড কেন—ইংরাজ-রাজ্যের সর্ব্বত্রই লণ্ডনের উচ্চারণ ও ব্যবহারাদিই প্রচলিত হয়। এরূপ উন্নতি বা পরিবর্ত্তনের গতিরোধ দুঃসাধ্য। কি করা যায় বলুন? —নাচার। লেখক যদি এইরূপ ঘরোয়া-চলিত ধরণে লিখিয়া ভাষার আর এক মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে ইচ্ছা করেন। বিশেষ, প্রসিদ্ধ গভীর চিন্তাশীল লেখকের লেখনী হইতে যাহা কিছু নিঃসৃত হইবে, তাহা ত নিন্দনীয় হইতেই পারে না; বরং, সে সকল, কালেতে ক'রে সাধারণে চলিয়া যাইয়াই থাকে। বাঙ্গালা ভাষায়—এমন কি, সংস্কৃত ভাষাতেও—এমন অনেক গুলি কথা প্রচলিত আছে, যে সকল কোনও ব্যাকরণ-নিয়মসিদ্ধ নহে,—কেবল শিষ্টপ্রয়োগসিদ্ধমাত্র। সকল বিষয়ই, প্রথম প্রচলনের সময়, একটু শ্রুতিকটু বা আচারবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, পুরাতন হইলেই সহিয়া যায়। এ-হেন সুশাসিত ও বজ্রবন্ধনে আবদ্ধ হিন্দুসমাজে যখন "যন্ত্রোদ্ধৃত জল হইতে জীবাস্থি-বিশোধিত শর্করা পর্য্যন্তর" ব্যবহার হইল, তখন সামান্য বঙ্গভাষায় 'হইতেছে' 'যাইতেছে'র পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে যে 'হচ্চে' 'যাচ্চে' চলিয়া যাইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? পরন্তু, ভাষার গৌরব—বচনবিন্যাসে ততটা নয়, যতটা ভাব-প্রকাশে।

ঘরোয়া চলিত ধরণের দোষ ও গুণ।

স্বামী বিবেকানন্দের লেখার ধরণ (বিলাতযাত্রীর পত্র):—

(১) "* * * কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চির-

নীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্ব্বতশিখর, উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ভঙ্গ কল্লোলশালী কত বারিনিধি—দেখলুম, শুনলুম ডিঙুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম ঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কল্‌কাতার বড় রাস্তার ধারে, টিক্‌টিকি ইঁদুর ছুঁচো মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে—কিবা পানের পিক বিচিত্রিত দেয়ালে—দিনের বেলায় প্রদীপ জেলে, আঁব কাঠের তক্তায় ব'সে, থেলো হুঁকো টান্‌তে টান্‌তে,—কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতির যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত ক'রে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন,—সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা।"

বিবেকানন্দের লেখার ধরণ (বিলাতযাত্রীর পত্রে)।

(২) "কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়—ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে নাচ্চে; পেছনে—আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই "গঙ্গা ফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।"

(৩) "জাহাজ বেজায় দুল্‌চে, আর তু—ভায়া দু হাত দিয়ে মাথাটী ধ'রে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।"

(৪) "হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে?—সেই নির্ম্মল নীলাভ জল, যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাথনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব্ব সুস্বাদ হিমশীতল "গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি", আর সেই অদ্ভুত হর্ হর্ হর্ তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরি নিঝ'রের হর্ হর্ প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার-শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্তকুলের নির্ভয় বিচরণ? * * *"

(৫) "গেলবারে আমিও একটু (গঙ্গাজল) নিয়ে গিয়েছিলুম, এক আধ বিন্দু পান কল্লেই,—সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতী সম পারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম,—সব লোপ হয়ে যেত, আর শুন্‌তাম সেই হর্ হর্ হর্, দেখ্‌তাম সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার কর্‌ছেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাক্‌ছেন হর্ হর্ হর্!!"

(৬) "যত তোপ বন্দুক উৎকর্ষ লাভ করছে, বন্দুকের যত ওজন হাল্‌কা হচ্ছে, যত নালের কিরকিরার পরিপাটী হচ্ছে, যত পাল্লা বেড়ে যাচ্ছে, যত ভরবার ঠাসবার কল কব্জা হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি আওয়াজ হচ্ছে, ততই যেন গুলি ব্যর্থ হচ্ছে। পুরানো ঢঙ্গের পাঁচ হাত লম্বা তোড়াদার জজেল, যাকে দো ঠেঙ্গো কাঠের উপর রেখে, তাগ করতে হয়, এবং ফুঁ ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়, তাই-সহায় বারাখজাই, আফ্রিদ আদ্‌মি, অব্যর্থ সন্ধান। আর আধুনিক সুশিক্ষিত ফৌজ নানা-কল-কারখানা-বিশিষ্ট বন্দুক হাতে, মিনিটে ১৫০ আওয়াজ ক'রে, খালি হাওয়া গরম করে।"

(৭) "তোমাদের বাড়ী ঘর দুয়ার—মিউসিয়ম, ***। তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও, ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। ***। তোমরা ভূত-

কাল,—লঙ্‌ লুঙ্‌ লিট্‌—সব এক সঙ্গে; বর্ত্তমান কালে তোমাদের দেখছি ব'লে, যে বোধ হচ্ছে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতে তোমরা শুন্ত, তোমরা ইৎ লোপ্‌ লুপ্‌।"

(৮) "বিলাতযাত্রীর পত্রে" স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ব্যবহৃত কতিপয় সুমিষ্ট চলিত বচনের দৃষ্টান্ত:—খুসির সওদা, নাম নিসানা, বেজায় জেদ্‌, খোঁজ খবর, ওলট পালট, চোর ছ্যাঁচড়, ঝড় ঝাপট, মাপ জোপ, হার জিৎ, তাড়া হুড়ো, চাষা ভুষো, আশে পাশে, ছেঁটে ছুঁটে, ছুঁতে না ছুঁতেই, ছোরার চক্‌চকানি, হিঁদুর হিঁদুয়ানি, প্রাণ থরহরি, বাগে পেলেই, তোপের তালিম, ময়দানি জঙ্গ, দরিয়াই জঙ্গ, ফেটে ফুটে চৌচাকলা, তিগ্‌ করে ছাড়া, কিস্তি বান চাল, বাঁশের পাটাতন, হালে পানি পায় না, ধলায় কালোয় মেশামিশি, এক ছুটে চোঁচা দেশের দিকে, হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা, সিভিল ওয়ারের সময়, দেয়ালগুলিতে "আইভরি পেণ্ট" লাগান, রবার-টায়ারের দিনে ইত্যাদি।

স্বামী বিবেকানন্দ ব্যবহৃত সুমিষ্ট বচনের ও

(৯) কতকগুলি চলিত শব্দের দৃষ্টান্ত;—বেল্‌কুল্‌, গারদ, রকমারি পোষাক, একদম্‌, (ইহা অপেক্ষা অনেক) তফাৎ, (এ শরীরের) পয়দা, বড় আরাম, বড় খারাপ, ফি (প্রতি অর্থে), ঢঙ্‌, ক'রে, নিও, হচ্চে, যাচ্চি, বল্‌চেন, করবার, শোনো, রোজই, কেউ, তা (ভোলবার নয়), কল্লে, যাহক্‌, খানিক, হয় ত, গেছি, চোক, শোবার, বেচারা।

চলিত শব্দের দৃষ্টান্ত।

সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের সব কয়টী উদ্দেশ্যর উপরেই কিছু কিছু অল্প বিস্তর বলিয়াছেন। মন্তব্য সহ সে সমস্ত প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রথম,—ব্যাকরণ-সঙ্কলন—

তিনি কয়রকম ব্যাকরণের নাম করিতেছেন। ভট্টাচার্য্য-ব্যাকরণ, সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণ, চাসাভুসার এবং অন্তঃপুর মহলের ব্যাকরণ, এবং খাস সংস্কৃত ব্যাকরণ। ভট্টাচার্য্য-ব্যাকরণ অর্থাৎ নিতান্ত পুঁথিগত সেই এক পুরাকালে গঠিত—ব্যাকরণকে ঘৃণা করিতেছেন এবং প্রচলিত প্রথানুযায়ী সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণের প্রশংসা করিতেছেন। বলিতেছেন, "সার্ব্বভৌমিক ব্যাকরণ, চাসাভুসার ও অন্তঃপুরের ব্যাকরণ, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ এই তিন ব্যাকরণে মিশাইয়া একখানি সুবোধ্য ও সুযোগ্য ব্যাকরণ প্রস্তুত করিলেই ভাল হয়; ছাত্রদিগের প্রাণবধকারী একটা যা' তা' ব্যাকরণ হওয়া অপেক্ষা ব্যাকরণ না হওয়া ভাল"।

প্রস্তাবটী অতি প্রয়োজনীয়—প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্যাকরণ চাই, এবং যাহাতে ছাত্রদিগের প্রাণবধ না হয় এমন ব্যাকরণ চাই। সকল ভাষার ব্যাকরণই এইরূপ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণও এইরূপ হইলে বড়ই ভাল হয় সন্দেহ কি? কিন্তু এইরূপ হইলে "খাস সংস্কৃত" ব্যাকরণের সহিত কতদূর মিল থাকিবে বলা যায় না। খাস সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সম্পর্ক রাখিতে চেষ্টা করিলে ছাত্রদিগের প্রাণবধ ত করিতেই হইবে; এবং প্রচলিত প্রথাও বোধ হয় পূর্ব্ব হইতেই পলায়ন করিবে।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের সংস্কার আবশ্যক।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের, রীতিমত বাঙ্গালা চলিত প্রথা অনুযায়ী প্রণয়ন করিতে হইলে, আগা গোড়া সংস্কার করিতে হয়। ইহার আলফা বিটা অর্থাৎ ক খ হইতে সেই পঙ্কচিউএশন (যতিচিহ্ন-পর্ব্বাধ্যায়) পর্য্যন্ত পঙ্কোদ্ধার করিতে হয়। ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়—বর্ণমালা সম্বন্ধীয়। সেই বর্ণমালারই সংশুদ্ধি ত প্রথমে আবশ্যক

বর্ণমালার-সংস্কার, ঈ ঊ ঐ ষ ণ যুক্তাক্ষর প্রভৃতি; শব্দানুলিখন।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন "বাপু! তোমাদের বর্ণমালায় কয়টি 'ব'?—দুইটী 'ব'। কার কিরকম চেহারা?—তখন 'ব' এর চেহারা আমি তাঁকে বলব না—তিনি আমার মুখের চেহারা দেখবেন! তখন হাঁ করে রইতে হইবে, আর উত্তর দিব কি?—বাস্তবিক দুইটী 'ব'-এরই চেহারা এক!

আচ্ছা, চেহারা যেন না বলতে পারলে—উচ্চারণটাই না হয় কর।—তাহাতেও নিরুত্তর রহিতে হইল। এইরূপ, দুটী ন'এর, দুটী জ'এর, তিনটী শ'এর উচ্চারণ একই; দুটী 'ই', দুইটী 'উ'রও উচ্চারণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রায়ই এক। মনে করুন, যদি কেহ এই প্রশ্নটী আমাকে লিখিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা করেন "তোমাদের ভাষায় কয়টী "স" আছে?"—তাঁহাকে একপ্রকার বিষম সমস্যায় পড়িতে হইবে যে,—কোন "স"টী তিনি লেখেন। তাঁহার কিছু উদ্দেশ্য নহে—'কয়টী দন্ত্য স আছে' জিজ্ঞাসা করা।

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষায় ত এক, কোন বর্ণেরই উচ্চারণ প্রকৃতরূপে করা যায় না; তাহার উপর আবার শ, ষ, স; ণ, ন; ঙ, ঞ; ইত্যাদি বিড়ম্বনার আবশ্যক কি? ছাত্রদিগের কথা দূরে থাক্, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিত মহাশয়গণই পাণিনীর সূত্র ঠিক্ ২ উচ্চারণ করুন দেখি—"ক্ঙিতি চ" (১ অ, ১ পা, ৫ সূ), "গাঙ্‌কুটাদিভ্যো ঞ্‌ণিন্ ঙিৎ" (১ অ, ২ পা, ১ সূ) ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশ মোল্লায় যখন গলদ, তখন আর "খাস সংস্কৃত" ব্যাকরণের সহিত মিলাইবার আবশ্যক কি? ছাত্রদিগের প্রাণবধ প্রকারান্তরেই বা করবার দরকার? বাঙ্গালা ব্যাকরণ, সংস্কৃত না হইয়া, বাঙ্গালাই হওয়া উচিত।

বর্ণমালার সংস্কার, উচ্চারণ-অনুযায়ী অর্থাৎ শব্দানুলিখন (ফনোগ্রাফী) নামক শাস্ত্রানুযায়ী, হইলেই ভাল হয়। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, স্ব স্ব জাতীয় বর্ণমালা সংস্কারার্থ, অনেক লিখিয়াছেন, আজও লিখিতেছেন। আমাদের দেশে সে বিদ্যার চর্চ্চা নাই; তার কথা-উত্থাপনই বৃথা। তবে আপাততঃ আমাদের বর্ণমালা এইরূপ দাঁড়াইলে যথেষ্ট উপকার হয় না কি?—

অ আ ই য় উ	ট ঠ ড ঢ	ন ম ঙ ং
এ এ্য ঐ ও ঔ	ত থ দ ধ	ল র ড় ঢ়
ক খ গ ঘ	প ফ ব ভ	ঋ শ হ
চ ছ জ ঝ		

য়=ই+অ; ইহা ডবল-স্বর, অতএব স্বরবর্ণের অন্তর্গত হইলেই ভাল হয়। ইহার বাঙ্গালা নামও অন্তস্থ অ। ক্লৃপ্ত প্রভৃতি যদিচ দু-একটী কথার ব্যবহার আছে, অনাবশ্যক

বিবেচনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় ত ৯ (লি ক্লী প্রভৃতি) তুলিয়াই দিয়াছেন। 'এক' কথাটী বাঙ্গালায় উচ্চারণ করিতে গেলে "য়্যাক" হয় ; অতএব একারের ঐরূপ উচ্চারণ করিবার জন্য পৃথক্ আর এক নূতন স্বরবর্ণ দ্বারা (যথা—এ) করিলেই ভাল হয়। ঞ এবং অন্তস্থ 'ব'এর কোনও আবশ্যক নাই। 'ঋ' = রি ; ইহা অর্দ্ধব্যঞ্জন বর্ণ—ব্যঞ্জনবর্ণের ভিতরে পড়িলেই ভাল হয়। বাঙ্গালায় বিসর্গের কোন আবশ্যক নাই।

এরূপ সংস্কার হইলে, অবশ্য, ণত্ব-ষত্ব-বিধান, সন্ধিপ্রকরণ প্রভৃতি বাঙ্গালা-ব্যাকরণের অনেক অংশই বদলাইতে হইবে ; অনাবশ্যকীয়ের বৃথা আবশ্যক কেন টানিয়া বর্দ্ধিত করা যায় ? আপনারা পাঁচ জন উন্নতিশীল পণ্ডিতে কি বলেন ?—পাঁচ জনেরই মত গ্রাহ্য হইবে কি না।

বাঙ্গালাভাষায় আঠার রকমের নিষ্প্রয়োজনীয় ইকার উকার শ ন ইত্যাদি উঠাইয়া দিলে প্রধানতঃ দুইটী বিশেষ উপকার হইবে :—প্রথমতঃ, শৈশব বালকবালিকাদিগের অস্ফুট স্মৃতি-শক্তির উপর বেশী আঘাত করিতে হয় না ; দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রগণ অথবা লেখক-লেখিকাগণকে পদে পদে বানানের জন্য অপ্রস্তুত হইতে অথবা সর্ব্বদা অভিধান খুলিতে এবং ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। যেরূপ লাটীন ও ইংরাজী, তদ্রূপ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া গেলে এমন কি ক্ষতি হইবে ? বরং, স্বাধীনতা প্রাপ্তির দরুন বাঙ্গালা ভাষার কি বিশেষ উন্নতি হইবে না ?

বর্ণমালার সংস্কারে দুই প্রকার উপকার।

যুক্তাক্ষরও বাঙ্গালা ভাষা হইতে যত উঠিয়া যায় ততই ভাল বোধ হয়। মনে করুন 'ক্ষ' ইহার উচ্চারণ বাঙ্গালায় কে করিতে পারে ? "দ্বারবার"এর 'দ্ব' কেহ কি বাঙ্গালায় উচ্চারণ করেন ? "ভট্টাচার্য্য"র 'র্য্য'ও তদ্রূপ। যুক্তাক্ষর ছাড়িয়া দিলে সুবিধা অনেক :—

যুক্তাক্ষরের সংস্কার এবং উপকার।

(১) সহজ উচ্চারণ ; যেমন উদ্বোধন এই কথাটী বেশী চলিত-কথা নয় বলিয়া, অনেক অশিক্ষিত লোককে 'উদ্দোধন' এইরূপ উচ্চারণ করিতে স্বকর্ণে শুনা গিয়াছে। এইটী যদি "উদ্‌বোধন" এইরূপ করিয়া লেখার প্রথা থাকিত তাহা হইলে, ঐরূপ ভ্রম হইবার কোনও আশঙ্কা থাকিত না।

(২) মিষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ, যেমন—"আত্মা" ; অনেক বঙ্গীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিও "আত্ত‍াঁ" উচ্চারণ করেন। যদি যুক্তাক্ষর না থাকিত তাহা হইলে "আৎমা" লেখা হইত, কাহারও পক্ষে উচ্চারণে ভ্রমসম্ভব থাকিত না। অবশ্য, ব্যঞ্জনবর্ণে-স্বরবর্ণে যুক্তাক্ষর না রাখিলে ভীষণ ব্যাপার সম্ভব।

(৩) মুদ্রাক্ষরের ছাঁচ প্রস্তুত (টাইপ মোল্ডিং) করিবার বড়ই সুবিধা হয়। যুক্তাক্ষর না থাকিলে বাঙ্গালায় নানাপ্রকারের সুন্দর সুন্দর এণ্টিক, ইটালিক, নক্সা-ওয়ালা, ফুলওয়ালা বা অলঙ্কৃত মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করা যাইতে পারে ; এবং মিনিয়ন, ননপ্যারিল, পার্ল প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হরফও তোয়ের হইতে পারে। বাঙ্গালা প্রিণ্টিং লাইনে তাহা হইলে রীতিমত উন্নতি হয়। আরও ইহাতে ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগকে অত ছব্‌ড়ি-ছগণ্ডা অক্ষরের ঘর মনে করে রাখবার অসুবিধা কমিয়া যায়। [ক্রমশঃ]

কোলে
বিস্কুট
লজেন্স
জ্যাম জেলী আচার
স্কোয়াশ
ORANGE SQUASH
KOLAY
নির্মাতা :
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৭০০ ০১০
K B—3/74/B.

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১৯'০০। ২য় ভাগ ১৭'০০
সাধারণ ১ম খণ্ড ৩'৫০; ২য় খণ্ড ৭'৮০; ৩য় খণ্ড ৫'২০; ৪র্থ খণ্ড ৭'০০; ৫ম খণ্ড ৭'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১'৬০; কাপড়ে বাঁধাই ১'৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। (ছাপা নাই)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬; সাধারণ ৬'০০
বাঁধাই ৭'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। মূল্য ৫'০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২২৯, মূল্য ৪'০০

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ১'৭৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ০'৭০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭'০০, ২য় ভাগ ৬'৫০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬। মূল্য ৬'০০ টাকা

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য—১৫'০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ৮'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪'২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১০৬, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ছেলেদের উপযোগী। পৃঃ ৬৪, মূল্য ০'৭০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(একত্রে) শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। (ছাপা নাই)

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩৬৯, মূল্য ৬'০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল ১'২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২'৫০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ৮'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই); ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী—পৃঃ ৩১৮, মূল্য ২'২৫

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। পৃঃ ১২৭, মূল্য ১'৫০

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরত্রিক-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬; মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। (ছাপা নাই)

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৮০, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ প্রসঙ্গ— (ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে— স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৫২, মূল্য ৩'৩০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০, শোভন ৬'০০

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৭, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৭৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। পৃঃ ১৫৮, মূল্য ২'০০

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ—স্বামী ধীরেশানন্দ (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি—স্বামী বেদান্তানন্দ সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬০, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য: ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০; ৩য় অঃ ১৩'০০; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—
(ছাপা নাই)

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮২, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ-চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃঃ ২৭৪, মূল্য ১০'০০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১৪ মূল্য ২'০০ (ছাপা নাই)

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৬২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গাথা—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

Udbodhan—Phone : 55-2447 MAY 1977 Regd. No. WB/NC-19

COVER PRINTED BY—

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্ট্রীগণের পক্ষে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত

সম্পাদক—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৯তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭৷৷০টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫৷৷০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৮৪

সূচীপত্র

পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জী
সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

সূচীপত্র

এন্টিফ্লজিস্টিন
কার্বাঙ্কল কিওর (রেজিঃ)
কার্বাঙ্কল, শোষ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়
বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে রোগমুক্তি
সেলিং এজেন্ট—লিটন এণ্ড কোং কলিকাতা-১৩
CARBUNCLE CURE
IT CUTS
IT CLEANSES
IT CURES

বেনারসী
সিল্ক
সাড়ী
পোষাক
শৈলেন্দ্র মণিলাল
স্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট • কলি-১২
(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)
বহুবাজার
শ্যামবাজার
কাশ্মিরী
শাল
বিছানা
হোসিয়ারী

"ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, তখন নির্জনে বাস ক'রবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'রবে।" —শ্রীরামকৃষ্ণদেব

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী

শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

দিব্য বাণী

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১১।১৪।১৭

(উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ)

আমাতেই অনুরাগী যাঁহাদের মন,
মহান্ মানব যাঁরা শান্ত অকিঞ্চন
অখিল জীবের প্রতি বৎসলতাময়
কামনা-অস্পৃষ্ট বুদ্ধি যাঁহাদের হয়
(সর্বভূতে অবস্থিত) আমারে সেবিয়া
নিরপেক্ষ-জন-লভ্য সুখ আস্বাদিয়া
(চরিতার্থ হন তাঁরা)—সে-সুখ অপার
অন্য কোন জন পার নাহি পায় তার।

কথাপ্রসঙ্গে

মানবপ্রেম

মহাভারতের শান্তিপর্বে আছে, একদা প্রজাপতি ব্রহ্মা সুবর্ণময় হংসের রূপ ধারণ করিয়া ত্রিভুবনে বিচরণ করিতে করিতে 'সাধ্য' নামক দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। 'হংসগীতা' নামে অভিহিত সেই উপদেশের এক জায়গায় আছে: 'গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি / ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ'—আমি তোমাদের একটি গুহ্য তত্ত্ব বলিতেছি, মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই।

মানুষ যে জড় বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা না বলিলেও চলে এবং প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধির উৎকর্ষহেতু মানুষ যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাও সুবিদিত। সুতরাং 'মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই'—ব্রহ্মার এই কথায় গুহ্য তত্ত্ব এমন কী থাকিতে পারে! মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্র হইতে আমরা এ বিষয়ে আলোক পাইতে পারি। পত্রটিতে স্বামীজী নিজ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বামীজী লিখিয়াছিলেন যে, যতই তাঁহার বয়স বাড়িতেছে, ততই তিনি মানুষ যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, হিন্দুদের এই মতবাদের রহস্য উপলব্ধি করিতেছেন। এই পৃথিবী সমুদয় স্বর্গলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালয়; ...যে সকল মানুষ এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া অন্য দেহ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই তথাকথিত উচ্চতর প্রাণী। তাঁহাদের দেহ মনুষ্য-দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, ইহা সত্য; তথাপি উহা মনুষ্যদেহই—মানুষেরই মতো ঐ দেহে হস্ত পদ ইত্যাদি বিদ্যমান। অধিকন্তু তাঁহারা এই পৃথিবীতেই বাস করেন—অন্য এক আকাশে এবং আমাদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচরও নহেন। তাঁহারাও চিন্তা করেন এবং আমাদের মতো তাঁহাদের সচেতনতা ও অন্য সব কিছুই আছে। সুতরাং তাঁহারাও মানুষ এবং দেবগণ—দেবদূতগণও অনুরূপভাবে মানুষই। কিন্তু এই মর্ত্যের মানুষই ভগবৎ-স্বরূপ হয় এবং পূর্বোক্ত সকলকেই ভগবৎ-স্বরূপ হইতে হইলে (অর্থাৎ স্বীয় ভগবৎ-স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে) পুনরায় মর্ত্যমানবদেহ ধারণ করিতে হইবে।

স্বামীজীর এই পত্রের দ্বারা ব্রহ্মার উল্লেখিত গুহ্য তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন হইল কিনা, তাহা সুধীগণের বিবেচনীয়। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের একটি সুপ্রসিদ্ধ কথা আমাদের মনে পড়িতেছে। উহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মার মতোই চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন:

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

যদিও সহজিয়া চণ্ডীদাসের এই উক্তিটি আরোপভিত্তিক একটি বিশেষ সাধনারই ইঙ্গিতবহ, তথাপি যে ব্যাপক অর্থে উহা আধুনিক যুগে গৃহীত হইতে দেখা যায়, এখানে সেই অর্থের উল্লেখ, আলোচনা ও সমালোচনা করা যাইতে পারে। সেই অর্থটি হইতেছে, মানুষের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। মানুষের যাহাতে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা, মানুষ যাহা ভালবাসে—সাহিত্য ইতিহাস চারুশিল্প কারুশিল্প দর্শন বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা, মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবেশ,

তাহার জীবিকা জীবনদর্শন ও জীবনচর্যা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে ও বিষয়ে সহমর্মিতার অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন। এক কথায় মানুষের প্রতি দরদ, মানুষকে মানুষের জন্যই ভালবাসা—ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ। এবং এই আদর্শের রূপায়ণ অপেক্ষা আর কোনও মহত্তর কর্তব্য মানুষের থাকিতে পারে না, কারণ 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মানুষকে ভালবাসার পদ্ধতিটি কী হইবে? একটি একটি করিয়া জগতের প্রত্যেকটি মানুষকে ভালবাসিতে গেলে তো অনন্ত জীবনেও কুলাইবে না। আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথারই প্রতিধ্বনি করিতেছি। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'যদি একজনের পর আর একজনকে ভালবাসিতে থাকো, তবে তুমি অনন্তকালের জন্য উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া যাইতে পারো, কিন্তু সমগ্র জগৎকে মোটেই ভালবাসিতে সমর্থ হইবে না।'

ইহার উত্তরে কেহ হয়ত বলিবেন: আচ্ছা, স্বীকার করিলাম ঐভাবে সকল মানুষকে ভালবাসা সম্ভব নহে, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সংস্কৃতির বেশ কিছু মানুষকে তো আমরা একত্রিত করিয়া তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া-মিশিয়া, একত্রে আহার-বিহারাদি করিয়া এবং ভাব-বিনিময়ের জন্য পরস্পরের ভাষা পর্যন্ত শিক্ষা করিয়া মানবপ্রেমের ভিত্তিরচনা করিতে পারি এবং এইভাবে অভীষ্ট আদর্শের বাস্তবায়নে অগ্রসর হইতে পারি।

প্রত্যুত্তরে বলা যায়, মানবপ্রেম-গঙ্গার গোমুখীর পথ অতটা সুগম নহে। উহা চিরকালই অতি দুর্গম বন্ধুর প্রস্তরাকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল। প্রতিপদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। কারণ, অনাদি-কাল হইতে রাগ-দ্বেষ আমাদের মনে পাকাপোক্ত বাসা বাঁধিয়াছে। সেই মলিন মন লইয়া উপরি-উক্ত ভাবে মানবপ্রেমের শিলান্যাস করা যায় না। রাগ-দ্বেষ-যুক্ত মন লইয়া মানুষকে ভালবাসিতে গেলে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া অনিবার্য। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের

> 'কত অজানারে জানাইলে তুমি,
> কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
> দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
> পরকে করিলে ভাই।'

—কথাটির দোহাই দিলে চলিবে না। এই স্তবকটিতে—আমাদের দৃষ্টিতে—মূল পদ হইল 'তুমি'। 'তুমি' বহু অজানারে জানাইয়াছ, বহু অপরিচিত ঘরে স্থান দিয়াছ, দূরকে নিকট করিয়াছ, পরকে ভাই করিয়াছ—এ সকলই 'তুমি' করিয়াছ, আমি নহি। কর্তা ও কারয়িতা 'তুমি'ই, আমি যন্ত্রমাত্র। 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।' নিজে কর্তা সাজিয়া প্ল্যান করিয়া 'দূরকে' 'নিকট' ও 'পরকে' 'ভাই' করিতে গেলে 'নিকট' 'দূর' এবং 'ভাই' 'পর' হইয়া যাইবার সমূহ সম্ভাবনা। ঐ কবিতার শেষ স্তবকেও রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

> 'তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর
> নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর···।'

—ইহাই মোক্ষম কথা। আগে ঈশ্বরকে জানিতে হইবে; তাঁহাকে জানিলে কেহ আর পর থাকে না, কাহারও সহিত মিলিতে-মিশিতে কোনও বিধি-নিষেধ থাকে না—কোন আশঙ্কারও সম্ভাবনা থাকে না।

যে-কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালে কবিতায় লিখিয়াছিলেন, এগারো-বারো বৎসর পূর্বে ১৮৯৪-৯৫ সালে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তিসম্বন্ধীয় ভাষণেও সেই

কথাই আমরা লক্ষ্য করি স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে প্রথমে সমষ্টিকে ভালবাসিতে হয়, তবেই ব্যষ্টিকে ভালবাসা সম্ভব হয় এবং ঈশ্বরই সেই সমষ্টি। 'If we love this sum total, we love everything. Loving the world and doing it good will all come easily then; we have to obtain this power only by loving God first; otherwise it is no joke to do good to the world.' নির্গলিতার্থ এই যে, জগৎকে ভালবাসা—জগতের কল্যাণ করা তামাসা নহে। উহার জন্য শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি অর্জন করিতে হইলে সর্বাগ্রে ভগবানকেই ভালবাসিতে হইবে। যদি আমরা সমষ্টিকে অর্থাৎ ভগবানকে ভালবাসি, তাহা হইলে সকল ব্যষ্টিকেই ভালবাসা হয়।

স্বামীজী একটি কবিতায়ও লিখিয়াছেন:

'অনন্তের তুমি অধিকারী,
প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও"—যেবা ফিরে চায়,
তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।'

এই কয়টি কথার মাধ্যমে স্বামীজী মানবজীবনের মহত্তম তত্ত্ব, উজ্জ্বলতম সম্ভাবনা এবং উচ্চতম আদর্শের চিত্র আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। অল্পে নহে, ভূমায় আমাদের অধিকার। হৃদয়ে আমাদের অপার প্রেমপাথার। সুতরাং প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষার অবকাশ কোথায়? প্রতিদান সেই চায়, যাহার অভাব আছে। যিনি আপন হৃদয়ে প্রেমসিন্ধুকে আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি প্রেমবিন্দুর প্রত্যাশা করিবেন কোন্ দুঃখে! কিন্তু ঐ আবিষ্কারটি করা চাই। চাই-ই চাই। নতুবা আমাদের প্রেম হইবে 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম। উহাতে সুখ কোথায়? 'ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?' তাই যে উচ্চতম আদর্শ স্বামীজী উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহার সার্থক রূপায়ণের প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে একটি প্রার্থনাই অগ্রাধিকার পায়। সেটি হইল:

'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে,
তোমার পানে।'

সকল ভালবাসা সর্বাগ্রে ভগবানেই সমর্পিত করিতে হয়। তবেই 'ভিক্ষা-ভরা থালি' 'নিঃশেষে হয় খালি' এবং আমাদের অন্তর ভগবানের দানে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তখন শুধু মানুষে কেন, আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁহার দর্শন হয়। তখনই এই অনুভূতি হয় যে, যদিও তিনি সর্বত্র বিরাজিত, তথাপি মানুষেই তাঁহার প্রকাশ সর্বাধিক। তাই মানুষের সেবাতেই সিদ্ধকাম ভগবৎ-প্রেমিকগণ নিজেদের নিয়োজিত করেন। তাঁহারা মানুষে মানুষ দেখেন না—মানুষে ভগবানকেই দর্শন করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়: 'We are the servants of that God who by the ignorant is called MAN.'—অজ্ঞেরা যাঁহাকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই ঈশ্বরেরই সেবক। রাগ-দ্বেষ-মুক্ত এই মহামানবগণের মানবপ্রেমই যথার্থ মানবপ্রেম এইরূপ মহাপুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথায় পাইলাম। তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী অখণ্ডানন্দজীর নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে পাই আরেকটি হৃদয়গ্রাহী পরিচয়:

'আমার প্রভু আমার হৃদয়েই আছেন এবং সদাকালই থাকিবেন। আমার প্রভু গিরিশৃঙ্গে বা নীলাকাশে বসিয়া নাই, আমার প্রভু আমার আত্মা—সর্বজীবে। সেই সর্বজীবরূপী ভগবানকে আমি মুহুর্মুহুঃ বলিতে শুনিতেছি, ওরে মানুষেই বৈদিক ঋষিবৃন্দ, মানুষের মধ্যেই রাম-কৃষ্ণাদি

অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা—দেখছিস্ নি? একথা যে শোনে, তার কি স্থির থাকবার জো আছে? এই মানুষ ভগবানের সেবায় এ জীবন দিয়াছি; আরও কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারি না।'

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা: আচার্য শংকর; টীকাকার: স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক: স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা: নন্থ অহংপ্রত্যয়বিষয়ঃ আত্মা প্রসিদ্ধঃ। তস্য কথং জ্ঞেয়াতীতত্ব-সম্ভাবনা ইতি আশঙ্ক্য আহ—

(**মূলস্তোত্রম্ঃ**)

যদ্ যদ্ বেদ্যং তৎ তদহং নেতি বিহায়
স্বাত্মজ্যোতির্জ্ঞানময়ানন্দমবাপ্য।
তস্মিন্নস্মীত্যাত্মবিদো যং বিদুরীশং
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ১০॥

যদ্ যদ্ বেদ্যম্ ইতি। দেহাদ্যহংকার-পর্যন্তং **তৎ তৎ অহম্** আত্মা **ন** ভবামি **ইতি বিহায়** ত্যক্ত্বা বেদ্যস্য চ ঘটাদিবৎ অনাত্মত্বেন ব্যাপ্যত্বাৎ অহংকারাদি চ বেদ্যত্বাৎ আত্মা ন ভবতি ইতি হিত্বা ইতি অর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—আত্মা অহংপ্রত্যয়বিষয়ঃ ইতি বদন্ বাদী প্রষ্টব্যঃ,—কিম্ আত্মস্বরূপাহংপ্রত্যয়বিষয়ঃ? উত আত্মনিষ্ঠাহংপ্রত্যয়-বিষয়ঃ? ন আদ্যঃ, স্বস্য স্বকর্মত্বানুপপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে অপি—কিম্ আত্মনিষ্ঠ-প্রত্যয়ঃ জড়ঃ? উত স্বপ্রকাশঃ? ন আদ্যঃ, জড়েন আত্মভানানুপপত্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, স্বপ্রকাশ-প্রত্যয়-বিষয়স্য ঘটাদিবৎ আত্মত্বাযোগাৎ। ন চ স্বপ্রকাশ-প্রত্যয়স্য আধারতয়া এব বিষয়ত্বম্ অন্তরেণ আত্মা ভাসতে ইতি বাচ্যম্, প্রত্যয়-ব্যতিরিক্তস্য প্রত্যয়াধীন-প্রকাশস্য প্রত্যয়-বিষয়ত্ব-নিয়মেন আত্মনঃ অনাত্মত্ব-দোষ-তাদবস্থ্যাৎ। তস্মাৎ যঃ যঃ প্রত্যয়-বিষয়ঃ অহংকারাদিঃ দেহান্তঃ সঃ সঃ অনাত্মা ইতি। কিংচ যৎ যৎ বেদ্যং তৎ তৎ স্ববিলক্ষণ-বেদ্যম্ ইতি ব্যাপ্তিদর্শনাৎ স্বপ্রকাশঃ আত্মা ইতি নিশ্চীয়তে ইতি আহ—**স্বাত্মা** ইতি। **স্বাত্মজ্যোতিঃ জ্ঞানময়ানন্দং**—স্বাত্মজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশঃ, জ্ঞানময়ঃ জ্ঞানস্বরূপঃ, যঃ আনন্দঃ তম্ **অবাপ্য** পরপ্রেমাস্পদত্বেন সংভাব্য, **তস্মিন্** সংভাবিতে অহংপদ-লক্ষ্যে, **অস্মি ইতি আত্মবিদঃ** অস্মি ইতি আত্মবেদনং কুর্বন্তঃ; **যম্ ঈশম্** ঈশপদ-লক্ষ্যং ব্রহ্ম, **বিদুঃ** সাক্ষাৎ অনুভবন্তি ইতি অর্থঃ। ত্বংপদ-লক্ষ্য-জ্ঞানং

বিনা তস্য ব্রহ্মত্ব-পরিজ্ঞানাসম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—'ত্রিষু ধামসু যদ্-ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ ভবেৎ। তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥' [কৈ. উ. ১।১৮]। অত্র হি শ্রুতৌ ভোগ্য-স্থূল-প্রবিবিক্তানন্দেভ্যঃ ভোক্তৃ-বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞেভ্যঃ উপাধিযুক্তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ, সর্বস্য ভাসকঃ যঃ চিন্মাত্রঃ অহংপদ-লক্ষ্যঃ ইতি অহংপদ-লক্ষ্যং সাক্ষাৎকৃতম্ অনূদ্য তস্য সদাশিব-শব্দ-লক্ষ্যাদ্বয়ানন্দ-ব্রহ্মত্বং বোধ্যতে ; ত্বংপদ-লক্ষ্যার্থম্ অসাক্ষাৎকুর্বতঃ তস্য ব্রহ্মত্ব-সাক্ষাৎকারাসম্ভবাৎ ॥ ১০ ॥

টীকানুবাদ : [প্রশ্ন :] আত্মা অহং-অনুভবের বিষয়রূপে প্রসিদ্ধ ; সেই আত্মার জ্ঞেয়াতীতত্ব কিরূপে সম্ভব ?—এই আশঙ্কা করিয়া [উত্তরে আচার্য] বলিতেছেন : [মূলস্তোত্র, শ্লোক ১০, পৃঃ ২৮৫ দ্রষ্টব্য]।

অন্বয় : যদ্ যদ্ বেদ্যং তৎ তদ্ অহং ন ইতি বিহায় স্বাত্মজ্যোতি-জ্ঞানময়ানন্দম্ অবাপ্য তস্মিন্ অস্মি ইতি আত্মবিদঃ যম্ ঈশং বিদুঃ, তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে। ১০।

স্তোত্রানুবাদ : [ইন্দ্রিয়াদি সহায়ে] যাহা যাহা জ্ঞেয়, তাহা তাহা আমি (আত্মা) নই, এই জ্ঞানে [সেগুলিকে] পরিত্যাগপূর্বক স্বপ্রকাশ জ্ঞানময় আনন্দস্বরূপ [বস্তু] লাভ করিয়া আত্মবিদ্‌গণ সেই তাহাতে (সেই বস্তুতে) 'ইহাই আমি', এইরূপে যে ঈশ্বরকে জানেন, সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকারবিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি।১০।

টীকানুবাদ : **যদ্ যদ্ বেদ্যম্** ইতি। দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অহংকার পর্যন্ত [যাহা কিছু জ্ঞেয় পদার্থ], **তৎ তদ্ অহং**—তাহা তাহা আমি (আত্মা) **ন**—নহি, **ইতি বিহায়**—এইভাবে [তাহাদিগকে] পরিত্যাগ করিয়া –[পরিত্যাগের হেতু বলিতেছেন] জ্ঞেয় [পদার্থ] মাত্রই ঘটাদির ন্যায় অনাত্মত্ব-ধর্মের দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া এবং অহংকারাদিও জ্ঞেয় বলিয়া আত্মা হইতে পারে না, এই বুদ্ধিতে [বিচার দ্বারা] পরিত্যাগ করিয়া—ইহাই অর্থ।

ইহার তাৎপর্য : আত্মা অহংপ্রত্যয়ের বিষয়, এইরূপ বক্তা বাদীর নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে, (১) অহংপ্রত্যয়ের বিষয় কি আত্মস্বরূপ ? অথবা (২) অহংপ্রত্যয়ের বিষয় কি আত্মাতে অবস্থিত ?[১] প্রথমটি হইতে পারে না। কারণ, নিজেই নিজের কর্ম হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।[২] দ্বিতীয় পক্ষেও ইহা জিজ্ঞাস্য যে—(ক) ঐ আত্মনিষ্ঠ প্রত্যয় কি জড় ? অথবা (খ)

১ যাহা অহং-অনুভবের বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই কি আত্মার স্বরূপ ?—ইহাই প্রথম প্রশ্ন। অহং-অনুভবের বিষয় বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহা কি আত্মাতে অবস্থিত ?—ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন।

২ কর্তা এবং কর্ম পৃথক্ বস্তু হয়—ইহাই নিয়ম। সুতরাং একই বস্তু একই ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম হইতে পারে না। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে পরসমবেত ক্রিয়ার ফলভাগী বস্তুই কর্ম হইবে এবং স্বসমবেত ক্রিয়ার ফলভাগী কর্তা হইবে। 'রামঃ গ্রামং গচ্ছতি' প্রভৃতি স্থলে দেশান্তর-সংযোগই গমন ক্রিয়ার ফল। সংযোগ 'রাম' এবং 'গ্রাম' উভয়ের

স্বপ্রকাশ? প্রথম পক্ষটি (ক) হইতে পারে না, কারণ জড়ের দ্বারা আত্মার ভান অর্থাৎ প্রতীতি হওয়া অযৌক্তিক। দ্বিতীয় পক্ষও (খ) হইতে পারে না, কারণ যাহা স্বপ্রকাশ অনুভবের বিষয়, তাহা ঘটাদির ন্যায় [অনাত্মস্বরূপ বলিয়াই] কখনও আত্মা হইতে পারে না। বিষয় না হইয়াও আত্মা স্বপ্রকাশ অনুভবের আধার হিসাবেই প্রকাশিত হইবেন, ইহাও বলা যায় না। কারণ, অনুভব হইতে ভিন্ন অথচ অনুভবের অধীনই যাহার প্রকাশ, তাহাই অনুভবের বিষয় হয় –এইরূপ নিয়ম থাকায় আত্মার অনাত্মত্বদোষ পূর্বের মতোই থাকিয়া যায়। সুতরাং অহংকার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহাদি পর্যন্ত যাহা যাহা অনুভবের বিষয়, তাহা তাহা অনাত্মা –ইহাই সিদ্ধ হয়। অধিকন্তু যাহা যাহা জ্ঞেয়, তাহা তাহা নিজ হইতে বিলক্ষণস্বভাব অন্য কাহারও দ্বারাই প্রকাশিত হয়—এইরূপ ব্যাপ্তি (নিয়ম) দেখা যায় বলিয়া আত্মা স্বপ্রকাশ, ইহাই নিশ্চিত হইয়া থাকে—ইহাই [আচার্য] বলিতেছেন – **স্বাত্ম** [**জ্যোতিঃ**] ইত্যাদি [শব্দের দ্বারা]। **স্বাত্মজ্যোতির্জ্ঞানময়ানন্দম্**—স্বাত্মজ্যোতিঃ অর্থাৎ **স্বপ্রকাশ, জ্ঞানময়** অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, যে আনন্দ, তাহা **অবাপ্য**—লাভ করিয়া অর্থাৎ পরমপ্রেমের আস্পদরূপে নিশ্চয় করিয়া **তস্মিন্**—সেই নির্ণীত অহং-পদ-লক্ষ্য আত্মাতে **অস্মি ইতি**—'আমিই তাহা', এই প্রকারে **আত্মবিদঃ** -আত্মবিদ্‌গণ অর্থাৎ 'আমিই তাহা' এইভাবে আত্মার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারিগণ **যম্ ঈশম্**—যে ঈশ্বরকে অর্থাৎ ঈশ-পদ-লক্ষ্য ব্রহ্মকে **বিদুঃ**—জানেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করেন, ইহাই অর্থ। 'ত্বং'-পদের লক্ষ্যার্থের জ্ঞান বিনা[৩] তাহার ব্রহ্মত্ব-নিশ্চয় সম্ভব হয় না, ইহাই ভাবার্থ। এই বিষয়ে শ্রুতিঃ 'ত্রিষু ধামসু যদ্ ভোগ্যং···সদাশিবঃ'—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ে

মধ্যেই থাকে। সুতরাং কেবল মাত্র ক্রিয়ার জন্য যে ফল উৎপন্ন হয়, সেই ফলের আশ্রয়কেই যদি কর্ম বলা যায়, তাহা হইলে সংযোগরূপ ফল রামের মধ্যেও বিদ্যমান থাকায় রামও কর্ম হইতে পারে, কিন্তু তাহা তো সম্ভব নহে। এই জন্যই বলিতে হইবে যে, পরসমবেত যে ক্রিয়া তাহার ফলের আশ্রয় যাহা হইবে, তাহাই কর্ম। এখানে গমন-ক্রিয়া রামেই বিদ্যমান বলিয়া রাম স্বসমবেত ক্রিয়ার জন্য ফলের আশ্রয় হিসাবে কর্তা; কিন্তু গ্রাম পরসমবেত (রামসমবেত) ক্রিয়ার ফলভাগী হওয়ায় কর্ম হইল। সুতরাং কর্তা এবং কর্ম, এই দুইটিই সর্বত্রই ভিন্ন হইবে—ইহাই নিয়ম।

৩ 'তত্ত্বমসি'—এই মহাবাক্যের অন্তর্গত 'তৎ'-পদের বাচ্যার্থ অজ্ঞান-অনুপহিত চৈতন্য (শুদ্ধচৈতন্য); 'ত্বম্' –পদের বাচ্যার্থ অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য (জীবচৈতন্য); 'অসি'-পদের দ্বারা উভয় চৈতন্য যে অভিন্ন, ইহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু অজ্ঞান-অনুপহিত চৈতন্য এবং অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়া উভয়ের অভেদ সম্ভব হয় না। এইজন্য 'তৎ'-পদের লক্ষ্যার্থরূপে কেবল চৈতন্যকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ অজ্ঞান অনুপহিত অংশ পরিত্যক্ত হইবে। 'ত্বম্'-পদের লক্ষ্যার্থরূপেও অজ্ঞান-উপহিত অংশ বর্জন করিয়া কেবল চৈতন্যকেই বুঝিতে হইবে। ইহার নাম ভাগ-লক্ষণা। এইরূপ হওয়ায় আর কোন বিরোধ থাকে না।

যাহা কিছু ভোগ্য, ভোক্তা ও ভোগ বিদ্যমান, তাহা হইতে বিলক্ষণ চৈতন্যস্বরূপ সাক্ষী আমিই সদাশিব (ব্রহ্ম)। এই শ্রুতিতে [অবস্থাত্রয়ের] স্থূল সূক্ষ্ম ও আনন্দরূপ ভোগ্য হইতে এবং উপাধিযুক্ত বিশ্ব তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপ ভোক্তা হইতে বিলক্ষণ, সকলের প্রকাশক অহং-পদ-লক্ষ্য যে চিন্মাত্রস্বরূপ, সেই সাক্ষাৎকৃত অহং-পদ-লক্ষ্যকে অনুবাদ করিয়া (তাহাকেই অবলম্বন করিয়া) তাহার (সেই অহং-পদ-লক্ষ্য প্রত্যগাত্মার) সদাশিব শব্দ-লক্ষ্য অদ্বয়ানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম-স্বরূপতা বুঝান হইয়াছে। কারণ, ত্বং পদের লক্ষ্যার্থের সাক্ষাৎকার যাহার হয় নাই, তাহার ব্রহ্মত্ব-সাক্ষাৎকার হওয়া সম্ভব নহে। ১০। [ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মায়ের জনৈক ত্যাগী সন্তান দুই-তিন বৎসর জয়রামবাটীতে থাকিয়া ম্যালেরিয়ায় খুব অসুস্থ হইয়া চিকিৎসা ও বায়ুপরিবর্তনের জন্য কাটিহারে যান এবং তাঁহার গুরুভ্রাতা জনৈক ডাক্তারের বাড়ীতে অবস্থান করেন। কিছুকাল সেখানে থাকিবার পর তাঁহার প্রতি সি. আই. ডি. পুলিশের সন্দেহ হয়। ঐ ডাক্তারের দুইজন কনিষ্ঠ সহোদর সন্ত্রাসবাদীদের দলভুক্ত এবং পলাতক ছিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করিয়া পুলিশ সাধুটিকেও ধৃত ও আটক রাখার উদ্যোগ করিল। ডাক্তারবাবু সরকারী বড় চাকুরী করিতেন। তিনি জামিন হইয়া উক্ত সাধুকে মুক্ত রাখিলেন—এই সর্তে যে, যখন পুলিশ তলব করিবে তখনই তাঁহাকে হাজির করিয়া দিবেন। সাধু তাঁহার বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন। কয়েকমাস পরে তাঁহার জয়রামবাটীতে ফিরিবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা হইল এবং তিনি কাটিহার ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। তখন মা কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। সন্তান ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে পাইয়া বিশেষতঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে দেখিয়া মায়ের মন অতীব প্রফুল্ল হইল। কিন্তু তিনি তখনও পুলিশের নজরবন্দী আছেন এবং সেই ডাক্তার তাঁহার জন্য বহু টাকার জামিনে দায়বদ্ধ রহিয়াছেন শুনিয়া সেখানকার উপস্থিত সকলে শঙ্কিত হইয়া তাঁহার মায়ের নিকটে থাকার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। সকলে এক-বাক্যে বলিলেন, তাঁহার তৎক্ষণাৎ কাটিহারে ফিরিয়া গিয়া যেখানে ছিলেন, সেই ডাক্তারের বাড়ীতেই থাকা কর্তব্য যতক্ষণ না পুলিশের হাঙ্গামা সম্পূর্ণরূপে মিটিয়া যায়। সকলের যুক্তি-যুক্ত কথা শুনিয়া তিনি ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন—বিশেষতঃ তাঁহাকে লইয়া মায়ের বাড়ীতে পুলিশ কোনরূপ হাঙ্গামা উপস্থিত না করে, সেজন্য সকলেরই ভাবনা দেখিয়া।

তখন জয়রামবাটীতে ও কোয়ালপাড়া আশ্রমে পুলিশের কড়া নজর রহিয়াছে; তদ্‌-পরি এই নজরবন্দী আসামীর আগমনে অবস্থা সঙ্গীন হইবে বলিয়া সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন। কিন্তু মা তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিলেন না। তাঁহার ফিরিয়া যাওয়ার কথা বলাতেই

অতিশয় দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 'যা হবার হবে ঠাকুরের ইচ্ছায়, ছেলে এখানে আমার কাছেই থাকবে'—মা এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে মহা মুস্কিল উপস্থিত হইল। ছেলেও পড়িলেন মহা সঙ্কটে। একদিকে মা ছাড়িতে চাহিতেছেন না, তাঁহার নিজেরও প্রবল ইচ্ছা মায়ের নিকটেই থাকিবেন; অন্য-দিকে সকল লোক প্রতিবাদী, আর তাঁহাদের যুক্তিযুক্ত কথা উড়াইয়াও দেওয়া যায় না। সর্বশক্তিমান পুলিশ কি করিবে কে জানে! এখানে মায়ের বাড়ীতেও হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে পারে, ওখানে কাটিহারে সেই নিরপরাধ ভক্ত-কেও ঘোর বিপদে ফেলিতে পারে। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন, কিন্তু মা কিছুতেই ছাড়িবেন না ছেলেকে! অধীর হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই অবুঝ বালিকার ন্যায় আকুলভাবে অশ্রু-বর্ষণ সকলকেই ব্যথিত করিয়া তুলিল। সন্তানও মায়ের স্নেহ-ব্যাকুলতা দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির, মা-ও ছেলেকে আবার দূরদেশে সেই পুলিশেরই কবলে পাঠাইবার প্রস্তাবে কাঁদিয়া অস্থির। এই অতীব বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সকলেই মহা ভাবনায় পড়িলেন। অল্পদিন পূর্বেই মায়ের ভীষণ ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছিল। তাঁহার সুচিকিৎসার জন্য পূজনীয় শরৎ মহারাজ, পূজ-নীয়া যোগীন-মা ও আরও সেবক-সেবিকা এবং ভক্তবৃন্দ তখন সেখানে রহিয়াছেন। সকলে আলাপ-আলোচনা করিয়া সেই সাধুটিকেই বুঝাইয়া মায়ের কাছে পাঠাইলেন—মাকে সকল ব্যাপার ভালভাবে বলিয়া সেই ভক্ত ডাক্তারের সমূহ বিপদের আশঙ্কার কথা জানাইবার জন্য। তদনুসারে তিনি নিজেই মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে সকলের আশঙ্কা ও ডাক্তারের বিপদের সম্ভাবনার কথা নিবেদন করিলেন। তাঁহার মুখে সব কথা শুনিয়া বিশেষভাবে ডাক্তারের চাকরী ও অর্থ-সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা জানিয়া মা নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। আরও কেহ কেহ মায়ের প্রীতি-পাত্র ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি গিয়া মাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বিশেষভাবে মা জানিতে পারিলেন, পূজনীয় শরৎ মহারাজেরও মত কাটিহারে চলিয়া যাওয়া। অগত্যা নিরুপায় হইয়া মাতাপুত্র দুইজনে চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে একে অন্যের নিকট বিদায় লইলেন। মায়ের শোকাশ্রু কয়েকদিন পর্যন্ত সময় সময় ঝরিয়া পড়িত ছেলের কথা মনে হইলেই। পরে মা ধীরে ধীরে নিজেকে সামলাইয়া লইলেন।

সেই সময় আর বিশেষ কিছু হাঙ্গামা না হইলেও মাস কয়েক পরে মায়ের বাড়ীতে স্থানীয় শিরোমণিপুরের পুলিশ ফাঁড়ির দারোগার আগমন হইয়াছিল ঐ সাধুরই সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য, উর্ধ্বতন কর্মচারীর আদেশে। পূর্বদিনে গ্রামের চৌকিদারের মুখে দারোগার আগমন-সংবাদ শুনিয়া অপরে চিন্তান্বিত হইলেও মায়ের অন্তরে বিন্দুমাত্র ভাবনা-চিন্তা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই। পরদিন সকাল-বেলা মায়ের কৃপাপাত্র সন্তান আরামবাগের উকীল মণীন্দ্রবাবুর আগমনে সকলের মন প্রফুল্ল ও আশ্বস্ত হয় এবং দারোগার আগমনের সম্ভাবনার কথা বলিয়া তাঁহাকে সেই দিন রাত্রেও থাকিতে বলা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্বে দারোগা মহাশয় আসিলে মণীন্দ্রবাবু তাঁহাকে আদর-আপ্যায়ন করিয়া বসাইয়া কথাবার্তা বলেন। দারোগা আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া এবং অপর কাহাকেও কাহাকেও কিছু কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াও তাঁহার জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লইলেন। মা ইতিমধ্যে তাঁহার জন্য স্বয়ং জলখাবার হালুয়া তৈরী করিয়া ডাকিয়া

পাঠাইলে সন্তানেরা দারোগাবাবুকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। তিনি মাতাঠাকুরানীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। মা-ও কাছে বসিয়া তাঁহাকে পরম আদরে খাওয়াইতে লাগিলেন। দারোগা খাইতে খাইতে মায়ের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতেই মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান-কার্য সুসম্পন্ন করিয়া লইলেন। পান মুখে দিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় মাগিলেন। অতি সরল ও প্রসন্ন চিত্তে মা-ও শুভকামনা করিয়া সন্তানবাৎসল্যেই বিদায় দিলেন তাঁহাকে। এই ভাবেই বিষম ভাবনার বিষয় - পুলিশ তদন্ত— সহজ সরল ভাবে সম্পন্ন হইয়া গেলে উপস্থিত সকলের মনও খুব প্রসন্ন হইল। কিন্তু একটা কথা উপস্থিত কাহারও কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিল। দারোগা মহাশয় যখন উপস্থিত হন, তখন তাঁহার বদনমণ্ডল ভারাচ্ছন্ন গম্ভীর অপ্রসন্ন ও চিন্তান্বিত দেখা গিয়াছিল। মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথাবার্তাও খুব খোলা মনে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, এমনকি বাড়ীর ভিতরে যাইবার সময়ও তাঁহাকে নতমস্তকে চিন্তিতভাবে ধীর-পদক্ষেপ করিতে দেখা গিয়াছিল।. কিন্তু মায়ের কাছে যাওয়ার পরই, বিশেষভাবে যখন মা পাশে বসিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার চোখের ভাব বদলাইয়া অতি সরল প্রসন্ন হইয়া উঠিল; মনে হইল তিনি যেন নিজের জননী অথবা দুহিতার নিকটে বসিয়া খাইতে-ছেন, সরস গল্প করিয়া করিয়া। বিদায়ের সময় সকলেরই সঙ্গে বিশেষ প্রসন্নচিত্তে প্রাণ খুলিয়া সহর্ষে কথা বলিয়া নমস্কারাদি করিয়া প্রিয়জনের মতো প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মা, তোমার বাক্যে, ব্যবহারে—বিশেষতঃ সন্তানদিগকে কিছু খাওয়ানোর ব্যাপারে কি মাধুর্যময় জাদু ছিল, তুমিই জান!

জয়রামবাটীতে পুলিশের দৃষ্টি সম্বন্ধে এই ঘটনার মাস কয়েক পূর্বের একটি ঘটনা বলা আবশ্যক। বঙ্গদেশে রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাস-বৃদ্ধি এবং মেয়েদেরও তাহাতে যোগদানের সঙ্গে জয়রামবাটীতে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টির কোন সম্পর্ক ছিল কিনা জানি না, কিন্তু ঐ সময়ে পুলিশ জয়রামবাটী ও কোয়ালপাড়াতে কাহারা আসে যায়, সেই সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর সংগ্রহের জন্য নিঃসন্দেহে তৎপর হইয়াছিল। পুলিশের নিকট 'মাতাজীর আশ্রম' নামে পরিচিত মায়ের বাড়ীতে কিছুকাল পূর্ব হইতেই প্রতিরাত্রে চৌকিদার আসিয়া অভ্যাগত লোকের পরিচয়, নাম, ঠিকানা, কোথা হইতে আগমন', 'কোথায় যাইবেন' ইত্যাদি বিবরণ লিখিয়া লইয়া যাইত এবং যথাসময়ে থানায় গিয়া দিয়া আসিত। এই সময়ে সর্বক্ষণ পাহারা রাখার জন্য চৌকি-দারের উপর একজন দফাদারও নিযুক্ত হইয়াছিল এবং দিনরাত কে আসে যায় খোঁজ লওয়া হইতেছিল। রাজনীতির সহিত সম্পর্কযুক্ত সন্তানগণ পূর্বে মায়ের বাড়ীতে সকালে আসিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই অনেকে দর্শনাদি করিয়া চলিয়া যাইতেন, চৌকিদারের খাতায় তাঁহাদের নাম উঠিত না। কিন্তু এই সময়ে সারাদিনরাত কে আসে, কে যায় খবরের জন্য চৌকিদার ও দফাদারের ঘন ঘন যাতায়াত আর জিজ্ঞাসাবাদ বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, ঐ সকল আগন্তুকদের বাড়ীতে— জন্মস্থানেও সেখানকার পুলিশের মারফত অনুসন্ধান চলিত এবং সময় সময় অদ্ভুত আজগুবি কল্পনার সহায়ে এমন সব কথা রটনা করা হইত যে, অনর্থক অশান্তির সৃষ্টি হইত।

জয়রামবাটীর আগন্তুকগণের অধিকাংশই কোয়ালপাড়া হইয়া যাতায়াত করে। কোয়াল-পাড়ায় মায়ের আশ্রমে—কাছারী-বৈঠকখানায়

ঠিক এই রকম পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কামারপুকুরের তিন-চার মাইল পূর্বে নবাসন নামক গ্রামে স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে একটি ছোট আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আরামবাগ-চাঁপাডাঙ্গার পথে জয়রামবাটীতে যাতায়াতকারী ভক্তগণ সেই আশ্রমে বিশ্রাম করিতেন। পূর্ব-বঙ্গবাসী দুই-একজন যুবক সাধুও সময় সময় সেখানে ছিলেন। সেখানেও পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং পরে পুলিশের উপদ্রবেই আশ্রমটি উঠিয়া যায়। পুলিশ মায়ের বাড়ীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেও কখনও কোন উপদ্রব-অত্যাচার করে নাই, তথাপি সকলের মনেই অশান্তি-আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী গ্রাম অবস্থিত। সেখানকার পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের সঙ্গে বাঁকুড়ানিবাসী মায়ের সন্তান শ্রীযুক্ত বিভূতিবাবুর আলাপ-পরিচয় ছিল। বিভূতিবাবু স্কুলে মাষ্টারি করেন, প্রায় প্রতি শনিবার স্কুল করিয়া বাঁকুড়া হইতে ট্রেনে গড়বেতা আসিয়া সেখান হইতে আট-নয় ক্রোশ পদব্রজে চলিয়া মায়ের বাড়ীতে আসিতেন এবং রবিবার বিকাল কিংবা সোমবার ভোরে ফিরিয়া যাইতেন। মায়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি। মা-ও তাঁহাকে খুব স্নেহ করেন। মায়ের সেবায় ও মায়ের বাড়ীর কাজে বিভূতিবাবু সদা প্রস্তুত এবং কষ্ট স্বীকার করিয়াও আগ্রহের সহিত সকল কাজই সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। মাতাজীর আশ্রম পুলিশের সুনজরে রাখিবার উদ্দেশ্যে বিভূতিবাবু ডি. এস্. পি. কে একবার জয়রামবাটী আনিয়া মাকে দর্শন করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। জগদ্ধাত্রীপূজার দুইচার দিন পর (সম্ভবতঃ ১৩২৫ বাংলা সনে) পুলিশকর্তা শিরোমণিপুর ফাঁড়িতে আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে পালকি চড়িয়া মায়ের বাড়ীতে আসিলেন। সেই সময়ে মায়ের অপর কয়েক জন সন্তানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে যথোচিত সম্মানে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বসানো হইল। তিনি বাড়ীঘর দেখিয়া বিভূতিবাবুর সঙ্গে মাকে দর্শন করিতে ভিতরে গেলেন। মায়ের ঘরের বারান্দায় তাঁহার জল-খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে মাকে দর্শন, জলখাবার খাওয়া এবং মায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা—এসব আমাদের দেখিবার শুনিবার সুযোগ হয় নাই। তিনি কিছুক্ষণ পরে সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া বাড়ীর ভিতরে উঠানে দাঁড়াইলেন। মা-ও সেখানে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। তিনি বিদায় লইতেছেন। সে সময়ে মায়ের সঙ্গে তাঁহার আলাপ দুই-চারিটি কথায় বুঝা গেল—পুলিশের কড়াকড়ি ও তদারক সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা উভয়ের মধ্যে হইয়াছে। পুলিশের কর্তা হাসিমুখে মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুলিশের সদাসর্বদা খোঁজ-খবর নেওয়ার বিষয়ে, 'এইসবে ভয় করে না তো ?' সর্বকার্যে সদা-অগ্রণী বিভূতিবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'ভয় করবেন কেন ? কিসের ভয় ?' চারিপাশে অনেক লোক দাঁড়াইয়া—সবাই নীরব। পুলিশ সাহেব মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন—মা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, স্নেহার্দ্র স্বরে ঠিক একটি ছোটমেয়ে যেমন তাহার বাবাকে আবদার করিয়া বলে, তেমনি সুমধুর স্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ বাবা! আমার ভয় করে।' কঠিনহৃদয় বীরবর পুলিশের কর্তার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিল সেই স্বর-লহরী। তিনিও ঠিক যেমন পিতা বিদেশগমন-কালে স্নেহের পুতলি কন্যাকে প্রবোধ দিয়া বিদায় দেন, তেমনি করিয়া মোলায়েম স্বরে খুব সাহস দিয়া বলিলেন, 'কোন ভয় নাই, মা, আমি সব ঠিক ক'রে দিয়ে যাব।' মায়ের দিকে

চাহিয়া তিনি প্রসন্নচিত্তে পালকিতে উঠিয়া যাত্রা করিলেন। মা-ও ততক্ষণ সকরুণ দৃষ্টিতে কন্যার মতোই চাহিয়া রহিলেন। জানি না পুলিশ-কর্তার অন্তরের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া মায়ের সুমধুর বাণী ও সকরুণ দৃষ্টি সেখানে কোন স্থায়ী রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল কিনা, কিন্তু সেই সময়ে এই অলৌকিক 'কন্যা'র স্নেহ-প্রীতি তাঁহার হৃদয় স্নিগ্ধ ও সুশীতল করিয়াছিল নিশ্চয়।

জয়রামবাটীতে পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি সর্বদা কায়েম থাকিলেও, সেই পুলিশ অফিসারের চেষ্টায় কিংবা অন্য কোন কারণে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানী ও তাঁহার সেবক-সেবিকা, সঙ্গিগণ, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন—কাহাকেও কোন হাঙ্গামায় পড়িতে হয় নাই— যদিও মায়ের সন্তানগণ ও তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনাদি কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়, তখন পুলিশ স্থানে স্থানে যেরূপ অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও মায়ের বাটীতে ঘটিলে কি হইত!

মা শুধু যে তাঁহার দীক্ষিত শিষ্যশিষ্যাগণকেই অপার স্নেহ-কৃপা প্রদর্শন করিতেন, তাহা নহে। তাঁহার কাছে মা বলিয়া যে-কেহ আসিয়াছে, সেই তাঁহার স্নেহলাভে ধন্য হইয়াছে। এমনকি, মা বলিয়া না আসিয়া অন্য কারণেও যাহারা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে আসিবার সুযোগ-সৌভাগ্য পাইয়াছিল, তাহারাও তাঁহার অহেতুক করুণা ও অপার মাতৃস্নেহ আস্বাদন করিয়া হৃদয় সুশীতল করিয়াছে। আর এই জীবনে বরাবর সেই স্মৃতি চিত্তপটে উজ্জ্বল না থাকিলেও বিলুপ্ত হইবার নহে; ত্রিতাপ যখন অসহনীয় জ্বালায় দগ্ধ করিবে, তখনই সেই লুক্কায়িত উৎস হইতে শান্তিবারি উৎসারিত হইয়া হৃদয় শীতল করিবে। ভাগ্যবান যাঁহারা, তাঁহাদের পরলোকেরও সঙ্গী হইবে সেই মুখচ্ছবি! পুলিশবেশধারী এইসকল ভাগ্যবানের জন্মজন্মান্তরে বহু সুকৃতি ছিল, সন্দেহ নাই।

জীবনে কাহার কিভাবে পূর্ব সুকৃতি ফল প্রসব করে, তাহা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগোচর। মাতাঠাকুরানীর কৃপা অনেক সুকৃতিমানের জীবনে অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের বিশেষ পরিচিত জনৈক যুবক তখন কলিকাতায় ডাক্তারী পড়িতে-ছিলেন। তাঁহার বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম, ঠাকুর-মার কথা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা খুব। দীক্ষাগ্রহণের জন্য তাঁহার মনে কখন কখন ইচ্ছার উদয় হইলেও কোথায় কাঁহার নিকট গিয়া দীক্ষা লইবেন, সেই বিষয়ে কিছুই স্থির করেন নাই। পিতৃগুরুবংশের প্রতি হৃদয়ে একটা টান শিশুকাল হইতেই ছিল সত্য, কিন্তু পরে উহা ক্ষীণ হইয়া যায়। কলিকাতায় ডাক্তারী পড়ার সময়ে যে মেসে থাকিতেন, হঠাৎ সেখানে তাঁহার পূর্বপরিচিত একজন মাতাঠাকুরানীর সন্তান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি জয়রামবাটী যাইতেছেন, মাতাঠাকুরানীকে দর্শন করিবার জন্য। তাঁহার জয়রামবাটী যাওয়ার কথা শুনিয়াই সেই যুবকের হৃদয়েও মাতা-ঠাকুরানীকে দর্শন ও তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল এবং তিনি অধীর হইয়া অন্যসকল অভাব-অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া জয়রামবাটী রওনা হইলেন তাঁহারই সঙ্গে। সেখানে গিয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল। মাতাঠাকুরানীর দর্শন- ও কৃপা-লাভে তাঁহার জীবন ধন্য হইল। এখন হইতে ভগবানের দিকে নির্দিষ্ট ধারায় জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিল। ক্রমে ক্রমে তিনি ঠাকুর-মায়ের অপরিসীম স্নেহ-কৃপা বিশেষভাবে উপলব্ধি

করিতে লাগিলেন। পরবর্তী কালে তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই ঠাকুর-মার চরণাশ্রয় করেন।

আর একজন ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত সন্তানগণের নিকট তাঁহার অপার করুণার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অতীব আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। মা তখন দেশে। সেই সময়ে বিষ্ণুপুর হইয়া গরুর গাড়ীতে জয়রামবাটী যাতায়াত কঠিন ব্যাপার ছিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এই সময়ে একদিন স্বপ্নে দর্শন পাইলেন—তিনি জয়রাম-বাটীতে মায়ের কাছে উপস্থিত, মা তাঁহাকে পরম স্নেহে স্বীয় প্রসাদী দুধভাত খাইতে দিতেছেন।

স্বপ্নে এই দিব্য দর্শনের ফলে তাঁহার মনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইল এবং কষ্ট স্বীকার করিয়াও জয়রামবাটী গমন করিলেন। তাঁহার অন্তরে দীক্ষাগ্রহণ করিবার আগ্রহ ছিল না। মাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার অপরিসীম স্নেহ-মমতা আস্বাদন করিয়াই তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। ততোধিক আশ্চর্যের ব্যাপার, দ্বিপ্রহরে আহারের পর যখন বিশ্রাম করিতেছেন, মা সেই সময়ে ডাকাইয়া তাঁহার হাতে স্বীয় ভুক্তাবশেষ দুধভাত একটি বাটিতে করিয়া দিয়া পরম স্নেহে বলিলেন, 'বাবা, খাও।' ভক্তটির হৃদয়-মন আনন্দে ভরপুর হইয়াছে, প্রাণের সাধ মিটাইয়া মায়ের স্নেহামৃত-প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তিনি স্নানের পর ভিজা কাপড় রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছিলেন। অপরাহ্নে বিশ্রামের পর কাপড় তুলিতে গিয়া উহা দেখিতে না পাইয়া চিন্তা হইল। পরে দেখিলেন, মা স্বয়ং উঠাইয়া তাঁহার ধুতি কুঁচাইয়া সুন্দর করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। মা তাঁহাকে কাপড় দিয়া বলিলেন, 'বাবা, রোদে বেশী শুকুলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, তাই তুলে রেখেছি।' অল্প সময়েই এইরূপে নানাভাবে মায়ের অপার কৃপা ও স্নেহ-মমতায় সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়া তিনি মায়ের বাড়ী হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পূর্বে শুনিয়াছিলেন, এখন স্বচক্ষেই দেখিলেন মা সন্তানদের জন্য কত পরিশ্রম, কত কষ্ট করেন। কাজেই বেশীদিন থাকা সমীচীন মনে হয় নাই। তিনি মায়ের দর্শন ও স্নেহমমতা-লাভকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে করিয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণের জন্য আর তাঁহার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা হইল না। মায়ের সাক্ষাৎ দর্শনই দীক্ষা ও সাধনার ফললাভ —এই ধারণা হওয়ায় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। মা তাঁহার যে-সন্তান যেরূপ চায়, তাহাকে সেই ভাবেই কৃপা করেন। তাঁহার কৃপাকটাক্ষই মোক্ষ, যথার্থ তত্ত্ববোধ—'মা-সন্তান'-প্রত্যয়ের অপরোক্ষ অনুভব।

জয়রামবাটীতে মা সকল ছেলেকে আগে খাওয়াইয়া পরে খাইতে বসেন মেয়েদের সঙ্গে, কাজেই তাঁহার ভোজনের পর ছেলেদের প্রসাদ পাওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। একবার মায়ের জন্মতিথি দিবসে ছেলেরা মাকে ধরিয়া বসিলেন, মায়ের আহার হইলে তাঁহারা প্রসাদ পাইবেন। মা সেদিন আপত্তি করিলেন না। মা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ দিলে তাঁহাকে নলিনীদিদির ঘরে ভাল আসনে বসাইয়া সমস্ত ভোগের জিনিস পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইল, ঠিক যেমন ঠাকুরদেবতার ভোগ দেওয়া হয়। মা একাকিনীই ভোজনে বসিলেন, কিন্তু দুই-তিন গ্রাস মুখে দিয়াই সম্মুখবর্তী একটি সন্তানকে—যিনি সকল বিষয় তদারক করিতেছিলেন, কাতরভাবে বলিলেন, 'ছেলেদের খাওয়ার আগে গলার ভিতর দিয়ে খাবার যায় না।' মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার কাতরভাব

দেখিয়া সন্তানটির তখন হুঁশ হইল, অন্যায় করা হইয়াছে। মাকে দেবী সাজাইতে গিয়া আজ তাঁহার খাওয়াই হইল না। ছেলেদের আগে খাওয়াইয়া পরে মেয়েদের সঙ্গে তাঁহাকে তাঁহার স্বাভাবিক ভাবে খাইতে দেওয়াই উচিত ছিল। 'তোমাদের খাওয়ার জায়গা কর তাড়াতাড়ি' —বলিয়াই মা উঠিয়া পড়িলেন। খাদ্যদ্রব্য সব একটু একটু চাখা হইল মাত্র! সেদিনের অনেক ব্যাপারই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষ দুইটির উল্লেখ করিব। বহু সন্তান সাধু-ভক্ত সেবার মায়ের জন্মতিথিতে জয়রামবাটীতে সমবেত হন এবং বেশ ধুমধামে উৎসবের আয়োজন হয়। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার পর মা খাটে বিছানার উপর বসিয়া সন্তানদের পূজা গ্রহণ করেন। উদ্বোধন হইতে পূজনীয় কপিল মহারাজ নূতন কাপড় ফল মিষ্টি ইত্যাদি বহু জিনিসপত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ যোগীন-মা গোলাপ-মা ও অপরে বহু যত্নে নানা জিনিসপত্র পাঠাইয়াছিলেন। মা নূতন কাপড় পরিয়া পশ্চিমাস্য হইয়া কোলের উপর উভয় হস্ত রাখিয়া পা ঝুলাইয়া সুপ্রসন্ন করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে উপবেশন করিলে জনৈক সন্তানের তৈরী মায়ের বাগানের হলদে ও পোড়া রঙের গাঁদাফুলের মনোহর মালা কপিল মহারাজ তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দিলেন। লম্বিত মালা শুভ্রবস্ত্র ও কৃষ্ণকেশের উপর দিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়া অতিশয় শোভমান হইয়াছিল, মার মুখমণ্ডলও আজ অসাধারণ শ্রীমণ্ডিত বোধ হইতেছিল। গৃহের অভ্যন্তর সুসজ্জিত নৈবেদ্যাদি, সুন্দর পুষ্পাদি, সুগন্ধ ধূপ ও উজ্জ্বল দীপাদি সুশোভিত হইয়া দেবলোকের ভাব আনয়ন করিয়াছিল। প্রথমে প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ, পরে ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ সকলেই মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। বাহিরের লোকও যাহারা কার্যোপলক্ষে সেখানে উপস্থিত ছিল, মোহিত হইয়া জোড়হস্তে দর্শন করিল, কেহ কেহ পুষ্পাঞ্জলি দিল, পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। মা অদ্য কল্পতরু—সকলেরই উপর অযাচিত কৃপা বর্ষণ করিলেন সত্য, কিন্তু পরে সন্তানদের কাহারও কাহারও মনে হইয়াছিল—ব্যাপারটা ভাল হইল না, মায়ের পবিত্র দেহে এই অবাধ স্পর্শের প্রতিক্রিয়া কষ্টকর হইবে, এবং হইয়াও ছিল। সেই দিন বিকাল হইতেই মা জ্বরে অসুস্থ হন এবং দেহে ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে থাকে।

ঐ দিন দ্বিপ্রহরের একটু পূর্বে যখন বাড়ীতে সকলে উৎসবের আনন্দে ব্যস্ত, বাহিরের ঘরে (বৈঠকখানায়) পরম উল্লাসে খুব ভজনগান চলিতেছে, ভিতরে ভোগের জন্য নানাপ্রকার রন্ধনাদি চলিতেছে, তখন দেখা গেল, মা স্বহস্তে কুটনো কুটিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় এক পাশে একটি ছোট উনুনে সেজো মামীর জন্য পথ্য ঝোল রান্না করিলেন, পরে একটি পাত্রে করিয়া নিজেই তাহা লইয়া গিয়া মামীর ঘরে গিয়া তাঁহাকে দিয়া আসিলেন। মামী আঁতুড় ঘরে আছেন—অসুস্থ, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিজয়ের জন্মের কয়েকদিন পরে মাত্র। মামীর ঘরে অপর স্ত্রীলোক কেহ নাই, মা-ই সস্নেহে সব দেখাশুনা ও পরিচর্যাদি করেন। মায়ের এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মনে প্রশ্ন জাগিল, আজ কাহার জন্মতিথি উৎসবের এই আয়োজন, ধুমধাম কাহার জন্য? পদ্মপত্রে জলের ন্যায় নির্লিপ্ততা কি এই? বড় মানুষের বাড়ীর ঝি হইয়া থাকা কি এই প্রকার? মাকে উপলক্ষ করিয়া সন্তানগণেরই মত্ততা, তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নাই!

মায়ের অন্নপ্রসাদ পাওয়া অতীব কঠিন হইলেও কোন কোন ভাগ্যবানকে অপ্রত্যাশিত-ভাবেও উহা পাইয়া অতীব পুলকিত হইতে দেখা গিয়াছে। সেরূপ একটি ঘটনা বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। শ্যামবাজারের প্রবোধবাবু মায়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র। বদনগঞ্জ হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধানশিক্ষক প্রবোধবাবু ঐ অঞ্চলে সম্মানিত, সুপরিচিত। কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থানের সংলগ্ন জমি 'গোঁসাই-য়ের ভিটা' ক্রয় করিয়া মন্দির-আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ ঐ জমির মালিক লাহাবাবুদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভার প্রবোধবাবুর উপরে দিয়াছেন। প্রবোধবাবু সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কামারপুকুরে যাতায়াত করেন। মাতাঠাকুরানীরও ঐ বিষয়ে আগ্রহ রহিয়াছে, সেজন্য প্রবোধবাবু সময় সময় আসিয়া তাঁহাকে খবর দিয়া যান, কতদূর কি হইল। আজ লাহাবাবুদের সঙ্গে কথাবার্তা দরদস্তর অনেকটা পাকাপাকি স্থির করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে মায়ের বাড়ী আসিবেন মাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সব কথা বলিবার জন্য। কামারপুকুর হইতে আসিতে আসিতে বেলা হইয়া গেল দেখিয়া ভাবিলেন মায়ের বাড়ীতে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পৌঁছিতে পারিবেন না; অসময়ে গেলে মায়ের ও সকলের অসুবিধা হইবে, অতএব বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াই আহার করিবেন, শুধু মাকে 'খবরটা বলিয়া যাইবেন। মায়ের বাড়ীর ছেলেরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বৈঠকখানায় বসিয়া গল্পগুজব করিতেছেন, মা মেয়েদের লইয়া খাইতে বসিয়াছেন। এমন সময়ে প্রবোধবাবু চুপি চুপি আসিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া বসিলেন। পান চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, 'আপনারা আমার খাওয়ার জন্য কিছু ভাববেন না। আমি ঘরে গিয়ে খাব, সেখানে বিশেষ জরুরি কাজ আছে, এখনই চলে যাব, শুধু মাকে প্রণাম ক'রে ব'লে যাব যে, কামারপুকুরের খবর খুব ভাল, লাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছে।' প্রবোধবাবু অতি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, খবর লইয়া যখন শুনিলেন যে, মা আহারে বসিয়াছেন, তখন একটু তামাকের বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। মার আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিবেন। সকলকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন, কেহ যেন মাকে তাঁহার আগমন-সংবাদ না দেন। তাহা হইলে মা ব্যস্ত হইয়া নিজের আহার ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইবেন। তিনি বেলা হইবে ভাবিয়া পূর্বেই খুব পেট ভরিয়া জলখাবার খাইয়া আসিয়াছেন। এখনও পান মুখে রহিয়াছে দেখাইয়া সকলকে নিশ্চিন্ত করিলেন। প্রবোধবাবুর তামাকে প্রীতি সকলের জানা, ভালভাবে তামাকের ব্যবস্থা হইল। তিনি একটি মোড়াতে বসিয়া আরামে তামাকে টান দিয়াছেন, অমনি বাড়ীর ভিতর হইতে মায়ের ডাক শুনা গেল, 'বাবা-প্রবোধকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও, পাতে ভাত দেওয়া হয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বল।' প্রবোধবাবু তাড়াতাড়ি কল্কের আগুন ফেলিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, 'পরে এসে ভাল ক'রে তামাক খাব; মা কি ক'রে টের পেলেন আমি এসেছি, বোধহয় আমাদের কথাবার্তা কানে গিয়েছে।' প্রবোধবাবু তাড়াতাড়ি ঘাটে হাতমুখ ধুইয়া গিয়া দেখেন, মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় বসিয়া মেয়েদের সঙ্গে একপাশে খাইতেছেন, বারান্দার অপর কিনারে আসন জল দিয়া পাতায় ভাত তরকারী দেওয়া হইয়াছে। জোড়হাতে প্রবোধবাবু বারান্দার

পাশে গিয়া দাঁড়াইতেই মা মৃদুহাস্তে 'এসো বাবা' বলিয়া নিজের পাতা হইতে ভুক্ত ডালভাত তরকারীর কিছুটা মাখিয়া একটা ডেলা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, 'খাও, বাবা।' তাহার পর পাশের পাতা দেখাইয়া বলিলেন, 'বসো ওখানে, খাও. তোমার জন্যে দেওয়া হয়েছে—ভাত তরকারী সবই বেশী ছিল, যথেষ্ট আছে, কোন ভাবনা করো না, পেটভরে খাও নিশ্চিন্ত হয়ে।' প্রবোধবাবুর মনপ্রাণ আনন্দে ভরপুর। বিস্মিত ও পুলকিত চিত্তে আসনে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। মা-ও ছেলের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে একটু একটু মুখে দিতেছেন—ছেলেও মায়ের সামনে বসিয়া মায়ের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে আনন্দে খাইতেছেন।

কামারপুকুরের ভাল খবর শুনিয়া মা বিশেষ আনন্দিত। আহারান্তে মুখ ভরিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বৈঠকখানায় আসিয়া প্রবোধবাবু পুনরায় মোড়ায় বসিয়া বলিলেন, 'এবার তামাকের আগুনটা ভাল ক'রে আনুন, নিশ্চিন্ত হয়ে খাই। আপনাদের ঠকিয়েছিলুম, কিন্তু মায়ের কাছে পারলুম না। এখানে প্রসাদ পাব বলেই সকালে কামারপুকুর থেকে বের হয়েছিলাম, কিন্তু রাস্তায় অপর লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় দেরী হয়ে গেল, তাই গাঁয়ের ভিতর এসে ভাল ক'রে হাতমুখ ধুয়ে পান যোগাড় ক'রে মুখে দিলুম, যাতে মুখ শুকনো না দেখায়। চুপি চুপি বৈঠকখানায় ঢুকলাম, দেখি আপনাদের খাওয়া হয়েছে কি না। মনে ছিল আপনাদের খাওয়া না হলে একসঙ্গে খাব, নতুবা বাড়ী ফিরে গিয়ে খাব। তা আজ দেরী হওয়াতে ভাগ্যবলে খুব লাভই হলো – মায়ের প্রসাদ এভাবে পাওয়া গেল; আগে আসলে এটা হতো না। আর এ রকম কখনও ভাগ্যে জোটেনি জুটবেও না। মায়ের কৃপায় আজ প্রাণের সাধ মিটেছে। এখন নিশ্চিন্ত হয়ে তামাক খাই, আর গল্প করি, আসুন।'

মা সন্তানদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সময় সময় অপ্রত্যাশিতভাবে পূরণ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অনেক সন্তান নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত ও আনন্দিত হইয়াছেন। মায়ের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রীপূজার সময় তিনি উপস্থিত থাকিলে তাঁহার সন্তানগণও অনেকে আসিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা মাকেই সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী জানেন; মা জগদ্ধাত্রীপূজা করেন প্রতিমায় বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে, আর ভক্ত সন্তানগণ দর্শন করেন সাক্ষাৎ জীবন্ত জগদ্ধাত্রী। মা অতিশয় আনন্দিত জগদ্ধাত্রীপূজা করিয়া; সন্তানগণও অতীব আনন্দিত পূজার সময়ে মায়ের মনোহর মূর্তি দেখিয়া। একটি সন্তান বহুদূর দেশ হইতে পূজায় আসিয়াছেন, রাস্তায় গোলমাল হওয়ায় তাঁহার পৌঁছিতে দেরী হইয়াছে। পূজার পূর্বদিন দ্বিপ্রহরে যখন পৌঁছিলেন, তখন মায়ের বাড়ীতে সকলে পূজার কাজে ব্যস্ত, চারিদিকে আয়োজন-উদ্যম চলিতেছে, সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ-অধিবাস ও প্রভাতে পূজারম্ভ হইবে। প্রতিমা তৈরী, সাজানো হইতেছে। তিনি মাকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। মা পূজায় সন্তানের আগমনে খুব খুশী, কিন্তু কুশলপ্রশ্ন ছাড়া অপর কথাবার্তার সময় হইল না।

সন্ধ্যার পর বাড়ীতে সকলে অতীব ত্রস্ত-ব্যস্ত; দেখিয়া তিনিও অগ্রসর হইলেন ব্যাপার কি দেখিতে। মাকে ঘিরিয়া অনেকেই দাঁড়াইয়াছেন, সকলেই মলিনবদন, বিষণ্ণ; নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, মা-ও নীরবে অধোবদনে বসিয়া আছেন, অতিশয় চিন্তিতা। কিছুক্ষণ কান পাতিয়া পার্শ্ববর্তী লোকের কথায় বুঝিলেন, পূজায় কলার অভাবে মুস্কিল হইয়াছে।

কয়েক দিন পূর্বে কাঁচা কলার কাঁদি কিনিয়া রাখা হইয়াছিল ; আশা ছিল ইতিমধ্যে পাকিয়া যাইবে, পূজার কাজ চলিবে, কিন্তু একটিও পাকে নাই, একটুও রং ধরে নাই। প্রভাতে পূজা, ঘুম হইতে উঠিয়াই নৈবেদ্যের জন্য কলা প্রয়োজন—কলা না হইলে পূজা হয় না, তাই মুস্কিল হইয়াছে। গ্রামে কাহারও ঘরে কলা নাই, পাশেও কোন স্থানে পাওয়ার আশা নাই। কি উপায় হইবে! সকলেই বিমর্ষ, এমন সময়ে কোয়ালপাড়ার একজন সাধু বলিলেন, সেখানে গেলে কলা পাওয়ার সম্ভাবনা, গ্রামে একজনের কলার বাগান আছে, তাহারা পাকা কলা হাটে বাজারে বিক্রী করে। তাহার কথা শুনিয়া সকলেরই অন্তরে আশার সঞ্চার হইল এবং কোয়ালপাড়া আশ্রমে তৎক্ষণাৎ লোক পাঠানো স্থির হইল, কিন্তু এ রাত্রে যাইবে কে? রাত্রি নয়টা আন্দাজ হইয়াছে, চার মাইল পথ যাওয়া-আসা কঠিন ব্যাপার।

আগন্তুক যুবকটি সাহসী। তিনি তাঁহার পরিচিত আর একটি ঐদেশীয় অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়স্ক যুবককে সঙ্গী করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মায়ের মন প্রসন্ন হইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া দুই বন্ধু যাত্রা করিলেন। অল্পবয়স্ক বন্ধুটি বড়ই নিদ্রালু, তিনি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া চলিলেন। দেশড়াগ্রামে ঢুকিতেই গ্রাম্য কুকুরের দল তাঁহাদের পিছনে লাগিল। তাঁহাদের রাস্তাও খুব ভাল জানা ছিল না। তাঁহাদের ডাকা-ডাকিতে পার্শ্ববর্তী বাড়ীগুলির লোকজন বাহিরে আসিয়া পথ দেখাইয়া দিল। এইভাবে চলিতে চলিতে অনেক রাত্রিতে কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌছিয়া আশ্রমের লোকদের জাগাইয়া তুলিলেন, সকলে ঘুমাইতে-ছিলেন। তাঁহারা এত রাত্রে দুই বন্ধুকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যখন আগমনের কারণ শুনিলেন, তখন ততোধিক চিন্তিত হইলেন। কোয়ালপাড়া আশ্রম হইতেই কলা কিনিয়া পাঠানো হইয়াছিল। কলা পাকে নাই শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তখনই লোক পাঠাইলেন কলার সন্ধানে, কিন্তু পাকা কলা কোথাও পাওয়া গেল না। কলার খোঁজে বৃথা অনেক রাত্রি হইল। যুবক-দ্বয় রাত্রে কোয়ালপাড়া আশ্রমেই শয়ন করিয়া রহিলেন এবং পরদিন প্রত্যূষে শূন্যহস্তে বিষণ্ণ অন্তরে মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিয়া জানা-ইলেন যে, পাকা কলা পাওয়া যায় নাই। মা ও সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ, কলা ছাড়া পূজা কি করিয়া হয়?

দূরদেশাগত যুবকটি বাড়ী হইতে আসার সময় তাঁহার স্বহস্তে রোপিত কলাগাছের কয়েকটি কলা মায়ের জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। গতকাল মাকে অত্যন্ত ব্যস্ত দেখিয়া কলা বাহির করিয়া দেন নাই, কলাগুলি তাঁহার ব্যাগের ভিতরপ্যাক করা, গোপনে রাখিয়া দিয়াছিলেন; ইচ্ছা, পূজার পরে মার অবসর হইলে তখন তাঁহার হাতে দিবেন। আরও তিনি ভাবিয়া-ছিলেন, ঐ সময়ে কলাগুলি দিলে এত জিনিস-পত্রের মধ্যে কোথায় গুলাইয়া যাইবে কে জানে? তাহার উপর কলাগুলি যদিও খুব পুষ্ট সুন্দর ও বড় বড়, তবু উৎকৃষ্ট জাতের নহে। পূজায় লাগার উপযোগী 'কবরী' কলা হইলেও উহা তো অতি সাধারণ কলা, লোকে খুব পছন্দ করে না এবং কোন বিশেষত্বও নাই। তিনি স্বহস্তে রোপিত গাছের ফল বলিয়া মায়ের জন্য যত্ন করিয়া আনিয়াছেন বটে, তবে অন্য লোকে দেখিলে এত দূর দেশ হইতে এই সাধারণ কলা বহিয়া লইয়া আসার জন্য হাসিবে এবং পূজা উপলক্ষে মায়ের বাড়ীতে কত ভাল ভাল

কলা আসিয়াও থাকিবে নিশ্চয়। এই সকল নানা কথা ভাবিয়া ভয়ে সঙ্কোচে ও লজ্জায় কলাগুলি গোপনেই রাখিয়াছিলেন এবং আনিবার সময় কলাগুলি কাঁচাই ছিল, ভাবিয়াছিলেন ভাল করিয়া পাকিতে দেরী হইবে। আজ কোয়ালপাড়া হইতে খালি হাতে ফিরিয়া আসার পর মায়ের বিষণ্ণ বদন ও চিন্তা দেখিয়া এবং পূজার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়া তিনি স্বীয় বাসস্থানে গিয়া কলাগুলির প্যাকিং খুলিয়া দেখেন, সেগুলি খুব পাকিয়া গিয়াছে এবং আসিবার সময় রাস্তায় চাপ লাগিয়া দুই-তিনটি একটু নরমও হইয়া গিয়াছে। কলা আর রাখা চলিবে না দেখিয়া, লইয়া গিয়া মায়ের সম্মুখে রাখিলেন। মা সেই পাকা কলা দেখিয়াই অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'গ্যাখো, গ্যাখো, মা তাঁর পূজোর যোগাড় নিজেই আগে থেকে ক'রে রেখে দিয়েছেন। আমরা সবাই ভেবে অস্থির।' সন্তান তাঁহার মনোগত সকল কথা মায়ের চরণে নিবেদন করিলে মা কলা হাতে লইয়া ভাল করিয়া দেখিলেন এবং পূজার জন্য প্রশস্ত কবরী কলা দেখিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলেন। সন্তানেরও সকল শ্রম সার্থক হওয়ায় হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল।

প্রসন্নচিত্তে মৃদুহাস্যে মা সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'এ যেন ঠিক ঘরের ভিতর বস্তু রেখে চারদিক খুঁজে বেড়ানো।' একটু থামিয়া আবার বলিলেন, বাক্যটি লম্বা করিয়া, 'ঘরের—ভিতর—বস্তু—রেখে—চারদিক—খুঁজে—বেড়ানো।' মা কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, সন্তানও তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; ভাবিতেছেন—ঘরের ভিতরের বস্তুটি কি?

আমাদের কল্পনার অতীত, বুদ্ধির অগোচর যোগসূত্রে সংসারের কত ঘটনাবলী আশ্চর্যরূপে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মায়ের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রীপূজায় কলার অভাব! আবার কি অত্যাশ্চর্যভাবে কোথাকার কলা কোথায় আসিয়া কিরূপ প্রয়োজনে লাগিল! দেখিয়া, চিন্তা করিয়া মনে হয়, সর্বব্যাপী এক শক্তির ইঙ্গিতেই সংসারের সর্বত্র সকল কার্য সম্পাদিত হইতেছে; আমরা অজ্ঞ, তাই বুঝিতে পারি না।

সেই যুবকটি কলার সঙ্গে নিজেদের বাগানের কয়েকটি পাকা-ছিল্‌কাশুদ্ধ সুপারীও লইয়া আসিয়াছিলেন, মাকে দেখাইবার জন্য। কিন্তু সেদিন আর সেগুলির কোন উল্লেখ করিলেন না, বাহির করিয়াও দেখাইলেন না। সুপারী নষ্ট হইবে না কয়েক দিনে; ভাবিলেন পরে অবসরমত দিবেন। জগদ্ধাত্রীপূজা শেষ হইল, মায়ের বাড়ীতে প্রতিমা দুই দিন রাখিয়া বিসর্জন দেওয়া হয়, বৃহস্পতিবার পড়িলে সেদিন বারবেলায় বিসর্জন হয় না, আরও একদিন পরে বিসর্জনের ব্যবস্থা। বিসর্জন না হওয়া পর্যন্ত পূজার জের থাকে, নিত্য সামান্যভাবে প্রতিমার অর্চনা করা হয়।

পূজার হাঙ্গামা মিটিয়া গিয়াছে, অতিথি-অভ্যাগতরা চলিয়া গিয়াছেন—তখন একদিন মাকে সম্পূর্ণ অবসর ও বিশ্রাম লইতে দেখিয়া সন্তানটি সুপারীগুলি আনিয়া দিলেন। পাকা কমলালেবুর রঙের, খোসাশুদ্ধ, বেশ গোলগাল, হাতের মুঠোভর এক-একটি সুপারী। মা দেখিয়াই খুব খুশী হইলেন। তিনি পূর্বে বাগানে, কলিকাতায় সুপারী দেখিয়াছেন, কাজেই চিনিতে পারিলেন, কিন্তু বাড়ীর অনেক মেয়েরা খোসাশুদ্ধ কাঁচা সুপারী দেখে নাই, তাহারা অতিশয় বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া সুপারী লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। মা আনন্দে

সুপারী হাতে লইয়া কিরূপে খাইতে হয় বলিলেন। সুপারীর ছাল ছাড়াইয়া জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, কিংবা অল্প সিদ্ধ করিয়া, কষ বাহির করিয়া, শুকাইয়া, খাইবার উপযোগী করার কথা শুনাইয়া, সকলকে সাবধান করিয়া বলিলেন, 'কাঁচা সুপারী কষশুদ্ধ খেয়ে মানুষের সময় সময় মাথা ঘুরে যায়।' সুপারীগুলি কোয়ালপাড়াতে প্রিয় বিশ্বস্ত সন্তান বুদ্ধিমান কেদারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, সেখানে আশ্রমের বাগানে পুঁতিয়া রাখিতে, গাছ হওয়ার জন্য। মায়ের কোয়ালপাড়া আশ্রমের উপর খুব নজর। পূর্বে একবার খুব ভাল আম দিয়াছিলেন সন্তানের হাতে, আম খাইয়া আঁঠি পুঁতিয়া গাছ করার জন্য। বড়ই সুখের কথা যে, সেই আঁঠিতে আমের গাছ হইয়াছিল এবং এখনও আছে, খুব ভাল আম, কাশীর ল্যাংড়া। দুঃখের কথা সেই সুপারীতে গাছ হইয়াছিল সত্য, তবে একটু বড় হইয়া পর পর সব কয়টিই মারা যায়। পরবর্তী কালে সেখানে বহুবিধ ফলের সঙ্গে সুপারী গাছও হইয়াছে।

[ক্রমশঃ]

ভ্রম-সংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যার ১৮০ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ১২শ পঙ্‌ক্তিতে 'ময়না' স্থলে 'খয়না' এবং ১৭শ পঙ্‌ক্তিতে 'কোটা' স্থলে 'ফোটা' পড়িতে হইবে।—সঃ

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(তৃতীয় পর্যায়)

নিম্বার্কের 'স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদ'

'ভেদ' ও 'অভেদ' আমাদের জীবনের, আমাদের দর্শনের দুটি মূলীভূত তত্ত্ব; এবং সকল দেশের, সকল কালের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল দার্শনিকের একটি শাশ্বত সমস্যা। 'ভেদ' ও 'অভেদ' ত আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরোধী। তা হ'লে তাদের সহাবস্থান সম্ভবপর কিরূপে? অথচ, এরূপ সহাবস্থান স্বীকার না করলেই নয়—একবার যদি কেবল 'অভেদে'র কঠিন, ঋজু পথ পরিত্যাগ করা যায় —যে-পথকে সর্বজনকল্যাণনির্ঝর উপনিষদ বর্ণনা করেছেন অনুপম ভাবে—

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
　প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
　দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥'
　　　(কঠোপনিষদ ।৩।১৪)

'উত্থান কর, জাগ্রত হও!
　ধন্য হও লভি' শ্রেষ্ঠ ধন!
শাণিত ক্ষুরসম মোক্ষপথ দুর্গম
　বলেছেন মুনিঋষিগণ॥'

কেবল 'অভেদে'র এরূপ প্রখর প্রচণ্ড জলন্ত উত্তপ্ত শুদ্ধজ্ঞানের পথ কিন্তু একটিই মাত্র, একে-

বারে সোজা, একেবারে খাড়া পথ—যে-পথে চলতে চলতে, মাথার উপরে অতি তীব্র রোদ, পায়ের নীচে অতি কর্কশ কাঁকর থাকলেও, তুমি মুহূর্তের জন্যও পারবে না শীতল ছায়া খুঁজতে, পারবে না কোমল তৃণদল দলতে—যে কোনো প্রকারে তোমাকে অগ্রসর হয়ে হয়ে যেতেই হবে স্থির ধীর দৃঢ় দৃপ্ত পদক্ষেপে সেই একটিই মাত্র পথ ধরে ধরে—

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।'

(রবীন্দ্রনাথ)

—এই মহতী আশা নিয়ে।

কিন্তু যাঁরা তা পারেন না, তাঁদের ত অন্বেষণ ক'রে নিতে হবে,—আত্মরক্ষা করতে—অন্যান্য আঁকাবাঁকা ছায়াসুশীতল তৃণসুকোমল পথ, যে-পথে যেতে হ'লে সময় হয়ত লাগবে বেশী, কিন্তু লক্ষ্যে ত পৌছান যাবে সুনিশ্চিত; এবং একবার সেই একটি মাত্র প্রধান রাজপথ পরিত্যাগ করলে, স্বভাবতই এসে যাবে বহু বিবিধ-বিচিত্র পল্লী-পথ—জনসাধারণের সরলতর সহজতর পথ। সেজন্য, কেবলাদ্বৈতবাদী শুদ্ধ-জ্ঞানবাদী শঙ্করের পরবর্তী নয় জন শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিকই নয়টি বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছেন তাঁদের অপূর্ব মেধা দিয়ে, ভক্তি দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, কৃতি দিয়ে। তাঁদের কোমল মধুর স্নেহস্নিগ্ধ সহানুভূতিশীল মন দিয়ে তাঁরা উপলব্ধি করলেন সাধারণ মানুষের প্রাণের আকুতি, অথচ শক্তির সীমা এবং সেই অনুসারেই তাঁরা তাঁদের নিয়ে চললেন সস্নেহে হাত ধরে তাঁদেরই যোগ্য স্বচ্ছন্দতর সুকরতর সুগমতর পথে—যে-পথে জ্ঞানের চেয়ে বেশী রয়েছে ভক্তি, একত্বের চেয়ে দ্বিত্ব, ব্রহ্ম-বিলীনত্বের চেয়ে জীব-ব্যক্তিত্ব। জনসাধারণের পথিকৃৎ তাঁরা চিরনমস্য!

এই নূতন আপোষের পথে প্রথম অগ্রসর হলেন নির্ভয়ে বিশ্ববন্দ্য রামানুজ। প্রথম পথ-প্রদর্শকের গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। তারপরে এলেন নিম্বার্ক, তাঁর নূতন পূজার অর্ঘ্য সাজিয়ে, রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে'র পাশে তাঁর 'স্বাভাবিক-দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' অথবা—'স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদে'র ফুটন্ত ফুলের সাজি রেখে—সসঙ্কোচে নয়, সগৌরবে—যদিও তাঁর মতবাদ রামানুজের মতবাদের সঙ্গে বহুলাংশেই এক ও অভিন্ন। কিন্তু তা সত্বেও প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভক্তপ্রবর নিম্বার্ক স্থির জানতেন যে, তাঁরও আছে নূতন কথা বলবার, নূতন আলোক বিকিরণ করবার, নূতন অমৃত সিঞ্চিত করবার, নূতন আনন্দ রণিত করবার। কারণ, তিনি দেখলেন একদিকে সানন্দে সগৌরবে সশ্রদ্ধায় কেবলাদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে রামানুজের প্রচণ্ড একক দুঃসাহসী অভিযান; গভীর শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করলেন এই বীর্যগম্ভীর সাধনার বেদীমূলে; এবং গ্রহণ করলেন সাগ্রহে পূর্বাচার্যের বহু তত্ত্ব ও নির্দেশ। কিন্তু অন্যদিকে ঠিক তেমনি তিনি দেখলেন রামানুজের নানাবিধ অসম্পূর্ণতা অযৌক্তিকতা দুর্বলতা খর্বতা; যার জন্য তিনিও নির্ভয়ে তাঁর এই পূজ্য-জনেরও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন; রামানুজের নির্দিষ্ট পন্থা সম্পূর্ণ অনুসরণ না ক'রে নিজেই দিলেন আরেকটি নূতন পথের সন্ধান, ঘোষণা করলেন দৃপ্তভাবে 'ভেদ' ও 'অভেদে'র সমন্বয়ের একটি নূতন রূপ; প্রপঞ্চিত করলেন পূর্ণ বিশ্বাসভরে বেদান্ত-দর্শনের একটি নূতন সম্প্রদায়; রামানুজের দিগন্তব্যাপী অত্যুজ্জ্বল রবিরশ্মির মধ্যেও প্রজ্বলিত করলেন, অদম্য সাহস-সহকারে তাঁর আপাত-দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র গৃহপ্রদীপটিকে। সত্যই, আমাদের

ভাবলে অবাক লাগে যে, রামানুজের পরে নিম্বার্ক কি ভাবে তাঁকে অতিক্রম ক'রে আরেকটি নূতন, তৃতীয় বেদান্ত-সম্প্রদায়ের পরিস্ফুটন করলেন—যা অবশ্য পূর্বেও ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এরূপ একটি সুন্দর, স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল, পরিপূর্ণ মতবাদরূপে নয়। কারণ, স্বরচিত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যই সকল বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি; এবং সেদিক থেকে বলতেই হয়—হায়, কোথায় বা রামানুজ, আর কোথায় বা নিম্বার্ক! 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ' নামক নিম্বার্কের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য এরূপ অধিক সংক্ষিপ্ত যে, রামানুজের 'শ্রীভাষ্য' নামক প্রখ্যাত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের মাত্র প্রথম সূত্রের ভাষ্যটিরও সমান নিম্বার্কের সমগ্র ব্রহ্মসূত্রভাষ্যই নয়! তদুপরি, নিম্বার্কের এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে কোনোদিক থেকেই সুগভীর পাণ্ডিত্য সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও সুবিস্তৃত প্রপঞ্চনা-শক্তির পরিচয় নেই। উপরন্তু, এতে প্রত্যেকটি সূত্রের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, আক্ষরিক ব্যাখ্যাই মাত্র আছে—এমন কি স্বীয় মতবাদের বিশদ ও যুক্তিসঙ্গত আলোচনা-প্রপঞ্চনাও একেবারেই নেই; নেই অপরাপর সম্প্রদায়ের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা ও খণ্ডন, 'তর্কপাদে'র (ব্র. সূ. ২।২) সাংখ্য-যোগ-প্রমুখ মতবাদের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ও খণ্ডন ব্যতীত; নেই কোনো পাণ্ডিত্য বিচারশক্তি প্রপঞ্চনা-রীতির বিন্দুমাত্র পরিচয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মাত্র তিন-চার পঙ্‌ক্তিতেই তিনি সেই সূত্রের কেবলমাত্র আক্ষরিক অর্থ দু'এক কথায় ব্যক্ত ক'রেই শেষ ক'রে দিয়েছেন। বস্তুতঃ, তাঁর মন্ত্রশিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য তাঁরই অনুরোধক্রমে তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভে'র প্রপঞ্চনা-প্রসঙ্গে 'বেদান্ত-কৌস্তুভ' নামক সুন্দর সুললিত ও বিস্তৃততর ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা না করলে, বহু স্থলেই নিম্বার্কের অতি সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যটি আমাদের নিকট দুর্বোধ্যই থেকে যেত, নিঃসন্দেহে।

অপর পক্ষে রামানুজের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'শ্রীভাষ্যে'র অতি বিস্তৃত, অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অতি যুক্তিবিচারসমৃদ্ধ, অতি তেজস্বী, অতি আত্মবিশ্বাসদৃঢ়, অতি স্বমহিমাদীপ্ত এবং অতি স্বশক্তিগর্বিত আলোচনা-প্রপঞ্চনা বিশ্বজনকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত না ক'রে পারে না—কি অপূর্ব রামানুজের বাক্‌চাতুর্য, কি অনুপম তাঁর বিচার-নৈপুণ্য, কি অভিনব তাঁর যুক্তি-রীতি, কি অতুলনীয় তাঁর প্রপঞ্চনা-প্রণালী, কি অত্যাশ্চর্য তাঁর সমগ্র সংগ্রাম ও বিজয়-পদ্ধতি! জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বীর, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক শঙ্করকে যেভাবে 'যুদ্ধং দেহি' ব'লে আক্রমণ ক'রেও রামানুজ অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন এবং বহু জনের সম্মানভাজন হয়েছিলেন, তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

অথচ, সর্বদিক থেকেই আপাতদৃষ্টিতে পরিম্লান পরিক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত নিম্বার্ক তাঁর পরে এসেও বৃথা বাগাড়ম্বর ও ঢক্কানিনাদ না ক'রেও, বিজয়ের কোনোরূপ প্রচেষ্টামাত্রে রত না হয়েও অনায়াসেই জনগণচিত্ত জয় ক'রে নিলেন কিরূপে? তার কারণ হ'ল এই যে, জনগণ শঙ্করে যা পাননি, তা-ই পেয়েছেন বহুলাংশে রামানুজে—বহুলাংশে পেয়েছেন দ্বিত্বকে, পেয়েছেন ব্যক্তিত্বকে, পেয়েছেন স্বাতন্ত্র্যকে, পেয়েছেন ভক্তিকে, পেয়েছেন নিষ্কাম কর্মকে, পেয়েছেন মনোবল নিজেদের ব্রহ্মের স্বগতভেদরূপে তাঁরই সমগোত্রীয় রূপে উপলব্ধি করতে,[১] ইত্যাদি। কিন্তু, রামানুজ যা এনে দিলেন ডালি ভ'রে, নিম্বার্ক তাকেই আরো সুন্দর করলেন, আরো সুরভিত করলেন, আরও মধুময় করলেন। কারণ, তিনি তাঁর আর্ষদৃষ্টিতে স্পষ্টতমভাবে

দেখলেন যে নির্ভীক তেজস্বী অক্লান্তকর্মী পথিকৃৎরূপে, রামানুজের দান অসংখ্য নিশ্চয়ই নঙর্থক ('নেগেটিভ্') দিক্ থেকে ; কিন্তু তাঁর ত্রুটিও থেকে যায় অনেক, অনিবার্যভাবেই, সদর্থক ('পজিটিভ্') দিক্ থেকে। যথা, পথিকৃৎ নূতন পথের কণ্টক উৎপাটিত করতে, আবর্জনা পরিষ্কার করতে, প্রস্তর অপসৃত করতে, ভগ্ন হর্ম্য বিধ্বস্ত করতে এরূপ ব্যস্ত থাকেন যে, কণ্টকের স্থলে কমল বিকশিত করতে, আবর্জনার স্থলে তৃণদল লীলায়িত করতে, প্রস্তরের স্থলে তটিনী প্রবাহিত করতে, ভগ্ন গৃহের স্থলে সু-উচ্চ অট্টালিকা উত্তোলিত করতে তাঁর যেন ততটা সময় উৎসাহ ও শক্তি থাকে না। রামানুজের ক্ষেত্রেও ত তাই হ'ল অনিবার্যভাবেই। শঙ্করের ন্যায় মহাশত্রুকে পরাজিত করতেই তাঁর চলে গেল অধিকাংশ সময় ও শক্তি। সেজন্যই হয়ত, নূতন হর্ম্য-রচনার অশেষ শুভ কার্যটি যেন পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হ'ল না তাঁর জীবনে।

এখানেই ঘটল নিম্বার্কের আড়ম্বরবিহীন প্রবেশ বেদান্তের পূত যজ্ঞভূমিতে—কত বিনত, কত সংযত, কত সংহত, অথচ স্বমহিমায় কত গৌরবান্বিত! তিনি দেখালেন একটি অভিনব সত্য সাহসভরে—অদ্বৈত-বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্ধর্ষতম বলবত্তম ধ্বংসকর্তা রামানুজও যেন স্বয়ংই হয়ে পড়েছেন অদ্বৈত-বেদান্ত-নিষ্ণাত বহুলাংশে— সর্বসময়ে অদ্বৈততত্ত্বাদি প্রণিধান করতে করতেই যেন তিনি অদ্বৈতবাদের মায়াতে, যাদুতে, মোহে পড়ে গেছেন অজান্তে। মনে হয়—অত্যাশ্চর্য কথা এটি! কিন্তু রামানুজ-বেদান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করলে এই অত্যদ্ভুত সিদ্ধান্ত থেকে নিস্তার কই? এই-খানেই নিম্বার্কের দান, এইখানেই নিম্বার্কের মহিমা, এইখানেই নিম্বার্কের অত্যাবশ্যকতা।

যেমন, ধরুন, রামানুজের প্রাণপ্রতিম তত্ত্ব 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'। বহু বাধাবিপদ অতিক্রম ক'রে, বহু স্ববিরোধদোষে অভিযুক্ত হয়ে, বহু যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিবেচনা আলোচনা-প্রপঞ্চনা ক'রে অবশেষে বহু কষ্টে তিনি তাঁর 'বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদে' উপনীত হয়েছেন। কিন্তু, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে সম্বন্ধ আলোচনা-প্রসঙ্গে রামানুজ —অপরাজেয় দার্শনিক ও নৈয়ায়িক শঙ্করের বিরুদ্ধে প্রথম তীব্র-লেখনীধারী প্রবল-তর্ক-কুশল প্রখর-যুক্তিবাদী প্রচণ্ড-বিচার-প্রদীপ্ত রামানুজ— যে-অসঙ্গতি ও দোদুল্যমান অস্থির চিত্তের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই অতি বিস্ময়কর। কারণ, এস্থলে প্রথমে মনে হয় যে, তিনি যেন একাধারে 'ভেদবাদ' (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১।১।১), 'অভেদবাদ' বা 'অনন্যত্ববাদ' (ঐ ২।১।১৫) এবং 'ভেদাভেদবাদ' (ঐ ২।৩।৪২-৫২) সবই খুসী মনে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা যখন দেখি যে, তিনি এই সব মতবাদের বিরুদ্ধে সমানে অস্ত্রধারণও করেছেন (যথা— ১।১।১ সূত্রভাষ্যে) তাঁর এই সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে, তখন সত্যই সংশয়াপন্ন হয়ে পড়ি, তাঁর প্রকৃত ও শেষ সিদ্ধান্ত বিষয়ে।

সে যাহোক, পূর্বেই যা বলা হ'ল—শেষ পর্যন্ত তাঁর মতবাদ হ'ল এই যে, ব্রহ্ম দ্রব্য বা বিশেষ্য ; জীব-জগৎ তাঁর গুণ বা বিশেষণ ; এবং এই ভাবে, দ্বৈত-বিশিষ্ট অদ্বৈতই পরম ও চরম সত্য।

এইখানেই করলেন নিম্বার্ক ঘোরতর আপত্তি —বললেন ক্ষোভভরে—এই কি হ'ল নির্ভীক যোদ্ধার প্রকৃত-প্রকৃষ্ট কার্য? কারণ, 'অদ্বৈত' দ্রব্য বা বিশেষ্য, এবং 'দ্বৈত' গুণ বা বিশেষণ মাত্রই হ'লে, 'অদ্বৈত' ও 'দ্বৈত' সমপর্যায়ভুক্ত সমমর্যাদাসম্পন্ন সমশক্তিসমৃদ্ধ আর হ'ল কিরূপে? অদ্বৈত বা অভেদই ত ক্রমশঃ হয়ে দাঁড়াল উচ্চতর

পূজ্যতর কাম্যতর—'দ্বৈত' বা 'ভেদ'কে আশ্রয় দিয়ে, প্রকাশিত ক'রে, প্রাণবন্ত ক'রে। তা হ'লে আর এরূপ কষ্ট ক'রে 'ভেদ'কে কেন উদ্ধার করা হ'ল অদ্বৈত-ব্রহ্মের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে? শেষ পর্যন্ত ত 'ভেদ' হয়েই গেল পরমুখাপেক্ষী দুর্বল দুঃস্থ; প্রভু 'অভেদে'র আজ্ঞাবহ ভৃত্যই মাত্র। তা হ'লে আর অদ্বৈত-বেদান্তের পরিপূর্ণ খণ্ডন হ'ল কিরূপে?

পুনরায় দেখুন, রামানুজের তথাকথিত 'ভক্তিবাদ'। এস্থলেও তিনি অদ্বৈত-প্রভাবে পূর্ণ-প্রভাবান্বিত। কারণ, তাঁর ভক্তি জ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র, যা পূর্ব প্রবন্ধে (উদ্বোধন, ৭৯।২৫৬) বলা হয়েছে।/

এরূপে সাধ্য 'ব্রহ্ম' এবং সাধন 'ভক্তি'—এই উভয় দিক্‌ থেকেই কি রামানুজের মতবাদ বহুলাংশে অসম্পূর্ণ নয়? স্বল্পবাক্‌ বিবাদ-বিমুখ, বিনয়াবনত নিম্বার্ক/সেজন্য অগ্রসর হয়ে এলেন নিঃশব্দে, তাঁর স্থির ধীর মহিমায়, 'ভেদ'কে পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করতে 'অভেদে'র কবল থেকে; 'ভক্তি'কে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে 'জ্ঞানে'র উত্তাপ থেকে বাঁচিয়ে। এইজন্যই নিম্বার্ক-বেদান্ত বহুলাংশে রামানুজ-বেদান্তের অনুরূপ হলেও নিম্বার্ক রামানুজের ছায়ামাত্র নন নিশ্চয়ই; পরিপূরক মাত্র নন নিশ্চয়ই—'ভেদ'-রক্ষার, 'ভক্তি'-রক্ষার নূতন পথ-প্রদর্শক, নূতন প্রাণ-প্রদায়ক, নূতন শক্তি-সঞ্চারক।

এরূপে, রামানুজেরই ন্যায় ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিক নিম্বার্কও ব্রহ্ম-চিৎ-অচিৎ, অথবা, ঈশ্বর-জীব-জগৎ নিয়ে আরম্ভ করেছেন; এবং প্রত্যেকের স্বরূপ গুণ শক্তি কর্ম প্রভৃতি একই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ (৬।২।১); কিন্তু সবিশেষ, অথবা সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত, কিন্তু স্বগতভেদবান্—জীব-জগৎ তাঁর স্বগতভেদ। ব্রহ্ম সগুণ—সকল কল্যাণগুণ-বিমণ্ডিত এবং সকল হেয়গুণ-বিবর্জিত; সক্রিয়—সৃষ্টি ও মুক্তি তাঁর প্রধান কর্ম; এবং 'পরিণামবাদ' অনুসারে সত্য-সত্যই জীব-জগতে পরিণত বা রূপান্তরিত হয়ে সত্যসত্যই জীব-জগৎ সৃষ্টি করছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ রূপে।

চিৎ বা জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা; সংখ্যায় বহু; আকারে অণু।

অচিৎ ত্রিবিধ—প্রাকৃত অপ্রাকৃত ও কাল। 'প্রাকৃত'—এই পরিদৃশ্যমান প্রকৃতিজাত বিশ্ব-চরাচর। 'অপ্রাকৃত'—রামানুজের 'শুদ্ধতত্ত্বে'র সমতুল—সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণাত্মক নয়, কেবল সত্ত্বগুণাত্মক—এবং ব্রহ্ম ও মুক্তাত্মগণের দিব্যদেহ, আভরণাদি ও ব্রহ্মলোক ও তদন্তর্গত দ্রব্যাদির উপাদান-কারণ। কাল অংশশূন্য ও বিভু।

এরূপে, বন্ধুভাবে চলছিলেন নিম্বার্ক রামানুজীয় পথে সম্পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে, পূর্বাচার্যের পুণ্য পদাঙ্কানুসরণ করে শ্রদ্ধাভরে। হঠাৎ পড়ল বাধা—তাকিয়ে দেখলেন নিম্বার্ক তাঁর পূজ্য পথিকৃৎ রামানুজের পথ যে যাচ্ছে ক্রমশঃ সরে অদ্বৈত-পথের দিকে; আর ত তাঁকে অনুসরণ করা চলবে না, চলবে না দেখা 'দ্বৈতে'র অমর্যাদা নীরব নিরীহ দর্শকের ন্যায়; চলতে হবে একাকী সাহসভরে নূতন পথে; প্রতিষ্ঠিত করতে হবে 'দ্বৈত'কে 'অদ্বৈতে'র পার্শ্বে সমমর্যাদায় সমসমাদরে সমমূল্যায়নে। আরম্ভ হ'ল নিম্বার্কের নূতন অভিযান ও নূতন বিজয়। বিপুলবিক্রম রামানুজের প্রভাব কাটিয়ে তিনি স্থাপিত করলেন তাঁর স্বতন্ত্র মতবাদ—'স্বাভাবিক ভেদা-ভেদবাদ'কে পূর্ণ মহিমায়, দিলেন 'ভেদ' ও 'অভেদ'কে সত্যসত্যই পরিপূর্ণ সমমূল্য সম-মাধুর্য।

এস্থলে সেই মূলীভূত প্রশ্ন হ'ল—ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ কি? স্থির বিশ্বাস-ভরে সুদৃঢ় সাহস-সহকারে সুস্নিগ্ধ আনন্দসঞ্চারে নিম্বার্ক বলছেন—ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ ভিন্নাভিন্ন। ব্রহ্ম কারণ, জীব-জগৎ কার্য; ব্রহ্ম শক্তিমান, জীব-জগৎ শক্তি; ব্রহ্ম অংশী, জীব-জগৎ অংশ; এবং কারণ ও কার্য, শক্তিমান ও শক্তি, অংশী ও অংশ স্বরূপতও ভিন্নাভিন্ন, ধর্মতও ভিন্নাভিন্ন।

সর্বজনবিদিত সর্বজনসমাদৃত কারণ-কার্য-সম্বন্ধের কথাই ধরা যাক। প্রথমতঃ এস্থলে কার্যের দিক থেকে, কার্য কারণ থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন, যেহেতু কার্য কারণাত্মক, কারণেরই পরিণাম রূপান্তর বা অবস্থা-বিশেষ। যেমন, কার্য মৃন্ময় ঘট কারণ মৃৎপিণ্ড থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন, যেহেতু উভয়ই সমভাবে মৃৎস্বরূপ—কার্য মৃন্ময় ঘটে মৃত্তিকা ব্যতীত আর কিছুই নেই; কারণ মৃৎপিণ্ডেও ঠিক তাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কার্য মৃন্ময় ঘট কারণ মৃৎপিণ্ড থেকে স্বরূপতঃ ভিন্নও নিশ্চয়, যেহেতু কার্যের একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা বা স্বরূপ আছে, যেজন্য কার্য কার্যই, কারণ নয়, অন্যান্য কার্যও নয়—ঘট ঘটই, পিণ্ড পাত্র বা অন্য কিছু নয়। এরূপে, কার্যের দিক থেকে কার্য ও কারণ স্বরূপতঃ ভিন্নাভিন্ন।

পুনরায়, কার্যের দিক্ থেকে, কার্য কারণ থেকে ধর্মতঃ অভিন্ন, যেহেতু কারণাত্মক কার্যে কারণের স্বভাবগত মূলীভূত সাধারণ ধর্ম নিশ্চয়ই বিলসিত হয়—যথা, মৃন্ময় ঘটে মৃত্তিকার কোমলতা শীতলতা কৃষ্ণতা প্রভৃতি ধর্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও কার্য কারণ থেকে ধর্মতঃ ভিন্নও সমভাবে—যেহেতু কার্যের বিশেষ গুণ কারণে বা অন্যান্য কার্যে নেই। যেমন, ঘটের ঘটরূপ স্বভাবজাত সমস্ত বিশেষ ধর্ম (যথা, ডিম্বাকৃতি) ও কর্ম (যথা, জলাহরণাদি) কেবল ঘটেই বিদ্যমান, পিণ্ডেও নয়, অন্যান্য মৃন্ময় দ্রব্যাদিতেও নয়। এরূপে কার্যের দিক্ থেকে কার্য ও কারণ ধর্মতও ভিন্নাভিন্ন।

সেজন্য, কার্যের দিক্ থেকে কার্য ও কারণ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ- উভয়তই ভিন্নাভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, কারণের দিক্ থেকেও, কারণ কার্য থেকে স্বরূপতঃ অভিন্ন, যেহেতু কারণই কার্যে পরিণত হয় ও নিহিত থাকে ব'লে কারণের স্বরূপই কার্যেরও স্বরূপ—মৃৎপিণ্ডের মৃৎস্বরূপ মৃন্ময় ঘটেরও মৃৎস্বরূপ। কিন্তু কারণ কার্য থেকে ভিন্নও নিশ্চয়, যেহেতু কারণ কার্যা-তিরিক্ত—কার্যকে, কার্যের স্বরূপ বা সত্তাকে অতিক্রম ক'রেও স্বীয় স্বরূপে, স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে, স্বীয় মহিমায় বিদ্যমান। সেজন্য কারণের দিক্ থেকেও কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ ভিন্নাভিন্ন।

পুনরায়, কারণের দিক্ থেকেও কারণ ও কার্য যে গুণতও ভিন্নাভিন্ন, তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এরূপে, কারণের দিক্ থেকেও কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ ও গুণতঃ—উভয়তই ভিন্নাভিন্ন।

কারণস্বরূপ ব্রহ্ম ও কার্যস্বরূপ জীব-জগতের মধ্যেও রয়েছে সেই একই সম্বন্ধ। প্রথমতঃ, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন—যেহেতু জীব-জগৎ ব্রহ্মপরিণামরূপে ব্রহ্মাত্মক বা ব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ তিনটি স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে তিনটি স্বতন্ত্র নিজস্ব স্বরূপ বা সত্তা-বিশিষ্ট ভিন্নবস্তু—ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব, জীবের জীবত্ব ও জগতের জগৎ-ত্ব পরস্পর ভিন্ন—ব্রহ্ম ব্রহ্মই, জীবও নন, জগৎও নন; জীব জীবই, ব্রহ্মও নয়, জগৎও নয়; জগৎ জগৎই, ব্রহ্মও নয়, জীবও নয়। অতএব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ ভিন্নাভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মতও ব্রহ্ম এবং জীব-জগৎ ভিন্নাভিন্ন। জীব-জগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য ও

নিত্য। পুনরায়, জীব ব্রহ্মেরই ন্যায় চিন্ময় ও আনন্দময়, জ্ঞাতা ও কর্তা প্রভৃতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রহ্মের সকল গুণ ও শক্তি জীব-জগতে নেই—যথা, বিভুত্বগুণ, জগৎসৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি; এবং জীব-জগতের সকল গুণ-শক্তিও ব্রহ্মে নেই—যথা, জীবের অণুত্বগুণ, সকাম কর্ম ও ফলভোগ ইত্যাদি; জগতের জড়ত্ব, অশুদ্ধত্ব ইত্যাদি। অতএব, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ ধর্মতও ভিন্নাভিন্ন।

এরূপে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ—উভয়তই ভিন্নাভিন্ন।

অতএব, নিম্বার্কের মতে 'ভেদ' ও 'অভেদ' সমভাবে নিত্য সত্য স্বাভাবিক ও অবিরুদ্ধ এবং 'ভেদ' ও 'অভেদে'র উপরি-উক্ত অর্থ গ্রহণ করলে তাদের সহাবস্থিতি অযৌক্তিক হয় না। এরূপে, এক্ষেত্রে, 'ভেদে'র অর্থ, কার্যের দিক্ থেকে, স্বরূপতঃ ও গুণতঃ—উভয়তই প্রভেদ; 'ভেদে'র অর্থ, কারণের দিক্ থেকে, স্বরূপতঃ ও গুণতঃ—উভয়তই প্রভেদ, এবং কার্যাতিরিক্ততা (Transcendence)। পুনরায়, 'অভেদে'র অর্থ, কার্যের দিক্ থেকে, স্বরূপতঃ ও গুণতঃ—উভয়তই অভেদ, এবং কারণাত্মকতা ও কারণাশ্রয়িত্ব; 'অভেদে'র অর্থ, কারণের দিক্ থেকে, স্বরূপতঃ ও গুণতঃ—উভয়তই অভেদ, এবং কার্যলীনতা (Immanence)।

সেজন্য নিম্বার্কের মতবাদের সুষ্ঠু সুন্দর সুযোগ্য নাম হ'ল—'স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদ'। রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে'র সঙ্গে এর মূলীভূত প্রভেদ এই যে, আমরা যা পূর্বেই দেখেছি, রামানুজের মতে, 'ভেদ' ও 'অভেদ' উভয়ই সত্য হলেও, সমভাবে সত্য নয়; শেষ পর্যন্ত, 'অভেদ'ই হয়ে দাঁড়াচ্ছে অধিকতর সত্য। পুনরায় জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম থেকে কেবল অভিন্ন; গুণতঃ কেবল ভিন্ন। কিন্তু নিম্বার্কের মতে 'ভেদ' ও 'অভেদ' সমভাবে সত্য। পুনরায়, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ স্বরূপতঃ কেবল অভিন্ন নয়, ভিন্নাভিন্ন; গুণতও কেবল ভিন্ন নয়, ভিন্নাভিন্ন।

আরেকটি প্রভেদ এই যে রামানুজ-বেদান্তে ব্রহ্মকে দ্রব্য বা বিশেষ্য, এবং জীব-জগৎকে গুণ বা বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু নিম্বার্ক-সম্প্রদায় এই মতবাদ অগ্রাহ্য করেছেন। কারণ, বিশেষণের কার্যই হল বিশেষ্য থেকে অপরাপর বস্তুর পার্থক্য নির্দেশ করা। যেমন নীলোৎপলের 'নীলত্ব' নীলোৎপলকে শ্বেতোৎপল প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক্ করে। সেজন্য, চিৎ ও অচিৎ যদি ব্রহ্মের বিশেষণ হয়, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও নিশ্চয় বলতে হবে যে, তারা বিশেষণরূপে বিশেষ্য ব্রহ্মকে অন্যান্য বস্তু থেকে পৃথক্ করে—যা একেবারেই অসম্ভব, যেহেতু ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।২।১) ব'লে তাঁর চিৎ-অচিৎ-রূপ স্বগতভেদ ব্যতীত অন্য কোনো সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদই নেই—অর্থাৎ এরূপ আর কোনো সমশ্রেণীর, অথবা, ভিন্নশ্রেণীর বস্তুই নেই যা থেকে ব্রহ্মকে পৃথক্ করা যায়। সেজন্য, চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের বিশেষণ হ'তে পারে না।

রামানুজের আরেকটি প্রিয় শরীর-শরীরী অথবা দেহ-আত্মার উদাহরণও নিম্বার্ক-সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নি। নিম্বার্ক-বেদান্তের প্রিয় উদাহরণ হ'ল—কারণ-কার্য, শক্তিমান্-শক্তি এবং অংশী-অংশের উদাহরণত্রয়। কারণ, এই সকল ক্ষেত্রেই, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে স্বরূপতঃ ও গুণতঃ—উভয়তই ভেদাভেদ সম্বন্ধের সুন্দর ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এরূপে, আপাতদৃষ্টিতে নীরব-নিরীহ ভাবে এক পার্শ্বে অবস্থান করেও নিম্বার্ক ক'রে গেলেন বেদান্তের সুসমৃদ্ধ ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সোনার দান; ক'রে গেলেন একটি স্বতন্ত্র অভিনব

বেদান্ত-সম্প্রদায়ের সুদৃঢ় পত্তন; ক'রে গেলেন কোটি কোটি প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ ও ভক্তজনের প্রাণে শান্তিবারি বর্ষণ—যাঁরা একদিকে ব্রহ্ম অথবা শ্রীভগবানের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হ'তে আকুল, তাঁর সঙ্গে কোনোরূপ ভেদ না রেখে; অথচ নিজেদের স্বতন্ত্র স্বরূপ বা ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতেও অনিচ্ছুক—প্রাজ্ঞ অনিচ্ছুক, যেহেতু জ্ঞানের গরিমায় পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল, পূর্ণ শক্তিমান্ জন তিনি—তিনি কেন চাইবেন সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এইভাবে নিজেকে অন্যের মধ্যে একেবারে নিঃশেষে বিলীন-বিলুপ্ত ক'রে দিতে—হোন না তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম—এরূপ অবস্থার অপেক্ষা 'বনে শৃগালত্বমপি বরম্'—বনে গিয়ে শৃগাল হয়ে থাকাও ভালো! পুনরায়, ভক্তও কামনা করেন প্রাণের ঠাকুরকে সর্বপ্রাণমন-জীবন দিয়ে নিজের সঙ্গে এক ক'রে নিতে, অথচ তিনিও চান না নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাকে ব্রহ্ম-সত্তায় সম্পূর্ণ এক ক'রে দিতে; কারণ, সেক্ষেত্রে ত তিনি আর তাঁর প্রিয়তম জনকে আরাধনা করতে পারবেন না,—আরাধ্য ও ও আরাধক যদি এক ও অভিন্ন হয়ে যান—তবে কে কাকে আরাধনা করবেন? সেজন্য, ভক্ত সাশ্রুনয়নে বলেন—মুক্তির অর্থ যদি শ্রীভগবানের সঙ্গে একত্ব হয়, তা হ'লে আমি তা একেবারেই চাই না—বরং বদ্ধ থেকেও আমি যেন তাঁর আরাধনাই ক'রে যেতে পারি চিরকাল। এই পরম বাণীই ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে সুমধুর ভক্তকণ্ঠে যুগে যুগে—

'(আমার) মুক্তি নিয়ে কি হবে মা,
আমি তোরে চাই।
স্বর্গ আমি চাই না মাগো,
কোল যদি তোর পাই॥
(মা) কি হবে সে মুক্তি নিয়ে
কি হবে সে স্বর্গে গিয়ে
যেথায় গিয়ে তোকে ডাকার
আর প্রয়োজন নাই॥'

(কাজী নজরুল—'রাঙাজবা' ৪৯)

একাধারে প্রাজ্ঞজন ও ভক্তজনের যে একই সমস্যা—বিভিন্ন দিক্ থেকে—অর্থাৎ 'ভেদ' ও 'অভেদ'কে সমান মর্যাদায় রেখে তাদের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সমন্বয়-সামঞ্জস্য বিধান করা—সেই মূলীভূত সমস্যার প্রথম প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট সমাধান করতে সমর্থ হলেন 'স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী' একমাত্র নিম্বার্ক। তিনি ছিলেন—'strong uncompromising Individualism'-এর শ্রেষ্ঠ হোতা—বলিষ্ঠ অনমনীয় 'ব্যক্তিত্ববাদে'র মহান্ প্রবক্তা এবং সেই দিক্ থেকে অতি আধুনিক। ব্রহ্মের দিক্ থেকে আমরা ব্রহ্ম, জীবের দিক্ থেকে জীব—এবং ব্রহ্মত্ব ও জীবত্ব, অদ্বৈত ও দ্বৈত, অভেদ ও ভেদ এইভাবে একত্রে সমন্বিত হয়ে একাধারে স্বর্গের মন্দাকিনী-ধারার ও মর্ত্যের ভাগীরথী-ধারার মহাসঙ্গম ঘটিয়েছে মানবজীবনে। কি পরম সৌভাগ্য আমাদের! এতে কিন্তু অযৌক্তিকতা কিছু নেই, অবোধ্যতা কিছু নেই, অসঙ্গতি কিছু নেই—কারণ, 'ভেদ' ও 'অভেদে'র এরূপ অত্যাশ্চর্য, অথচ অনিবার্য, সমন্বয়ই ত জীবনমন্ত্র জীবনরহস্য জীবনসার্থকতা। পৃথিবীতে সর্বত্রই এরূপ 'ভেদ' ও 'অভেদে'র সমন্বিত লীলা-খেলা—মূল থেকে ফুটে উঠেছে ফুলটি—মূলছাড়া ফুল কোথায়? অথচ ফুল ফুলই—মূলও নয়, কাণ্ডও নয়, শাখাও নয়, প্রশাখাও নয়, পত্রও নয়, ফলও নয়—ফুল একমাত্র ফুলই—তার অতি নিজস্ব সৌন্দর্যে মাধুর্যে সৌরভে মধুতে—সে একমাত্র ফুলই। একই ভাবে—নিম্বার্ক বলছেন, জীবন-শতদলকে নিঃশেষে নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে সমর্পণ ক'রে দাও শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-শতদলে; কিন্তু কোনোক্রমেই মিশিয়ে দিও না তাতে—বরং দুটি শতদলই প্রস্ফুটিত হয়ে থাক একত্রে

সমন্বিত ভাবে পাশাপাশি, একত্রে, সমন্বিত ভাবে করুক অম্লান রং বিকিরণ শতদিকে, একত্রে সমন্বিত ভাবে করুক অনন্ত সৌরভ বিতরণ শতদিকে, একত্রে সমন্বিত ভাবে করুক অফুরন্ত মধু সিঞ্চন শতদিকে। মর্ত্যধাম ত তবে হয়ে উঠবে ব্রহ্মধাম—আর কি প্রয়োজন আমাদের ?

মোক্ষের দিক্ থেকেও নিম্বার্কের মতবাদ রামানুজের সমতুল। নিম্বার্কের মতেও মোক্ষ জীবের স্বরূপবিনাশ নয়, স্বরূপবিকাশ ; মুক্তজীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন, অর্থাৎ, ব্রহ্মসদৃশ ; মুক্তজীব অণুপরিমাণ এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সংঘটনরূপ-শক্তিবিহীন—এবং শেষোক্ত এই দুটি দিক্ থেকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। মুক্তি অনন্ত অসীম আনন্দরসঘন মহাবস্থা। রামানুজের ন্যায় নিম্বার্কও বিদেহমুক্তিবাদী।

সাধনের দিক্ থেকে রামানুজ-বেদান্ত ও নিম্বার্ক-বেদান্তে কোনোরূপ ভেদ নেই—যেহেতু উভয় আচার্যই জ্ঞানবাদী নন, ভক্তিবাদী। কিন্তু আমরা উপরে দেখেছি যে, রামানুজীয় ভক্তি জ্ঞানেরই নামান্তরমাত্র ; এবং রামানুজ 'বেদন' 'ভক্তি' 'উপাসনা' 'ধ্যান' প্রভৃতি শব্দকে সমার্থক ব'লে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নিম্বার্ক-বেদান্তেই আমরা প্রথম ভক্তির মধুর মোহন আস্বাদ লাভ করি। এই ভক্তি জ্ঞানমূলক, কিন্তু জ্ঞান নয় ; ভাব, কিন্তু ভাবনা নয় ; আবেগোচ্ছ্বাস, কিন্তু শুষ্ক পাণ্ডিত্য নয় ; মধুর উপলব্ধি, কিন্তু শূন্য বিচার নয়। আমাদের সাধনতত্ত্বে দ্বিবিধা ভক্তির কথা উল্লিখিত আছে—ঐশ্বর্যপ্রধানা ভক্তি এবং মাধুর্যপ্রধানা ভক্তি। প্রথমটির ভিত্তি ব্রহ্মের ভীষণ রূপ, দ্বিতীয়টির ভিত্তি ব্রহ্মের মধুর রূপ। বস্তুতঃ ব্রহ্মকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি দুদিক থেকে—প্রচণ্ড প্রতাপশালী সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা ধ্বংসকর্তা ধারক বাহক চালক ও শাসকরূপে এবং এই দিক্ থেকে তিনি প্রধানতঃ শ্রদ্ধা সম্ভ্রম ও ভীতির পাত্র ; অপর দিকে তিনি আমাদের অতি প্রিয় জন, অতি নিজ জন, অতি নিকট জন ; আমাদের প্রিয়তম সখা, নিকটতম সহায়, নিজতম প্রাণের ধন। এরূপে, আমরা যখন পরমেশ্বরের ভীষণ রূপের কথা ভাবি, তখন তাঁর সম্পর্কে আমাদের হয় প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, গভীর সম্ভ্রম, নিগূঢ় ভীতি—এইটি হ'ল 'ঐশ্বর্যপ্রধানা ভক্তি'। পুনরায়, আমরা যখন পরমেশ্বরের মধুর রূপের কথা ভাবি, তখন তাঁর সম্পর্কে আমাদের হয় অনিন্দ্যতম আনন্দ, প্রসন্নতম প্রীতি, মধুরতম মৈত্রী—এইটি হ'ল 'মাধুর্যপ্রধানা ভক্তি'। বলাই বাহুল্য যে, শ্রদ্ধা থেকে ভক্তিতে, ভীতি থেকে প্রীতিতে, বাহির থেকে অন্তরে, দূর থেকে নিকটে উপনীত হওয়া-তেই ত 'ধর্মে'র জয়যাত্রা এবং এই জয়যাত্রার পুরোধা ভক্তশ্রেষ্ঠ নিম্বার্ক আমাদের চিরবন্দ্য।

কোনো দার্শনিক মতবাদই সম্পূর্ণরূপে ত্রুটি-বিচ্যুতি-বিমুক্ত নয়। নিম্বার্ক-দর্শনও সেজন্য সকল সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। বিশেষ ক'রে 'ভেদ' ও 'অভেদ'কে সত্যই এইভাবে সমন্বিত করা যায় কিনা, স্ববিরোধ-দোষের সৃষ্টি না ক'রে—তা সত্যই গভীর চিন্তার বিষয়। তা সত্ত্বেও দর্শন-ধর্ম-নীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে নিম্বার্ক-বেদান্তের যে শ্রেষ্ঠ দান—সাম্য সমন্বয় সামঞ্জস্য সংহতি—তার মহিমা গরিমা মধুরিমা আমাদের মুগ্ধ চমৎকৃত ও তৃপ্ত না ক'রে পারে না

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অনুপম ভাবে ভারতা-ত্মার মর্মোত্থ। অমৃতরসঘনা বাণী রণিত করেছেন—'বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ...এই ঐক্য-সাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দূরে রাখিবার পক্ষে নহে—ভারতবর্ষ

সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলকেই স্বস্বপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধান-সঙ্কুল পৃথিবীর সম্মুখে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।'

(রবীন্দ্রনাথ: 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ, 'আত্মশক্তি' গ্রন্থ)।

সাম্যৈক্য-ভূমি পরম পুণ্যধাম ভারতবর্ষের শাশ্বতী সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক; তাদেরই প্রাণপ্রতিম সাম্য-ঐক্য-প্রীতি-মৈত্রী-ত্যাগ-সেবার জীবন্ত-জ্বলন্ত বিগ্রহ; পুণ্যশ্লোক ধন্যজীবন অনন্যচরিত্র স্থিতপ্রজ্ঞ নিম্বার্কাচার্যকে শত-সহস্র-কোটি প্রণাম!

কয়েকটি সংক্রামক ব্যাধি

ডক্টর সত্যপ্রকাশ দে*

যে সকল ব্যাধি কোনও রোগীর দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তিদের দেহে সংক্রামিত হয়, তাহাদের সংক্রামক ব্যাধি বলে। সাধারণ লোকে ইহাদের 'ছোঁয়াচে রোগ' বলিয়া থাকে। পূর্বে একটি প্রবন্ধে[১] রোগের কারণ বিশ্লেষণে জীবাণু (bacteria) অথবা অণুজীবাণু (virus) ঘটিত ব্যাধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সংক্রামক ব্যাধি সর্বক্ষেত্রে জীবাণু অথবা অণুজীবাণু দ্বারা ঘটিয়া থাকে। সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু বা অণুজীবাণু নানাভাবে এক ব্যক্তি হইতে অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। মল মূত্র থুথু অথবা শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত এইসব রোগের জীবাণু বা অণুজীবাণু রোগগ্রস্ত শরীরের বাহিরে আসিয়া সুস্থ ব্যক্তিকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে যথেষ্ট পারিমাণ প্রতিরোধ-ক্ষমতা (resistance) না থাকিলে জীবাণু বা অণুজীবাণুকে দমন করা সম্ভব হয় না; ফলে দেহের ভিতর তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এই ক্রমবৃদ্ধির ফলে দেহের কোন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রোগের উপসর্গগুলি প্রকাশ পায়। আমাশয় কলেরা টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জীবাণু মলের সহিত, যক্ষ্মা ডিপথিরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা বসন্ত প্রভৃতি রোগের জীবাণু অথবা অণুজীবাণু কফ থুথু ইত্যাদির সহিত বহির্গমন করিয়া রোগের প্রসার করে। সতর্কতা অবলম্বন না করিলে ব্যাধি এইভাবে ক্রমশঃ জনগণের মধ্যে চলিতে থাকে এবং পরিশেষে মহামারীর আকার ধারণ করে। জীবাণু অথবা অণুজীবাণু কোন শরীরে প্রবেশের পরে তৎক্ষণাৎ রোগের উপসর্গ প্রকাশ পায় না। সাধারণতঃ কয়েকদিনের ব্যবধানের পর উপসর্গগুলি দেখা দিতে আরম্ভ করে। সময়ের এই ব্যবধান রোগবিশেষে ভিন্ন হয়। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহাকে 'ইনকিউবেসন সময়' (incubation period) বলা হয়। কয়েকটি রোগের ইনকিউবেসন সময়ের তালিকা দেওয়া হইল:

পানিবসন্ত (chickenpox)	১৪—২১ দিন
গুটিবসন্ত (smallpox)	১১—১৪ "

* প্রাক্তন জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌, কেন্দ্রীয় ভেষজ পরীক্ষাগার, কলিকাতা; ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান গবেষণা-সংস্থা, কলিকাতা; হাফ্‌কিন ইন্‌স্টিটিউট, বম্বে; ভারতীয় বিজ্ঞান-সংস্থা, ব্যাঙ্গালোর।

১ 'অদৃশ্য জগতের রহস্য'—উদ্বোধন, ৭৬।১৬৬-৭২

টাইফয়েড (typhoid)	১০—১৪	দিন
কলেরা (cholera)	১—৩	"
হাম (measles)	১২—১৯	"
ডিপথিরিয়া (diphtheria)	২—৫	"
ঘুংড়ি কাশি (whooping cough)	৭—১৪	"
পোলিওমায়েলাইটিস (Poliomyelitis)	৬—৯	"
ইনফ্লুয়েঞ্জা (influenza)	১—২	"

যদিও সাধারণভাবে সংক্রামক ব্যাধি যে কোন সুস্থ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে, তথাপি কয়েকটি রোগ শৈশবে অথবা বাল্যকালে অধিক দেখা যায়। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে শরীরে জীবাণুর আক্রমণ-প্রতিরোধের ক্ষমতার বৃদ্ধি হওয়ার দরুন প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই রোগগুলি সাধারণতঃ দেখা যায় না। শৈশবে অথবা বাল্যকালে সচরাচর যে ব্যাধিগুলি দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে হাম ডিপথিরিয়া ঘুংড়ি কাশি এবং পোলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশুর জন্মের পর প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে এই ব্যাধিগুলির প্রাদুর্ভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। ঋতুবিশেষেও এই সকল রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শিশুর জন্মের পর প্রথম ছয় মাসের মধ্যে এই রোগগুলির প্রতিষেধক টিকা দেওয়া একান্ত কর্তব্য। মায়ের রক্তে যে সকল রোগের প্রতিরোধ-ক্ষমতা থাকে, নবজাত শিশুও উত্তরাধিকারসূত্রে তাহার অনেকটা পায় বলিয়া প্রথম তিনমাস শিশুকে টিকা না দিলেও চলে।

এইবার উপরোক্ত এই-জাতীয় ব্যাধিগুলির আলোচনা করা হইবে। রোগের প্রথম দিকে অথবা পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করিলে বহু শিশুকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করা সম্ভব।

(১) হাম

প্রায় সকল দেশেই শিশুকে প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে এই রোগের সম্মুখীন হইতে হয়। এই রোগ অণুজীবাণুঘটিত। একবার এই ব্যাধি হইলে সাধারণতঃ দ্বিতীয়বার ইহা হয় না, যদিও অল্প কয়েকক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। যে কোন হামরোগাক্রান্ত শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস অথবা মুখের লালা হাওয়ার মাধ্যমে বা অন্য ভাবে (যেমন রোগীর ব্যবহৃত বিছানা বা থালা-বাসনের মাধ্যমে) অপর কোন সুস্থ শিশুর শরীরে প্রবেশ করিতে পারে এবং এইভাবে রোগের বিস্তার ঘটাইতে পারে। সুতরাং কোন শিশুর হাম হইলে তাহাকে পৃথক করিয়া রাখা কর্তব্য এবং যাঁহারা রোগীর পরিচর্যা করেন, তাঁহাদেরও কোন সুস্থ শিশুর সংস্পর্শে আসা উচিত নয়। কিন্তু মুস্কিল ইহাই যে, আক্রান্ত শিশুর রোগের লক্ষণ দেখা দিবার পূর্বেই তাহার লালাতে হামের অণুজীবাণু আসিয়া যায় এবং কোনরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবার পূর্বেই সে অন্য শিশুকে আক্রান্ত করে। প্রথমে জ্বর হয়—শরীরের তাপমাত্রা ১০২°-১০৪° (ডিগ্রি) অথবা তাহার অধিকও হইতে পারে। শিশুর মেজাজ খিটখিটে হয়, আহারে রুচি হ্রাস পায়, নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, চোখ দিয়া জল পড়িতে পারে অথবা চোখ ঈষৎ রক্তাভ হইতে পারে। এই সময় অর্থাৎ রোগের গোড়ার দিকে পরীক্ষা করিলে মুখের ভিতরে, গালের ভিতরের চামড়ায় ছোট শ্বেতাভ স্ফোটক (eruption) দেখা যায়, ইহাদের 'কপ্‌লিক্ স্পট্' (Koplick spot) বলে। জ্বর অধিক হইলে 'তড়কা' (convulsion) হইতে পারে। জ্বরের ৩-৪ দিন পরে শরীরের বাহিরের চামড়ায় প্রথম রক্তাভ স্ফোটক (rash) দেখা দিতে আরম্ভ করে এবং জ্বরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। প্রথমে কপালে, কানের পাশে, ঘাড়ে, পরে বুকে, পিঠে এবং পরিশেষে হাতে, পায়ে অর্থাৎ প্রায় সারা দেহে ক্ষুদ্র আকারের রক্তাভ স্ফোটকগুলি

প্রকাশ পায়।

এই সময় জ্বরের মাত্রা পুনরায় বৃদ্ধি পায়। বুকে সর্দি, নাকে জল ও চোখের শ্বেত অংশ রক্তাভ হয় এবং বহুক্ষেত্রে পেটের গোলমাল হইতে পারে। ইহার প্রায় ৩-৪ দিন পরে পুনরায় জ্বরের মাত্রা হ্রাস পায় অথবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়, রক্তাভ স্ফোটকগুলিও ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে আরম্ভ করে। বুকে সর্দি বসা ও চোখের প্রদাহের প্রতি বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন এবং চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা কর্তব্য। শিশুর হাম উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং প্রথম অবস্থা হইতে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সুখের বিষয়, এই রোগের ভাল টিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে প্রায় প্রতি শিশুকেই এই টিকা দেওয়ার ফলে ঐ সব দেশে হামের ভীষণতা অনেক কমিয়া গিয়াছে। বয়স্ক লোকদের রক্তে সাধারণতঃ হামের প্রতিরোধ-ক্ষমতা থাকে। তাহাদের রক্ত হইতে তৈয়ারী গ্লোবিউলিন (globulin) যদি কোন টিকা-না-নেওয়া শিশুকে ইঞ্জেকসন দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে কিছু-দিনের জন্য আসন্ন হাম হইতে রক্ষা পায়। এদেশে গ্লোবিউলিন তৈয়ারী হয় এবং টিকা তৈয়ারী করার ব্যবস্থাও শীঘ্রই হইতেছে।

(২) ঘুংড়ি কাশি

এই বিশেষ ধরনের কাশি শৈশবে অথবা বাল্যকালে, জন্মের কয়েকমাস পর হইতে ৭-৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত হইতে পারে। জীবাণুঘটিত এই ব্যাধিও হামের মতোই মুখের লালা, নাসিকার নিঃসৃত শ্লেষ্মা ইত্যাদির দ্বারা সঞ্চারিত হয়। সুস্থ শরীরে জীবাণু প্রবেশের পর কয়েকদিনের মধ্যে প্রথমে সাধারণভাবে অল্প কাশি, সর্দি এবং কয়েকক্ষেত্রে সামান্য জ্বর দেখা দিতে পারে, তখন কাশির 'টান' থাকে না; সপ্তাহখানেক পরে ক্রমশঃ 'টান' আরম্ভ হয়। তখন কাশির বেগ প্রবল হয়, এবং কয়েক মিনিট ক্রমান্বয়ে এইভাবে কাশির পর শিশু একটি লম্বা শ্বাস টানে। এই লম্বা শ্বাস টানার সময় যে শব্দের সংযোগ (whoop) শোনা যায় তাহা যে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি শুনিলেই রোগটি হুপিং কাশি বলিয়া সহজেই নির্ণয় করিতে পারেন। কাশির বেগ বৃদ্ধির ফলে কাশির সময় শিশু প্রায় নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং শ্বাস রোধ হওয়ার ফলে মুখ নীলাভ হয়। লম্বা শ্বাস টানার পর শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস পুনরায় স্বাভাবিক হয়। সাধারণতঃ ৩।৪ সপ্তাহ কাশির প্রবলতা থাকে, পরে ক্রমশঃ বেগ হ্রাস পায় এবং আরো ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়। যদিও প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে না তবু এই কাশি বড় যাতনাদায়ক। ক্রমাগত কাশির ফলে এবং আহারের পর বমি হওয়ার দরুন শিশুর পুষ্টির ক্ষতি হয়। কাশির বেগে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এবং শিশুর মেজাজ খিটখিটে হইয়া যায়। যদি অত্যধিক বমি হয়, আহার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধেয়। একসঙ্গে অধিক আহারের পরিবর্তে অল্প মাত্রায় অধিকবার খাওয়াইতে হইবে। কাশির প্রবলতা হ্রাসের জন্য ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলে শিশুর নিদ্রারও সুবিধা হয়।

সৌভাগ্যবশতঃ এই ব্যাধির প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা আছে। এই টিকার সহিত ডিপথিরিয়া (diphtheria) ও ধনুষ্টঙ্কার (tetanus) রোগের প্রতিষেধক (toxoid) মিশান থাকার দরুন সমবেত এই তিনটি ইঞ্জেকসনকে ট্রিপ্‌ল এন্টিজেন (triple antigen) টিকা বলা হয়। শিশুর তিন হইতে ছয় মাস বয়সের মধ্যে এই টিকা দিলে শিশুকে এই

রোগের প্রকোপ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হয়। কয়েক সপ্তাহ ব্যবধানে তিন মাত্রায় এই টিকা দেওয়া হয়।

(৩) ডিপথিরিয়া

ইহা একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। রোগের প্রথমাবস্থায় রোগ নির্ণয় করিতে না পারিলে অথবা চিকিৎসা শুরু করা না হইলে শিশুর প্রাণের আশঙ্কা থাকে। মায়ের নিকট হইতে শিশু খানিকটা প্রতিরোধ-ক্ষমতা পায় বলিয়া জন্মের প্রথম দুই-এক মাস এই রোগ বড় একটা হয় না। পরে দেহে এই প্রতিরোধ-ক্ষমতার মাত্রা যখন হ্রাস পায়, তখন যে কোন সময়ে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে পারে। সমীক্ষায় প্রথম ৫।৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব সর্বাধিক দেখা যায়; পরে বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণভাবে শরীরের প্রতিরোধ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় রোগের আক্রমণ হ্রাস পায়। সুস্থ শিশু যদি কোন রোগীর অথবা যাহারা রোগীর পরিচর্যায় নিযুক্ত, তাহাদের সংস্পর্শে আসে, তবে তাহাদের দ্বারা বাহিত জীবাণু তাহার সুস্থ দেহে প্রবেশ করিতে পারে। এই রোগের জীবাণু শ্বাস-প্রশ্বাস ও কাশির শ্লেষ্মার সহিত এক ব্যক্তি হইতে অপরে সংক্রামিত হয়। যে বাড়ীতে এই রোগ হয়, সে বাড়ীর অন্য শিশুদেরও প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। এই রোগের ইনকিউবেসন সময় খুবই অল্প, সুতরাং ছোঁয়াচ লাগার কয়েক দিনের মধ্যে রোগের প্রথম উপসর্গ দেখা দেয়। এই রোগে ঘায়ের সৃষ্টি হয় এবং ঘায়ের উপর ধূসর বর্ণের একটি ঝিল্লী (membrane) পড়ে। আক্রমণের স্থান বিশেষে এই রোগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়:

(ক) গলবিল-সংক্রান্ত (pharyngeal)

(খ) স্বরযন্ত্র-সংক্রান্ত (laryngeal)

(গ) নাসিকার অভ্যন্তর-সংক্রান্ত (nasal)

উপরি-উক্ত তিন স্থান অনুসারে রোগের লক্ষণের তারতম্য হয়। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রথমে জ্বর ও অল্প কাশি হয় এবং আহারের সময় ঢোক গিলিতে অসুবিধা হয়, ফলে বহুক্ষেত্রে বমি হইতে পারে। নাসিকার অভ্যন্তরের প্রদাহে কণ্ঠস্বরে নাকী সুর ও স্বরযন্ত্রের প্রদাহে কণ্ঠস্বর কর্কশ অথবা স্বরভঙ্গ হইতে পারে। ডিপথিরিয়া সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা শুরু না করিলে ক্রমশঃ শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় ও পরিশেষে শ্বাসরোধ হওয়ার ফলে মৃত্যু হয়। শ্বাসরোধ-জনিত মৃত্যু এড়াইবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে রোগীর কণ্ঠনালীতে ছিদ্র করিয়া শ্বাসগ্রহণের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। রোগের প্রারম্ভে যথেষ্ট পরিমাণ ডিপথিরিয়া-প্রতিষেধক সিরাম (antitoxin ও এন্টিবায়োটিক-জাতীয় ঔষধ দিলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ব্যাধি দমন করা যায়। সুচিকিৎসার ফলে রোগমুক্তির পরেও কয়েক সপ্তাহ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কারণ, এই সময় কয়েক প্রকার জটিল উপসর্গের সৃষ্টি হইতে পারে। স্নায়ু ও হৃদ্‌যন্ত্রের মাংসপেশীর দৌর্বল্যবশতঃ শরীরের স্থান বিশেষে পক্ষাঘাত অথবা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আকস্মিক মৃত্যু হইতে পারে। রোগ-নিরাময়ের পরে অন্ততঃ আরো কয়েক সপ্তাহ শিশুকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখা প্রয়োজন; ক্রমে ধীরে ধীরে বসাইতে হইবে। এই সময় আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন—যাহাতে শরীরের পুষ্টি হয় সেজন্য পুষ্টিকর আহার ও ভিটামিন-জাতীয় ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) পোলিওমায়েলাইটিস

সম্প্রতি আমাদের দেশে এই রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষভাবে শিশুদেরই এই রোগ হয়, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে বয়স্কদেরও এই রোগ হইতে দেখা যায়।

পোলিও অণুজীবাণু-ঘটিত ব্যাধি এবং এই অণুজীবাণুগুলি অন্ত্রে বাসা বাঁধিয়া রোগ সৃষ্টি করে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মলে থাকা অণুজীবাণুগুলি খাদ্য বা পানীয়ের সহিত অপরের শরীরে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ শরীরে প্রবেশ করিবার সাত-আট দিন পরে রোগের প্রথম উপসর্গগুলি দেখা দেয়। অল্প জ্বর, মাথাধরা অথবা মাথায় যন্ত্রণা, পরে ক্রমশঃ ঘাড়ে ও শিরদাঁড়ায় ব্যথা ও বহুক্ষেত্রে বমি হইতে দেখা যায়। এই সময়ে সঠিক রোগনির্ণয় করা কঠিন। পরে ক্রমে যখন স্নায়ুজনিত উপসর্গগুলি আরম্ভ হয়, তখন চিকিৎসক পোলিও সম্বন্ধে সচেতন হন। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অথবা শিরদাঁড়ার স্নায়ুমণ্ডলীর স্থানবিশেষ অণুজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দরুন কয়েক প্রকার বিশেষ উপসর্গের সৃষ্টি হয়। মাথার যন্ত্রণা-বৃদ্ধি, আলোর দিকে চাহিতে অসুবিধা (photophobia) ক্রমে অঙ্গবিশেষের পেশীর শৈথিল্যের দরুন যন্ত্রণা ও পরে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ছাড়িয়া যায়। অণুজীবাণুগুলি স্নায়ুমণ্ডলীর কোন্ স্থান আক্রমণ করিবে, তাহার উপরই রোগের লক্ষণ নির্ভর করিবে। কাহারও কাহারও মুখের অভ্যন্তরের পেশীগুলির দৌর্বল্যে ঢোক গিলিতে অক্ষমতা অথবা কথা বলার অসুবিধা দেখা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের পেশীর পক্ষাঘাত হইলে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয় এবং উপসর্গগুলি বৃদ্ধি পাইলে শ্বাসরোধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। যে কোন হাতে বা পায়ে পক্ষাঘাত হইতে পারে। জ্বরের কয়েকদিনের মধ্যে শরীরের কোন অংশে অস্বাভাবিক দৌর্বল্য অথবা শৈথিল্য দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য।

রোগের প্রারম্ভেই সুচিকিৎসা (ফিসিওথেরাপি—physiotherapy) হইলে কিছু রোগী আরোগ্য লাভ করে, তবে অনেককেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া সারাজীবন অতিবাহিত করিতে হয়।

পূর্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এ রোগের কবল হইতে শিশুকে রক্ষা করা যায়। বর্তমানে প্রতিষেধক টিকার প্রচলন হইয়াছে। এই টিকা দুই প্রকার: (ক) মৃত অণুজীবাণু হইতে তৈয়ারী টিকা যাহাকে 'সল্ক' ভ্যাক্সিন (salk vaccine) বলে। ইহার ইঞ্জেকসন লইতে হয়। (খ) জীবন্ত, কিন্তু যাহার রোগ জন্মাইবার ক্ষমতা নষ্ট করা হইয়াছে, এইরূপ অণুজীবাণু হইতে তৈয়ারী টিকা। ইহা খাওয়ান হয়। এই শেষোক্ত টিকারই চলন বেশী। এই টিকা শিশুর প্রথম বৎসরে তিনবার খাওয়াইলে এই ব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। সহরাঞ্চলে যেখানে এই রোগের প্রকোপ অধিক দেখা যায়, সেখানে প্রত্যেক শিশুকেই এই রোগের প্রতিষেধক টিকা দেওয়া একান্ত কর্তব্য।

উপরোক্ত যে কয়টি বিশেষ সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, সেগুলি প্রধানতঃ শৈশবে অথবা বাল্যকালে দেখা যায়। এইবার আর কয়েকটি সাধারণ রোগ বিষয়ে কিছু জানা প্রয়োজন। এই ব্যাধিগুলি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক—উভয়কেই আক্রমণ করে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে ব্যাধিগুলির ব্যাপক প্রসার দেখা যায় সেগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু জানা প্রয়োজন। ইহাদের সাধারণ উপসর্গগুলি জানা থাকিলে প্রথম অবস্থায় রোগনির্ণয় সম্ভব হয়,

ফলে ঠিকমত চিকিৎসা করাইলে বহুক্ষেত্রে রোগনিরাময় সহজসাধ্য হয়। ইহা ব্যতীত প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ফলে সংক্রমণ রোধ করা যায় এবং সমাজকেও মহামারীর কবল হইতে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

(১) **বসন্ত** (পানিবসন্ত ও গুটিবসন্ত)

সাধারণতঃ শীতকালের শেষভাগে অথবা বসন্তকালের প্রারম্ভে দুই প্রকার বসন্তরোগেরই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকের জীবনে পানিবসন্ত হইতে দেখা যায়। পানিবসন্ত ও গুটিবসন্ত উভয় ব্যাধিই অণুজীবাণুঘটিত। দুইটি রোগের অণুজীবাণু পৃথক্, ফলে গুটিবসন্তের টিকা লইলে পানিবসন্ত প্রতিরোধ করা যায় না। গুটিবসন্ত ভয়াবহ ব্যাধি। ইহাতে নানা জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে; অন্ধত্ব এবং মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে। পানিবসন্ত যদিও কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করে, ইহার বিশেষ ক্ষতিকর উপসর্গ না থাকায় প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে না।

পানিবসন্ত

এই রোগে জ্বরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম গুটিগুলি (eruptions) দেখা দেয়। এই সময় শরীরের তাপ হ্রাস পায়। প্রথমে বুকে পিঠে, পরে বাহুতে ও মুখে বিশেষতঃ কপালে স্ফোটকগুলি বাহির হইতে আরম্ভ করে এবং দুই তিন দিনের মধ্যে সর্বাঙ্গে কমবেশী বিস্তার লাভ করে। গুটিগুলি চামড়ার উপরে প্রথমে জলভরা স্ফোটকের মত এবং পরে পুঁজ হওয়ার দরুন ঈষৎ হলদে রঙে পরিবর্তিত হয়। এই সময়ে শরীরের তাপমাত্রা ঈষৎ বৃদ্ধি পাইতে পারে, অল্প সর্দি কাশি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে এবং গা চুলকানির ন্যায় অস্বস্তিকর উপসর্গ দেখা দেয়। পাঁচ ছয় দিন পরে স্ফোটকগুলি শুখাইতে আরম্ভ করে, এবং সপ্তাহ খানেক পরে মামড়িগুলি দেহ হইতে খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। পানিবসন্ত মারাত্মক ব্যাধি নহে, গৃহের সাধারণ পরিচর্যা ও শুশ্রূষায় রোগী নিরাময় হয়। সাধারণতঃ গৃহে কাহারও এই ব্যাধি হইলে পূর্বে যাহাদের এই রোগ হয় নাই, তাহাদের মধ্যে রোগ দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। কারণ গায়ে স্ফোটক বাহির হইবার পূর্বেই রোগীর কাশি, হাঁচি ও থুথুর মাধ্যমে অণুজীবাণুগুলি অন্যকে আক্রমণ করিয়া ফেলে। অধিক বয়সে প্রথম এই রোগ হইলে উপসর্গগুলি, বিশেষতঃ জ্বরের প্রকোপ অধিক হইতে পারে। শিশুদের উপসর্গগুলি কিছু জটিল হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য। পানিবসন্তের ভাল প্রতিষেধক টিকা এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

গুটিবসন্ত

ইহা ভয়াবহ ও মারাত্মক ব্যাধি, সুতরাং পানিবসন্ত ও গুটিবসন্তের প্রধান প্রভেদগুলি জানা থাকিলে রোগের প্রথম হইতে সতর্ক হওয়া সম্ভবপর হয়। এই ব্যাধির প্রথম লক্ষণ পূর্বের ন্যায় জ্বর ও সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ কোমরে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা, কোন কোন রোগীর আলোর দিকে চাহিতে কষ্ট হয় (photophobia) ; কয়েক ক্ষেত্রে বমির লক্ষণ দেখা দিতে পারে। পানিবসন্তের তুলনায় শরীরের তাপমাত্রা অধিক বৃদ্ধি হয়। পানিবসন্তে জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই বা পরের দিন সাধারণতঃ প্রথম গুটি দেখা দেয়, গুটিবসন্তে জ্বরের তিন দিন পরে প্রধানতঃ প্রথম গুটিগুলি প্রকাশ পায়। পানিবসন্তে স্ফোটকগুলি মধ্যশরীরে (trunk) বেশী দেখা দেয়, মুখে হাতে পায়ে ও শরীরের অন্যান্য অংশে (limbs) অপেক্ষাকৃত কম দেখা দেয়। গুটিবসন্তে স্ফোটকগুলি হাতে পায়ে বা মুখে বুকে পেটে পিঠে ও শরীরের

অন্যান্য অংশে অপেক্ষাকৃত কম দেখা দেয়। গুটি-বসন্তের গুটিগুলি চামড়ার নীচে থাকার দরুন চামড়ার উপর হাত দিলে মটরদানার ন্যায় শক্ত বোধ হয়। যদিও গুটি বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের মাত্রা কিছু হ্রাস পায়, পরে যখন গুটির মধ্যে পুঁজ হইতে আরম্ভ হয় তখন তাপমাত্রার পুনরায় বৃদ্ধি হয়। গুটিবসন্তের গুটিগুলি সব একসঙ্গে বাহির হয় না বলিয়া অর্থাৎ ক্ষেপে ক্ষেপে বাহির হওয়ার দরুন শরীরে বিভিন্ন প্রকারের স্ফোটক দেখা যায়।

কয়েকক্ষেত্রে সাংঘাতিক ধরনের বসন্তরোগ হয়, যাহাকে হেমারেজিক স্মলপক্স (hæmo-rrhagic smallpox) বলে। ইহাতে সর্বাঙ্গ রক্তাভ হইয়া যায় এবং মুখ, নাক ও মলমূত্রের সহিত রক্ত নির্গত হয়। ইহা একটি ভয়াবহ লক্ষণ এবং এই ব্যাধিতে মৃত্যুহারও অত্যন্ত অধিক।

গুটিবসন্তে চোখের ভিতর প্রদাহ হইতে পারে, সুতরাং রোগের প্রথম অবস্থায় চোখের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অবহেলার দরুন বহুক্ষেত্রে রোগীর চক্ষু নষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলে রোগ-নিরাময়ের পরে রোগী দৃষ্টিহীন হইয়া বাঁচিয়া থাকে। আমাদের দেশে গুটিবসন্ত অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ। গুটিবসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগ দেখা দিলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা কর্তব্য। রোগীর থুথু, কাশি অথবা তাহার ব্যবহৃত কাপড়, বিছানা প্রভৃতি হইতে রোগের অণুজীবাণুর সঞ্চারণ হয়। শ্বাসের মাধ্যমে এই অণুজীবাণু সুস্থদেহে প্রবেশ করে। যখন গুটি-গুলি শুখাইতে আরম্ভ করে তখন শুষ্ক মামড়ি-গুলিও (scabs) অণুজীবাণু বহন করিয়া রোগ-বিস্তারে সহায়তা করে।

গুটিবসন্তের টিকা দ্বারা এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। বহু পূর্বে ইংলণ্ড ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে গুটিবসন্তের প্রকোপ ছিল, কিন্তু ব্যাপকভাবে এই টিকার ব্যবহার ও স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য সতর্কতার ফলে সেই দেশ-গুলি হইতে গুটিবসন্ত অনেক আগেই সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভবপর হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষ অভিযানের ফলে আমাদের দেশেও গুটিবসন্ত সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হইয়াছে। আশা করা যায়, দুই-এক বৎসর পরে আর গুটিবসন্তের টিকা লইবার প্রয়োজন থাকিবে না, কারণ সারা পৃথিবী এখন বসন্তরোগ হইতে মুক্ত হইবার মুখে।

(২) **টাইফয়েড** (সান্নিপাতিক জ্বর)

এই ব্যাধি জীবাণুঘটিত। ইহার জীবাণুগুলি খাদ্য বা পানীয়ের সহিত শরীরে প্রবেশ করিয়া অন্ত্রে ঘা করিয়া টাইফয়েড অসুখের সৃষ্টি করে। পানীয় জল অথবা আহার জীবাণু দ্বারা দূষিত হওয়ার ফলে এই রোগের প্রসার হয়। প্রথম লক্ষণ: অল্প জ্বর ও মাথা ধরা; ক্রমশঃ তাপ-মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে যে কোন জ্বরের প্রশমন না হইলে টাইফয়েড জ্বরের কথা চিন্তা করিতে হইবে। অন্যান্য কয়েকটি উপসর্গ যথা—পেট ফাঁপা, পেট ব্যথা অথবা উদরাময়, ক্লান্তি, অবসাদ, নিদ্রার ব্যাঘাত সাধারণতঃ জ্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখা যায়। শরীরের তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে কালবিলম্ব না করিয়া চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য। দ্বিতীয় সপ্তাহে নানা জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যথা, বিকার (delirium), মস্তিষ্কের প্রদাহের ফলে রোগীর সংজ্ঞাহীন হওয়া, অন্ত্রের মধ্যে স্থানবিশেষে ছিদ্র হওয়ার ফলে ব্যাপক প্রদাহ (peritonitis), অথবা অন্ত্রের রক্তবাহী শিরা, উপশিরা ছিন্ন

হওয়ার ফলে অন্ত্রের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ। যদি হঠাৎ জ্বরের তাপমাত্রা বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং সারা শরীরে ঘাম দেখা দেয়, তবে অন্ত্রের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণ সন্দেহ করা যাইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৃতীয় সপ্তাহে তাপমাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং চতুর্থ সপ্তাহে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া যায়।

টাইফয়েড জ্বর সন্দেহ হইলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ পৃথক্ করা আবশ্যক। তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদি, বিছানা অপরের সংস্পর্শে যাহাতে না আসে সেদিকে নজর রাখা কর্তব্য। আহারের ও পানীয়ের জন্য বাসন ইত্যাদির পৃথক্ ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফেলিবার পূর্বে রোগীর মলমূত্রাদিতে জীবাণুনাশক ঔষধ মেশানো উচিত। যাঁহারা রোগীর পরিচর্যা করিবেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্য কাহারও রোগীর নিকট আসা নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। শুশ্রূষা-কারীদের অন্যের সংস্পর্শে আসার পূর্বে পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিবর্তন করা এবং বিশেষভাবে হাত পরিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। উপরন্তু তাঁহাদের ও গৃহের অন্য সকলকে টাইফয়েড-প্রতিষেধক টিকা দেওয়া কর্তব্য।

বর্তমানে টাইফয়েডের চিকিৎসায় ক্লোরোমাইসেটিন-জাতীয় এন্টিবায়োটিক আবিষ্কারের ফলে রোগের ভয়াবহ পরিণতির ও জটিল উপসর্গগুলির নিরোধ সম্ভব হইয়াছে, এবং যথাসময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থার দ্বারা মৃত্যুর কবল হইতে রোগীকে রক্ষা করা সহজসাধ্য হইয়াছে। সাধারণতঃ ক্লোরোমাইসেটিন খাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে রোগ দমন করা সম্ভব হয়।

প্যারাটাইফয়েড জ্বর পূর্বোক্ত জ্বরের ন্যায়, উপসর্গগুলিও তদ্রূপ, তবে সাধারণতঃ জ্বরের তাপমাত্রা অল্প ও দুই সপ্তাহের মধ্যে জ্বরের অবসান হয়। প্যারাটাইফ এ অথবা বি জীবাণু এই ব্যাধির কারণ। এই দুইটি জীবাণু টাইফয়েড-জীবাণুর সমগোত্রীয়।

টাইফয়েড ও এই দুই প্রকার প্যারা-টাইফয়েড রোগের প্রতিষেধক হিসাবে টিকা একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, তাহাকে টি. এ. বি. ভ্যাক্সিন (T. A. B. Vaccine) বলে। প্যারাটাইফয়েড রোগ টাইফয়েডের তুলনায় এত বিরল যে, বর্তমানে ভারত সরকার স্থানবিশেষে শুধু টাইফয়েডের টিকা প্রচলন করিবার কথা চিন্তা করিতেছেন।

(৩) ওলাউঠা বা কলেরা

এই রোগটি অত্যন্ত সংক্রামক। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক বৎসর সহরাঞ্চলে, গ্রামাঞ্চলে, মেলা প্রভৃতি জনবহুল স্থানে কলেরার মহামারী দেখা দিত। স্বাস্থ্য বিভাগের তৎপরতায়, প্রতিষেধক টিকার প্রচলনে, পানীয় জলের সুব্যবস্থায় এবং বিশেষতঃ কলেরা-জীবাণুর মধ্যে একটা পরিবর্তন আসার ফলে বিগত কয়েক বৎসর বিশেষ কোন মড়কের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কলেরা জীবাণুঘটিত ব্যাধি। জীবাণুগুলি খাদ্য বা পানীয়ের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। পানীয় জল-সরবরাহ জীবাণু দ্বারা দূষিত হইলে ব্যাপক ভাবে এই রোগের প্রসার হয়। পুষ্করিণীর জলে রোগীর ব্যবহৃত কাপড় বাসন ইত্যাদি ধোয়ার ফলে অথবা রোগীর বিষ্ঠা যত্রতত্র ফেলার দরুন মাছি দ্বারা এই জীবাণু বাহিত হইয়া ব্যাধির সৃষ্টি করে। বৎসরে বিশেষ কয়েকটি ঋতুতে (সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে) এই ব্যাধির আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। কলেরা-জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রথম

উপসর্গগুলি প্রকাশ পাইতে পারে যথা, ভেদবমি, ঘনঘন মলত্যাগ; —মলের রং প্রথমে ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ অর্থাৎ স্বাভাবিক থাকে, কিছু পরে চাল-ধোয়া জলের ন্যায় তরল হয় ও তখন রোগীর শরীরে অত্যন্ত অবসাদ, ক্লান্তি দেখা দেয় ও সারা দেহ ঘামিতে থাকে। নাড়ীর গতিও ক্ষীণ হয়। কলেরা সন্দেহ হইলে রোগীকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন, নচেৎ রোগীকে বাঁচান শক্ত। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে বর্তমান চিকিৎসা-পদ্ধতি দ্বারা শতকরা ৯৫ জন রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব হয়। গৃহে কাহারও এই রোগ হইলে রোগীকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রোগীর মল, পরিধেয় বস্ত্রাদি বা বিছানা অপরের সংস্পর্শে যাহাতে না আসে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে নচেৎ অপরে এই ব্যাধির কবলে পড়িতে পারে। গৃহে একাধিক ব্যক্তির আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বিরল নহে।

বর্তমান গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, টাইফয়েডের ন্যায় কলেরার জীবাণুও সুস্থ ব্যক্তির অন্ত্রে থাকিতে পারে (cholera carrier) এবং সেই সুস্থ ব্যক্তির মলে থাকা জীবাণু অন্যের দেহে কলেরা রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং কোন গৃহে বারবার কলেরা হইলে এইরূপ জীবাণু-বাহকের সন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন।

গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভেই এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া কর্তব্য। বাহিরে খোলা জায়গায় রাখা খাবার বা পানীয় গ্রহণ করা উচিত নহে। কারণ, মাছির পায়ে লাগা কলেরা-জীবাণু কাটা ফলে বা খাবারে বসিলে রোগ বিস্তার লাভ করিতে পারে। পচা মাছ বা অন্যান্য দুষ্পাচ্য খাবার খাইবার ফলে পেটের গোলমাল হইলে সেই ব্যক্তির অন্ত্রে কলেরা-জীবাণুর বংশ-বৃদ্ধি করিতে সুবিধা হয়। কোন অঞ্চলে কলেরা দেখা দিলে ব্যাপক প্রতিষেধক টিকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইসব সতর্কতা অবলম্বনের ফলে বহুক্ষেত্রে এই ব্যাধির শুধু প্রসার-রোধ নহে, দেশ হইতে ইহাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করাও সম্ভব হইয়াছে। পাশ্চাত্যে বিগত শতাব্দীতে বহুদেশে কলেরা দেখা দিত, বর্তমানে সে সব দেশে এইসব প্রচেষ্টার ফলে বিশেষতঃ বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করার ফলে কলেরা ব্যাধি দমন করা সম্ভবপর হইয়াছে।

বর্তমান চিকিৎসা-প্রণালীতে কলেরা নিরাময় করা দুঃসাধ্য নহে পূর্বে একথা বলা হইয়াছে, তবে এই চিকিৎসা সাধারণ গৃহে সম্ভব নহে। সুতরাং রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে প্রেরণ করা কর্তব্য। যে বাড়ীতে এই রোগ দেখা দেয় সেই বাড়ীর সকল ব্যক্তিকেও প্রতিষেধক টিকা দেবার ব্যবস্থা করা বিধেয়। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, কলেরার টিকা বসন্তের টিকার মত অতটা কার্যকরী নহে। সেইজন্য সারা পৃথিবীতে আরও উন্নত ধরনের কলেরা-টিকা তৈয়ারীর জন্য প্রচুর গবেষণা হইতেছে।

(৪) যক্ষ্মা

প্রাচীন কালেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব যে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের মত দেশে এই ব্যাধির সমস্যা বিশেষ চিন্তার কারণ এবং সেইজন্য ইহা দমন করার জন্য সর্বপ্রকার উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। যক্ষ্মাও সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগের জীবাণু রোগীর কাশি, থুথুতে থাকার ফলে সহজেই এক হইতে অপরে সংক্রমিত হইতে পারে। যক্ষ্মার জীবাণুর (Mycobacterium tuberculosis) চারিধারে মোমজাতীয় আচ্ছাদন থাকার ফলে ইহাকে অল্প উত্তাপে ধ্বংস করা যায় না এবং শুষ্ক

অবস্থায় বহুকাল জীবিত থাকে বলিয়া সহজেই ব্যাপকভাবে রোগের প্রসার হয়। কোন ব্যক্তির ফুসফুসে যক্ষ্মা হইলে এবং তাহার কাশির শ্লেষ্মা পরীক্ষা করিয়া জীবাণু পাইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। থুথু এবং কাশির শ্লেষ্মা যত্রতত্র না ফেলিয়া একটি পাত্রে জমা করিয়া তাহাতে কারবলিক এসিড জাতীয় জীবাণুনাশক দিয়া পরে পুড়াইয়া ফেলা উচিত, নতুবা মাটির গর্তের মধ্যে পুঁতিয়া মাটি চাপা দিতে হইবে।

কোন ব্যক্তির বহুদিন যাবৎ ঘুষঘুষে জ্বর বিশেষতঃ সন্ধ্যার দিকে হইলে অথবা কাশির চিকিৎসা সত্ত্বেও উপকার না পাইলে এবং কাশির সহিত রক্ত দেখা দিলে ফুসফুসের যক্ষ্মা সন্দেহ করিতে হইবে। কয়েক ক্ষেত্রে প্রথমেই কাশির সহিত রক্ত দেখা দেয়। যক্ষ্মার আর একটি উপসর্গ ক্রমশঃ শরীরের ওজন-হ্রাস। ডায়াবিটিস ও কর্কট-জাতীয় রোগের ন্যায় যক্ষ্মার ক্ষেত্রেও ইহা একটি বিশেষ উপসর্গ। ফুসফুসের যক্ষ্মা সন্দেহ হইলে রোগীর থুথু ও ফুসফুসের একস্‌রে পরীক্ষা করা কর্তব্য। থুথুতে যক্ষ্মার জীবাণু থাকিলে রোগীকে অপরের সংস্পর্শে আসিতে দেওয়া উচিত নহে।

বর্তমান কালে এন্টিবায়োটিক-জাতীয় ঔষধ ও নানারূপ রাসায়নিক ঔষধের আবিষ্কারের ফলে যক্ষ্মার চিকিৎসা সহজসাধ্য হইয়াছে, বিশেষতঃ রোগের প্রারম্ভে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে অধিকাংশ রোগীকে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব। অবশ্য আজকাল অনেক রোগীর জীবাণুর উপর কয়েকটি চালু ঔষধ (যেমন স্ট্রেপটোমাইসিন) কার্যকরী হয় না বলিয়া চিকিৎসককে সেই সব ক্ষেত্রে নূতন নূতন ঔষধের সাহায্য লইতে হয়।

এন্টিবায়োটিক ও রাসায়নিক ঔষধগুলি আবিষ্কারের পূর্বে যক্ষ্মার একমাত্র চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিল—স্যানাটোরিয়মে অথবা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা। যদিও বর্তমান যুগে ইহার প্রয়োজন হয় না, তবুও রোগীকে জনবহুল সহরাঞ্চল হইতে বাহিরে রাখিলে বেশী সুফল পাওয়া যায়; তবে অন্যান্য চিকিৎসা-ব্যবস্থার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। রোগীর আহারের বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। দুগ্ধ, দুগ্ধজাত খাদ্য, যথা মাখন, ছানা ও ফল ইত্যাদি দৈনিক আহারে থাকা বাঞ্ছনীয়।

সমাজে কাহারও যক্ষ্মা হইলে রোগ-নিরাময়ের পরেও তাহার সহিত অবাধ মেলামেশা করিতে অনেকে এখনও ভয় পান। ব্যাধির নিরাময় ও যক্ষ্মার জীবাণু সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা হইলে সে ব্যক্তি দ্বারা অপরের কোনও ক্ষতি হওয়া সম্ভব নহে, সুতরাং উদার দৃষ্টিতে যক্ষ্মারোগ-মুক্ত লোকদের আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে জনশিক্ষার প্রয়োজন।

(৫) ইনফ্লুয়েঞ্জা

ইহা একটি অণুজীবাণুঘটিত সংক্রামক ব্যাধি। সহর ও জনবহুল স্থানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইহা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। যদিও সাধারণভাবে আমরা এই রোগ সম্বন্ধে বিশেষ নজর দিই না, কিন্তু সময় সময় নূতন ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা-অণুজীবাণুর আবির্ভাব পৃথিবীব্যাপী মড়কের সৃষ্টি করিতে পারে। বিগত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীব্যাপী যে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী দেখা দিয়াছিল তাহাতে মৃতের সংখ্যা যুদ্ধে হতের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক ছিল। সাধারণতঃ সারা শরীরে ও মাথায় ব্যথা, অল্প জ্বর, সর্দির ভাব বা অল্প কাশি হইলে আমরা এই ব্যাধি সন্দেহ করি। যখন এই ব্যাধির ব্যাপক প্রসার হয়, তখন বদ্ধ কক্ষে যথা

সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি প্রেক্ষাগৃহে না যাওয়া বিধেয়। এই ব্যাধির অণুজীবাণু সর্দির শ্লেষ্মা অথবা কাশির দ্বারা সঞ্চারিত হয়, সুতরাং যাঁহারা এই রোগে আক্রান্ত হন, তাঁহাদের হাঁচিবার, কাশিবার সময় রুমালদ্বারা নাক, মুখ ঢাকা কর্তব্য।

সাধারণভাবে এই ব্যাধির জন্য নানা ভাবে গৃহে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, নানা রকম মাথাধরার বড়ি ইত্যাদি ইহার চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। তবে আজ পর্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জার অণুজীবাণুকে মারার কোন ঔষধ বাহির হয় নাই। চিকিৎসকেরা যে ঔষধ দেন, তাহা শরীরের কষ্ট কমাইবার জন্য।

কোন রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করিতে হইলে, উহার কারণ সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন কলিকাতা নগরীতে প্লেগ রোগের মহামারী দেখা দেয় তখন স্বামীজী তাঁহার সহকর্মীদের বিশেষতঃ ভগিনী নিবেদিতাকে বস্তি অঞ্চল ও তাহার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করা এবং ইঁদুর ধ্বংস করার কর্মসূচী অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। স্বামীজী জানিতেন ইঁদুরের গায়ে এক প্রকার কীট (flea) প্লেগের বাহক এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করিলে ও ইঁদুর ধ্বংস করিলে ব্যাধির প্রসার বন্ধ করা সম্ভব। নাগরিক হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য স্বাস্থ্য সম্পর্কে যথাযোগ্য জ্ঞান অর্জন করা এবং বিশেষ-ভাবে, সংক্রামক ব্যাধি কেন হয় এবং কিভাবে তাহার দমন সম্ভব, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া। শুধু নিজের জন্য নহে, সমাজের কল্যাণে রোগ সম্বন্ধে তথ্যাদি অপরকে অবগত করানও আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

জ্ঞানতাপস সুনীতিকুমার

মাত্র তের বৎসর বয়সে সুনীতিকুমার স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলীর সহিত পরিচিত হন। তিনি ও তাঁহার কয়েকজন সহপাঠী স্কুলে একটি পাঠচক্র গঠন করেন। সেখানে স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং ইংরেজী বক্তৃতাবলীর পাঠ ও আলোচনা হইত। ইহার ফলে তিনি স্বামীজীর বিশ্বজনীন চিন্তাধারায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। তিয়াত্তর বৎসর বয়সে বাল্যের সেই স্মৃতিচারণা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন : 'জীবনের গভীরতম প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে মনের মধ্যে প্রথম জিজ্ঞাসা জাগরিত হইল বিবেকানন্দের লেখা পড়িয়া। ভারতীয়তা, ভারতীয় জাতীয়তা, হিন্দুত্ব, হিন্দু আদর্শ অনুসারে মানব-সমাজ এবং নৈতিক জীবনের সঙ্গে সেই আদর্শের যোগ, ইহার সম্বন্ধে বোধ পরিস্ফুট হইতে পারিল বিবেকানন্দের কৃপায় ;·· বিবেকানন্দ আমার মনের বিকাশে, জ্ঞান ও বিচারশক্তির উন্মেষে আমাকে সাহায্য করিলেন, আমি ধন্য হইলাম। তজ্জন্য চিরতরে তাঁহার দাস বনিয়া গেলাম। এইজন্য তাঁহার কথা মনে হইলেই শতকোটি প্রণাম তাঁহার উদ্দেশে নিবেদন করি।'

রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে সুনীতিকুমার লিখিয়াছেন, স্বামীজীর 'স্থাপিত ও অনুপ্রাণিত রামকৃষ্ণ মিশন ভারতকে ও জগৎকে তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান।' মন্তব্যটি নিছক প্রশস্তিবাদ নহে, ঢক্কানিনাদ না করিয়া বহু বৎসর রামকৃষ্ণ মিশনের নিঃস্বার্থ সেবা করিয়া তিনি স্বীয়

উক্তির পরিপূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে বেলুড় মঠ শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সমিতির পক্ষ হইতে উক্ত সমিতির প্রকাশন উপসমিতির সম্পাদক স্বামী অবিনাশানন্দ কর্তৃক তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'The Cultural Heritage of India' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকে মুখ্য উপজীব্য করিয়া ১৯৩৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের জন্ম হয়। সুনীতি-কুমার আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা সমিতির অন্যতম সহাধ্যক্ষ ছিলেন এবং নানাভাবে ইহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত গ্রন্থটি ১৯৫৩ সালে ৭ খণ্ডে এবং অনেক পরে ৮ খণ্ডে প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইলে তিনি উহার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যরূপে বৃত হন। এ যাবৎ চারিটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডটির মুখ্য সম্পাদক তিনিই এবং ঐ খণ্ডটি তাঁহার দুইটি মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক পঞ্চম খণ্ডটির সম্পূর্ণ সম্পাদনা তিনিই করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার বহু বর্ষের নিঃস্বার্থ সম্পাদনার ফলশ্রুতি উক্ত খণ্ডটির প্রকাশন তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, কারণ উহা যন্ত্রস্থ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন'-পত্রিকার তিনি একজন আগ্রহী লেখক ছিলেন এবং তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ উহার ৩৮তম বর্ষ হইতে ৫৮তম বর্ষ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে বিশেষ সংখ্যাগুলিতেই লিখিতেন। স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ইংরেজীতে 'Swami Vivekananda—A World Figure' এবং বাংলায় 'যুগাবতার শ্রীবিবেকানন্দ' ও 'বেদান্ত ও বিবেকানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বামীজীর প্রতি তাঁহার অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

স্বামীজীর পরম অনুরাগী, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী এই মানুষটির দেহনির্মুক্ত আত্মা ভগবচ্চরণে চিরশান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

গত ২৯শে মে ১৯৭৭, রবিবার অপরাহ্ণে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঐ দিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। স্নানের পর শ্বাসকষ্ট শুরু হইলে চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁহাকে একটি নার্সিং হোমে পাঠানো হয়। সেখানে পৌঁছিবার অল্পক্ষণের মধ্যেই বৈকাল ৪-২০ মিঃ নাগাদ তাঁহার জীবনাবসান হয়। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৭ বৎসর। ৩১শে মে, মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

১৮৯০ সালের ২৬শে নভেম্বর হাওড়া জেলার অন্তর্গত শিবপুরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ১৯১১ সালে ইংরেজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন এবং ১৯১৩ সালে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এম. এ. পাস করেন। ঐ বৎসরই তিনি কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপকরূপে যোগ দেন এবং পর বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে ইংরেজীর অধ্যাপক হন (১৯১৪—১৯১৯)। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে উচ্চতর অধ্যয়নের জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি পাইয়া ১৯১৯ সালে তিনি ইওরোপে গমন করেন এবং ১৯২১ সালে ভাষাবিজ্ঞানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্. হন। লণ্ডন হইতে তিনি প্যারিসে

যান এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন অধ্যাপকের অধীনে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। ১৯২২ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব ও ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের 'খয়রা অধ্যাপক'পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৯৫২ সালে এমেরিটাস অধ্যাপক হন।

ভারতের তথা বিশ্বের অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল এবং তিনি বহুবার ইওরোপ আমেরিকা চীন ও রাশিয়ার বিভিন্ন সভাসমিতি ও শিক্ষাসম্মেলনে যোগদান করেন। জাপান অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকা ম্যানিলা প্রভৃতি দেশেও গমন করেন এবং তাঁহার বৈদগ্ধ্যের জন্য সর্বত্র সমাদৃত ও সম্মানিত হন। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৫ সালে উক্ত অধ্যক্ষপদে পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারত সরকারের সংস্কৃত কমিশনের চেয়ারম্যান, ১৯৬৪ সালে ভারতের জাতীয় অধ্যাপক, ১৯৬৯ সালে সাহিত্য আকাদমীর সভাপতি এবং ১৯৭১ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন তিনি। পূর্বেও এক সময়ে তিনি এই সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৭২ সাল হইতে দেহান্ত পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। পূর্বেও এক সময়ে তিনি ইহার সভাপতি ছিলেন।

১৯২৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'The Origin and Development of the Bengali Language' দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে ইহার বিলাতী ও আমেরিকান সংস্করণও প্রকাশিত হয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহার কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন মালয় সুমাত্রা জাভা বালি ও শ্যামদেশ পরিভ্রমণে যান, তখন সুনীতিকুমার তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। 'দ্বীপময় ভারত' গ্রন্থে সুনীতিকুমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ করেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে সুনীতিকুমারকে 'ভাষাচার্য' অভিধা প্রদান করেন। ১৯৪৮ সালে এলাহাবাদের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক তিনি 'সাহিত্যবাচস্পতি' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬১ সালে রোম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি. লিট্. উপাধি প্রদান করেন।

সুনীতিকুমার কেবলমাত্র ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন নাই; সাহিত্য সমাজতত্ত্ব শিল্প ইতিহাস পুরাণ ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার সাবলীল সঞ্চরণহেতু জ্ঞানতাপস হিসাবে সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের তিনি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আসন

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

কত অভিমান করেছি ! আসছ না কেন ?
শুনতেই পাচ্ছ না যেন ;
সন্তের সুভাষিত—'পেয়ে গেছ মানব-শরীর—
মুক্তির এষণা—মহতের আশ্রয়-সমীর'—
চলো—চালিয়ে যাও ভাই
অভী হবে আঁধারে আর নিরাশায় ।
তারপর, কাল বয়ে যায়
হাসি, অশ্রু নিত্য দোলা পায়
ভাবি—করি স্মৃতি রোমন্থন
সহসা যে কেঁপে উঠে মন
অশরীরী আকুলতা
শরীরী ভাষায় হানে বিচিত্র বারতা—
হৃদয়েতে ঠাঁই কোথা তোর
কারা নিত্য ভিড় করে কামনা-বিভোর !
কাম যায়—ক্রোধ আসে—লোভ নাচে পায় পায়—
মনের ওই ছাদনাতলায়
আজো কারা বাজায় সানাই—
লোকমান্যি হবার আশে
ছোটাছুটি উর্ধ্বশ্বাসে—
কোথায় দেবতা !
তারি নামে চলে বাচালতা—
ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই হায়—
ইষ্ট তোর দাঁড়ায় কোথায় !
সব ফেলে, করিলে নির্জন
প্রিয়তম পাইবে আসন—
হোলে স্তব্ধপারা
মনের আকাশে আসে
পূবালীর তারা !

এনে দিল তব চরণতলে

শ্রীমতী ছায়া সিংহ

আঘাতের 'পর আঘাত হানিয়া সংসার-মায়া ভুলাল যারা,
এমনি করিয়া ক্ষণে-অক্ষণে বহায়েছে যারা নয়ন-ধারা,
মনে হয় তারা মোর প্রিয়জন —এ জীবনে মোর বন্ধু তারা।
তারাই শিখাল—বিপদে শরণ নাহি কেহ ভবে তোমারে ছাড়া।
অহমিকা-বশে সংসার-মোহে তোমা হতে ছিনু অনেক দূরে
শুনিতে পাইনি আহ্বান তব, ডেকেছ কত না বাঁশরী-সুরে!
অরাতি নহেকো আঘাতে আঘাতে যাহারা ভাসাল নয়ন-জলে,
বন্ধু যে তারা—এইরূপে মোরে এনে দিল তব চরণতলে।

শব্দব্রহ্ম

শ্রীমতী গৌরী বিশ্বাস

তুমি আপন মনে তোমার বীণা বাজিয়ে চলেছ,
ওই বীণার তানে মন যে আমার মাতিয়ে তুলেছ।
বীণার ধ্বনি শুনতে গিয়ে
নিজেই আমি যাই হারিয়ে—
হৃদয়মাঝে চেয়ে দেখি
সেথায় রাজিছ।

তোমার ওই বীণার তানে ভরে উঠুক প্রাণ,
তানের সাথে সুর মিলিয়ে গাইব তোমার গান।
অনাহত ধ্বনির সুরে
মিলিয়ে দেব আপনারে—
মনটি আমার সুরে সুরে
ভরে দিয়েছ।

'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া'

শ্রীবিমলজ্যোতি দাস

জগতের বিদ্যালয়ে বহু বিদ্যা করি অধ্যয়ন
মনে মোর প্রশ্ন জাগে, —এই বিদ্যা-বিহীন যে জন,
তার সাথে আজি মোর সত্যকার পার্থক্য কোথায়,
লভিয়াছি কোন্ নিধি মূর্খজন বঞ্চিত যাহায় ?
সুখে হাসা, দুঃখে কাঁদা, জগতের জনারণ্য-মাঝে
বাঁচার প্রয়াস লয়ে লেগে থাকা কোন-কিছু কাজে,
তারপরে একদিন মৃত্যুতে পরম অবসান—
সব-কিছুতেই দেখি সে ও আমি উভয়ে সমান।

তাই যদি হয়, তবে মিথ্যা এই বিদ্যার গৌরব,
এ কাঠ-গোলাপে নাই অতিমর্ত জ্ঞানের সৌরভ।
শিখি নাই সেই বিদ্যা দিব্যদ্যুতি, প্রজ্ঞা যার নাম,
যাহার প্রসাদে পাই অতীন্দ্রিয়-আনন্দের ধাম,
যে জ্ঞান জানায় মোরে আপনার সত্য পরিচয়,
মায়ার বন্ধন হতে মুক্ত করি চিরশান্তিময়
অমৃতের স্পর্শ আনে, শুদ্ধ করে ধ্যান-ধারণায়,
আপনারে বিলাইয়া দিতে বলে সবার সেবায়।

অমৃতবাণী

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

কতটুকু জানা যায় পুঁথিপত্র পড়ে ?
চাক্ষুষ দেখিলে তবে হয় পূর্ণ জ্ঞান।
ছবি দেখে বই পড়ে কাশী বিশ্বেশ্বরে
জানা আর চোখে দেখা নহে তো সমান।

যতই সন্দেশ থাক্ হালুই-এর ঘরে
মুখে না পুরিলে স্বাদ বুঝা নাহি যায়।
শাস্ত্রাদি পড়িয়া কেহ সংশয় না তরে
সাধনই জেনো বন্ধু, মুক্তির উপায়।

সমালোচনা

স্তোত্র-মালিকা : সংকলক ও প্রকাশক : শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২৫। (১৩৮৪), পৃষ্ঠা ৬৪, মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে বিশ্বসারতন্ত্র হইতে শ্রীগুরুস্তব ও শ্রীগুরুগীতার ৩১টি শ্লোক, শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে শ্রীশ্রীমাতৃপ্রণাম, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য রচিত শিবাষ্টকম্ শ্রীনারায়ণস্তোত্রম্ ও চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্রম্, স্বামী বিবেকানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রম্ শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক-ভজন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণাম, স্বামী অভেদানন্দ রচিত শ্রীরামকৃষ্ণাষ্টকম্ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রণামমন্ত্র ও শ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্, মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত শ্রীগুরুস্তবাষ্টক শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়াষ্টক ও প্রার্থনাষ্টক, শ্রী পি. বি. জুন্নারকর রচিত শ্রীসারদালীলা-সংকীর্তনম্ বন্দনা ও প্রার্থনা; এবং শ্রীরামনাম-সংকীর্তনম্ শ্রীশ্যাম-নাম-সংকীর্তনম্ শ্রীবিষ্ণুপ্রণাম ও শ্রীশিবপ্রণাম সংকলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে যাবতীয় সংস্কৃত অংশের নির্ভরযোগ্য প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গানুবাদে সংযোজিত পাদটীকা-গুলিও প্রণিধানযোগ্য।

গ্রন্থটির সম্পাদনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের সম্পাদকমণ্ডলীর আন্তরিকতা শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার স্বাক্ষরবহ। কাগজ মুদ্রণ ও বাঁধাই উত্তম। সে-তুলনায় নির্ধারিত মূল্য খুবই কম। স্তোত্র-পাঠ প্রার্থনা প্রণাম সংকীর্তনাদি ভক্তিসাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। সেজন্য আশা করি ভক্তিপথের পথিকগণের নিকট এই গ্রন্থ যোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

মহাজীবন [গীতিকাব্য] : শ্রীমাখন গুপ্ত। প্রকাশক : শ্রীবিধুভূষণ দাসগুপ্ত, সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি, সি-৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। (১৯৬৯), পৃষ্ঠা ৫৪, মূল্য এক টাকা।

গান্ধীজীর মহাজীবনকে উপজীব্য করিয়া লেখক একটি গীতি-আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। গান্ধীজীর পুণ্য নাম সমগ্র পৃথিবীতে সমাদৃত ও শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত। ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করিতে গান্ধীজীর অবদান শাশ্বতকাল ধরিয়া ভারতবাসী স্মরণ করিবে। স্বল্প পরিসরে গান্ধীজীর ঘটনাবহুল জীবনের কিছু অংশ লেখক গীতি-কথার মাধ্যমে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার উদ্যম সার্থক সুন্দর ও অনবদ্য হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভে সংযোজিত গান্ধীজীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী গীতি-আলেখ্যটি অনুধাবন করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিবে।

'ভারত বন্দনা', 'রাষ্ট্রীয় পতাকা','সমবায় পদ্ধতিতে চাষ', 'কুটীর শিল্প', 'গ্রামরাজ' প্রভৃতি গান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজীর জীবন-বেদকে অনুসরণ করিয়াই সমগ্র পুস্তিকাটি রচিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

লেখকের ছন্দ সুর তাল ও ভাষার উপর স্বচ্ছন্দ দখল থাকায় কোথাও পাঠক ও শ্রোতাকে হোঁচট খাইতে হয় না। স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যরস এই রচনার সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। গান্ধীজীর মহাবাণীকে কবিতা ও গানের মাধ্যমে প্রচারের জন্য লেখককে অভিনন্দন জানাই। যে মহা-জীবন ভারতের তথা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য

নিঃশেষিত, তাহার অনুধ্যান সর্বকালের মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগাইবে। শ্রীমাখন গুপ্তের গীতিকাব্যটি সেই অনুধ্যানের বিশেষ সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই। ইহার বহুল প্রচার হউক—ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। **মৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

কানপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭৫-৭৬ সালের কার্যবিবরণী নিম্নরূপ :

ধর্ম ও সংস্কৃতি ঃ আশ্রমে নিত্য শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা প্রার্থনাদি ব্যতীত প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় কীর্তন ও ধর্মালোচনা হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি এবং কালীপূজা যোগ্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে পালিত হইয়াছে। শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি, খ্রীষ্টমাস ঈভ এবং শিবরাত্রিও যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শিক্ষা ঃ আলোচ্যবর্ষে পাঠাগারে ৮টি সংবাদপত্র ও ৬৮টি সাময়িকী রাখা হয়। পুস্তকাগারে ৫০৫টি নূতন পুস্তক সংযোজিত হয়। মোট পুস্তকসংখ্যা ছিল ৪,৬০২। ৬,৩৬৫ বার পাঠকগণ পুস্তক পড়িতে গ্রহণ করেন। পাঠকগণের দৈনিক উপস্থিতির গড় ছিল ৬১। ক্রমবর্ধমান শিশু-পাঠকদের জন্য পৃথক শিশু-বিভাগটির কার্যও উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ভর্তির সংখ্যা ছিল ৭০২। উত্তর প্রদেশ বোর্ডের পরীক্ষায় মোট ১৩৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সকলেই উত্তীর্ণ হয়। তন্মধ্যে

৮৫ জন প্রথম, ৫১ জন দ্বিতীয় ও ৩ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৩ জন ছাত্র স্টার এবং বিভিন্ন বিষয়ে ১২৩ জন ডিস্টিংসন পায়। ষষ্ঠ একাদশ ও ত্রয়োদশ স্থানও তাহারা অধিকার করে। এজন্য সরকারের পক্ষ হইতে বিদ্যালয়কে একটি শিল্ড ও প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়। দক্ষতা-মূলক সরকারী অনুদানের তালিকায় বিদ্যালয়টি শীর্ষস্থান অধিকার করে। ৫৬ জন ছাত্র সরকারী ও অন্যান্য ছাত্রবৃত্তি লাভ করে। ১৭০ জন ছাত্র বিনা বেতনে ও ৬৬ জন ছাত্র অর্ধ-বেতনে পড়িবার সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে ৭,১২৪টি পুস্তক ছিল।

চিকিৎসা: দাতব্য চিকিৎসালয়ে মোট ১,৮৯,৫৬৯ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। সাধারণ অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ছিল ১৫২, ইনজেকসনের সংখ্যা ৪৩,৮১৫, রক্ত-মল-মূত্রাদি পরীক্ষার সংখ্যা ৬০৩, রঞ্জন-রশ্মি বিভাগে পরীক্ষার সংখ্যা ৩৮৫।

উৎসব

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪২তম জন্মোৎসব পূজাপাঠ শোভাযাত্রা ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। নির্ধারিত কার্যসূচী অনুযায়ী ৫ই এপ্রিল উৎসব শুরু হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কিছু অনুষ্ঠান অসমাপ্ত থাকে। সেগুলি পরে ৬ই ও ৭ই মে উদ্‌যাপিত হয়। ৬ই আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কার-বিতরণী সভাতে সভা-পতিত্ব করেন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। ছাত্রগণের ড্রিল ব্রতচারী নৃত্য ক্রীড়াকৌশল আবৃত্তি ও হাস্যকৌতুক অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে ছাত্রগণ 'পানিপথ' নাটকাভিনয় করে। ৭ই শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ একটি শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করে। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পদ্মানন্দ শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী রাজীবানন্দ। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে প্রায় দুই হাজার ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। রাত্রে শিক্ষকগণ কর্তৃক 'কৃষ্ণ-সুদামা' যাত্রাভিনয় হয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কাকদ্বীপ ও দক্ষিণ ২৪-পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে ধর্মসভাদির আয়োজন করা হয়। ১৮ই এপ্রিল কাকদ্বীপ কিশোর সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ধর্মসভাতে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণানন্দ শ্রীনবনী-হরণ মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী চেতসা-নন্দ। সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের জনশিক্ষা বিভাগ হইতে চলচ্চিত্র-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। ২০শে এপ্রিল উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে, ২২শে এপ্রিল ব্রজবল্লভপুর হাইস্কুলে এবং ২৩শে এপ্রিল হরেন্দ্রনগর সবুজ সংসদ প্রাঙ্গণে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সব ধর্মসভাতে স্বামী চেতসানন্দ স্বামী শরণ্যানন্দ ও স্বামী পরিপূর্ণানন্দ ভাষণ দেন।

'প্ল্যাটিনাম'-জয়ন্তী

কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম-প্রতিষ্ঠার ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গত ৮ই হইতে ১০ই এপ্রিল ১৯৭৭, 'প্ল্যাটিনাম'-জয়ন্তী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র হইতে বহু সাধু উৎসবে যোগদান করেন। অনেক ভক্তেরও সমাগম হয়। ১০ই অপরাহ্ণে ধর্ম-সভায় পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রাম-কৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরা-নন্দজী। সভার প্রারম্ভে তিনি এই জয়ন্তী উপলক্ষে মুদ্রিত একটি স্মারক গ্রন্থের প্রকাশন ঘোষণা করেন।

হীরক-জয়ন্তী

কিষণপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গত ৩রা এপ্রিল ১৯৭৭, হীরক-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী এই উৎসব উপলক্ষে মুদ্রিত একটি স্মরণিকার প্রকাশন ঘোষণা করেন।

অন্যান্য সংবাদ

লখনউ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের পলিক্লিনিকে গত ১৭ই এপ্রিল ১৯৭৭, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দের একটি ব্রঞ্জ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মসচিব স্বামী গম্ভীরানন্দজী পৌরোহিত্য করেন।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নবনির্মিত সাধু-নিবাসের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী গত ২২শে ফেব্রুআরি ১৯৭৭।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন (কলিকাতা) বিদ্যার্থী আশ্রমের তিনজন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি. টেক্. পরীক্ষায় নিজ নিজ বিষয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রটি সমস্ত শাখায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের তালিকায়ও শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

রজত-জয়ন্তী

কলিকাতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংসদের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে রজত-জয়ন্তী উৎসব ও তৎসহ শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব-উৎসব গত ১৯-শে মার্চ হইতে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ১৯শে রাত্রে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে সকালে জাতি-ধর্ম-ও বর্ণ-নির্বিশেষে শ্রীবুদ্ধ শ্রীখ্রীষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ আচার্য ও অবতারগণের প্রতিকৃতিসহ প্রায় দেড়সহস্রাধিক ভক্ত নরনারীর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শিবশঙ্কর মল্লিক লেনস্থ উৎসব-মুখর মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাগন্ত্যলীলাস্থল শ্যামপুকুরবাটী, বলরাম মন্দির, শ্রীমায়ের অন্ত্যলীলাস্থল 'মায়ের বাটী' এবং স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থানের সন্নিকটস্থ পথ অতিক্রম করিয়া বিধান সরণি হইয়া সংসদের নাটমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ, স্বামী দেবানন্দ প্রমুখ বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করিয়া উহার পরিচালনা পরিদর্শন করেন। আরাত্রিক, বৈদিক শান্তিবচন ও বন্দনান্তে শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে মঙ্গলঘট ও সানাই প্রভৃতি সপ্তবাদ্য ছিল। তাহার পর ক্রমান্বয়ে ছিল পথপ্রদর্শক চারিটি মোটর সাইকেল আরোহী; দুইটি সুসজ্জিত অশ্বের উপর 'যত মত তত পথ' লিখিত পতাকাবাহী বালক ও বালিকা; সর্বধর্মসমন্বয়ের ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সংসদের প্রতীকধারী; 'ওঁ তৎ সৎ', 'তত্ত্বমসি' লিখিত শ্বেত ও গৈরিক পতাকাবাহী দল; শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমা স্বামীজী

প্রভৃতি ধর্মাচার্যগণের বাণী ও শাস্ত্রের বাণী লিখিত পতাকাধারিণী মহিলাগণ ; 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ' প্রভৃতি মুদ্রিত 'উত্তরীয়'-গাত্রে জয়ধ্বনিরত ও ভজনরত গায়ক-গায়িকাবৃন্দ ; শঙ্খধ্বনি ও স্তোত্রপাঠরত ছাত্রছাত্রীগণ ও সংকীর্তনদল। তাহার পর সুসজ্জিত চারিটি বৃহৎ গাড়ীতে সিংহাসনে প্রথমে স্বামীজী বুদ্ধ ও খৃষ্ট এবং সর্বশেষে শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিসমূহ শোভাযাত্রাটিকে মহাসমারোহপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। ছাত্রদের দুইটি ব্যাণ্ডপার্টি, স্কাউটদল, সেণ্ট জন এ্যাম্বুলেন্স ও জলসরবরাহে কাশীবিশ্বনাথ সেবাসমিতি, ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'দূর-দর্শনকেন্দ্র' ও 'তথ্যচিত্র' সংস্থাও শোভাযাত্রায় যোগদান করেন।

২০শে মার্চ সন্ধ্যায় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ শ্রীমা সম্বন্ধে আলোচনা ও শ্রীরাধারমণ কীর্তন সমাজ লীলাকীর্তন করেন। ২১শে সন্ধ্যায় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি কথকতা এবং শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ও শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ২২শে সকালে বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ ও গীতাপাঠ হয়। 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' আলোচনা করেন স্বামী তীর্থানন্দ। মধ্যাহ্নে প্রায় ২০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় 'অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। পরে রামায়ণগান করেন শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩শে স্বামী তীর্থানন্দ শ্রীমা সম্বন্ধে আলোচনা করেন ও 'রসরঙ্গ' কর্তৃক শ্রীমা লীলাগীতি কথা ও গানে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪শে রাত্রে স্বামী আত্মস্থানন্দ ও শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা ও শ্রীনিখিল চট্টোপাধ্যায় মহাভারত কথকতা করেন। ২৫শে কঠোপনিষদ আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীপাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'মায়ের খেলা' কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন-আলেখ্য গীত হয়। ২৬শে রামনামসংকীর্তন এবং শ্রীশান্তিগোপালের নির্দেশনায় তরুণ অপেরা কর্তৃক 'বিদ্রোহী সন্ন্যাসী' যাত্রা হয়। ২৭শে গীতা সম্বন্ধে আলোচনা করেন পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ সপ্ততীর্থ এবং শ্রীরাধা দামোদর কীর্তন সমাজ লীলাকীর্তন করেন। ২৮শে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং স্বামী শিবানন্দ গিরির পরিচালনায় আনন্দম্ কীর্তন গোষ্ঠী মাতৃনাম কীর্তন করেন। ২৯শে ধর্মসভায় ভজন করেন শ্রীমতী সুস্মিতা মুখোপাধ্যায় শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী মঞ্জু ভট্টাচার্য। পরে প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ও সান্ত্বনা দাশগুপ্ত শ্রীমা সম্পর্কে আলোচনা ও শ্রীমতী গৌরী মিত্র লীলাকীর্তন করেন। ৩০শে 'অভিগীত' প্রযোজিত 'শ্রীরাম-কৃষ্ণ-আরতি' গীতি-নাট্য অনুষ্ঠিত হয়।

এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পূজনীয় অধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদকের আশীর্বাণী ও শুভেচ্ছা সহ বহু তত্ত্ব ও তথ্য সংবলিত 'পঞ্চবটী'শীর্ষক একটি মনোরম স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। 'রামকৃষ্ণ-সারদা', 'যত মত তত পথ' লিখিত কিছু বস্ত্রও (উত্তরীয়) ভক্তদের জন্য ছাপানো হয়।

গোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৬ই মার্চ ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলারতি গীতাপাঠ কথামৃতপাঠ নগরপরিক্রমা বিশেষ পূজা হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে দুই সহস্রাধিক ভক্ত খিচুড়িপ্রসাদ পান। বৈকালীন ধর্মসভায় ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ, প্রধান অতিথি স্বামী কৃষ্ণানন্দ ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ মজুমদার। সন্ধ্যারতির পর শ্রীভূপেন চক্রবর্তী শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন। ৭ই বাউল সঙ্গীত পরিবেশিত এবং ৮ই 'সাধক ত্রৈলঙ্গস্বামী' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন

১ম বর্ষ ।]　　১৫ই পৌষ ।　(১৩০৬ সাল)　　[২৪শ সংখ্যা ।]

সমালোচনা ।

"সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(৪) এই অবসরে আর একটা কথা বলি :—অনেকেই জানেন—এ'কার ঐ'কার আ'কার মূর্দ্ধণ্য ণ একই রকম ; কিন্তু ছাপা পুস্তকাদিতে দেখিতে পাইবেন—সব দুই দুই প্রকার যথা—া া, ে ে, ৈ ৈ, ণ ণ অর্থাৎ মাঝের আকার ও শেষের আকার, আগের একার ও মাঝের একার, আগের ঐকার ও মাঝের ঐকার, মাঝের ণ ও শেষের ণ । এত হাঙ্গামা প্রবর্ত্তন করার এমন কি আবশ্যক—বুঝি না। যদি কোন প্রিণ্টার বলেন যে ইহাতে ভাল দেখায়। কিন্তু একদিন একটী পুরাতন গ্রন্থকর্ত্তাকে বলিতে শুনিলাম "আমার যত বহি ছাপা হবে তাতে যেন আদৌ আগের এ'কার ও শেষের আ'কার না থাকে, আগের এ'কারের ও শেষের আ'কারের স্থানে মাঝের একার ও মাঝের আকার দিবে—ইহাতে আরও ভাল দেখায়" ।—একপ্রকার যথার্থ কথাই ;—মাত্রাশূন্য অক্ষরের অপেক্ষা মাত্রাযুক্ত অক্ষর ভাল দেখায় বটে। দ্বিতীয় কথা, চক্ষুকে যে রূপই দেখিতে অভ্যাস করাইবেন সেই রূপই সে সুন্দর দেখিবে। আগে ত আমাদের চোখে অক্ষরেরই এত ভেদাভেদ ঠেকতো না ; এক্ষণে আর এক রকম শিখে ও দেখে অভ্যাস ক'রে ফেলেছি ; কাযেকাযেই বর্ত্তমান হাওয়ার অনুযায়ী চলিতেছি।

ছাপাখানার সংস্কার ।

পঙ্কচিউএসন অর্থাৎ যতিচিহ্ন সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষা অতি দরিদ্র। ইংরাজি যত প্রকার চিহ্ন আছে সে সমস্তই (বাঙ্গালা নাম না দিতে পারি, ইংরাজি নাম দিয়া) প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। আজও পর্য্যন্ত 'কোলন' ত বাঙ্গালা ভাষায় দেখিতেই পাইলাম না ; যদিও কদাচিৎ মুদ্রাঙ্কনে কোলন দেখিতে পাই ত সে সকল—কোলনের স্থানে : বিসর্গই দেখি। তাঁহাদের দোষ নয় ;—মুদ্রাক্ষর-নির্ম্মাতাদিগের। কোলন মুদ্রাক্ষরের ছাঁচ আজও বাংলাভাষার জন্য তোয়েরই হয় নাই। যা আছে তা ইংরাজি-সাটের সামিল।

যতিচিহ্নের সংস্কার

আজকাল দুই একটী গ্রন্থকর্ত্তা বাঙ্গালায় 'ফুলষ্টপ' ব্যবহার করিতেছেন, যেমন—"গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক" স্থলে "গ. সা. গু."। তদ্রূপ "পি, সি, দে" স্থলে 'পি. সি. দে.' এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তন করিলে ভাল হয়।

উচ্চারণ করিবার চিহ্ন ত বাঙ্গালা ভাষায় একেবারেই নাই। সে সকলেরও (নিদেন ইংরাজি নাম দিয়া) ব্যবহার-প্রবর্ত্তন কর্ত্তব্য। 'এক' বাঙ্গালা উচ্চারণ করিতে গেলে 'হ্যাক্' হয়; এই স্থলে 'এক'-এর এ'র মাথায় কোনও প্রকার চিহ্ন দিবার আবশ্যক (বাঙ্গালা অভিধানে ত একান্ত আবশ্যক)।

দ্বিতীয়—অভিধান সঙ্কলন :—

সভাপতি মহাশয় অভিধান সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, এমন এক অভিধান হওয়া উচিত যাহাতে সমস্ত চলিত-কথা, যথা 'ট্যাঁক', 'চোঁচ', 'তাড়স', 'ভোঁ' প্রভৃতি পর্য্যন্ত শব্দও পাওয়া যায়। —খুব ভাল কথা। কিন্তু প্রথমতঃ এরূপ করিতে গেলে ত এক প্রকাণ্ড ব্যাপার সংঘটন করিতে হয়; সমগ্র বাঙ্গালা দেশের স্থানীয় চলিত-কথা সংগ্রহ করিলে, অমন ২।৩ সেট "সেঞ্চিউরি-ডিক্সনারী"তেও অর্থাৎ ৯×১১×৩ মাপের ২ ডজন গ্রন্থেও কুলানো দায়। দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় জেলায় বহুদিন ধরিয়া বাস করিয়া কথা সংগ্রহ করাও সুকঠিন। তবে এরূপ কার্য্যের চেষ্টা ও প্রারম্ভ অতি আবশ্যকীয় এবং প্রশংসনীয়। কলিকাতা-রাজধানীর ত চলিত কথাগুলি প্রথম সংগ্রহ হউক, ক্রমশঃ সেই উদ্যম পর-পর চতুর্দ্দিকস্থ জেলায় বিস্তৃত করা যাইবে। কিন্তু, তৃতীয়তঃ একটী প্রধান কথা হইতেছে যে, শতাবধি-টাকা-মূল্যের বাঙ্গালা-অভিধান ক্রয় করেন এমন কার্য্যকর সাহিত্যোৎসাহী হৃদয়বান বাঙ্গালী-মহোদয়—গরীবের কথা ত ছেড়েই দিন, ধনাঢ্যদিগের মধ্যেও বড়জোর মেরে কেটে, একটী হস্তাঙ্গুলীর পর্ব্বরেখা যে কয়টী সংখ্যায় সে কয়টীও হন কিনা সন্দেহ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অভিধান।

তৃতীয়—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাষা :—

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাষা সঙ্কলন সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদে দুই চারিটী সরল-বাঙ্গালা-ভাষাজ্ঞ সংস্কৃত-দার্শনিক পণ্ডিতের অত্যাবশ্যক—একথা তিনি ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের ইংরাজি-দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। তা না হ'লে ততটা উপকার দর্শাবে না। তবে যদি একান্ত এক রাশিতে এরূপ তিনটি শুভগ্রহের (সংস্কৃত, ইংরাজি ও বাঙ্গালা) যোগ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অপররাশিস্থ শুভগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি ঐ রাশিতে যাহাতে পড়ে এমত লগ্নের উদ্ভাবন করিতে হইবে। ভালরূপ ইংরাজী ও বাঙ্গালা জানা সংস্কৃতদার্শনিক পণ্ডিত পাওয়া যাইতেও পারে; কিন্তু ভালরূপ সংস্কৃত-জানা ইংরাজী-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অতি বিরল। শুধু আবার পদার্থবিদ্যাবিৎ রাখিলেই যে কার্য্য পূর্ণ হইল তাহা নয়; ভূতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব খনিজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েরও পৃথক্ পৃথক্ পণ্ডিতের প্রয়োজন। আরও একটা কথা, ইংরাজি ও সংস্কৃত গণিত-জ্যোতির্ব্বিদের সাহায্যও বিশেষ আবশ্যক। এই এতগুলি হইলে যদি, বাঙ্গালা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পূর্ণ

ইংরাজি-বিজ্ঞানবিৎ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত।

হয়। এত বড় ব্যাপারের আয়োজন একেবারে না হউক ক্রমশঃ অল্প করিয়া হইলেও সাহিত্য-সেবক-মণ্ডলীর যথেষ্ট উপকার হইতে থাকিবে। [ক্রমশঃ।]

ভগবদ্গীতা-শঙ্করভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণানুবাদিত।)

[২য় অধ্যায়ের ৪৭ হইতে ৫৪ সংখ্যক শ্লোক—অন্বয়, অনুবাদ, ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদ সহ।—বর্তমান সম্পাদক]

[প্রথম বর্ষের 'উদ্বোধনে'র পুনর্মুদ্রণ সমাপ্ত।—বর্তমান সম্পাদক]

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ (পুনর্মুদ্রণ)

২

কোলে
বিস্কুট
জ্যাম জেলী আচার
স্কোয়াশ
ORANGE SQUASH
কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৭০০ ০১০
K B—3/74/B.

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—১৪৲ টাকা : পুরা সেট ১৩৫৲ টাকা
বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১০৲ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র

দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত

তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্ম-সমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে

পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গে

ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী

সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)

অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ

নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন

দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

গ্রন্থ	পৃষ্ঠা	মূল্য
কর্মযোগ—	পৃঃ ১৪১,	মূল্য ৪·০০
ভক্তিযোগ—	পৃঃ ৯৬,	মূল্য ২·৮০
ভক্তি-রহস্য—	পৃঃ ১৪৮,	মূল্য ১·৭৫
জ্ঞানযোগ	পৃঃ ২৯০,	মূল্য ৮·৫০
রাজযোগ—	পৃঃ ২১৪,	মূল্য ৫·৬০
সন্ন্যাসীর গীতি—	পৃঃ ২৩,	মূল্য ০·৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—	পৃঃ ২৯,	মূল্য ০·৮০
সরল রাজযোগ—	পৃঃ ৩৬,	মূল্য ০·৫০
পত্রাবলী—২য় ভাগ	পৃঃ ৫১৬	মূল্য ৫·৫০
ভারতীয় নারী—	পৃঃ ৯৩,	মূল্য ২·৪০
পওহারী বাবা—	পৃঃ ১৮,	মূল্য ০·৫০
স্বামীজীর আহ্বান—	পৃঃ ৮০,	মূল্য ০·৮০
ধর্ম-সমীক্ষা—	পৃঃ ১৩০,	মূল্য ২·৫০
বেদান্তের আলোকে	পৃঃ ৮১,	মূল্য ১·৫০
ধর্মবিজ্ঞান—	পৃঃ ১০২,	মূল্য ২·০০
ভারতে বিবেকানন্দ—		মূল্য ১০·০০
দেববাণী—	পৃঃ ১৫৩,	মূল্য ২·৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ—	পৃঃ ২৬৮,	মূল্য ৪·০০
কথোপকথন—	পৃঃ ১৩৫,	মূল্য ১·২৫
মদীয় আচার্যদেব—	পৃঃ ৬২,	মূল্য ০·৭৫
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—	পৃঃ ১৪৩,	মূল্য ২·০০
চিকাগো বক্তৃতা—	পৃঃ ৫২,	মূল্য ১·৫০
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ—	পৃঃ ১৩৪,	মূল্য ৩·০০
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—		(ছাপা নাই)

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

গ্রন্থ	পৃষ্ঠা	মূল্য
পরিব্রাজক—	পৃঃ ১৩২,	মূল্য ৩·০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—	পৃঃ ১৩৬,	মূল্য ২·২৫
বর্তমান ভারত—	পৃঃ ৪০,	মূল্য ১·৬০
ভাববার কথা—	পৃঃ ৯২,	মূল্য ১·২০
বাণী-সঞ্চয়ন—	পৃঃ ৩১৬,	মূল্য ৭·০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১৯·০০। ২য় ভাগ ১৭·০০
সাধারণ ১ম খণ্ড ৩·৫০ ; ২য় খণ্ড ৭·৮০ ; ৩য় খণ্ড ৫·২০ ; ৪র্থ খণ্ড ৭·০০ ; ৫ম খণ্ড ৭·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি— অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১·৬০ ; কাপড়ে বাঁধাই ১·৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। (ছাপা নাই)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬ ; সাধারণ ৬·০০
বাঁধাই ৭·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। মূল্য ৫·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২২৯, মূল্য ৪·০০

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। (ছাপা নাই)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ০·৭০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭·০০, ২য় ভাগ ৬·৫০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬। মূল্য ৬·০০ টাকা

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য—১৫·০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ৮·০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪·২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল চার্য। ছেলেদের উপযোগী। পৃঃ ৬৪, মূল্য ০·৭০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(একত্রে) শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। (ছাপা নাই)

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩৬৯, মূল্য ৬·০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল ১·২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২·৫০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ৮'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬. মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই) ; ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— ছাপা নাই)

আরত্রি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১৬;

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। (ছাপা নাই)

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৮০, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ প্রসঙ্গ— (ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে— স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৫২, মূল্য ৩'৩০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০, (ছাপা নাই)

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি — স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্ — স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ— স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি — স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র —স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০ ; ৩য় অঃ ১৩'০০ ; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি — (ছাপা নাই)

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮১, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব —স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ-চরিত — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃঃ ২৭৪, মূল্য ১০'০০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ২'০০ (ছাপা নাই)

ছোটদের বিবেকানন্দ — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৬২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

COVER PRINTED BY—

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্ট্রীগণের পক্ষে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'২০ টাকা

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৮৪

সূচীপত্র

সূচীপত্র

এন্টিথ্যাক্সেটুন
কার্বাঙ্কল, শোষ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া বা
পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল
লাগাইলেই সারিয়া যায়
বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে
সেলিং এজেন্ট—লিটন এণ্ড কোং কলিকাতা-১০
IT CUTS
IT CLEANSES
IT CURES

বেনারসী
সিল্ক
শাড়ী
পোষাক
শৈললাল মণিলাল
স্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট • কলি-১২
(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)
বহুবাজার
শ্যামবাজার
৫৫-২০০৭
কাশ্মিরী
শাল
বিছানা
হোসিয়ারী

ভাল চা বলতে
টসের
চা
TOSH'S
AIR TIGHT
এ, টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা—১

দিব্য বাণী

যতোঽনন্তশক্তেরনন্তাশ্চ জীবা যতো নির্গুণাদপ্রমেয়া গুণাস্তে।
যতো ভাতি সর্বং ত্রিধা ভেদভিন্নং সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥
যতো বুদ্ধিরজ্ঞাননাশো মুমুক্ষোর্যতঃ সম্পদো ভক্তসন্তোষিকাঃ স্যুঃ।
যতো বিঘ্ননাশো যতঃ কার্যসিদ্ধিঃ সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥

—গণেশপুরাণ, গণেশাষ্টকম্, ১, ৫

(এক সূর্য, তবু বহু জলকণিকায়
প্রতিবিম্বরূপে ভায় অসংখ্যের প্রায়—
সেইরূপ) অন্তহীন জীবের উদয়
অনন্তশকতিমান্ যাঁহা হ'তে হয়,
গুণাতীত তিনি, তবু জ্ঞানের অতীত
গুণরাশি তাঁর হয় সদা প্রকাশিত।
যাঁহা হ'তে রূপ পায় অখিল ভুবন—
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণে যাহার সৃজন,
তিনি দেব গণপতি—তাঁহারে সদাই
ভজি ভক্তিভরে আর প্রণতি জানাই।

যাঁহার কৃপায় হয় বুদ্ধির বিকাশ
মুমুক্ষু জনের হয় অজ্ঞানের নাশ
ভক্তের সন্তোষকর সম্পদ্‌নিচয়—
বিঘ্ননাশ কার্যসিদ্ধি যাঁহা হ'তে হয়,
তিনি দেব গণপতি—তাঁহারে সদাই
ভজি ভক্তিভরে আর প্রণতি জানাই।

কথাপ্রসঙ্গে

সাধনে অন্তরায়

সাধনে অন্তরায়—না, সাধনাই অন্তরায়? দুই-ই সত্য। তবে কোটির মধ্যে সম্ভবতঃ একজন সাধকই উপলব্ধি করেন যে, সাধনাই অন্তরায়। অবশিষ্ট একোনকোটি সাধক সাধনে অন্তরায় লইয়াই কোন-না-কোন সময়ে বিব্রত হন। মুনীশ্বর অষ্টাবক্র রাজা জনককে বলিয়াছিলেন, 'তুমি নিঃসঙ্গ নিষ্ক্রিয় স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন—সুতরাং তুমি যে সমাধির অনুষ্ঠান করিতেছ, ইহাই তোমার অন্তরায়।' অদ্বৈতবেদান্তের অত্যুত্তম অধিকারী রাজা জনক ব্রহ্মজ্ঞ অষ্টাবক্রের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় হওয়ায় তাঁহার পক্ষে বস্তুতঃ কোনও সাধন-ক্রিয়াই উপপন্ন হয় না। কিংবদন্তী আছে, অশ্বারোহণকালে একটি রেকাবে পা রাখিয়া অপর রেকাবটিতে পা রাখিতে যতটুকু সময় লাগে, অষ্টাবক্র মুনির উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই জনকরাজ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আচার্য শংকরও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে এইরূপ উত্তম অধিকারীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন যে, এইরূপ নিপুণমতি ব্যক্তিগণের একান্ত অভাব নাই, যাঁহারা 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য শ্রবণমাত্রেই অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এবং এই কারণে শংকরাচার্য আরও বলেন যে, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য শ্রবণ করাইয়া গুরু শিষ্যকে কখনও বলিবেন না, 'যাও, এখন তুমি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ সাধনের অভ্যাস করো।' 'তুমি স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় শুদ্ধচৈতন্য'—এই উপদেশ দিয়া পরক্ষণেই শিষ্যকে ঐ উপদেশ হইতে প্রচ্যুত করিয়া সাধন-ক্রিয়ার অভ্যাস করিতে নির্দেশ দেওয়া বস্তুতঃ অন্তরায় সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নহে। গুরু শিষ্যকে ঐরূপ নিদিধ্যাসনাদির উপদেশ তখনই দিবেন, যখন মন্দবুদ্ধি শিষ্য নিজেই স্বীকার করিবেন যে, শ্রবণ সত্ত্বেও ঐ মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য তাঁহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় নাই।

কোটির মধ্যে একজনের কথা থাকুক—তিনি তো সাধনা ও সিদ্ধির প্রত্যন্তরেখায় অবস্থিত! একোনকোটি সাধকগণ, যাঁহাদের সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে অপরিমেয় ব্যবধান, তাঁহাদের সাধনপথে অন্তরায়সমূহের আলোচনা করা যাইতে পারে। মূল অন্তরায় তো অবিদ্যা! সেই অবিদ্যারই অসংখ্য শাখা-প্রশাখা অজস্র অন্তরায় সৃষ্টি করে। ভারতীয় দার্শনিকগণ অতি প্রাচীনকালেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা ভুল, যাহা কিছু শুনিতেছি তাহা ভুল, যাহা কিছু আস্বাদ করিতেছি তাহা ভুল, ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রত্যেকটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমাদের মনে যে-বোধ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা ভ্রান্ত। বস্তু একটিই আছে, অথচ আমরা তাহাকে নানা রূপে, নানা রসে, নানা গন্ধে, নানা শব্দে, নানা স্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া অনুভব করিতেছি। ইহাই অবিদ্যা। এবং এই অবিদ্যা হইতেই কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য ভয় শোক ইত্যাদি যাবতীয় অনর্থের সৃষ্টি। যদিও অবিদ্যার এই বিবরণ অদ্বৈতবেদান্তমতেই দেওয়া হইল, তথাপি সাধারণভাবে বলা যায়, অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকই কোন-না-কোন ভাবে অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান বা বিপরীতজ্ঞানের অস্তিত্ব

স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং অবিদ্যার সংজ্ঞা যাহাই হউক না কেন, উহা যে-কোন মতের যে-কোন পথের সাধকেরই সাধনায় 'সাধারণ' অর্থাৎ অ-বিশেষ অন্তরায়। এবং অবিদ্যা হইতে উদ্ভূত ষড়রিপু আদিও অনুরূপভাবেই 'সাধারণ' অন্তরায়। এই অন্তরায়গুলি অল্প-বিস্তর সকলেরই সুবিদিত। গীতোক্ত দৈবী সম্পদের বিপরীত যাহা কিছু আসুরী সম্পদ আছে, সে-সকলই যে, যে-কোন সাধনপথে 'সাধারণ' অন্তরায়, তাহা না বলিলেও চলে।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনে ব্যাধি মানসিক-জড়তা সংশয় প্রমাদ আলস্য বিষয়তৃষ্ণা মিথ্যা-অনুভব একাগ্রতার অপ্রাপ্তি এবং একাগ্রতা লাভ করিয়াও ঐ অবস্থায় স্থিতিলাভ করিতে না পারা—এই নয়টিকে সাধনে অন্তরায় বলিয়াছেন। যোগপথ সম্পর্কেই এই অন্তরায়-গুলি উল্লেখিত হইলেও, মনে রাখা প্রয়োজন যে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানী পতঞ্জলি অধ্যাত্ম-সাধনাকে একটি বিজ্ঞানরূপেই উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই কারণে সাধন-সংক্রান্ত তাঁগার সিদ্ধান্তগুলি সকল সম্প্রদায়েই স্বীকৃত। ফলতঃ পূর্বোক্ত নয়টি অন্তরায় কি রাজযোগী, কি জ্ঞানযোগী, কি ভক্তিযোগী, কি কর্মযোগী—সকল সাধকেরই সাধনপথে 'সাধারণ' অন্তরায়।

'সাধারণ' অন্তরায়গুলি একটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা দুরূহ ব্যাপার। 'দম্ভ দর্প অভিমান' ইত্যাদি হইতে শুরু করিতে হইলে একটি 'মহাভারত' হইয়া যাইবে! সুতরাং আমরা 'বিশেষ' অন্তরায়গুলির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। অধ্যাত্মসাধনার যে-চারিটি প্রসিদ্ধ পথ রহিয়াছে, সেই পথগুলির প্রত্যেকটিতে বিশেষ অন্তরায় আছে—স্বামী বিবেকানন্দ উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই বিশেষ অন্তরায়গুলিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

জ্ঞানপথের অপর নাম বিচারপথ। এই পথে চলিতে চলিতে সাধক বিচারের দুশ্ছেদ্য বেড়া-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারেন। এইজাতীয় সাধক 'বিচারানন্দী'—মুক্তপুরুষের ন্যায় তাঁহার চালচলন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার মুক্তাবস্থা লাভ হয় নাই। বিচারপথে সমাধির উপর জোর নাই—জোর বিচারেরই উপর। এই কারণে বিচার-মার্গী সাধকের দৃষ্টি সমাধির উপর থাকে না। ইহাতে অসঙ্গতি কিছুই নাই, বরং ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁহার আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত, মনবুদ্ধির অতীত ব্রহ্মবস্তুর অপরোক্ষ অনুভূতি তাহার হইয়াছে, অথবা বিচারের স্তরেই তিনি আবদ্ধ আছেন। শংকরাচার্য বলিয়াছেন, বীণাবাদন-নৈপুণ্যের দ্বারা শ্রোতাদের আনন্দ-বিধান করা যাইতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যলাভ করা যায় না। যে-শব্দরাশির সাহায্যে সাধক বেদান্ত-বিচার করেন, তাহা তাঁহার ও অপরের প্রীতিপ্রদ হইলেও সাধককে মুক্তিরূপ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং বিচার-সর্বস্ব হওয়া জ্ঞানমার্গী সাধকের বিষম অন্তরায়। সমস্ত বিচারের অবসানেই যে পরম ও চরম প্রাপ্তি, ইহা বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন: 'বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি', 'বিচার করতে করতে মন যখন স্থির হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান' ইত্যাদি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা প্রয়োজন; বিচার ও ধ্যানবলে লক্ষ্যে উপনীত হইতে হয়। বিচার ধ্যান-সমন্বিত হইলেই জ্ঞানপথ নিষ্কণ্টক হয়।

ভক্তিপথে বিশেষ অন্তরায় হইল ভাবের

বহিঃপ্রকাশ। ভাব উত্তম, কিন্তু ভাবের উচ্ছ্বাস নহে। ভাব চাপিয়া রাখিতে হয়, বাহিরে উহা প্রকাশ করিবার প্রবণতা ভাবকে গভীর হইতে দেয় না। কথিত আছে, শ্রীরূপ গোস্বামীর জনৈক শিষ্য একদা পূজা করিতে করিতে ভাবে অধীর হইয়া নৃত্য করিতে থাকিলে শ্রীরূপ তাঁহাকে ত্যাগ করেন। শ্রীরাধা শ্রীরূপকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া শিষ্যকে পুনরায় গ্রহণ করিতে বলায় শ্রীরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, 'তুমি গোয়ালার মেয়ে, তুমি এর কি বুঝবে! শ্রীগুরুর কৃপায় আমি বুঝেছি কিভাবে শিষ্যকে শাসন করতে হয়।'

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন: যে-ভাবোচ্ছ্বাস মানবজীবনে স্থায়ী পরিবর্তন উপস্থিত করে না, যাহার প্রভাব মানবকে এই মুহূর্তে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া পরমুহূর্তে কাম-কাঞ্চনের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না, তাহার গভীরতা নাই, সুতরাং তাহার মূল্য অতি অল্প। উহার প্রভাবে কাহারও শারীরিক বিকৃতি—অশ্রুপুলকাদি অথবা কিছুক্ষণের জন্য বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক লোপ হইলেও উহা স্নায়বিক দৌর্বল্যপ্রসূত; মানসিক শক্তিবলে উহাকে দমন করিতে না পারিলে পুষ্টিকর খাদ্য এবং চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করা কর্তব্য।

বস্তুতঃ স্বামীজীর একটি বিশেষ উপদেশ এই যে, সংকীর্তনাদিতে লম্ফঝম্ফ করিয়া স্নায়ু-মণ্ডলীকে পর্যস্ত করিয়া মূর্ছাগ্রস্ত হওয়াকেই ভক্তি বলে না। ঐরূপ ভাবাবেগ ভক্তিপথের সাধকের বিষম অন্তরায়। ভাবের আবেগে কুণ্ডলিনী শক্তি সহসা জাগ্রত ও উত্থিত হয় বটে, কিন্তু উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঐ শক্তি যে ত্বরিতবেগে ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছিল, সেই ত্বরিতবেগেই নিম্নাভি-মুখী হয়। ফলে সাধকের অগ্রগতিই শুধু ব্যাহত হয় না, তাঁহার মন এমন এক নিম্নাবস্থায় পতিত হয় যে, সেখান হইতে উহাকে উঠাইয়া নিয়মিত সাধনভজনে নিয়োজিত করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য স্বামীজী ভাবালুতা-বর্জিত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পথই প্রশস্ত ও নিরাপদ পথ বলিয়া বারংবার নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মানবজীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন: 'অনন্তচৈতন্যলাভই মানবের লক্ষ্য। সেখানে আবেগের স্থান নাই, ভাবালুতার স্থান নাই, ইন্দ্রিয়গত কোন কিছুর স্থান নাই; সেখানে কেবল বিশুদ্ধ বিচারের আলো, সেখানে মানুষ আত্মস্বরূপে দণ্ডায়মান।' জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকিয়া ধীর স্থির শান্ত ভাবে ভক্তির সাধনা করা উচিত, ইহাই স্বামীজীর অভিপ্রায়। উপনিষদও বলিতেছেন: 'শান্তঃ উপাসীত।'

যোগপথে বিশেষ অন্তরায় এই যে, সাধকের মন যোগবিভূতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যায়। যোগসাধনার ফলে যে-সকল বিভূতিলাভ হয়, মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে সেগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। একজন অধ্যাত্মবিজ্ঞানী হিসাবে তাঁহাকে বলিতেই হইয়াছে, কি কি বিভূতি কোন্ কোন্ উপায়ে লাভ করা যায়। কিন্তু তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিয়াছেন যে, এই সকল বিভূতির প্রতি আসক্ত হইলে সাধকের পক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছান অসম্ভব। লক্ষ্য হইল কৈবল্য। নির্বিকল্প সমাধি অর্থাৎ যে-সমাধিতে মন নির্বিষয় হয়, তাহাই উক্ত লক্ষ্যের দ্বারস্বরূপ। এদিকে বিভূতিগুলি 'সংযমে'র দ্বারা লভ্য। 'সংযমে'র অর্থ: ধারণা ধ্যান ও সবিকল্প সমাধি। 'সংযম'-কালে মন সবিষয় থাকে—বিষয়চিন্তারহিত হয় না, কারণ বিষয়ের উপরই 'সংযম' করিতে হয়। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, 'সংযম'-সহায়ে অণিমাদি আশ্চর্য আশ্চর্য বিভূতি লাভ হইলেও সেগুলি যোগীর

একান্ত অভীষ্ট নির্বিকল্প সমাধির পথে অন্তরায়। মানুষ সামান্য ঐশ্বর্য লাভ করিয়া তাহাতেই মুগ্ধ আসক্ত ও গর্বিত হয়। সুতরাং অপরিমেয় অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়া সাধক যে তাহাতেই আবদ্ধ হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। মহর্ষি পতঞ্জলি এইজন্য বারংবার সাধককে ঐ সকল সিদ্ধি হইতে দূরে থাকিতে বলিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণীর সহিত পরিচিত, তাঁহারা সকলেই জানেন, তিনি 'সিদ্ধাই'গুলিকে কতদূর হেয় জ্ঞান করিতেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, কর্মের গতি অতি গহন। মানুষ মনে করে যে, সে নিষ্কাম কর্ম করিতেছে, কিন্তু খতাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, একটা-না-একটা কামনার তাড়নায় সে কর্ম করিতেছে। বস্তুতঃ খুব কম লোকই পাওয়া যায়, যাঁহারা যথার্থ কর্মযোগী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী বলিতেন, 'কর্ম বড় কঠিন। Cool brain (ঠাণ্ডা মাথা), ত্যাগ, বৈরাগ্য খুব দরকার। তা না হ'লে ওতে ডুবতে হয়। সিদ্ধিলাভের পর প্রকৃতপক্ষে কর্মের অধিকারী হয়।' স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, 'কর্মের এমন মারপ্যাঁচ যে, বড় বড় সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন।'

নিষ্কাম কর্মের কঠিন পথে সাধকের বিশেষ অন্তরায় হইল নিজ সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ বাড়ানো। জগতের সকল মানুষের দুঃখ আমরা কোন কালেই দূর করিতে পারিব না—কোন মহাপুরুষ বা অবতারপুরুষও পারেন নাই। সুতরাং যেটুকু জনহিতকর কর্ম আমরা সুষ্ঠুভাবে এবং নারায়ণসেবাবুদ্ধিতে করিতে পারি, সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, তাহার অধিক কর্মের প্রবর্তন করা নিরাপদ নহে। যখনই ঐরূপ করিবার প্রবণতা দেখা দেয়, তখনই আত্মবিশ্লেষণ করিয়া দেখা উচিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কর্ম করিবার স্পৃহা অন্তরে জাগরিত হইয়াছে কিনা। সর্বদাই মনে রাখা উচিত, যাঁহারা যথার্থ কর্মযোগী তাঁহারা অতি সামান্য কাজও প্রসন্নচিত্তে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে মন-প্রাণ দিয়া করিয়া থাকেন, লোকের প্রশংসা-লাভের জন্য তাঁহারা কখনও কোনও কাজ করেন না।

কর্মযোগ সম্পর্কে আরেকটি বিষয় উল্লেখ-যোগ্য। ভক্তি জ্ঞান বা যোগের পথ চিত্তের একাগ্রতার বিশেষ সহায়ক, কিন্তু কর্মের পথে সাধকের চিত্ত কিছুটা বিক্ষিপ্ত থাকে। এই বিক্ষেপ একটি অন্তরায়। কারণ বস্তুলাভের জন্য চিত্ত কেবলমাত্র শুদ্ধ হইলেই চলিবে না, উহা একাগ্র হওয়াও প্রয়োজন। অবশ্য ইহা সত্য যে, শুদ্ধ চিত্ত স্বভাবতই একাগ্রতা-প্রবণ হয়, কারণ উহা বিষয়াসক্তিবর্জিত। তথাপি চিত্তের একাগ্রতা সাধনার ধন, উহা অভ্যাস-সাপেক্ষ; বাহ্য কর্ম ও ধ্যান এক বস্তু নহে। সুতরাং কর্মজনিত চিত্তের বিক্ষেপ দূর করিবার জন্য কর্মযোগীর পক্ষে উচ্চ বিষয়ের চিন্তা ও চর্চা এবং ধ্যানাদির অভ্যাস অত্যাবশ্যক।

প্রত্যেকটি সাধনপথের উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ অন্তরায়গুলি সহজে পরিহার করা যাইতে পারে, যদি জ্ঞান ভক্তি যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, চতুর্বিধ যোগের সমন্বয়ে গঠিত চরিত্রই সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্র এবং এইরূপ চরিত্রগঠনই বর্তমান যুগের আদর্শ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য তিনি যে প্রতীকটি নির্ধারিত করিয়াছিলেন এবং যাহা বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতীকরূপে প্রখ্যাত, তাহাতে এই চতুর্বিধ যোগের সমন্বয়-মূলক আদর্শই তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : ননু এবং দেহাদি-বিলক্ষণম্ আত্মানং তস্য ব্রহ্মত্বং চ জানতাম্ অপি কেষাংচিৎ মুক্ত্যভাবঃ, পুনঃ অপি দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিঃ চ দৃশ্যতে ; অতঃ দেহাদি-ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং নিষ্ফলম্ ইতি আশঙ্ক্য তেষাম্ অপ্রতিবদ্ধাত্মজ্ঞানাভাবাৎ এব মুক্ত্যভাবঃ, ন তু জ্ঞানস্য তদসাধনত্বেন। প্রতিবন্ধঃ চ অসত্য-প্রপঞ্চানাত্ম-দেহাদিষু সত্যত্বাত্মত্ব-বুদ্ধিঃ পূর্ব-পূর্ব-বাসনয়া প্রাপ্তা, প্রপঞ্চ-দেহাদিষু অসত্যত্বানাত্মত্ব-ভাবনয়া আত্মনঃ চিদ্রূপত্ব-ভাবনয়া চ দীর্ঘকাল-নৈরন্তর্য-সৎকারাভ্যস্তয়া নিবর্ততে ; নিবৃত্তে তস্মিন্ জ্ঞানেন অজ্ঞানে নষ্টে তে সর্বে ব্রহ্ম এব ভবন্তি ইতি আশয়েন আহ—

(**মূলস্তোত্রম্ :**)

হিত্বা হিত্বা দৃশ্যমশেষং সবিকল্পং
মত্বা শিষ্টং ভাদৃশিমাত্রং গগনাভম্।
ত্যক্ত্বা দেহং যং প্রবিশন্ত্যচ্যুতভক্তা-
স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১১ ॥

হিত্বা ইতি। **দৃশ্যং** দৃশো গোচরং ; **সবিকল্পং** ঘটত্ব-পটত্ব-ব্রাহ্মণ্যাদি-বিকল্প-সহিতম্ ; * **সর্বম্** এব বাহ্যম্ অভ্যন্তরং[১] চ প্রপঞ্চং ; **হিত্বা** অসত্যত্বেন অনাত্মত্বেন চ ভাবনয়া নিরস্য ; দেহাদেঃ অনাত্মত্বং জগতঃ মিথ্যাত্বং বাসয়িত্বা ইতি অর্থঃ। তৎ উক্তং ভারতীতীর্থৈঃ—'আত্মা দেহাদিভিন্নোঽয়ং মিথ্যা চেদং জগত্তয়োঃ। দেহাদ্যাত্মত্বসত্যত্ব-ধীর্বিপর্যয়ভাবনা॥ তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাঽতো দেহাদিরিক্ততাম্। আত্মনো ভাবয়েৎ তদ্বন্মিথ্যাত্বং জগতোঽনিশম্॥' [পঞ্চদশী, ৭।১১১,১১২] ইতি। **শিষ্টং** পরিশিষ্টম্। **ভাদৃশিমাত্রং** স্বপ্রকাশ-চিন্মাত্রম্। স্বচ্ছত্বাসঙ্গত্ব-বিভুত্বাদিভিঃ **গগনোপমং মত্বা** আত্মত্বেন জ্ঞাত্বা। তৎ উক্তং বিদ্যারণ্যগুরুভিঃ—'পঞ্চকোশপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাব-শেষতঃ। স্বস্বরূপং স এব স্যাচ্ছূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটমিতি॥' [পঞ্চদশী, ৩।২২] ততঃ **দেহং ত্যক্ত্বা** আত্মত্বেন অনভিমত্য ; যং বিষ্ণুং **প্রবিশন্তি**। তত্র প্রবেশঃ তদাত্মতয়া অবস্থানম্ এব, মুখ্যপ্রবেশস্য অসম্ভবাৎ। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' [তুলনীয় মু. উ.

* এখানে '**অশেষং**' পদটি টীকাকার উল্লেখ না করিয়া কেবল তাহার অর্থটিই লিখিয়াছেন।—সঃ

১ এখানে 'আভ্যন্তরং' পাঠ হওয়াই সমীচীন—সঃ

৩।২।৯] ইত্যাদি শ্রুতেঃ। **অচ্যুতভক্তাঃ**—অচ্যুতে চ্যুতিরহিতে অবিনাশিনি ব্রহ্মণি আত্মত্বেন যা ভক্তিঃ ভজনং তদ্‌যুক্তাঃ ইতি অর্থঃ। 'অথ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহম্ অস্মীতি ন স বেদ' [বৃ. উ. ১।৪।১০] ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ১১ ॥

টীকানুবাদ: [শঙ্কা:] আচ্ছা, [যাঁহারা] এইভাবে আত্মাকে দেহাদিবিলক্ষণরূপে জানেন এবং তাহার ব্রহ্মত্বও জানেন, [তাঁহাদের মধ্যে] কাহারও কাহারও মুক্তি হয় না; কেবল তাহাই নহে, দেহাদিতে [তাঁহাদের] আত্মবুদ্ধিও দেখা যায়; সুতরাং দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান নিষ্ফল[২] —এই আশঙ্কা করিয়া [উত্তরে বলা হইতেছে যে, যাহাদের কথা বলা হইল] তাহাদের প্রতিবন্ধকরহিত আত্মজ্ঞানের অভাববশতই মুক্তি হয় নাই [বুঝিতে হইবে], কিন্তু জ্ঞানের তাহাতে (দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি এবং মোক্ষলাভে) সাধকতা নাই, ইহা নহে।[৩] [প্রতিবন্ধক কি এবং তাহার নিবৃত্তির উপায় কি, তাহা বলা হইতেছে—] প্রতিবন্ধক হইতেছে মিথ্যা জগতে সত্যত্ববুদ্ধি ও অনাত্ম দেহাদিতে আত্মত্ববুদ্ধি, যাহা পূর্ব পূর্ব [জন্মের] বাসনা (সংস্কার) হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরের সহিত জগতের মিথ্যাত্ব ও দেহাদির অনাত্মত্ব এবং আত্মার চিদ্রূপত্ব ভাবনার অভ্যাস করিলে [পূর্বোক্ত মিথ্যাবুদ্ধিরূপ] প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হয়; তাহা (প্রতিবন্ধক) নিবৃত্ত হইলেই জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হওয়ায় সমস্তই (দেহ, জগৎ ইত্যাদি সর্ব পদার্থই) ব্রহ্মস্বরূপে পর্যবসিত হয়—এই অভিপ্রায়ে [আচার্য] বলিতেছেন: মূলস্তোত্র, শ্লোক ১১, পৃ: ৩৪২ দ্রষ্টব্য]।

অন্বয়: সবিকল্পম্ অশেষং দৃশ্যং হিত্বা হিত্বা, শিষ্টং গগনাভং ভাদৃশিমাত্রং মত্বা, দেহং ত্যক্ত্বা অচ্যুতভক্তাঃ যং প্রবিশন্তি, তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে। ১১।

স্তোত্রানুবাদ: সবিকল্প (নাম, জাতি প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত) যাবতীয় দৃশ্য

২ আত্মা যে দেহাদিব্যতিরিক্ত এই জ্ঞানের ফল মোক্ষ। ইহার অন্য কোনও ফল নাই। কিন্তু আত্মাকে দেহাদিব্যতিরিক্ত বলিয়া জানা সত্ত্বেও অনেকের মোক্ষলাভ হয় না; কেবল তাহাই নহে, দেহাদিতে পূর্বের ন্যায়ই আত্মবুদ্ধিও থাকে। সুতরাং আত্মাকে দেহাদিব্যতিরিক্তরূপে জানিয়া মোক্ষলাভ না হইলে এইরূপ আত্মজ্ঞান—অন্য কোনও ফলদায়ক না হওয়ায়—নিষ্ফল হইল, ইহাই পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা।

৩ পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত—এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি হয় এবং মোক্ষলাভ হয়। পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, আত্মজ্ঞান এই দ্বিবিধ ফলের মধ্যে কোন ফলই জন্মাইতে পারে না। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, জ্ঞান যে ঐ দ্বিবিধ ফল জন্মাইতে পারে না, তাহা নহে; কিন্তু প্রতিবন্ধক দূর না হইলে যথার্থ জ্ঞান প্রকাশিত হয় না। সুতরাং যেখানে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না এবং মোক্ষলাভ হয় না, সেখানে প্রতিবন্ধক দূর হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। ফলকথা এই যে, আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিলেই অজ্ঞাননিবৃত্তি হওয়ায় যথার্থ ফললাভ হয়। সুতরাং যেখানে ঐরূপ ফললাভ হয় না, সেখানে আত্মার পরোক্ষ জ্ঞান হইয়াছে, অর্থাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তি হয় নাই, ইহাই তাৎপর্য। অর্থাৎ অজ্ঞানই প্রতিবন্ধক।

(অনুভবযোগ্য বস্তু) পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট আকাশোপম (সর্বব্যাপক ও অসঙ্গ) স্বপ্রকাশ-চৈতন্যস্বরূপকে [আত্মরূপে] অবগত হইয়া, দেহাভিমান বর্জন করিয়া অচ্যুতভক্তগণ (অবিনাশী ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ সাধকগণ) যাঁহাতে প্রবেশ করেন, সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি। ১১।

টীকানুবাদ: **হিত্বা** ইত্যাদি। **দৃশ্যং**—দৃষ্টির গোচর অর্থাৎ অনুভবযোগ্য[৪] **সবিকল্পং**—ঘটত্ব পটত্ব ব্রাহ্মণত্বাদি বিবিধ কল্পনা[৫] সহিত সমস্ত বাহ্য ও আন্তর প্রপঞ্চ **হিত্বা**—অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা ও অনাত্মা, এই ভাবনাদ্বারা নিরাস করিয়া; অর্থাৎ দেহাদির অনাত্মত্ব ও জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া—ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে [আচার্য] ভারতীতীর্থ বলিয়াছেন -'আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং এই জগৎ মিথ্যা। সেই দেহাদিকে আত্মা এবং জগৎকে সত্য বলিয়া জানাকেই বিপরীত জ্ঞান বলে। তত্ত্বভাবনার দ্বারা (ধ্যানসহায়ে তত্ত্বের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার দ্বারা) সেই বিপরীতজ্ঞান নষ্ট হয়। অতএব আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নত্বজ্ঞান যেরূপ নিরন্তর চিন্তা করিতে হইবে, জগতের মিথ্যাত্বও সেইরূপ সর্বদা চিন্তা করিতে হইবে।'

শিষ্টং—অবশিষ্ট; **তাদৃশিমাত্রং**—কেবল স্বপ্রকাশচৈতন্যকে, স্বচ্ছত্ব অসঙ্গত্ব ও বিভুত্বাদি গুণযোগে **গগনাভং**—আকাশসদৃশ, **মত্বা**— নিজের] আত্মরূপে জানিয়া;—এই বিষয়ে বিদ্যারণ্য-আচার্য বলিয়াছেন—'পঞ্চকোশ [বিচারসহায়ে মিথ্যারূপে] পরিত্যক্ত হইলে[৬]

৪ বেদান্তমতে অন্তঃকরণের বৃত্তির দ্বারা অজ্ঞানের আবরণভঙ্গ হওয়ার পর চৈতন্যের দ্বারা বস্তুর প্রকাশকেই অনুভব বলে। সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞানই অনুভব।

৫ বস্তুর স্বরূপ নাম-জাত্যাদি-শূন্য। বস্তুকে অনুভব করিবার পর অপরকে বুঝাইবার জন্য কোন একটি শব্দের ব্যবহার করা হয়। এই শব্দটি অনুভূত বস্তুর বাচক নামরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুতরাং নামের সহিত বস্তুর বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ কল্পিত। এইজন্যই নামের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ-জ্ঞানকে কল্পনাযুক্ত জ্ঞান বা সবিকল্প জ্ঞান বলা হয়।

৬ হৃদয়গুহায় ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিবার জন্য শরীরাশ্রিত যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান আবশ্যক। এইজন্য হৃদয়ের গুহা বলিতে কি বুঝায় তাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে বেদান্তে পঞ্চ-কোশের কথা বলা হইয়াছে। অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এইগুলিই পঞ্চকোশের নাম। খাদ্যবস্তুর সাহায্যে যাহার পরিপুষ্টি হয়, তাহাই অন্নময় কোশ অর্থাৎ স্থূল-দেহই অন্নময় কোশ। প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান—এই পঞ্চবায়ু যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের পরিচালক বলিয়া পঞ্চবায়ুর নাম প্রাণময় কোশ। দেহকে 'আমি' বা 'আমার' বলিয়া যে অভিমান জন্মে, সেই অভিমানের কর্তাকেই অর্থাৎ মনকেই মনোময় কোশ বলে। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি সমস্ত জ্ঞানের জনক বলিয়া ইহাদিগকে বিজ্ঞানময় কোশ বলা হয়। 'আমি ভোক্তা'—এইরূপে ভোগের কর্তারূপে যাহাকে বুঝা যায়, তাহার নাম আনন্দময় কোশ। ইহাদের কোনটিই আত্মা নহে। সুতরাং স্থূল শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতমরূপ আনন্দময় কোশ পর্যন্ত আত্মা বা অহংরূপে প্রতিভাত হইলেও বিচারের সাহায্যে ইহাদের অনাত্মত্ব নির্ধারণ করিতে হয়। [এই বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য 'পঞ্চদশী'-গ্রন্থের তৃতীয় প্রকরণ, 'পঞ্চকোশবিবেক' দ্রষ্টব্য।]

জ্ঞানস্বরূপ এক সাক্ষীই অবশিষ্ট থাকেন। সেই সাক্ষীই জীবের স্বস্বরূপ হইবে, তাহার (স্বস্বরূপের) শূন্যত্ব৭ অসম্ভব।'

তদনন্তর **দেহং ত্যক্ত্বা**—দেহাদিতে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া যং—যে বিষ্ণুতে **প্রবিশন্তি**—[সাধকগণ] প্রবেশ করেন; তদাত্মকরূপে ঐ তত্ত্বে অবস্থানই এখানে প্রবেশ [শব্দদ্বারা বিবক্ষিত], কারণ প্রবেশ শব্দের মুখ্য অর্থ এখানে সম্ভব নহে। শ্রুতিও বলেন—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইয়া যান।' **অচ্যুতভক্ত্যাঃ**—অচ্যুত অর্থাৎ চ্যুতিরহিত অবিনাশী ব্রহ্মে [স্বকীয়] আত্মরূপে যে ভক্তি বা ভজন, তাহার দ্বারা (সেইরূপ ভক্তির দ্বারা) যুক্ত—ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রুতি : যে [ব্যক্তি] দেবতাকে নিজ হইতে ভিন্ন জানিয়া [অর্থাৎ] দেবতা আমা হইতে ভিন্ন এবং আমিও দেবতা হইতে ভিন্ন, [এইরূপ] উপাসনা করে, সে [প্রকৃত তত্ত্ব] জানে না। ১১।

৭ সুষুপ্তির পরে জাগ্রত ব্যক্তি মনে করে—'সুষুপ্তিকালে আমি ছিলাম না।' এই অনুভবের দ্বারা সুষুপ্তিকালে অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। সুষুপ্তিকালে যাহা থাকে, তাহাই আত্মা। সুতরাং অনস্তিত্ব বা শূন্যই আত্মা—ইহা শূন্যবাদী বৌদ্ধদের সিদ্ধান্ত।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

মা তাঁহার অক্ষম সন্তানগণের মনোবাসনা কত অচিন্ত্য অদ্ভুত উপায়ে পূর্ণ করিতেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মায়ের শেষ অসুখে দেশে অনেক দিন ভুগিয়া শরীর খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও অপর সকলে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া কলিকাতা হইতে সাধুদের পাঠাইয়া মাকে আনয়ন করিয়াছেন। মা উদ্বোধনে আছেন। যতদূর ভাল সম্ভব, চিকিৎসা সেবা ঔষধপথ্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশেষ সুফল পাওয়া যাইতেছে না। রোজ বিকালে একটু একটু জ্বর হয়। বহু ঔষধপথ্যেও উহা সারিতেছে না, কালাজ্বর বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। জ্বরচিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞ প্রাচীন সুবিজ্ঞ ডাক্তার পি. ডি. বোস সম্প্রতি দেখিতেছেন। তিনি দেখিতে আসিয়া ক্রমে যখন রোগিণীর বিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন, তদবধি ভিজিটের টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে চিকিৎসা করিতেছেন, কিন্তু কখন কখন একটু ভাল মনে হইলেও স্থায়ী উপকার কিছুই বুঝা যায় নাই, বরং শরীর খারাপের দিকেই চলিয়াছে। মায়ের অসুখের খবরে চিন্তিত হইয়া দেশদেশান্তর হইতে তাঁহার সন্তানেরা ছুটিয়া আসিতেছেন এবং মাকে দর্শন করিয়া সকলেরই হৃদয় অতিশয় বিষণ্ণ, দুঃখিত। বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছে। মাকে প্রণাম করা, তাঁহার চরণ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ;

এমনকি দর্শন করাও কঠিন। সাধারণে তো মায়ের কাছেই যাইতে পায় না, বিশেষ পরিচিত সন্তানেরাই দর্শন ও দুই-একটি কথা বলিতে পারে। সেবক-সেবিকাগণ বিশেষ হুঁশিয়ারিতে পাহারা দেন, ভক্তেরা মায়ের সুখ-স্বাস্থ্যই কামনা করেন, সেজন্য কেহ কোনপ্রকারে নিয়ম লঙ্ঘন ও তাঁহার পীড়াবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করেন না। দূরদেশাগত ভক্তও মাকে বিশেষ কারণে দর্শন করিতে চাহিলে পূজনীয় শরৎ মহারাজের অনুমতি লইতে হয়। তিনিও খোঁজখবর লইয়া অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করেন সত্য, তবে কখন কখন মায়ের অভিপ্রায়মতে বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি শিথিলও হইয়া থাকে। মায়ের অসুখের খবর পাইয়া তাঁহার একটি দীন সন্তান দূরদেশ হইতে আগমন করিয়াছেন এবং পূর্ব হইতে সকলের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা থাকায় মাকে দর্শনাদিও করিতেছেন। তিনি ঘরের ভিতর গেলেও একটু দূর হইতেই মাকে দর্শন করিয়া, কুশল-সমাচার লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসেন, কখনও মা তাঁহাকে ডাকিলে নিকটে যান এবং দুই-চারিটি বাক্য-বিনিময় হয় বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ভয়ে ভয়ে বাহির হইয়া আসেন, যাহাতে মায়ের বেশীক্ষণ কথা বলিয়া কষ্ট না হয় এবং অপরের নজরে না পড়েন, হয়ত তাহা হইলে আসা-দেখাটুকুও বন্ধ হইয়া যাইবে। অসুখের সময় প্রণাম করিতে নাই, সেজন্য প্রণামও করেন না, পাদস্পর্শ তো দূরের কথা, বড়জোর হাতজোড় করা পর্যন্ত। মায়ের চোখমুখের প্রসন্নতা, মনপ্রাণ-স্নিগ্ধকারী বাণী এখনও প্রায় পূর্ববৎই রহিয়াছে। সেজন্য মনে হয় না সন্তানদের শীঘ্রই ছাড়িয়া যাইবেন। আর মানুষের মন কখনও ভরসা ছাড়ে না, তাই সকলেরই আশা—মা পূর্ব পূর্ব বারের মতো এবারও সারিয়া উঠিবেন, সন্তানদের সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

যদিও মায়ের কাছে গেলে এই প্রকার আশা-ভরসায় হৃদয় পূর্ণ হয়, তথাপি দূরে আসিয়া অসুখের ধরন, চিকিৎসার বিফলতা চিন্তা করিয়া, বিশেষতঃ মায়ের দেহের প্রতি উদাসীনতা এবং সর্বোপরি শ্রীমতী রাধারাণীর উপর উপেক্ষাভাব দেখিয়া-শুনিয়া অন্তরে বিষম আতঙ্কের উদয় হয়। যে রাধিকে না দেখিলে মুহূর্তে মায়ের মন ছট্‌ফট্‌ করিত, তিনি এখন আর তাহাকে দেখিতে চান না, নিকটে আসিলে সরিয়া যাইতে বলেন, এমনকি তাঁহার নিকট হইতে দেশে চলিয়া যাইবার জন্যও বলিয়া দিয়াছেন। রাধির অশ্রুজলও তাঁহার মনে সহানুভূতি সমবেদনা আনয়ন করে না। স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, 'মনকে তুলে নিয়েছি, আর নয়।' দূরাগত সেই সন্তানটি আসেন, দেখিয়া চলিয়া যান—দুই-একটি কথা বলিয়া। তাহাতে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেও প্রাণের ভিতর দিন দিন একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল। 'হায়! আমাদের পোড়া অদৃষ্ট! কোন্ মুহূর্তে সোনার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে, কে জানে! একটিবার প্রাণ খুলিয়া মায়ের সঙ্গে দুইটা কথা বলিতে পাইলাম না, ভাল করিয়া দর্শন করিতে পাইলাম না, চরণ স্পর্শ করিতে পাইলাম না! সাক্ষাৎভাবে একটু সেবারও ভাগ্য হইল না!' আসেন যান, অন্তরের তীব্র ব্যথা অন্তরেই গোপন রহিল। মাকে একদিনও ঘুণাক্ষরে একটিবার আকাঙ্ক্ষা জানান নাই, মায়ের এই অসুখ, তাহার উপর আবার তাঁহাকে উৎপীড়ন! অমনি কত দুষ্কর্ম, পাপের বোঝা চাপাইয়াছি, তাহার কি গণনা আছে? আমাদের জন্যই তো আজ তাঁহার এই দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। এইসব কথা ভাবিয়া মনে লজ্জা ও অনুতাপ হয়, আর

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করেন, 'ক্ষমা করো, প্রভো, দাসের প্রতি যথেষ্ট কৃপা করিয়াছ, অনেক সাধ মিটাইয়াছ, এখন আর কিছু না হইলেও আপসোস নাই, শুধু মাকে সুস্থ করিয়া দাও, আরও কিছুকাল অন্ততঃ আমাদিগকে মাতৃহারা অনাথ করিও না।' মায়ের বিছানার সম্মুখেই ঠাকুরের সিংহাসন, সেখানে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া, ঠাকুর ও মা উভয়ের নিকট মনোবেদনা প্রকাশ ও প্রার্থনা করিয়া প্রত্যহ ফিরিয়া আসেন।

কয়েকদিন পরে একদিন দ্বিপ্রহরে হঠাৎ কি প্রয়োজনে মায়ের ঘরের দিকে গেলে দরজা দিয়া ঘরের ভিতর একটু উঁকি মারিতেই মা তাঁহাকে ডাকিয়া একেবারে কাছে নিলেন এবং সম্মুখবর্তী সেবিকাকে তাঁহার পাখা সন্তানের হাতে দিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। সন্তানের অন্তরে এই আকস্মিক ব্যাপারে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তিনি বুঝিলেন, সেবিকা সম্ভবতঃ কার্যান্তরে চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন; মা-ও অপেক্ষা করিতেছিলেন তাঁহাকে ছুটি দিবার জন্য। দ্বিপ্রহরে পথ্য পাওয়ার পর এক ঘণ্টা বসিয়া বিশ্রাম করিয়া তৎপরে শয়ন ও নিদ্রার জন্য চিকিৎসকের নির্দেশ, সেজন্য মা আহারের পর বসিয়া আছেন, বিছানার উপর তাকিয়া ঠেসান দিয়া, পা মেলিয়া। সেবিকা পাখা হাতে দিয়া চলিয়া গেলে সন্তান মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে একটু একটু হাওয়া করিতেছেন। আর মা মাঝে মাঝে দুই-একটি কথা বলিতেছেন। একটু তন্দ্রার ভাব আসিতেছে, কিন্তু ঘুমাইবেন না; ছেলের সঙ্গে কথা বলিয়া নিদ্রাকে দূর করিতেছেন। অনেক-দিন পরে মায়ে-পোয়ে আজ কাছাকাছি; খাওয়ার পর সকলেই বিশ্রাম করিতেছেন, সারা বাড়ী নীরব নিস্তব্ধ। কদাচিৎ নীচে আফিস-ঘরে একটু-আধটু কথা শুনা যায়। ছেলে ভয়ে নিজে থেকে কোন কথা বলিতেছেন না, কিন্তু মা নিজে থেকে অতি আপনার করিয়া অন্য তাহার মনপ্রাণ সারা জন্মের মতো পরিতৃপ্ত করিতে ঘরোয়া কথা আস্তে আস্তে বলিতেছেন। সন্তানটি ভয়ে ভয়ে—যাহাতে মায়ের অসুখ না বাড়ে সেজন্যই—অবহিতভাবে দূরে রহিয়াছেন। প্রণামাদি করিলে রোগ স্থায়ী হয় শুনিয়া এবার আসিবার পর একদিনও মায়ের পাদস্পর্শ করিতে সাহস করেন নাই। অদ্য মায়ের খুব কাছে দাঁড়াইলেও বিশেষ সাবধান আছেন, যাহাতে মায়ের দেহস্পর্শ না হয়। মা কিন্তু একথা-সেকথা বলার পর নিজের অসুখের কথা তুলিয়া এত চিকিৎসাদি সত্ত্বেও কিছু ফল হইতেছে না বলিলেন। সন্তানটি শিশুকে বুঝাইবার মতো বলিতেছেন, 'না, সারিয়া যাইবে ঠাকুরের কৃপায়, কোন ভাবনা নাই' ইত্যাদি। মায়ের মুখে চোখে কথায় অসুখের জন্য কিংবা শরীরের জন্য বিন্দুমাত্র দুঃখ চিন্তা বা উদ্বেগের চিহ্নও নাই। শরীরের উপর মায়ের একেবারেই মন নাই বুঝিয়া সন্তানের মনে বিষাদ ও ভাবনা হইলেও তাহা ভিতরে চাপা রাখিয়া মায়ের অসুখ সারিয়া যাওয়া ও সুস্থ হওয়ার দিকেই কথার জের টানিতে চেষ্টা করিতেছেন। মা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে বলিলেন, 'দ্যাখো, ডুব হচ্ছে'; বলিয়াই পায়ের পাতায় আঙুলের ডগা টিপিয়া দেখাইলেন, একটু ডুব হইল। সন্তান সেই ডুবের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে বলিলেন, 'দ্যাখো, তোমার নিজের আঙুল দিয়ে।'

দেহস্পর্শ করিতে সন্তানের ভয়, তাই পা ছুঁইবার মোটেই ইচ্ছা ও সাহস নাই। মা বলিতেছেন, অগত্যা আঙুলের ডগা একটু ঠেকাইলেন মাত্র। মা তাহাতে খুশী না হইয়া

সস্মিত বদনে বলিলেন, 'জোরে টিপে দ্যাখো।' কাজেই আর ভাল করিয়া না দেখিয়া উপায় নাই, পায়ে হাত ভাল করিয়াই দিতে হইল—আঙুল দিয়া ভাল করিয়া টিপিয়া দেখিলেন ডুব হইতেছে। মা সেই আঙুলের দাগের দিকে—পায়ের পাতায় ডুবের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন এমনভাবে যেন অপরের দেহ। তাঁহার নিজের দেহ, কিংবা দেহের অসুখ কিছুই যেন বোধ নাই! আঙুলে টেপাস্থানে 'ডুব' দাঁড়াইয়া আছে, মিলাইতে সময় লাগিল; সন্তান দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, দেহে রক্তহীনতা ও শোথ দেখা দিয়াছে। বদন বিষণ্ণ হইল, অন্তর ততোধিক; নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন, মা মুখের দিকে চাহিলেন, বোধ হয় সন্তানের হৃদয় বুঝিয়াছেন, অসুখের কথা ছাড়িয়া অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যে কালো মেঘ সন্তানের হৃদয়াকাশে অদ্য দেখা দিল, দিনে দিনে তাহা বাড়িয়া কিছুদিনের মধ্যে সব অন্ধকার করিয়া দিয়াছিল। ঘড়ি দেখা হইল, এক ঘণ্টা পূর্ণ হইলে মা শুইয়া বিশ্রাম করিলেন, সন্তান নিকটে থাকিয়া একটু একটু হাওয়া করিয়া মাছি তাড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সামান্য নিদ্রা যাইয়া মা উঠিলেন। মুখ ধুইবেন, সন্তান ডাবর ধরিয়া জল দিলেন। মুখের ভিতর মায়ের অর্ধচর্বিত পান ছিল, প্রথমে তাহা ডাবরে ফেলিলেন। মা কুলি করিলে পর বারান্দায় গিয়া নির্বোধ সন্তান যখন ডাবর ধুইয়া নীচে ফেলিতেছেন, তখন হঠাৎ হুঁশ আসিল, কি দুর্লভ জিনিস আজ হেলায় ফেলিয়া দিলাম। এই জিনিস তো আর মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যাইবে না, হায়! প্রসাদী তাম্বুল স্বহস্তে বিসর্জন দিলাম! মা পরে জল খাইতে চাহিলেন, সন্তান মায়ের সেই চুমকী ঘটিতে করিয়া মাকে জলপান করাইতেছেন, কিন্তু মা ঢোক গিলিতে পারিতেছেন না, পিঠে বাম হাত রাখিয়া ডান হাতে বুক একটু মাজিয়া দিলে তবে জল নামিল। মা সন্তানের মুখের দিকে চাহিতেছেন, সন্তান আস্তে আস্তে এইরূপ ঢোক ঢোক করিয়া জল পান করাইয়া দিলেন। মায়ের সেবার সাধ আজ একটু পূর্ণ হইল, সন্দেহ নাই, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন, 'আমাদের কপাল ভাঙিয়াছে—আর দেরী নাই।'

অপরাহ্ণ। মা উঠিয়া বসিয়াছেন। লোক-জন নড়াচড়া চলাফেরা করিতেছে, একজন একটি কাজে আসিলেন। মা আঁচল হইতে চাবি বাহির করিয়া সন্তানের হাতে দিয়া তাঁহার বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। মায়ের সেই বহুকালের ব্যবহৃত অতি পরিচিত ছোট স্টীলের বাক্সটিতে (কোথাও যাত্রাকালে নিত্যসঙ্গী—ঠাকুরের চিত্রাদি উহাতে রাখিতেন) হাত দিয়া এবং উহা খুলিয়া ভিতরের সাজানো-গুছানো সব দেখিয়া সন্তানের বারংবার মনে হইতে লাগিল: 'মা মহামায়া, তোমার এই অদ্ভুত সংসার-লীলা, কৃপায় যাহা দীন সন্তানদের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছ, তাহা কি এত শীঘ্র গুটাইয়া লইবে? ইহা যদি পূর্বে কল্পনাও করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আরও একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লইতাম, মা!'

বৈকাল চারটার উপর হইয়াছে, অপরে সেবার জন্য আসিয়াছেন, সন্তানকে বিদায় লইতে হইল। মুখে হর্ষ, অন্তরে বিষাদ, ভাবনা। উদ্বোধনের দরজা পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া সন্তানের মনে হইল: দেখি প্রসাদী পানের একটু পাওয়া যায় কিনা! খুঁজিয়া অল্প একটু পাইলেন, তাহাতেই তৃপ্তি ও আনন্দ হইল। বেশী খোঁজাখুঁজিরও সাহস হইল না, পাছে কেহ টের পায়। আর তখনই দেখিলেন পাশে

সুধীরা দেবী পরনের শাড়ীর আঁচল গলায় জড়াইয়া অতি ভক্তিভরে মায়ের বাড়ীর সিঁড়িতে মস্তক নত করিয়া, হাঁটু গাড়িয়া প্রণতা হইয়াছেন, উপরে যাইবেন মাকে দর্শন করিতে। সন্তানকে শেষের সম্বল মা বহু দিলেন, কিন্তু 'কাঙ্গালে পাইলে রত্ন, সে কি কভু রাখতে পারে?'

মাকে নীরোগ ও সুস্থ করার জন্য পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও মায়ের অপর সন্তানগণ বহু চেষ্টা করিতেছেন। এ্যালোপ্যাথিক হোমিও-প্যাথিক কবিরাজী সর্বপ্রকার চিকিৎসা হইয়াছে। দৈবচিকিৎসা গ্রহশান্তি স্বস্ত্যয়নপূজা জপ হোমাদি অনেক দিন চলিয়াছিল। কখন কখন একটু ভাল বোধ হইলেও কোন কিছুতেই স্থায়ী ফললাভ হয় নাই। গ্রহশান্তি স্বস্ত্যয়নের সময় একটি সন্তান বেলুড় মঠ হইতে প্রত্যহ ফুল বিল্বপত্র ইত্যাদি লইয়া আসিতেন, বিশেষ-ভাবে হোমের জন্য নিখুঁত ত্রিপত্র-বিল্বপত্র এবং ঐ সঙ্গে মায়ের জন্য আমরুল শাক ও মঠের বাগানের টাটকা পাতিলেবুও লইয়া আসিতেন। একদিন ঐসকল লইয়া সকাল সকাল উদ্বোধনে পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া পূজার তত্ত্বাবধায়ক পূজনীয় কপিল মহারাজকে সমঝাইতে গিয়া দেখেন তিনি বিশেষ ব্যতিব্যস্ত। যে ঘটে এত-দিন স্বস্ত্যয়নের পূজা চলিতেছে, অদ্য সেই ঘটের নিম্নদিক হইতে জল পড়িতে দেখিয়া সকলেই দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছেন। ঘট বদল করিয়া আর একটি ঘট স্থাপিত হইল। একটু পরেই স্বস্ত্যয়নকর্তা ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন, পরিবর্তিত ঘটের নীচেও জল। এই ঘটের নীচেও ছিদ্র থাকায় জল বাহির হইতেছে দেখিয়া সকলে অতীব আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি ঘট স্থানান্তরিত করা হইল। কপিল মহারাজ অপর একজনকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং দোকানে গিয়া বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া একটি নূতন ঘট খরিদ করিয়া আনিলেন; নূতন ঘট পরিষ্কার করিয়া জলপূর্ণ করিয়া বসানো হইল, পূজা আরম্ভ হইতে দেরী হইয়া গেল। অদ্য মাতা-ঠাকুরাণীর জন্মনক্ষত্রের অধিপতি দেবতার বিশেষ পূজা হোম, কাজেই তাহাতে এই আকস্মিক বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় সকলেরই অন্তরে বিষম ভাবনা-চিন্তার সঞ্চার হইল। মায়ের দেহ তখন খারাপ হইয়া পড়িয়াছে—শয্যাশায়ী বলা চলে। জনৈক সাধু গিয়া পূজনীয়া যোগীন-মাকে যখন বলিলেন, 'শুনেছেন যোগীন-মা, এতদিন যে ঘটে স্বস্ত্যয়নের পূজা হচ্ছিল, আজ তাই দিয়ে জল পড়ছে, বদল ক'রে অন্য ঘট বসানো হ'ল, তা'তেও ছেঁদা। এখন বাজার থেকে নতুন ঘট কিনে এনে পূজা হচ্ছে। বুঝেছেন কি গুরুতর ব্যাপার!' যোগীন-মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু উপরে তুলিয়া কাতর ভাবে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'বুঝতে কি আর কিছু বাকী আছে, বাবা? ঘটে তো নয়, আমাদেরই কপাল ফুটো হয়েছে।' সকলে নীরব নিস্তব্ধ—সকলেরই হৃদয় অবসন্ন, শেষ আশাটুকুও মিলাইয়া যাইতেছে।

সন্তান বেলুড় মঠ হইতে প্রায়ই উদ্বোধনে গিয়া দূর হইতে মাকে দর্শন করেন। তাঁহার সেই শীর্ণ কলেবরেও মুখের প্রশান্তি ও সকরুণ স্নেহদৃষ্টি দর্শন করিয়া ক্ষণিক ভুলিলেও অন্তরে বিষম ব্যথা লইয়াই প্রত্যাবর্তন করেন। মায়ের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, চলচ্ছক্তিরহিত, ঘর হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের আসন অন্যত্র সরানো হইয়াছে, মা নীচে বিছানায় আছেন। সকলেরই অন্তরে হতাশা, আশঙ্কা কখন কি হয়! একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গিয়া সেই সন্তান দেখিলেন মাকে ধরিয়া বিছানায় বসানো হইয়াছে, কন্যাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছেন। সন্ধ্যা হইলে মা অতি কষ্টে অপরের সহায়তায় বাহু

দুইটি একটু উঠাইয়া লম্বা করিয়া ঠাকুর-প্রণাম করিলেন। পূর্বের সেই সুন্দর সুললিত বরাভয়প্রদ করযুগল শীর্ণ ম্লান অস্থিচর্মসার দেখিয়া সন্তানের প্রাণ শুকাইয়া গেল, ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না। হায়! যে হাতে মা সন্তানকে কত আশীর্বাদ করিয়াছেন, স্নেহমমতায় মনপ্রাণ ভরপুর করিয়া কত প্রসাদ খাইতে দিয়াছেন ও খাওয়াইয়াছেন, সেই হাতের আজ এই অবস্থা! মায়ের শরীর এত শীর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, হাতের সেই পুরাতন ভারী 'অনন্ত বলয়' অত্যন্ত ঢিলা হইয়া পড়িয়া যাওয়ার মতো হওয়ায় সুতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল। একদিন তাঁহার অতি স্নেহপাত্রী ৺বলরামবাবুর কন্যা মাকে দর্শন করিতে আসিয়া মায়ের শরীরের ঐ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইয়া ছোটমেয়ের হাতের উপযোগী সোনার বালা তৈয়ার করিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। সেই বালা শেষ পর্যন্ত মায়ের হাতে ছিল এবং ঐ বালাসহই পূতদেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষায় জন্মাষ্টমীর কয়েকদিন পূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুর অন্তর্ধান করিয়াছিলেন এই নরলোক হইতে। সেই সময় নিকটবর্তী হইলে মা-ও তাঁহার দীন সন্তানগণকে অকূল সায়রে ভাসাইয়া ঠাকুরেরই মতো গভীর নিশায় নরবপু পরিত্যাগ করিয়া নিত্যস্বরূপে অবস্থিতি করিলেন। বেলুড় মঠে তখনই খবর পৌছিলে যাঁহাদের ঠাকুরের সেবার কাজে প্রয়োজন তাঁহারা ও প্রাচীনেরা ভিন্ন সকলেই উদ্বোধনে ছুটিয়া চলিলেন মাকে শেষ বার দর্শন করিবার জন্য।

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ) বেলুড় মঠে গঙ্গার দিকের উপরের বারান্দায় কখন, কখন বা ঘরের ভিতর, একাকী গম্ভীর হইয়া পায়চারি করিতেছেন—ঠাকুরঘর গঙ্গা দক্ষিণেশ্বর কাশীপুর উদ্বোধনের দিকে চাহিতেছেন। কি মনে তাঁহার, তিনিই জানেন। ভোরে এখনও অন্ধকার আছে—একটু আলোর আভা আসিয়াছে, এমন সময় প্রাচীন ভক্ত ভুবনবাবু মহাপুরুষ মহারাজের সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, 'মহারাজ, মা উদ্বোধন আলো ক'রে আছেন! কি অলৌকিক জ্যোতি ফুটে উঠেছে মুখে! দেখলে মনে হয় না যে, আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মুখ দেখলে সব শোক দূর হয়ে যায়!'

তাড়াতাড়ি মঠে ঠাকুরের পূজা ও ভোগের আয়োজন হইল। পূজনীয় খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দ) ছুটাছুটি করিয়া সব দেখিতেছেন, তদারক করিতেছেন। মার দেহ মঠে আসিবে, স্নান পূজা আরাত্রিক হইবে—তৎপূর্বেই ঠাকুরের পূজা ও ভোগ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা হইল। এতদিন ঠাকুরের শয়নঘরে মায়ের যে ছবি ছিল, পূজারী লক্ষ্মণ মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজের অনুমতিক্রমে অদ্য তাহা ঠাকুরঘরে আনিয়া ঠাকুরের সিংহাসনের বামদিকে পৃথক্ আসনের উপর বসাইয়া পুষ্পাদির দ্বারা সুন্দরভাবে সাজাইয়াছেন। অদ্য হইতে মায়ের পটে প্রকাশ্যে নিত্যপূজা বেলুড় মঠে আরম্ভ হইল।

দ্বিপ্রহরে পত্রপুষ্পাদিতে সুসজ্জিত সুন্দর খট্টায় মায়ের মাল্যভূষিত চন্দনচর্চিত পূতদেহ বহন করিয়া আনিয়া নৌকায় গঙ্গা পার করিয়া বেলুড় মঠে আনীত হইয়াছে। মায়ের কন্যাগণ অশ্রুমোচন করিতে করিতে মাকে গঙ্গায় অবগাহন করাইয়া নববস্ত্রাদি দ্বারা সাজাইলেন। মঠে ঠাকুরমন্দিরের সিঁড়ির সম্মুখে রাখিয়া আরাত্রিক হইল। বহু পদচিহ্ন রাখা হইল। তৎপরে গঙ্গাতটে (বর্তমান মায়ের মন্দির যেখানে আছে) লইয়া গিয়া চন্দনকাষ্ঠের চিতায়

স্থাপিত হইল। স্বামী সারদানন্দজী প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নি সংযোগ করিলেন। স্বামী শিবানন্দজী স্বামী সুবোধানন্দজী স্বামী নির্মলানন্দজী মাষ্টার মহাশয় (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ও আরও বহু প্রাচীন ভক্ত চারিদিকে দাঁড়াইয়া, বহু ভক্ত নরনারী সমবেত হইয়াছেন—তাঁহারাও ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া, শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই অদ্ভুত যজ্ঞহোম দেখিতেছেন। স্বামী নির্মলানন্দজী একটি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সকলে ধূপ অগুরু কর্পূর প্রভৃতি আহুতি দিলেন। অতি অল্পক্ষণেই সব শেষ। তৎপরে চিতানির্বাপণের জন্য সকলে ঘটে করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইলে পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজ ঘটে করিয়া জল ঢালা বন্ধ করাইলেন তৎক্ষণাৎ। অল্পক্ষণ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া চিতা নির্বাপিত এবং দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তপ্ত মায়ের সন্তানসকলকে শীতল করিয়া দিল। কয়েকজন সন্তান মিলিয়া একটি ঘটে দেহাবশেষ অস্থি সংগ্রহ করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সবই প্রায় ভস্ম হইয়া গিয়াছে, অতি অল্পই পাওয়া গেল এবং সযত্নে সংগ্রহ করিয়া তাম্রঘটে ভক্তিভাবে লইয়া গিয়া বেলুড়মঠের ঠাকুরঘরে মায়ের পটের কাছে স্থাপিত হইল। ঠাকুরের বিরাট ভোগ দিয়া প্রচুর লুচি তরকারি রসগোল্লা প্রসাদ সমবেত সকলকে দেওয়া হইল। সেদিন সন্ধ্যায় সেই যজ্ঞস্থলে এক সন্তান ধূপ জ্বালিয়া দিলেন, পরদিন হইতে পূজনীয় সুবোধানন্দ মহারাজ নিত্যনিয়মিত ধূপ দীপ দেওয়ার জন্য একজন ব্রহ্মচারীর উপর ভার অর্পণ করিলেন। [ক্রমশঃ]

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(চতুর্থ পর্যায়)

মধ্বের 'দ্বৈতবাদ'

শঙ্করের বিশ্ববিশ্রুত 'কেবলাদ্বৈতবাদে'র ফলে জীব-জগৎ হয়ে পড়ল, হয় 'মিথ্যা', নিজেদের দিক্ থেকে; নয় স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁর দিক্ থেকে—অনিবার্য ভাবেই। কিন্তু কোনো দিক্ থেকেই ত আর রইল না তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, তাদের—'জীবত্ব' ও 'জগৎ-ত্ব'! এতে ব্যাকুল-ব্যথিত হয়ে রামানুজ ও নিম্বার্ক সাহস-ভরে অগ্রসর হলেন জীব-জগৎকে রক্ষা করতে; কিন্তু তাঁদেরও এতদূর সাহস হল না যে, জীব-জগৎকে ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেন। বরং তাঁরা 'আপসের' পন্থা অবলম্বন করেই, 'ভেদ' ও 'অভেদে'র মধ্যে যে কোনো প্রকারে একটি সমন্বয়-সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্যই আপ্রাণ প্রচেষ্টা করলেন, যাতে জীব-জগৎ একদিক্ বা স্বরূপের দিক থেকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়েও, অন্য দিক বা গুণশক্তির দিক্ থেকে তাঁর থেকে ভিন্নই থেকে গিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারে শেষ পর্যন্ত। অথচ, রামানুজ নিজেই, যাদের বলেছেন, 'শীতোষ্ণ-তমঃ-প্রকাশাদিবৎ' (শ্রীভাষ্য ১।১।১), অথবা শীতলতা ও উষ্ণতা, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়ই বিরুদ্ধস্বভাব, সেই 'ভেদ' ও 'অভেদ'কে একত্রে গ্রথিত করতে গিয়ে তাঁদের বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের দিক্

থেকে। কিন্তু তাহলে উপায় ?

উপায় আবিষ্কার করবার মত প্রাজ্ঞজনের অভাব অবশ্য ভারতবর্ষে ছিল না; কারণ, শাশ্বত সত্যের পীঠস্থান এই পুণ্যভূমি আদ্যন্তকাল ধন্য হয়েছে প্রকৃত-প্রকৃষ্ট-প্রতিভাবিশিষ্ট অসংখ্য জ্ঞানিগুণিগণের পূত পদধূলিতে। 'প্রতিভা'কে আমাদের আলঙ্কারিকেরা ব্যাখ্যা করেছেন 'নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ' রূপে। সেজন্য এরূপ নূতন-সৃষ্টিশক্তিধর দার্শনিকবৃন্দের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে ভারতের দর্শন-ক্ষেত্রে যে সকল বিবিধ-বিচিত্র তত্ত্ব বা মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, তা সত্যই জগতে অতুলনীয়; এবং এরই একটি উজ্জ্বলতম উদাহরণ আমরা পেলাম পূর্ণপ্রজ্ঞ বা মধ্বের অভিনব 'দ্বৈতবাদে'।

রামানুজ-নিম্বার্কাপেক্ষা শতগুণ অধিক সাহসী পুরুষ ছিলেন মধ্ব। বস্তুতঃ তিনি অতুল সাহসভরে যে কথা বলে গেলেন বেদান্ত-দর্শনের ক্ষেত্রে, তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ত আর আমরা দেখিনি! কারণ, যে ব্রহ্ম বেদান্তের প্রাণস্বরূপ, তাঁকেই তিনি সদর্পে একেবারে বাদ দিয়ে দিলেন নিজের জীবন ও নিজের জগৎ থেকে, অর্থাৎ জীব-জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপেই; এবং নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে নির্দ্বিধায় প্রচারিত করলেন তাঁর সুবিখ্যাত 'পঞ্চ ভেদবাদ', যার জন্য তাঁর অত্যাশ্চর্য বেদান্ত-মতবাদের যোগ্য নাম হল 'দ্বৈতবাদ' অথবা শঙ্করের 'কেবলা-দ্বৈতবাদে'র ঠিক বিপরীত মতবাদ 'কেবল দ্বৈতবাদ'।

এই পাঁচটি ভেদ হ'ল :

(১) জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ। (২) জড় জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে ভেদ। (৩) জীব ও জড়ের মধ্যে, অথবা জীব ও জগতের মধ্যে ভেদ। (৪) জীবে ও জীবে, অথবা সকল জীবের মধ্যে পরস্পর ভেদ। (৫) জড়ে ও জড়ে, অথবা সকল জড় বস্তুর মধ্যে, এবং একই জড় বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে পরস্পর ভেদ।

মধ্বের মতে, এই 'পঞ্চবিধ-ভেদ'ই শাশ্বত অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্তনীয়; অর্থাৎ 'বন্ধ-মোক্ষ' উভয় অবস্থাতেই সমভাবে বিরাজমান সমমহিমায়।

বেদান্ত-দর্শনের মূলভিত্তি যে 'ব্রহ্ম', তাঁকে অবশ্য মধ্ব রেখেছেন সমান শ্রদ্ধায়, সমান ভক্তিতে, সমান সম্মান-সমাদরে; কিন্তু বলেছেন বহু নূতন কথা তাঁর সম্বন্ধে।

ব্রহ্ম নিশ্চয়ই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যো-পনিষদ ৬।২।১); এবং এই একটিমাত্র বিষয়ে দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই একমত। অবশ্য, শঙ্করের 'অদ্বৈতবাদে'র বিরুদ্ধে সরোষে সজোরে খড়্গধারণ ক'রে মধ্ব বলছেন—ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় অতি অবশ্যই; কিন্তু তাহলেই যে জীব-জগৎ মিথ্যা মায়ামাত্র হয়ে পড়বে তা-ই বা কি ধরনের কথা ? কারণ, এক্ষেত্রে এইমাত্র বলা হয়েছে—এবং তা আমরাও সানন্দে স্বীকার করি—যে, জীব-জগৎ ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্মের 'দ্বিতীয়' নয়—সম্পূর্ণ সত্য কথা। কিন্তু তা ব'লেই যে তারা 'মিথ্যা' হয়ে পড়বে—তা-ই বা কোন্ যুক্তির কথা ? জীব-জগৎ ব্রহ্ম নয়, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের তত্ত্ব—তাতে বাধা কি ? সেজন্য, ব্রহ্মকে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নিশ্চয়ই বলবো, কিন্তু সেই সঙ্গে সমান জোরের সঙ্গেই বলবো— জীব-জগৎও সমান সত্য; এবং একেশ্বরবাদ সত্য হলেও, একতত্ত্ববাদ সত্য নয়, ত্রিতত্ত্ববাদই কেবল সত্য।

মধ্বমতবাদের নয়টি সিদ্ধান্ত বা 'প্রমেয়' হ'ল :

(১) বিষ্ণু বা হরি সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব; এবং তিনিই 'ব্রহ্ম'। (২) বিষ্ণু বা হরি সকল

শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু ; এবং একমাত্র শাস্ত্র থেকেই তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। (৩) জীব-জগৎ সত্য। (৪) জীব-জগৎ বিষ্ণু থেকে ভিন্ন। (৫) জীবগণ বিষ্ণুর নিত্য সেবক। (৬) জীবগণ বদ্ধ-মুক্তভেদে পরস্পর ভিন্ন। (৭) মুক্তির অর্থ হ'ল : বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মলাভ এবং জীবের প্রকৃত স্বরূপের পরিপূর্ণ বিকাশ। (৮) মুক্তির সাধন অমলা ভক্তি। (৯) তিনটি প্রমাণ—প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ।

মধ্বের মতে পদার্থ অথবা তত্ত্ব দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র অথবা স্বাধীন এবং পরতন্ত্র অথবা পরাধীন। পরতন্ত্র পদার্থ দশবিধ—দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ বিশিষ্ট অংশী শক্তি সাদৃশ্য ও অভাব।

ব্রহ্মই একমাত্র স্বতন্ত্র তত্ত্ব বা সত্তা। রামানুজের ন্যায় মধ্বও ব্রহ্মকে সম্প্রদায়ের দিক্ থেকে 'বিষ্ণু' ব'লে গ্রহণ করেছেন।

ব্রহ্ম নির্গুণ নন, সগুণ—সকল কল্যাণ-গুণবিমণ্ডিত এবং সকল মন্দগুণবিবর্জিত।

ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নন, সক্রিয়। তাঁর ক্রিয়া অষ্টবিধ—সৃষ্টি বা জগৎ-সৃষ্টি ; স্থিতি বা জগৎ-পালন ; প্রলয় বা জগৎ-ধ্বংসকরণ ; শাসন বা সুশৃঙ্খলভাবে জগৎ-পরিচালন ; জ্ঞানদান ; স্বরূপপ্রকাশন ; বন্ধ- ও মুক্তি-সাধন ;—প্রথমটি জীবের সকাম-কর্মানুসারে, দ্বিতীয়টি সাধকের নিষ্কাম-কর্ম ও সাধনানুসারে।

ব্রহ্ম একাধারে জগল্লীন ও জগদতিরিক্ত।

এই সকল বিষয়ে অন্যান্য বৈদান্তিকের সঙ্গে মধ্বের সাধারণভাবে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

অন্তপক্ষে, মধ্ব তাঁর বেদান্ত-দর্শনে কয়েকটি নূতন কথাও বলেছেন, যদিও সকল ক্ষেত্রেই যে ন্যায়ানুমোদিত ভাবে, তা নয়।

যেমন, সৃষ্টি-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, ব্রহ্ম নিশ্চয় জীব-জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ; কিন্তু তিনি কেবল জীব-জগতের নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ নন। অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী ও সৃষ্টিবাদী বৈদান্তিকদের মতে, ব্রহ্মই জীব-জগতের একমাত্র অভিন্ন নিমিত্ত- ও উপাদান-কারণ, যেহেতু তিনি সর্বব্যাপী। তাঁর বাইরে—যেমন নিমিত্তকারণ কুম্ভকারের বাইরে কুম্ভের উপাদান-কারণ মৃৎপিণ্ড বিদ্যমান, সেরূপ—অন্য কোনো উপাদান থাকতেই পারে না। কিন্তু মধ্বমতে কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ ব্রহ্ম উপাদান-কারণ অচেতন প্রকৃতি থেকে জগৎ-সৃষ্টি করেন। এই জড়-প্রকৃতিকে অবশ্য সর্বব্যাপী ব্রহ্মের ভিতরেই থাকতে হবে, তাঁর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়েই—তা যে প্রকারেই সম্ভবপর হোক না কেন!

ব্রহ্ম দিব্যদেহবান ও অনন্তমূর্তি-বিশিষ্ট। তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব'লে তাঁর অজড় অপার্থিব দিব্যদেহও সচ্চিদানন্দময়।

এই প্রসঙ্গে মধ্ব আরেকটি নূতন কথা বলেছেন, পূর্ববৎ সেটিও ন্যায়সঙ্গত ভাবে নয়। তাঁর মতে ব্রহ্ম অনন্ত অচিৎ গুণ-শক্তির আধার, এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিবিশিষ্ট দিব্যদেহবান হলেও, স্বগতভেদবান নন। অর্থাৎ তিনি সগুণ হলেও সবিশেষ নন, নির্বিশেষ। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ অর্থাৎ তাঁর সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদ নেই। রামানুজ-নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদশূন্য হলেও, স্বগতভেদবান, যেহেতু তাঁর অসংখ্য গুণ শক্তি অংশ প্রভৃতি তাঁর স্বগতভেদ ; এবং সেজন্য তিনি সগুণ ও সবিশেষ অর্থাৎ স্বগতভেদবান। অথচ মধ্বের মতে ব্রহ্ম অবশ্যই সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত। কিন্তু তিনি সগুণ হলেও তাঁর স্বগতভেদ নেই, অর্থাৎ সগুণ হলেও তিনি সবিশেষ নন, নির্বিশেষ, যেহেতু তাঁর স্বরূপ গুণ শক্তি নাম রূপ লীলা বা ক্রিয়া ও

দেহ সম্পূর্ণ অভিন্ন, এবং সেজন্য এগুলি তাঁর স্বগতভেদ নয়।

বেদান্ত-দর্শনের ক্ষেত্রে মধ্ব আরেকটি নূতন তত্ত্বের 'আমদানি' করলেন দর্শন-শাস্ত্র এবং সম্প্রদায়-সম্মত ধর্মতত্ত্বের সংমিশ্রণ। সেজন্য তিনি 'বিষ্ণু'র পার্শ্বে এনে ফেলেছেন 'লক্ষ্মী'কে তাঁরই নিত্যা সহচরীরূপে। লক্ষ্মী বিষ্ণু থেকে ভিন্না হয়েও সম্পূর্ণরূপে তাঁরই আশ্রিতা; বিষ্ণুরই ন্যায় নিত্যমুক্তা, বিভু; পার্থিবদেহহীনা হয়েও অনন্তমূর্তিবিশিষ্টা—'দোষবিবর্জিতা সর্বদা সুখরূপা চ সর্বদা জ্ঞানস্বরূপিণী' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্য ৩।৫)। লক্ষ্মী বিষ্ণুর ক্রিয়াশক্তি-রূপিণী; এবং তাঁরই সহায়তায় নিমিত্তকারণ বিষ্ণু উপাদানকারণ জড়-প্রকৃতি থেকে জগৎ-সৃষ্টি করেন। শ্রী ভূ ও দুর্গারূপে লক্ষ্মী যথাক্রমে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের প্রকাশিকা, এবং যথাক্রমে দেবতা মনুষ্য ও দৈত্যগণের বন্ধের বিশেষভাবে কারণ।

এইভাবে মধ্ব বেদান্ত-দর্শনের নূতন একটি তত্ত্বের উদ্ভব করলেন, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'Anthropomorphism' অথবা ঈশ্বরে মানবীয় ভাব বা মানবোচিত স্বরূপ গুণ শক্তি প্রভৃতির আরোপ; এবং সেই সঙ্গে, এমন কি, মানবের ক্ষেত্রে যেরূপ, ঠিক সেরূপই, দেহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বেশভূষা অলঙ্কারাদি ক্রিয়াকলাপ বাসস্থান বনোপবন নদনদী বৃক্ষলতা পত্র-পুষ্পাদি-শোভিত লীলাভূমি দাসদাসী সহচর-সহচরী লীলাকুঞ্জ রথ-শকটাদিপূর্ণ রম্য অট্টালিকা প্রভৃতি মানবজীবনের সকল কাম্য ভোগ্য সামগ্রীর শত সহস্র লক্ষ কোটি গুণ বর্ধিত সমাবেশ পরমেশ্বরের ক্ষেত্রেও সমান ভাবে স্বীকরণ। পূর্বেই যা বলা হল, এই প্রণালী বেদান্ত-দর্শনের ক্ষেত্রে প্রথম বিশদভাবে মধ্ব-মতবাদেই পরিলক্ষিত হয়। কারণ, রামানুজ ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায় যথাক্রমে 'লক্ষ্মী' ও 'রাধা'কে 'বিষ্ণু' ও 'কৃষ্ণে'র নিত্যসহচরীরূপে গ্রহণ করলেও স্বয়ং রামানুজ ও নিম্বার্ক তাঁদের দর্শনতত্ত্বে অথবা ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে, এঁদের কোনো বিশেষ স্থান দেননি, দিয়েছেন কেবল ধর্মতত্ত্বেই মাত্র। 'বিষ্ণু' বা 'কৃষ্ণে'র দেহ হস্তপদাদি-অবয়ব বসনভূষণ লীলাকেলি সহচর-সহচরী অবতারাদির বিস্তৃত বিবরণ রামানুজ বা নিম্বার্কের দর্শনতত্ত্বে একেবারেই নেই। কিন্তু মধ্ব-মতবাদে, ধর্মের দিক্ থেকে উপাস্যা লক্ষ্মীদেবী, দর্শনের দিক্ থেকে পরিগণিতা হয়েছেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম বা বিষ্ণুর ক্রিয়াশক্তিরূপে।

'বিষ্ণু' ব্যূহ ও অবতাররূপে স্বীয় স্বরূপ প্রকটিত করেন। অবতার ত্রিবিধ—জ্ঞানাবতার, বলাবতার ও উভয়াবতার। জ্ঞানাবতারগণের মাধ্যমে বিষ্ণু জ্ঞানদান দ্বারা সাধক-ভক্তগণকে মুক্তিদান করেন। বলাবতারগণের মাধ্যমে বিষ্ণু দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ক'রে সাধক-ভক্তগণকে উদ্ধার করেন। উভয়াবতারগণের মাধ্যমে বিষ্ণু তাঁর সাধক-ভক্তগণের জন্য এই উভয় কার্যই করেন অর্থাৎ একাধারে জ্ঞানদান করেন এবং রক্ষা করেন সস্নেহে।

এই ব্যূহবাদ এবং অবতারবাদও মধ্বের দার্শনিক মতবাদে, তাঁর দর্শনশাস্ত্রেই অন্যান্য তত্ত্বসমূহের ন্যায় সমান সম্মাননীয়, কেন্দ্রীভূত এবং প্রয়োজনীয় স্থান লাভ করেছে, যা রামানুজ-নিম্বার্ক-মতবাদে একেবারেই করেনি। রামানুজ-নিম্বার্কও অবশ্য ব্যূহ ও অবতারে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের ছিল একটি সুষ্ঠু সুন্দর সুসমতা সমানুপাত বা সঙ্গতিবোধ, যার জন্য তাঁরা মাত্রা ছাড়িয়ে কিছু করতেন না; এবং স্ব স্ব সম্প্রদায়গত বিশেষ বিশেষ তত্ত্বসমূহকে তাঁরা তাঁদের দর্শন-তত্ত্বে প্রবেশ করিয়ে তাকে অযথা ভারাক্রান্ত এবং সীমিত করতে চাইতেন না

অকারণে। তাঁদের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই আমরা ধন্য হয়েছি তাঁদের নিকট থেকে শুদ্ধ অমিশ্রিত 'খাঁটি' দর্শনতত্ত্বাদি লাভ ক'রে। কিন্তু মধ্ব ছিলেন উগ্র সম্প্রদায়-প্রবক্তা এবং সেজন্য তিনি সর্বদাই সাম্প্রদায়িক বিশেষ বিশেষ তত্ত্বাদি দ্বারাও নিজের সব কিছুকেই আচ্ছাদিত করতেন সশ্রদ্ধায়।

রামানুজ-নিম্বার্ক-প্রমুখ অন্যান্য বৈষ্ণব বৈদান্তিক অথবা ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায় মধ্বও বলেছেন যে, জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা; কর্তা ও ভোক্তা; অণুপ্রমাণ ও সংখ্যায় অসংখ্য।

জীব ত্রিবিধ—নিত্য মুক্ত ও বদ্ধ। নিত্য-জীবগণ নিত্যমুক্ত—যথা, লক্ষ্মী। মুক্তজীবগণ বদ্ধাবস্থার পরে মুক্তিলাভ করেছেন—যথা, দেব মনুষ্য প্রভৃতি। বদ্ধজীবগণ সংসারচক্রবিঘূর্ণিত জন্মজন্মান্তরভাগী এবং অনন্তদুঃখক্লিষ্ট। পুনরায়, বদ্ধজীব দ্বিবিধ—দুঃখ-সংস্থ বা দুঃখ-সংস্পৃষ্ট এবং দুঃখ-অসংস্থ বা দুঃখ-অসংস্পৃষ্ট। দুঃখ-সংস্থ জীবও দ্বিবিধ—মুক্তি-যোগ্য ও মুক্তি-অযোগ্য। মুক্তি-অযোগ্য জীবও দ্বিবিধ—নিত্য-সংসারী বা জন্মজন্মান্তরভাগী, ও তমোযোগ্য বা অনন্ত-নরকবাসী। অথবা সংক্ষেপে, জীব ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক—'ধ্যানগত, স্মৃতি-গত ও সুষুপ্তি-সংস্থ।' সাত্ত্বিক বা ধ্যানগত জীবগণ মুক্তিলাভ ক'রে অনন্তবৈকুণ্ঠবাসী হন; যথা, দেবগণ ঋষিগণ পিতৃগণ সাধুগণ। রাজসিক বা স্মৃতিগত জীবগণ বৈকুণ্ঠ- বা নরক-গামী না হ'য়ে সংসারেই নিয়ত পরিভ্রমণ করেন; যথা সাধারণ মানব। তামসিক বা সুষুপ্তি-সংস্থ জীবগণ পাপের ফলে 'অন্ধতামিস্র'-প্রাপ্ত হয়ে অনন্তনরকবাস করেন; যথা, দানব রাক্ষস পিশাচ প্রমুখ বিষ্ণুবিদ্বেষিগণ।

জীব-তত্ত্ব প্রসঙ্গে মধ্ব আরেকটি নূতন তত্ত্বের প্রপঞ্চনা করেন, অর্থাৎ তাঁর অভিনব 'প্রতিবিম্ববাদ'—যা শঙ্করের 'প্রতিবিম্ববাদ' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মধ্বমতে বিশ্বপ্রপঞ্চে যে সমস্ত জীব বিরাজ করছেন তাঁরা সকলেই চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামে বা ব্রহ্মলোকে অনন্ত-আকারবিশিষ্ট বিষ্ণুর নিরুপাধিক প্রতিবিম্বরূপে বর্তমান এবং বিষ্ণুও সেই সকল প্রতিবিম্বের বিম্বরূপে বিরাজ-মান। এমন কি, অসুর-দানব পিশাচাদিরও প্রতিবিম্বের বিম্বরূপে ব্রহ্ম বা বিষ্ণু বিরাজিত অনন্তকাল। এরূপে, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অনন্ত-মূর্তিমান বিম্বরূপ শ্রীভগবানের অনন্ত সচ্চিদানন্দ-ময় প্রতিবিম্বরূপেই ব্রহ্মাদি দেবতা থেকে কীটাদি এবং বৃক্ষলতাতৃণাদি পর্যন্ত সকলেই সেই শ্রীভগবদ্ধামে নিত্য বিরাজমান।

মধ্বমতে, অচিৎ ত্রিবিধ—নিত্য নিত্যানিত্য ও অনিত্য। বেদ নিত্য। পুরাণাদি কাল ও প্রকৃতি নিত্যানিত্য। অনিত্য দ্বিবিধ—অসংসৃষ্ট—যথা, মহৎ অহঙ্কার বুদ্ধি মন দশেন্দ্রিয় পঞ্চ-তন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত; এবং সংসৃষ্ট, যথা শরীরাদি। প্রকৃতি জগতের মূল উপাদান-কারণ, এবং প্রকৃতি থেকে মহদাদিক্রমে বিশ্ব-সংসার সৃষ্ট হয়, সাংখ্যপ্রণালী অনুসারে।

মধ্বমতবাদ সম্পূর্ণরূপেই ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে ভেদমূলক। পূর্বেই যা বলা হয়েছে, এই মতানুসারে, পাঁচটি ভেদের কথা আমাদের স্বীকার ক'রে নিতেই হয়। সেজন্য ঈশ্বর ও জীব স্বরূপতঃ ও গুণতঃ চির-ভিন্ন; ঈশ্বর ও জগৎও ঠিক তাই।

মধ্বের এই নিঃসর্ত নির্ভেজাল, নির্ভীক দ্বৈতবাদ অবশ্য সাধারণভাবে বেদোপনিষদের তত্ত্বানুযায়ী নয়—বরং ঠিক তার বিপরীত, যেহেতু বেদোপনিষদে একেশ্বরবাদ ও একতত্ত্ব-বাদই প্রপঞ্চিত, শুদ্ধ দ্বৈতবাদ নয়। সেজন্য, উপনিষদেরই বহু সুবিখ্যাত মন্ত্রকেই তাঁকে

ব্যাখ্যা করতে হয়েছে—কষ্টকল্পনা ক'রে—যথা 'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।৮।৭)—'তিনিই তুমি' এই বিশ্ববিশ্রুত মন্ত্রটিকে তাঁকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে এই অদ্ভুত ভাবে—যথা 'স আত্মা, তত্ত্বমসি', এর অর্থ হ'ল 'স আত্মা, অতৎ ত্বম্ অসি'—অর্থাৎ 'সেই আত্মা তুমি নও'। পুনরায় 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৫।১৯)—'এই আত্মাই ব্রহ্ম'—এই সুবিখ্যাত মন্ত্রটিও কেবল গৌণার্থেই গ্রহণীয়, মুখ্যার্থে নয়। বলাই বাহুল্য, মধ্বের এরূপ ব্যাখ্যা কোনো ক্রমেই গ্রহণীয় নয়।

মধ্বমতে বদ্ধজীব ও ঈশ্বর যেরূপ নিত্য ভিন্ন, এমন কি, মুক্তজীব ও ঈশ্বরও ঠিক তাই। রামানুজ-নিম্বার্কাদির ন্যায় মধ্বও পরিপূর্ণভাবে জীব-স্বাতন্ত্র্যবাদী—অর্থাৎ মোক্ষকালে জীব যে ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যাবে—এই মতবাদ মধ্বের চিন্তার বাইরেই ছিল শাশ্বতকাল। সেজন্য মুক্তি ব্রহ্মস্বরূপত্ব-লাভ একেবারেই নয়, বরং জীবের প্রকৃত স্বরূপের পরিপূর্ণ বিকাশ ('স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'), বিনাশ নয়। মুক্তজীব কেবলমাত্র কিয়দংশে ব্রহ্মসদৃশ হন মাত্র—যথা, ব্রহ্মের ন্যায় আনন্দস্বরূপ হন। সাধারণ উপমা দিয়ে মধ্ব বলছেন—যে ব্যক্তি রাজার নিকট নিজেকে রাজা ব'লে প্রচার করেন নির্বোধের মত, তিনি ক্রুদ্ধ রাজা কর্তৃক তৎক্ষণাৎ নিহত হন। কিন্তু যিনি বুদ্ধি ক'রে নিজেকে রাজার দাসানুদাস ব'লে তাঁর স্তুতিবাদ করেন, তিনি রাজার কৃপালাভ করেন। একই ভাবে, মুক্তজীবও ব্রহ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হবার স্পর্দ্ধা যেন না করেন কোনোদিনও। বরং মুক্তজীবও ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্ম কর্তৃক শাসিত, ব্রহ্মের সেবক ও ব্রহ্মের উপাসক শাশ্বতকাল।

মোক্ষ দুঃখাভাবই মাত্র নহে, পরিপূর্ণ আনন্দ-রসঘন অবস্থা। জীবের স্বাভাবিক আনন্দ-স্বরূপত্ব একমাত্র মোক্ষকালেই নির্বাধ পরিপূর্ণ ভাবে প্রকটিত হয় ('স্ব-স্ব-যোগ্য-স্ব-স্বরূপানন্দাভিব্যক্তিঃ')।

মধ্বমতে জীবের আছে ত্রিবিধ দেহ—স্থূল-দেহ সূক্ষ্মদেহ ও স্বরূপদেহ। স্থূলদেহ সূক্ষ্মদেহের, এবং সূক্ষ্মদেহ স্বরূপদেহের আবরণস্বরূপ। মৃত্যুর পরে স্থূলদেহের বিনাশ হয়, কিন্তু সূক্ষ্মদেহ মুক্তি পর্যন্ত থাকে জন্মজন্মান্তরেও সমভাবে। মুক্তিকালে সূক্ষ্মদেহ বিনষ্ট হলে, জীবের স্বরূপ-দেহের প্রকাশ হয়—যা বিম্বস্বরূপ বিষ্ণুর প্রতি-বিম্বস্বরূপ। সাধনলভ্য এরূপ সূক্ষ্মদেহনাশই চরম পুরুষার্থ। এরূপ তৃতীয় 'স্বরূপদেহবাদ'ও মধ্বমতের আরেকটি অভিনবত্ব।

মধ্বমতে মোক্ষ চতুর্বিধ—সাযুজ্য সামীপ্য সালোক্য ও সারূপ্য। সাত্ত্বিক জীবগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন। অর্থাৎ বিষ্ণুতে ব্রহ্মার যে নিরুপাধিক বিম্ব আছে, তারই নিরুপাধিক প্রতিবিম্বস্বরূপ ব্রহ্মা সেই নিরুপাধিক বিম্বে ইচ্ছানুসারে প্রবেশ করেন, বা পৃথক্‌ও থাকতে পারেন, কিন্তু কদাপি তাঁর সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যান না—যা একেবারেই অসম্ভব—যেমন, লৌহে প্রবিষ্ট অগ্নি লৌহ থেকে সর্বদা ভিন্নই থাকে।

অন্যান্য জীবগণ সাধনানুসারে প্রথমে সকলেই সারূপ্য মুক্তি লাভ করেন—অর্থাৎ যা উপরে বলা হ'ল, সূক্ষ্মদেহ বিনষ্ট হ'লে, তাঁদের 'স্বরূপদেহ' পূর্ণতমভাবে প্রকটিত হয়, এবং তাতে বিম্বস্বরূপ ব্রহ্মের সেই বিশেষ আকার প্রতিবিম্বিত হয়। তারপরে, তাঁরা সাধনানুসারে সালোক্য ও সামীপ্য মুক্তিলাভ করেন, অর্থাৎ তাঁরা অনন্ত বৈকুণ্ঠলাভ করেন।

সাধনাবলীর দিক্ থেকেও, মধ্বমতবাদে নূতনত্বের অভাব নেই। অবশ্য, অন্যান্য

সকলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মধ্বও বলেছেন, ভাবস্বরূপ অবিদ্যাই বন্ধের মূল কারণ। অবিদ্যা দ্বিবিধ—জীবাচ্ছাদিকা ও পরমাচ্ছাদিকা। নাম থেকেই বোঝা যায় যে, প্রথমটি জীবের স্বরূপ গুণ শক্তি প্রভৃতি আচ্ছাদিত ক'রে রাখে, এবং দ্বিতীয়টি ব্রহ্মের স্বরূপ গুণ শক্তি প্রভৃতি আচ্ছাদিত ক'রে রাখে - জীবের কাছ থেকে। ফলে অজ্ঞানকবলিত জীব নিজের ও ব্রহ্মের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেকে মনে করেন স্বাধীন-স্বতন্ত্র, সংসারকে মনে করেন পরমকাম্য ভোগস্থল, ঈশ্বরকে মনে করেন অস্তিত্ববিহীন। সেজন্য তিনি সংসারকেই একমাত্র কাম্যবস্তু মনে ক'রে একমাত্র সংসার-পঙ্কেই লিপ্ত হয়ে থাকেন, বারংবার সকাম কর্ম ক'রে বারংবার সংসারেই প্রত্যাবর্তন করেন।

ভারতীয় মতে সকাম কর্ম দ্বিবিধ – পুণ্যকর্ম ও পাপকর্ম এবং তথাকথিত পুণ্যকর্ম প্রায়শঃই সকাম কর্ম। মানযশের জন্য গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়স্থাপনাদি জনসেবামূলক পুণ্যকর্ম সকামভাবে করলে, তার ফলে সাধক-ভক্ত স্বর্গে যান, এবং সেখানে সাধনোচিত সুখলাভ ক'রে পুনরায় এই সংসারেই প্রত্যাবর্তন করেন, সংসারেই ভোগ্য অবশিষ্ট সকাম কর্মের ফলরূপে। পুনরায়, যাঁরা পাপকর্ম করেন, তাঁরা তাঁদেরই ন্যায্য ফলরূপে নরকে যান; এবং সেখানে এরূপ মন্দকর্মোচিত ফলভোগ ক'রে পুনরায় সংসারেই প্রত্যাবর্তন করেন, পূর্বোক্তভাবে, সংসারেই ভোগ্য অবশিষ্ট সকাম কর্মের ফলরূপে—অর্থাৎ এই নূতন জীবনে ও জগতে তিনি আরেকটি নূতন সুযোগ সুবিধা পান নূতনভাবে জীবন গঠন করবার, নিষ্কাম কর্ম করবার ও সাধন সম্পন্ন করবার। এই ত হ'ল ভারতীয় দর্শনের সর্বাপেক্ষা আশা ও অনুপ্রেরণার কথা—জীবকে স্বর্গ বা নরকে আবদ্ধ ক'রে রেখো না। অকারণে—তাঁকে প্রত্যাবর্তন করতে দাও বারংবার এই ধরণীরই ধূলিতে ধূলিতে, এই মর্ত্যেরই মাটিতে মাটিতে যাতে তিনি একদিন না একদিন, এ জন্মে না হয় পরজন্মে মোক্ষলাভে ধন্যাতিধন্য হবেনই হবেন।

কিন্তু মধ্বের 'অনন্ত-সংসারবাদ' এবং খ্রীশ্চীয়ান মতানুযায়ী, 'অনন্ত-নরকবাসবাদ', যার কথা পূর্বেই বলা হ'ল, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির, দর্শন-ধর্মের মূলভিত্তিস্বরূপ 'কর্মবাদে'র মূলেই কুঠারাঘাত করেছে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবেই। এরূপ অত্যদ্ভুত মতবাদ ভারতীয় দর্শনে একটিও নেই।

সে যাহোক, মধ্বের মতে অবিদ্যাই বন্ধের মূলীভূত কারণ ব'লে বিদ্যাই মোক্ষের প্রথম ও প্রধান উপায়। কিন্তু নিষ্কাম-কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে, তবেই সেই নির্মল চিত্তে জ্ঞানালোক প্রতিফলিত হতে পারে পূর্ণতম প্রভায়। স্বতন্ত্র-অস্বতন্ত্র-পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানই প্রকৃত-প্রকৃষ্ট জ্ঞান, —অর্থাৎ উপরে উক্ত পঞ্চবিধ ভেদজ্ঞান; এবং জীবের শাশ্বত ব্রহ্মাধীনতা ও ব্রহ্মদাস্য; ও ব্রহ্মের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও প্রবল প্রভুত্ব বিষয়ক জ্ঞানই পরিপূর্ণ সত্যজ্ঞান।

অবশ্য জ্ঞান প্রারম্ভই মাত্র, পরিশেষ নয়। কারণ, জ্ঞান থেকে উদয় হয় প্রগাঢ় ভক্তির এবং ভক্তি থেকে উদয় হয় অনবরত ধ্যানের; এবং এরূপ ভক্তি-ধ্যানই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধক।

ভক্তি ত্রিবিধা—সাধারণী ভক্তি, পরমা ভক্তি এবং স্বরূপভক্তি বা সাধ্যভক্তি। শাস্ত্র বা ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বেও, সাধারণ জনদের যে শ্রদ্ধারূপা ভক্তি, তার নাম 'সাধারণী' ভক্তি। শাস্ত্র বা ব্রহ্মজ্ঞানের পরে যে ভক্তি তার নাম 'পরমা' বা 'অমলা' ভক্তি। এরূপ 'পরমা' ভক্তির দ্বারাই শ্রীভগবানের পরমপ্রসাদ ও পরমপুরুষার্থ (মোক্ষ)

লাভ হয়। মুক্তজীবের নিত্যা ভক্তির নাম 'স্বরূপভক্তি' বা 'সাধ্যভক্তি'। আমরা দেখেছি যে, মুক্তজীবও ব্রহ্মের ভক্ত উপাসক সেবক দাস —এবং সেজন্যই এরূপ স্বরূপভক্তি'র প্রয়োজন হয় তাঁর নিকট।

এরূপে, মধ্বমতে জ্ঞান ও ভক্তি অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত, তথাপি মোক্ষের সাক্ষাৎ উপায় জ্ঞান নয়, ভক্তি। সেজন্য, মুক্তির ক্রম এরূপ : প্রথমে, সাধারণ জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপা ভক্তির উদয় হ'লে সেই শ্রদ্ধাশীল জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ভক্ত শাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। সেই জ্ঞান থেকে প্রগাঢ়তরা ঈশ্বর-ভক্তি, তার থেকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি, তার থেকে পরমা ভক্তি, তার থেকে ঈশ্বরপ্রসাদ, এবং পরিশেষে, তার থেকে স্বরূপভক্তি লাভ হয়।

ঈশ্বরপ্রসাদ সম্বন্ধে মধ্ব ও অন্যান্য ত্রিতত্ত্ব-বাদী বৈদান্তিকেরা একমত—অর্থাৎ তাঁদের সকলের মতেই ঈশ্বরপ্রসাদ ভিন্ন মুক্তি লভ্য হয় না। মধ্বমতে এরূপ ঈশ্বরপ্রসাদ লাভ করতে হ'লে প্রয়োজন হয় ত্রিবিধ সাধনার—ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরধ্যান ও ঈশ্বরসেবা। এরূপ ঈশ্বরসেবাও ত্রিবিধ—অঙ্কন নামকরণ ও ভজন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিষ্ণুর শঙ্খচক্রাদি ধারণ বা লিখন হ'ল অঙ্কন। পুত্রাদির বিষ্ণুর নামে (কেশব প্রভৃতি) নামার্পণ হ'ল 'নামকরণ'। ভজন দশবিধ : সত্যবাক্য-কথন হিতবাক্যকথন প্রিয়বাক্যকথন ও শাস্ত্রপাঠ —এই চারটি হ'ল 'বাচিক ভজন'; সৎপাত্রে দান, বিপন্নের পরিত্রাণ ও শরণাগতের রক্ষণ— এই তিনটি হ'ল 'কায়িক ভজন'; সর্বজীবে দয়া, ঈশ্বরসেবার ঐকান্তিকী স্পৃহা এবং গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অচলা নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা—এই তিনটি হ'ল 'মানসিক ভজন'।

মোক্ষ ও সাধন প্রসঙ্গে, মধ্বের আরেকটি অভিনব মতবাদ হ'ল ঈশ্বরপুত্র 'বায়ু'র মধ্যস্থতা। এই বিষয়ে সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে—কারণ, কেবল বৈদান্তিকগণ কেন, সকল সম্প্রদায়ের সকল আচার্যের মতে মুক্তি স্বপ্রচেষ্টা-লব্ধ ধন, এবং ঈশ্বরপ্রসাদে এই মহাধন লাভ হ'লে মুমুক্ষু সাক্ষাৎভাবে শ্রীভগবানকে লাভ করেন। কিন্তু তাঁদের সকলের সঙ্গে মধ্বের মূলীভূত প্রভেদ হ'ল এই যে, তাঁর মতে জীব সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ বা ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মলাভ করতে পারেন না। সেজন্য তাঁকে বিষ্ণুপুত্র 'বায়ু'র শরণাপন্ন হতে হয় প্রথমে। বায়ু পিতা বিষ্ণুর 'প্রতিমা প্রেয়সী' বা প্রিয়তম বিগ্রহ। তাঁরই মধ্যস্থতায় মুমুক্ষু বিষ্ণুর সংস্পর্শে আসতে পারেন ও বিষ্ণুকে লাভ করতে পারেন।

মধ্বমতবাদের এই তিনটি অতি অভিনব 'অনন্ত-সংসারবাদ' 'অনন্ত-নরকবাদ' ও 'ঈশ্বরপুত্রের মধ্যস্থতাবাদ' ভারতীয় দর্শনে অন্যত্র কোথাও নেই, যা পূর্বেই বলা হ'ল। শেষোক্ত দুটি মতবাদই খ্রীশ্চীয়ান ধর্মের 'ঈশ্বর-পুত্র যিশুর মধ্যস্থতাবাদ' ও 'অনন্ত-নরকবাদে'র সমতুল। মধ্ব সত্যই খ্রীশ্চীয়ান মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন কিনা-সে বিষয়ে অবশ্য কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।

সার্থকনামধারী পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব অনেক আশা-ভরে, অনেক সাহস-সহকারে, অনেক আনন্দ-সঞ্চারে বেদান্তদর্শনে নূতন কিছু আনবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলেন। কারণ, তিনি দেখেছিলেন যে, 'দোটানায়' যাঁরা পড়েন, তাঁদের দুর্গতি অনন্ত। সেজন্য, 'আপসের' পথ, সমন্বয়ের পথ, সাম্যের পথ তিনি করলেন সম্পূর্ণ বর্জন— বললেন, অসাধ্য সাধনে বৃথা সময় নষ্ট ক'রে আর লাভ কি—'ভেদ' ও 'অভেদ' এরূপই পরস্পরবিরুদ্ধ যে তাদের মেলানো যাবে না কিছুতেই। তা হ'লে বরং কেবল একটিকেই গ্রহণ করি আমরা—হয় কেবল 'ভেদ'কে, নয় কেবল

'অভেদ'কে। কিন্তু কেবল অভেদ'কে গ্রহণ করলে ত, বাঁচতে পারব না আমরা কিছুতেই; আমরা বিশাল সমুদ্রে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বারিবিন্দুর মতই মিলিয়ে যাব ভূমা মহান ব্রহ্মে এক নিমেষেই। তা হ'লে আর আমাদের লাভ কি, যদি এইভাবে ব্রহ্ম আমাদের গ্রাস ক'রে ফেলেন সম্পূর্ণরূপে! তা হ'লে আমরা কেবল 'ভেদ'-কেই গ্রহণ করি না কেন বাঁচার তাগিদে।

কিন্তু সত্যই কি বাঁচা হ'ল? না, হ'ল না, হতে পারে না—কারণ, ব্রহ্মকে রাখব, অথচ রাখব না তাঁকে জীবনে জীবে জগতে—তা কি ক'রে হয়? সেজন্য মধ্বমতবাদ আদ্যোপান্ত স্ববিরোধদুষ্ট। ঈশ্বর সর্বব্যাপী; জীব-জগৎকে থাকতে হবে তাঁরই মধ্যে; অথচ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে —সে কি ক'রে সম্ভব—একটি বস্তুর মধ্যে, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, বিরুদ্ধ বস্তু থাকতে পারে কিরূপে? সেজন্য রামানুজ-নিম্বার্ককে বলতেই হয়েছে যে, জীব-জগৎ ব্রহ্ম থেকে অন্ততঃ স্বরূপতঃ অভিন্ন।

পুনরায়, মধ্ব নিজেই বলছেন যে, জীব-জগৎ ব্রহ্মের স্বগতভেদও নয়; কারণ তারা ব্রহ্মের গুণ শক্তি বা অংশ; এবং ব্রহ্ম ও তাঁর গুণ শক্তি অংশাদি সম্পূর্ণরূপেই অভিন্ন। সেক্ষেত্রে জীব জগৎ ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর রইলেন কিরূপে—হয়ে পড়লেন ত ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্নই।

বস্তুতঃ, ব্রহ্ম সগুণ, অথচ নির্বিশেষ—স্বগত-ভেদশূন্যও—এই তত্ত্বটিই ত আদ্যোপান্ত স্ব-বিরোধদোষদুষ্ট—কারণ, গুণ শক্তি অংশ প্রভৃতি যদি ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্নই হয়, তা হ'লে তাদের আর সেই সেই বিশেষ নামে চিহ্নিত করা কেন?

সত্যই, মধ্বের নিজেরই 'পঞ্চভেদবাদ' অনুসারে জীব-জগৎ ব্রহ্ম থেকে শাশ্বতকালই, পরিপূর্ণভাবেই ভিন্ন। অথচ, মধ্বের নিজেরই 'নির্বিশেষত্ববাদ' বা 'স্বগতভেদশূন্যত্ববাদ' অনু-সারে জীব-জগৎ ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন!

পুনরায়, ব্রহ্ম কেবলই নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ নন; তা-ই বা কি ক'রে হয়? যদি ঈশ্বরকে উপাদানের জন্য সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন ও বিরুদ্ধস্বভাব অচেতন 'প্রকৃতি'র উপরই নির্ভর করতে হয়, তা হ'লে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও সার্ব-ভৌমত্ব অবশিষ্ট থাকে কতটুকু? তা হ'লে ত তিনি কুম্ভকারাদির ন্যায়ই পরাধীন কর্তা মাত্রই হয়ে পড়েন।

মধ্বের অভিনব 'ঈশ্বরে মানবীয় ভাবারো-পণবাদ' (Anthropomorphism), 'অনন্তনরক-বাদ' 'বিষ্ণুপুত্র বায়ুর মধ্যস্থতাবাদ' প্রভৃতিও সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক ও অগ্রহণীয়।

কিন্তু এই সব দোষত্রুটি সত্ত্বেও মধ্ব-দর্শন স্বীয় মর্যাদায় সংযমে নিষ্কলুষতায় গাম্ভীর্যে ও ঐশ্বর্যে গৌরববিমণ্ডিত। প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ মধ্ব জানতেন যে, যে-বস্তুটিকে আশ্রয় করলে সংসার-সাগর নির্বাধায় উত্তীর্ণ হওয়া যাবে—তা হ'ল 'জ্ঞান' এবং তারই বহিঃপ্রকাশ 'নীতি' বা সম্পূর্ণ নিষ্কাম পবিত্র—'কর্ম'। সেজন্য, ভক্তিবাদী হ'লেও তিনি তাঁর ভক্তিকে করেছেন জ্ঞান-ভিত্তিক ও নীতিভিত্তিক; বা প্রকৃষ্ট কর্মভিত্তিক। জ্ঞান-ভক্তি-নিষ্কামকর্ম-সমন্বিত, এই যে অপূর্ব সাধনপথ, তার তুলনা কোথায়?

পুনরায়, আমরা দেখেছি যে 'Anthropom-orphism' প্রায়ই ভোগবাহুল্যের কলঙ্ককালিমায় ও ভাবোচ্ছ্বাসের ফেনিল আবর্তে বিক্ষুব্ধ বিভ্রান্ত বিপথগামী হয়ে পড়ে। কিন্তু মধ্বমতবাদে এই সকলের চিহ্নমাত্র নেই। বরং তা তার অন্ত-র্নিহিত ধৈর্য স্থৈর্য বীর্য গাম্ভীর্য ঐশ্বর্য চিরকাল অক্ষুণ্ণ রেখেছে সগৌরবে।

আসুন, আমরাও আজ ভক্তশ্রেষ্ঠ মধ্বের সঙ্গে প্রাণমন খুলে বলি—

> 'হে জিহ্বে মম নিঃস্নেহে!
> হরিং কিং নানুভাষসে।
> হরিং বদস্ব কল্যাণি!
> সংসারোদধি-নৌ হরিঃ॥'
>
> (কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব ৭০)

> 'হে মোর জিহ্বা নিষ্করুণ!
> কর না কেন কল্যাণি! হরিনাম?
> সংসারসাগর-তরণী সে যে,
> বল সেই হরিনাম অবিরাম॥'

অর্জুন-বিলাপ

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

এখনও দৃষ্টিতে ভাসে ছায়ামগ্ন অনন্ত রূপের
অসংলগ্ন রেখাচিত্র—হৃদয়ের
স্থির শান্ত হ্রদে
আকাশের ঝড় নামে—অথবা নক্ষত্র
অগণিত প্রতিবিম্ব! বলো আমি
কোন্ মন্ত্রবলে
লক্ষ্যে স্থির হয়ে যাবো—এ জন্মের তীব্র পরীক্ষায়!
দর্শকের দৃষ্টিবাণ সমুদ্যত নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে,
বৃক্ষে স্থির ভাস পক্ষী ; মৎস্য চক্ষু,
আয়োজিত শর
ধনুকে নিঃস্পন্দ ভাষা! প্রভু, তুমি দিয়েছ জীবনে
জীবাত্মার চিরলক্ষ্য, জ্যোতির্লীন পরম জ্যোতিতে
অপরূপ মূর্তিময়—
আমি তবু ভ্রষ্ট, চ্যুত, একা
থর থর বিকম্পিত প্রমাদের আকণ্ঠ বিষাদে।

অথচ প্রসন্ন দুটি স্নিগ্ধ শান্ত চোখ
অপলকে চেয়ে আছে—অনির্বচনীয়
ভাষাতীত কথা হয়ে! সাক্ষী, প্রভু, শরণ, সুহৃৎ
প্রিয়তম ঈশ্বরের মুখ আমি দেখেছি আভাসে
বুঝেছি নিষ্কম্প, শান্ত, সমাহিত প্রণবের ধনু,
একনিষ্ঠ আত্মা শর, লক্ষ্য চির পূর্ণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ—
দ্রবীভূত লবণের পুত্তলিকা সে আলো-সাগরে
আলোকিত মগ্নবোধে ডুবে যাবে শব্দহীনতায়!

তন্ন তন্ন খুঁজে ফিরি, এখনও দুচোখে
বৃক্ষ, লতা, পত্র, পুষ্প,
জীবনের সব আয়োজন—
রূপে, রসে, শব্দে, গন্ধে ছায়ালীন অজস্র সম্ভার—
একমাত্র সূর্য নেই
নিস্তরঙ্গ হৃদয়-সলিলে !!

বিবেকানন্দের বক্তৃতা

(জনৈকা বিদেশিনী শ্রোত্রীর অনুভূতি অবলম্বনে)

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

বাণী নয়, মণি! মণি নয়, খনি! না, না—অশনি—
লোকোত্তর ধ্বনি!
জমাট আঁধার বিদীর্ণ হোয়ে যায়
মরণোত্তর সৌভাগ্যের জীবন্ত ভাষায়—
যেন দর্শন ঘটে
মানস মহিম-পটে
মাটিতে যেন আকাশের বাজ নেমে আসে—
প্রসন্ন উল্লাসে!
তেমনি ত্বরিতে ছোঁ দিয়ে তুলে নেয় মন
কল্প আস্বাদন!
যা ছিল অলৌকিক
তাই হয় সাবিত্রী ঋক্—
সোনার অক্ষরে—
ভাসে, জ্বল জ্বল করে!
স্বাদনীয় হয় আনন্দ
কানে আসে মন্দাকিনী-ছন্দ—
মাটির দেহ মূর্তি হারায়
ইহ ঝ'রে যায় পরত্রের পায়!
উচ্চ হোতে উচ্চতরতায়
চিহ্ন সব মানস হারায়—
পার্শ্বভূমি স্তব্ধ হোয়ে যায়
সাগর-রেখায়!
ধ্বনিত সে কণ্ঠের মাধুরী
সারা কক্ষে চলে উড়ি' উড়ি'—
মর্তের মাটির চোখে দেখা দেয় উরি'
ত্যাগীরও অত্যাজ্য সেই দিব্য দেবপুরী
ভাষকের বাণীর পর্দায়—
দেবতার প্রভা পেয়ে 'অহং' লুকায়!

রং

বকলম

ওগো রংওলা,

তোমার ও গামলায় কী রং গোলা ?
রংবেরঙের কাপড় যে ছোপাও ঃ
কোথায় এতো নানা রং তুমি পাও ?
তোমার কাছে আসে রকমারি লোকে
হরেক রঙে ধুতে কাপড়গুলোকে।
যার যে রংটি চাই বসনটিতে
সে অবাক রং মেলে ওই ভাটিতে।
কৃপা করে এখন আমায় রাঙাও ঃ
যে রঙে তুমি রাঙা সে রংটি দাও—
হে বিশ্বশরণ:চৈতন্যকারী
রঙের পসারী !

প্রার্থনা

শ্রীকৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়

'প্রেয়' নাহি চাহি প্রভু, 'শ্রেয়' কর দান—
'আমি'-ভাব বিনাশিয়া দাও 'তুমি'-জ্ঞান।
বিশ্বমাঝে তব কৃপা সার
কণামাত্র লভিলে তাহার
পঙ্গুতে লঙ্ঘয় গিরি, মূক যে বাচাল!
তাহারি ভিখারী আমি, হে পিতঃ দয়াল।
সর্বভূতে তুমি দেখা দাও—
'আমারে' 'তোমার' ক'রে নাও।
শেষ করি' সংসারের অনন্ত এ দ্বন্দ্ব
দাও স্থান পদে তব, দাও চিদানন্দ।

দেখাও হে নাথ

শ্রীসুসময় রায় চৌধুরী

ছেড়ে যেতে বড় বুকে ব্যথা বাজে,
ছেড়ে যেতে নাহি চাই।
তাই প্রভু তুমি, আঘাত হানো যে
শ্রীচরণ যাতে পাই।
কত মোহে থাকি, কত বাসনায়
ফিরি আমি পথে পথে,
ভুলে থাকি তব করুণা ও প্রেম,
যেতে নাহি চাই সাথে।
ভাবি বেশ আছি, মান-সম্মান
কাম-কাঞ্চন-মাঝে,
প্রিয় পরিজন সম আর কোথা
আপনার কেহ আছে!
আমার এ মোহ, মায়া ভেঙে দিতে
বেদনা-আঘাত হানি'
ভেঙে যত বাধা—স্নেহের আড়াল
শ্রীপদে তোমার টানি,
দেখাও হে নাথ, অভয় অশোক
মুক্ত স্বরূপ মম—
তব করুণার অমল মহিমা
ভালবাসা অনুপম।
পরমশান্তি পরমানন্দ
প্রেমঘনরূপে নাথ,
দাঁড়াও আমার আঁখির আগেতে
রাখো মোর হাতে হাত।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস*

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

স্বামী বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী' নানা দিক থেকে তাঁর সাহিত্যিকসত্তাকে প্রকাশ করেছে—তাঁর অনন্যসাধারণ গদ্যভঙ্গিমা, মানব ও বিশ্বের সর্বস্তরে প্রসারিত তাঁর উদার প্রেমিক হৃদয়, নির্মম ভর্ৎসনায় রুদ্র ও নির্মোহ আদর্শবাদে অবিচল তাঁর সংগ্রামী অনুপ্রেরণা, উপলব্ধির গভীরতম স্তরে তাঁর কবিদৃষ্টি ও মনীষার আত্মপ্রকাশ, আর সেই সঙ্গে ক্ষুরধার শাণিত ব্যঙ্গের উজ্জ্বল হাস্যরসদীপ্তি। 'পত্রাবলী' এবং অন্যত্র—অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীজীর হাস্যরসের মূল বৈশিষ্ট্য তাঁর ব্যঙ্গপ্রতিভায়।

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসের স্রষ্টা পরিমল গোস্বামী তাঁর 'আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আলোচনাটির প্রথমাংশ প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধৃত করছি—'সামাজিক বিষয়ে যুক্তিবাদী হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সোজাসুজি ব্যঙ্গ বর্ষণ করেছেন অর্থহীন আচার-নিষ্ঠদের উপর। এবং তাঁর ব্যঙ্গ কোথাও মৃদু নয়। এদেশে সত্য ব্যঙ্গ, অর্থাৎ কিছু ঘুরিয়ে ব্যঞ্জনাধর্মী ব্যঙ্গ রচনার দ্বারা ব্যঙ্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য খুব যে সফল হয় এমন আমার মনে হয় না। এদেশে বিবেকানন্দের মতোই খর-আক্রমণ প্রয়োজন।

'সোজা আক্রমণ ও সাহিত্যগুণ, দুইয়ের মধ্যে একটা রফা করা অসম্ভব নয়; এবং অনেকেই যে তা সাফল্যের সঙ্গে করতে পেরেছেন তার অন্যতম দৃষ্টান্ত বিবেকানন্দ।

'উদ্দেশ্য-সিদ্ধিই যদি একমাত্র প্রেরণা হয়, তাহলে তর্কের খাতিরে বলা চলে, লাঠিই সবচেয়ে উপযোগী। এবং একথায় অতিরঞ্জন নেই। আমাদের দেশে সাহিত্যের আক্রমণ অপেক্ষা লাঠির আক্রমণ বেশি কার্যকর, একথা আমি স্বীকার করি।

'কিন্তু ব্যঙ্গকে সাহিত্যের সীমানায় থাকতে হলে লাঠি অথবা অন্যান্য নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র অচল, একথা সাহিত্যিকেরা স্বীকার করে থাকেন। তবে ব্যঙ্গ-সাহিত্য যদি লাঠি অথবা অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রের কাছাকাছি হয়, তবে আপত্তি থাকা উচিত নয়। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যঙ্গ লাঠির নিকট আত্মীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।'[১]

পরিমল গোস্বামী ব্যঙ্গ শব্দটি ইংরেজী 'satire' শব্দের প্রতিরূপ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে কৌতুকহাস্য বলতে তিনি ইংরেজী Humour (হিউমার), Wit (উইট) Joke (জোক) সব কিছুকেই বুঝিয়েছেন। আমাদের মনে হয় কৌতুক বলতে ইংরেজী 'জোক' শব্দটিই যথার্থ, 'হিউমার'কে কৌতুক বললে অনেক কম বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে 'কমলাকান্তের দপ্তর' অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'হিউমারে'র উদাহরণ—অবশ্য এ গ্রন্থে হাস্যরসের অন্যান্য সব

* উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৮০ সংখ্যায় বিশেষভাবে স্বামীজীর 'পত্রাবলী' অবলম্বনে লেখকের এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য: 'বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস : পত্রাবলী'।

১ আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয় : পরিমল গোস্বামী : পৃঃ ৬২-৬৫ দ্রঃ

স্বরই মিশিয়ে আছে। 'হিউমার' একদিকে হাস্তরসের আলোকে আত্মদর্শন আর একদিকে জীবনের গভীরতম করুণার উপলব্ধিকে হাস্তরসে মূর্ত করা। সকালবেলার শিশিরবিন্দুতে সূর্যের উদ্ভাসন—এর যোগ্য উপমা। 'হিউমার' শব্দটির যথার্থ বাংলা প্রতিরূপ এখন অবধি চোখে পড়ে নি।

'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র মধ্যে জীবন-উপলব্ধির একটি মাত্রাগত পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের একাঙ্ক নাট্য সঙ্কলন দুটির স্বাদের পার্থক্য এদিক থেকে স্মরণীয়। পরিমল গোস্বামী কৌতুক থেকে ব্যঙ্গের ক্রমপর্যায়ের একটি রেখা-চিত্র (Chart) ক'রে স্বামীজীর হাস্যরসের ব্যঙ্গ-প্রাধান্য সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত করেছেন, সেটি অনুসরণ ক'রে আমরা একটি রেখাচিত্র দাঁড় করাতে পারি—

সা	রে	গা	মা	পা	ধা	নি
১০০	৯০+১০	৭৫+২৫	৫০+৫০	২৫+৭৫	১০+৯০	১০০

উপরে সংগীতের স্বরগ্রামের মতো কৌতুক থেকে ব্যঙ্গে পরিণতিকে সাত ভাগে ভাগ ক'রে পরিমল গোস্বামী কৌতুক ও ব্যঙ্গের মাত্রাবিভাগ বোঝাতে চেয়েছেন।

'সা'—কৌতুকহাস্যের পরিপূর্ণ অবস্থা, 'নি' ব্যঙ্গহাস্তের চরম রূপ। 'সা'-তে ব্যঙ্গ একেবারেই অনুপস্থিত, 'নি'-তে ব্যঙ্গই সব। 'সা' থেকে 'মা' পর্যন্ত কৌতুকহাস্যের প্রাধান্য ও ব্যঙ্গহাস্যের ক্রম-উপস্থিতি। 'মা'-তে কৌতুক ও ব্যঙ্গ সমান সমান। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' এর যথার্থ উদাহরণ। পরিমল গোস্বামীর মতে স্বামীজীর লেখায় 'মা' থেকে 'নি' অবধি ব্যঙ্গপ্রধান হাস্য-রসেরই প্রাধান্য।

স্বামীজীর এই ব্যঙ্গপ্রধান হাস্যরসের উদাহরণ হিসাবে পরিমলবাবু 'পত্রাবলী' থেকে ১৮৯৪-তে মঠের গুরুভাইদের উদ্দেশে লেখা একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করেছেন—'আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা, সকলে পড়ে টানাটানি – রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমা সীমান্ত নাই।

---

২ সা—বিশুদ্ধ কৌতুক; রে—কৌতুক ও সামান্য ব্যঙ্গ (৯০+১০); গা—কৌতুকের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ব্যঙ্গ (৭৫+২৫); মা—কৌতুক ও ব্যঙ্গ সমান সমান (৫০+৫০); পা—ব্যঙ্গপ্রধান, এতে বিশুদ্ধ কৌতুক ক্ষীয়মাণ (২৫+৭৫); ধা—প্রায় সবটাই ব্যঙ্গ; নি—পূর্ণ ব্যঙ্গ (১০০)। পরিমল গোস্বামীকৃত স্বরগ্রামের এই অর্থ। পরিমলবাবু 'যুগান্তর' পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যার সম্পাদকরূপে দীর্ঘকাল বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং 'ঘুঘু' 'স্মৃতিচিত্রণ', 'যখন সম্পাদক ছিলাম', 'আমি যাদের দেখেছি' প্রভৃতি নানা গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন। একদা তাঁর সম্পাদিত ব্যঙ্গগল্পসঙ্কলন 'ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী' পাঠকসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল।

হয়ে হয়ে, বলি একটা কিছু ক'রে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হ'ল, কাল তার উপর ভেঁপু হ'ল, পরশু তার উপর চামর হ'ল, আজ খাট হ'ল, কাল খাটের ঠ্যাঙে রূপো বাঁধানো হ'ল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হ'ল—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খ-গদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরেজীতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐরকম বেলকোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile (ক্লীব)—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দিম দুবার ঘুরবে বা চারবার--ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতো-খেকো, আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

'যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাটরূপ এই জগৎ, তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম; ঘণ্টার উপর চামর চড়ানো নয়, আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট ব'সব কি আধ ঘণ্টা ব'সব—এ বিচারের নাম 'কর্ম' নয়, ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁট-কুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে, একথা বুঝিস—আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা-গারদ দেশময়।'[৩]

উল্লেখিত অংশে স্বামীজীর ব্যঙ্গ প্রসঙ্গে পরিমলবাবুর মন্তব্য—'ভদ্র আক্রমণের ভাষা এর চেয়ে চড়া বোধ হয় আর হয় না।' সমগ্র চিঠিটি পড়লে স্বামীজীর ব্যঙ্গ, বেদনা ও বিপ্লবী অনুপ্রেরণার যে অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়, তা শুধু আক্রমণ বললে অনেক কম বলা হয়, এ আক্রমণ একান্ত ভালবাসার আত্মোৎসর্গেরই প্রস্তুতি। উদ্ধৃত অংশের পরেই আছে—'যাক, তোদের মধ্যে যারা একটু মাথাওয়ালা আছে, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ ও তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁরা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন, যা আমাদের দেশে কখনও হয় নাই।'[৪]

সাহিত্যের জগতে যাঁরা Satirist বা ব্যঙ্গ-রচয়িতারূপে পরিচিত তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গে স্বামীজীর ব্যঙ্গহাস্যের মূল পার্থক্য ওইখানে।

'পত্রাবলী' থেকে বিশুদ্ধ কৌতুকের উদাহরণ-রূপে পরিমলবাবু ১৮৯৪ সালে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লেখা স্বামীজীর চিঠির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে-ছেন— 'বিমলা—কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জামাতা—এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার হিন্দুধর্মে এখন যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি। আমাকে প্রতিষ্ঠা হইতে সাবধান হইবার জন্য অনেক সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। এবং তাঁহার গুরু শশী-বাবুর সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা লিখিতেছেন। শিব, শিব! যাঁহার বড় মানুষ শ্বশুর তিনি কিছুই পারেন না, আর আমার তিন কালে শ্বশুর মোটেই নাই!!'[৫] এই পত্রটি সামগ্রিকভাবে

৩, ৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৭ম খণ্ড : ১ম সং : পৃঃ ৪৭-৪৮

৫ তদেব : পৃঃ ৫১

দেখলে এতে কৌতুকের চেয়ে তীব্র ব্যঙ্গের উদাহরণই বেশী। এই পত্রেই বিমলা ও শশী সাণ্ডেল প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ছুঁৎমার্গ প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য—'ব্রহ্ম ·· এখন ভাতের হাঁড়িতে।'

স্বামীজীর মুখের কথায় ব্যঙ্গবিদ্রূপের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের উদাহরণরূপে পরিমল গোস্বামী স্বামীজীর আলাপচারী থেকে সেই বিখ্যাত গোরক্ষাপ্রচারকের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের উদাহরণ দিয়েছেন, যার চরম ব্যঙ্গ হলো—'গোরু যে আমাদের মা, তা আমি বিলক্ষণ বুঝেছি। তা না হলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?'[৬] বস্তুতঃ স্বামীজীর কথাবার্তায় ও চিঠিপত্রে কৌতুক, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, মৃদুহাস্য থেকে অট্টহাস্য—নানাভাবে তাঁর আনন্দময় সত্তা বিকীর্ণ। মাঝে মাঝে তাঁর হাস্যরস সমাজ-সংসারের হৃদয়হীনতা ও বুদ্ধি-হীনতার তীব্র প্রতিবাদে অনিবার্য তিক্ত স্বাদ নিয়ে আসে, কিন্তু কখনোই মানবপ্রেমের চিরন্তন সত্য থেকে দূরে সরে আত্মকেন্দ্রিক দংশন-পিপাসায় নিজেকে চরিতার্থ করে না। যে দেশে শত শত মানুষ দুর্ভিক্ষে অনাহারে মরে, সে দেশে গোমাতার সেবায় সম্প্রদায় বা ব্যক্তি-বিশেষের অতি আগ্রহ এবং মানুষের সেবায় সম্পূর্ণ অনিচ্ছা—এ দুই ভাবের আশ্চর্য বৈপরীত্যই স্বামীজীর মন্তব্যের কারণ। স্বামীজীর 'ব্যঙ্গের লাঠি' এখানে কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদের চৈতন্যলোকে ফিরে আসার সঠিক ওষুধ। আলাপচারীতে বা চিঠিপত্রে এজাতীয় মন্তব্যের উদাহরণ অজস্র। তবে সাহিত্যিক শিল্পরূপের দিক থেকে স্বামীজীর ব্যঙ্গরসসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভাব্‌বার কথা' নামে ব্যঙ্গচিত্র বা নক্শাজাতীয় রচনাগুচ্ছ। সমকালীন জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সরস মন্তব্য প্রকাশের বিশেষ ভূমিকা বাংলা-সাহিত্যে পত্রপত্রিকার বিশিষ্ট ঐতিহ্য। 'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম যুগেই সাহিত্যসচেতন বিবেকানন্দ এজাতীয় রচনার দ্বারা পত্রিকাটিকে এবং সামগ্রিকভাবে বাংলাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধনার ক্ষেত্রে 'ভাবের ঘরে চুরি' সম্বন্ধে বারংবার সাবধান করেছেন। বাইরে একরকম ভাব দেখিয়ে মনে মনে অন্য রকম অভিসন্ধি পোষণ করাই—ভাবের ঘরে চুরি। 'উদ্বোধন'-পত্রিকায় এই ভাবের জগৎ সম্বন্ধে স্বামীজী ছোট ছোট কাহিনীর রূপরেখায় আমাদের কথা ও কাজের দুস্তর অসংগতির প্রতি তর্জনীসংকেত করেছেন। 'ভাব্‌বার কথা' নামে এই লেখাগুলি পড়তে পড়তে এজাতীয় রচনায় স্বামীজীর স্বভাবসিদ্ধ কুশলতা একদিকে যেমন বিস্ময় জাগায়, আর একদিকে তেমনি এদের সংখ্যাল্পতার জন্য প্রত্যাশী পাঠককে ব্যথিতও করে। অবশ্য 'পরিব্রাজক' এবং 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' স্বামীজীর সরস বাগ্‌বৈদগ্ধ্য অনেক পরিমাণে আমাদের আশ্বস্ত করে। তবু, 'ভাব্‌বার কথা'র অম্ল-মধুর 'টিপ্পনী' জাতীয় রচনার চাহিদা সাহিত্যে ও সংবাদিকতায় সব যুগেই রয়েছে। 'ভাব্‌বার কথা' রসরচনাগুচ্ছ একাধারে তাঁর সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রতিভার যুগ্ম সম্মেলন। পত্রিকা চালাতে হলে শুদ্ধমাত্র গুরুভার প্রবন্ধ পাঠকের মনের উপরে না চাপিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক হাস্য পরিহাসের দ্বারা পাঠকসমাজকে সচেতন ও ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলা যে প্রয়োজন একথা স্বামীজী

৬ বাণী ও রচনা : ৯ম খণ্ড : ১ম সং : পৃঃ ৯

ভালোভাবেই জানতেন। 'ভাব্‌বার কথা'-জাতীয় ব্যঙ্গরচনা বা 'পরিব্রাজকে'র মতো ভ্রমণ-কাহিনীর সেইজন্যই আবির্ভাব।

'ভাব্‌বার কথা'র'[৭] প্রথম চারটি ব্যঙ্গ-কথিকার মূল ব্যঞ্জনা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে। অবশ্য স্বামীজীর অধ্যাত্মচিন্তার মূলসূত্র আমরা ইচ্ছা করলে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যে কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন আমাদের ইহজীবনেরও সব প্রান্তকেই স্পর্শ করে এবং নূতন প্রেরণায় সঞ্জীবিত করে—এদিক থেকে জগতের ইতিহাসে আধ্যাত্মিক গুরুদের মধ্যে তাঁর স্থান অনন্য। অবশ্য সবার আগে এবং সবার পরিণতিতে তাঁর অধ্যাত্ম উপলব্ধিই প্রধান লক্ষণীয়। বিবেকানন্দ-সাহিত্য প্রসঙ্গে, এমন কি তাঁর সাহিত্যের ব্যঙ্গরসের অনুধাবনেও এই মূলসূত্রটি আমরা দেখতে পাবো।

সুর-তাল-লয়-জ্ঞানহীন ভক্তের ভগবানকে গান শোনাবার চেষ্টা; সাধনভজনহীন ভোলাচাঁদের শরণাগতি সম্বন্ধে আত্মপ্রচার; বেদান্তবাদী ভোলাপুরীর ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমানের অন্তরালে আত্মসর্বস্বতা এবং রামচরণের গুরু-গিরি—এসব কয়টি কাহিনীই 'ব্যঙ্গের লাঠি।' তবে স্বামীজীর নিজস্ব বাক্‌ভঙ্গীর রসায়নে প্রত্যেকটি গল্পের ব্যঞ্জনা শেষ অবধি মানুষের মন মুখ এক করার সাধনা, ভাবের ঘরে খাঁটি হওয়ার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যে আত্মপ্রতারণায় আমরা জগতের কর্তব্য ফাঁকি দিতে চাই, সে প্রতারণায় কিন্তু ঈশ্বর প্রতারিত হ'ন না। যথার্থ ভক্ত বা শরণাগতের প্রতিটি কাজে ও চেষ্টায় যে সততা, নিষ্ঠা ও শ্রম দেখা যায়, তার মূলে ঈশ্বরের কাছে তার পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। সে আত্মনিবেদন যথার্থ কি না, তার কষ্টিপাথর বিবেকানন্দের মতো জগদ্‌গুরুদের সাধনাজনিত সিদ্ধান্ত। সে সিদ্ধান্তের কথায় আসার আগে আমরা 'ভাব্‌বার কথা'র প্রথম গল্পটি স্মরণ করি—

'ঠাকুর-দর্শনে এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত। দর্শনলাভে তাহার যথেষ্ট প্রীতি ও ভক্তির উদয় হইল। তখন সে বুঝি আদানপ্রদান-সামঞ্জস্য করিবার জন্য গীত আরম্ভ করিল। দালানের এক কোনে থাম হেলান দিয়া চোবেজী ঝিমাইতেছিলেন। চোবেজী মন্দিরের পূজারী, পহলওয়ান, সেতারী—দুই লোটা ভাঙ দুবেলা উদরস্থ করিতে বিশেষ পটু এবং অন্যান্য আরও অনেক সদ্‌গুণশালী। সহসা একটা বিকট নিনাদ চোবেজীর কর্ণপটহ প্রবলবেগে ভেদ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্বিদা-সমুৎপন্ন বিচিত্র জগৎ ক্ষণকালের জন্য চোবেজীর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বিশাল বক্ষস্থলে 'উথায় হৃদি লীয়ন্তে' হইল। তরুণ-অরুণ-কিরণ-বর্ণ ঢুলু ঢুলু দুটি নয়ন ইতস্তত: বিক্ষেপ করিয়া মনশ্চাঞ্চল্যের কারণানুসন্ধায়ী চোবেজী আবিষ্কার করিলেন যে, এক ব্যক্তি ঠাকুরজীর সামনে আপনভাবে আপনি বিভোর হইয়া কর্মবাড়ীর কড়ামাজার ন্যায় মর্মস্পর্শী স্বরে নারদ, ভরত, হনুমান, নায়ক—কলাবতগুষ্টির সপিণ্ডীকরণ করিতেছে। সম্বিদানন্দ-উপভোগের প্রত্যক্ষ বিঘ্নস্বরূপ পুরুষকে মর্মাহত চোবেজী তীব্রবিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"বলি বাপু হে, ও

৭　উদ্বোধন, প্রথম বর্ষ, ১৩০৫, ১০ম ও ১৪শ সংখ্যায় এই নামে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে স্বামীজীর বিভিন্ন প্রবন্ধ, অসমাপ্ত অনুবাদ ও গল্প ইত্যাদির সঙ্গে 'ভাব্‌বার কথা' রচনাগুচ্ছ একত্র ক'রে 'ভাব্‌বার কথা' বইয়ের সৃষ্টি।

বেসুর বেতাল কি চীৎকার ক'রছ!" ক্ষিপ্র উত্তর এল—"সুর তালের আমার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্ছি।" চোবেজী —"হুঁ, ঠাকুরজী আমার এমনই আহাম্মক কি না! পাগল তুই আমাকেই ভিজুতে পারিস নি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?"

সুরের সাধনায় স্বামীজীর সিদ্ধি তাঁর জীবন-কাহিনী-পাঠকমাত্রেরই পরিচিত। এই গল্পটির পটভূমিতে স্বামীজীর সেই সংগীতসাধকরূপটি সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর ভাষায় 'ভাবরাজ্যের রাজা' শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণদেব সুকণ্ঠ সংগীততন্ময় সাধক। বিশেষতঃ সংগীতের ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশে তিনি ভক্ত ও সাধকদের অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচনে কতখানি সহায়ক হ'তেন, সেকথা 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'কথামৃতে'র পাতায় পাতায় বিধৃত। কিন্তু বেসুর বেতাল গান শুধুমাত্র উচ্ছ্বাসের জোরে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কখনো বরদাস্ত করতেন না। সুরে তালে ভাষায় কোনো ত্রুটি হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অস্বীকৃতি প্রকাশ পেতো। শিল্পের জগতের পূর্ণতার সাধনা ঈশ্বরসাধনার অঙ্গ। সাধনার উপকরণে ত্রুটি ঘটলে পূজাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বেসুরো গায়কের মন ভেজাবার চেষ্টা তাই এমন হাস্যকর ব্যর্থতায় পরিণত।

[ক্রমশঃ]

'কথামৃতে'র আলোকে সেকাল ও একাল

ডক্টর জলধিকুমার সরকার*

'কথামৃত' শ্রীরামকৃষ্ণবাণীরই শুধু একটি জীবন্ত আলেখ্য নয়, এর মধ্য দিয়ে সাধারণ পাঠক পায় হাসিকান্নামাখা জগতের এমন একটি মজার মানুষকে যাঁর তুলনা সে কোথাও খুঁজে পায় না; আবার ভগবদ্‌ভক্ত খুঁজে পায় এক দেবমানবকে যাঁর কথা সে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ বাইবেলে পড়েছিল। আমরা জানি যে, অবতারপুরুষগণ যদিও বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হন, তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে এক, এবং তাঁরা একই চিরন্তন সত্যের পথনির্দেশ ক'রে যান। তাঁদের জীবনধারায় বা বাণীর মধ্যে যে আপাতদৃষ্ট বৈষম্য দেখি, তার একটি কারণ, তাঁদের অনুবর্তীদের ভুল বুঝা বা পরবর্তী যুগের পুস্তকসমূহে তাঁদের বাণীগুলির ভুল অর্থ লিখিত হওয়া। অন্য একটি কারণ, তাঁদের জন্মস্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা দেশকাল ও পাত্রের (শিষ্যবর্গের) তারতম্য থাকায় তাঁদের বাণীর মধ্যে অধিক জোর দেওয়া অংশের বিভিন্নতা। কিন্তু শ্রীম-লিখিত 'কথামৃত' অবতার-কথার একটি অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব নিখুঁত দিনলিপি (diary)—বর্ণনার বস্তুকে চোখের সামনে এনে ফেলে। এই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে, তৎকালীন সমাজব্যবস্থার যে আভাস পাওয়া যায়, তার খোঁজ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পটভূমিকায় অবতারপুরুষদের বুঝা খানিকটা সহজ হওয়া স্বাভাবিক।

'কথামৃতে' বর্ণনাকাল (পরিশিষ্টাংশ বাদ দিলে) ১৮৮২-১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহধারণের শেষ চারবৎসর।

* কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ভাইরলজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। বর্তমানে ঐ বিভাগেই 'এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট'। এফ, এন, এ,।

স্থান কলিকাতা শহর বা তার উপকণ্ঠ। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের কথাবার্তা গল্প বলা বা হাস্য কৌতুকের মাধ্যমে তাঁর জীবিত কালের (১৮৩৬-১৮৮৬) অনেক কিছু ঘটনার, বিশেষতঃ তাঁর গ্রাম্য জীবনের কিছু কিছু আভাস আমরা পাই। মনে রাখতে হবে যে, উনবিংশ শতাব্দীর এটি এমন একটি কাল, যখন ব্রিটিশশাসন, যার গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৭৫৭ সালে পলাশীযুদ্ধের পর, আস্তে আস্তে তার প্রতিষ্ঠা কায়েমী ক'রে তুলছে, এবং ১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহের পরে আরও জোরদার করতে সচেষ্ট; যখন শত শত বৎসর ধ'রে বিদেশী মুসলমান-শাসিত জাতি ইউরোপীয় সভ্যতার ঝলসানিতে সম্মোহিত ও দিশেহারা; এবং যখন আমরা আমাদের ধর্ম সমাজব্যবস্থা এবং সব কিছুর মধ্যে খারাপ ও বিদেশীর সব কিছুর মধ্যে ভাল দেখতে আরম্ভ করেছি।

২

কিন্তু সে যাই হোক, মাত্র একশত বৎসর আগেকার সমাজব্যবস্থার মধ্যে আমরা বর্তমান হ'তে বিরাট কিছু পরিবর্তন আশা করব না। আমরা রক্ষণশীল জাতি ব'লে পরিচিত। সেইজন্য আমরা কোন মতবাদ বা প্রথা ধরতেও যত দেরী করি, একবার ধরলে তা তাড়াতাড়ি বদলাতেও চাই না। * সেইজন্য অনেক কিছুই, যা আগে ছিল, তা কমবেশী এখনও আছে। হয়ত বা সামান্য রকমফের হয়েছে। তখনকার দিনে লোকে কামারপুকুরে হালদারপুকুরের পাড় রোজ সকালে নোংরা ক'রে রাখত, গালাগাল সত্ত্বেও থামত না, আজও সে দৃশ্য প্রতি পল্লীগ্রামে দেখা যাবে। রাধাকান্তের মন্দির হ'তে গয়না চুরি যাবার পরে সেজোবাবু (রাসমণির জামাই) এই ব্যাপারে রাধাকান্তঠাকুরের শক্তিহীনতার নিদর্শন পেয়েছিলেন। এখনও মন্দির হ'তে দেবতার অলঙ্কার চুরির (এমন কি পুরাতন দেবমূর্তি চুরিরও) সংবাদ খবরের কাগজে দেখে অনেকে দেবতাদের অক্ষমতার কথা ভেবে আশ্চর্যান্বিত হন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আরতির পূর্বে তখন যেমন দক্ষিণেশ্বরের গ্রামবাসী যুবকবৃন্দ, কেউ হাতে ছড়ি নিয়ে, কেউ বা বন্ধুসঙ্গে বাগানে বেড়াতে আসতেন, আজও অনেকে কেবলমাত্র গঙ্গার ধারে বেড়াবার জন্যই পঞ্চবটী এলাকায় যান। জয়গোপাল সেন টাকা থাকতেও হিসেবী (কৃপণ) ছিলেন, নিজের গাড়ীতে ঠাকুরের কাছে আসতেন; কিন্তু নিয়ে আসতেন হয়ত দুটো পচা ডালিম। সেই ধারা এখনও চলছে, আজও বহু ব্যক্তি সামর্থ্যের চেয়ে অনেক কমই দেন দেবতার মন্দিরে বা উপাস্য গুরুর শ্রীচরণে। বন্ধুর চোখের সামনে হুড়মুড় ক'রে বাড়ী ভেঙ্গে যাওয়ার কথা শুনেও যেমন একজন খবরের কাগজে লেখা ছিল না ব'লে সে-কথা বিশ্বাস করেনি, সেইরকম খবরের কাগজে পূর্ণ বিশ্বাসী আজও আছে। 'অবিদ্যারূপিণী মেয়ে'দের মোহিনী শক্তি যেমন আগে ছিল, আজও তা অপ্রতিহত আছে। আফিসের বড়বাবুর কাছে নিত্য গিয়ে হতাশ হয়ে চাকুরির উমেদার যেমন গোলাপীকে ধ'রে চাকুরির যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিল, আজও ঠিক সেই একই পন্থায় অনেকে চাকুরি ঠিকাদারী অথবা নানা সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। আর "স্ত্রী যদি বলে 'যাও ত একবার' অমনি উঠে দাঁড়ায়—'বসো ত'—অমনি বসে পড়ে"—এরূপ পুরুষের সংখ্যা নিশ্চয়ই কমে যায় নি। পুঁটুলি-পাঁটলা নিয়ে সাধু—দু'তিনজন বসে আছে, কেউ বা ডাল বাছছে, কেউ কাপড় সেলাই করছে, আর বড় মানুষের বাড়ির ভাণ্ডারার গল্প করছে—এরকম

সাধুর উদাহরণ ত পথে-ঘাটে আজও সর্বত্র দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার ব্যাপারে আমরা দেখেছি এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী মতের চিকিৎসককে। আজও দেখতে পাই শহরের অলিতে-গলিতে এই তিন শ্রেণীর চিকিৎসকের দ্বারেই রোগীরা ছুটাছুটি করছে। শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে আগতদের মধ্যে গিরিশ ও সুরেন্দ্রকে পানাসক্ত দেখতে পাওয়া যায়। মদের আড্ডা কাশীপুরের রাস্তার ধারে ছাড়া নিশ্চয় অন্যত্রও ছিল। আজকাল মদ্যপায়ীদের সংখ্যা নিশ্চয় কম নয়, মদের দোকানও আগের চেয়ে সংখ্যায় কমেনি। চড়কের মেলায় তালপাতার ভেঁপু এখনও বিক্রি হয় এবং কৃষ্ণকিশোরের মত লুচিছক্কা খেয়ে একাদশী আজও অনেকে করে। "ইনি কোন্ বিষ্ণু মানেন? পাতা বিষ্ণু! (অর্থাৎ যিনি পালন করেন)—ও আমরা ছুঁই না"—এরকম নিষ্ফল তর্কাতর্কি শুধু পল্লীগ্রাম ফুলুই শ্যামবাজারেই হোত না, কলিকাতাতেও সেই সময় "বাবুরামবাবু ভারি মজলিস করিয়া বসিয়া আছেন…অনেকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিত শাস্ত্রালাপ করিতেছেন। কেহ কেহ ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁকড়ি ধরিয়াছেন— কেহ কেহ তিথিতত্ত্ব বা মলমাসতত্ত্বের কথা লইয়া তর্ক করিতে ব্যস্ত আছেন—কেহ কেহ দশম স্কন্ধের শ্লোকব্যাখ্যা করিতেছেন—বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব লইয়া মহা দ্বন্দ্ব করিতেছেন"[১]—এরূপ চলিত। আজও এরূপ নিরর্থক বাগ্-বিতণ্ডার অন্ত নেই, তা ধর্মবিষয়েই হোক, বা অন্য কোন বিষয়েই হোক। ওদেশে অর্থাৎ কামারপুকুরের ওদিকে ছুতোরের মেয়েরা ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি পাড়া, ধান ঠেলে দেওয়া, কাঁড়া ধান তোলা ও খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলার সঙ্গে যেমন পনের আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রাখত, পাছে ঢেঁকি হাতে পড়ে যায়, আজও প্রায় সেই রকম চিত্রই দেখা যায়। অবশ্য ঢেঁকিতে চিড়ে কোটা আজকাল বেশী হয় না, কারণ তার জন্য কল চালু হয়েছে। নরেন্দ্র স্কুলের ছেলেদের অধঃপাতে যেতে দেখেছিলেন, কারণ তাদের বার্ডশাই (সিগারেট), ইয়ার্কি, বাবুয়ানা, স্কুলপালানো এসব ছিল, এমন কি কুস্থানেও যেত। বর্তমান যুগেও ছাত্রদের সম্বন্ধে এসব কথা হলপ করে বলতে পারা যায়, অবশ্য সিগারেটের নাম এখন পালটেছে।

৩

কতকগুলি সামাজিক ব্যবস্থা বা প্রথা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। তখনকার দিনে কলকাতার প্রধান যানবাহন ছিল ঘোড়ার গাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাড়া করা ঘোড়ার গাড়ি ক'রে অনেক স্থানেই যেতে হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথের শেয়ারের গাড়িতে আসারও উল্লেখ আছে। অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকের, যেমন বলরামবাবু, মহেন্দ্র ডাক্তার প্রভৃতির নিজেদের বাড়ির গাড়ি ছিল। আজকাল কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি নিশ্চিহ্নপ্রায়। বাংলার অন্যত্রও ঘোড়ার গাড়ির বদলে সাইকেল রিক্সার চলন হয়েছে। অবশ্য 'কথামৃতে' ট্রামগাড়িরও উল্লেখ আছে। যথার্থ হিসাবী মণিলাল মল্লিক ট্রামে চেপে শোভাবাজারে আসতেন, সেখান হতে শেয়ারের গাড়িতে বরানগরে আসতেন। এখনও অনেকের কলকাতার বাইরে বাগানবাড়ি আছে সত্য, তবে আগে বোধ হয় তার সংখ্যা আরও বেশী ছিল। তাই আমরা সুরেন্দ্র, রাম, মণি মল্লিক, যদু মল্লিক—এঁদের বাগানবাড়ির উল্লেখ পাই। বড়লোক বা রাজারাজড়াদের মোসাহেব চিরকালই ছিল এবং গত শতাব্দীতেও ছিল।

১ টেকচাঁদ ঠাকুর: আলালের ঘরে দুলাল, পৃঃ ৪৫

ধনী যদু মল্লিকেরও ছিল, যাদের শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভাঁড়' নামে অভিহিত করেছিলেন। ওই যুগে "বনেদী মানুষ কব্‌লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ শ্রোত্রীয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে, আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত। .. প্রায় অনেকেরই এক একটি পোষা পাশবালিস আছে—'যে আজ্ঞে' ও 'হুজুর আপনি যা বলেছেন, তাই ঠিক' বলার জন্য দুই এক গণ্ডমূর্খ ভদ্র সন্তান মাইনে করা নিযুক্ত আছে।"[২] এখনও মোসাহেব আছে, তবে মাইনে করা আছে বলে শুনা যায় না। যাত্রার প্রচলন এখনও আছে, তবে আগের চেয়ে কম। সাধারণ লোকের বিনা পয়সায় দেখার সুযোগ প্রায় হয় না; সেইজন্য 'মাদুর বগলে নিয়ে যাত্রা শুনতে যাওয়া'ও হয় না। একান্নবর্তী পরিবার, বৃহৎ পরিবারের সংখ্যা কমে গেছে; সেজন্য গিন্নীদের 'ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি', যাতে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি-বাঁধা শশাবীচি, কুমড়াবীচি থাকত তা আর বেশী রাখতে হচ্ছে না। 'কথামৃতে' যে সব গান পাওয়া যায় তার অনেকগুলির ভাষা সরল এবং গানের অর্থ বা ভাব বুঝতে একেবারেই বেগ পেতে হয় না। "তুমি পিতা আমরা অতি শিশু পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের জনম"—এরকম সরল ভাব-ব্যঞ্জক গান আজকাল খুব বেশী রচিত হয় না। এখন শ্রুতিমধুর বাক্যের আবরণে ভাবকে দুর্বোধ্য করার দিকেই যেন 'ঝোঁক বেশী। ধনবান শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, রাস্তাঘাট, কুয়ো করতে চেয়েছিলেন, তাঁর অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্য। বর্তমানে ধনীদের কখনও কখনও ওইরূপ সদিচ্ছা হয়, যদিও রাস্তাঘাট, কুয়ো (এখন নলকূপ) করার দায়িত্ব প্রধানতঃ সরকারের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শম্ভু ঝগড়া বিবাদের সালিসী মোড়োলী করতে ভাল-বাসতেন। এখনও অনেকে মোড়োলী খুবই করে, তবে সালিসী করার সুযোগ কমে গেছে। সুবর্ণ বণিক অধরের বাড়ীতে আহার করতে কেদারের মত ভক্তকেও ইতস্তত: করতে দেখা গিয়েছিল। কলকাতাতে এরূপ দ্বিধার ভাব আজকাল প্রায় দেখা যায় না, তবে সুদূর পল্লীগ্রামে খাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ এখনও মানা হয়। পোশাকের অঙ্গ হিসাবে উড়্‌নির ব্যবহার তখন ভদ্র সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ উড়্‌নি ব্যবহার করতে পারবেন না ভেবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ব্রাহ্মোৎসবে যেতে বারণ করেছিলেন। অধরের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আলোচনার শেষে বঙ্কিমচন্দ্র উড়্‌নি ফেলে শুধু জামা গায়ে চলে যাচ্ছিলেন। বর্তমানে উড়্‌নির ব্যবহার বিবাহাদিতে কিছু কিছু চালু থাকলেও, তার ব্যবহারিক মূল্যবোধ অনেক কমে গেছে।

প্রধানতঃ শাসক সম্প্রদায়ের কাছে সুযোগ-সুবিধা পাবার জন্য সেযুগে ইংরেজী শিক্ষার উপরে প্রবল ঝোঁক ছিল, এবং ইংরেজী-জানা লোকের বিশেষ সম্মান ছিল। 'সে সময় কলকাতায় সকল লোকের এই আগ্রহ ছিল যে ছেলেরা যে কোনও রূপেই হউক একটু আধটু ইংরেজী শিখুক, যে সময় কলকাতার অলিতে গলিতে অতি সামান্য ইংরেজী-জানা এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে একান্ত মূর্খ বাঙ্গালী, ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি শুধু ইংরেজী শব্দের দীর্ঘ

২ কালীপ্রসন্ন সিংহ: হুতোম প্যাঁচার নক্সা, পৃঃ ২৭ ও ৪১

তালিকা মুখস্থ করাইবার নানা পাঠশালা খুলিয়া বসিতেছে ও তাহাতে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতেছে, যে সময়ে ইংরেজী জানাই চাকরি পাইবার পক্ষে একমাত্র আবশ্যকীয় গুণ।'[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ ওই যুগের 'মানুষ', তাই তাঁকেও নরেন্দ্র ও মাষ্টারকে বলতে শুনি 'তোমরা দুজনে ইংরেজীতে কথা কও ও বিচার করো, আমি শুনব'; অন্যত্র তিনি গিরিশ ও নরেন্দ্রকেও তাই বলেছিলেন। বর্তমানে ইংরেজীর ঠিক অতটা আভিজাত্য না থাকলেও ইংরেজী-জানা লোকের যে সমাজে কদর বেশী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৪

'কথামৃতে' এমন অনেক সামাজিক প্রথা বা চলনের উল্লেখ আছে, যার অস্তিত্ব বর্তমানে নেই বললেই চলে। 'শ্রীম' লিখেছেন, শ্রীশ্রীমার বিবাহ হয়েছিল যখন তাঁর বয়স ছয় বৎসর। এখন এরূপ বিবাহ দেখা যায় না। বলরামের বাড়ী হতে নন্দ বসুর বাড়ী যেতে শ্রীরামকৃষ্ণকে পাল্কিতে উঠতে দেখা যায়। এখনকার দিনে কলকাতা শহরে চেষ্টা করলেও বোধ হয় পাল্কি পাওয়া যাবে না। মহারাষ্ট্রের একটি মেয়ে শিক্ষিতা ছিলেন ও বিলেত গিয়েছিলেন—এটি খবর হিসাবে প্রতাপচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন। কিন্তু এরূপ ঘটনা খবর হিসেবে বিবেচিত হবে না এখন। কামারপুকুরে ধনবান লাহাদের অতিথিশালা ছিল; কলকাতায় নন্দ বসুর বাড়িতে দেবদেবীর এত ছবি ছিল যে, লোকে দেখতে আসত; গণুর মার বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমনে পাড়ার ছেলেরা ঐক্যতান বাজিয়ে শুনিয়েছিল। এগুলি আজকাল আর প্রায় দেখা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ভক্তেরা থাল মিছরি নিয়ে আসতেন, যেটা তিনি বালক ভক্তদের বিশেষতঃ নরেন্দ্রকে খেতে দিতেন। এখন মিছরি নিয়ে যাবার প্রথা প্রায় উঠে গেছে। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনান্তে ভোজের শেষে দধি ও ক্ষীর দেওয়া হয়েছিল। আজকাল ভোজের শেষে ক্ষীর দেওয়া কচিৎ দেখা যায়। মনে হয় সে যুগে মুড়ির কদর আরও বেশী ছিল। ১৮৮১ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কেশবের জামাতা ও কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের ষ্টীমারে উঠেন এবং কেশবের দলবলের সঙ্গে গঙ্গার বক্ষে ভ্রমণ করেন, তখন ওই ষ্টীমারে উঠেছিল মুড়ি ও সন্দেশ।[৪] সহ-যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ইংলণ্ড হ'তে সদ্য প্রত্যাগত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, যিনি পরে কেশবের দ্বিতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৮২ সালে ঠিক ওইরূপ একটি ষ্টীমার পার্টিতেও ছিল মুড়ি ও নারকেল। বর্তমানে যদিও মুড়ির দাম বেড়েছে, কিন্তু তার গত শতাব্দীর আভিজাত্য বোধ হয় এখন আর নেই। হুঁকায় তামাক খাওয়া যেটা কলকাতার ফ্যাসান ছিল, তা প্রায় শহর থেকে উঠে গেছে বললেই হয়। বাবুদের মধ্যে গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়ার প্রচলন ছিল, যার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতেন রাজসিকতার ভাব। 'কথামৃতে' মোটর গাড়ির উল্লেখ নেই, এবং কোন বাড়িতেই ইলেকট্রিক আলোর কথা নেই।

শেষে, কয়েকটি জিনিসপত্রের দামের কথা,

৩ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী, পৃঃ ৩০২

৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস : সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, পৃঃ ১০৭-১০৮

যার উল্লেখ 'কথামৃতে' আছে, বললে মন্দ হয় না। ধুতির দাম ছিল বার আনা, তামাক খাবার কলকে এক পয়সা, উইলসনের সার্কাসের শেষ শ্রেণীর টিকিটের দাম আট আনা, বিলাতী চাদর এগার আনা, চড়কের মেলায় ছুরি এক পয়সায় দেয় নাই, ট্রামের ভাড়া চার পয়সা, এবং পাচক ব্রাহ্মণের মাহিনা ছয় টাকা। বর্তমানে এ সবের মূল্য বেড়েছে এবং বাড়াই স্বাভাবিক। একশত বৎসরে কতটা বেড়েছে, সেটা দেখানই এখানে উদ্দেশ্য।

যাত্রী

স্বামী তথাগতানন্দ

৮ই ফেব্রুআরি, ১৯৭৭। মঙ্গলবার, সকাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজে নিউইয়র্ক যাচ্ছি। দমদম এয়ারপোর্টে সমাগত সবার কাছে বিদায় নিয়ে ৺দুর্গানাম স্মরণ ক'রে Indian Airlines-এর air-bus-এ উঠলাম। জীবনে এই প্রথম প্লেনের ভিতরটা দেখা এবং চড়া; প্রায় ফাঁকাই ছিল প্লেনটা, আমাকে জানালার ধারে বসতে দেওয়া হয়েছিল। তবু নতুন প্লেন চড়ার উত্তেজনা ছিল না মনে। মনে আসছিল শত সহস্র স্মৃতি-বিজড়িত দেশের কথা। বোম্বে থেকে আকাশ-পথে সুদূর নিউইয়র্ক প্রায় ৮,২৭৯ মাইল। বিদেশে যাওয়ার আনন্দ হয়নি। দেশ ছাড়ার বেদনাই মনে ছিল।

Air-bus আকাশে উঠলো—একেবারে ৩১০০০ ফিট উঁচুতে। ঘণ্টায় প্রায় ৫০০ মাইল বেগে যাচ্ছে। সকাল সাড়ে নয়টায় প্লেন ছেড়েছিল। ঠিক ১২টায় বোম্বেতে নামল। Airport-এ নিরাময়ানন্দজী ও কালীপদ মহারাজ এসেছিলেন। আশ্রমে আসতে একটার উপর হয়ে গেল। মন্দির বন্ধ। দরজায় প্রণাম ক'রে আমরা তিনজন থেতে বসলাম। অপরাহ্নে চায়ের আসর। ঠাকুরপ্রণাম ক'রে এসে আসরে যোগ দিলাম—ভাষ্যানন্দজী ও একজন আমেরিকান ব্রহ্মচারী, ত্রিবিক্রমজীও ছিলেন।

আরব সমুদ্রের তীরে বোম্বের জুহু-বীচে সূর্যাস্ত দেখলাম, বোম্বের জুহু-বীচ নিউইয়র্কের ক্ষুদ্র সংস্করণ। শুভানুধ্যায়ী ত্রিবিক্রমজীর অনুরোধে নিরাময়ানন্দজী কিছু উপদেশ দিলেন।

শুক্রবার (১১।২) রাত দশটায় গৈরিক বস্ত্র ছেড়ে সাহেব সাজতে হোল। রাত সাড়ে দশ-টায় আশ্রমের গেটের কাছে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম ক'রে সাধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। সঙ্গে নিরাময়ানন্দজী, ত্রিবিক্রমজী, কালীপদ মহারাজ ও সিদ্ধার্থা-নন্দজী। Airport-এ State Bank of India-র counterে থেকে ৫৬৲ দিয়ে মাত্র ছয়টি ডলার পেলাম, Immigrant visa; ওর চেয়ে বেশী পাওয়া যায় না। প্লেন ছাড়তে দেরী হোল। সাধুরা যতদূর যাওয়া যায় ততদূর গিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন। রাত সাড়ে বারোটায় তাঁদের ছেড়ে প্লেনে চড়ার জন্য রওনা হলাম। এবার সীট পড়েছিল প্লেনের ডানার কাছে। পা ছড়িয়ে বসা যায়। যাত্রী নাই বিশেষ। রাত একটার পর প্লেন ছাড়ল দিল্লীর উদ্দেশে। দিল্লী থেকে উঠলেন এক মধ্যবয়স্কা মহিলা, ভারতীয় মহিলা, তিনবার বিলেত গেছেন। ছেলের কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়ে চলেছেন। American visaটির আয়তন কম নয়—১৪"×১৮"—তার উপর প্ল্যাসটিক জড়ানো, যাতে লেখাগুলি মুছে

না যায়। J. S. Mohamedally-র দোকান থেকে পাওয়া প্ল্যাসটিক হ্যাণ্ডব্যাগে ঢুকিয়েছি visaটিকে। সবাই চায় আমেরিকা যেতে। তাই visa, passport খুব চুরি হয়। তাই এত সতর্কতা।

রাতে ঘুম হয়নি। সকালে Kuwait-এ প্লেন থামল। প্রায় ৬০ জনের মতো এক জাপানী ছাত্রছাত্রীদল উঠে প্লেনটিকে একেবারে ভরিয়ে দিলে।

প্লেন আকাশে উঠার পর এল breakfast; যখন টিকিট কিনি, তখনই Air-India Office-এ লিখিয়েছিলাম purely vegetarian। অনেক কিছু দিয়েছে, অচেনা খাগু, তাই পাশের ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস ক'রে সন্দেহমুক্ত হয়েছিলাম।

বেলা দশটা নাগাদ প্লেন বার্লিনে থামল। ভীষণ কুয়াশা, সামান্য বৃষ্টি পড়ছে। এখানে অনেকেই ঘড়ির কাঁটা লণ্ডন টাইম অনুসারে ঘুরিয়ে নেয়। লণ্ডনে বেলা ১২টা হলে বার্লিনে বেলা একটা, আর ভারতে বিকেল ৫-৩০ মিঃ।

মাত্র একঘণ্টা পরেই লণ্ডন। চিন্তা হোল, কারণ লণ্ডনের স্বামী ভব্যানন্দজী বোম্বে আশ্রমে phone-এ জানিয়েছিলেন যে, তিনি Airport-এ আসতে পারবেন না। তাঁকে Scotland যেতে হবে। তাঁর আশ্রমের ব্রহ্মচারী Andrew যাবে। আমি যেন হাতে 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র একটি কপি রাখি। এতে চিনতে না পারলে Announcement counter থেকে আমি আমার নাম ও গন্তব্যস্থল ঘোষণা করব এবং ঐ আশ্রমের ব্রহ্মচারীও তাই করবে। ঠিক বেলা ১১-৩০ মিঃ আমরা লণ্ডনের Heathrow Airport-এ নামলাম। অনেকটা পথ হাঁটতে হয়। মাঝে দুজায়গায় escalator আছে। ভাগ্যে ২।১ বার কোলকাতার Reserve Bank-এ escalator-এ চড়া হয়েছিল। Visa দেখার জন্য কয়েকজন অফিসার আছেন। আমিই প্রথম যাই। কাগজপত্র দেখালেও অযথা একটু দেরী করলেন। শুনেছি অন্যদের (অবশ্য যাঁরা লণ্ডনে থামবেন) একটু কষ্ট পেতে হয়। নীচে নেমে দাঁড়িয়ে স্যুটকেশ দুটি নেবার জন্য conveyor-এর কাছে এলাম। এদেশে কুলি নেই। একজনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি ট্রলি (trolley) নিতে বল্লেন। সামনেই অনেক ট্রলি রয়েছে। কোন পয়সা লাগে না। এটা একটা বেশ ভাল ব্যবস্থা, বোম্বে বা নিউইয়র্কে এ ব্যবস্থা নেই। মাত্র কয়েক গজ মাল নিয়ে গিয়ে বোম্বেতে কুলি ৩টি মালের জন্য ৯৲ নিয়েছিল। যাক্ মাল নিয়ে এলাম Custom officer-এর কাছে। আমার ব্যাগ ও স্যুটকেশ নেড়েচেড়ে দেখে ছাড়লেন। ট্রলিতে মালপত্র নিয়ে বাইরে এলাম। এবার লণ্ডনের শীত টের পেলাম, যদিও ভাগ্যবলে আকাশ পরিষ্কার ছিল, যা বিলেতে একান্ত দুর্লভ। যাত্রীদের পরিচিত লোকের সারি। হাতে আমার 'প্রবুদ্ধ ভারত'। কিন্তু কেউ ডাকছে না। শেষে নাম ঘোষণা করতে যাব, এমন সময় দেখতে পেলাম একজনের ইঙ্গিত। Br. Andrew 'প্রবুদ্ধ ভারত' দেখেই চিনেছে। Airport-এর নিকটে একটা চারতলা বাড়ী car-parking-এর জন্য। সেখানে আমাদের গাড়ি ছিল। প্রায় ৪৫ মিনিট লাগল আশ্রমে আসতে। বেলা তখন প্রায় দুটো, স্নান না করেই দুজনে খেয়ে নিলাম।

আশ্রমে সন্ধ্যের দিকে এলেন অনিলবাবু। প্রায় ২২ বছর লণ্ডনে বাস। অবিবাহিত ও ঠাকুরের ভক্ত, টেলিফোন বিভাগের একজন অফিসার, পাশ্চাত্যের মিশনকেন্দ্রগুলির সঙ্গে তিনি টেলিফোন মারফত যোগাযোগ রাখেন,

৮২ বছরের বৃদ্ধা মাকে নিয়ে থাকেন। মাকে নিয়ে মাঝে মাঝে দেশেও যান। তাঁর মায়ের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য কেদার বদ্রী যাবার ইচ্ছা আছে। আমার সঙ্গে পূর্ণকুম্ভের জল ছিল। সেই জল দিলাম অনিলবাবুকে। অনিলবাবু নিউইয়র্কে ফোন ক'রে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর মা সেই জল স্পর্শ ক'রে যেন ত্রিবেণী মায়ীরই স্পর্শ অনুভব করেছিলেন। সংস্কার মানতে হয়। ভারতের মানুষ কি ভারতের ঐতিহ্যকে একেবারে ভুলে যেতে পারে! মাতৃভক্ত অনিলবাবু মেদিনীপুরে গিয়ে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের ইচ্ছা শেষ বয়সে রামকৃষ্ণ মিশনের কোন আশ্রমের কাছাকাছি থেকে জীবন কাটাবেন। পূর্বে এঁর সঙ্গে বোম্বে আশ্রমে দেখা হয়েছিল।

লণ্ডন! স্কুল থেকে বৃটেনের ইতিহাস পড়েছি। এই জাতের সভ্যতার অনেক ইতিহাস আমাদের জানা আছে। এদের প্রতি আমাদের মনে যতই বেদনা ও ক্ষোভ থাকুক না কেন, এদের জাতীয় জীবনের একটা গৌরবময় দিকও আছে। জাতীয় চরিত্র একটা মহান সম্পদ। শুধু মাত্র চারিত্রিক সম্পদে বলীয়ান হয়েই এরা সভ্যতার ইতিহাসে অনেক কিছু দান করেছে। আমার মনে প্রথমেই দাগ কাটে এদের নীরবতা। চুপচাপ সব চলেছে, কোলাহল নেই।

লণ্ডনের বাস মানেই দোতলা। বেলা সাড়ে নয়টায় টিউবে ও বাসে দেখেছি প্রায় খালি। 'The way to see London is from the top of a bus'—অনিলবাবুর সঙ্গে দোতলা-বাসের উপর বসে প্রায় গোটা শহরটা দেখেছি। গাছ ও পার্কের দেশ লণ্ডন। প্রায় সর্বত্রই রাস্তায় সারি সারি গাছ। শীতের লণ্ডন শেলীর 'Ode to the West Wind'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। তীর্থময় ভারত, আর পার্কময় লণ্ডন বলা যায়। আমাদের আশ্রমের কাছেই বিখ্যাত Hyde Park ৬৩৬ একর জায়গা নিয়ে। এর চেয়ে বড় বড় পার্ক আছে। Richmond পার্কের আয়তন ২৩৭০ একর। Hyde পার্কে সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়া ও গাছের মধ্যে রেস্তোরায় খাওয়ার দৃশ্য দেখেছি।

বীরেনবাবু আমাদের আশ্রমে আজ ১০।১১ বছর আছেন। যৌবনেই চলে এসেছিলেন আর ঠাকুরের অশেষ কৃপায় জীবনটা আশ্রমেই কাটাচ্ছেন। ভব্যানন্দজী খুবই স্নেহ করেন বীরেনবাবুকে। অবিবাহিত যুবক। নিজের গাড়ি আছে। অফিসে যান আর বাকি সময় সর্বদাই আশ্রমে কাটান। অনেক কিছু কাজ নিজে করতে পারেন। রবিবার তিনি আমাকে গাড়ি ক'রে লণ্ডন শহরের সব কিছু দেখালেন—National Art Gallery, White Hall, Parliament, West Minister Abbey (যেখানে রাজা-রানীদের অভিষেক-কার্য সম্পন্ন হয়), 10 Downing St. (অত্যন্ত সাধারণ বাড়ী—প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন ও অফিস), ৩২০ ফিট উঁচু ঘড়ি (Big Ben), Trafalgar Square, (১৮০৫ সালের নৌযুদ্ধে বিজয়ী নেলসনের ১৮৫ ফিট স্তম্ভের উপর বিরাট প্রতিকৃতি, অনেক পায়রা দেখলাম এখানে, শুনেছি এত পায়রা নাকি ভেনিসের St. Mark's Square ছাড়া পৃথিবীতে কোথাও নাই), Fleet Street (বিখ্যাত সংবাদ-পত্রগুলির অফিস), St. Paul's Cathedral (৫১৫'×১২৫'×৩৬৫'), Tower of London (কারাবাস ও মৃত্যুদণ্ডের জন্য বিখ্যাত), Buckingham Palace, Piccadilly ইত্যাদি অনেক কিছুই বীরেনবাবুর দৌলতে দেখেছি।

লণ্ডন ব্রীজের উপর দিয়ে যাবার সময় 'The Hound of Heaven'-এর বিখ্যাত কবি Francis Thomson (1859-1907)-এর কথা স্মরণ করেছি,—'All things betray thee, who betrays Me'—চিরকাল যেন স্মরণে থাকে।

সোমবার বৃটিশ মিউজিয়াম ও Madame Tussud (টুসোড)-এর মোমের দ্বারা গঠিত ইতিহাস-বিখ্যাত নর-নারীর মূর্তি দেখলাম। ভীষণ ভীড়। এর মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু ও ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতি আছে। এর মধ্যে Chamber of Horrors নামে একটি কক্ষ আছে, ইতিহাসের কুখ্যাত নর-নারীদের প্রতিকৃতি এখানে দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লব-খ্যাত Marie Antoinette-এর মস্তকছেদনকারী অস্ত্রটি (guillotine) আছে। এটি আসল, মোমের নয়। হাত দিয়ে ব্লেডটা স্পর্শ করায় মনটা খারাপ লাগল। হাতটা ধুয়ে এলাম। আমাদের আশ্রমের পাশেই Holland Park ও Commonwealth Institute—কমনওয়েলথ-অন্তর্ভুক্ত সব দেশেরই শিল্পকলার নিদর্শন এতে আছে। ভারতীয় বিভাগে সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তি, গণেশের মূর্তি, কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের চিত্র প্রভৃতি দেখলাম।

Tube Rly. বোধ হয় লণ্ডনেই প্রথম হয়, ১০ই জানুআরী ১৮৬৩তে। পৃথিবীর বৃহত্তম পরিবহণ সংস্থা এখানে। ৮ মিলিয়ন লোক বাস করে। ১৯৫২-র সেন্সাস অনুসারে হাজার প্রতি দশজনের মৃত্যু হয়। রাস্তায় এক জায়গায় লেখা আছে—Litter offenders are liable to pay £ 100 fine. কুকুর রাস্তা ময়লা করলে মালিককে ২০ পাঃ জরিমানা দিতে হবে। এ ব্যাপারে নিউইয়র্কের চেয়ে লণ্ডন অনেক । তাই রোম, প্যারিস ও নিউইয়র্কের তুলনায় লণ্ডনকে বলা হয়েছে—'finest and healthiest city.'

লণ্ডনেই প্রথম মুখ খুলতে হোল রবিবারে। ৩০। ৫ জন ভক্তের মধ্যে ভব্যানন্দজীর কাছে বসেছিলাম। অনেকেই প্রশ্ন করলেন। প্রায় ৩০।৪০ মিঃ ধ'রে উত্তর দিতে হয়েছিল।

মঙ্গলবার, ১৫।২ তাং আমার নিউইয়র্কগামী প্লেন ছাড়বে বেলা একটায়। ভীষণ কুয়াশা। তিন ঘণ্টা দেরীতে প্লেন ছাড়ল। সেই সকালে খাওয়া, তাড়াতাড়িতে আসার সময় খাবার এলেও খেতে পারিনি। Airport-এ এসে শুনলাম দেরী হবে। Br. Andrew ও হল্যাণ্ডের যুবক ভক্ত John Ian-কে বিদায় দিলাম। Custom-এর ঝামেলা চুকিয়ে International lounge-এ বসলাম একা, বেলা একটা। ওরা কিছু খাবার কথা বলেছিল, কিন্তু এত দেরী হবে জানতুম না ব'লে খাওয়া হয়নি। দুর্দান্ত ক্ষিদে। অনেকেই বসে খাচ্ছেন। আমার সম্বল মাত্র ছয় ডলার। ধনীর দেশ আমেরিকা। প্রতি ঘণ্টায় সাধারণ মজুরেরা ৫।৬ ডলার নেয়। Airport-এ কি লাগে জানি না, তাই খরচ করিনি। বেলা ৪টায় প্লেন ছাড়ল। নীচে তুলোর মত সাদা মেঘ, কিন্তু উপরে সূর্যকিরণ। সাড়ে চারটায় খাবার এল। প্রচুর খাবার, কিন্তু বিশেষ খেতে পারিনি। প্লেনটা প্রায় ফাঁকা, আমার আগের সীটে গলায় কণ্ঠী-পরা বৈষ্ণব যুবক। হাতে শ্রীমদ্ভাগবত, বৈরাগীর বসন, আমেরিকান, সীটের হাতল তুলে দিয়ে শুয়ে পড়ল। প্লেন নামল নিউইয়র্কের Kennedy Airport-এ। সময় (নিউইয়র্কের) সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা, অর্থাৎ লণ্ডনের রাত ১১-৩০ এবং ভারতে ভোর ৫টা। এখানে কিছু checking করেনি। কুলির বা trolley-র সাক্ষাৎ পাইনি। দুটি সুটকেস ও

ব্যাগ নিয়ে নিজেই বাইরে এলাম, বুঝলাম কি ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা—জিরো ডিগ্রী! চারজন ভক্ত এসেছিলেন নিতে। এখানেও 'প্রবুদ্ধ ভারত' সাহায্য করেছে। পবিত্রানন্দজী ওভারকোট, টুপি ও মাফলার পাঠিয়েছিলেন এয়ার পোর্টে। তা আর দরকার হয়নি। প্রায় ৪৫ মিঃ পরে হঠাৎ গাড়ি থামল একটি বাড়ীর সামনে—বেদান্ত সোসাইটি—স্বামীজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এদেশে আদি আশ্রম। সময় তখন ৭-৪৫মিঃ।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য ও তৎপরবর্তী আচার্যগণ (পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ) : শ্রী১০৮ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়া বাবা। প্রকাশক : শ্রীনেপাল চক্রবর্তী, কাঠিয়া বাবার আশ্রম, পো : সুখচর, জিলা ২৪ পরগণা। পূর্বভাগ—(১৩৮১), পৃষ্ঠা ৩৬+৩৭৬+৩৮, মূল্য বারো টাকা। উত্তরভাগ—(১৩৮১), পৃষ্ঠা ১০ + ২২২, মূল্য সাত টাকা।

মুণ্ডকোপনিষদের সূচনায় আছে, দেবগণের মধ্যে প্রথম ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি বিশ্বের কর্তা এবং ভুবনের পরিরক্ষক। তিনি সকল বিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা অথর্বা নামক তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা অথর্বাকে যাহা বলিলেন, অথর্বা সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রথমে অঙ্গির্ নামক ঋষিকে বলিলেন, তিনি ভরদ্বাজ বংশের সত্যবহ নামক ঋষিকে তাহা বলিলেন এবং সত্যবহ অঙ্গিরাকে তাহাই বলিলেন। উপনিষদের এই কথাগুলি হইতে আমরা বুঝিতে পারি, ব্রহ্মবিদ্যা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় প্রাপ্ত বিদ্যা। বস্তুতঃ সকল যথার্থ অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেই একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা থাকে, গুরুপরম্পরারূপ একটি অখণ্ড যোগসূত্রের দ্বারা সম্প্রদায়ভুক্ত সকল সাধকই যুক্ত থাকেন। শংকরাচার্য বলিয়াছেন, গুরু- ও সম্প্রদায়-রহিত ব্যক্তির ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় না। ফলতঃ সাধক-মাত্রেরই নিজ সম্প্রদায়ের আচার্যগণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সাধনারই অঙ্গবিশেষ। প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহের আচার্যগণের জীবনী ও উপদেশ সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদির অভাব আছে। গ্রন্থকারের 'শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী' নামক মূল গ্রন্থ নিম্বার্কসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এই অভাব দূরীকরণের একটি সার্থক প্রয়াস। এই মূল গ্রন্থের চারিটি খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব ও উত্তর ভাগ সহ বর্তমান গ্রন্থটি উক্ত সিরিজের পঞ্চম ও শেষ খণ্ড। এই খণ্ডের পূর্বভাগে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ৫১ জন আচার্য এবং উত্তরভাগে ঐ সম্প্রদায়ের তিনটি বিভিন্ন শাখায় ততোধিক সংখ্যক আচার্য এবং মহাপুরুষের জীবনী ও উপদেশাবলী গ্রন্থকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। নিম্বার্কসম্প্রদায় বৈষ্ণবগণের চতুঃসম্প্রদায়ের অন্যতম। শ্রীহংস ভগবান ইহার আদি আচার্য হইলেও শ্রীনিম্বার্কাচার্য ইহার প্রথম ঐতিহাসিক পুরুষ। শ্রীনিম্বার্কাচার্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা নির্ধারণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও ঐ সম্প্রদায় যে অতি প্রাচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজ ও শ্রীসন্তদাস কাঠিয়া বাবাজী মহারাজের জীবনী অংশ (অষ্টম ও নবম অধ্যায়) এবং পরিশিষ্টটির কথা ছাড়িয়া দিলে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য এবং শ্রীকেশবকাশ্মীরি ভট্টজীর প্রসঙ্গই এই গ্রন্থের পূর্বভাগের সর্বাধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। নিম্বার্কসাহিত্যে ইঁহাদের অবদানও সুবিদিত।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য হইতে গ্রন্থের প্রারম্ভ এবং তাঁহার আলোচনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রীর উপর নিম্বার্কভাষ্যের এবং শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য-কৃত 'বেদান্তকৌস্তুভ' নামক ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ দিয়াছেন। ইহাতে উভয় ভাষ্যের সহিত পাঠকবর্গের পরিচয়ের সুযোগ ঘটায় নিম্বার্কদর্শনের মূলতত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে তাঁহাদের স্পষ্ট ধারণা হইবে। এই সংযোজনের জন্য দর্শনরসপিপাসু পাঠকগণ গ্রন্থকারকে সাধুবাদ দিবেন।

শ্রীকেশবকাশ্মীরির ক্ষেত্রে গ্রন্থকার কিন্তু এই ধরনের দার্শনিক আলোচনার অবতারণা করেন নাই; শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট কেশবকাশ্মীরির পরাজয়ের কথা লইয়া দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন এবং এই পরাজয় যে নিছক কল্পনা-প্রসূত প্রচুর তথ্য পরিবেশন ও বিশ্লেষণ করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই ধরনের শাস্ত্রীয় বিচারে জয় পরাজয়ের কথা আমাদের দেশে আরও আছে এবং সে-সব ক্ষেত্রে সত্যাসত্য নির্ণয় করাও যেমন কঠিন, তেমনি উহাকে গুরুত্ব দেওয়াও অনাবশ্যক মনে হয়। যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সেইসব যুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল কিনা সন্দেহ এবং নিজ নিজ সম্প্রদায় এবং আচার্যকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য সময়ে সময়ে অনেক কিছু অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইত। যাহাই হউক শ্রীকেশবকাশ্মীরিজী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার সেই অত্যুচ্চ মহিমাকে খর্ব করিতে পারিবে না।

পরিশিষ্টে ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও শ্রীললিতকুমার বসু কর্তৃক শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়-দাসজী কাঠিয়া বাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণিত হইয়াছে, কারণ তিনি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য হইতে মূল গুরুপরম্পরায় ৫২তম আচার্য।

উত্তরভাগে গীতগোবিন্দকার কবি শ্রীজয়দেব, তানসেন-গুরু হরিদাসস্বামী ও মীরাবাঈ-এর জীবনী গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। যদিও ইঁহারা কেহই নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্য ছিলেন না, তথাপি গ্রন্থকারের মতে ইঁহারা সকলেই উক্ত সম্প্রদায়ানুবর্তী বৈষ্ণব ছিলেন। অধিকন্তু তাঁহারা ভারতবিখ্যাত সাধক-সাধিকা। এই উভয় কারণে গ্রন্থকার তাঁহাদের বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্যগণের মুখ্য সাধনাস্থল, মঠ, মন্দির, আশ্রম ও প্রচারকেন্দ্রের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

গ্রন্থটি সুলিখিত এবং ইহা নিম্বার্কসম্প্রদায়ের ভক্তদিগের একটি যথার্থ অভাব পূরণ করিবে। প্রামাণিক তথ্যের অভাবে এই ধরনের গ্রন্থের নামের একটি দীর্ঘ তালিকায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু বহু পরিশ্রম করিয়া তথ্যাদি সংগ্রহ করার ফলে এবং গ্রন্থকারের রচনা-কৌশলে আলোচ্য গ্রন্থটি একটি সুখপাঠ্য মূল্যবান কৃতির মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থকার অবশ্য তথ্যের জন্য অনেকাংশে নাভাজীকৃত 'ভক্তমালে'র উপর নির্ভর করিয়াছেন কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, নাভাজীকৃত 'ভক্তমাল' ভিন্ন আরও 'ভক্তমাল' আছে। সুতরাং এই বিষয়ে আরও গবেষণার অবকাশ আছে কিনা সেই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে।

যদিও গ্রন্থটি মুখ্যতঃ নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণের বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে, তথাপি বহু মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী থাকায়, ইহা সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণ কর্তৃক সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ, প্রকৃত সাধকগণ যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, তাঁহাদের উদার হৃদয় যেখানেই ভগবৎ-প্রেমিকগণের সন্ধান পায় সেখানেই পরিতৃপ্ত হয়।

গ্রন্থটির উভয় ভাগেরই ছাপা, কাগজ ও

বাধাই প্রশংসনীয়। মুদ্রণ-প্রমাদ নাই বলিলেই চলে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীলোকেন্দ্রনাথ বসু

সত্য পথের সন্ধান : লেখক ও প্রকাশক স্বামী পরমানন্দ তীর্থ, অবধূত আশ্রম, ৬ মহেশ মুখার্জী ফিডার রোড, কলিকাতা-৫৭। (১৩৮২), পৃষ্ঠা ২৬২, মূল্য আট টাকা ও নয় টাকা।

জানিবার ইচ্ছা চিন্তাশীল মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম। সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করাই পরম পুরুষার্থ। অথচ আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত সংসারের দুঃখের কোনও কালে অবসান হইবে না। সুতরাং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শ্রদ্ধালু মানবের সত্যাদি-সাধনপথে সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হওয়া উচিত। উপনিষদও বলিয়াছেন—

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্॥

তাৎপর্য এই যে, সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের নহে; দেবযান নামক বিস্তীর্ণ পথ এই সত্য দ্বারাই লাভ করা যায়; যেখানে সাধন-সত্যের ফলস্বরূপ পরমার্থ সত্য সর্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থরূপে নিহিত আছে, আপ্তকাম ঋষিগণ সেখানে গমন করেন।

এই পরমার্থ সত্যকে লাভ করিবার জন্য সত্যাদি-সাধনপথের প্রয়োজনীয়তা আলোচ্য গ্রন্থে স্বামী পরমানন্দজী শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সহজ সরল ভাষায় সাধকের সাধারণ স্তর হইতে চরম স্তরে পৌছিবার কর্ম ভক্তি যোগ ও জ্ঞান-পথের সাধন-ক্রমগুলি গ্রন্থকার নিজস্ব তপস্যালব্ধ প্রজ্ঞা-সহায়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছুক ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীও ঈদৃশ গ্রন্থের সাহায্যে প্রভূত উপকৃত হইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ছাপা ও কাগজ ভাল। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথপ্রদর্শক এই গ্রন্থখানির উত্তরোত্তর প্রচার ও প্রসার কামনা করি। শ্রী…

যোগসন্দর্শন : শ্রীদিব্যসুন্দর দাস। প্রকাশক : শ্রীপ্রেমসুন্দর দাস, ১৮।২, ছকু খানসামা লেন, কলিকাতা-৯। (১৯৭৬), পৃষ্ঠা ৬০, মূল্য তিন টাকা।

'যোগ' শব্দের সাধারণ অর্থ মিলন, ঐক্য। হিন্দুশাস্ত্রে 'যোগ' শব্দের অর্থ—চিত্তবৃত্তির নিরোধ; লক্ষ্যবস্তু হইতে অন্য বিষয়ের দিকে চঞ্চল মনের গতির নিবৃত্তি; জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ অর্থাৎ ভক্তি কর্ম জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ রাজযোগ-সাধনের দ্বারা মনকে ভগবানের সহিত যুক্ত বা মিলিত করা। সুস্থ সংযত পবিত্র শরীর-মনকে শুদ্ধস্বরূপ ভগবানের সহিত যুক্ত করাই যোগসাধনের চরম লক্ষ্য। যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহাদের প্রয়োজন মাংসপেশীগুলিকে লোহার মতো ও স্নায়ুগুলিকে ইস্পাতের মতো শক্ত করা এবং মনকে বজ্রসদৃশ উপাদানে গঠিত করা।

আলোচ্য 'যোগসন্দর্শন' পুস্তিকায় লেখক যোগব্যায়াম-প্রণালী অর্থাৎ আসন মুদ্রা ও প্রাণায়ামের সাহায্যে দেহ-মনের সংযোগস্থাপনের নিয়মগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাকে যোগ-ব্যায়াম-শিক্ষার্থীদের পথপ্রদর্শক পুস্তিকা (পকেট-সাইজের গাইড বুক) হিসাবে গ্রহণ করা যায়। দেহ-মনের সংযোগস্থাপন ও উন্নয়ন যৌগিক ব্যায়ামের প্রধান উদ্দেশ্য। নিয়মিত যোগাসন-

অভ্যাসের ফলে দেহ সুস্থ সবল দৃঢ় নীরোগ কার্যক্ষম ও প্রাণবন্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনও আধিহীন বা গ্লানিমুক্ত সংযত সতেজ নিবিষ্ট ও আনন্দময় হয়।

পুস্তিকাটির লেখক বাল্যকাল হইতেই নিয়মিত যোগব্যায়াম অভ্যাস করিয়াছেন প্রখ্যাত ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষ ও ডাঃ গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে এবং শত শত শিক্ষার্থী ও রোগীকে শিক্ষাদান করিয়াছেন।

পুস্তিকাটিতে শবাসন ভুজঙ্গাসন বজ্রাসন পদ্মাসন সুখাসন প্রভৃতি ৪২টি আসন এবং মহামুদ্রা উড্ডীয়ান নৌলী ধৌতি অশ্বিনীমুদ্রা ভস্ত্রিকা ও শীতলী প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪৬টি ছবিও দেওয়া আছে। ছবিগুলি লেখকের নিজের যোগ-ব্যায়াম অভ্যাসের সময়ে তোলা। প্রচ্ছদপটেও একহস্তবদ্ধ ময়ূরাসনের একটি শোভন রঙীন ছবি আছে। কোন্ কোন্ আসনের অভ্যাসে কি কি উপকার হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা অজীর্ণ আমাশয় ক্ষুধামান্দ্য সর্দিকাশি হাঁপানি বহুমূত্র রক্তচাপ অনিদ্রা বাত প্রভৃতি রোগের প্রতিরোধে কি কি আসন-অভ্যাসের প্রয়োজন, তাহার উল্লেখ আছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম-নির্দিষ্ট সূর্য-নমস্কারের পদ্ধতিও বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার আটটি বিভিন্ন আসনের ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে। ছবিসমেত দেহপরিচয় এবং শারীরিক কি অবস্থায় কোন্ কোন্ আসন নিষিদ্ধ তাহাও বর্ণিত হইয়াছে।

মোটের উপর পুস্তিকাটিতে যোগব্যায়ামের বহু তথ্য বিশেষ নিপুণতার সহিত সহজ সরল ভাষায় পরিবেশিত হইয়াছে। মুদ্রণ ও ছবিগুলি পরিচ্ছন্নতা ও যত্নের পরিচয় দেয়। পুস্তিকাটি ছাত্র-ছাত্রী এবং যোগব্যায়ামানুরাগী মাত্রেরই অশেষ উপকারে আসিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

জামশেদপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি এপ্রিল ১৯৭৫—মার্চ ১৯৭৬-এ পরিচালনা করে:

১। (ক) পাঁচটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালকদের জন্য দুইটি, বালিকাদের জন্য দুইটি এবং বালক-বালিকা উভয়ের জন্য একটি)—ছাত্রসংখ্যা ১,৫৫৩; ছাত্রীসংখ্যা ২,১১৬। (খ) চারিটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়—ছাত্র-সংখ্যা ২,২৯৫; ছাত্রীসংখ্যা ১,৯১১। (গ) দুইটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়—ছাত্রসংখ্যা ৩৪২; ছাত্রীসংখ্যা ২৫৫।

এই এগারটি বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮,৫৯২। একটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় শুধু হিন্দী-ভাষীদের জন্য নির্দিষ্ট। দুইটি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, তিনটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে এবং একটি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকল শ্রেণীতে বাংলা বিভাগের সহিত প্রায় সমানসংখ্যক হিন্দী বিভাগ আছে। অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতে যে-সকল ছাত্রের মাতৃভাষা হিন্দী নয় তাহাদের হিন্দী আবশ্যিক বিষয় হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয়।

২। পল্লী অঞ্চলের অনগ্রসর শ্রেণীর বালকদের জন্য একটি ছাত্রাবাস—মোট ছাত্র-সংখ্যা ৩৩, তন্মধ্যে দশটি বালক সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক এবং পাঁচটি বালক আংশিক নিঃশুল্ক থাকা ও খাওয়ার সুযোগ পায়।

৩। একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার—পুস্তক-সংখ্যা ৪,২১০, ৮টি মাসিক পত্রিকা, ৬টি সাপ্তাহিক ও ৪টি দৈনিক পত্রিকা।

৪। ১১টি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসমূহ—গ্রন্থসংখ্যা ৩১,৪৭০।

৫। ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে সাপ্তাহিক আলোচনা এবং সাময়িক বক্তৃতা।

৬। নিজস্ব প্রজেকটারের সাহায্যে সময়ে সময়ে সবাক চলচ্চিত্র-প্রদর্শন।

৭। শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও বনভোজন এবং সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য পাঠ্যসূচী-বহির্ভূত কার্যক্রম।

৮। বিদ্যালয়গুলিতে কালো ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান।

৯। বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ছয়শত দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বিনা বেতনে ও আংশিক বেতনে অধ্যয়নের জন্য মোট ২৬,২১৫ টাকার ব্যয়ভার-বহন।

১০। সোসাইটি-সংলগ্ন প্রার্থনাগৃহে একাদশীতে রামনাম-সংকীর্তন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সারদাদেবী স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য মহাপুরুষদের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন, খ্রীস্টমাস ঈভ শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমী উৎসব পালন এবং মহাসমারোহে কালীপূজা, দুর্গাপূজা ও সরস্বতী-পূজার অনুষ্ঠান।

অন্যান্য বিশেষ সংবাদ: (১) ইন্দ্রনগর হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর একটি ছাত্রী জামশেদপুর রোটারী ক্লাব হইতে এক বৎসরের জন্য মাসিক পঁচিশ টাকার একটি বৃত্তি পায়। (২) স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী তহবিল হইতে রামকৃষ্ণ মিশন লেডি ইন্দ্র সিং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন বিদ্যার্থী গত বৎসর হইতে মাসিক পঁচিশ টাকার একটি বৃত্তি পাইতেছে। (৩) সিধগোরা বিবেকানন্দ মধ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রী পরিষদ কর্তৃক শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে সাপ্তাহিক আলোচনা বেশ ফলপ্রসূ হইয়াছে। (৪) ১৯৭১-৭২ সনে স্থাপিত পুস্তক ব্যাঙ্কটির প্রশংসনীয় কাজ অব্যাহত আছে। (৫) ১৯৭৬ সনে মিশন বিদ্যালয়গুলি ১৭০ জন আদিবাসী ও ১০৬ জন হরিজন ছাত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়াছে। (৬) বিগত ১০ বৎসর বিহারের পল্লী অঞ্চলগুলির চারিশতাধিক বালক সাকচি ছাত্রনিবাসে থাকিয়া স্থানীয় স্কুল ও কলেজে পড়িবার সুযোগ পায়। খাই-খরচ ছাড়া সিট ভাড়া, আলো প্রভৃতির জন্য তাহাদের কিছুই দিতে হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে ১৩টি আদিবাসী ও ২টি হরিজন বালকের শিক্ষা ও আহারের সম্পূর্ণ ব্যয় আশ্রম হইতে বহন করা হইয়াছে। (৭) ৩২,০০০ টাকা ব্যয়ে বর্তমান অতিথি-শালার উপর দুইটি প্রকোষ্ঠ নির্মিত হইয়াছে—তন্মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠ স্থানীয় পরিচালক কমিটির দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট পরলোকগত শিবতোষ দাসগুপ্তের স্মৃতিরক্ষার্থে। (৮) ভগিনী নিবেদিতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের উপরে ক্লাশ-লাইব্রেরীর জন্য তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে চারিটি প্রকোষ্ঠ নির্মিত হইয়াছে। (৯) ইন্দ্রনগর হাই স্কুলের জন্য একটি ত্রিতল বিজ্ঞান-ভবন নির্মিত হইতেছে। ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য আসবাব সহ ইহার জন্য আনুমানিক ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। (১০) এগারটি বিদ্যালয়ে পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহ সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের এপ্রিল, ১৯৭১ হইতে মার্চ, ১৯৭৫ পর্যন্ত কার্য-বিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

মঠ বিভাগ: ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে নিয়মিত পূজা প্রার্থনা ভজনাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্বামীজী এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব এবং শ্রীশ্রীকালীপূজা শিবরাত্রি প্রভৃতি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

মিশন বিভাগ:

(ক) অ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়:

প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই এই চিকিৎসালয়টি সর্বশ্রেণীর আর্তনারায়ণের সেবারত। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের দরিদ্র জনসাধারণও এখানে চিকিৎসিত হইয়া থাকেন। আলোচ্য চারি বর্ষে মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:

	নূতন	পুরাতন	মোট
পুরুষ	২৫৮৭৫	২৪৫৭০	৫০৪৪৫
নারী	২২৬৩৪	২৩৪৬১	৪৬০৯৫
শিশু	৪১৩৬২	৩১০৫৬	৭২৪১৮
			১৬৮৯৫৮

(খ) বিবেকানন্দ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়:

আলোচ্য চারি বৎসরে ছাত্রছাত্রী-সংখ্যা নিম্নরূপ ছিল:

	মধ্য ইংরেজী	উচ্চ প্রাথমিক	
	ছাত্র	ছাত্র	ছাত্রী
১৯৭১-৭২	৮১	১২৮	৯৬
১৯৭২-৭৩	৮৩	১৩৫	৯৪
১৯৭৩-৭৪	৮৪	১৪৩	১০৩
১৯৭৪-'৫	৮২	১৪০	১০৯

(গ) বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার:

দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যকল্পে একটি পাঠ্য পুস্তক বিভাগ আছে। শিশুদের উপযোগী পুস্তকও রহিয়াছে। ইংরেজী ও সংস্কৃত সহ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় মোট ৯৬০০ পুস্তক আছে। ৮টি দৈনিক ও ৮৩টি সাময়িক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। নিঃশুল্ক পাঠাগারে গড়ে দৈনিক উপস্থিতি ছিল ৭৮ এবং গ্রন্থাগারের মোট সভ্যসংখ্যা ছিল ৬৪০।

কালাডি শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের ১৯৭২-৭৫ সালের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১। ব্রহ্মানন্দোদয় বিদ্যালয়সমূহ:

	ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা		
	৭২-৭৩	৭৩-৭৪	৭৪-৭৫
জুনিয়ার বেসিক	২৬২	২৬৮	২৬৫
উচ্চ প্রাথমিক	৪৭৯	৫২৪	৫২৫
উচ্চ বিদ্যালয়	৫৯৫	৬৫২	৭০১

২। শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুকুল ও উপজাতি ছাত্রাবাস:

ছাত্রসংখ্যা	১০৯	১১২	১১৪

প্রতিবৎসরই ৭০ জন উপজাতি ছাত্র বিনা-খরচায় থাকা খাওয়া ও শিক্ষাদির সুবিধা পায়।

৩। শ্রীসারদা আয়ুর্বেদ বৈদ্যমন্দির:

রোগীদের সংখ্যা	৩১১৭	৩৮৭৪	৩৯৪৯

৪। সমাজশিক্ষা প্রকল্প: স্বামী বিবেকানন্দ সমাজশিক্ষা গ্রন্থাগারে ৬,৬৬০টি গ্রন্থ ও ১৮৬টি দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা আছে। প্রশস্ত সভাকক্ষটিতে ৮০০ শ্রোতা বসিতে পারে।

৫। স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার: গ্রন্থসংখ্যা ২০০০।

৬। প্রকাশন বিভাগ: শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও উপদেশ এবং আচার্য শংকরের কয়েকটি প্রকরণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

৭। ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ: আশ্রমস্থ মন্দিরে নিত্য শিবপূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা

অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা স্বামীজী আচার্য শংকর প্রভৃতির জন্মজয়ন্তী এবং নবরাত্রি শিবরাত্রি ইত্যাদি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

৮। ধর্মীয় শিক্ষণ ও প্রচার: আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে সন্ন্যাসিগণ প্রতিবৎসর প্রায় ১০০ ধর্মীয় আলোচনা-সভা করেন।

৯। কৃষি: বর্তমানে আশ্রমের ৩২·২৬ একর কৃষি-জমিতে কাজু-বাদাম, নারিকেল, রবার, ধান ইত্যাদির আবাদ করিবার প্রয়াস করা হইতেছে।

১০। নূতন মন্দির: ১৪ এপ্রিল, ১৯৭৬ নবনির্মিত মন্দিরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩ সংখ্যায় (পৃঃ ২৬৮-৭০) বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

১১। সমাজশিক্ষা: কালাডির সন্নিকটে মাত্তুরে হরিজন ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের সার্বজনীন ব্যবহারের জন্য ৫৫, ১৪২ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি বৃহৎ কক্ষ ও নাট্যমঞ্চ-সমন্বিত ভবনে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ভজন, নৈতিক শিক্ষাদান ও ধর্মীয় আলোচনা হয়। প্রায় ২০০ শিশু ও আসন্নপ্রসবা মায়েদের প্রতি সন্ধ্যায় (রবিবার ও ছুটির দিন ছাড়া) পুষ্টিকর রুটি বিতরণ করা হয়।

অন্যান্য সংবাদ

রাঁচি (মোরাবাদি) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নবীকৃত মন্দিরে গত ২১শে এপ্রিল ১৯৭৭, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের নূতন প্রতিকৃতিত্রয় স্থাপন করেন। ঐ দিন তিনি সাধুদের নিবাস-ভবনের শিলান্যাসও করেন।

শিকাগো কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভাষ্যানন্দ গত ১০ই এপ্রিল ১৯৭৭, বম্বে ছাড়িয়া জেনেভা হইয়া ১৪ই এপ্রিল শিকাগো পৌঁছিয়াছেন।

বার্কলি বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া স্বামী স্বানন্দ গত ২৩শে এপ্রিল ১৯৭৭, কলিকাতা হইতে বার্কলি রওনা হন।

বিবিধ সংবাদ

গুজরাট রাজ্য সংস্কৃত-সম্মেলন

বিগত ৫ই এবং ৬ই জুন ১৯৭৭, সুরাটে গুজরাত রাজ্য সংস্কৃত-সম্মেলন সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সমাগত পঞ্চশতাধিক বিদগ্ধ প্রতিনিধি-বর্গের উপস্থিতিতে এবং পরমশ্রদ্ধেয় জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য মহারাজের (দ্বারকার) পৌরোহিত্যে অতি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সম্মেলনের উদ্বোধন ও মঙ্গলাচরণ করেন ডক্টর রমা চৌধুরী এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ভারতীয় বিদ্যাভবনের সর্বাধ্যক্ষ ডক্টর ভাবে। দ্বিতীয় দিন প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমধুসূদন শাস্ত্রী। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের স্থান ও সংস্কৃতশিক্ষার নূতন রীতিনীতি সম্বন্ধে দুইদিনই বিশদ আলোচনা হয় এবং সংস্কৃতের প্রচার-প্রসার ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে বহুবিধ মূল্যবান প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইগুলির মধ্যে মূল প্রস্তাব এই ছিল যে, সংস্কৃতকে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মহিমা-গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও জীবিকা-উপার্জন ও আর্থিক দিক হইতে ফলপ্রসূ করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকারের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

১৯৪৩ সালে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও ডক্টর রমা চৌধুরী কর্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত প্রাচীন সংস্কৃত গবেষণামন্দির 'প্রাচ্যবাণী'র 'সংস্কৃত-পালি-নাট্য-সংস্থা' এই সংস্কৃত-সম্মেলনে আমন্ত্রিত হইয়া উভয় দিনই সন্ধ্যায় স্বরাটের সুবিখ্যাত ও সুবৃহৎ উন্মুক্ত অভিনয়মঞ্চ 'রঙ্গোপবনে' ডঃ রমা চৌধুরী বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যজীবনীমূলক সংস্কৃত নাটক 'যুগজীবনম্' এবং ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত মীরাবাঈয়ের পুণ্যজীবনীমূলক সংস্কৃত নাটক 'অমর-মীরম্' সহস্রাধিক পণ্ডিতজন সম্মুখে অভিনয় করিয়া জগদ্-গুরু শ্রীশঙ্করাচার্যের নিকট হইতে আন্তরিক অভিনন্দন ও পুরস্কার লাভ করে এবং উপস্থিত সকলকেও বিশেষ মুগ্ধ ও তৃপ্ত করে। বিশেষতঃ 'যুগজীবনম্' নাটকটি প্রত্যেককে গভীরভাবে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করে। স্মরণ থাকে যে, এই সংস্কৃত নাটকটি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ ১৯৬৭ সালে কলিকাতায় মহাজাতি-সদনে উদ্বোধন করেন এবং পরে তাঁহারই পুণ্যাশীর্বাদপূত এই নাটকটি শত শত বার ভারতের সর্বত্র অভিনীত হইয়া বিশেষ অভিনন্দিত হইয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা সারদাদেবীর কৃপায়।

প্রাচ্যবাণীর অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের ন্যায় এই দুইটি সংস্কৃত নাটকও সম্পূর্ণরূপে অপেশাদারী ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক অভিনীত হয়।

পরলোকে

যশোহর জেলার (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত) নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক **গুরুদাস গুপ্ত** গত ১৫।৫।৭৭ তারিখে ৯০ বৎসর বয়সে কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বৈকাল ৬-২০ মিনিটে সজ্ঞানে শরীরত্যাগ করেন। মৃত্যুসময়ে তাঁহার নিকট রামকৃষ্ণ মিশনের বহু সাধু উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ঠাকুরের নাম শুনান। তাঁহার শেষ ইচ্ছামত তাঁহার দেহ সাধুদের ন্যায় গঙ্গাসলিলে সমাহিত করা হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন ও মঠের বহু প্রাচীন সাধুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। কলেজের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর প্রায় ৪০ বৎসর তিনি কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের একটি নির্জন কক্ষে সাধনভজন ও সদালাপে দিন কাটাইতেন। এক সময়ে কাশীতে শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর নিকট সমগ্র গীতা অধ্যয়নের সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল।

এই চিরকুমার পরহিতব্রত ভক্তের আত্মা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পরা শান্তি লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা।

ভ্রম-সংশোধন

গত জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪ সংখ্যায় পৃষ্ঠা ২৩২-এ ২-সংখ্যক পাদটীকাটি বাদ যাইবে।

[পুনর্মুদ্রণ]

উদ্বোধন।

২য় বর্ষ।]　　১লা মাঘ।　(১৩০৬ সাল)　[১ম সংখ্যা।]

নববর্ষ প্রবেশ।

"যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি, পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্‌গতেঃ কারণমীশ্বরং বা, তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায়॥"

মাতঃ প্রণমি শ্রীপদে॥*
মঙ্গল-কারিণী শিবা,　　ত্রাতা শম্ভু উমাপতি,
সিদ্ধিদাতা গণেশাদি আছেন যত দেবতা,
রবি গুরু যত গ্রহ,　　পুরন্দরাদি দিক্‌পতি,
পাশী পবন পাবক রাশি ঋক্ষ সবে তথা,—
সদা করুন মঙ্গল॥

করুন, করুণা করি,
উদ্বোধন-শিরোপরি –
আশীর্ব্বচন বর্ষণ,　　শুভদৃষ্টির অর্পণ ;—
সত্যপথ সদাচার না করে যেন বর্জ্জন।
সর্ব্বাঙ্গে করিয়া দিন　　সিদ্ধ কবচ ধারণ,
দ্রুত উন্নতি কারণ।—
হ'ক—স্বদেশ-ভূষণ॥

এস ; অমোঘ নির্ম্মাল্য ভক্তিসহ শিরে ধরি
যাও,—উচ্চহৃদে বাঁধি পরহিতেরি কামনা।
শুনরে, কভু ভুল না,—
সর্ব্বত্র সাধিবে সদা　　পরোপকার-সাধনা,
যাবৎ জীবন আপন॥

---

* অনুষ্টুভ্।

(শ্রাবণ, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৮৫)

আজ উদ্বোধন নববর্ষে প্রবেশ করিলেন। গত মাঘের প্রথম দিবসে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। "দেবগুরু-প্রসাদে" এই এক বৎসর মধ্যে বঙ্গের প্রায় সকল স্থলেই, এবং ভারতের অন্যান্য অনেক প্রদেশেই, বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন, অনেক সহৃদয় মহাশয় ব্যক্তি তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতাধিক সফলতা লাভ, আর কোনও সহযাত্রী করিয়াছেন কি না সন্দেহ। পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদ ও সৎইচ্ছা থাকিলেই উন্নতি এবং উত্তরোত্তর উদ্দেশ্যের সফলতা হইতে থাকিবে সন্দেহ কি।

বর্ষপ্রবেশ।

উদ্বোধনের উদ্দেশ্য কিছু নিম্নশ্রেণীর নহে; আবশ্যকীয় প্রসুপ্ত গুণাবলিকে জাগ্রত করিয়া দিবার চেষ্টা করাই উদ্বোধনের কার্য। প্রয়োজনীয় যে সকল গুণাবলি স্বদেশে নাই তাহার আনয়ন করিতেই উদ্বোধনের আয়াস। নিঃস্বার্থভাবে পরহিত-সাধনাই ইহার জীবনোদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য।

পরহিত সাধনের আবশ্যক? নিজ-হিতকল্পে ব্যাপৃত থাকিলেই ত হয়। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি; পাঁচ জনকে লইয়াই সমাজ; স্ব স্ব কর্ত্তব্য করিলে কাহাকেও পরের কার্য্য করিতে হয় না; পরহিত আকাশকুসুম বা সোনার পাথরবাটীবৎ; নিজ-হিতই ত পরহিত। নিজের হিতই ত পরম হিত।

পরহিত।

কিন্তু, কালের বিচিত্র গতি। সে কালে ছিল বটে ঐ প্রকার; একালে অন্য রকম,—কর্ত্তব্যপালনের পরিবর্ত্তে অহিতাচরণই যেন প্রথা। স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন বিলুপ্তপ্রায়, নিজ নিজ হিতসাধন সুদূরপরাহত; সুতরাং পরহিতের আবশ্যক, নিঃস্বার্থতার উদ্ভব; এবং কাহারও কাহারও বোধ হইতে লাগিল, পরহিতই পরমপুণ্য, পরহিতই নিজহিত; দেখা গেল—এমন কি পশুপক্ষীর জন্যও কেহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কে জানে কেন? কে জানে, এতই কি আবশ্যক? পরহিত, নিজহিত অপেক্ষা, এতই সুখকর? নিজ জীবন হইতেও তবে কি পরের জীবন এতই মূল্যবান? উত্তর মনোমত হইবে কি না সন্দেহ; অনেকের নিকট যুক্তিযুক্ত হইবে কি না—আরও সন্দেহ।

পরহিত—নিজ হিতেরই জন্য;—না, পরহিতের জন্যই পরহিত; বা, স্বভাববশতঃ পরহিত করিতে হয়? যে কারণেই হউক, পরহিত মাত্রই মঙ্গলকর।

'নিজহিতের জন্য পরহিত'—কি প্রকার? —আদান-প্রদান ভাবে পরহিত, অর্থাৎ ইহকালে বা পরকালে কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় পরোপকার। অথবা, স্বাভাবিক নিয়মে পরোক্ষে নিজহিত, অর্থাৎ পরহিত করিতে করিতে নিজহিত আপনা-আপনি ভিতর ভিতর—হইতে থাকে: পরোপকার করিতে করিতে পরোপকার করা অভ্যাস হইয়া যায়; নিজ চরিত্র ক্রমশঃ গঠিত হয়, স্বার্থ ক্রমশঃ চলিয়া যাইতে থাকে, কর্ম্ম ক্ষয় হইতে থাকে, হৃদয়-গ্রন্থিসকল ছিন্ন হয়, অবশেষে জীবন্মুক্তি পর্য্যন্তও লাভ করিতে পারা যায়।

নিজহিতের জন্য পরহিত।

'পরহিতেরই জন্য পরহিত'—সে কেমন?—কোনও প্রত্যাশা পোষণ না করিয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবোধে পরহিতেরই নাম 'পরহিতের জন্য পরহিত'। আজ কাল এই কর্ত্তব্য-

বোধটা, অনুরোধ উপরোধেই সচরাচর হইয়া থাকে; স্বয়ং উত্থিত হইতে অতি অল্প স্থলেই দেখা যায়। যদিও কখন উত্থিত হয়, কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত হইতে না হইতে, মনাকাশেই মিলাইয়া যায়; যদিও শূন্যে না উড়িয়া যায়, অপরের প্রতি উপদেশাকারে পতিত হয় মাত্র। তবে কি বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য-জ্ঞানে প্রকৃত উপকার নাই? আছে, খুব কম। কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য—বিচার করিয়া স্থির করিতে হয় কি না; বিচার করিতে গেলে, অবশেষে হয়ত অনেকের পক্ষে অনেক উপকার, নানা কারণে বা নানা আকারে, অকর্ত্তব্যই দাঁড়াইয়া যায়। অথবা, কর্ত্তব্য বলিয়া যখন স্থির হইল, হয়ত দেখা গেল—উপকার করিবার সময় ফুরাইয়া গিয়াছে !!

পরহিতের জন্য পরহিত।

এসকল স্থলে, যাঁহারা স্বভাবতঃই পরহিতকারী, পরহিত যাঁহাদিগের একান্ত প্রকৃতিগত, পরহিত-কর্ম্মই যাঁহাদিগের জীবনোদ্দেশ্য এবং পরমব্রত, তাঁহাদিগের নিকট হইতেই যথার্থ পরোপকারের প্রত্যাশা সর্ব্বদাই করিতে পারা যায়। ইঁহাদিগকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্বভাব-বশতঃ পরহিত-সাধন।

জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্যতীত অন্যের জীবন এরূপভাবে উৎসর্গীকৃত হইতে পারে কিনা সন্দেহ। যাঁহাদিগের আপনার বলিবার কেহ নাই, জগৎই যাঁহাদিগের আপনার হইয়া গিয়াছে; সকল বস্তুর ভিতরেই যাঁহারা নিজেকে দেখেন, এবং নিজের ভিতরেও সকলকে দেখেন; যাঁহাদিগের আর কৃতকর্ম্ম নাই, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পারে গিয়াছেন; তাঁহারাই জীবনের অবশিষ্টাংশ এইরূপ পরহিতের জন্যই কাটাইয়া দেন। তিনি গৃহস্থই হউন আর সন্ন্যাসীই হউন,—আমাদিগের এবং সকলকারই প্রণম্য ও প্রাতঃস্মরণীয়।

বলিতে পারি না উদ্বোধনের এরূপ পবিত্র জীবন কি না, বলিতে পারি না উদ্বোধনের জীবন এইরূপ উৎসর্গীকৃত হইয়াছে কি না। যদিও সঙ্কল্পে হইয়া থাকে, জানি না কার্য্যে কতদূর যাইয়া পর্য্যবশেষ হইবে। কালের বিচিত্র গতি; সৎও অসৎ হইয়া পড়ে, অসৎও সৎ হইয়া উঠে। সকলই ঈশ্বরের হাত, তিনি যদি সৎ রাখেন, তবেই থাকিবে। তাঁর ইচ্ছা কে জানিতে পারে?

কে বলে জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষে কর্ম্ম সম্ভবে না? জনকাদি ঋষি কি কর্ম্ম দ্বারা পুনরায় বন্ধনে পতিত হইয়াছিলেন? মুক্তের আবার বন্ধন কি? সন্তরণ একবার শিক্ষা করিলে আর কি কভু বিস্মৃত হয়?—ভবনদী সন্তরণ সম্বন্ধেও সেইরূপ। মথিত তক্রোত্থিত নবনীর, তক্রের সহিত পুনর্ম্মিশ্রীভাব যেমন অসম্ভব, দৃষ্টদোষসংসারবিমুক্ত পুরুষেরও পক্ষে কর্ম্মলিপ্ততা তদ্রূপ। ভর্জ্জিতবীজ যেমন বৃক্ষোৎপাদন-শক্তিবিহীন, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কর্ম্মও সেইরূপ বন্ধন-হেতু-শূন্য। তাঁহাদিগের কর্ম্ম কেবল পরেরই হিতের নিমিত্ত, স্বার্থ তাহাতে কিছুমাত্র থাকে না।—"পরোপকারায় সতাং জীবনং"।

সিদ্ধপুরুষেও কর্ম্ম সম্ভব।

কে বলে কর্ম্ম—'ত্যাগের' কারণ হইতে পারে না? কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে কর্ম্ম-ত্যাগের চেষ্টা বিফল। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মক্ষয় হয়; "পায়ে কাঁটা ফুটিলে আর একটি কাঁটা দ্বারা সেইটী তুলিতে হয়।" শ্রীভগবান বলিয়া গিয়াছেন

কর্ম্মের ভিতরে থাকিলেও যে, ত্যাগ হয় না, ইহা ভুল ধারণা।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে"।

কর্ম্ম রজোগুণের লক্ষণ; সত্ত্বের প্রভাবে ত্যাগেচ্ছার উদ্ভব; তমোগুণের প্রাদুর্ভাবে সত্ত্ব ও রজঃ প্রসুপ্ত থাকে, অজ্ঞানে জীব অভিভূত হইয়া পড়ে। সেই তমোনাশের বিধিমতে চেষ্টা করা সকলকারই কর্ত্তব্য—বিশেষ ভারতবর্ষে। ভারতবাসী আজ আলস্যপ্রধান—সে ওজস্বিতা আর তাঁহার নাই !!

ছিল বটে এককালে—কর্ম্ম-মাত্রই দূষণীয়, কর্ম্মের আত্যন্তিক ত্যাগ না হইলে মুক্তি-লাভের উপায় ছিল না।—অতীব কঠিন ও দুঃসাধ্য বটে; তখন কিন্তু, ইহাই প্রচলিত মত ছিল। আধুনিক মলিন ভারতবাসীর হৃদয়-কূপোদকে পড়িয়া সেই মত আজ কি বিকৃত রূপই ধারণ করিয়াছে!—তমোগুণকেই সত্ত্ব বলিয়া ভ্রম হইতেছে। "নৈষ্কর্ম্ম্য" বা সন্ন্যাসের ধর্ম্ম জ্ঞানে, কর্ম্মাক্ষমতা বা স্বাভাবিক আলস্যকেই, গ্রহণ করিতে আজকাল অনেককে দেখা যায়। বালক ও বৃদ্ধ, ক্ষিপ্ত ও ঈশ্বরোন্মত্ত, বোকা (Idiot) অথবা মিন্মিন (Aphasia) রোগী এবং পরমহংস, স্বরগ্রামে উদারা ও তারা ষড়্‌জ,—প্রভৃতি বিপরীত প্রান্তসকল, একের সহিত অপরের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও কি প্রকৃতপক্ষে এক? ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির জন্মভূমি ভারতেই আজ এই ভ্রম! যে ভারতবাসীর প্রতিধমনীতে কর্ম্মস্রোত বায়ুর ন্যায় বহিয়াছিল; এককালে প্রতিগৃহে যে ভারত-বাসীর হৃদয়াভ্যন্তরে দেশহিতৈষণা দাবাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল;—

সাধকের পক্ষেও কর্ম্ম বিঘ্নকর সকল স্থলে নহে।

—কে বলে কর্ম্ম করা, সাধক বা যোগারূঢ় ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে?—যে ভারতবাসীর পরমারাধ্য ঋষি-তপস্বিগণ পর্য্যন্তও, কতই ঈপ্সিত তপোভূমি-হিমালয় হইতে, মানবের এই কর্ম্মভূমি আর্য্যাবর্ত্তে উত্তরণপূর্ব্বক, রাজ্যশাসনাবধি কৃষি-গোরক্ষা পর্য্যন্ত—যাবতীয় কার্য্যবিভাগে পরম সহায়তা সম্পাদন করিতেন; অহো, যে ভারতে এককালে একটী সামান্য পরহিতের জন্যই ক্ষুদ্র শিশু পর্য্যন্তও এত ভীষণভাবে অবলীলাক্রমে প্রাণ দান করিয়াছিল; আজ কিনা সেই ভারতবাসীর সন্তান, ভারতের বক্ষে বসিয়া, পরহিতের কথা চুলায় যাক—নিজ বিদ্যাভ্যাস অবধি পিতৃ-মাতৃসেবা পর্য্যন্ত (ভূমিকম্প কি?—ভারত বিদীর্ণ হইয়া যে, এখনও হৃদয়াগ্নি উদ্গার করেন নাই, এই যথেষ্ট) যাবতীয় অবশ্য কর্ত্তব্য, বৈরাগ্য বা অনাবশ্যকতা-ভানে ঔদাস্য প্রকাশ করিতেছেন। ইহা কি তমোগুণের লক্ষণ নহে, সত্ত্বগুণের অপব্যবহার নহে?

পুনঃসংস্কার।

কালের বিচিত্র গতিতে, এইরূপ, সকল বিষয়েরই ক্রমশঃ অসৎ ব্যবহার ও অপব্যবহার হইয়া পড়ে। যখনই এইরূপ অবস্থা শেষ সীমায় পরিণত হয়,—তখনই পুনঃসংস্কারের একান্ত আবশ্যক। ভারতে এই পুনঃসংস্কারের সময় উপস্থিত; আলস্যাবশে থাকা আর ভারতসন্তানের শোভা পায় না। ভারতের সর্ব্বত্র সকল বিভাগে কিছু কিছু সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে; বীরগণ সর্ব্বত্রই প্রায় নিদ্রোত্থিত হইয়া বদ্ধপরিকরে দণ্ডায়মান। কেবল ভারতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতে আজ পুনঃসংস্কারের তরঙ্গ উত্থিত,—বঙ্গেরও সকলে বদ্ধমুষ্টি না থাকিয়া, তমস্ত্যাগ করতঃ মুক্ত হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে নিজ নিজ হিতার্থে সাহায্য করুন।—"পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ"।

তমোগুণের নাশ রজোগুণের দ্বারা সাধিত হয়, সত্ত্বের দ্বারা অসম্ভব; রজঃ কর্ম্মাত্মক,

সত্ত্ব প্রকাশাত্মক। কর্ম্মের দ্বারা হৃদয়ের গ্রন্থিসকল শিথিল হইলে, সত্ত্বগুণ সত্যের বিকাশ করিয়া দেয়। দেশের মঙ্গল যদি কেহ চাহেন, কর্ম্মঠ হউন ; বিশেষ – বঙ্গবাসিগণের পক্ষে কর্ম্মণ্য হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে ; এই ঘোর কর্ম্মযুগে কর্ম্মব্যতীত গত্যন্তর নাই। যাবতীয় কর্ম্মমধ্যে, পরহিতকর্ম্মই গরিষ্ঠ ও অতি মহৎ। পরের মঙ্গল করিয়া—দেশের মঙ্গল কর্ম্ম করিয়া নিজ ভারতবাসিত্বের সার্থকতা করুন। নিজের জীবনকে ধন্য করুন। কর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে অন্তঃপ্রবেশ করিয়া দেখুন, বুঝিবেন - পরের মঙ্গলেই নিজের মঙ্গল, দেশের মঙ্গলই নিজের মঙ্গল ; পরহিতসাধনেই—দেশের হিতসাধনেই—নিজের হিতসাধন। অর্জ্জুনকে দেশের সাধারণ হিতকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য, শ্রীভগবান বলিতেছেন—"দেবান্ ভাবয়তানেন, তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।"

কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য।

পরের মঙ্গলই নিজের মঙ্গল।

একটী বাউল গানে আছে -"যারা পরে এলো আগে গেল, আমি রইলুম পড়ে।" আর্য্যজাতি প্রথমে ভারতেই প্রবেশ করেন বলিয়া প্রবাদ ; পরে, (আর এক শাখা) পশ্চিমাঞ্চলে গমন করেন। সেই পশ্চাদ্‌যাত্রী পাশ্চাত্যবাসিগণই আজ জগতের কতই হিতসাধন করিয়াছেন ; কেবল কর্ম্মশীল বলিয়াই, তাঁহারা আজ এতদূর উন্নতি সকল বিভাগেই করিতে সক্ষম। পাশ্চাত্য প্রদেশে কর্ম্মমাত্রই অতি পবিত্র বলিয়া আদৃত। সেই পাশ্চাত্য কর্ম্মশীলতা, পবিত্র ভাবে, বঙ্গবাসীর অন্তরে আবির্ভূত করিয়া দেওয়াই উদ্বোধনের উদ্দেশ্য ; প্রতিদানে—যাহাতে পাশ্চাত্য দেশসমূহে আমাদের এই ভারতীয় প্রাচ্য পারমার্থিকতা প্রবেশ করে, তাহাও উদ্বোধনের লক্ষ্য। কতদূর কৃতকার্য্য হইবে বলা দুষ্কর ;—জীবন পর্য্যন্ত ন্যস্ত করিয়া, যদি তৃণোত্তোলনসম যৎসামান্য কার্য্যেও সফল হয়, কৃতার্থ ও পরম সৌভাগ্য মনে করিবে।

পাশ্চাত্য কর্ম্মশীলতা বাঙ্গালীর বিশেষ অনুকরণীয়।

অতি মহৎ উদ্দেশ্য সহকারে উদ্বোধন জন-সমাজে শুভযাত্রা করিয়াছেন ; কামনা—পরহিত ; —না, 'পর'—নহে ; স্বজাতির, স্বদেশের,—নিজের অভিন্ন বন্ধুবর্গের হিতকামনা। সমভিব্যাহারে সম্বল—একমাত্র নিঃস্বার্থতা ; বিশ্বাস—সেই সম্বলেই কৃতকার্য্য হইবে, স্বদেশের প্রভূত উপকার করিবে। সৎকার্য্যে নানা বিঘ্ন, বিপদ প্রতিপদে,—কেবল সহায়—পরমবন্ধু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। ভরসা—উদ্যম। প্রসাদ—জগদীশ্বরের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদ। তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

উপসংহার।

(শ্রাবণ, ১৩৮৪, পৃঃ ৩৮৯)

"নাচুক তাহাতে শ্যামা"

(শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত।)

ফুল্ল ফুল, সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল গুঞ্জরিছে আশে পাশে।
শুভ্র শশী, যেন হাসিরাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাবাসে॥
মৃদুমন্দ মলয়পবন, যার পরশন, স্মৃতিপট দেয় খুলে।
নদী, নদ, সরসী হিল্লোল, ভ্রমর চঞ্চল, কতবা কমল দোলে॥
ফেনময়ী, ঝরে নির্ঝরিণী, তানতরঙ্গিণী, গুহা দেয় প্রতিধ্বনি।
স্বরময়, পতত্রিনিচয়, লুকায়ে পাতায়, শুনায় সোহাগবাণী॥
চিত্রকর, তরুণ ভাস্কর, স্বর্ণ তুলিকর, ছোঁয় মাত্র ধরাপটে।
বর্ণখেলা ধরাতল ছায়, রাগ পরিচয়, ভাবরাশি জেগে ওঠে॥

মেঘমন্দ্র কুলিশনিস্বন, মহারণ, ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপী।
অন্ধকার উগরে আঁধার, হুহুঙ্কার শ্বসিছে প্রলয়বায়ু॥
ঝলকি ঝলকি তাহে ভায়, রক্তকায়, করাল বিজলি জ্বালা।
ফেনময়, গর্জ্জি মহাকায়, উর্ম্মি ধায়, লঙ্ঘিতে পর্ব্বতচূড়া॥
ঘোষে ভীম গম্ভীর ভূতল, টলমল, রসাতল যায় ধরা।
পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে॥

শোভাময়, মন্দির আলয়, হ্রদে নীলপয়, তাহে কুবলয় শ্রেণী।
দ্রাক্ষাফল হৃদয় রুধির, ফেনশুভ্রশির, বলে মৃদু মৃদু বাণী॥
শ্রুতিপথে বীণার ঝঙ্কার, বাসনা বিস্তার, রাগ, তাল, মান লয়ে।
কতমত ব্রজের উচ্ছ্বাস, গোপী তপ্তশ্বাস, অশ্রুরাশি পড়ে বয়ে॥
বিম্বফল যুবতী অধর, ভাবের সাগর নীলোৎপল দুটি আঁখি।
দুটি কর, বাঞ্ছা অগ্রসর, প্রেমের পিঞ্জর, তাহে বাঁধা প্রাণপাখী॥

ডাকে ভেরী, বাজে ঝর্‌র ঝর্‌র দামামা নকাড়্, বীর দাপে কাঁপে ধরা।
ঘোষে তোপ বব-বব-বম্, বব-বব-বম্, বন্দুকের কড়কড়া॥
ধূমে ধূম ভীম রণস্থল, গরজি অনল, বমে শত জ্বালামুখী।
ফাটে গোলা লাগে বুকে গায়, কোথা উড়ে যায়, আসোয়ার ঘোড়া হাতী॥
পৃথ্বীতল কাঁপে থর থর, লক্ষ অশ্ববর পৃষ্ঠে বীর ঝাঁকে রণে।
ভেদি ধূম গোলা বরিষণ, গুলি স্বন্ স্বন্, শত্রুতোপ আনে ছিনে॥
আগে যায়, বীর্য্যপরিচয়, পতাকা নিচয়, দণ্ডে ঝরে রক্তধারা।
সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক দল, বন্দুক প্রবল, বীরমদে মাতোয়ারা॥
ঐ পড়ে বীর ধ্বজাধারী, অন্য বীর তারি ধ্বজা লয়ে আগে চলে।
তলে তার ঢের হয়ে যায় মৃতবীর কায়, তবু পিছে নাহি টলে॥

(৭৯তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৯০

দেহ চায় সুখের সঙ্গম, চিত্তবিহঙ্গম সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল, প্রাণ সদা লোল, যাইতে দুখের পার॥
ছাড়ি হিম শশাঙ্কচ্ছটায়, কেবা বল চায়, মধ্যাহ্নতপনজ্বালা।
প্রাণ যার চণ্ড দিবাকর, স্নিগ্ধ শশধর, সেও তবু লাগে ভালো॥
সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর, দুখে যার ভালবাসা।
সুখে দুখ, অমৃতে গরল, কণ্ঠে হলাহল, তবু নাহি ছাড়ে আশা॥
রুদ্রমুখে সবাই ডরায়, কেহ নাহি চায়, মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার, রুধির উদ্গার, ভীম তরবার খসাইয়ে দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি, মৃত্যুরূপা কালী, সুখ-বনমালী তোমার মায়ার ছায়া।
করালিনি, কর মর্ম্মচ্ছেদ, হোক মায়াভেদ, সুখস্বপ্ন দেহে দয়া॥

মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী।
প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিকবাস, বলে মা দানব-জয়ী॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়, আসিলে সময়, কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ, মহামারী, বিষকুম্ভ ভরি, বিতরিছ জনে জনে॥
রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও, ফিরে নাহি চাও, পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুখ চাও, সুখ হবে বলে, ভক্তি, পূজাছলে, স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা॥
ছাগকণ্ঠ রুধিরের ধার, ভয়ের সঞ্চার, দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ! দয়ার আধার! ধন্য ব্যবহার! মর্ম্মকথা বলি কাকে?
ভাঙ্গ বীণা, প্রেমসুধাপান, মহা আকর্ষণ, দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধু রোলে গান, অশ্রুজলপান, প্রাণপণ যাক্ কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখ-ভার, এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার, প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর, সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক্, স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা॥

রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ।

(জনৈক সন্ন্যাসী প্রেরিত।)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (বেলুড়, হাওড়া) হইতে শ্রীমৎ স্বামী কল্যাণানন্দকে নভেম্বর মাসে দুর্ভিক্ষপীড়িত রাজপুতানা ও আহম্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানসকল দেখিতে পাঠান হয়। ইনি ঐ সকল স্থান ভ্রমণ করিয়া বিগত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে রাজপুতানার অন্তর্গত কৃষ্ণগড়ে একটী অনাথালয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে জাতি বা ধর্ম্মের বিচার না করিয়া অসহায় ও

(শ্রাবণ ১৩৮৪, পৃঃ ৩৯১)

অনাহারে ক্লিষ্ট বালক বালিকা মাত্রকেই লওয়া হয় ও পিতামাতা অথবা অপর কোন আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া যাইতে চাহিলে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

কৃষ্ণগড়—দেশীয় রাজা দ্বারা শাসিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানে অনাথালয় স্থাপনের প্রধান কারণ এই যে, এখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা স্বামী কল্যাণানন্দের এই কল্যাণ-চেষ্টার বিরোধী নহেন। বোধ হয় রাজপুতানায় কোন রাজ্য অপেক্ষা কৃষ্ণগড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের দুঃখমোচনের বন্দোবস্ত কম করা হয় নাই। তবে এখানকার কর্ত্তৃপক্ষেরা এতটুকু বুঝেন যে, দুর্ভিক্ষের আয়তন যেরূপ তাহাতে অতি ক্ষুদ্র সাহায্যচেষ্টাও অনাদরণীয় নহে।

দুর্ভিক্ষের প্রথম ছবি জয়পুরে দেখিলাম। রাজদরবার হইতে ক্লিষ্টদিগের সাহায্যার্থ প্রবন্ধগুলি দেখিলে মনে হয়, জয়পুরে কোন প্রাণীর কষ্ট হওয়া অসম্ভব। তাহার উপর, কি রাজকর্ম্মচারিগণ, কি প্রজাগণ, সকলেই দুর্ভিক্ষপীড়িতগণের দুঃখমোচনে যথাসাধ্য যত্নবান; তথাপি দুই তিন দিন ভ্রমণ করিয়া সমস্ত সহরে ও সহরের বাহিরে প্রায় এক হাজার অসহায় স্ত্রী ও পুরুষ দেখিলাম। ইহাদের মধ্যে অনেকেই দূরদেশ হইতে আগত। প্রায় সকলেই অস্থি-চর্ম্মসার ও অন্নবস্ত্রাভাবের শেষ দশায় উপস্থিত। এই শীতে, রাত্রে অনাবৃত স্থানে ধূলার উপর পড়িয়া থাকে। পথে একটী শস্য বা কোন খাবার জিনিষের টুকরা পড়িলে, চতুর্দ্দিকে কিছুদূর পর্য্যন্ত ধূলারাশির সহিত সেইটি উঠাইয়া লয়। আমাদের অনাথালয় করিবার সঙ্কল্প আছে, কোন সূত্রে সংবাদ পাইয়া কয়দিন যাবৎ কয়েকটী পিতামাতা আপনাদিগের সন্তানগুলি আমাদিগকে দিবার জন্য আসিয়াছিল। আরও কয়েকটী পিতামাতা অপর লোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিল, কিছু মূল্য পাইলে এক একটী শিশু রাখিয়া অপরগুলি আমাদিগকে দিতে পারে।

রাজপুতানার সর্ব্বত্রই রাজাপ্রজা মিলিয়া সাধ্যমত ক্লিষ্টদিগের ক্লেশ দূরীকরণের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক ভাবে উপরোক্ত দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাকে লোকে দয়াময় বলে, তিনি যদি থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার শক্তি মনুষ্যশক্তি অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক কি না, কাযে কাযেই মনুষ্য এত চেষ্টা করিয়াও অতি সামান্য মাত্র ক্লেশ দূর করিতে পারিতেছে।

কত শত নরনারী নিজ নিজ শিশু সন্তানসহ গৃহ ছাড়িয়া দূরদেশে চলিয়া যাইতেছে। অনেকে পথেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে, অন্যে মুমূর্ষু অবস্থায় দেশান্তরে উপস্থিত হইয়া নিরাশ্রয়ে অনাহারে এবং শীতে ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে। যাহারা জীবিত আছে বুঝিতে হইবে তাহাদের ভোগ এখনও দয়াময় শেষ করেন নাই, তাহাদের প্রতি আরও দয়া করিবেন।

এ অঞ্চলে কষ্টের কথা লিখিয়া শেষ করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে আমাদের আপনা আপনির মধ্যে দেখা কয়েকটী আদর্শ চিত্র আছে, সেইগুলি লিখিয়া ক্ষান্ত হইব।

একটি বৃদ্ধ, একটি যুবা ও একটি বালক আসিয়া বলিল, অনেক দিন খাওয়া হয় নাই। যাঁহাকে বলিল তিনি তখনি তাহাদের তিনজনকে জল মিশ্রিত করিয়া একটু একটু ব্রাণ্ডি খাওয়াইলেন ও অল্পক্ষণ পরেই গরম গরম বার্লির পায়স খাইতে দিলেন। তিনজনে পাত্রটী পর্য্যন্ত চাটিয়া খাইয়া সেইখানেই শুইল—আর উঠিল না।

একটি স্ত্রীলোক—পতি ও কয়েকটী সন্তানসহ—কোন পল্লীর নিকট আসিয়া বসিল ও

(৭৯তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৯২)

কোলে
বিস্কুট
জ্যাম জেলী আচার
ORANGE SQUASH
বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৭০০ ০১০.
K B—3/74/B.

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—১৪৲ টাকা : পুরা সেট ১৩৫৲ টাকা
বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১০৲ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র

দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত

তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্ম-সমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে

পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গে

ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী

সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)

অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ

নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন

দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ—	পৃঃ ১৪১,	মূল্য ৪'০০
ভক্তিযোগ—	পৃঃ ৯৬,	মূল্য ২'৮০
ভক্তি-রহস্য—	পৃঃ ১৪৮,	মূল্য ১'৭৫
জ্ঞানযোগ	পৃঃ ২৯০,	মূল্য ৮'৫০
রাজযোগ—	পৃঃ ২১৪,	মূল্য ৫'৬০
সন্ন্যাসীর গীতি—	পৃঃ ২৩,	মূল্য ০'৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—	পৃঃ ২৭,	মূল্য ০'৮০
সরল রাজযোগ—	পৃঃ ৩৬,	মূল্য ০'৫০
পত্রাবলী—২য় ভাগ ;	পৃঃ ৫১৬	মূল্য ৫'৫০
ভারতীয় নারী—	পৃঃ ৯৩,	মূল্য ২'৪০
পওহারী বাবা—	পৃঃ ১৮,	মূল্য ০'৫০
স্বামীজীর আহ্বান—	পৃঃ ৮০,	মূল্য ০'৮০
ধর্ম-সমীক্ষা—	পৃঃ ১৩০,	মূল্য ২'৫০
বেদান্তের আলোকে	পৃঃ ৮১,	মূল্য ১'৫০
ধর্মবিজ্ঞান—	পৃঃ ১০২,	মূল্য ২'০০
ভারতে বিবেকানন্দ—	পৃঃ ৪২৪,	মূল্য ১০'০০
দেববাণী—	পৃঃ ১৫৬,	মূল্য ২'৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ—	পৃঃ ২৬৮,	মূল্য ৪'০০
কথোপকথন—	পৃঃ ১৩৫,	মূল্য ১'২৫
মদীয় আচার্যদেব—	পৃঃ ৬২,	মূল্য ০'৭৫
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—	পৃঃ ১৪৩,	মূল্য ২'০০
চিকাগো বক্তৃতা—	পৃঃ ৫২,	মূল্য ১'৫০
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ—	পৃঃ ১৩৪,	মূল্য ৬'০০
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত—	(ছাপা নাই)	

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

পরিব্রাজক—	পৃঃ ১৩২,	মূল্য ৩'০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—	পৃঃ ১৩৬,	মূল্য ২'২৫
বর্তমান ভারত—	পৃঃ ৪০,	মূল্য ১'৬০
ভাববার কথা—	পৃঃ ৯২,	মূল্য ১'২০
বাণী-সঞ্চয়ন—	পৃঃ ৩১৬,	মূল্য ৭'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১৯'০০। ২য় ভাগ ১৭'০০
সাধারণ ১ম খণ্ড ৩'৫০ ; ২য় খণ্ড ৭'৮০ ; ৩য় খণ্ড ৫'২০ ; ৪র্থ খণ্ড ৭'০০ ; ৫ম খণ্ড ৭'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১'৬০ ; কাপড়ে বাঁধাই ১'৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। (ছাপা নাই)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬ ; সাধারণ ৬'০০
বাঁধাই ৭'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। মূল্য ৫'০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২২৯, মূল্য ৪'০০

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। (ছাপা নাই)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ০'৭০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে সংগৃহীত। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭'০০, ২য় ভাগ ৬'৫০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬। মূল্য ৬'০০ টাকা

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য—১৫'০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ৮'০০
(প্রথম খণ্ড—ছাপা নেই)

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪'২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ছেলেদের উপযোগী। পৃঃ ৬৪, মূল্য ০'৭০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(একত্রে) শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। (ছাপা নাই)

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩৬৯, মূল্য ৬'০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল ১'২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২'৫০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬. মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই); ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬; মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। (ছাপা নাই)

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৮০, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ প্রসঙ্গ— (ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে— স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৫২, মূল্য ৩'৩০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০, (ছাপা নাই)

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৭৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ—স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি—স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০ ; ৩য় অঃ ১৩'০০ ; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—(ছাপা নাই)

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮১, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ-চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃঃ ২৭৪, মূল্য ১০'০০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ২'০০ (ছাপা নাই)

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

COVER PRINTED BY:—

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্ট্রীগণের পক্ষে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৮৪

সূচীপত্র

সূচীপত্র

এন্টিফ্লেক্সটিন
কার্বোরল কিওর (রেজিঃ)
কার্বঙ্কল, শোথ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া বা
পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল
লাগাইলেই সারিয়া যায়
বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে রোগমুক্তি
সেলিং এজেন্ট—লিটন এণ্ড কোং কলিকাতা-১৩
IT CUTS
IT CLEANS
IT CURES

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY

বেনারসী
সিল্ক
সাড়ী
পোষাক
মৈলনাল মণিলাল
ষ্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট • কলি-১২
(বসুমতী ভবনের পাশে)
বড়বাজার
শ্যামবাজার
কাশ্মিরী
শাল
বিছানা
হোসিয়ারী

ভাল চা বলতে
টসের
চা
TOSH'S
AIR TIGHT
এ, টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা—১

দিব্য বাণী

সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ
পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।
ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে
হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৭।৩২

পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বচরাচর
আমিও তাহারি সঙ্গে হই পরাৎপর
অদ্বিতীয় বাসুদেব পরম ঈশ্বর—
(অখণ্ড সচ্চিদানন্দ নরকলেবর—
এই তো শরণাগতি জ্ঞানিগণ কহে
অপর প্রপত্তি যত এর তুল্য নহে।)
অবিচলা এই মতি হয় হৃদয়েতে
অবস্থিত যাঁহাদের অনন্তদেবেতে
দূরে যাও পরিহরি' তুমি তাঁহাদের
(নিজ দূত প্রতি এই নির্দেশ যমের)।

কথাপ্রসঙ্গে

পার্থসারথির বাণী : 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য…'

গীতা ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামী তাঁহার গীতা-টীকার উপসংহারে লিখিয়াছেন : নিজ প্রগল্‌ভতাবলে ভগবদ্‌গীতাকে মথিত করিয়া উহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বকে অধিগত করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কি আচার্যকৃপারূপ পীযূষদৃষ্টি ব্যতীত স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে? নিজ অঙ্গুলি দ্বারা জল সরাইয়া রত্নাকরের গভীরে অবস্থিত মণিরাজি-লাভেচ্ছু ব্যক্তি কি উত্তম কর্ণধার ব্যতিরেকে আবর্তমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায় না?

কোন সন্দেহ নাই, গীতাব্যাখ্যাকার পূর্বাচার্যগণের কৃপা ব্যতীত আমরা গীতার গহন তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারি না। তাঁহাদের রচিত ভাষ্য ও টীকাই আমাদের প্রতি তাঁহাদের অনুত্তম অনুগ্রহ। গীতারহস্য অনুধাবন করিতে সেগুলি অবশ্যই আমাদের অপরিহার্য অবলম্বন। কিন্তু অসুবিধা এই যে, অনেক স্থলেই ব্যাখ্যাগুলি পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং নিজেদের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগেরও যথেষ্ট অবকাশ থাকে। টীকাকারগণও সকলেই নিজ নিজ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী উভয়েই গীতার টীকারম্ভে লিখিয়াছেন যে, আচার্য শংকরের ভাষ্য সযত্নে সম্যক্ আলোচনা করিয়াই তাঁহারা যথাসাধ্য গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। কিন্তু অনুপুঙ্খের ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, শংকরাচার্য বহু আড়ম্বরে যে-ব্যাখ্যার খণ্ডন করিতেছেন, শ্রীধরস্বামী সেই খণ্ডিত ব্যাখ্যাই সাগ্রহে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার গীতা-টীকার উপসংহারেও লিখিয়াছেন, 'ভগবৎপাদ শ্রীশংকর গীতার প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তথাপি মধুসূদন-মুনি কর্তৃক স্বীয় জ্ঞানের শুদ্ধিহেতু গীতারহস্য পুনরায় স্পষ্ট করিয়া ব্যাখাত হইল।' অন্যত্রও তিনি বিনয় করিয়া লিখিয়াছেন, 'একই নিক্তিতে সোনা ও কুঁচ ওজনের জন্য উঠিয়া থাকে, কিন্তু সেই কারণে দুই-ই কি তুল্য?' অর্থাৎ শংকরাচার্যের গীতা-ভাষ্য সুবর্ণস্থানীয় এবং মধুসূদনের গীতাটীকা গুঞ্জাফলস্থানীয়—উভয়ে কখনই তুল্যমূল্য হইতে পারে না। কিন্তু এত বিনয় সত্ত্বেও দশনামী সন্ন্যাসী মধুসূদন গীতার একাধিক শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আচার্য শংকরের ভাষ্যের অন্ধ অনুবর্তন করেন নাই। এইরূপ একটি শ্লোকের আলোচনা করা যাইতে পারে।

গীতার শেষ অধ্যায়ের ৬৬তম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন :

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ করো। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। শোক করিও না। এই শ্লোকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি এই শ্লোকটিতেই। ইহার পর শ্রীভগবান যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা গীতাশাস্ত্রের সম্প্রদান-বিধি অর্থাৎ কাহাকে গীতাশাস্ত্র বলা উচিত এবং কাহাকে বলা উচিত নহে, সেই বিষয়ক নির্দেশ। সুতরাং স্বাভাবিক-

তাবেই আমাদের এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় যে, উক্ত শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য কি। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' (সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া)—এই অংশটুকুই শ্লোকটিকে দুর্বোধ্য করিয়াছে; উহা বাদ দিলে অবশিষ্ট অংশে জটিলতা কিছুই নাই। সুতরাং দেখিতে হইবে শংকরাচার্যপ্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'-এর কি অর্থ করিয়াছেন।

শংকরাচার্যের মতে এই শ্লোকটিতে সমস্ত বেদান্তের সার সম্যগ্‌দর্শন এবং তাহার সাধনরূপে সন্ন্যাসের কথা, নৈষ্কর্ম্যের কথা বলা হইয়াছে। এইজন্য তিনি বলেন ধর্ম বলিতে এখানে অধর্মও বুঝিতে হইবে এবং 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'-এর অর্থ হইল 'ধর্মাধর্মাত্মক সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া' অর্থাৎ 'সন্ন্যাসী হইয়া'। সন্ন্যাসী হইয়া কী করিতে হইবে? না, ঈশ্বরের শরণাগত হইতে হইবে। কিন্তু শংকরাচার্য এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রথমেই যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, কর্মযোগনিষ্ঠার পরমরহস্য ঈশ্বরে শরণাগতির কথার উপসংহার শ্রীভগবান অব্যবহিত পূর্ব শ্লোকেই (১৮।৬৫) করিয়াছেন, যেখানে তিনি অর্জুনকে বলিয়াছেন, 'তুমি আমাতে দত্তচিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, আমার ভজন করো, আমাকে নমস্কার করো; তুমি আমার প্রিয়, এইজন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।' সুতরাং প্রশ্ন উঠে অব্যবহিত পূর্ব শ্লোকে শরণাগতির কথার উপসংহারই যদি হইল, তাহা হইলে পুনরায় এই শ্লোকে স্পষ্ট 'শরণং ব্রজ' বলার অর্থ কী? ইহার উত্তরে শংকরাচার্যের বক্তব্য: হ্যাঁ, 'আমার ভজন করো', 'আমাকে নমস্কার করো' ইত্যাদি প্রচলিত অর্থে শরণাগতি নিশ্চয়ই, কিন্তু আসল শরণাগতি হইল সন্ন্যাসী হইয়া 'তিনিই আমি'—চিত্তের এই ব্রহ্মাকারা বৃত্তি অবলম্বন করা। এইজন্য আলোচ্য শ্লোকের 'মাম্ একং শরণং ব্রজ'—অংশটির তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন: 'সকলেরই আত্মা, অদ্বিতীয়, সর্বত্র সম, সর্বভূতস্থ, অচ্যুত, গর্ভজন্মজরা-বিবর্জিত ঈশ্বরকে "আমিই তিনি", এইভাবে আশ্রয় করো।' ইহাই যে আসল শরণাগতি, আসল ভক্তি, তাহা শংকরাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যের অন্যত্র একাধিকবার বলিয়াছেন। এইভাবে শরণাগত হইলে শ্রীভগবান অর্জুনকে 'সমস্ত পাপ হইতে' মুক্ত করিবেন। পাপ বলিতে এখানে পুণ্যকেও গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ শ্রীভগবান অর্জুনকে সমস্ত পাপ ও পুণ্যের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন; অতএব অর্জুন যেন শোক না করেন। ইহাই সংক্ষেপে শংকরাচার্যের ব্যাখ্যা।

মধুসূদন সরস্বতীর মতে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ ধর্মই—'ধর্ম' এবং 'অধর্ম' নহে; 'পাপ' শব্দের অর্থ পাপই—'পাপ' এবং 'পুণ্য' নহে। গীতার উপক্রমে যুদ্ধারম্ভে অর্জুন বন্ধুবধাদিনিমিত্ত পাপের কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং শোকপ্রকাশও করিয়াছিলেন। এইজন্য নানা উপদেশের অন্তে গীতার উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণ সেই কথাই স্মরণ করিয়া অর্জুনকে বলিতেছেন, 'তুমি আমার শারণাগত হও; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।' মধুসূদনের মতে 'মামেকং শরণং ব্রজ'—শুধু এই কথার দ্বারাই সর্বধর্মশরণতাত্যাগের কথা বলা হইয়া যায়। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন যে, বর্ণসমূহের যে-সকল বিশেষ ধর্ম আছে, আশ্রমসমূহের যে-সকল বিশেষ ধর্ম আছে এবং বর্ণাশ্রম-নিরপেক্ষ যে-সকল সামান্য ধর্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্মই

স্ব স্ব ফলদানে ঈশ্বরসাপেক্ষ বলিয়া তাহাদের ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ আশ্রয়ণীয়-বোধে সমাদর না করিয়া ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। ফলতঃ মধুসূদনের মতে ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—সকলেই নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম করিতে থাকিলেও সেই সেই কর্মের উপর নির্ভর না না করিয়া একমাত্র ঈশ্বরকেই শরণ্য বলিয়া অবলম্বন করিবেন, ইহাই আলোচ্য শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—সন্ন্যাসের কোনও নির্দেশ এখানে নাই। মধুসূদন আরও বলিয়াছেন যে, এই ঈশ্বর-শরণাগতির তিনটি স্তর আছে: (১) আমি তাঁহারই, (২) তিনি আমারই এবং (৩) তিনি ও আমি অভিন্ন। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি উচ্চতর এবং তৃতীয়টি সর্বোচ্চ স্তর। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন বলিয়াছেন যে, ভক্তিনিষ্ঠা হইতেছে কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠা—এই উভয় নিষ্ঠার সাধনস্বরূপ এবং উভয়েরই ফলস্বরূপ। এইজন্য গীতার শেষে এই ভক্তিনিষ্ঠাই শ্রীভগবানের চরম উপদেশ।

গীতার উপক্রম ও উপসংহার অনুযায়ী আলোচ্য শ্লোকটির মধুসূদন যে-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাতেও একাধিক ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যের সূচনায় শংকরাচার্য বলিয়াছেন যে, সমস্ত লোককে অনুগ্রহ করিবার জন্য অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়াই শ্রীভগবান গীতা উপদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ গীতার প্রত্যেকটি উপদেশ সর্বজনীন—শুধু অর্জুনেরই জন্য নহে। এইজন্যই শংকরাচার্য আমাদের আলোচ্য শ্লোকটিকে অর্জুন-নিরপেক্ষ ও যুদ্ধপরিবেশ-নিরপেক্ষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধুসূদন ইহা মানিতে প্রস্তুত নহেন, কারণ উহাতে উপক্রম ও উপসংহারের অসঙ্গতি হয়, অধিকন্তু ৬৪তম শ্লোকে শ্রীভগবান যখন অর্জুনকে স্পষ্ট বলিতেছেন, 'বক্ষ্যামি তে হিতম্'—তোমার যাহা হিতকর, তাহা বলিব, তখন আলোচ্য (৬৬তম) শ্লোকটিতে প্রদত্ত উপদেশও অর্জুনেরই জন্য, সকলের জন্য নহে। এই যুক্তি মানিয়া লইলেও বলা যাইতে পারে যে, মধুসূদন শংকরের যে ত্রুটি ধরিয়াছেন, সেই ত্রুটি হইতে তিনি নিজেও মুক্ত নহেন। ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—সকলেরই জন্য ঈশ্বর-শরণাগতি উপদেশ করা হইয়াছে, এইরূপ বলার অর্থ কী? অর্জুনেরই জন্য যখন উপদেশ, তখন অর্জুন-প্রসঙ্গেই ব্যাখ্যাটি সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয়। আরও কথা এই যে, কোন শ্লোক-বিশেষের ব্যাখ্যায় মতভেদ থাকিতে পারে—ইহা খুবই স্বাভাবিক এবং সর্বত্র পরিলক্ষিতও হয়। কিন্তু মূল সিদ্ধান্তে মতভেদ থাকিলে ব্যাপারটি গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। সেখানে অত্যধিক বিনয়েরও—যাহার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে—বিশেষ কোন গুরুত্ব থাকে না। মধুসূদনের সিদ্ধান্ত হইল ভক্তিনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠার ফল। শংকরের সিদ্ধান্ত হইল জ্ঞাননিষ্ঠা ও পরা ভক্তি একই জিনিস। সুতরাং মূল সিদ্ধান্তেই বিরোধ! মধুসূদনের সিদ্ধান্ত আমাদের রামানুজ নিম্বার্ক প্রমুখ আচার্যগণের সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তে কোনও অসঙ্গতি নাই, কারণ তাঁহাদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ বাস্তব—স্বীয় আত্মস্বরূপের জ্ঞানের পর জ্ঞানী ব্যক্তির পরমাত্মাতে ভক্তিনিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অদ্বৈতমতে উক্ত ভেদ ঔপাধিক। এবং জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ পরা ভক্তির পর্যবসান মোক্ষে। আর মুক্ত ব্যক্তি কর্মনিষ্ঠ ধ্যাননিষ্ঠ জ্ঞাননিষ্ঠ অথবা ভক্তিনিষ্ঠ হইবেন, সে-বিষয়ে কোনও বিধান দেওয়া যায় না। প্রারব্ধ অনুসারে তিনি প্রচণ্ড কর্ম করিতে পারেন, অধিকাংশ সময়ে

ধ্যানস্থ থাকিতে পারেন, বেদান্তবিচার করিতে পারেন অথবা ভক্তি-ভক্ত লইয়াও থাকিতে পারেন।

আরও লক্ষণীয় যে, মধুসূদন শরণাগতির যে অন্তিম স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের কথাই বলা হইয়াছে। শংকরের মতে ঐরূপ শরণাগতি সন্ন্যাসীদেরই হইতে পারে, অন্যদের নহে। সুতরাং মধুসূদন যদি গৃহী অর্জুনের জন্য উক্ত শরণাগতি বিহিত হইয়াছে বলেন, তাহা হইলে শংকরের সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হয়।

'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার মধুসূদন সরস্বতী আচার্য শংকরের সিদ্ধান্তের বিরোধী কথা বলিয়াছেন, এইরূপ মন্তব্য করা ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইতে পারে। এইজন্য বিষয়টির শেষ বিচারের ভার সুধীগণের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিরস্ত হওয়াই নিরাপদ পন্থা মনে করি

শ্রীধরস্বামী আলোচ্য শ্লোকটির ব্যাখ্যায় কোনও জটিলতার অবতারণা করেন নাই। তাঁহার মতে 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য'-এর অর্থ হইল 'বিধিকৈঙ্কর্য ত্যাগ করিয়া'। পাপের প্রসঙ্গটি তিনি মধুসূদনের ন্যায় গীতার উপক্রমে অর্জুনের—'এই সকল আততায়িগণকে বধ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে'—এই উক্তির সহিত সংযুক্ত করেন নাই। অনুরূপভাবে শোকের প্রসঙ্গও অর্জুনের 'বিষাদ-যোগে'র সহিত সংযুক্ত করেন নাই। তাঁহার ব্যাখ্যাটি অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত। তিনি লিখিয়াছেন: আমাতে ভক্তির দ্বারাই সব হইবে—এই দৃঢ় বিশ্বাসসহায়ে বিধিকৈঙ্কর্য ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও। এইভাবে থাকিলে বিহিত কর্মত্যাগহেতু পাপ হইতে আশঙ্কা করিয়া শোক করিও না, যেহেতু একমাত্র আমারই শরণাপন্ন তোমাকে আমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব।

'বিধিকৈঙ্কর্য' শব্দটি শুদ্ধা ভক্তির প্রসঙ্গে অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া শ্রীধরস্বামী উহার ব্যাখ্যা করেন নাই। ভাগবতে আছে:

> দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
> ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
> সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
> গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্॥
> (১১।৫।৪১)

যোগীন্দ্র করভাজন নিমিরাজকে বলিতেছেন, 'হে রাজন্, যিনি 'কর্ত' অর্থাৎ বিধিপ্রাপ্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া সকলের শরণ্য শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণভাবে আশ্রয় করেন, তিনি দেবগণ ঋষিগণ প্রাণিগণ পোষ্যবর্গ অন্যান্য মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট আর ঋণী থাকেন না, তাঁহাদের দাসও হন না। পরবর্তী শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে, এইরূপ শরণাগত ভক্তের নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তথাপি যদিই বা কোনও প্রকারে তাঁহার কোনও পাতক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে হৃদিস্থিত পরমেশ্বর শ্রীহরিই তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা বিধিকৈঙ্কর্য-ত্যাগের সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই। রাজা প্রতাপরুদ্র সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে প্রশ্ন করিতেছেন, 'উপবাস ক্ষৌরকর্মাদি—তীর্থবিধি, সেই বিধি পালন না করিয়া ভক্তগণ কেন অন্নপানাদি গ্রহণ করিবেন?' ভট্টাচার্য উত্তর দিতেছেন, 'আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা বিধিধর্ম। রাগমার্গে সূক্ষ্ম ধর্মকর্ম আছে। ক্ষৌরকর্ম-উপবাসাদি ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা, মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ-ভক্ষণ।...

> পূর্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।
> প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥

যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয় ছাড়ে সেই লোকবেদধর্ম॥'
(মধ্যলীলা, ১১শ পরিঃ)

এখন প্রশ্ন হইতেছে, উপক্রম-নিরপেক্ষভাবে উপসংহারের ব্যাখ্যা সমীচীন কিনা। মনে হয়—না। কারণ, উপসংহার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, উপক্রমের সহিত তাহার সঙ্গতি ও সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। এবং এই দিক হইতে মধুসূদনের ব্যাখ্যা ত্রুটিহীন, কিন্তু শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা নহে। আরও প্রশ্ন: অর্জুন কি বিধিকৈঙ্কর্য-ত্যাগের অধিকারী? অর্জুন অবতীর্ণ ভগবানের সখা, তিনি আধিকারিক পুরুষ। কিন্তু সে-দিক হইতে ব্যাখ্যাকারগণ নিতান্ত সঙ্গতভাবেই তাঁহার বিচার করেন নাই, কারণ নরলীলায় সব নরেরই ন্যায় হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়বীর অর্জুন শোকমোহগ্রস্ত, সাধারণ মানুষেরই মতো। এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেইভাবেই উপদেশ দিতেছেন। যুদ্ধেরই যেখানে বিধি-নির্দেশ, সেখানে বিধিকৈঙ্কর্য-ত্যাগের কথা সমীচীন মনে হয় না।

মধ্বাচার্য এই যুদ্ধবিধির কথা তাঁহার ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং প্রায়ই মৌন। শ্লোকের পর শ্লোক চলিয়া যায়—মধ্বাচার্য সম্পূর্ণ নীরব। কোনও ব্যাখ্যা নাই। এই নীরবতা আমাদের মনে কৌতুক ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যাহাই হউক, আলোচ্য শ্লোকটির সম্পূর্ণ মধ্বভাষ্য নিম্নরূপ:

'ধর্মত্যাগঃ—ফলত্যাগঃ। কথম্ অন্যথা যুদ্ধ-বিধিঃ? "যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভি-ধীয়তে" ইতি চ উক্তম্।'—ধর্মত্যাগের অর্থ ফলত্যাগ। অন্যথা যুদ্ধবিধি হয় কিরূপে? শ্রীভগবানও বলিয়াছেন, যিনি কর্মফলত্যাগী, তিনি ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন।

মধ্বভাষ্যের টীকাকার জয়তীর্থ বলিয়াছেন, যাঁহারা 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' বলিতে বর্ণাশ্রম-বিহিত সমস্ত ধর্মের পরিত্যাগের কথা বলেন, মধ্বাচার্য তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন, সর্বধর্মত্যাগের অর্থ সর্বকর্মফলের ত্যাগ। 'ধর্ম' শব্দটি এখানে ধর্মকার্যের 'ফল'-এর উপলক্ষণ

আচার্য রামানুজ আলোচ্য শ্লোকটির দুইটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। প্রথম ব্যাখ্যাটির সহিত মধ্বাচার্যের ব্যাখ্যার কিছু অংশে সাদৃশ্য আছে। রামানুজ বলিয়াছেন সমস্ত কর্মের ফল, কর্ম-বিষয়ক মমতা ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগই শাস্ত্রীয় ত্যাগ। তবে কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই ত্রিবিধ যোগকেই তিনি 'সর্বধর্ম' বলিয়াছেন। এই যোগত্রয় যে পরিত্যাগ করিতে হইবে, বলা বাহুল্য, তাহা নহে; যথাধিকার এইগুলি অত্যন্ত প্রীতির সহিতই করিতে হইবে; ত্যাগ করিতে হইবে শুধু উহাদের ফলাকাঙ্ক্ষা, উহাদের প্রতি মমতা এবং কর্তৃত্ববুদ্ধি। পাপের প্রসঙ্গেও তিনি উপক্রম-নিরপেক্ষভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তিবিরোধী অনাদিকালসঞ্চিত পাপসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে বলিয়াছেন, নিষ্পাপ হইলে ভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়, কিন্তু ভক্তি-যোগের আরম্ভের প্রতিবন্ধকরূপ পাপ অনন্ত। এই অনন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্তও অপরিমিত কাল ধরিয়া করা আবশ্যক—এই সকল কথা ভাবিয়া নিজেকে ভক্তিযোগের অনুপযুক্ত মনে করিয়া অর্জুন শোকার্ত হইলে তাঁহার শোক দূর করিবার জন্য শ্রীভগবান বলিতেছেন, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি অসংখ্য প্রায়শ্চিত্তরূপ 'সর্বধর্ম'কে পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগের আরম্ভের সিদ্ধির জন্য শ্রীভগবানেরই শরণ লইতে হইবে। তিনিই উল্লিখিত সমস্ত পাপ হইতে বিনির্মুক্ত করিবেন, অতএব অর্জুন যেন শোক না করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, রামানুজও উপক্রম ও উপসংহারের সঙ্গতি রাখেন নাই। অধিকন্তু অর্জুন যে বাস্তবিক দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে বর্ণিত প্রকারে শোকার্ত হইয়াছিলেন, তাহারও সমর্থনে রামানুজ কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত আচার্য কেশব কাশ্মীরী উপক্রম ও উপসংহারের সঙ্গতি রাখিয়া শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা সুদীর্ঘ হইলেও অতীব হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু সেখানেও ত্রুটি এই যে, বলা হইয়াছে 'সর্বধর্ম' অর্থাৎ দান তপস্যা স্বাধ্যায় অগ্নিহোত্র পঞ্চ মহাযজ্ঞ ইত্যাদি কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, প্রেমের প্রাবল্যে গঙ্গাপ্রবাহবৎ অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মরণের উহারা অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপ কর্মত্যাগের সপক্ষে কেশব কাশ্মীরী মহাভারত ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বহু শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়াছেন। কিন্তু অর্জুনের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা কতদূর প্রাসঙ্গিক তাহা বিচার্য। যিনি শুদ্ধা ভক্তির দিকে এতটা অগ্রসর, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করা কি সম্ভব?

সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে মধ্বাচার্যের ব্যাখ্যাই নির্দোষ মনে হয়। হইতে পারে অধিক না লেখাতেই তাঁহার ভাষ্য উতরাইয়া গিয়াছে।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : অস্তি হি বৃহদারণ্যকে পঞ্চমাধ্যায়ে[১] আখ্যায়িকা—জনকঃ হ বৈ বহুদক্ষিণং যজ্ঞম্ আরভত। তত্র চ নানাদেশেভ্যঃ ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্মবিদঃ যজ্ঞদিদৃক্ষয়া ধনাদি-লিপ্সয়া চ সমাগতাঃ অভিসঙ্গতাঃ বভূবুঃ। তত্র চ ব্রহ্মবিৎ-সঙ্ঘদর্শনেন জনকস্য জিজ্ঞাসা বভূব। স চ তেষাং ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্মিষ্ঠং পুরুষং জ্ঞাত্বা তম্ উপসম্পদ্য তত্ত্বং ততঃ জ্ঞাস্যামি ইতি মন্বানঃ গবাং সহস্রং স্বর্ণরত্নাদিভিঃ সর্বতঃ অলংকৃতং ব্রহ্মবিৎ-সভায়াম্ অবরুধ্য তান্ উবাচ—হে ভগবন্তঃ ব্রাহ্মণাঃ! যঃ বঃ ব্রহ্মিষ্ঠঃ তস্মৈ এতৎ গোসহস্রং ময়া দত্তং গৃহ্ণীয়াৎ ইতি। তে চ ভীতাঃ তূষ্ণীং স্থিতাঃ। অথ যাজ্ঞবল্ক্যঃ তূষ্ণীং-ভূতান্ তান্ আলক্ষ্য স্বান্তেবাসিনম্ উবাচ—এতাঃ গাঃ অস্মদ্গৃহং নয় ইতি। স তথা চকার। তৎ দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণাঃ চুক্রুধুঃ। ক্রুদ্ধেষু চ তেষু হোতা অশ্বলঃ আর্তভাগঃ ভুজ্যুঃ লাহ্যায়নিঃ উষস্তঃ কহোলঃ ইতি এতে ব্রহ্মবিদঃ যাজ্ঞবল্ক্যেন সদ্যঃ পরাজিতাঃ। অথ উদ্দালকেন ঋষিণা অন্তর্যামিণং পৃষ্টঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ উদ্দালকায় অন্তর্যামিণম্ উবাচ। সা চ শ্রুতিঃ এবা—যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী

১ আরণ্যকের পঞ্চমাধ্যায়=উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়।

শরীরং, যঃ পৃথিবীম্ অন্তরঃ যময়তি, এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ ইতি। [বৃহ. উ. ৩।৭।৩]। এবম্ এব যঃ অপ্সু তিষ্ঠন্ যঃ অগ্নৌ যঃ অন্তরিক্ষে যঃ দিবি যঃ আদিত্যে ইত্যাদ্যনেকপর্যায়ৈঃ সর্বান্তর্যামী বিষ্ণুঃ নিরূপিতঃ। তস্যাঃ চ শ্রুতেঃ অয়ম্ অর্থঃ—যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠতি সঃ অন্তর্যামী। কিং ঘট-পটাদিঃ? ন ইতি আহ—পৃথিব্যাঃ অন্তরঃ। কিং ইয়ং বর্তমানা পৃথিবীদেবতা? ন ইতি আহ—যং পৃথিবীদেবতা ন বেদ, সঃ অন্তর্যামী। পৃথিবীদেবতা হি স্বাত্মানং ন জানাতি ইয়ম্ অহম্ অস্মি ইতি। তস্মাৎ ন সা। কিং শরীরং সঃ? ন ইতি আহ—যস্য পৃথিবী শরীরম্ ইতি। যস্য পৃথিবী এব শরীরম্; নিয়ম্য-শরীরাতিরিক্তং শরীরং নাস্তি ইতি অর্থঃ। এবং যঃ অন্তরঃ বর্তমানঃ পৃথিবীং পৃথিবীদেবতাং যময়তি স্বব্যাপারে প্রেরয়তি এষঃ অমৃতঃ কূটস্থঃ নিত্যঃ অন্তর্যামী, হে উদ্দালক, তে আত্মা ইতি। এবং সর্ব-পর্যায়েষু অর্থঃ দ্রষ্টব্যঃ। এবং ব্রহ্মবিৎ-সভায়াং সর্বান্তর্যামিত্বেন সিদ্ধং বিষ্ণুং স্তৌতি—

(**মূলস্তোত্রম্ঃ**)

সর্বত্রাস্তে সর্বশরীরী ন চ সর্বঃ
সর্বং বেত্ত্যেবেহ ন যং বেত্তি হি সর্বঃ।
সর্বত্রান্তর্যামিতয়েত্থং যময়ন্, য-
স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১২॥

সর্বত্র ইতি। যঃ **সর্বত্র** পৃথিব্যাদিষু উপাদানতয়া **আস্তে** তন্তুষু পটে ইব। সর্বং শরীরং যস্য সঃ **সর্বশরীরী**। **ন চ সর্বঃ**, যঃ চ ন সর্বঃ কিন্তু অধিষ্ঠানতয়া সর্বস্য অন্তরঃ। যঃ চ **ইহ** পৃথিব্যাদৌ স্থিতঃ **সর্বং বেত্তি** জানাতি। যং চ **সর্বঃ** পৃথিব্যাদিঃ **ন বেদ**।[২] 'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা' [শ্বে. উ. ৩।১৯] ইত্যাদি শ্রুতেঃ, 'বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥' [গীতা ৭।২৬] ইতি স্মৃতেঃ চ। **যঃ যময়ন্**, পৃথিব্যাদি প্রেরয়ন্ বিহিত-প্রতিষিদ্ধেষু প্রবর্তয়ন্ নিবর্তয়ন্ চ, **ইত্থম্** উক্তপ্রকারেণ **সর্বত্রান্তর্যামিতয়া** বর্ততে **তম্** ইতি অর্থঃ। তথা চ উক্তম্—'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ। কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥' [পঞ্চদশী, ৬।১৭৬-এ উদ্ধৃত পাণ্ডবগীতার বচন], 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥' [গীতা, ১৮।৬১] ইতি স্মৃতেঃ চ ॥১২॥

টীকানুবাদ: বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ে [এই] আখ্যায়িকা আছে যে, [রাজর্ষি] জনক বহুদক্ষিণ[৩] নামক [এক] যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেখানে যজ্ঞদর্শনের

২ মূলস্তোত্রে 'বেত্তি' আছে, সুতরাং টীকায় 'বেদ' স্থলে 'বেত্তি' হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

৩ 'বহুদক্ষিণ' শব্দটি একটি স্বতন্ত্র যজ্ঞের নাম হইতে পারে অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞে বহু দক্ষিণার বিধান থাকায় উহাকেই বহুদক্ষিণ যজ্ঞ বলা যায়। বৃহ. উ. ৩।১।১ শাংকরভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অভিলাষে ও ধনাদি-প্রাপ্তির আশায় নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণ আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে ব্রহ্মবিদ্‌বর্গকে দর্শন করিয়া জনকের [মনে] জিজ্ঞাসা [উদিত] হইয়াছিল। তিনি সেই ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে জানিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব—ইহা মনে করিয়া স্বর্ণরত্নাদির দ্বারা সর্বতোভাবে অলংকৃত এক সহস্র গো ব্রহ্মবিদ্‌গণের সভাতে অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—'হে পূজ্যতম ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি মৎপ্রদত্ত এক সহস্র গো গ্রহণ করুন।' [ইহা শুনিয়া] তাঁহারা (ব্রাহ্মণগণ) ভীত হইয়া নীরব রহিলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণগণকে নীরব লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য স্বশিষ্যকে বলিলেন—'এই গোসমূহ আমাদের গৃহে লইয়া যাও।' সে তাহাই করিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইলেন। সেই ক্রুদ্ধ [ব্রাহ্মণ]-গণের মধ্যে হোতা অশ্বল, আর্তভাগ, ভুজ্যু লাহ্যায়নি, উষস্ত এবং কহোল—এই ব্রহ্মবিদ্‌গণ [বিচারে] যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক সদ্য পরাজিত হইলেন। অনন্তর উদ্দালক ঋষি কর্তৃক অন্তর্যামী বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে অন্তর্যামী বিষয়ে বলিলেন। সেই শ্রুতিটি এই—'যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, যিনি পৃথিবীর অন্তরে [বিদ্যমান], পৃথিবী যাঁহাকে জানেন না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, [তিনিই] এই তোমার অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা।' এইভাবেই 'যিনি জলে, অগ্নিতে, অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে, আদিত্যে অবস্থিত' ইত্যাদি বহু পর্যায়ে সর্বান্তর্যামী বিষ্ণু নিরূপিত হইয়াছেন।[৪] সেই শ্রুতির অর্থ এই : যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, তিনি অন্তর্যামী। [তাহা হইলে] উহা কি [পৃথিবীস্থিত] ঘটপদাদি [কোন পদার্থ]? [উত্তরে] বলিতেছেন—'না, তিনি পৃথিবীর অন্তরে [বিদ্যমান]।' [উহা] কি এই বর্তমান পৃথিবীদেবতা? [উত্তরে] বলিতেছেন—'না, যাঁহাকে পৃথিবীদেবতা জানেন না, তিনি অন্তর্যামী।' পৃথিবীদেবতা স্বীয় (স্বস্বরূপভূত) আত্মাকে, 'এই আত্মা'ই আমি' ইহাই জানেন না। অতএব তিনি (পৃথিবীদেবতা) [অন্তর্যামী] নহেন। [তাহা হইলে] তিনি কি শরীর [বিশেষ]? [উত্তরে] বলিতেছেন—'না, পৃথিবীই যাঁহার শরীর।' 'পৃথিবীই যাঁহার শরীর'—ইহার অর্থ: নিয়ন্ত্রণযোগ্য শরীরের অতিরিক্ত শরীর [যাঁহার] নাই।[৫] এইরূপে যিনি অন্তরে বর্তমান থাকিয়া পৃথিবী ও পৃথিবীদেবতাকে

৪ সমস্ত কার্যবস্তুর অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট আত্মাকেই অন্তর্যামী বলা হইয়াছে। পৃথিবী জল বায়ু প্রভৃতি সমস্ত ভূতবর্গের অভ্যন্তরে আত্মা অনুপ্রবিষ্ট—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। এই অনুপ্রবিষ্ট আত্মাকেই সাক্ষী বা ঈশ্বর বলা হয়।

৫ দৃশ্য স্থূল-বস্তু জড়-পদার্থ। চেতন ভিন্ন এই জড়-পদার্থকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। কিন্তু নিয়ন্ত্রণকারী চেতন—পৃথিবী প্রভৃতি জড়বস্তুর বাহিরে থাকিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন না, উহাদের অভ্যন্তরে থাকিয়াই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করেন। সুতরাং নিয়ন্ত্রণকারী আত্মা পৃথিবী আদি জড়বস্তুর অধিষ্ঠাতা, কিন্তু এই পৃথিবী আদি ব্যতীত তাঁহার শরীরস্থানীয় অপর কিছুই নাই। এই জন্যই পৃথিবী আদিকে তাঁহার শরীরস্থানীয় বলা

নিয়ন্ত্রণ করেন অর্থাৎ স্বব্যাপারে প্রেরণ করেন, তিনিই অন্তর্যামী [এবং তিনিই] অবিনাশী, নির্বিকার ও নিত্য ; হে উদ্দালক, ইনিই তোমার আত্মা। [অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের] সমস্ত পর্যায়ে এইরূপ [এক] অর্থই দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মবিদ্‌গণের সভায় এই প্রকারে সর্বান্তর্যামিরূপে প্রতিপাদিত বিষ্ণুকে [আচার্য] স্তুতি করিতেছেন : [মূলস্তোত্র, শ্লোক ১২, পৃঃ ৪০০ দ্রষ্টব্য]।

অন্বয় : [যঃ] সর্বশরীরী সর্বত্র আস্তে, ন চ সর্বঃ ; [যঃ] ইহ সর্বং বেত্তি এব, সর্বঃ হি যং ন বেত্তি ; যঃ সর্বত্র ইত্থম্ অন্তর্যামিতয়া যময়ন্ [আস্তে], তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে। ।১২।

স্তোত্রানুবাদ : যিনি সর্বশরীরী, সর্বত্র বিদ্যমান, [কিন্তু] সর্বস্বরূপ নহেন ; [যিনি] সমস্তই জানেন, [অথচ] সকলে যাঁহাকে জানে না ; যিনি সর্বত্র এইভাবে অন্তর্যামিরূপে নিয়ন্ত্রণ করিয়া বর্তমান, সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকারবিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি। ।১২।

টীকানুবাদ : **সর্বত্র** ইত্যাদি। যিনি **সর্বত্র**—পৃথিবী আদি সমস্ত পদার্থে, তন্তুসমূহে [অবস্থিত] পটে [তন্তুসমূহের] ন্যায় উপাদানরূপে **আস্তে**—বর্তমান আছেন ; সমস্তই যাঁহার শরীর, তিনি **সর্বশরীরী**। **ন চ সর্বঃ**—[যিনি] সর্ব [দেহই] নহেন, কিন্তু [তাহাদের] অধিষ্ঠানরূপে সকলের অন্তরস্থ ; যিনি **ইহ**—এই পৃথিবী আদিতে অবস্থান করিয়া **সর্বং বেত্তি**—সকলকে জানেন, কিন্তু **যং** চ **সর্বঃ**—যাঁহাকে পৃথিবী আদি সকলে **ন বেদ** (**বেত্তি**)—জানে না ; শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'তিনি [সমস্ত] জ্ঞেয় [বস্তু]কে জানেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা কেই নাই।' ; স্মৃতিতেও রহিয়াছে, 'হে অর্জুন! আমি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ [যাবতীয়] ভূতবর্গকে জানি, কিন্তু আমাকে কেহ জানে না।'

যঃ যময়ন্—যিনি প্রবর্তিত করেন [অর্থাৎ] পৃথিবী আদিকে প্রেরণ করেন, [ইহার তাৎপর্য—] বিহিত এবং নিষিদ্ধ কর্মে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত করেন [এবং] **ইত্থং**—এইভাবে [অর্থাৎ] পূর্বোক্ত প্রকারে [যিনি] **সর্বত্রান্তর্যামিতয়া**—সর্বত্র অন্তর্যামিরূপে বিরাজমান, **তং**—তাঁহাকে (সেই অন্তর্যামী বিষ্ণুকে) [আমি স্তুতি করিতেছি]—ইহাই অর্থ। এইরূপ কথিতও হইয়াছে, 'ধর্ম কি তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না ; অধর্ম কি তাহাও আমি জানি, কিন্তু [তাহা হইতে] আমার নিবৃত্তি হয় না ; [ইহাই আমি বুঝিয়াছি যে, আমার] হৃদয়স্থ কোন দেবতা আমাকে যেরূপ নিয়োগ করিতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি।' স্মৃতিও রহিয়াছে, 'হে অর্জুন! যন্ত্রারূঢ় সমস্ত প্রাণীকে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।' ।১২। [ক্রমশঃ]

হইয়াছে। শরীরের অভ্যন্তরবর্তী আত্মা যেমন সমগ্র শরীরকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তেমনই পৃথিবী প্রভৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিত চেতন, অন্তর্যামিরূপে পৃথিবী প্রভৃতিকেও নিয়ন্ত্রিত করেন। আত্মার যেমন স্থূল শরীর ব্যতীত অপর শরীর নাই, তেমনই অন্তর্যামীরও পৃথিবী প্রভৃতি ব্যতীত শরীরস্থানীয় অপর কিছুই নাই, ইহাই তাৎপর্য।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীমার নিত্যলীলা-প্রবেশের পরদিন দ্বিপ্রহরে তাঁহার দেহ যখন বেলুড় মঠে আনীত হইল, প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে এতদূর বহন করিয়া আনা সত্ত্বেও তখনও মুখমণ্ডল জ্যোতির্মণ্ডিত। স্নান-পূজাদির পরও, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুখের সেই দিব্য জ্যোতির্ময় আভা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই এবং যাঁহারা চরণকমল-স্পর্শের সৌভাগ্য লাভ করিলেন, তাঁহারা দেখিলেন উহা তখনও কি সুকোমল; পুষ্পাদি-শোভিত হইয়া 'স্থলপদ্ম-প্রতীকাশম্' সে চরণযুগল অতি সুন্দর, নয়ন-মনোরঞ্জক রূপ ধারণ করিয়াছিল। মায়ের এই দিব্য জ্যোতির্ময় প্রভা সম্বন্ধে পূজনীয় রাসবিহারী মহারাজ বলিয়াছেন, "কি আশ্চর্য ব্যাপার! অনেক দিন ভুগে ভুগে মায়ের শরীরে কিছু ছিল না, চেহারা অতীব শীর্ণ ক্ষীণ ম্লান হয়ে পড়েছিল, দেহত্যাগ করার সময়েও সেইরূপই ছিল! প্রাণবায়ু বিলীন হওয়ার পর পূজনীয় শরৎ মহারাজের নির্দেশে পরিধেয় বস্ত্রাদি বদল করে নূতন বস্ত্রাদি পরিয়ে পরিষ্কার বিছানা করে দেহ তাতে রাখা হয়, ধূপ জ্বালানো হয়। একটু দূরে সকলে বসে আছেন শোকাচ্ছন্ন হয়ে, হঠাৎ একজনের নজরে পড়ল, মুখমণ্ডল দীপ্ দীপ্ করছে—চারিদিকে জ্যোতিঃ ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি 'ভাখো ভাখো, মায়ের মুখ জ্যোতির্ময় হয়েছে' বলে উঠলে সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল। অবাক্ হয়ে একে অন্যের মুখ দেখছে, 'কি ব্যাপার! কোথা থেকে হঠাৎ এই জ্যোতির আবির্ভাব, পূর্বে তো কেহ কখনও এরূপ দেখেনি!' সকলের হৃদয় বিস্মিত পুলকিত হইয়া উঠিল, মাতৃসঙ্গীত ভজনাদি আরম্ভ হইল।"

ত্রয়োদশ দিনে বেলুড় মঠে মহামহোৎসব হয়, পূজা পাঠ কীর্তন প্রসাদবিতরণ 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' শব্দে মঠ মুখরিত হইয়াছিল। তখন বর্ষাকাল; উৎসবের পূর্বদিন খুব বাদলা হওয়ায় অনেকে শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইলে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ জোর গলায় বলিলেন, 'কোন ভয় নাই, জান না কার কাজ? তাঁর ইচ্ছায়ই সকল কাজ সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।' পরদিন আকাশ পরিষ্কার হইল এবং সকলেই নির্বিঘ্নে উৎসবে যোগদান ও প্রসাদধারণ করিলেন।

মায়ের দেহত্যাগের দুই-একদিন পর সন্ধ্যা-বেলায় মায়ের আশ্রিত এক সম্ভ্রান্ত ভক্তদম্পতী অতি শোকার্ত হইয়া বেলুড় মঠে আসেন এবং পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিয়া নিজেদের অন্তরের প্রবল শোক কাঁদিতে কাঁদিতে নিবেদন করেন। তাঁহারা দূরে থাকেন, মাকে শেষ দর্শন করিবার আশায় কত কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আশা পূর্ণ হয় নাই। মা তৎপূর্বেই অন্তর্ধান করিয়াছেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহাদের প্রতি খুব সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন, তাঁহাদের মনও একটু শান্ত হইল। তাহার পর মহাপুরুষজী একপ্রকার ভাবাবিষ্টপ্রায় হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'মা তো এখন সর্বব্যাপিনী, সকলের মধ্যেই, সকল স্থানেই তাঁকে দেখতে পাবে। যে তাঁকে প্রাণভরে ডাকবে, সে-ই দর্শন পাবে। তিনি এতদিন একস্থানে ছিলেন। এখন সর্বত্র আছেন। দুঃখের কোন কারণ নেই, ব্যাকুল হয়ে আন্তরিকভাবে ডাকলেই দর্শন দেবেন।' মহাপুরুষ মহারাজের সেই আশার বাণী অনেকেরই হৃদয় স্পর্শ করিল ও ভরসা আনিল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে শ্রীপঞ্চমী দিবসে জনৈক ব্রহ্মচারী বেলুড় মঠে প্রতিমায় দেবী সরস্বতীর পূজা করিতে বসিবার পূর্বে মহাপুরুষ-জীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে গিয়াছেন; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষ মহারাজ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, 'মা-ই সাক্ষাৎ সরস্বতী, তাঁর কৃপায় আমাদের মঠে নিত্য তাঁর পূজা হয়। তিনিই কৃপা ক'রে সকলের অজ্ঞান দূর করেন, জ্ঞান ভক্তি প্রদান করেন।' 'জয় মা', 'জয় মা' বলিয়া মহাপুরুষজী ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে জোড়হস্তে বিনম্রভাবে মায়ের উদ্দেশে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভাবোচ্ছ্বাস সকলেরই চিত্ত দ্রব করিল। মায়ের জনৈক সন্তান মা সাক্ষাৎ সরস্বতী শুনিয়া অতি পুলকিত হইয়াছেন, তাঁহার অন্তরে একটি পুরাতন স্মৃতি জাগরূক হইয়াছে। তিনি এক-দিন জয়রামবাটীতে পূজার জন্য ফুল সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়া কাছাকাছি কোথাও ফুল না পাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভুরসুবো গ্রামে মানিকরাজার বাটীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বাগানে একটি মৃতপ্রায় কুন্দগাছে কয়েকটি ফুল দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া কাঁটাঝোপঘেরা অতিক্রম করিয়া সেই ফুল কয়টি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন। তখন শীতের সময় কুন্দফুল প্রস্ফুটিত হওয়ার কাল। মা ফুল দেখিয়া খুব খুশী হইলেন এবং ঠাকুরের পূজা করিলেন। পূজাকালে/সন্তান কয়েকটি ফুল অবশিষ্ট রাখার জন্য মাকে প্রার্থনা জানাইলেন। পূজাশেষে মা তাঁহাকে ফুল দেখাইয়া দিয়া খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছেন। তিনি ফুল লইতে গিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে একটি অতি সুন্দর বিকশিত কুন্দও রহিয়াছে। তাঁহারা মায়ের পদে রক্ত পুষ্পই দিতে ভালবাসেন, সাদা ফুল তো ঠাকুরের জন্য। যাহাই হউক, মা রাখিয়াছেন, তাই সাদা কুন্দটিও হাতে লইয়া পাদপদ্মে দিলেন, কিন্তু ফুলটি পাদপদ্মে দিতেই অন্তরে যেন একটি আনন্দের হিল্লোল উঠিল, যেন কি এক অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়া চতুর্দিক আলোকিত করিয়া হাসিতেছে, বোধ হইল। মা-ও অতীব প্রসন্নবদনা। কুন্দ মা সরস্বতীর খুব প্রিয় পুষ্প, আমাদের মা-ই যে সাক্ষাৎ সরস্বতী, অজ্ঞ সন্তান তখনও একথা শুনেন নাই।

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে লইয়া হুজুকপ্রিয় একদল মানুষ মত্ত হইতেছে এবং মুখে ভগবান ভগবতী বলিয়া মহিমা-প্রচার করিয়া ভক্তিভাব দেখাইলেও তাহাদের অন্তরে যে বিশ্বাস-নিষ্ঠার অভাব—ইহা মা টের পাইতেন। অতি সরলা গ্রাম্য মেয়ে সংসারের আধুনিক কুটিলতার কোন খবর রাখিতেন না, ধার ধারিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার দূরদৃষ্টির নিকট কোন ব্যাপারই অজ্ঞাত ছিল না, থাকিত না। তথাপি দুর্বল, অক্ষম এই সব সন্তানগণের প্রতি তাঁহার স্নেহকৃপা বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না। তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য অবসরমতো তাহাদের শিক্ষাদান করিতেন, সময়বিশেষে সাবধানও করিয়া দিতেন। যাহাদের অন্তরে ভোগবাসনা অত্যন্ত প্রবল দেখিতেন, তাহাদিগকে অন্তর্যামিণী কখনও সংসারত্যাগের পথ দেখাইতেন না অথবা ঐ পথের উচ্চ প্রশংসা করিতেন না। সৎপথে সৎকর্মে থাকিয়া সংযত সংসারী হইতেই উপদেশ দিতেন, অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাস-ভক্তি যে জীবনের প্রধান অবলম্বন সেই বিষয়ে সর্বদা

সকলকে বিশেষভাবে হুঁশিয়ার করিতেন।

আমরা পূর্বে প্রসঙ্গক্রমে ঢাকায় ভক্তগণের চাঁদাতোলা সম্বন্ধে মায়ের মন্তব্যের উল্লেখ করিয়াছি। এখন তাঁহার বিভিন্ন সময়ে সমালোচনাত্মক ও শিক্ষাপ্রদ ঐরূপ মন্তব্য আরও কয়েকটি বলিতে ইচ্ছা করি।

মায়ের এক সন্তান বিবাহিত ছিলেন, এবং গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। নানারকম শিল্পাদি কাজকর্ম তাঁহার বেশ ভালভাবেই জানা ছিল, মোটামুটি গ্রাসাচ্ছাদনের তাঁহার অভাব-অসুবিধা ছিল না। অন্তরে ধর্মভাব বাল্যকাল হইতেই ছিল, পরে ঠাকুরের কথা জানিয়া ও মায়ের কৃপা পাইয়া ভগবদ্ভজনের জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মে এবং সংসার-সম্পর্ক ষোল আনা ত্যাগ করিয়া সাধু হইয়া একটি আশ্রমে যোগদান করেন। আশ্রমে নানাপ্রকার কাজ আছে, ধীরে ধীরে তাঁহার উপর কাজের চাপ বাড়িতে লাগিল; সেখানে সকলেই দিনরাত খাটে, তিনি কি করিয়া বসিয়া থাকেন আর ইচ্ছামত জপধ্যান করেন! কিছুদিন পরেই অন্তরে ভীষণ অশান্তি উপস্থিত হইল। নিরুপদ্রবে ভজন করিবেন বলিয়া সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছেন, এখানে দেখেন ততোধিক উপদ্রব। একদিন শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া অন্তরের বেদনা প্রকাশ করিলে মা বলিলেন, 'বাবা, টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাস—আশ্রম তো নয়, দ্বিতীয় সংসার!' মা তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করিয়া সব সহ্য করিয়া যাইবার জন্য বুঝাইয়া বলিলেন, আন্তরিক ভজনের আগ্রহ থাকিলে ঠাকুর সময়ে সব যোগাযোগ করিয়া দিবেন। বাস্তবিকই অল্পদিন পরেই তাঁহার কাশীতে থাকার সুবিধা হয় এবং তাহার পর বহুদিন উত্তরাখণ্ডে বাস করিয়া ভজনে কালাতিপাত করিয়া পরম আনন্দিত হন।

ক আশ্রমাধ্যক্ষ আশ্রমের কর্মীরা সর্ব বিষয়ে তাঁহার নির্দেশ ষোল আনা মানিয়া চলিতে চাহে না দেখিয়া মাকে ধরিয়া বসিলেন। আশ্রমের কর্মীরা সকলে মায়েরই আশ্রিত এবং মায়ের আদেশ-পালনে সতত তৎপর। তিনি ভাবিলেন, মা আদেশ করিলে তাহারা সকলেই বিনা আপত্তিতে তাঁহার আদেশ পালন করিবে। মা তাঁহাকে খুব ভালবাসেন, তাঁহার উপর বিশ্বাস-ভরসা রাখেন এবং তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কর্মশক্তিরও খুব প্রশংসা করেন। কাজেই তাঁহার মনে ধারণা ছিল, মা তাঁহার অনুরোধমতো সকলকে তাঁহার অধীন হইয়া থাকিতে ও সকল বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে বলিবেন। কিন্তু মা তাঁহার প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি দৃঢ়ভাবে তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, 'ছেলেরা সাধু হয়েছে, ভগবানকে ডাকবে, নিজের জীবন সার্থক করবে। আশ্রমের কাজকর্ম তো যথাসাধ্য করছেই, করবেও। তাদের বয়স হয়েছে, বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছে, নিজের ভাল-মন্দ সুখ-সুবিধা বুঝে তারা স্বাধীনভাবে চলতে চাইলে তাতে তুমি বাধা দিয়ে কিছু বলতে পারবে না। আর বাধা দিলেও নিজের কষ্ট-অসুবিধা বরণ করে কেউ চিরকাল পরের অধীন হয়ে থাকতে পারে না। তোমার কাজের অসুবিধা হ'লে তোমাকেই তাদের বুঝিয়ে বলতে হবে। তারা বরাবর তোমার কথা শুনে আসছে, এখনও শুনবে। ভালবাসায় সব কিছু হয়, জোর ক'রে কায়দায় ফেলে কাউকে দিয়ে কিছু করানো যায় না।' অধ্যক্ষ কিন্তু মায়ের একথা শুনিয়াও নিজের কর্তৃত্ববুদ্ধি কমাইতে পারিলেন না, বুদ্ধিবলে কলে-কৌশলে সকলের নিকট কাজ আদায়ের চেষ্টার ফলে

অল্পকাল পরেই বিচ্ছেদ ঘটিতে লাগিল। আশ্রমাধ্যক্ষকে বিভিন্ন সময়ে উক্ত মায়ের সদুপদেশের মর্মার্থই এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

জয়রামবাটীতে মায়ের জন্য নূতন বাড়ী নির্মিত হইবার পর স্থানীয় লোকের উপকারের জন্য দাতব্য ঔষধালয় ও নৈশ পাঠশালা স্থাপনের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। ঐ সকল কাজের উন্নতি ও প্রসারের জন্য উদ্যোক্তাগণ টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে মায়ের নামে আবেদন-পত্র বাহির করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ প্রস্তাব তাঁহার কর্ণগোচর হইবা-মাত্র মা দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করেন। মায়ের অসন্তুষ্টির ভয়ে তাঁহারা ঐ বিষয়ে আর অগ্রসর হন নাই। মা জানিতেন, তাঁহার প্রিয় সন্তান ললিতবাবু বহু পরিশ্রমে ও কষ্টে উক্ত ঔষধালয় ও পাঠশালার জন্য অর্থ ও জিনিসপত্র জোগাড় করিয়া দেন। যাহাতে ঐ সকলের যথাযথ সদ্ব্যবহার হয়, কোন প্রকারে অপচয় না ঘটে, এ বিষয়ে মার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। যুদ্ধের সময় ঔষধ ও স্পিরিট দুর্মূল্য, সংগ্রহ করাও কঠিন। বাতের জন্য মায়ের হাঁটুতে একটু স্পিরিট মালিশ করিলে সাময়িকভাবে বেদনার উপশম বোধ হইত। একজন সন্তান মধ্যে মধ্যে দুই-চারি দিন ঐভাবে স্পিরিট মালিশ করিয়া দিলে মা করুণ স্বরে বলিলেন, 'বাবা! ললিত আমার কত কষ্ট ক'রে ঐ সকল সংগ্রহ ক'রে দেয় গরীবদের জন্য। এখন যুদ্ধের জন্য পাওয়া খুবই কঠিন হয়েছে। আমার একটু রশুন-সরষের তেল গরম ক'রে মালিশ করলেই বেশ আরাম বোধ হয়। এই দামী জিনিস আমার ব্যবহার করতে কষ্ট হয়, এই মালিশ আর করতে হবে না।' মা আর স্পিরিট মালিশ করিতে দিলেন না।

মায়ের বিচার-বিবেচনা ও দূরদর্শিতার কথা চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, বিস্ময়ের অবধি থাকে না। জয়রামবাটীর জমিদার রায়েদের সন্তান ডাক্তার সজনীবাবু মায়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে চাহিলে মা তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সজনীবাবু নিরস্ত না হওয়ায় তাঁহাকে দীক্ষা দেন। দীক্ষান্তে সজনীবাবু দুইটি টাকা গুরু-দক্ষিণা দিলে মা তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া টাকা দুইটি ফেরত দিয়াছিলেন। এই ঘটনায় বিস্ময়াবিষ্ট জনৈক সন্তানকে মা বলিয়াছিলেন, 'ও নিজেদের বাগানের জিনিসপত্র কখনো এনে দেয়, সে আলাদা কথা, কিন্তু টাকা নিলে ওর বাড়ীর লোকের মনে সন্দেহ হতে পারে পাছে তাদের বিষয়ে হাত পড়ে। ওরা বিষয়ী লোক, জমিদার; ওদের কাছ থেকে তাই প্রণামীর টাকা নিলুম না, গ্রহণ ক'রে ফিরিয়ে দিলুম।'

যতদূর মনে হয়, গড়বেতা অথবা ঐ অঞ্চলেরই অপর কোন আশ্রমের কর্মী জনৈক ব্রহ্মচারী আশ্রমের খরচের জন্য চাঁদা তুলিতে বাহির হইয়া এদিক সেদিক ঘুরিয়া জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। মা তখন সেখানে আছেন। তিনি তাঁহাকে আদরযত্নে রাখিলেন, স্নেহমমতায় খাওয়াইলেন এবং বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন জয়রামবাটী কিংবা পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে যেন তিনি কাহারও নিকট ভিক্ষা না করেন, চাঁদা না তুলেন। মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'এসকল গ্রামের গরীব লোক কষ্টে চাষবাস ক'রে দুঃখে জীবন কাটায়। এদের কাছ থেকে কিছু পয়সাকড়ি আদায় করা ঠিক নয়। ঠাকুরের নাম ক'রে কিছু চাইলে এরা ভাববে, ঠাকুর তাদের ঘাড়ে এক উপদ্রব চাপালেন।' চাঁদা তোলার নামে মায়ের মনে এক আতঙ্কের ভাব আসিত।

ঠাকুরের পূজার্চনার জন্য অনেকের উৎসাহ-

উদ্যম দেখিয়া এবং উহাতে আন্তরিক ভাব-ভক্তির অভাব লক্ষ্য করিয়া মা বলিতেন, 'ঠাকুরকে ছবিতে পূজা-সেবা করা এখন খুব সহজ হয়েছে। ভোগ দাও ভাল ক'রে আর নিজেরাই প্রসাদ খাও। যদি সত্যিই ঠাকুর খেয়ে ফেলতেন; তবে কে কিরূপ ভোগ দিত বলা যায় না! ঠাকুরের অসুখের সময় খরচের জন্য টাকা পয়সা নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছে।' মা নিজের সম্বন্ধেও কখন কখন ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছেন, 'সেই সময়ে কে আর খবর নিয়েছে? এই ভিখারী ফকির ছেলেরা ছিল, নিজেদেরই খাবার জোটে না, মাথা রাখবার স্থান নেই, তবু তারাই যা সম্ভব হতো করেছে।' বিষয়ী লোকের ভগবদ্ভক্তির গভীরত্ব ও দৃঢ়তা থাকে না —এই বিষয়ে ঠাকুরের নাম করিয়া মা বলিতেন, 'ঠাকুর বলতেন, বিষয়ী লোক স্প্রিংয়ের গদী—বসলেই নুয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়ালে আবার যেমন-তেমনি হয়ে যায়। সংসারী লোকের ভাবভক্তি তপ্ত লোহায় জলের ছিটা, পড়তে না পড়তেই শুকিয়ে উড়ে যায়।' বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া ভগবদ্ভজন খুবই কঠিন কাজ, সেজন্য যতদূর সম্ভব হাঙ্গাম কমাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকার কথাই মা বলিতেন। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে কাহারও কাহারও অন্তরে প্রবল ভোগতৃষ্ণা, খাওয়া-পরার জিনিসের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ, আর সর্বদা অশান্তি-ভোগ দেখিয়া মা দুঃখ পাইতেন। সময় সময় সদুপদেশ দিতেন বটে, কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তির অন্তরের দুর্বলতা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া দুঃখিত হইলেও নীরব থাকিতেন। জানিতেন, উহারা নিজেদের বাঁচাইতে পারিবে না। ভোগ না করিলে উহাদের নিবৃত্তি আসিবে না। তাই বাধা দিবার কথা উঠিলে আপশোস করিয়া বলিতেন, 'অন্তরে ভোগতৃষ্ণা প্রবল, তাই এমন করছে।'

তাঁহার সন্তানদের মধ্যে কেহ কখনও জয়-রামবাটীতে তাঁহার সমীপে বাস করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে বলিতেন 'আমি এখানে মেয়েদের নিয়ে থাকি, মেয়েদের মধ্যে ব্যাটা-ছেলেদের থাকা সুবিধা হবে না।' কার্যব্যপদেশে সময় সময় যে-সকল সন্তান সেখানে থাকিতেন, তিনি তাঁহাদের বাড়ীর ভিতরে যখন তখন আসা কিংবা বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা পছন্দ করিতেন না। শুধু তাহাই নহে, ভিতরে বেশী না আসার জন্য সাবধানও করিয়া দিতেন। তাহা সত্ত্বেও অসাবধান কাহাকেও বাড়ীর ভিতরে অধিক যাতায়াত করিতে দেখিলে তাহাকে স্পষ্টই বলিতেন, 'ভিতরে মেয়েরা থাকে, সকল সময় তারা কাপড়-চোপড় সামলে থাকতে পারে না। কখন কখন তারা গা খুলেও বসে; হঠাৎ যখন তখন কোন ব্যাটাছেলে এসে পড়লে তাদের লজ্জা-সরমে আঘাত লাগে। ছেলেরা কেন এরূপ এসে মেয়েদের উত্যক্ত করবে?' মায়ের মুখে এরূপ বাক্য ও সমালোচনা শুনা যাইত। জনৈক সন্তান মায়ের সাবধান করা সত্ত্বেও কাজের অছিলায় মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া শেষে বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মা পরবর্তী কালে তাঁহার দুর্বল সন্তানগণকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভক্তমেয়েদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা করিতে নিষেধ করিতেন, এমন কি তাঁহার কাছেও অধিকক্ষণ বসিতে দিতেন না।

সাধুরা গৃহস্থদের সহিত খুব মিশিলে তাঁহাদের ত্যাগের ভাব কমিয়া যাইতে পারে। এজন্য কর্মব্যপদেশে গৃহস্থদের সঙ্গে সাধুরা যত কম থাকেন ততই ভাল। এমন কি গৃহস্থঘরে নিমন্ত্রণাদিতেও সাধুরা যত কম যান, গৃহস্থের নিকট হইতে জিনিসপত্রাদি যত কম গ্রহণ করেন, ততই নিজেদের মঙ্গল—ইহা মা তাঁহার

সাধুসন্তানদের অন্তরে বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিতেন। সেজন্য তাঁহার কোন কোন সন্তান পাড়াপ্রতিবেশীর ঘরে, এমন কি মামাদের বাড়ীতেও নিমন্ত্রণাদি স্বীকার না করিলে কিংবা অপর কাহারও কোন দ্রব্য না খাইলে বা গ্রহণ না করিলে মা দুঃখিত না হইয়া প্রসন্নই হইতেন। তাঁহার নিকট হইতে গেরুয়া গ্রহণ করিয়া জনৈক ব্রহ্মচারী কিছুকাল পরে উহা ত্যাগ করেন। তৎপূর্বে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ বাড়ীতে অনেকদিন কাটাইয়াছিলেন। মা সেই সাধুর গেরুয়াত্যাগের কথা শুনিয়া খুব দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'বিষয়ী লোকের অন্ন খেয়ে খেয়ে ওর বুদ্ধি মলিন হয়ে গেছে। মাটির হাঁড়িতে সিংহের দুধ টেকে না।' সংসারত্যাগ করিয়াও কামকাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তিদের সহিত বেশী সম্পর্ক রাখিলে পতন হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এজন্য যতদূর সম্ভব তাহাদের হইতে দূরে ও কঠোর-ভাবে থাকার প্রশংসা করিতেন। সর্বদাই মায়ের মুখে ত্যাগের ভাবে জীবনযাপনের উচ্চ প্রশংসা শুনা যাইত, এমন কি দৈনন্দিন ব্যবহারেও তিনি যাহাদের অন্তরে ত্যাগের ভাব দেখিতেন, তাহাদের ঐ পথে উৎসাহিত করিতেন।

এক সময়ে জয়রামবাটীতে তাঁহার কয়েকটি ত্যাগী সন্তান একত্র হন। উঁহাদের প্রকৃতি বিভিন্ন, কাহারও কাহারও একটু ভাল খাইবার অভ্যাস, কেহ কঠোরতা পছন্দ করিতেন। মা সন্তানদের অন্তর বুঝিতে পারেন, অন্য মেয়েরা তাহা পারে না; কাজেই তাঁহাদের খাওয়া ও জল-খাওয়ার ব্যাপারে কমবেশী করিয়া পরি-বেশনাদি করিতে একটু মুশকিল হইত। মা সেই সময়ে সম্মুখে থাকিলে নিঃসঙ্কোচে যাহাকে যেমন দিতে হইবে ঠিক বলিয়া দিতেন। গরমের সময় একদিন বিকালে ছেলেদের কিছু জল-খাবার দিতে হইবে। জনৈকা মহিলা ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তিনি নিজে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, মা কাহাকে কি দিতে হইবে বলিয়া দিয়া দেখাইয়া দিলেন। একটি ছেলেকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে, উহাকে কিছুই দিতে হইবে না; ঐ ছেলেটি বারবার খাওয়া ও সৌখীনতা পছন্দ করিত না এবং মা-ও তাহাকে ঠিক সেইরূপ কঠোরভাবেই চলিতে দিতেন।

সকালে সব দিন ভাল প্রসাদ থাকে না, মুড়িই প্রধান জলখাবার। যখন বাহিরের ভক্ত-সাধু থাকেন, মুড়ি যাঁহাদের মনোমত হয় না, তাঁহাদের জন্য অনেক সময়ে হালুয়া হয়। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে সবদিন হালুয়া করা কঠিন ব্যাপার। অপর মেয়েরা অনেক সময় সাধুদের শুধু মুড়ি দিতে সঙ্কুচিত হইত। কিন্তু মা স্নেহভরে ছেলেদের মুড়ি খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিতেন এবং তাঁহার যে-সকল ছেলে খাওয়ার ব্যাপারে যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট, তাহাদিগের জন্য সাধারণতঃ নিজেও মুড়ি বাদ দিয়া হালুয়া করিতে যাইতেন না বা অপরকে করিতে দিতেন না। অন্যেরা ইতস্ততঃ করিলে স্পষ্টই তাঁহাদের বলিয়া দিতেন, 'একে মুড়ি দিলেই চলবে।' সেইসকল ছেলে মুড়ি খাইয়া অধিক সন্তুষ্ট হইতেন এবং মায়ের ও অপরের হাঙ্গাম কম হওয়াতে মনে স্বস্তি অনুভব করিতেন।

এক সময়ে চন্দ্রকোণা হইতে একটি অল্প-বয়স্কা বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা আসিয়া কিছুদিন মায়ের চরণসমীপে বাস করেন। মেয়েটি মায়ের কৃপাপ্রাপ্তা এবং চালচলনে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণভাবেই প্রাচীনকালের বিধবাদের ন্যায়। মাথার চুল ছোট করিয়া কাটেন, পরনে সাদা থান, গায়ে কোন অলঙ্কার নাই, আহারে বিধবাদের বিধি সম্পূর্ণ পালন করিয়া থাকেন। অতিশয় ভক্তিমতী সেই যুবতী মায়ের বিশেষ

স্নেহমমতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠোর ত্যাগ-তপস্যা ও ভক্তি-বিশ্বাসের প্রশংসা করিয়া মা অনেক সময় অপরকে ত্যাগের পথে উৎসাহিত করিতেন।

মা তাঁহার আত্মীয়বর্গ ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রীদের ভোগের বিষয়ে আসক্তি ও টাকাকড়ি জিনিস-পত্রের প্রতি লালসা এবং ভগবানে ভক্তিবিশ্বাসের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়া সময় সময় দুঃখ করিতেন। সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াও কাহারো মনে বিষয়ের ছাপ পড়িতেছে দেখিলে মায়ের অন্তরে বিশেষ বেদনা জন্মিত। সেজন্য কেহ ত্যাগের পথ অবলম্বন করিতে চাহিলে তাহাকে খুব সাবধান করিয়া দিতেন এবং বিবেকবিচারসহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে বলিতেন। যাহাতে সাময়িক ভাবের প্রেরণায় কেহ কিছু না করে সেইজন্য মা বিশেষ সাবধান হইয়া 'রয়ে সয়ে' সব কিছু করিতে বলিতেন। সকল কাজেই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অত্যধিক উৎসাহ উদ্যম প্রকাশ করা ভাল নয় বলিতেন। একদিন উদ্বোধনে রাত্রে রাঁধুনী-বামুন নাই, কে রান্না করিবে—সে বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। একজন অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রান্না করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মনের ভাব রান্নার অসুবিধায় মায়ের কোন কষ্ট না হয়। মায়ের নিকটে তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে মা উহা সমর্থন করিলেন না। মা তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, 'অনেক লোকের রান্না—বড় বড় হাণ্ডা তুমি নাড়াচাড়া করতে পারবে না।' তাহার পর খুব সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, 'সবকাজেই "আগু-বাড়া" হয়ো না।' কিন্তু হায়! সেই অমূল্য উপদেশ তাঁহার অন্তরে ধারণা হইল না এবং পরবর্তী কালে অধিক উৎসাহে অনেক কাজেই 'আগু-বাড়া' হইয়া বারংবার খুব ধাক্কা খাইয়া তবে মায়ের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

লোকসঙ্গ, বৃথা আলাপ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, কুপথে পরিচালিত করে; সেইজন্য মা তাঁহার সন্তানদিগকে ঐ বিষয়ে খুব সাবধান করিয়া দিতেন। একদিন কোন কাজের জন্য একজন সন্তানকে গ্রামান্তরে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি কাজ শেষ করিয়া অনেকক্ষণ সেখানে কাটাইয়া বিলম্বে ফিরিয়া মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন মা তাঁহার বিলম্বের কারণ জানিতে চাহিলেন। যখন শুনিলেন, যে-প্রয়োজনে পাঠাইয়াছিলেন তাহা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিটিয়া গেলেও তিনি সেখানে বসিয়া কথাবার্তা বলিয়া ও পরে একটু হাঙ্গামা জড়াইয়া আসিয়া-ছেন, তখন দুঃখিত হইলেন এবং দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'যখনই কোন কাজে কোথাও যাবে, কাজটি হয়ে গেলেই তক্ষুনি চলে আসবে। দেখা যায়, জীবনে অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেশী খুঁড়ে আমরা সাপ বের ক'রে বসি।'

সামান্য ব্যাপার নিয়েই হইচই হট্টগোল সৃষ্টি করা আমাদের স্বভাব এবং ফলে দুঃখ-অশান্তিও ভোগ করি। মা সকল ব্যাপারেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া নীরবে সব সহ্য করার জন্য শিক্ষা দিতেন—'শ, ষ, স—যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।'

জয়রামবাটীতে মায়ের সুখসুবিধার জন্য পূজনীয় যোগীন মহারাজ অনেক কিছু জিনিসপত্র করিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে খাট, আলনার সঙ্গে মুড়িয়া রাখা যায় এরূপ একটি কাঠের ছোট টেবিলও ছিল। ঐ সকল জিনিসের সহিত যোগানন্দ-স্বামীর স্মৃতি-বিজড়িত থাকায় মা খুব যত্নে সেগুলি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার দেওয়া বিছানার তোষকটির তুলা অনেক কাল ব্যবহার

করায় শক্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মা উহা বদল না করাইয়া পুনরায় ঝাড়িয়া ধুনাইয়া লইবার জন্য জনৈক সন্তানকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে বলিয়া বলিলেন, 'যোগীনের তৈরী করানো তোষক, এক নম্বর তুলা, খুব ভালো আছে এখনও; একটু বাড়িয়ে ধুনিয়ে নিলেই আবার খুব ভাল, ঠিক নতুন হয়ে যাবে।' সন্তান তাঁহার আদেশমত উহা কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন এবং ঠিক করাইবার পরে মা সানন্দে উহা ব্যবহার করেন।

মা জয়রামবাটী থাকাকালীন একদিন ঘরের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিবার সময়ে সেই টেবিলের উপরের ভারী কাঠটি (মাঝে কব্জা দিয়া দুই খণ্ডে জোড়া দেওয়া) পায়ে পড়িয়া গেল। ভীষণ আঘাত লাগিল—চামড়া ছিঁড়িয়া গিয়া রক্ত বাহির হইল। খুব যন্ত্রণা হইতেছে, মা হাতে পা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া আছেন, চক্ষু দিয়া জল ঝরিতেছে। সকলে ছুটিয়া গেলেন, ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। মা নিজের উপর দোষ লইয়া বলিতেছেন, 'ভাবলুম টেবিলখানা একটু সরিয়ে দিয়ে ঘরখানা ভাল ক'রে পরিষ্কার করব, এই দেখ, ঝাড়ু পড়ে রয়েছে; ভারী কাঠ, তুলতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গেল। কর্মের ফল ভুগতেই হবে। তা না হলে, অপর কাকেও বললেই সরিয়ে দিত। এই মাত্র কোয়ালপাড়ার ছেলেটি এসেছিল জিনিসপত্র নিয়ে, বসে মুড়ি খেয়ে কথাবার্তা বলে চলে গেল, তাকে বললেই সরিয়ে দিত, কিন্তু মনে হল না। নিজের হাতে করতে গিয়ে পায়ে কাঠ পড়ে গেল, আঘাত লাগল। অদৃষ্টে যা আছে তা তো ভুগতেই হবে।' মা স্থিরভাবে সেই স্থানেই বসিয়া ধীরে ধীরে কথা বলিতেছেন। শুনিতে পাইয়া নলিনীদিদি ছুটিয়া আসিয়াছেন; দেখিয়া খুব দুঃখ করিতে লাগিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে ছোটমেয়েকে বা বৌমাকে শাসন করার মতো বলিতেছেন, 'ওঁর সব কাজ নিজের হাতে না করলে ভাল লাগে না! কেন এই ভারী কাঠ তুলতে যাওয়া! একি কম ভারী? বাড়ীতে এত লোক রয়েছে, কাউকে বললেই ক'রে দিত; তা নয়, উনি নিজে করবেন! এখন দেখ দিকিন, কত কষ্ট হচ্ছে! ক'দিন ভুগতে' হবে, কি হবে কে জানে?' নলিনীদিদি ঘটনাকে খুব বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, মা কিন্তু চুপ করিয়া সব শুনিলেন, যন্ত্রণাও অনেকটা কমিয়াছিল। সেই সময়ে যে-সন্তান সেখানকার দেখাশুনা করিতেন, তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিয়া দিলেন, 'দেখ, এসব কথা কলকাতায় কিছু লিখো না, তা হলে তারা আবার লোক পাঠাবে, কষ্ট ক'রে কারা সব আবার আসবে, আর মিছামিছি একটা হইচই হট্টগোল সুরু হবে।' মা তাঁহাকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া চুপ-চাপ থাকিতে বলিলেন; বলিলেন, আঘাত বিশেষ কিছু নয়, সহজেই সারিয়া যাইবে। মায়ের আদেশানুসারে তিনি কাহাকেও কিছু লিখিলেন না। মা কোন বিষয়েই অপরকে উদ্ব্যস্ত করিতে ইচ্ছা করিতেন না। নিজের দুঃখকষ্ট যতদূর সম্ভব গোপন রাখিয়া নিজেই সহ্য করিতেন।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ অপরের পত্রে মায়ের উক্ত আঘাতের কথা জানিতে পারিয়া আরাম-বাগের ভক্ত ডাক্তার প্রভাকরবাবুকে পত্র দিলেন—তিনি যেন জয়রামবাটী আসিয়া ভাল করিয়া মায়ের আঘাত পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে পত্র লেখেন। প্রভাকরবাবু পত্র পাইয়াই আসিলেন, তখন আঘাতের ঘা প্রায় সারিয়া গিয়াছে, ব্যথা আর নাই বলিলেও চলে। প্রভাকরবাবু ভাল করিয়া দেখিয়া একটু ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া

দিয়া গেলেন এবং কলিকাতায় পূজনীয় শরৎ মহারাজকেও পত্র দিয়া সকল কথা ভালভাবে লিখিয়া জানাইলেন—কোন ভয় বা উদ্বেগের কারণ নাই, সারিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে শরৎ মহারাজ মাকেও অতি বিনীতভাবে এক পত্র লিখিয়া মায়ের পায়ে আঘাত লাগার জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করেন এবং কখনও কোন কিছু হইলে তাঁহাকে জানাইবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জানান। অবশ্য, উপস্থিত ঘটনা না জানানোর জন্য সেখানে উপস্থিত সন্তানের উপর সামান্যভাবে অনুযোগ করিয়া খেদ প্রকাশও করিয়াছিলেন। মা সকলকেই শিক্ষা দিতেন, 'মানুষ স্বীয় কর্মেরই ফল ভোগ করে, এজন্য অপরকে দোষী না ক'রে ভগবানের নিকট প্রার্থনা ও তাঁর কৃপার উপর নির্ভর ক'রে ধীরভাবে সকল অবস্থায় সহ্য ক'রে যাওয়াই প্রয়োজন।'

নিজের দুঃখকষ্টের জন্য মাকে কখনও অপরকে দোষ দিতে দেখা যাইত না। রাধির মা—ছোট মামী— তাঁহাকে অত্যন্ত উত্যক্ত করিলে নিজের কর্মেরই ফলে এই উপদ্রব—একথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেন, 'বাবা! মনে হয়, কাঁটা-দেওয়া বেলপাতা দিয়ে শিবের পুজো করেছিলুম, তাই আমার এই কাঁটার যন্ত্রণা ভুগতে হচ্ছে।' মায়ের বাম পায়ে হাঁটুতে বাতের বেদনার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, এজন্য নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহৃত হইত, কিন্তু স্থায়ী উপকার হয় নাই। মায়ের সকল ঔষধেই বিশ্বাস, যে-কেহ যে-কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিত, মা তাহাই ব্যবহার করিতেন, নিজের উপকারের জন্যও বটে, আবার চিকিৎসকের আগ্রহপূরণ ও মনস্তুষ্টির জন্যও বটে। জয়রাম-বাটীতে একঘর নাপিতের বাস; তাহারা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ এবং গ্রামে তাহাদের মান-সম্ভ্রমও ছিল। একদিন নাপিতদের বড়কর্তা মায়ের নিকট আসিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, তাঁহাদের একজন কুটুম্ব আসিয়াছেন, তিনি একবার মাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, মা অনুমতি দিলে তাঁহাকে লইয়া আসিবেন। মা মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতে বলিলে বড়কর্তা গিয়া তাঁহার কুটুম্বকে লইয়া আসিয়া মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইলেন। তখন সকাল বেলা, মায়ের কুটনোকোটা হইয়া গিয়াছে, একটু অবসর আছে। কুটুম্ব আসিয়া প্রণাম করিলে মা তাঁহাকে সমাদরে বারান্দায় বসাইয়া নিজেও কাছে বসিলেন, আপনার কুটুম্বের মতোই কুশল-সমাচারাদি গ্রহণ করিলেন। সুখদুঃখের নানা কথা লইয়া উভয়ের মধ্যে আলোচনা চলিল। আগন্তুক ভদ্রলোক প্রৌঢ়বয়স্ক, সৌম্যদর্শন; পোশাক-পরিচ্ছদ কথাবার্তা ভদ্রজনোচিত। মা তাঁহার সঙ্গে আলাপে প্রীতিলাভ করিলেন। তিনি কবিরাজ, কথাপ্রসঙ্গে মায়ের হাঁটুর বাতের বেদনার কথা শুনিয়া খুব দুঃখিত হইলেন এবং মাকে জানাইলেন তাঁহার একটি ঔষধ জানা আছে, সেই ঔষধ-প্রয়োগে বাতের ব্যথার অনেক উপশম হয়। উহা একটি লতার শিকড় এবং এখানেও পাওয়া যাইতে পারে, মা যদি ব্যবহার করেন তবে তিনি উহা খুঁজিয়া দিতে পারেন। মা খুশী হইয়া ঔষধ ব্যবহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি একজন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া ঝোপজঙ্গল খুঁজিয়া একটি ক্ষুদ্র শিকড় সংগ্রহ করিয়া তাঁহার হাতে দিয়া, একটু আদাসহ শিলে উত্তমরূপে বাটিয়া ব্যথাস্থানে লাগাইবার জন্য বলিলেন। হাত দিয়া ঔষধ না লাগাইবার জন্য তিনি বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেন এবং একটি খড়কের অগ্রভাগ দ্বারা বিন্দুমাত্র ঔষধ ব্যথাস্থানে লাগাইতে বলিয়া গেলেন।•

ঔষধ লইয়া আসিলে মা খুশী হইলেন এবং পূজা ও জলখাওয়া শেষ হইলে পর ঔষধ তৈয়ার করিয়া আনিবার জন্য সেই ব্রহ্মচারী-সন্তানকে আদেশ করিলেন। তিনি সযত্নে ঔষধ প্রস্তুত করিলেন এবং মা উপবেশন করিয়া হাঁটুর কাপড় সরাইয়া যথাস্থান নির্দেশ করিলে সেখানে একটি খড়কের অগ্রভাগ দিয়া একটু ঔষধ লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু হায়! সেই ঔষধ স্পর্শমাত্র মা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভীষণ জ্বালা, যেন আগুনের স্পর্শ, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ফোস্কা পড়িয়া গেল। যিনি ঔষধ লাগাইয়াছিলেন তিনি তো হতভম্ব হইয়া নিরুপায়ভাবে চাহিয়া দেখিতেছেন। মায়ের চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে, যন্ত্রণার স্থানটির পাশে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া আছেন। বাড়ীর লোক সকলে জড় হইয়াছে। কি করা যায়, আলোচনা চলিল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কবিরাজের উদ্দেশে অজস্র কটূক্তি বর্ষিত হইতে লাগিল। মা কিন্তু সেই কবিরাজকে কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ দিলেন না বা একটুও নিন্দা করিলেন না। তিনি নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলিতেছেন, যে-অসুখ কত ঔষধেও সারিতেছে না, তাহা এই সামান্য মুষ্টিযোগে সারিবার দুরাশা কেন করিলেন? কর্মের ফল—অদৃষ্টে দুঃখভোগ থাকিলে এইরকম বুদ্ধি হয়, যোগাযোগও সেরূপ ঘটে ইত্যাদি। আহাম্মকের মতো সেই সন্তানটিও বিষণ্ণ হইয়া পাশেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভাবিতেছেন, মায়ের এত কষ্টের কারণ এই ঔষধটি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া কেন লাগাইলেন তিনিই তো অপরাধী! মা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া একটু ঘি একটি ছোট পাথরের বাটিতে করিয়া আনিতে বলিলেন। ঘি আনা হইলে মা দেখাইয়া দিলে তিনি উহাতে ঠাণ্ডা জল মিলাইয়া পাথরের বাটিতে ফেটাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জল ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন ঠাণ্ডা জল দিয়া পূর্ববৎ ফেটাইতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বার করিতে করিতে উহা ধবধবে সাদা মাখনের মতো এবং খুব ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তখন উহা ধীরে ধীরে জ্বালাস্থানে প্রলেপের মতো লাগাইয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে ঐস্থান স্নিগ্ধ ও জ্বালার উপশম হইল। মায়ের মুখে হাসি দেখা দিলে সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন, মধ্যাহ্নের আহারাদি সম্পন্ন হইল। এই ঔষধেই দিন কয়েকের মধ্যে ফোস্কার ঘা সারিয়া সম্পূর্ণ আরাম হইয়াছিল। মায়ের অসীম ধৈর্য, দুঃখ-বিপদে অবিচলিতচিত্তে কর্তব্যনির্ধারণ এবং সর্বোপরি অপরের প্রতি দোষারোপ না করিতে দেখিয়া সন্তানের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। পূর্বোক্ত প্রকারে ঠাণ্ডা জলে ধৌত ঘৃত বায়ুরোগেরও মহৌষধ; পরবর্তী কালে সন্তানটি নিজের মাথার যন্ত্রণা ও অনিদ্রাদিতে উহা ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছিলেন। অতি স্নিগ্ধকর বস্তু, মাথায় বেশী ব্যবহার করিলে সর্দি লাগিয়া যায়।

কথাপ্রসঙ্গে ভানি পিসীর মুখে শুনিয়াছি মা ছোটবেলায় ছেলোপাটালী (শীতের সময় ঐদেশে হয়) পছন্দ করিতেন। আমরুল শাকের ন্যায় গাঁদালও মা ভালবাসিতেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের পেট ভাল ছিল না, সেজন্য গাঁদালের ঝোল ডালনা করিয়া দিতেন। মঙ্গলবারে ঠাকুর কিছু পোড়া জিনিস খাইতেন। [ক্রমশঃ]

আবাহন

শ্রীমতী মাধুরী রায়

তমসা ঘুচাতে তোমার আবির্ভাব—
তাই কি তোমার জন্ম তামসী রাতে ?
অত্যাচারীর কারাগার ভেঙে দেবে,
শৃঙ্খল তাই বন্দিনী মা'র হাতে ?

মধুর খেলায় বিভোর হে রাখালিয়া
মধু ব্রজধামে নীল যমুনার তীরে—
গোপ-গোপিনীর প্রেমের রাখাল-রাজা
বিরহ-ব্যথায় মিলনানন্দ-নীরে !

মথুরায় তব আরেক মূর্তি হেরি—
শৌর্য-দীপ্ত উজ্জ্বল যৌবন ;
স্বেচ্ছাচারের সৌধ ভাঙিয়া পড়ে,
আবির্ভূত যে কংসের নিসূদন !

বিভবের ছবি হেরি তব দ্বারকায়
ভাস্বর তুমি, হে রাজ-রাজেশ্বর !
মহাসারথির কূটনীতি-চালনায়
কুরুক্ষেত্রে পরাজিত কুরুবর ।

তোমার লীলার অন্ত না পাই খুঁজে
প্রভাসে তোমার এ কি অপরূপ খেলা !
সন্ততি তব হানাহানি করে' মরে—
উদাসীন তুমি—একান্ত অবহেলা !

স্বেচ্ছামৃত্যু আপনি বরিয়া নিলে
হে যুগ-দেবতা, সে যে কত যুগ আগে !
এস তুমি এস আবার এ ধরণীতে
মম অন্তর-রাধা নিরবধি মাগে ।

'সম্ভবামি যুগে যুগে'

শ্রীমতী মানসী বরাট

বসি' সরস্বতী-তীরে, ভাসে সুখে আঁখি-নীরে
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—
যোগ-নিদ্রা ত্যজি' আজ, নামিছেন ধরামাঝ
দেব নারায়ণ ।

শিখি-পুচ্ছ-বাঁধা চূড়া, পরিধানে পীতধড়া
আঁখি দুটি প্রেমের নির্ঝর ।
মোহন মুরলীসুরে, তরঙ্গ-মূর্ছনাভরে
পরিপূর্ণ দূর-দূরান্তর ।

'ডেকেছিলে দ্বৈপায়ন, আসিয়াছি নারায়ণ'
ডাকে যেন নওলকিশোর ।
পুলকে কাঁপিছে অঙ্গ, এবে সুরু লীলারঙ্গ
ঋষিবর ভাবেতে বিভোর ।

পুঞ্জীভূত জ্ঞান যত, গলে তুষারের মত
পরমেশ-পরশে নিমেষে ;
গলিত সে ভাবধারা, বহিয়া আপনহারা
যেন নীল সাগরেতে মেশে ।

অসীম সাগর-নীলে, এক হয়ে যায় মিলে
নয়নমোহন সেই নবঘনশ্যাম ;
পুলকিত দ্বৈপায়ন, আসিছেন নারায়ণ—
গগন পবন ধন্য, ধন্য ধরাধাম !

প্রণমি তোমারে দেব

শ্রীশেফালিকা দেবী

১

নীল নব ঘন মেঘ জমে থরে থরে,
নিকষ তিমিরে ঘেরা গগনের 'পরে।
চমকে দামিনী ভেদি' গভীর আঁধার,
ধরায় আবির্ভাব ঘোষিছে কাহার ?
পাষাণ-প্রাকার ঘেরা কংসকারায়,
ক্ষীণদীপশিখা জ্বলে গভীর নিশায়।
মথুরা নগরী গাঢ় সুপ্তিতে লয়,
শঙ্কিত দুটি প্রাণ শুধু জেগে রয়।
সহসা উজল কারা রূপের প্রভায়,
দেবকী তনয়ে লয়ে অনিমিখে চায়।
অশনি গরজে, বায়ু করে হুঙ্কার,
ধারা জলে যমুনার স্রোত খরধার।
শেষনাগ ধরে ফণা মাথার উপর,
শঙ্কিত জনকের হিয়া থর থর।
অপরূপ নীল শিশু বুকের মাঝার,
বেগে ধায় বসুদেব ভেদিয়া আঁধার।
বসুদেব দেবকীর শোক-তাপ-হারী
প্রণমি তোমারে দেব নররূপধারী।

২

ব্রজমায়ীগণ সবে দেয় করতাল,
নন্দের প্রাঙ্গণে নাচিছে গোপাল।
শিরে-চূড়া শিখি-পাখা চাঁচর চিকুর,
কটিতটে পীত ধটী চরণে নূপুর।
অঞ্জন আঁখিপাতে অধর রাতুল,
মোহনিয়া হাসি আর চাহনি অতুল।
অলকা তিলকা ভালে কানে কুণ্ডল,
মুখশোভা হেরি' হার মানে শতদল।
গলে দোলে তালে তালে মুকুতার হার,
কঙ্কণ করযুগে কি শোভা অপার !
তনু ঘেরি বহে যেন অমিয় নিঝর,
স্বরগ-সুষমা এল নামি ধরা 'পর।
মাগে যবে মেলি' দুই রাঙা করতল,
নবনীত দেয় কেহ কেহ দেয় ফল।
শ্রমজ বিন্দু ভালে মুকুতার দল ;
সযতনে দেয় মুছি' দিয়ে অঞ্চল।
যশোমতী রোহিণীর চিত-মন-হারী
প্রণমি তোমারে দেব নররূপধারী

৩

রবির প্রখর করে বসি' তরুছায় ;
গোপ শিশুগণ রাজা কাহারে সাজায় ?
শ্যামল পাতায় রচে রাজার আসন ;
বসায় তাহার 'পরে কানু প্রাণধন।
কুসুম-কিরীট গাঁথি দেয় শির 'পর,
গুঞ্জাফলের মালা গলে মনোহর।
চারিদিকে করে শোভা যতেক গোধন,
ফলফুল আনে সবে উজাড়ি কানন
রাজার চরণে আনি' দেয় উপহার,
মুরলীর তানে জাগে পুলক অপার।
উছল যমুনা বহে—গোপ শিশুদল
সখা সনে জলকেলি করে কোলাহল।
শিলাসনে বসি করে পুলিন-ভোজন,
কমলপত্রে কেহ করিছে ব্যজন।
মুখে তুলি দেয় কেহ আধ-খাওয়া ফল,
হাসিমুখে চাহে সখা নয়ন চপল।
ধূলিধূসরিত তনু পুলিনবিহারী,
প্রণমি তোমারে দেব নররূপধারী।

৪

শ্রাবণের মেঘ নামে ঘনায় আঁধার,
উছল যমুনা বহে যেন পারাবার।

কেতকী সুবাস মাখি' ফিরিছে পবন ;
বকুল শ্যামল তৃণে রচে আলিপন।
জলদ গরজে শিখী মেলিছে কলাপ,
কুঞ্জ-কাননে করে ঝিল্লী আলাপ।
দাত্বরী সঘনে ডাকে—নীরব চাতক,
নীল নব ঘনে খেলে তড়িৎ-ঝলক।
কদম্ব শিহরিত গুরু দেয়া ডাকে,
দোলার কুসুম-রশি বাঁধা নীপশাখে।
তরুশাখে কেকা করে ময়ূর ময়ূরী,
কুসুম-দোলায় দোলে কিশোর কিশোরী
বায়ুভরে উড়ে পিছে নীল পীত বাস,
সজল জলদে যেন বিজলী-প্রকাশ।
অপরূপ রূপে আলো করে উপবন ;
মুগ্ধ নয়নে ঘিরি হেরে গোপীগণ।
করে বেণু বনমালী নিকুঞ্জ-চারী.
প্রণমি তোমারে দেব নররূপধারী।

৫

মিলিত সমরে যবে কুরু পাণ্ডব,
গগন ভেদিয়া উঠে দুন্দুভি-রব।
সাগরের কল্লোল সম উঠে রোল,
বৃংহণ হ্রেষা রবে দিশি উতরোল।
শ্বেত-হয়-স্যন্দনে উড়িছে কেতন
পার্থ-সারথি আসে শ্যামল-বরণ।
প্রগ্রহ বাম করে দখিণে প্রতোদ,
বেগে রথ ধেয়ে আসে ভেদি' প্রতিরোধ
বায়ুভরে পশ্চাতে দোলে পীত বাস,
প্রসন্ন নিরমল মুখে মৃদুহাস।
উঠে ঘন জয়নাদ কত কোলাহল,
উদ্বেগ নাহি কোন থির অচপল।
কিরীটী স্বজন হেরি' যবে বিহ্বল,
মোহ নাশ করে কেবা জ্বালি জ্ঞানানল।
অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শ্রবণ ব'ধির,
ভেদিয়া উঠিছে কার স্বর গম্ভীর !
জীবের হৃদয় হতে তমোদূরকারী,
প্রণমি তোমারে দেব নররূপধারী।

৬

কার আগমনে আজি উতল সাগর,
প্রভাসতীর্থে লুটে বেলাভূমি 'পর !
উজল রবির করে দশ দিশি ভায়,
কল্লোলে কোলাহলে গগন মাতায়।
যতেক যাদব করে সলিল-বিহার,
হাসি খেলা পান ভোজে পুলক অপার।
কৌতুক রসালাপে কত আহ্লাদ,
ইঙ্গিতে কার ক্রমে ঘনায় বিবাদ !
মত্ত মদিরা পিয়ে যদুবীরগণ,
শরবন ভাঙ্গি সবে করে মহারণ।
একে একে ভূমিশায়ী যতেক স্বজন,
বিকার-বিহীন বসি' হেরে কোন্ জন !
বাম উরু 'পরে রাখি দখিণ চরণ,
তরুতলে বসি' কোন্ ভাবে নিমগন !
তীক্ষ্ণ সায়কে বিঁধে চরণকমল,
অভয় মাগিছে ব্যাধ বসি' পদতল।
তুষিল কিরাতে কেবা দিয়ে প্রেমবারি,
প্রণমি তোমারে দেব নররূপধারী।

পতিতোদ্ধারিণি ! মাতঃ !

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য, সপ্ততীর্থ

পতিতোদ্ধারিণি ! মাতঃ !
পুণ্যতরঙ্গে দুষ্কৃতিভঙ্গে
তব শুভচরণে মম প্রণিপাতঃ।
অপনয় সঞ্চিত-কুমতিকলাপং
পাপনিবারিণি ! হর মে পাপম্।
জ্যোতির্ময়পদভাবিনি ! নিত্যং
দেহি কৃপাময়ি ! চিন্ময়বিত্তম্।
ভবতু ভবার্ণব-মগ্নতনৌ তব
দীনজনে ময়ি দৃষ্টিনিপাতঃ।
পতিতোদ্ধারিণি ! মাতঃ !

ক্ষিতিমণিহারং জ্যোতিরুদারং
সাধক-মানসভবদুপচারম্
শিরসি মমার্পয় ভোগবিষক্ষয়-
পাদযুগং তে ত্রিভুবনসারম্ !
শারদবিধুরিব তব শুভদৃষ্টিঃ
তিমিরবিখণ্ডনমণ্ডলসৃষ্টিঃ
কামহলাহলজর্জরচিত্তে
শান্তিসুধামভিসিঞ্চতু নিত্যে !
তব পদপঙ্কজ-সঙ্গতমানস-
জন্মনিবন্ধনভয়বিনিপাতঃ।
পতিতোদ্ধারিণি ! মাতঃ !

ধনজনতৃষ্ণা-রোগবিনাশন-
ভক্তিরসায়নবিহিতবিধাত্রী
রামকৃষ্ণপদ-শরণ-সমাগত-
কল্পলতামৃতময়ফলদাত্রী
ত্বং পরমেশ্বর-সাধনশক্তিঃ
তিষ্ঠতু তব পদে নিশ্চলভক্তিঃ,
শুদ্ধতপোময়সাধকবন্দ্যে !
যোজয় মামিহ পরমানন্দে।
বিশ্বজনেশ্বরি ! ভগবতি ! শঙ্করি !
শরণমহং তব চিরমায়াতঃ।
পতিতোদ্ধারিণি ! মাতঃ !

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(পঞ্চম পর্যায়)

বল্লভের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'

শংকরের একদিক থেকে চরম মতবাদ 'কেবলাদ্বৈতবাদে'র বিরুদ্ধে অন্যদিক থেকে চরম মতবাদ 'কেবলদ্বৈতবাদ' উপস্থাপিত করলেন সার্থকনামা পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্ব, অত্যন্ত সাহসসহকারে, সকলকে চমৎকৃত ও অভিভূত ক'রে দিয়ে। কিন্তু প্রথম বিস্ময় এবং মুগ্ধতার আবেশ যখন গেল কেটে অনিবার্যভাবেই, তখন জ্ঞানী গুণী চিন্তাশীল যাঁরা, তাঁরা অনেকেই ভাবতে লাগলেন —রোগের চেয়ে চিকিৎসাই যেন হয়ে গেল বেশী —যে ডালে বসা, সেই ডালটিকেই যেন কেটে ফেলা হল নির্বোধের মত—যেহেতু, যে ব্রহ্ম আমাদের আত্মস্বরূপ প্রাণস্বরূপ ভিত্তিস্বরূপ শক্তিস্বরূপ—তাঁরই 'একত্বে' ও 'অদ্বিতীয়ত্বে' ভীত হয়ে এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় অত্যুগ্র-

ভাবে উৎসাহী হয়ে সেই সর্বকারক সর্বপালক সর্বধারক ব্রহ্মকেই ত দেওয়া হ'ল বাদ আমাদের জীবন থেকে; আমাদেরই যেন ক'রে তোলা হ'ল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।২।১)—ব্রহ্ম থেকে সর্বদাই সম্পূর্ণ ভিন্ন; ব্রহ্ম থেকে সর্বদাই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যে, স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে, স্ব স্ব জীবত্বে, এক কথায় স্ব স্ব স্বরূপে গুণে শক্তিতে সম্পূর্ণ বিপরীতরূপে সগৌরবে গ্রহণ ক'রে। এরূপ অদ্ভুত অবস্থা আর কতদিন সহ্য করা যায়!

সেজন্য, মানবপ্রগতির দুর্বার ধারা অনুসারেই ভক্তশ্রেষ্ঠ বল্লভ আবির্ভূত হলেন তাঁর পরিপূর্ণ ভক্তি-প্রীতির অর্ঘ্য সাজিয়ে—সর্বজনকাম্য সর্বজনত্রাতা সর্বজনপ্রিয় ব্রহ্মকেই জীবের জীবনে, জগতের কেন্দ্রে পুনরায় স্থাপিত করতে সাদরে সানন্দে সশ্রদ্ধায়। তিনি বললেন অশেষ কৃতজ্ঞতাভরে একটি সম্পূর্ণ নূতন কথা—ব্রহ্মকে রাখব নিশ্চয়ই ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই সর্বদাই—জীবে-জগতে সর্বত্রই সর্বদাই, কিন্তু সেই সঙ্গে 'মায়া'কেও রাখব কেন অকারণে নিত্যশুদ্ধ নির্মল নিরঞ্জন 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' (ঈশোপনিষদ ৮) ব্রহ্মেরই পাশাপাশি, তাঁকে আবৃত ক'রে? সেজন্য, বল্লভ অকুতোভয়ে ঘোষণা করলেন যে, শংকরের মায়াসমন্বিত অশুদ্ধ ব্রহ্মের পরিবর্তে মায়াবিহীন শুদ্ধ ব্রহ্মকেই পুনঃস্থাপিত করবেন তিনি জীবজগৎসমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডে তার সঙ্গে অভিন্নরূপেই, তাঁর নবমতবাদ সুযোগ্য-নামধারী 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' দ্বারা। এরূপে, বল্লভের অভিনব মতবাদের মূল কথাটিই হ'ল এই যে, অশুদ্ধ 'মায়া'কে সম্পূর্ণরূপে বর্জন ক'রেও 'অদ্বৈত-বাদ'কে সম্পূর্ণরূপেই স্থাপন করা যায় ন্যায়ানুগ ভাবেই। এরূপে, 'দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়ে'র মধ্যে প্রসিদ্ধতম 'পঞ্চ বেদান্ত-সম্প্রদায়ে'র প্রারম্ভেও আমরা পেলাম 'অদ্বৈতবাদ'—এবং পরিশেষেও পুনরায় 'অদ্বৈতবাদ'; কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থেই; এবং বল্লভের তথাকথিত মায়াবিহীন অদ্বৈতবাদ সত্যই কতটা 'অদ্বৈতবাদ' এবং কতটা অন্য কিছু, সে সমস্যারও সম্মুখীন হ'য়ে অবশ্যম্ভাবী ভাবেই।

অন্যান্য বৈদান্তিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বল্লভও বলেছেন যে, ব্রহ্মের মূলীভূত স্বরূপ হ'ল এই যে, তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।২।১); এবং সেজন্য তিনি নিশ্চয়ই নির্বিশেষ, সকল প্রকার ভেদবিহীন অর্থাৎ সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদবিহীন, কিন্তু শাংকর অর্থে নয়, বরং মাধ্ব অর্থে। সর্বব্যাপী ব্রহ্মের যে সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ নেই, তা সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু শংকরের মতে ব্রহ্মের স্বগতভেদও নেই, যেহেতু তিনি সম্পূর্ণরূপেই নিগুর্ণ, নিঃশক্তি ও নিরংশ—তাঁর গুণ শক্তি অংশ প্রভৃতি কিছুই নেই; আছে কেবল শুদ্ধ স্বরূপ বা সত্তা এবং সেজন্যই তিনি নির্বিশেষ। রামানুজ ও নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মের যেরূপ স্বরূপ আছে, সেরূপ গুণ শক্তি অংশাদিও আছে এবং এগুলিই তাঁর স্বগতভেদ ব'লে তিনি সবিশেষ। মধ্বের মতেও ব্রহ্মের যেরূপ স্বরূপ আছে, সেরূপ গুণ শক্তি অংশ নাম রূপ লোক দেহ ভূষণাদি ও লীলাও আছে; কিন্তু এ সবই তাঁর স্বরূপের সঙ্গে এক ও অভিন্ন ব'লে এগুলি তাঁর স্বগতভেদ নয়; সেজন্য তিনি নির্বিশেষ। এই দিক্ থেকে, বল্লভের মতবাদও মধ্বের মতবাদেরই সমতুল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলীভূত প্রভেদ এই যে, মধ্বের মতে জীব-জগৎ ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; বল্লভের মতে, সম্পূর্ণ অভিন্ন। আমরা দেখেছি যে (চতুর্থ পর্যায়ে), মধ্বের এই মতবাদ স্ববিরোধদোষদুষ্ট, যেহেতু তাঁর মতে, জীব-জগৎ ব্রহ্মের গুণ-শক্তি-অংশরূপে তাঁর সঙ্গে এক ও অভিন্ন; অথচ জীব-জগৎ যে ব্রহ্ম থেকে চিরভিন্ন, তা মধ্বেরই

নিজের একটি মূলীভূত মতবাদ। একই ভাবে, আমরা দেখব যে, বল্লভের মতবাদও স্ববিরোধ-যেহেতু তাঁকেও অভেদের পার্শ্বে ভেদকেও স্বীকার ক'রে নিতেই হয়েছে।

বল্লভের মতে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপ। অর্থাৎ তিনি অনন্ত-দিব্য-গুণবিমণ্ডিতরূপে 'সগুণ'; প্রাকৃত বা সাংসারিক গুণবিবর্জিত-রূপে 'নির্গুণ'। বল্লভের এই মতবাদও একটি অভিনব মতবাদ, যেহেতু এটি পূর্বের চারটি বেদান্ত-সম্প্রদায়ের মতবাদের সমতুল নয়। শংকরের মতবাদ ত শুদ্ধনির্গুণত্ববাদ, যেহেতু তাঁর মতে আমরা যা পূর্বেই দেখেছি (প্রথম পর্যায়ে), ব্রহ্মের গুণ শক্তি প্রভৃতি একেবারেই নেই, কেবল স্বরূপই মাত্র আছে। রামানুজ-নিম্বার্কের মতে ব্রহ্ম অনন্তকল্যাণগুণবিমণ্ডিত-রূপে 'সগুণ' এবং সকলহেয়গুণবিবর্জিতরূপে 'নির্গুণ' হ'লেও তাঁকে 'নির্গুণ' না বলাই ভালো, যেহেতু তাতে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হতে পারে; সেজন্য, যেখানে শ্রুতিতে 'নির্গুণ' শব্দটি আছে, সেখানে তার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই কেবল তাঁকে সকলহেয়গুণবিবর্জিতরূপে 'নির্গুণ' বলা যেতে পারে। মধ্বের মতে ব্রহ্ম কেবলই নির্গুণ, সগুণ নন, যেহেতু তাঁর স্বরূপ ও গুণ এক ও অভিন্ন।

এই প্রসঙ্গে বল্লভ আরেকটি নূতন কথাও বলেছেন। আমরা দেখেছি যে, তাঁর মতে গুণ ও গুণী, শক্তি ও শক্তিমান, অংশ ও অংশী অভিন্ন। এই দিক্ থেকে, ব্রহ্ম 'নির্গুণ', যেহেতু তাঁর স্বরূপ ও গুণ এক ও অভিন্ন। সেজন্য, যাঁরা ব্রহ্মের এরূপ শুদ্ধাদ্বৈত রূপটি দর্শন অথবা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করেন, তাঁদের নিকট স্বভাবতই ব্রহ্ম 'নির্গুণ' (নিম্নে ব্রহ্মের 'অক্ষর-রূপ' দেখুন)। কিন্তু যাঁরা ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশের দিক্‌টিই অধিক দর্শন বা উপলব্ধি করেন, তাঁদের নিকট স্বভাবতই ব্রহ্ম 'সগুণ', অনন্ত-কল্যাণগুণাশ্রয়।

পরবর্তী অচিন্ত্যভেদাভেদবাদিগণের ন্যায় বল্লভও ব্রহ্মের অনন্ত-অচিন্ত্য-গুণশক্তির কথা বারংবার বলেছেন; এবং সেই সঙ্গে বলেছেন যে, ব্রহ্মে বিরুদ্ধ গুণশক্তির সমন্বয় সম্ভবপর এবং এরূপ সর্ববিরুদ্ধধর্মাশ্রয়ত্ব বরং তাঁর ভূষণ ও অকল্পনীয় মহিমা-গরিমারই প্রকাশক।

অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকের ন্যায় বল্লভের মতেও ব্রহ্মই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; এবং সেজন্য ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নন, পরিপূর্ণভাবে সক্রিয়। বল্লভও পরিণামবাদী। কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্ম জীব-জগতে আপাতদৃষ্টিতে নয়, যথার্থভাবেই পরিণত হ'লেও স্বয়ং অপরিণতই থাকেন এবং এই অবিকৃত-পরিণামবাদ তত্ত্বটি —যা প্রমাণ করা সত্যই অতি কঠিন এবং যা পরিণামবাদী বৈদান্তিকগণের প্রধানতম স্ববিরোধদোষ—বল্লভ-বেদান্তের একটি মূলীভূত তত্ত্ব, যার সাহায্যেই তিনি তাঁর অভিনব 'শুদ্ধা-দ্বৈতবাদ'-স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন।

এরূপে, 'কর্তৃত্ব' পরমেশ্বরের সত্যাদিধর্মের ন্যায় একটি স্বাভাবিক ধর্ম; এবং এটি লৌকিক নয়, অলৌকিক কর্তৃত্ব; সেজন্য, এক্ষেত্রে দেহাদির সঙ্গে 'অধ্যাসে'র কোনোরূপ প্রয়োজন নেই, নেই কোনো সাংসারিক ধর্মের।

একই ভাবে, ব্রহ্ম ভোক্তা; কিন্তু স্বভাবতই এস্থলেও লৌকিক অর্থে নয়, অলৌকিক অর্থে। অর্থাৎ, তাঁর ভোগ কর্মফলভোগ নয়, স্বীয় নিত্যোৎসারিত স্বরূপভূত আনন্দরসের উপভোগই মাত্র।

রামানুজ-নিম্বার্ক প্রমুখ ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায় বল্লভের মতেও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সৎ চিৎ ও আনন্দ একাধারে স্বরূপ ও গুণ উভয়ই। অর্থাৎ, ব্রহ্ম একাধারে সৎস্বরূপ ও

সত্তাবান, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, আনন্দস্বরূপ ও আনন্দময়।

অতএব, ব্রহ্ম জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা, অবশ্য—যা পূর্বেই বলা হ'ল—লৌকিক অর্থে নয়, সম্পূর্ণরূপেই অলৌকিক অর্থেই কেবল। সেজন্য, তাঁর জ্ঞানও পার্থিব নিয়মানুসারে দেহেন্দ্রিয়-সাধ্য বাহ্যিক বিষয়ের জ্ঞান নয়—দেহেন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ স্বীয় স্বরূপের পরিপূর্ণ নির্বাধ অনন্ত অসীম দিব্য জ্ঞান।

বল্লভের মতে, ব্রহ্মের ত্রিবিধ রূপ: (১) 'আধিদৈবিক'রূপ, (২) 'অক্ষর'রূপ ও (৩) 'অন্তর্যামী'রূপ। আধিদৈবিকরূপে ব্রহ্ম গোলোকাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা পুরুষোত্তম এবং অসংখ্য অচিন্ত্য অনন্ত অসীম অপার্থিব অত্যাশ্চর্য অনির্বচনীয় অলৌকিক পারমার্থিক দিব্য গুণ ও শক্তির শ্রেষ্ঠ আধার। তা সত্ত্বেও, পূর্বেই যা বলা হ'ল—মধ্বের ন্যায় বল্লভের মতেও ব্রহ্মের স্বরূপ গুণ শক্তি লীলা বা ক্রিয়া, দেহ ভূষণ নাম ও লোকাদি সম্পূর্ণ অভিন্ন ব'লে ব্রহ্ম স্বগতভেদ-হীন। পূর্বের ন্যায় এক্ষেত্রেও শংকর ও বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতস্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শংকরের মতে ব্রহ্ম শুদ্ধাদ্বৈতস্বরূপ, কারণ তাঁর কেবলমাত্র স্বরূপই আছে, গুণ শক্তি প্রভৃতি একেবারে কিছুই নেই। কিন্তু বল্লভের মতে ব্রহ্ম শুদ্ধাদ্বৈতস্বরূপ, কারণ তাঁর স্বরূপ এবং গুণ শক্তি প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে এবং শাশ্বতকালই এক ও অভিন্ন—যা পূর্বেই বলা হ'ল।

কিন্তু সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবেই বল্লভ দিব্যি মনের সুখে বলছেন যে, এই যে সর্বানন্দাধার গোলোকধাম, সেখানে ত ব্রহ্ম একাকী চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না—কারণ তাহ'লে তাঁর আনন্দময়ত্ব বৃথাই হয়ে যাবে, যদি তিনি তাঁর সেই গভীরতম পবিত্রতম পূর্ণতম আনন্দকে প্রকাশিত করতে না পারেন দিব্যক্রীড়ার মাধ্যমে তাঁর ভক্তগণের সঙ্গে। সেজন্য, বল্লভের মতে এই অপূর্ব আনন্দলোক গোলোকধামে শ্রেষ্ঠ ভক্তগণের সঙ্গে দিব্যলীলায় অথবা আধ্যাত্মিক ক্রীড়ায় রত হয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিজেও পরমানন্দ লাভ করেন, অন্যদেরও পরমানন্দ দান করেন। কিন্তু তাঁর গুণ-শক্তি-অংশাদিস্বরূপ জীব যদি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপেই অভিন্নই থাকেন, তাহ'লে পুনরায় তাঁর সঙ্গে লীলা বা ক্রীড়া করবেন কিরূপে, যেহেতু ক্রীড়ার জন্য অবশ্য প্রয়োজন অন্ততঃ দু'জন—অথচ সেই দু'জন একেবারেই নেই বল্লভের নিজের মতেই!

সে যা হোক, এইসব কূটতর্ক ছেড়ে আমরা প্রচেষ্টা করি পুণ্য-ধন্য-অনন্য গোলোকধামে ব্রহ্মের সঙ্গে মুক্তজীবগণের ক্রীড়া ও তজ্জনিত অনির্বচনীয় আনন্দের বিষয় কিছুমাত্র ধারণা করতে। শ্রীকৃষ্ণের এই গোলোক বা বৈকুণ্ঠের নাম 'ব্যাপি-বৈকুণ্ঠ' এবং এটি বিষ্ণুর গোলোক বা বৈকুণ্ঠ থেকে বহুল পরিমাণে উচ্চতর; এবং বৃন্দাবন সহিত গোলোকও এই 'ব্যাপি-বৈকুণ্ঠে'রই অন্তর্গত। শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ এই মধুর-মোহন শান্ত-স্নিগ্ধ শ্যামল-কোমল শীতল-বিমল কুঞ্জ-শোভিত বিহগ-কূজিত যমুনা-পুলিনস্থ দিব্য-ধাম 'ব্যাপি-বৈকুণ্ঠে'রই ধন্য অধিবাসী; এবং এই আনন্দরসঘন সুধাসিঞ্চিত মধুময় অমৃতসিক্ত পরমসুন্দর স্থানে তাঁরা গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মধুরতম রাসক্রীড়ায় রত হন পরমানন্দে; এবং চিরকাল সেই অনিন্দ্য অমেয় অনুপম ব্রহ্মানন্দেই নিমজ্জিত হয়ে থাকেন পরিপূর্ণভাবে। সুতরাং ব্রহ্মের এই 'আধিদৈবিক' রূপ প্রধানতঃ আনন্দরূপ—তাঁর সৎ-রূপ ও চিৎ-রূপের পূর্ণতম প্রকৃষ্টতম প্রশস্ততম আনন্দরূপ।

ব্রহ্মের দ্বিতীয় রূপ—'অক্ষর' রূপ। এই অবস্থায় ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, বিভু ও নির্গুণ—কারণ, এই অবস্থায় ব্রহ্ম স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা

তাঁর গুণাবলী আবৃত ক'রে রাখেন; বিশেষ ক'রে তাঁর 'আনন্দ'রূপ গুণটি তাঁর 'সৎ' ও 'চিৎ'রূপ গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। অবশ্য, আমরা উপরে দেখেছি যে, বল্লভ-মতে, ব্রহ্ম এই কারণে নিগুর্ণ যে, তাঁর অসংখ্য অচিন্ত্য অনির্বাচ্য গুণসমূহ তাঁর স্বরূপের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপেই এক ও অভিন্ন। সেজন্য, শেষ পর্যন্ত বলা চলে যে, ব্রহ্মের কেবল স্বরূপই আছে—গুণাবলীর সঙ্গে অভিন্ন স্বরূপই আছে; তাঁর গুণাবলী স্বরূপ থেকে ভিন্ন—স্বতন্ত্র নয়। কিন্তু 'অক্ষর' রূপের ক্ষেত্রে ব্রহ্মের গুণাবলীই নেই, যেহেতু সাময়িকভাবে, তারা তখন ব্রহ্মকর্তৃক আচ্ছাদিত হয়ে থাকে।

কিন্তু ব্রহ্ম হঠাৎ এরূপভাবে স্বীয় গুণাবলী আবৃত ক'রে ফেলেন কেন? তার উত্তর হ'ল এই যে, তিনি অত্যন্ত ভক্তবৎসল; এবং সেজন্য, তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রবৃত্তি-আকৃতি-শক্তি-বিশিষ্ট ভক্তগণের তৃপ্তির জন্য বিভিন্ন রূপেই তাঁদের নিকট বিশেষভাবে প্রকটিত হন। যেমন, যাঁরা অতিশয় ভাবপ্রবণ—আবেগোচ্ছ্বাস-চালিত, তাঁরা স্বভাবতই ব্রহ্মকে লাভ করতে চান একটি নিবিড় ভাবরসঘন আনন্দোৎফুল্ল প্রীতিপ্রসন্ন পরিবেশে—যেক্ষেত্রে তিনি কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপই নন, সেই সঙ্গে অনন্ত-অসীম-অচিন্ত্য মধুর-মোহন গুণাবলীরও শ্রেষ্ঠ সমাহার—যেমন প্রেম সৌখ্য দয়া ক্ষমা লীলাময়তা মুগ্ধকারিতা আকর্ষণশীলতা চমৎকারিতা প্রভৃতির। কিন্তু যাঁরা ভাব নয়, ভাবনা; ভক্তি নয়, জ্ঞপ্তি; আবেগোচ্ছ্বাস নয়, স্থির-ধীর-শান্ত-সমাহিত অবস্থারই অধিক অনুরাগী, তাঁরা স্বভাবতই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে চান নিগুর্ণ, নির্বিশেষ জ্ঞানরূপেই মাত্র—ব্রহ্মের সঙ্গে ভাবরসঘন আবেগোচ্ছ্বাসব্যাকুল রাসক্রীড়ায় তাঁদের আসক্তি নেই, আসক্তি আছে কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের চিৎ অথবা জ্ঞানস্বরূপটিই বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করতে। সেজন্য যদিও পরিশেষে ভক্ত জ্ঞানী থেকে সহস্রগুণ শ্রেয়:—যেহেতু একমাত্র তিনিই ত ব্রহ্মের অত্যন্ত নিকটবর্তী হন প্রেমে সৌখ্যে লীলায় খেলায়—তা হ'লেও পরম করুণাময় ব্রহ্ম জ্ঞানিগণকেও তৃপ্ত ও ধন্য করতে তাঁদের নিকট প্রধানত: জ্ঞানস্বরূপভাবে আবির্ভূত হন।

ব্রহ্মের তৃতীয় রূপ—'অন্তর্যামী' রূপ। এই রূপে ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা জগল্লীন এবং অবতার। ব্রহ্ম প্রাকৃত সত্ত্ব রজ: ও তম: গুণ বর্জিত হ'লেও তাঁর বিশুদ্ধ সত্ত্ব বিশুদ্ধ রজ: ও বিশুদ্ধ তম:—এই তিনটি অপ্রাকৃত গুণ আছে। যখন সর্বান্তর্যামিরূপে ব্রহ্ম জীবজগতে, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হতে ইচ্ছুক হন, তখন তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত সত্ত্বকে বিগ্রহ ক'রে লৌহগোলকান্তর্গত অগ্নির ন্যায় তাতে প্রবেশ ক'রে 'বিষ্ণু'রূপ ধারণ করেন; স্বীয় বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত রজোগুণকে বিগ্রহ ক'রে পূর্ববৎ তাতে প্রবেশ ক'রে 'ব্রহ্মা'-রূপ ধারণ করেন; এবং স্বীয় বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত তমোগুণকে বিগ্রহ ক'রে পূর্ববৎ তাতে প্রবেশ ক'রে 'শিব'রূপ ধারণ করেন। সেজন্য, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ব্রহ্মের 'গুণাবতার' নামে পরিচিত; এবং সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের বিশেষ অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা।

বল্লভমতে দ্বিতীয় তত্ত্ব চিৎ অথবা জীব ব্রহ্মেরই ন্যায় জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞাতা কর্তা ভোক্তা শুদ্ধ নিত্য প্রভৃতি; কিন্তু পরিমাণে অণু অথবা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং সংখ্যায় বহু। অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায় বল্লভের মতেও অণু হ'লেও, জীব স্বীয় সর্বব্যাপী জ্ঞানগুণদ্বারা সর্বশরীরব্যাপী। যেমন চন্দনবিন্দু শরীরের একটি ক্ষুদ্রতম অংশে অবস্থিত হয়েও সর্বশরীরকে শীতল ও সৌরভময় করে, যেমন একটি ক্ষুদ্র

মণির প্রভাও বহুদূরে প্রসারিত হয়, যেমন একটি ক্ষুদ্র পুষ্পের সৌরভও দিগ্‌বিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়।

রামানুজ জীবকে বিশেষভাবে ব্রহ্মের গুণ; নিম্বার্ক, কার্য এবং মধ্ব, প্রতিবিম্ব (শাংকর অর্থে নয়) ব'লে গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে বল্লভ জীবকে বিশেষভাবে বলেছেন ব্রহ্মের অংশ। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি পরমেশ্বরের সৎ অংশ থেকে জগৎ বা জড়বস্তু; চিৎ অংশ থেকে জীব; এবং আনন্দ অংশ থেকে অন্তর্যামীর আবির্ভাব হয়। সেজন্য, জীব ব্রহ্মের ন্যায় সৎ ও চিৎ হ'লেও আনন্দ নয়; কারণ, ব্রহ্মের আনন্দ-গুণ তিরোহিত হ'লেই ব্রহ্ম জীবরূপ ধারণ করেন।

এক্ষেত্রে শংকর-রামানুজ-নিম্বার্কের সঙ্গে বল্লভের আছে একটি মূলীভূত প্রভেদ। রামানুজ-নিম্বার্কের মতে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম, তাঁর সমগ্র সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ-সহকারেই জীবে নিহিত হয়ে আছেন শাশ্বতকাল। শংকরের বিবর্তবাদ এবং রামানুজ-নিম্বার্কের পরিণামবাদ অনুসারে কেবল সংসারকালে বা বদ্ধাবস্থায়, অজ্ঞান-কবলিত জীব অজ্ঞানাবরণ ভেদ ক'রে নিজের সেই শাশ্বত সচ্চিদানন্দস্বরূপ-ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করতে পারে না। সেজন্য, বদ্ধাবস্থায়, ব্রহ্মের কেবলমাত্র আনন্দ-গুণের তিরোধানের কোনো প্রসঙ্গই শংকর-রামানুজ-নিম্বার্ক-বেদান্তে নেই।

অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায় বল্লভের মতেও জীব ত্রিবিধ—শুদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত। 'শুদ্ধ' জীব কোনোদিনও অবিদ্যা-কলুষিত হন না ব'লে কোনোদিনও সংসার-ভাগীও হন না, বা সংসারে জন্মগ্রহণও করেন না। সেজন্য তিনি পরমৈশ্বর্যবান ও নিত্যমুক্ত। 'সংসারী' জীব স্বীয় অবিদ্যানিবন্ধন ও সকাম কর্মের ফলে সংসারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এ'দের মধ্যে যাঁরা সদ্‌বাসনাবিশিষ্ট, তাঁরা সাধনবলে মুক্তিলাভে অধিকারী; যাঁরা অসদ্‌-বাসনাবিশিষ্ট, তাঁরা নন। 'মুক্ত' জীব সাধন-বলে অধুনা সংসারপাশমুক্ত ও জন্মজন্মান্তর-রহিত।

বল্লভ জীবকে ব্রহ্মের কার্যও বলেছেন এবং সেই দিক্ থেকে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

বল্লভমতে অচিৎ দ্বিবিধ—প্রকৃতি ও কাল প্রকৃতিই জড়জগতের মূলীভূত কারণ। জগৎ জীবের ন্যায়ই সত্য, নিত্য; ব্রহ্মের অংশ ও কার্য বা পরিণাম এবং সেজন্য ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন। কিন্তু জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় সৎ হ'লেও চিৎ ও আনন্দ নয়, যেহেতু ব্রহ্মের চিৎ- ও আনন্দ-গুণ তিরোহিত হ'লেই ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হন।

রামানুজ-নিম্বার্কপ্রমুখ অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায় বল্লভের মতেও ব্রহ্ম জীব-জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদানকারণ; এবং তিনি লীলাভরে স্বীয় পরমানন্দের বিকাশরূপ ক্রীড়ার জন্য জীবজগৎ সৃষ্টি করেন—কি উপায়ে তা পূর্বেই বলা হয়েছে—অর্থাৎ তিনি তাঁর অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা স্বীয় আনন্দ-গুণকে আবৃত ক'রে জীব; এবং স্বীয় চিৎ- ও আনন্দ-গুণকে আবৃত ক'রে জগতের সৃষ্টি করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অন্যান্য পরিণাম-বাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায় বল্লভের মতেও ব্রহ্ম জীবজগতে সত্যসত্যই পরিণত হ'লেও স্বয়ং অবিকৃতস্বরূপই থাকেন; সুতরাং, তিনি তাঁর মতবাদের নাম দিয়েছেন 'অবিকৃত পরিণাম-বাদ'। বস্তুতঃ, পরিণাম দ্বিবিধ। প্রথম ক্ষেত্রে, কারণ কার্যে পরিণত হ'লেও অবিকৃতস্বরূপই থাকে - যেমন সুবর্ণ-পিণ্ড সুবর্ণ-কুণ্ডলে পরিণত হ'লেও সুবর্ণস্বরূপই থাকে, তাতে অন্য কোনো

বিরুদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হয় না, এবং সেজন্য সুবর্ণ-কুণ্ডল থেকে সুবর্ণ-পিণ্ড ফিরে পাওয়া যায় অনায়াসে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, কারণ কার্যে পরিণত হ'লে কারণের স্বরূপেরও বিকৃতি হয় এবং তাতে অন্যান্য বিরুদ্ধ ধর্মেরও আবির্ভাব হয়—যথা দুগ্ধ দধিতে পরিণত হ'লে তার নিজস্ব তরলত্ব মধুরত্ব প্রভৃতি গুণ তিরোহিত হয়ে গাঢ়ত্ব অম্লত্ব প্রভৃতি নূতন গুণের আবির্ভাব হয়; এবং সেজন্য দধি থেকে পুনরায় দুগ্ধে ফিরে যাওয়া যায় না।

একই ভাবে জীব ও জগতের সৃষ্টিকালে পরমকারণ ব্রহ্ম যথাক্রমে স্বীয় আনন্দ, এবং চিৎ- ও আনন্দ-গুণকে সাময়িকভাবে আবৃত করেন মাত্র—সত্যই তাদের বিলোপও ঘটে না, তাদের স্থলে ব্রহ্মে অন্য কোনো বিরুদ্ধ গুণের উদয়ও হয় না, এবং ব্রহ্ম আদ্যন্তকাল সচ্চিদানন্দ-স্বরূপই থাকেন, অবিকৃতস্বরূপই থাকেন।

এরূপে জীবজগৎ যদি ব্রহ্মের অবিকৃত-পরিণামই হয়, তা হ'লে তারা ব্রহ্মেরই ন্যায় নিত্য ও সত্য—শংকরের জগন্মিথ্যাত্ববাদ সম্পূর্ণ-রূপেই ভ্রান্ত। বল্লভের মতে শংকরের তথাকথিত 'কেবলাদ্বৈতবাদ' প্রকৃতকল্পে আদ্যোপান্ত দ্বৈত-বাদ, যেহেতু শাংকরমতোক্ত অবিদ্যাস্বরূপ 'মায়া' জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দ্বিতীয় তত্ত্ব হতে বাধ্য।

বল্লভের মতে 'মায়া' এবং 'অবিদ্যা' একার্থ নয়, সম্পূর্ণ ভিন্নস্বরূপ। 'মায়া' ব্রহ্মগত, ব্রহ্মের 'সর্বভবনসামর্থ্যরূপা' সর্বসৃষ্টিসমর্থ অচিন্ত্যশক্তিই মাত্র। এই অনুপম শক্তির সাহায্যেই তিনি এই সুবিশাল বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেন—পূর্বেই যা বলা হ'ল—স্বীয় আনন্দের প্রকাশরূপ ক্রীড়ার জন্য। সুতরাং 'মায়া' যেরূপ সত্য, মায়াসৃষ্ট 'জগৎ'ও ঠিক সেরূপই সত্য—'মায়া' অবিদ্যা-স্বরূপও নয়, 'জগৎ'ও মিথ্যা নয়।

অপরপক্ষে, 'অবিদ্যা' জীবগত; এবং তা ভ্রান্তজ্ঞানেরই হেতু হতে পারে, মিথ্যা বস্তুর কদাপি নয়। এরূপ অবিদ্যার দুটি শক্তি: ব্যামোহিকা—যা জীবের বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করে এবং আচ্ছাদিকা—যা সেই বস্তুটির স্বরূপ আচ্ছাদিত করে—যার জন্যই জীব সেই বস্তুটির সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হয়। কিন্তু তার নিজের দিক্ থেকে এরূপ ভ্রান্তজ্ঞান হ'লেও, সেই বস্তুটি ত স্বয়ং মিথ্যা হয়ে যায় না—যেমন, রজ্জু-সর্প ভ্রমকালে জীবের মনে ভ্রান্ত সর্পজ্ঞানের উদ্ভব হলেও মিথ্যা সর্পের সৃষ্টি এস্থলে কদাপি হয় না—বল্লভের মতে এইটিই হল শংকরের মূলীভূত ভ্রম।

বল্লভের মতে এরূপ জীবগত 'অবিদ্যা'ই 'সংসারে'র কারণ। অবিদ্যাকবলিত জীব সকাম-কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে কর্মবাদানুসারে বারংবার প্রত্যাবর্তন ক'রে অনাদি সংসারচক্রেই বিঘূর্ণিত হয় এবং ক্ষুদ্র সংকীর্ণ 'অহং-মম'-ভাবের বশীভূত হয়ে নিজেকে স্বাধীন স্বতন্ত্র কর্তারূপেই গ্রহণ ক'রে ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হয়। এরূপে 'সংসার' জীবগত 'অবিদ্যা'রই ফল এবং এরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত 'অহং-মম'-ভাবান্বিত ভ্রান্ত জীব মায়াশক্তির সাহায্যে ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এই সুন্দর জগতে স্বীয় অসত্য অবিদ্যা ও সংকীর্ণ অহংকার-সৃষ্ট ক্ষুদ্র দুঃখক্লিষ্ট অশুদ্ধ অসত্য সংসারের সৃষ্টি করে। সেজন্য, ঈশ্বরগত 'মায়া'র কার্য 'জগৎ' এবং জীবগত 'অবিদ্যা'র কার্য 'সংসার' সম্পূর্ণ পৃথক্—জগৎ ঈশ্বরকার্যরূপে সত্য ও নিত্য—তার আবির্ভাব-তিরোভাব আছে, বিলোপ নয়; কিন্তু সংসার জীবের অবিদ্যার ফলরূপে অসত্য—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে অবিদ্যানিবৃত্তি হ'লে এই 'সংসারে'রই বিলয় হয়, 'জগতে'র নয়।

এরূপে, বল্লভের মতে 'মায়া' ও 'অবিদ্যা', 'জগৎ' ও 'সংসার' এক নয়—কিন্তু শংকর এই

মূলীভূত প্রভেদ বুঝতে না পেরেই জগৎকেও অকারণে মিথ্যা ব'লে গ্রহণ ক'রে যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেছেন।

বল্লভের মতে ব্রহ্ম কারণ ও অংশী, জীবজগৎ কার্য ও অংশ ; এবং কারণ ও কার্য, অংশী ও অংশ সম্পূর্ণ অভিন্ন ব'লে ব্রহ্ম ও জীবজগৎও ঠিক তাই। বস্তুতঃ, স্বয়ং ব্রহ্মই জীবজগতে অবিকৃত-স্বরূপসহ পরিণত হয়ে জীবজগৎরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সেজন্য, জীবজগৎ ব্রহ্মের অবস্থা-বিশেষ বা রূপভেদই মাত্র। কিন্তু একই বস্তু দুটি অবস্থা বা রূপের জন্য দু'ভাবে প্রতীত হলেও, দুটি বস্তু হয়ে যায় না—চিরকাল সেই একই বস্তু থাকে ; যেমন, কুণ্ডলীকৃত সর্প ও প্রসারিত সর্প একই সর্পের দুটি অবস্থা বা রূপ-ভেদমাত্রই ব'লে সম্পূর্ণরূপেই এক ও অভিন্ন। সমভাবে, জীবজগৎ স্বয়ং ব্রহ্মের দুটি অবস্থা বা রূপভেদমাত্রই ব'লে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, সচ্চিৎস্বরূপ জীব ও সৎস্বরূপ জগৎ সম্পূর্ণরূপেই এক ও অভিন্ন।

বল্লভ এক্ষেত্রে সগৌরবে বলছেন যে, এইটিই হ'ল বেদান্তদর্শনে তাঁর নূতন দান—অশুদ্ধ মায়া-সংস্পর্শ ব্যতীতই ব্রহ্ম যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তা পরিপূর্ণ ন্যায়ানুমোদিত ভাবেই প্রমাণিত করা। অর্থাৎ, যেক্ষেত্রে শংকর বলছেন, ব্রহ্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', যেহেতু জীবজগৎ মিথ্যা, সেক্ষেত্রে বল্লভ বলছেন যে, ব্রহ্ম 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্', যেহেতু জীবজগৎ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। এরূপে, অশুদ্ধ মায়ার সাহায্য ব্যতিরেকেও ব্রহ্মের মূলীভূত একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বকে অনায়াসে রাখা যায়, এই বিশ্বাসে বল্লভ তাঁর সাহসী তেজস্বী মতবাদের যোগ্য নাম দিয়েছেন 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'।

কিন্তু হায়! পূর্বেও যা আমরা বহুবার দেখেছি, এক্ষেত্রেও ঠিক তাই দেখি—যত বড় নৈয়ায়িকই হোন না কেন 'জীব'কে যেন কেউই ঠিকমত ব্যাখ্যা ক'রে উঠতে পারেন না। কারণ, একদিকে জীব ব্রহ্মস্বরূপ ব'লে ব্রহ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্ন ; অন্যদিকে জীব একটি স্বতন্ত্র সত্তা ব'লে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নও নিশ্চয়—তিনি তাঁর সমস্ত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বর্জন ক'রে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যেতে চান না। সুতরাং নিরুপায় হয়ে রামানুজ-নিম্বার্ক 'অভেদ' ও 'ভেদ' উভয়কেই রেখেছেন, এবং তজ্জন্য বহু অসুবিধারও সম্মুখীন হয়েছেন। সেই ভয়ে মধ্ব 'অভেদ'কে এবং বল্লভ 'ভেদ'কে বাদ দিয়ে নূতন ক'রে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলেন সাহসভরে—কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত, মধ্বকেও 'অভেদ' এবং বল্লভকেও 'ভেদ'কে 'হরে দরে' মেনে নিতেই হ'ল। সেজন্য 'শুদ্ধা-দ্বৈতবাদ' সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেছি, শংকরকেও অতিক্রম ক'রে—এই গৌরবের দাবী ক'রেও বল্লভও বলছেন যে, বদ্ধ জীব অণু, ব্রহ্মের কার্য ও অংশ, সৃষ্ট্যাদিশক্তিহীন, ব্রহ্মের প্রেমিক ও সেবক, এবং ব্রহ্মের 'আনন্দাংশে'র প্রকাশ নয় ব'লে দুঃখক্লিষ্ট—অতএব বদ্ধ জীব নিশ্চয়ই ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। এমন কি, মুক্ত জীবও অণু, সৃষ্ট্যাদিশক্তিরহিত, ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মের উপাসক, ব্রহ্মের সেবক, ব্রহ্মের প্রেমিক, ব্রহ্মের দাসানুদাস—অর্থাৎ, ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন (নিম্নে দেখুন)। একই ভাবে, জগৎও ব্রহ্মের কার্য ও অংশ, এবং ব্রহ্মের 'চিদানন্দাংশে'র প্রকাশ নয় ব'লে জড় ও নিরানন্দ। সেজন্য, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ পরমকারণ সর্বব্যাপী নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যতৃপ্ত নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম এবং জীব ও জগৎ—যারা তা নয়—নিশ্চয়ই পরস্পর ভিন্নও সমভাবে।

সে যাহোক, বল্লভমতে, যা আমরা পূর্বেই দেখেছি—জীবগত অবিদ্যাই সংসারের কারণ। জীব চিরকালই ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন, ব্রহ্মের

অধীন, ব্রহ্মের সেবক, ব্রহ্মের দাস। কিন্তু অসত্য 'অহং-মম'-ভাবের বশবর্তী হয়ে বদ্ধজীব নিজেকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, স্বাধীন কর্তা ও স্বতন্ত্র দ্বিতীয়সত্তা ব'লে গ্রহণ ক'রে সকাম কর্ম ক'রে বারংবার সংসারেই প্রত্যাবর্তন করেন—এই হ'ল 'বদ্ধাবস্থা' বা 'সংসারচক্র'। অবিদ্যা-নিবৃত্তি হ'লে এরূপ অসত্য সংসার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বল্লভমতে জীবের নিকট জগৎ-প্রপঞ্চ তিনটি রূপে প্রতিভাত হয়:

(১) মুক্তজীব ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন ব'লে জগৎও তাঁর নিকট ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন এবং সেজন্য ব্রহ্মেরই ন্যায় শুদ্ধ পূর্ণ নিত্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব'লে বোধ হয়।

(২) জ্ঞানী বা শাস্ত্রজ্ঞ জীবের নিকট জগৎ ব্রহ্মধর্মী ও মায়াধর্মী— এই উভয়রূপেই প্রতিভাত হয়। আমরা উপরে দেখেছি যে, 'মায়া' ব্রহ্মের সর্বসৃষ্টিকারিণী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি। এই মায়াসৃষ্ট জগৎকে জ্ঞানীরা ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন ও ভিন্ন উভয় রূপেই দর্শন করতে বাধ্য হন, যদিও তাঁরা পরিপূর্ণভাবে জানেন যে, তাঁদের ভিন্ন-দর্শন মিথ্যা বা অসত্য। দ্রুতগামী যানস্থিত জ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিও যখন বাইরের বৃক্ষাদিকে দর্শন করেন, তখন তিনি তাদের ধাবনশীলরূপেই দর্শন করতে বাধ্য হন, যদিও তিনি সুস্পষ্টভাবে জানেন যে, সেই সব ধাবমান বৃক্ষাদির 'বৃক্ষত্ব' প্রভৃতিই কেবল সত্য 'ধাবমানত্ব' নয়। একই ভাবে, যদিও জ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞ জন পরিপূর্ণভাবে জানেন যে, জগৎ কেবল অভিন্নই ব্রহ্ম থেকে, ভিন্ন কদাপি নয়—তথাপি, জগতে থেকে তিনি জগৎকে ব্রহ্মভিন্নরূপেই দেখতে বাধ্য হন।

(৩) অবিদ্যাকবলিত জীবও জগৎকে কোনোক্রমে ব্রহ্মাত্মক বা ব্রহ্মস্বরূপ এবং সেজন্য ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন ব'লে জানলেও তা যে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, এরূপ জ্ঞান তাঁর থেকেই যায়। অর্থাৎ, তিনি জগৎকে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন ও ভিন্ন উভয়রূপেই প্রত্যক্ষ করেন, এবং উভয় প্রত্যক্ষকেই সমান সত্যরূপে গ্রহণ করেন যেমন, দ্রুতগামী যানস্থিত শিশু বাহিরের বৃক্ষাদিকে ধাবমান ব'লে দর্শন করতে বাধ্য হয়, এবং তাদের 'বৃক্ষত্বা'দি ও 'ধাবমানত্ব'—উভয়কেই সমান সত্যরূপেই গ্রহণ করে। প্রাজ্ঞ ও অজ্ঞের মধ্যে এই মূলীভূত প্রভেদ।

বল্লভমতেও মুক্তি নিত্যানন্দরসঘন পরম-রমণীয় অবস্থা; এবং ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন মুক্ত-জীব এই ব্রহ্মানন্দপানে ধন্যাতিধন্য হন। তা সত্ত্বেও মুক্তজীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হয়ে গোলোকস্থ বৃন্দাবনে বা 'ব্যাপি-বৈকুণ্ঠে' (উপরে দেখুন) চিরদিন ব্রহ্মকে গোপীভাবে পতিরূপে প্রেম ও সেবা করেন; এবং তাঁর সঙ্গে রাসলীলাদিতেও রত হয়ে পরম ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জিত হয়ে থাকেন। সেজন্য মুক্তজীব শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মভিন্ন হয়ে পড়ছেন—কারণ অন্ততঃ দু'জন না হ'লে প্রেম হয় না, সেবা হয় না, পূজা হয় না এবং এসবও ত মুক্ত-জীবও ক'রে চলেন সমানে মোক্ষকালেও। সুতরাং তখন তাঁকে ব্রহ্মভিন্ন ব'লে গ্রহণ করা ব্যতীত আর গত্যন্তর কোথায়—তা যতই স্ববিরোধদোষদুষ্ট হোক না কেন?

অন্যান্য ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায় বল্লভও বিদেহমুক্তিবাদী। অর্থাৎ তাঁরও মতে শরীর থাকতে মুক্তিলাভ অসম্ভব, দেহান্তেই তা

বল্লভ ভক্তিবাদী। বল্লভমতে মোক্ষের দুটি উপায়রূপে জ্ঞান ও ভক্তিকে গ্রহণ করা হ'লেও কেবল জ্ঞানে মুক্তি নেই। কারণ, জ্ঞানী কেবল ব্রহ্মের 'অক্ষর'রূপই দর্শন করেন, যেক্ষেত্রে ভক্ত ব্রহ্মের পরমানন্দ রসঘন শ্রীকৃষ্ণ-রূপ দর্শন ক'রে

তাঁর সঙ্গে একত্রে তাঁর আনন্দরস ও প্রেমসুধা আস্বাদন ক'রে তৃপ্ত ও ধন্য হন।

ভক্তি দ্বিবিধ—মর্যাদাভক্তি ও পুষ্টিভক্তি। প্রথম শ্রেণীর ভক্ত স্বপ্রচেষ্টায় শাস্ত্রোপদিষ্ট সাধন-ভজনের দ্বারা মোক্ষলাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্ত কেবলমাত্র প্রগাঢ় ভগবৎপ্রীতির দ্বারাই ভগবদনুগ্রহলাভে সমর্থ হন এবং তদ্দ্বারাই মোক্ষলাভে পরম কৃতার্থ হন—আর কোনো স্বতন্ত্র সাধন বা স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার জন্য অপেক্ষা না ক'রে। পুষ্টিভক্তিই শ্রেয়ঃ। 'পুষ্টি' অথবা 'পোষণে'র অর্থ 'অনুগ্রহ'। পুষ্টিভক্তিতে থাকে জীবের দিক থেকে কেবলমাত্র সেবা ও প্রীতি এবং শ্রীভগবানের দিক্ থেকে কেবলমাত্র কৃপা ও প্রেম।

পুষ্টিভক্তি চতুর্বিধ :

(১) প্রবাহ-পুষ্টিভক্তি। যিনি সংসার-প্রবাহে নিমগ্ন হয়েও শ্রীভগবানকে লাভের জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম করেন, তাঁরই মার্গ এই। তিনি কর্মমার্গানুসারী হ'লেও সকাম-সাংসারিক কর্ম না ক'রে নিষ্কাম-ঐশ্বরিক কর্ম করেন ব'লে মোক্ষলাভে অধিকারী হন।

(২) মর্যাদা-পুষ্টিভক্তি। যিনি পার্থিব বাসনা-কামনাকে ধ্বংস ক'রে শ্রীভগবানের নাম-কীর্তনাদিতে রত থাকেন, তাঁরই মার্গ এই।

(৩) পুষ্টি-পুষ্টিভক্তি। যিনি ভগবদনুগ্রহে জ্ঞানলাভে অধিকারী হয়ে স্বপ্রচেষ্টায় জ্ঞানলাভ ক'রে পরিশেষে শ্রীভগবানের ভজন-পূজন, সেবা-দিতে রত হন, তাঁরই মার্গ এই।

(৪) শুদ্ধ-পুষ্টিভক্তি। এরূপ ভক্তি ভক্তিরই উচ্চতম উৎকৃষ্টতম রূপ; এবং তা কেবল প্রেম-প্রধানা ও ভগবদনুগ্রহেরই ফল এবং সেজন্য এর অপর নাম 'প্রেমভক্তি'।

প্রেম আসক্তি ও ব্যসন—প্রেমভক্তির এই তিনটি অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুতে প্রেমাভাবই হ'ল 'প্রেম'। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনো বস্তুতে দ্বেষ হ'ল 'আসক্তি'। শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ়তম প্রীতি হ'ল 'ব্যসন'। শুদ্ধ-পুষ্টি-ভক্তির ফল সর্বাত্মভাব অথবা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মদর্শন। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন ও ঈশ্বরের আপ্রাণ সেবাই এরূপ ভক্তের কর্তব্য। সেবা দ্বিবিধা—ফলরূপা অথবা মানসী সেবা অর্থাৎ স্মরণ প্রভৃতি এবং সাধনরূপা অথবা শরীরসহায়ে সেবা-অর্চনা প্রভৃতি। এরূপে, শুদ্ধ পুষ্টিমার্গ - রাগমার্গ ও রসমার্গ।

মর্যাদা-ভক্তগণ সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু পুষ্টিভক্তগণ সালোক্য-মুক্তি লাভ করেন অর্থাৎ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমলোকস্থিত হয়ে গোপ গোপী গাভী পশু পক্ষী বৃক্ষ নদী প্রভৃতি নানারূপে তাঁর সঙ্গে রাসক্রীড়ায় লিপ্ত হন—যা পার্থিব ব্রজস্থ ও বৃন্দাবনস্থ রাসক্রীড়ারই অনুরূপ। এই হ'ল শ্রেষ্ঠ মুক্তি। কারণ, মুক্তির অর্থ শ্রীভগবানের সঙ্গে অভিন্নত্বপ্রাপ্তি হ'লেও তিনি লীলাভরে নিজেকে মুক্তজীব থেকে পৃথক্ ক'রে ফেলে তাঁর সঙ্গে রাসকেলিতে মগ্ন হন; এবং সেজন্য এরূপ ভিন্নত্ব অভিন্নত্ব অপেক্ষা শ্রেয়ঃ এবং অধিকতর কাম্য প্রকৃত ভক্তের নিকট।

বল্লভের মতে ব্রহ্ম-জীবের সম্পর্ক পতি-পত্নীর নিকটতম নিজতম মধুরতম সম্পর্ক; এবং পতি-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এরূপে মধ্ববেদান্তের ন্যায় বল্লভ-বেদান্তেও Anthropomorphism বা ঈশ্বরে মানবিক ভাবারোপের ছড়াছড়ি, তদুপরি মধুর ও শৃঙ্গার রসের প্রাবল্য।

বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে বল্লভের আবির্ভাব চমকপ্রদ ও মনোমুগ্ধকর। দ্বৈতমূলক ভক্তি-বাদের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদ স্থাপনের প্রচেষ্টা ক'রে তিনি একটি নূতন পথিকৃৎ-এর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যদিও তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টা বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে, তা হলেও তাঁর সাহস আত্মবিশ্বাস উৎসাহ উদ্দীপনা ও নিরলস প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য, নিঃসন্দেহে।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

জাতীয়-মানসের পুনরুজ্জীবনের সঙ্কল্প নিয়ে 'উদ্বোধন'-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। 'উদ্বোধনে'র পাতায় স্বামীজীর 'ভাব্‌বার কথা' রচনাগুচ্ছ সেই মানস-সঞ্জীবনেরই আর একটি পন্থা। আদর্শবাদ যেমন উচ্চমার্গের প্রবন্ধ-নিবন্ধের দ্বারা প্রচার করা সম্ভব, তেমনি আবার বিচারবিশ্লেষণের আর এক অঙ্গ হিসাবে হাস্য-রসের নিপুণ প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ আদর্শের যাত্রাপথে সম্ভাব্য অসঙ্গতিগুলি দেখিয়ে দেওয়াও প্রয়োজন। এই সব অসঙ্গতি আমাদের সমাজে সংসারে চিন্তায় ধারণায় নানাভাবেই ছড়িয়ে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে মূল আদর্শকে আচ্ছন্ন করে এদের শাখাপ্রশাখা জীবনের মূল সত্যকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। তখন এদের বিরুদ্ধে সংস্কারবাদী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি—নানান ধরণের মনীষীরাই সমবেত হন। বাংলাসাহিত্যে ও সমাজে রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের কথা আমরা এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে পারি। উচ্চতম মননশক্তির সঙ্গে সূক্ষ্মতম হাস্যরসের যোগের দিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অনেক পূর্বসূরীর সঙ্গেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মাননার অধিকারী। 'ভাব্‌বার কথা'র* এই রচনাগুচ্ছ তার অন্যতম প্রমাণ।

প্রথম গল্পটিতে বেসুরো গায়কের ভক্তির আতিশয্যকে স্বামীজী পরিহাসের দ্বারা নিরস্ত করতে চেয়েছেন, পরের তিনটি গল্প-কণিকায় আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক রাজ্যের আরো কয়েকটি অসঙ্গতির প্রতি পাঠকদের সচেতন করেছেন। বস্তুতঃ গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে এ গল্পগুলির অন্তর্নিহিত সমাজসমালোচনার কঠোরতা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে মর্মভেদী হ'বার কথা। কিন্তু পরিবেশন-নৈপুণ্যে নির্মম সত্য-নির্দেশকেও স্বামীজী আনন্দমাধুর্যে মণ্ডিত করে শেষ অবধি হাস্যরসেই সার্থক করেছেন, সমালোচনার অম্লস্বাদ কোনো তিক্ততাসৃষ্টির অবকাশ রাখে নি।

এ সব রচনায় স্বামীজী বঙ্কিমচন্দ্র বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 'কমলাকান্ত' বা 'পঞ্চানন্দ' (ওরফে পাঁচু ঠাকুর)-জাতীয় অন্য কারু ভূমিকা গ্রহণ না করে কল্পিত কোনো চরিত্র বা নামের অবলম্বনে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। ভোলাচাঁদ, ভোলাপুরী বেদান্তী, কৃষ্ণব্যাল ভট্টাচার্য—এ-জাতীয় চরিত্র। আর নামঅবলম্বনে বক্তব্য নিবেদনের রসিকতা—'বলি, রামচরণ!'

'ভাব্‌বার কথা' গল্পগুচ্ছের দুটি কেন্দ্রীয় গল্প। প্রথম গল্পটির সঙ্গে আর তিনটি ছোট ছোট গল্প—প্রথম গল্পটির ভাষ্যটীকা অর্থেও এদের নেওয়া চলে। দ্বিতীয় প্রধান গল্পটি লক্ষ্ণৌর ইমামবাড়ায় দুই রাজপুতের কাহিনী। তার পরে আর দুটি গল্প—তাদের একটি স্পষ্টতঃই প্রধান গল্পটির ব্যাখ্যা। বেশ বোঝা যায়, স্বামীজী এ গল্পগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের জড় চিত্তবৃত্তিকে সজোরে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন, তাই এদের নাম 'ভাব্‌বার কথা।'

---

* স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা : ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।

বেসুরো গায়কের উদাহরণটির শেষ কথা—পাগল তুই, আমাকেই ভিজুতে পারিসনি, ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?'—পর পর তিনটি মন্তব্যধর্মী গল্পেই অন্যভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে। গীতার 'মামেকং শরণং ব্রজ'—একমাত্র আমার শরণাগত হও—এই উপদেশের প্রয়োগ যে কেবল মুখের কথায় নয়, জীবনের সাধনায় সত্য হয়ে ওঠে, সে কথা আমরা ক'জনে মনে রাখি? ফলে ভক্তির বাইরের আবরণ অনেক সময়ই স্বার্থ-সাধনের ছদ্মবেশ হয়ে দাঁড়ায়, যথার্থ আত্মনিবেদন না থাকলে সর্বপাপ থেকে তিনি রক্ষা করবেন—এমন আশা বাতুলতা। ঈশ্বরের শরণাগতির প্রকাশ জীবনে বচনে মননে সমানভাবে দেখা না দিলে শুধুমাত্র গীতার বাণীর পুনরাবৃত্তি কারু মহত্বের প্রমাণ হতে পারে না। আধ্যাত্মিক আদর্শের এ অসঙ্গতি স্বামীজী ভোলাচাঁদের ধরণ-ধারণের মধ্য দিয়ে এইভাবে ফুটিয়েছেন—'ভগবান অর্জুনকে বলেছেন: তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার ক'রব।'[১] ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুশী; থেকে থেকে বিকট চীৎকার: আমি প্রভুর শরণাগত, আমার ভয় কি? আমার কি আর কিছু করতে হ'বে? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথাগুলি খুব বিটকেল আওয়াজে বারংবার বলতে পারলেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার ওপর মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত স্বরে জানানও আছে যে, তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এ ভক্তির জোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন, তবে সবই মিথ্যা। পার্শ্বচর দু-চারটা আহাম্মকও তাই ঠাওরায়! কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর জন্য একটিও দুষ্টামি ছাড়তে প্রস্তুত নন। বলি, ঠাকুরজী কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমরাই ভুলিনি!!'

প্রসঙ্গত মনে করা যায়, ভোলাচাঁদ-জাতীয় মানুষদের কথা স্বামীজীর সমকালীন সমাজে তাঁর পরিচিত মণ্ডলীর মধ্যেই মিলতো। আবার এক হিসাবে সব কালেই একদল বাক্‌সর্বস্ব অনুগামী দেখা যায়, যাঁরা ভক্ত বলে পরিচিত হতে পারেন, অথবা রাজনৈতিক বা সামাজিক দল-বিশেষের অনুরক্তও হতে পারেন। বিশেষ আদর্শবাদকে তাঁরা আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির ধ্বজা হিসাবেই ব্যবহার করে থাকেন, সে আদর্শ-বাদের কোনো পরিচয় তাঁদের জীবনে দেখা যায় না। কিন্তু বুলি আওড়াতে তাঁরা সব সময় মজবুত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও এমন কেউ কেউ ছিলেন, যাঁরা তাঁর দেহাবসানের পরে মনে করতেন, তাঁদের আর আলাদা সাধনভজনের দরকার নেই, কারণ তাঁরা স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখেছেন, আর জপ তপ সাধন ভজনের দরকার নেই। অথচ দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্তানেরা—বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রমুখ সবাই তাঁদের গুরু-মহারাজের দেহত্যাগের পরে সুদীর্ঘ সুকঠোর তপস্যায় গুরুর কাছে পাওয়া সাধনসম্পদ অন্তরের মণিকোঠায় চির উজ্জ্বল করে রেখেছেন। আবার তাঁদের সেই ধ্যানতপস্যার আদর্শই নবযুগের তরুণচিত্তে বিবেকবৈরাগ্যের বহ্নিসঞ্চার করে চলেছে, সে-কথা বর্তমান ভারতের ইতিহাস।

আদর্শবাদের নামে আচার-আচরণের

১ মূল শ্লোকটি গীতায় এইভাবে রয়েছে—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৬। স্বামীজী এখানে মূলভাবটি অবলম্বনে সহজ করে লিখেছেন।

অসঙ্গতি কেমন করে মানুষকে প্রবঞ্চিত করে, তার প্রমাণস্বরূপ ভোলাচাঁদের দল অবশ্য আধ্যাত্মিক-আদর্শে বিশ্বাসী ভারতবাসীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী মেলে। এরা শুধু অন্যদের ঠকায় না, নিজেরাও ঠকে; হয়তো কখনো কখনো না জেনে বুঝেও ঠকে। ভোলাচাঁদের বিটকেল আচরণ যেমন অসহনীয়, তেমনি তার মধ্যে একটু নির্বুদ্ধিতাও আছে। তার ধারণা তার ধাপ্পা অন্যেরা বুঝতে পারছে না, এমন কি ভগবানও না। শুধু 'শরণাগত' শব্দটি উচ্চারণ করলেই বুঝি সব পাপ থেকে উদ্ধার মেলে। যথার্থ শরণাগতির সঙ্গে এই মৌখিক ভক্তি-ঘোষণার যে আকাশ-পাতাল তফাৎ সেকথা ভোলাচাঁদ কতটা বুঝতে পারে সন্দেহ। এদিক থেকে স্বামীজীর তীব্র বিশ্লেষণের আলোকে সমাজের আর এক শ্রেণীর যথার্থ জ্ঞানপাপী দেখা দিয়েছে। চতুর মতলববাজ এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ মানুষের মূঢ়তাকে সম্বল করেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করে থাকে। এ-জাতীয় চরিত্রের একজনকে স্বামীজী 'রামচরণ' নামে সম্বোধন করেছেন—" বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসাবাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই, শারীরিক শ্রমও তোমাদ্বারা সম্ভব নহে, তার ওপর নেশা-ভাও এবং দুষ্টামিগুলিও ছাড়তে পার না, কি করে জীবিকা কর, বল দেখি?' রামচরণ —'সে সোজা কথা, মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।' "

'রামচরণ ঠাকুরজীকে কি ঠাওরেছেন?' এত অল্প কথায় একটি গোটা চরিত্রের ব্যঙ্গধর্মী চিত্রায়ণ স্বামীজীর হাস্যরসের বৈদগ্ধ্য ও নৈপুণ্যের অসামান্যতার নিদর্শন। নিষ্কর্মা উপদেষ্টাদের মুখোস এমন নির্মমভাবে খুলে দিয়ে স্বামীজী মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সে মহাব্রতে এ ধরণের উদাহরণের বিশেষ উপযোগিতা সেকালে তো ছিলই, একালেও অনেকখানি। লোকচরিত্র-অনুধাবনে স্বামীজীর অপূর্ব দক্ষতা রামচরণের চাঁচাছোলা জবাবটির মধ্যে রূপায়িত। এ ধরণের মানুষ সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই নিজেকে এবং সকলকে প্রতারণা করে চলেছে বলেই হয়তো এত সোজাসুজি বলতে পারলো—'আমি সকলকে উপদেশ করি।' একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এসব মানুষের শ্রোতাও একদল জোটে। যার নিজের জীবনে কোনো সমস্যা সমাধানেরই যোগ্যতা নেই, সে অনায়াসে আর সকলকে পথ দেখাবার চেষ্টা করে। হয়তো বহুজনের বোকামি একজনের ভরণপোষণের কারণ হতে পারে, কিন্তু আর সবাইকে ঠকানো গেলেও অন্তর্যামীকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। রামচরণ, কি ঠাওরেছেন?—যাই তিনি ঠাহর করে থাকুন, ঈশ্বরকে নয়।

'ভোলাপুরী বেজায় বেদান্তী'—ওই 'বেজায়' কথাটির মধ্যে স্বামীজীর কলকাতা-কেন্দ্রিক আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর মুচ্‌কি হাসির আভাসটুকু ফুটে উঠেছে। বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের যাঁরা শ্রেষ্ঠ রসিক তাঁরা নিজের নিজের বর্ণ বা শ্রেণীকেই বিদ্ধ করেছেন সবচেয়ে বেশী। বিদ্যাসাগরের স্বনামে ও বেনামে রচনাগুলির (হাস্যরসের দিক থেকে বেনামী রচনাগুলিই বেশী মূল্যবান) আক্রমণের লক্ষ্য মূলতঃ এদেশের ব্রাহ্মণসমাজ—যে সমাজের একজন তিনি নিজে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী যে 'বাবু' সমাজের উচ্চাশার চরমলক্ষ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব সেই সমাজে এবং তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য প্রধানতঃ এই বাবুসমাজ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তথাকথিত উচ্চবর্ণ সমাজের হৃদয়-হীনতাকে যেমন ফুটিয়েছেন তেমনি দেখিয়েছেন অজ্ঞতা-কুসংস্কার-দলাদলি-ঈর্ষ্যায় আচ্ছন্ন এই

সমাজের হাস্যকর দিক। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী, তবু 'বেজায় বেদান্তী' ভোলাপুরীর স্বার্থপর ধর্মাচরণের অর্থহীনতাকে তিনিই সবথেকে কঠোর আক্রমণ করেছেন। সমাজচেতনার বিচারে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের আবির্ভাব অনেক সময় এইভাবেই হয়ে থাকে। পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসের উৎস নিজের মধ্যে, তারপরেই নিজের জনদের মধ্যে। এর আগের উদাহরণগুলিতে স্বামীজী যথার্থ ভক্তির আদর্শ খুঁজতে গিয়ে তথাকথিত ভক্তদের ফাঁকি দেখিয়েছেন, এবার দেখালেন তথাকথিত জ্ঞানীর আত্মপ্রবঞ্চনা। সাধুর ভেকধারী যারা "সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরে" তমোগুণে ডুবে থাকে তাদের ফাঁকি সম্বন্ধে স্বামীজীর সব সময় তীব্র মতামত। পরিব্রাজক অবস্থায় একবার এক গাছতলায় ধ্যানের ছলে নিদ্রারত সাধুকে দেখে বিরক্ত স্বামীজী লোকটির দুই কাঁধে জোয়াল জুড়ে দিয়ে তার তমোগুণ দূর করার প্রস্তাব করেছিলেন। সংসারের সুখদুঃখে উদাসীন থেকে এ-জাতীয় সাধুরা যখন নিজেদের সামান্য সুখসুবিধার অভাবে ভ্রূকুটি করতে থাকেন, তখন ভোলাপুরী বেদান্তীর গল্পটি স্মরণীয়—

"ভোলাপুরী বেজায় বেদান্তী—সকল কথাতেই তাঁর ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরীর চারিদিকে যদি লোক-গুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাঁকে স্পর্শও করে না; তিনি সুখদুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো মরে ঢিপি হয়ে যায়, তাতেই বা তাঁর কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন! তাঁর সামনে বলবান দুর্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলাপুরী 'আত্মা মরেনও না মারেনও না'—এই শ্রুতিবাক্যের গভীর অর্থসাগরে ডুবে যান। কোনও প্রকার কর্ম করতে ভোলাপুরী বড়ই নারাজ। পেড়াপীড়ি করলে জবাব দেন যে, পূর্বজন্মে ওসব সেরে এসেছেন।"—সন্ন্যাস-ধর্মের মহৎ আদর্শ অযোগ্যের জীবনে ও ব্যবহারে কতখানি বিপরীত ব্যঞ্জনা নিয়ে আত্মপ্রতারণা হয়ে দাঁড়ায় সেকথা ভারতীয় সন্ন্যাসীদের সর্ব-স্তরের সঙ্গে যোগাযোগের ফলেই তাঁর লেখায় এত সহজ ও সরসরূপে ধরা দিয়েছে। বেজায় বেদান্তীর অনুপ্রাসে একই সঙ্গে কৌতুক, বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের মিশ্রণ!

স্বামীজীর বর্ণনায় ভোলাপুরীর ভাবভঙ্গী একালের পাঠকদের শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বর্ণিত এক সাধুবাবার কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বে এই সাধুবাবার সঙ্গে শ্রীকান্তের দেখা এবং কিছুদিন এঁর সাকরেদিও সে করেছে। শরৎচন্দ্রের নিজের জবানবন্দী অনুসারে প্রথম জীবনে তিনি একা-ধিকবার সাধুদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, আর 'শ্রীকান্তে'র কথা অনুযায়ী সে নিজেও বার চারেক সাধু হয়েছে। 'শ্রীকান্ত' বা শরৎচন্দ্রের মতে সাধুদের অধিকাংশের চরিত্রেই ভোজনের প্রতি একটু বেশী দৃষ্টি থাকলেও অন্য বিষয়ে নিরাসক্তি সহজেই চোখে পড়ে। তবে তিনি যে সাধুবাবার সঙ্গে ছিলেন, তাঁর সঙ্গে বিহারের গ্রামাঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে বিঠোরাগ্রামে এসে যখন তাঁবু গাড়লেন, তখন একদিন—"দেখিলাম, সাধুবাবা আজ যেন কিছু বিরক্ত! হেতুটা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন—বলিলেন, 'এ-গ্রামটা সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়, সেবাদির ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক হবে না; সুতরাং কালই এ-স্থান ত্যাগ করতে

হবে।' যে আজ্ঞা, বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলাম।"[২]

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে আধুনিক যুগের সেবাব্রতী সন্ন্যাসী বজ্রানন্দের ভোজন সম্বন্ধে উদারতার বর্ণনায় শরৎচন্দ্রের সস্নেহ সমর্থন লক্ষণীয়। কিন্তু প্রথম পর্বের সাধুবাবা অনেকটাই 'ভোলাপুরী'-জাতীয়। 'বিঠোরা' গ্রামের লোকজনদের তাদৃশ ভক্তির অভাবে বিরক্ত হলেও 'ছোট বাঘিয়া' গ্রামে এসে যখন বসন্ত মহামারীভয়ে ভীত নরনারীদের কাছে তিনি ভক্তি ও ভোজ্য সামগ্রী প্রচুর পেতে লাগলেন, তখন সেখানেই দিনকয় থেকে গেলেন। শ্রীকান্তের জবানীতে--"প্রাণের ভয়টা ইঁহাদের নিতান্তই কম—'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ' ত আছেই; কিন্তু কি করিলে অনেকদিন জীবেৎ এ খেয়াল নাই।"[৩] গ্রামাঞ্চলের আধুনিক শিক্ষাবর্জিত ভোজনবিলাসী সাধুর এ উদাহরণ নিশ্চয়ই একমাত্র নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে শরৎচন্দ্র এই সাধুবাবার সরল স্নেহ-প্রবণ ও বৈরাগ্যরঞ্জিত ব্যক্তিত্বটিও অল্প কথায় সুন্দর ফুটিয়েছেন।

তবে স্বামীজীর গল্পের ভোলাপুরী হয়তো 'ন জায়তে ম্রিয়তে' ([আত্মার] জন্ম মৃত্যু নেই) জাতীয় কথা বলতে বলতে আগেই মহামারী-আক্রান্ত গ্রামটি ছেড়ে যেতেন। বেদান্তের এ-জাতীয় ভ্রান্ত প্রয়োগ সম্বন্ধে সাবধান করবার জন্যই স্বামীজীর এই কথিকাটির সৃষ্টি। যে সেবাধর্মের প্রবর্তনে স্বামীজী ভারতীয় সন্ন্যাসী-সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, আজ তাঁর প্রবর্তিত রামকৃষ্ণসঙ্ঘ এবং সেই সঙ্ঘের অনুসরণে ভারতের সর্বপ্রান্তের অধিকাংশ সাধু-সমাজ মানবকল্যাণের ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অগ্রসর হয়ে এসেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় শরৎ-চন্দ্রের অন্যতম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র রামকৃষ্ণসঙ্ঘের স্বামী অখণ্ডানন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং 'স্বামী বেদানন্দ' নামে সঙ্ঘের সারগাছি-কেন্দ্রে ও বৃন্দাবন সেবাশ্রম-কেন্দ্রে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করে স্বামীজীর সেবাধর্মে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'বজ্রানন্দ'-চরিত্রে তাঁর এই সন্ন্যাসী ভাইটির প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।

শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিকের অন্তরালে একজন শ্রেষ্ঠ সমাজসমালোচক নিহিত থাকেন। সাধারণ মানুষ যেখানে সামান্য ঠাট্টা, ইয়ার্কি বা রঙ্গব্যঙ্গ করেই ক্ষান্ত হয়, শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক সাহিত্যিকের কলমে সেখানে চরিত্র ঘটনা ও মন্তব্যের সমবায়ে সমাজদেহের অন্তরালবর্তী পুঞ্জিত গ্লানির স্থায়ী সাহিত্যরূপ হাস্যরসের রসায়নে মূর্ত হয়ে ওঠে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুধর' (ডমরু-চরিত) অথবা পরশুরামের 'গণ্ডেরীরাম' (সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্—'গড্ডলিকা') এ-জাতীয় চরিত্রচিত্রণের দৃষ্টান্ত। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'তে 'নিমচাঁদ' একটি অমর উদাহরণ।

[ক্রমশঃ]

২, ৩ শ্রীকান্ত : প্রথম পর্ব : পৃঃ ১৩৮ ; পৃঃ ১৪০ : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রকাশিত 'অখণ্ড' সংস্করণ।

মরিশাসে কয়েক দিন

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

অনেকদিন বাদে এবার ভারতের বাইরে যাওয়ার সুযোগ হ'ল। মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের নতুন মন্দির হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করতে যাবেন পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ।* সঙ্গে যাবেন তাঁর দুই সেবক। প্রতিষ্ঠার দিন শনিবার, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৭৬। পূর্বের ব্যবস্থানুযায়ী আমরা ১১ই নভেম্বর মঠ থেকে বেরিয়ে পথে কাশী এলাহাবাদ কানপুর লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী হয়ে বোম্বে পৌঁছি ২৫শে নভেম্বর। বোম্বে মরিশাস যাতায়াতের 'গেটওয়ে'।

আজ মঙ্গলবার, ৩০শে নভেম্বর। আমাদের যাত্রার দিন। সকাল নটায় তৈরী হয়ে আমরা বেরিয়েছি বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে এসেছেন বোম্বে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দজী এবং অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা—বিমানবন্দরে পূজ্যপাদ মহারাজজীকে বিদায়-সংবর্ধনা জানাতে। অনেক ভক্তও সমবেত হয়েছেন। পনর মিনিটের মধ্যে আমরা বোম্বের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সান্তাক্রুজে পৌঁছে গেছি।

বেলা সাড়ে দশটায় আমাদের প্লেন সান্তাক্রুজের মাটি ছাড়ল। এয়ার ইণ্ডিয়ার বোয়িং ৭০৭। ব্যবস্থা ভারি চমৎকার। মেঘ-গর্জনে বিদ্যুৎগতিতে ছুটল আমাদের প্লেন এবং নিমেষের মধ্যে উঠে গেল কয়েক হাজার ফুট উঁচুতে। ভেতরে তখন শোনা যাচ্ছে, ঘোষক ঘোষণা ক'রে চলছেন আমরা কত হাজার ফুট উঁচু দিয়ে কত বেগে কোন্ দিকে যাচ্ছি, আমাদের গন্তব্যস্থল কতদূর এবং পৌঁছুতে কত সময় লাগবে ইত্যাদি। সেদিনকার আবহাওয়া ছিল অপ্রত্যাশিতভাবে চমৎকার। আকাশ ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার, নীলে নীল। উপরে উজ্জ্বল নীল আকাশ আর নীচে নীল সমুদ্র। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! অপার্থিব অনুভূতির স্পন্দন জাগায় মনে।

আরব সাগর পার হয়ে আমাদের প্লেন ঢুকল ভারত মহাসাগরে। দেখতে দেখতে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেল। সবাইকে খাবার পরিবেশন করা হ'ল। আতিথেয়তার জন্য এয়ার ইণ্ডিয়ার খুব সুনাম; প্লেনে 'যত্ন আত্তি' খুব করা হয়। ভারতীয় সময় আড়াইটায় আমাদের প্লেন নামল সিশেলস (Seychelles) দ্বীপে। ওখানকার সময় তখন একটা। সিশেলস ভারত মহাসাগরের বুকে অতি ছোট কিন্তু অপূর্ব সুন্দর একটি দ্বীপ। অল্প দিন হ'ল স্বাধীন হয়েছে। এখানে এক ঘণ্টা বিরতি। আমরা প্লেন থেকে নেমে চললুম লাউঞ্জে। খোলা জায়গায় ইচ্ছামত একটু ঘোরাফেরা ক'রে প্লেনে একটানা বসে থাকার ক্লান্তি অনেকটা কাটিয়ে উঠলুম।

এক ঘণ্টা বিরতির পর নির্দিষ্ট সময়ে আবার প্লেন ছাড়ল। আড়াই ঘণ্টার পর আমরা পৌঁছে যাব মরিশাসে, আমাদের গন্তব্যস্থলে। ইতিমধ্যে বৈকালিক চা ও আনুষঙ্গিক খাবার পরিবেশন করা হ'ল। চা-টা খেয়ে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। অজান্তেই মনটা চলে গেল অনেক পিছনে। বাণিজ্য করতে এসে

* শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

ইংরেজরা হয়েছে ভারতের রাজা। ভারত থেকে শোষণ করা ধনে নিজেদের ধনভাণ্ডার করেছে সমৃদ্ধ। কিন্তু মুস্কিল হ'ল ঐ মরিশাস নিয়ে। মরিশাস তখন ফরাসীদের দখলে। আর ইংরেজদের জাহাজকে ভারতে যাতায়াত করতে হয় মরিশাস-উপকূল দিয়ে। যাতায়াতের তখন অন্য কোন পথ ছিল না। ইংরেজদের জাহাজ মরিশাসের কাছাকাছি এলেই ফরাসীরা দল বেঁধে জাহাজ আক্রমণ করে ও জিনিসপত্র লুট ক'রে নেয়। ফলে মরিশাস হয়ে দাঁড়াল ইংরেজদের কাছে এক মহা সন্ত্রাসের কারণ। তাই ইংরেজরা মরিয়া হয়ে উঠল—ফরাসীদের হটিয়ে দখল করতেই হবে মরিশাস। শেষ পর্যন্ত করলও তাই। যুদ্ধে হেরে গেল ফরাসীরা। চুক্তি হ'ল দু'পক্ষের মধ্যে। সেই চুক্তি (The Treaty of Paris 1814) অনুযায়ী মরিশাস এল ইংরেজদের হাতে।

মরিশাসের মাটি ও জলবায়ু আখ-চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ইংরেজরা বণিকের জাত, ব্যবসা তাদের মজ্জাগত। কি করলে বেশী লাভ হবে, তারা ভালই জানে। মরিশাসে আখের ব্যবসাই সবচেয়ে লাভজনক। কিন্তু ব্যবসার ভিত্তিতে আখ-চাষের উন্নতি করতে হ'লে চাই প্রচুর শ্রমিক; এই উদ্দেশ্যে চুক্তিপত্র সই করিয়ে ও নানা প্রলোভন দেখিয়ে সংগ্রহ করা হ'ল প্রচুর ভারতীয় শ্রমিক। জাহাজ বোঝাই ক'রে ভারত থেকে নিয়ে আসা হ'ল তাদের মরিশাসে। এই ভারতীয় শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আখ-শিল্পের হ'ল প্রভূত উন্নতি। ইংরেজদের ধনভাণ্ডারে জমা হ'ল কোটি কোটি টাকা। ভারতীয় যারা ওদেশে গেল তারা আর দেশে ফিরে এল না। মরিশাসেই স্থায়ি-ভাবে বসবাস করতে লাগল। তাই তো মরিশাসে আজ ভারতীয়রাই প্রধান অধিবাসী, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তাদের ক্রমাগত সংগ্রামের ফলে ১৯৬৮তে মরিশাস হয়েছে স্বাধীন। মরিশাসের বর্তমান সমৃদ্ধ অবস্থার স্রষ্টা ভারতীয়রাই। চিন্তায় ছেদ পড়ল যখন শোনা গেল প্লেনের ভেতর থেকে বেল্ট বাঁধার নির্দেশ ঘোষণা করা হচ্ছে। আর বলা হচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের প্লেন মরিশাসের মাটিতে নামবে।

দেখতে দেখতে বন্ বন্ শব্দে প্লেন বিমান-বন্দরে এসে নামল এবং ঝড়ের বেগে রান-ওয়েতে এক চক্কর খেয়ে আস্তে আস্তে নির্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়াল। ভারতীয় সময় তখন সন্ধ্যা ছটা; মরিশাসের সময় বিকাল সাড়ে চারটা। যাত্রীরা ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন। আমরাও নামলাম।

মরিশাসের বিমানবন্দরের নাম প্লেযাঁচ্ (Plaisance)—রাজধানী পোর্ট লুইস থেকে ৩৪ মাইল দূরে, সমুদ্রতীরে। পালাম, দমদম্ বা সান্তাক্রুজের মতো বড় নয়। খুব ছোট, তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আন্তর্জাতিক বিমান কোম্পানীগুলির অনেক বিমান এখানে ওঠা-নামা করে।

প্লেন থেকে নীচে নেমেই দেখা হ'ল মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অপরানন্দের সঙ্গে। ওখানকার মিশনের বিশিষ্ট বন্ধু ও ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে তিনি এসেছেন বিমান-বন্দরে, পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহারাজকে স্বাগত জানাতে। সকলের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় ও সম্ভাষণাদি-পর্ব শেষ ক'রে আমরা রওনা হলাম আশ্রমের উদ্দেশ্যে, মোটরে। বিমানবন্দর থেকে আশ্রমের দূরত্ব বাইশ মাইল। রাস্তাঘাট চওড়া ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলুম আশ্রমে। ভ্যাকুয়া শহরে ছয় একর জমির উপর

অবস্থিত আশ্রমটির শোভা অতি মনোরম। পোর্ট লুইস থেকে আশ্রমের দূরত্ব বার মাইল। আশ্রমে ঢুকতেই ডান দিকে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নবনির্মিত মন্দির। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ ক'রেই আমাদের মরিশাস আসা। মন্দিরের পিছনে ছোট একখানি উঠান। উঠানের শেষপ্রান্তে আশ্রমের একতলা বাড়ী, কাঠের, দার্জিলিং প্রভৃতি পাহাড়ে যেমন হয়। দৃঢ় ও সুদর্শন এই বাড়ীরই বিভিন্ন কক্ষে আছে লাইব্রেরী, আশ্রমের অফিস, কর্মীদের বাসস্থান, রান্নাঘর ও খাওয়ার ঘর। নতুন মন্দির না হওয়া পর্যন্ত এই বাড়ীরই একখানি ঘর ঠাকুরঘর হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। আশ্রম-বাড়ীর পিছনে একফালি সব্জী বাগান। বাগানের পরেই ছোট্ট একটি নদী কল কল রবে বয়ে যাচ্ছে। আশ্রমের বহুমুখী কর্মধারার বিকাশ একদিনে হয় নি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মিশনের কতিপয় বন্ধু তাঁদের দেশে একজন সন্ন্যাসী প্রচারক পাঠাবার জন্য বার বার প্রার্থনা জানাতে লাগলেন বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষের নিকট। শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রার্থনা মঞ্জুর হ'ল এবং মনোনীত হলেন স্বামী ঘনানন্দ মরিশাসের কাজের জন্য। মঠ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে তিনি মরিশাস পৌছেন ১৯৩৯-এর জুলাই মাসে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারারূপী চারাগাছ আজ এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে মিশনের স্থায়ী শাখাকেন্দ্র। মরিশাসের রামকৃষ্ণ মিশন আজ ওখানকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রধান মিলনকেন্দ্র।

আজ ৪ঠা ডিসেম্বর। মন্দির-প্রতিষ্ঠার দিন। ভোরেই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে আসা হ'ল পুরনো ঠাকুরঘর থেকে নতুন মন্দিরে। নতুন মন্দিরের বেদীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বড় সুসজ্জিত প্রতিকৃতি আগেই রাখা হয়েছিল। তারই সম্মুখে তিনটি আসনে এই প্রতিকৃতিত্রয় স্থাপন করলেন পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ। 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' অধিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করলেন, প্রদীপ-হাতে করলেন আরাত্রিক। পরদিন সকালে ধর্মসভা। সভাপতি পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ, প্রধান অতিথি মরিশাসের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ স্যার শিউসাগর রামগুলাম। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য এই শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের দ্বার আজ থেকে উন্মুক্ত হ'ল, ঘোষণা করলেন পূজ্যপাদ প্রেসিডেন্ট মহারাজ। আনুষ্ঠানিক ভাবে দ্বারোদ্ঘাটন করলেন নব-নির্মিত মন্দিরের। তাঁর ভাষণে তিনি বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন জগতের সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক। মন্দিরে এসে তাঁর কাছে যারা ধন-সম্পদ প্রার্থনা করবে, তারা পাবে ধন-সম্পদ। আর যারা প্রার্থনা করবে শান্তি ও মুক্তির জন্য, তারা পাবে শান্তি ও মুক্তি। এই মন্দিরে এসে নিজ নিজ ধর্মজীবনের অনুপ্রেরণা নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানালেন। প্রধান মন্ত্রী ভাষণ দিলেন চমৎকার। তাঁর ভাষণে তিনি তাঁর অতীত জীবনের স্মৃতিমন্থন ক'রে বললেন, তাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল মরিশাস রামকৃষ্ণ মিশনের গোড়া থেকেই মিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার। স্বামী ঘনানন্দের সময় মিশন-পরিচালিত ডিস্পেনসারীতে ডাক্তার হিসাবে রোগীর সেবা করবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বাধ্যক্ষকে মরিশাসে দর্শন করতে পেয়ে তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন।

এই ক'দিনের মধ্যেই অল্প অল্প ক'রে দ্বীপটিকে মোটামুটিভাবে আমরা দেখে নিয়েছি। ছোট দ্বীপ, আয়তনে ৭২০ বর্গ মাইল। লম্বা ৩৮ মাইল এবং চওড়া ২৮ মাইল। লোকসংখ্যা মোটামুটি নয় লক্ষ।

পরিচ্ছন্ন দেশ; অধিবাসীরা অত্যন্ত শ্রম-সহিষ্ণু। দ্বীপটির বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝ দিয়ে উঁচু নীচু পাহাড় বেষ্টন ক'রে চলে গেছে সুদৃশ্য পিচবাঁধানো সড়ক। বার মাসই অল্প বিস্তর বৃষ্টি হয় ব'লে সমস্ত দ্বীপটি সবুজ বনরাজিতে সুশোভিত। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে কোথাও চলে গেছে সরকারী সড়ক বা বনবিভাগের পথ। আর রাস্তার দুধারে যত দূর দৃষ্টি যায় মাইলের পর মাইল শুধু আখের খেত। সবুজে সবুজ। এই আখ জুড়ে আছে দেশের দুই পঞ্চমাংশ জমি। দেশের মোট আয়ের তিরানব্বই ভাগ এই আখ থেকে। আর অধিকাংশ লোকের জীবিকা এই কৃষিজ আখ-শিল্প অবলম্বনে।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হ'ল ভারতীয় হিন্দু। ষোল শতাংশ ভারতীয় মুসলমান। আর আছে ক্রিয়ল ও কয়েক হাজার চীনা। চীনাদের বেশীর ভাগই ব্যবসায়ী। ইওরোপীয় ও আফ্রিকান অথবা ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের মিশ্রণে বর্ণসঙ্কর জাতি এই ক্রিয়ল। দেশের সরকারী ভাষা ইংরেজী। তবে শিক্ষিতমাত্রেই ফরাসী ও ইংরেজীতে অনর্গল কথা বলে। অধিবাসীদের এক বড় অংশ কথা বলে হিন্দীতে। তাছাড়া আছে ক্রিয়ল ভাষা—ফরাসী ও ইংরেজীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন ভাষা। বাড়ীতে সবাই ক্রিয়ল ভাষায় কথা বলে। বলতে গেলে ক্রিয়লই মরিশাসদের মাতৃভাষা।

মরিশাসে রেলগাড়ী নেই। তবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে যানবাহনাদির ব্যবস্থা খুব সন্তোষজনক। বাসে ক'রে দ্বীপের যে-কোন স্থানে যাওয়া যায়। তাছাড়া আছে অসংখ্য ট্যাক্সি। আর মরিশাসে যত প্রাইভেট কার দেখেছি অন্ত কোথাও এমন দেখিনি। রাস্তায় বেরুলে মানুষের চেয়ে প্রাইভেট কারেরই সংখ্যা যেন বেশী মনে হয়। ওখানে বলে, Every second man has got a car—প্রত্যেক দ্বিতীয় ব্যক্তির একখানা ক'রে গাড়ী আছে। কথাটা অতি-রঞ্জিত হলেও একেবারে মিথ্যা নয়। পোশাক পরিচ্ছদ ফরাসী ও ইংরেজদের অনুকরণে, তবে মেয়েদের মধ্যে শাড়ীর বহুল প্রচলন আছে।

পোর্ট লুইস দেশের রাজধানী ও প্রধান সামুদ্রিক বন্দর। ১৭৩৬-এ শহরটির গোড়া-পত্তন করে ফরাসীরা। ১৭১৫ থেকে ১৮১০ পর্যন্ত মরিশাস ছিল ফরাসীদের অধিকারে। পোর্ট লুইস শহরের একাংশ সমতল; অপরাংশ পার্বত্য। দৃশ্য খুব সুন্দর। দূর থেকে ছবির মতো দেখায়। রঙিন ছবি। বড় বড় অট্টালিকা ফরাসী স্থাপত্যের স্বাক্ষর বহন করে। রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত। বন্দর ছাড়া দেখবার মতো আছে পার্লামেণ্ট হাউস, রাজভবন, মিউজিয়াম প্রভৃতি। মরিশাসের ছোট শহরগুলির মধ্যে বৌবাসিন, রোজহিল, কেতারবন, ভ্যাকুয়া ও কিউপিপের দৃশ্য অতি মনোরম। তাছাড়া আছে মৎস্য-শিকারের প্রধান কেন্দ্র মাহেবু এবং বহুসংখ্যক সমুদ্র-সৈকত। এগুলি দেশবিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

দীর্ঘ দিন ওদেশে থাকা সত্ত্বেও এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতন সত্ত্বেও ভারতীয় হিন্দুরা তাদের পিতৃপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে নি। তাই আজও মরিশাসে দেখতে পাই বহুসংখ্যক শিবমন্দির এবং হিন্দুদের অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির। মন্দিরগুলিতে নিত্য পূজা ও উৎসবাদি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ওদেশে হিন্দু-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হ'ল মন্দিরগুলি।

আজ ৭ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার। আমাদের মরিশাস ছাড়ার দিন। প্লেন ছাড়বে ভারতীয় সময় রাত সাড়ে সাতটায়; মরিশাসের সময় সন্ধ্যা ছটা। সেভাবে তৈরী হয়ে আমরা বিমানবন্দরে এলুম। সঙ্গে এলেন স্বামী অপরানন্দ, স্বামী সুদর্শনানন্দ এবং বেশ কিছু-সংখ্যক ভক্ত, পূজ্যপাদ প্রেসিডেণ্ট মহারাজকে বিদায়-সংবর্ধনা জানাতে। বিমানবন্দরে এসে শুনলুম সেদিন বোম্বের আবহাওয়া নাকি খারাপ। প্লেন দেরীতে আসবে, সুতরাং ছাড়বেও দেরীতে। লাউঞ্জে বসেই আমরা অপেক্ষা করছি প্লেনের। শেষ পর্যন্ত প্লেন এল ভারতীয় সময় রাত আটটায়, মরিশাসের সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা উঠলুম প্লেনে। সেদিন প্লেন একটানা যাবে, কোথাও থামবে না। ভারতীয় সময় নটায় আমাদের প্লেন মরিশাসের মাটি ছাড়ল। ছাড়ার অল্পক্ষণ পরেই রাত্রের খাবার পরিবেশন করা হ'ল। ক্রমে ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর পার হয়ে প্লেন যখন বোম্বের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে নামল তখন ভারতীয় সময় রাত আড়াইটা। আমাদের যাত্রা শেষ হ'ল। সঞ্চয় ক'রে নিয়ে এলাম একটি নতুন সুন্দর দেশ দেখার অভিজ্ঞতা। স্মৃতিভাণ্ডার সমৃদ্ধ হ'ল একটি নতুন সুখের স্মৃতির সংযোজনে।

সমালোচনা

যুগ-জীবনম্ঃ লেখিকা ও প্রকাশিকা: ডক্টর রমা চৌধুরী, সম্পাদিকা, প্রাচ্যবাণী, ৩, ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। (১৯৭৭), পৃষ্ঠা ১০৪+২৪+১৫, মূল্য দশ টাকা।

বর্তমানে একটি গুরুতর মূলীভূত সমস্যার আমরা সম্মুখীন হইয়াছি। তাহা হইল এই যে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে, প্রযুক্তি-বিস্তার যুগে, যন্ত্র-সভ্যতার যুগে, ব্যাবহারিক প্রয়োগের যুগে দেবভাষা সংস্কৃতের স্থান এবং প্রয়োজন আছে কতটুকু, কতটুকুই বা আছে উহাতে প্রাণ এবং সজীবতা। কারণ, এই প্রসঙ্গে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, সংস্কৃত এক দিকে অতি প্রাচীন ভাষা—নবীন যুগে যাহা বাতিল করিয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য। অন্য দিকে সংস্কৃত মৃত ভাষা, যে ভাষায় বর্তমানে কথোপকথন চলে না, পঠন-পাঠন চলে না, লেখন-রচনও চলে না। এই ধারণাসমূহ যে কতদূর ভ্রান্ত এবং অজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। প্রাচীন হইলেই কি কোনো কিছু ঘৃণাভরে বর্জনীয়? তাহা হইলে চন্দ্র-সূর্যও ত বর্জনীয়, হিমাচল-গঙ্গাও সমভাবে বর্জনীয়,—বর্জনীয় সকল সত্য, সকল ধর্ম, সকল ন্যায়, সকল নীতিও সমভাবে। কি অত্যদ্ভুত কথা এইটি! পুনরায়, গীর্বাণ-বাণী সংস্কৃত যে মৃত নয়, উপরন্তু অতি প্রাণবন্ত, অতি শক্তিশালী, অতি প্রগতিশীল, তাহারও বহু প্রমাণ আমরা পাই তে সংস্কৃত-বিরোধী বর্তমান সমাজেও। যথা, বর্তমানেও ভারতবর্ষে এরূপ বহু ব্যক্তি আছেন, সংস্কৃতেই যাঁরা কথোপকথন করেন। সংস্কৃত পত্র-পত্রিকার সংখ্যাও অল্প নহে; এবং সংস্কৃতে পুস্তক-রচনাও হইতেছে প্রচুর।

ইহারই একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ পুনরায় পাইয়া কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেছি। তাহা হইল —প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে নিপুণা, সুলেখিকা ডক্টর রমা চৌধুরী বিরচিত আধুনিক সংস্কৃত

নাটক ‘যুগ-জীবনম্’। এই নাটকটি যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দিব্য-জীবনীমূলক এবং ইহার দশটি দৃশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের ভগ্ন বিগ্রহ সম্বন্ধে গদাধরের বিধানদান, জগন্মাতার দর্শন-লাভের জন্য গদাধরের ব্যাকুলতা, গদাধরের নিয়মবিহীন প্রাণোত্থ পূজা-পদ্ধতিবিষয়ে পুণ্য-শ্লোকা রাণী রাসমণির অনুপম নির্দেশ, গদাধরের ভৈরবী-ব্রাহ্মণী-গুরুলাভ, গদাধরের অবতারত্ব বিষয়ে প্রমাণ, গদাধরের অদ্বৈতবেদান্তবাদী তোতাপুরী নামক গুরুলাভ, শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য গার্হস্থ্য জীবন ও ষোড়শীপূজা, শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসাধক-লাভ, শ্রীরামকৃষ্ণ-‘কথামৃত’, শ্রীরাম-কৃষ্ণের ‘কল্পতরু’-রূপ-ধারণ ও অভয়-প্রকাশ, শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্রের নিকট স্বীয় অবতারত্ব বিষয়ে শেষবারের মতো স্পষ্টতম মত-প্রকাশ, শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীসারদামণি দেবীর উপর ভারার্পণ এবং শ্রীসারদামণি দেবীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। সুতরাং এই নাটকটিতে স্বল্প পরিসরে হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণের ঘটনাবহুল বিরাট বিশাল জীবনের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র পাওয়া যায়।

ডক্টর রমা চৌধুরী দেশে-বিদেশে তাঁহার সুগভীর দর্শনজ্ঞান, দর্শন-অধ্যাপনায় বিশেষ নৈপুণ্য এবং দর্শন-গবেষণামূলক পুস্তক-প্রবন্ধাদির জন্য সুবিদিত ও সুসমাদৃত। কিন্তু তিনি যে সংস্কৃত নাটক, শ্লোক ও সঙ্গীত রচনাতেও সমান, অথবা অধিক সিদ্ধহস্তা, তাহার সুষ্ঠু সুন্দর সুস্পষ্ট প্রমাণ তাঁহার সাম্প্রতিক কালে রচিত আধুনিক সংস্কৃত নাটকাবলীর মধ্যে পাইয়া আমরা সংস্কৃতানুরাগিগণ বিশেষ করিয়া অতীব মুগ্ধ চমৎকৃত ও আনন্দিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা সত্ত্বেও আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীলা লেখিকা সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর ধরিয়া তাঁহার অনবদ্য রচনা ও ভাষণের মাধ্যমে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারে নিয়োজিতপ্রাণা। তাঁহার নাটকাবলীর মধ্যে সেই নিগূঢ় আধ্যাত্মিকতার আভাস পাইয়া আমরা পরম তৃপ্ত। বর্তমান নাটকটি, তিনি নিজেই বলিয়াছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদ-পদ্মে নিবেদিত তাঁহার বিনীত শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং ইহার প্রথম অভিনয়ের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ স্বয়ং ১৯৬৭ সালে। নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া তিনি সানুগ্রহে একটি আশীর্বাণীও প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহা গ্রন্থের প্রারম্ভে মুদ্রিত হইয়াছে।

নাটকটির ভাষা অতি সহজ সরল সুখবোধ্য সুললিত ও সুমধুর। সংস্কৃত যে অতি দুরূহ কঠিন ভাষা, এই সাধারণ ধারণা নাটকটি পাঠ করিলে বহুলাংশে বিদূরিত হইবে। নাটকে সন্নিবিষ্ট বহুসংখ্যক শ্লোক, সঙ্গীত এবং সংস্কৃতে রূপায়িত সঙ্গীত ইহার বহুল সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। দুইটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে—

‘ঘনকৃষ্ণাবগুণ্ঠন-কলিতা, শ্বেত-তারকা-খচিতাঞ্চল-লসিতা, নৈশ-কুসুম-সুরভিবাসিতা, স্নিগ্ধ-শীতল-সমীরণবীজিতা, প্রসন্ন-ঝিল্লীরব-নিনাদিতা ইয়ং মধুর-মোহনা রজনী। শান্তি-ধারিণী, ক্লান্তিহারিণী ক্রান্তিকারিণী চ সা। ততঃ সৈব আন্তর-সাধনায়া নির্জন-তপস্যায়া নীরব-প্রার্থনায়াঃ সর্বশ্রেষ্ঠ-কালরূপেণ গণনীয়া। অহমপ্যদ্য রাত্রৌ মম পরমাদরিণীং সন্তান-সুখ-সাধিনীং মঞ্জু-মোহন-হাসিনীম্ আনন্দামৃত-বর্ষিণীং জগজ্জননীং নিভৃত-হৃদয়কেন্দ্রে পশ্যামি, স্পৃশামি তস্যাঃ কমল-কোমল-লোহিত-লসিত-

শ্রীচরণদ্বন্দ্বং, শৃণোমি তস্যাঃ স্নিগ্ধ-শীতল-সরল-শোভন-বাণীম্। অহো! পরম-সৌভাগ্যং মম।' (পৃঃ ৫৬)

'মনস্ত্বং কৃষিবিদ্যাহীনম্।
ঈদৃঙ্ মানবক্ষেত্রং স্থিতং পতিতং
কর্ষণেন ভবেৎ স্বর্ণপ্রদম্।' (পৃঃ ২৫)
('মন তুমি কৃষিকাজ জান না,
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।')

ডক্টর রমা চৌধুরী আরো ২০।২১টি আধুনিক সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া এবং দেশে-বিদেশে সেগুলি বহুবার ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক অভিনীত করাইয়া আধুনিক সংস্কৃত নাট্য-আন্দোলনের অন্যতমা পুরোধাস্থানীয়া হইয়াছেন। তাঁহার জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক এই প্রার্থনা। শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগিবৃন্দ এবং অন্যান্য সকলে এই সর্বাঙ্গসুন্দর নাটকটি পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত ও উপকৃত হইবেন বলিয়াই আমাদের স্থির বিশ্বাস।

স্বামী সেবানন্দ পুরী

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারত ঃ (১) ত্রিপুরা বন্যাত্রাণ। পানিসাগরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত চল্লিশটি টিনের ছাদযুক্ত পাকা বাড়ী চল্লিশটি উপজাতি পরিবারকে ২৪শে মে ১৯৭৭ তারিখে দেওয়া হইলে ১৯৭৬ সালে আরব্ধ উক্ত ত্রাণকার্যটি সম্পূর্ণ হয়।

(২) অরুণাচলে অগ্নিত্রাণ। শিয়াঙ জেলায় আলঙের সন্নিকটে একটি অগ্নিবিধ্বস্ত গ্রামে ত্রাণকার্য শুরু করা হইয়াছে।

বাংলাদেশ ঃ বাগেরহাট ঢাকা দিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা ও গুঁড়া দুধ বিতরণ অব্যাহত আছে।

কার্যবিবরণী

মায়াবতী দাতব্য হাসপাতালের ১৯৭৫-৭৬ সালের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

২৩টি শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে আলোচ্য বর্ষে ৩৯৪ জন রোগীর

চিকিৎসা করা হয়। বহির্বিভাগে ১৮,৩৮১ জন (৭,১৩১ নূতন ও ১১,২৫০ পুরাতন) রোগী চিকিৎসিত হন।

এই হাসপাতালটিতে ১৩টি পট্টীর লোক চিকিৎসার সুযোগ পায়। প্রতি পট্টীতে প্রায় ১১২টি গ্রাম আছে। ফলতঃ ১৪ শতেরও বেশী গ্রাম উপকৃত হয়। গড়ে ১০ মাইল দূর হইতে রোগীরা চিকিৎসার জন্য আসেন। কখন-কখন টনকপুর পিথোরাগড় নেপাল প্রভৃতি বহুদূরবর্তী স্থান হইতেও রোগীরা আসেন।

প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের জন্য হাসপাতালটির ১২,৭৫০ টাকা প্রয়োজন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এইজন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

কালাডি রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র গত এস্. এস্. এল্. সি. পরীক্ষায় সমগ্র কেরল রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ কর্তৃক ১৯৭৭ সালের কেন্দ্রীয় বোর্ড পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রেরিত ২৬ জন ছাত্রের মধ্যে ২৪ জন প্রথম বিভাগে ও একজন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়; একজন কম্পার্টমেণ্টাল পায়। দুইজন ছাত্র বিজ্ঞানশাখায় দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্থান অধিকার করে।

মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগর রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র তামিলনাড়ুর গত এস্. এস্. এল্. সি. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে। মাদ্রাজ শহরের সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে সে প্রথম হইয়াছে।

বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন (কলিকাতা) বিদ্যার্থী আশ্রমের একজন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এম্. এস্.সি. (পদার্থবিদ্যা) পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। যে ছাত্রটি প্রথম হইয়াছে, সে ঐ আশ্রমেরই প্রাক্তন ছাত্র।

অন্যান্য সংবাদ

ঢাকা কেন্দ্রের সংস্কৃতি-ভবনটির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, অধ্যাপক আবুল ফজল ২রা মে ১৯৭৭ তারিখে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

মাদ্রাজ কেন্দ্র পরিচালিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (গ্রিফিথ রোডে অবস্থিত) নূতন ভবনের উদ্বোধন করেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল ২০শে জুন ১৯৭৭ তারিখে।

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণকল্পে গত ১৪ই জুলাই (১৯৭৭) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সন্ন্যাসী ও অনুরাগিবৃন্দের এক বৃহৎ সমাবেশে একটি বহু-তল ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

গত ২৪শে জুলাই সেবাপ্রতিষ্ঠানের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও পরিবার-কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্মরণিকার তিনি উদ্বোধন করেন এবং তাঁহার ভাষণে চিকিৎসকগণের আদর্শের উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিম বঙ্গের পূর্ত ও গৃহ-নির্মাণ মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী। তিনি পরিকল্পিত বহু-তল ভবনটির নির্মাণকার্যের সূচনা করেন এবং তাঁহার ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনের শিবজ্ঞানে জীবসেবার মহান আদর্শের উল্লেখ করেন। প্রারম্ভে সম্পাদক স্বামী গহনানন্দ

সেবাপ্রতিষ্ঠানের অতীত ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিবরণী পাঠ করেন। ভাবী সম্প্রসারণের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যে-এগারটি ভূ-খণ্ড অধিগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে সরকার এযাবৎ পাঁচটি ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠানকে অর্পণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট ছয়টি ভূখণ্ড সরকারের নিকট হইতে এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রাপ্ত জমিতে একটি সপ্ততল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে, তবে আপাততঃ চারিটি তল এবং ভূ-নিম্নস্থ তলটি নির্মিত হইবে। ইহাতে ব্যয় হইবে আনুমানিক ৬২ লক্ষ টাকা। এজন্য তিনি সরকার, সহৃদয় জনগণ ও কল্যাণব্রতী সংগঠনগুলির নিকট অকুণ্ঠ অর্থসাহায্যের আবেদন জানান।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রতিষ্ঠা-বাসরীয় ভাষণদান করেন।

দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী জ্ঞানদানন্দ (নীলকণ্ঠ মহারাজ) গত ৭ই জুলাই (১৯৭৭) বেলা ১২-২০ মিনিটে ৮৪ বৎসর বয়সে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। মস্তিষ্কে রক্ত-সংবহনের আকস্মিক বিপর্যয়ের ফলেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২১ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯২৪ সালে তিনি স্বীয় মন্ত্রগুরুর নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। মালদা ও বাঁকুড়া কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত তিনি বেলুড় মঠ ও বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে পূজারী ও ভাণ্ডারীরূপে সংঘ-সেবা করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত কেন্দ্রে এক দশকেরও অধিককাল তিনি অবসর-জীবন যাপন করিতে-ছিলেন।

স্বামী শ্রীকরানন্দ (শ্রীধরন মহারাজ) গত ২৫শে জুলাই (১৯৭৭) বেলা ২-৩০ মিনিটে ৬১ বৎসর বয়সে রামকৃষ্ণ আশ্রম ত্রিবান্দ্রম হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। হৃদযন্ত্রের দৌর্বল্যজনিত রক্ত-সংবহনের অক্ষমতা এবং মূত্রাশয় সংক্রামিত হওয়ার ফলেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তিনি সংঘে যোগদান করেন (বঙ্গলুর বেদান্ত কলেজে) এবং ১৯৫২ সালে শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। নটরমপল্লী আশ্রমের অধ্যক্ষতা ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সময়ে ত্রিচুর কালিকট পোনামপেট কালাডি সেলম রেঙ্গুন সোসাইটি সিঙ্গাপুর ও ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

পাখানজোড় (দণ্ডকারণ্য) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২০শে ও ২১শে ফেব্রুআরি ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি পালিত হয়। ২০শে মঙ্গলারতি প্রভাতফেরি বিশেষ পূজা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। প্রায় এক হাজার ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ পান। বিকালে

'রামায়ণ গান' হয় এবং রাত্রিতে 'মহীরাবণ বধ' নাটক অভিনীত হয়। ২১শে আশ্রম-শিল্পিগণ কর্তৃক 'দক্ষিণেশ্বরের মন্দির' (পাগল ঠাকুর) নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব এবং কল্পতরু-উৎসবও আশ্রমে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

মালকানগিরিতে (দণ্ডকারণ্য) গত ২০শে ও ২১শে ফেব্রুআরি ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ২০শে মঙ্গলারতি প্রভাতফেরি বিশেষ পূজা কালী-কীর্তন বেদপাঠ ও কথামৃতপাঠ হয়। পরে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরিত হয়। বিকালে ধর্ম-সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে ভাষণ দেন অধ্যাপক শরৎ মহান্তি। পরে জয়পুরের বেতার-শিল্পিগণ কর্তৃক ভজন ও কীর্তন গান হয়। ২১শে ধর্মসভায় লীলাগীতির পর ডঃ টি. কে. কাঞ্জিলাল ও শ্রীরামচন্দ্র পাণ্ডা এবং সভাপতি শ্রী এস. পানি শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

খিদিরপুর সুরবিতান কর্তৃক গত ২০শে ফেব্রুআরি ১৯৭৭, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। সংস্থাধ্যক্ষ শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এবং ভাষণ দেন।

পরলোকে

হাওড়ার স্বনামধন্য প্রখ্যাত আইনজীবী ও সমাজসেবী **প্রভাসচন্দ্র মল্লিক** গত ৬ই জুলাই ১৯৭৭ কলিকাতার বেলভিউ নার্সিং হোমে ৮৬ বৎসর বয়সে থ্রম্বসিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন। তিনি পঁচিশ বৎসর হাওড়ার সরকারী উকীল হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও অন্যান্য আইন বিষয়ে সমান পারদর্শী ছিলেন। হাওড়া বার এসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ লইয়ার্স এসোসিয়েশন এবং হাওড়া যক্ষ্মা হাসপাতালেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের আইনবিষয়ক পরামর্শদাতা হিসাবে ও উকীল হিসাবে তিনি আজীবন কার্য করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মানবদরদী আদর্শনিষ্ঠ দৃঢ়চেতা ও কর্তব্যপরায়ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তের অভাবে আমরা বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা [পুনর্মুদ্রণ]

রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ [পূর্বানুবৃত্তি]

(গত সংখ্যার শেষ লাইন: একটি স্ত্রীলোক—পতি ও কয়েকটী সন্তানসহ—কোন পল্লীর নিকট আসিয়া বসিল ও)

অনতিবিলম্বে ধড়ফড় করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। লোকে নিকটে গিয়া তাহার স্বামীর নিকট শুনিল, স্ত্রীলোকটি আসন্নপ্রসবা ছিল, ক্ষুধার তাড়নায় গৃহ হইতে চলিয়া আসিয়াছিল, পথ-পর্য্যটনে, অনাহারে ও শীতে মুমুর্ষুপ্রায় হইয়াছিল, তাহার উপর প্রসববেদনা আসিয়াছিল।

সেদিন একটি বালক আপনার কনিষ্ঠটিকে, অর্দ্ধেক ক্রোড়ে ও অর্দ্ধেক টানিয়া আনিয়া অনাথালয়ে উপস্থিত করিল। তখনি তাহাদিগকে কিছু খাইতে দিয়া ছোট ছেলেটিকে একখানি চারপাইয়ে শোয়াইয়া হাঁসপাতালে পাঠান হইল। কিছুক্ষণ পরে অনুসন্ধান লওয়াতে শুনা গেল ছেলেটির নিমোনিয়া (Pneumonia) হইয়াছিল, মারা গিয়াছে।

উপরোক্ত চিত্রগুলিতে এ সব দেশে আর নূতনত্ব কিছু নাই। এই জাতীয় ঘটনা এ অঞ্চলে প্রায় নিত্যই ঘটিতেছে।

কেতাব পড়িয়া ও বন্ধুবান্ধবের সহিত আলোচনা করিয়া জগৎস্রষ্টা, জগৎ ও পরস্পরের সম্বন্ধ সম্বন্ধে কতই সিদ্ধান্ত করা যায়। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনায় কতবার দেখিলাম সিদ্ধান্তগুলি সিদ্ধ না হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। দয়াময় স্রষ্টার অস্তিত্বের সহিত এই মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার অস্তিত্বের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া করা যায় বলিতে পারি না। এই ঘোর নিষ্ঠুর সংহারমূর্ত্তিতে,—যাঁহার দীর্ঘ ছায়া সমস্ত রাজপুতানা ও অন্যান্য দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশসমূহে পড়িয়াছে, মৃত্যু যাঁহার নিঃশ্বাস, জগৎশোষণ অগ্নি যাঁহার জিহ্বা, অসি ও মুণ্ডমালা যাঁহার অলঙ্কার, যাঁহার পদভরে মেদিনী টলটলায়মানা, সেই ঘোরা আসবপানোন্মত্তা, উলঙ্গিনী, এলোকেশী প্রতিমারই সার্থকতা দেখিতে পাই।

যাহা হউক, আমি যাহাই দেখি, Metaphysical তর্কের এ সময় নয়। যাহাদের আত্মীয় স্বজন কেহ জীবিত নাই, যাহাদের আত্মীয় স্বজন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে চলিয়া গিয়াছে অথবা যাহাদের আত্মীয়গণ কোনরূপে তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে পারে না, এতাদৃশ বালকবালিকাগণের এ দুর্দ্দিনে কত কষ্ট তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। তাহাদের সাহায্য করাই স্বামী কল্যাণানন্দের বিশেষ লক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত সম্ভব হইলে সাধারণকে সাহায্য করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন। এই কার্য্যের সহায়তার জন্য যদি কেহ কিছু দান করিতে ইচ্ছা করেন, দয়া করিয়া "উদ্বোধন" সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন অথবা রাজপুতানা কৃষ্ণগড় অনাথালয়ে স্বামী কল্যাণানন্দের নামে পাঠাইবেন।

স্বামী কল্যাণানন্দ এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সাহায্য পাইয়াছেন, তিনি ধন্যবাদের সহিত নিম্নে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন।

জনৈক সন্ন্যাসী।

প্রাপ্তি স্বীকার।

এলাহাবাদের কয়েকটী বন্ধু	৭৷৷০ টাকা।
সখিসমিতি, কলিকাতা	১৫৲ টাকা।
একটী বন্ধু	৫৲ টাকা।

(স্বাক্ষর) কল্যাণানন্দ।

(ভাদ্র, ১৩৮৪, পৃঃ ৪৪১)

সমালোচনা।

সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, ৬ষ্ঠ ভাগ ২য় সংখ্যা।

(পূর্ব্বসংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

সাহিত্যপরিষদের পারিভাষিকসমিতি-বিভাগে তিনটী প্রশাখা-সভা গঠন করিলে ভাল হয় : একটীর—কার্য্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, আর একটীর—যাবতীয় শিল্পিক, এবং তৃতীয়টীর—বিবিধ বিষয়ক (সামাজিক, নাবিক, সৈনিক, বাণিজ্যিক প্রভৃতি) পরিভাষা নির্ণয় করা।

পরিভাষা সমিতির ৩টী প্রশাখা।

শিল্পিক পরিভাষা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "যন্ত্র-বিজ্ঞানের পরিভাষা" এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন) প্রস্তুত করিতে গেলে অনেক বিদেশীয় কথা প্রবেশ করাতেই হইবে ; যদি সৃষ্টি-করা সংস্কৃত কথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করা যায়—শ্রম সম্পূর্ণ সার্থক হইবে না। কঠিন বাঙ্গালা অর্থাৎ সংস্কৃতভাঙ্গা-বাঙ্গালা, কেবল পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতে পারে। আর যাহারা শিল্পী—যাঁহারা "হাতে কলমে" সে সকল কর্ম্ম করেন, এবং জনসাধারণে, সেই চলিত-কথাই ব্যবহার করিবেন, তা ইংরাজিই হউক, আর ফার্সিই হউক।

মনে করুন—ছাপাখানার ব্যাপার। এখানে পনরআনা-উনিশগণ্ডা কথা ইংরাজী ; কায করছে অতিমূর্খলোকে—যাহাদের ক-অক্ষর গোমাংস, যাহারা হয়ত অতি বালক—কিন্তু কইতেছে ইংরাজী ! কি করিবে ? বাঙ্গালা দেশে ত ও-পাঠ ছিল না ; ছাপাখানার কাজ ইংরাজি-শিল্প, পরিভাষাও ইংরাজী। নিরক্ষর কম্পোজিটারগণও ইম্পোজ, বড্‌কিন, গেলী, ফ্রেম, কেস, ফ্রেঞ্চ-রুল, রেজ্লিং, মেকঅপ, লক্‌-অপ্‌, ইণ্ডেণ্ট প্রভৃতি ঝুড়ি ঝুড়ি ইংরাজী পরিভাষাই, চলিত সরল বাঙ্গালার ন্যায়, ব্যবহার করে। এই সকলের পরিবর্ত্তে দুরূহ সংস্কৃত কথা সৃষ্টি করিয়া দিন, তাহারা নিজেদের পূর্ব্ব বুলি কখনই বদলাইতে পারিবে না। "প্রিণ্টিং প্রেসের" বদলে "মুদ্রাঙ্কন-যন্ত্র", "টাইপের" বদলে "মুদ্রাক্ষর" কখনই তাহারা ব্যবহার করিতে পারিবে না।

ছাপাখানার পরিভাষা।

অনেকগুলি কথা কম্পোজিটাররা ইংরাজী ও বাঙ্গালা মিশাইয়া ব্যবহার করে ;—মেকাপ-শেষ, ময়লা-প্রুফ, প্রুফ-কাগজ, আধ-এম, গুলি-গটর, আট-পেজী ইত্যাদি। কতকগুলি ইংরাজী কথাকে অপভ্রংশ করিয়া ব্যবহার করে, যথা—Space ইস্পেস্‌, Cutter কাতুরি, Ordered forme অর্ডারীফর্ম্মা ইত্যাদি। কতকগুলি জিনিস আছে—যে সকল এ দেশে খুব চলিত এবং যে সকলের বাঙ্গালা নাম আছে, সে সকলের সেই বাঙ্গালা (?) নামই ব্যবহার করে ; যথা—সাজিমাটী ("ফুলার্স আর্থ" বলে না), শিরীষ ('Glue' বলে না), মেজ (টেব্‌ল্‌), কালীর শীল (ইঙ্কিং টেব্‌ল) ইত্যাদি।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি ইংরাজী কথার এইরূপ বঙ্গানুবাদ (বা সংস্কৃতানুবাদের বাঙ্গালা উচ্চারণ) করিতেছেন, যথা—"ফলক্রম্‌" = স্তম্ভক, "লিভর্‌" = তোলক, "পেণ্ডুলম্‌" = দোলক, "স্ক্রু" = আবর্ত্তক, "স্প্রিং" = প্রহাঁপক। অনুবাদগুলি অতি সুন্দর

হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা কি চলিত-বাঙ্গালার পক্ষে সুবিধা হইবে? কার্য্যক্ষেত্রে চলিত-বাঙ্গালায় (ঐ ইংরাজী নামই) চালাইতে হইবে কি -চলিয়া গেছে। যত সব বাক্স-সারাওয়ালারা, যারা ফিরি করিয়া বেড়ায়, তাহারাও বলে "দুই লিবারের চাবি, তিন লিবারের চাবি" ইত্যাদি। ছোটলোক ভদ্রলোক, ছেলে মেয়ে বুড়ো—সকলেই ত আমরা "ইসক্রু" (বা "ইস্কুপ"), "ইস্প্রিং", "পেণ্ডুলম" ইত্যাদি কথাই ব্যবহার করি; ভাবও বেশ প্রকাশ হয়; কার্য্যও বেশ চলে। আচ্ছা বলি—সেলেট পেন্‌সিল, উট্ পেন্‌সিল, ফাইল প্রভৃতির বাঙ্গালা রচনা করিয়া চলিত-ভাষায় চালান সম্ভব কি? নূতন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা (বা বিকৃত সংস্কৃত) প্রতিশব্দ প্রস্তুত করেন—খুব ভাল; অধিকন্তু ন দোষায়। খুব উঁচু ধরণের বাঙ্গালা বই তোএর করতে ইচ্ছে হ'ল,—যত বিদেশীয় কথার নূতন বাঙ্গালা সৃষ্টি করিয়া ব্যবহার করুন, নানা রকমের কায়দা ও ধরণ ধারণ দেখান, বহুবিধ রত্নাদিতে গ্রন্থখানিকে ভূষিত করুন—দেখিতে, শুনিতে, পড়িতে—অতীব উত্তম হইবে সন্দেহ কি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তলায় একটু টীকের আগুন জ্বালিতে হইবে বোধ হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক কতকগুলি শব্দের সংস্কৃতানুবাদ।

বাঙ্গালা ভাষাতে বিদেশী কথা চালান ত দূরের কথা, সংস্কৃত ভাষাতেই এক সময়ে অনেক বিদেশী কথা চলিয়া গিয়াছে—আজও আমাদের অনেকে হয়ত সেই সকল কথা সংস্কৃত বলিয়াই জানেন! আমাদের ফলিত জ্যোতিষে "দ্রেক্কাণ" বলিয়া একটী কথা পাওয়া যায়: প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশে (ইংরাজী ৩০ ডিগ্‌রী) বিভক্ত, তাহার তিন ভাগের এক ভাগকে "দ্রেক্কাণ" কহে; প্রত্যেক রাশিতে তিনটী করিয়া দ্রেক্কাণ আছে। বিশ্বকোষ প্রভৃতি কোনও অভিধান বা শব্দভাণ্ডারে দ্রেক্কাণের ব্যুৎপত্তি নাই। কেবল মাত্র উইলসন সাহেব তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে বলিতেছেন যে, দ্রেক্কাণ হয়ত ইউরোপীয় ফলিত জ্যোতিষের "ডিকেনস্" নামক কথা হইতে উৎপন্ন। কিন্তু বোধ হয়, "ডিকেনস্" হইতে নহে, গ্রীক 'ড্রেকনিস' বা ইংরাজী ড্রেগন্ (একটি কন্‌ষ্টেলেশন বা নক্ষত্রপুঞ্জ) হইতে উৎপন্ন। অথবা দ্রেক্কাণ = দৃক্কর্ণ = ড্রেগন্; দৃক্কর্ণ অর্থ সর্প, ড্রেগনের অর্থও প্রায় সেইরূপ। জ্যোতিষশাস্ত্রে আরও এমন অনেক শব্দ আছে, যে সকল শুনিলেই বোধ হইবে যে, তাহাদিগের উৎপত্তি সংস্কৃত হইতে নহে, খুব সম্ভবতঃ গ্রীক ভাষা হইতে, যেমন, কৌর্প্য অর্থাৎ বৃশ্চিক রাশি (বোধ হয় গ্রীক স্কর্পিয়স্ হইতে), তাবুরি অর্থাৎ বৃষ রাশি—গ্রীক 'টাউরস্'; আকোকের অর্থাৎ মকর রাশি, এবং লিয়া অর্থাৎ সিংহরাশি - সম্ভবতঃ ল্যাটিন কাপ্রিকর্ণস ও লিও হইতে উৎপন্ন। খানকতক এমন সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্র আছে, যাহা বিদেশীয় মূলক বলিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয়। যেমন পৌলিশ-সিদ্ধান্ত, রোমক-সিদ্ধান্ত, যবন-সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। রোমক সিদ্ধান্তে নাকি শুনিতে পাওয়া যায়, যীশুখ্রীষ্টের কোষ্ঠী আছে; পৌলিশ সিদ্ধান্ত নাকি পৌলিয়স আলেকজাণ্ড্রিনেস্-কৃত। বোধ হয় দ্রেক্কাণ প্রভৃতি কথা গর্গঋষি প্রথম ব্যবহার করেন। গর্গঋষি গ্রীকদিগের প্রতি অতি উচ্চভাব পোষণ করিতেন। গ্রীকেরা ম্লেচ্ছ হইলেও তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষ উৎকৃষ্টরূপে জানিতেন বলিয়া গর্গাচার্য্য তাঁহাদিগকে 'ঋষি' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। গ্রীকগণ দুই শতাব্দীর অধিক (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭-১৬১) ভারতবর্ষে

প্রাচীন সংস্কৃতেও ইয়ুরোপীয় শব্দের প্রচলন দেখা যায়।

(ভাদ্র, ১৩৮৪, পৃঃ ৪৪৩)

আধিপত্য করিয়াছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে এদেশে গ্রীকদিগের অনেক আচার ব্যবহার ও ভাষা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল সন্দেহ কি? কর্ণ সাহেব বলেন গর্গাচার্য্য খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় পর্য্যন্তও বোধ হয় সংস্কৃত ভাষার খুব চর্চ্চা ছিল—আজকালকার মত মৃত-ভাষায় পরিণত তখনও হয় নাই।

৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এই সময়ে, বাঙ্গালা ও হিন্দি প্রভৃতি ভাষার ত কথাই নাই, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে—এমন কি, বেদে পর্য্যন্তও প্রক্ষিপ্ত ভাবে অসংখ্য আরবী ও ফারসী কথা চলিয়া গিয়াছে। বেদে প্রক্ষিপ্তই হউক আর যাহাই হউক—আল্লোপনিষৎ তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। বাঙ্গালায়—কাগজ কলম দোয়াৎ প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য বাক্য, বিদেশীয় ভাষা হইতে আসিয়াছে। ইহাদিগের স্থলে পত্র, লেখনী, মসীপাত্র ইত্যাদি কথন ভাষায় চলন নাই।

আর একটা কথা মনে পড়ে গেল: ছেলেরা মারবেল খেলা করে—সে খেলাটী কোন্ দেশের? আমাদের দেশের কি? সে দিন ৭ বৎসরের ও ৫ বৎসরের দুইটী গরীব ছোটলোকের ছেলে ঐ মারবেল খেলা করিতেছিল; জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলাম তাহারা সবে পাঠশালাতে বর্ণপরিচয় আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ত বেশ থি্, সিক্স, নাইন, টুএল্‌ভ্, এইট্টিন ফোর, নথিং নট্‌এনি, ইত্যাদি বিদেশীয় পরিভাষা ব্যবহার করিতেছে, অর্থ বুঝিতেছে এবং তদনুযায়ী কার্য্যও করিতেছে। এইরূপ স্থলে 'তিন', 'ছয়', 'নয়' ইত্যাদি প্রতিশব্দ তাহাদিগকে এখন হাজার শেখালেও আর 'থি্' 'সিক্‌স্' প্রভৃতি বল্‌তে ছাড়ছে না।

বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী শব্দের মিশ্রণ—অপরিহার্য্য।

এইত গেল নিরক্ষর শিশুদিগের কথা। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্যগণপর্য্যন্তও "শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল বসু মল্লিকের ফেলোসিপের লেক্‌চর", "সপ্তম লেক্‌চর" প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন।

একস্থলে সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন যে, "বাঙ্গলাভাষার ত্রিসীমার মধ্যে একটীও সাঁওতাল ভাষার বা অন্য কোনও জঙ্গলী ভাষার শব্দ নাই"।—ইহা কি সত্য? খুঁজিলে বোধ হয় বাঙ্গলা ভাষা থেকে, বিশেষ পশ্চিমাঞ্চলের চলিত বাঙ্গলা হইতে—অনেক সাঁওতালি শব্দ পাওয়া যায়; এবং দূরবর্ত্তী পূর্ব্ববাঙ্গলা হইতে অনেক জঙ্গলী ভাষার শব্দও পাওয়া যাইতে পারে।

সভাপতি মহাশয় কর্তৃক কতিপয় ইংরাজী শব্দ ও বাক্যাংশের বঙ্গানুবাদ, সমালোচনা-সহ দেওয়া যাইতেছে:— ১। "Division of labour=শ্রমের বিভাজন"। অনুবাদটী সুন্দর হইয়াছে। 'শ্রম-বিভাজন' (স্থল বিশেষে 'শ্রম-বিভাগ') করিলে কি আরও একটু ভাল হয় না?

দ্বি. ঠা. কর্ত্তৃক কতিপয় ইংরাজী শব্দের বঙ্গানুবাদ ও সমালোচনা।

২। "Tendon=স্নায়ু"। "Nerve=তৈজসতন্তু; Ganglion=তৈজসপিণ্ড; Nervous system=এক প্রকার সূক্ষ্মশরীরের সামিল"।—সূক্ষ্ম শরীর হইতেছে নিরাকার, আর 'নর্ভাস সিস্‌টেম্' বলিলে সাকার কোন বস্তুকে বুঝায়—"সূক্ষ্ম-শরীরের সামিল" কি করিয়া হইতে পারে? স্নায়ুকে নর্‌ভ্ বলিলে কিছু ক্ষতি হয় না, টেন্‌ডন্ বলিলে বিশেষ ক্ষতি। এ সম্বন্ধে "স্নায়ু বা নর্‌ভ্"নামক পৃথক প্রবন্ধাকারে পরবর্ত্তী এক সংখ্যায় কিছু বিচার করা যাইবে।

(১৭তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৪৪)

৩। "Centripetal and Centrifugal forces = কেন্দ্রানুগা এবং কেন্দ্রাতিগা" শক্তি।—এই অনুবাদ দুইটী বড় যে ভাল হইয়াছে বোধ হয় না। কেন্দ্রানুগা শক্তি বলিলে যেন কেন্দ্রস্থ শক্তির বলবত্ত্ব ও প্রাধান্য না বুঝাইয়া, আকৃষ্ট বস্তুর স্বকর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বুঝায়, যেন নিজের ইচ্ছাতেই নিজে কেন্দ্রের অনুগমন করিতেছে,—কেন্দ্রের আর আকর্ষণ-ক্ষমতা তত নাই। 'কেন্দ্রাতিগা শক্তি' বলিলে যেন বোধ হয় পদার্থটি অপর এক স্থান হইতে আসিয়া পথিমধ্যে একস্থলে কেন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে; পদার্থটী যে, কেন্দ্র হইতেই পলায়ন করিতেছে তাহা সুস্পষ্ট বুঝাইতেছে না। বোধ হয় পূর্ব্বাবধি প্রচলিত শব্দ "কেন্দ্রাভিকর্ষিণী ও কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি" ব্যবহার করিলেই ভাল।

৪। "Organized labour = যন্ত্রবদ্ধ পরিশ্রম"।—সভাপতি মহাশয় স্বয়ংই একস্থলে অনুবাদ করিবার প্রণালী সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, অনুবাদ যেন "ভাবাংশে মূলের মত এবং ভাষাংশে মনের মত হয়"। 'যন্ত্রবদ্ধ পরিশ্রম' অনুবাদটী ইহার ভাবাংশে মূলের মত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষাংশে ঠিক সকলকার মনের মত কতদূর হইয়াছে বলা সুকঠিন। 'যন্ত্রবদ্ধ'এর পরিবর্ত্তে যদি ধারাবদ্ধ', 'প্রণালীবদ্ধ', 'দলবদ্ধ সুবিভক্ত', অথবা 'দলবদ্ধ সুশৃঙ্খল' (পরিশ্রম)- এইরূপ অনুবাদ করা যায় তাহা হইলে ভাবাংশে ও ভাষাংশে দুই দিকেই ঠিক হয় না কি?

৫। "Organic Chemistry = শারীরক রসায়ন; Inorganic Chemistry = ভৌতিক রসায়ন"।—'ভৌতিক' শব্দ ত ব্যবহার করাই যায় না; কেননা জগতের যাবতীয় পদার্থই ভৌতিক; শরীরও ভৌতিক। ভৌতিক রসায়নের পরিবর্ত্তে 'অশারীর রসায়ন' বলিলে ভাল হয়। বেদান্তসারের টীকাকার 'শারীরক' মানে করিতেছেন 'জীবাত্মা'; 'শারীরক রসায়ন' মানে তাহা হইলে 'জীবাত্মা সম্বন্ধীয় রসায়ন' হইয়া পড়ে। 'শারীরবিধান', 'শারীরস্থান', 'শারীর বিজ্ঞান' প্রভৃতি যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন 'শারীর রসায়ন' এই শব্দ চালাইলেই ভাল। রসায়নবিৎ ডাক্তার চুনিলাল বসু রায়বাহাদুর মহাশয় তাঁহার 'ফলিত রসায়নে' 'অর্গানিক ও ইনর্গানিক কেমিষ্ট্রীর' অনুবাদ 'অঙ্গারক ও অনঙ্গারক রসায়ন' করিয়াছেন।—ইহা কিছু উচ্চারণ-কৃচ্ছ্র। অনুবাদটী পূর্ণ মাত্রায় বিজ্ঞানসঙ্গত হইলেও বরং এক কথা ছিল। যখন, ইস্পাত (ডাক্তার টমসন্ সাহেব বলেন, ইস্পাতে ৯৯ ভাগ লোহা আর একভাগ অঙ্গার ও সিলিকান আছে) এবং টার্পিন, মেথেন, এসিটিলিন, এথিলিন প্রভৃতি হাইড্রোকার্ব্বন্‌স্, এবং আরও অনেকানেক অঙ্গার-যৌগিক (কার্বন-কম্পাউণ্ড্‌স্) অঙ্গারক-রসায়নের অন্তর্গত হইতে পারিতেছে না, তখন 'অঙ্গারক' 'অনঙ্গারক' এই দুইটী রাশ-নাম (রাশ্যাশ্রিত নাম) রাখিয়া, ডাক-নাম 'শারীর রসায়ন' ও 'অশারীর রসায়ন' রাখিলেও, তবু যাহা হউক এক রকম মন্দ হয় না; ইংরাজিতেও কেমিষ্ট্রী-অভ-কার্ব্বনকম্পাউণ্ড্‌স্ ডাক-নাম না হইয়া 'অর্গানিক কেমিষ্ট্রী' ডাক-নাম হইল বোধ হয় সেই কারণেই। অর্গানিক কেমিষ্ট্রীকে 'আন্তর্দৈহিক রসায়ন' এবং ইনর্গানিক কেমিষ্ট্রীকে 'নান্তর্দৈহিক রসায়ন' বলিলে অনুবাদটী ন্যায়সঙ্গত ত হয়ই, তা ছাড়া "ভাষাংশে মূলের মত এবং ভাবাংশে মনের মতও" অতি সুন্দররূপে হয়। আন্তর্দৈহিক অর্থাৎ যাহাদের ক্রিয়া অন্তর্দেহে (কোনও জীব জন্তু বা উদ্ভিদের অভ্যন্তরে) উৎপন্ন হয়; ইংরাজী 'অর্গানিক' শব্দেরও এ স্থলে অর্থ ঠিক তাহাই—যাহার প্রক্রিয়া কোনও অর্গানিক সিস্‌টেমের ভিতরে হয়।

(ভাদ্র, ১৩০৪, পৃঃ ৪৪৫)

৬। "Theory=সিদ্ধান্ত"। "Theoretical=তাত্ত্বিক"। "Practical=ব্যবহারিক"।— থিয়রীর আরও দুইটী অর্থ আছে:—তত্ত্ব (বাদ বা বিচারসিদ্ধ জ্ঞান) এবং মত (অনুমান বা কল্পনাসিদ্ধ একটা অভিপ্রায় মাত্র) থিয়রেটিকালেরও তাত্ত্বিক, পরোক্ষ, কল্পনাসিদ্ধ এইরূপ কয় প্রকার অর্থ হয়। 'থিয়রেটিকাল নলেজ' মানে 'পরোক্ষানুভূতি'। 'প্রাকৃটিকাল' মানে 'প্রত্যক্ষ' বা 'অপরোক্ষ'; প্রাকৃটিকাল সায়েন্‌স্=প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান; প্রাকৃটিকাল নলেজ=অপরোক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষজ্ঞান। 'পরোক্ষ' 'অপরোক্ষ' দুইটী কথা বেদান্ত দর্শনে এইরূপ অর্থে ভূরি ভূরি ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাক্তার চুণিলালবাবু 'প্রাকৃটিকাল কেমিষ্ট্রীর' অনুবাদ 'ফলিত-রসায়ন' করিয়াছেন।

৭। "Moral science=ধর্মতত্ত্ব"।—কর্ত্তব্য-বিধান, কর্ত্তব্যশাস্ত্র বা কর্ত্তব্য-বিজ্ঞান বলিলে কি ঠিক হয় না? "Moral courage=সাত্ত্বিক সাহস"।—'চরিত্র-বল' বা 'মনের তেজ' এইরূপ হইলেই যেন ভাল হয়। "Morally strong=অন্তরাত্মা সবল"।—ইহারও অর্থ 'মনের তেজ খুব' অথবা 'মানসিক ওজঃপূর্ণ', করিলে ভাল হয়। "Conscience satisfied=অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট"।—'মন সন্তুষ্ট' এইরূপ হইলেও মন্দ কি? যেমন, তোমার Conscience clear থাকিলেই হইল= 'তোমার মন সাচ্চা থাকিলেই' বা 'তোমার মনে কোনও গলদ না থাকিলেই হইল'। হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে 'মনকে লইয়াই যত কায; 'মন' একটা অমনি ছোট খাট ফেলনা-জিনিষ নয়; নানা উচ্চ অর্থে 'মন' এই শব্দ ব্যবহার করা যায়।

৮। "Morality=Practical ধর্ম্ম"; 'Religion=Doctrinal ধর্ম্ম' (অর্থাৎ theoretical); 'Religionকে বিশ্বাসে ধরিয়া থাকিতে হয় এবং Moralityকে কার্য্যে ধরিয়া থাকিতে হয়'।—নিতান্ত তলিয়া না বুঝিলে, অনেকের পক্ষে এ সকল সর্ব্বনেশে কথা। Morality—religionএর পূর্ব্বাবস্থা; morality যেখানে শেষ হইয়া যায়, religion সেখানে আরম্ভ হয়; মনুষ্যকে morality, religionএর জন্য প্রস্তুত করাইয়া দেয় মাত্র। Morality কিছুদূর যাইয়াই অকূল পাথার দেখে; religion সেইখান হইতে তখন মনুষ্যকে তুলিয়া সম্মুখে অনন্ত পথ দেখাইয়া দেয়,—সত্যের পর সত্য, আনন্দের পর আনন্দ, ক্রমশঃ অবাঙ্‌মনসোগোচর যে সচ্চিদানন্দ তাহা পর্য্যন্ত লাভ করাইয়া দেয়।

প্রকৃত ধর্ম্মাত্মার দৃষ্টিতে Moralityর রাজ্য অতি সঙ্কীর্ণ, অতীব ক্ষুদ্র—ইহ জগতেও দুই দিনের জন্য, যতক্ষণ সত্যমিথ্যাজ্ঞান কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান, ততক্ষণ পর্য্যন্ত। অন্তঃকরণ যখন ঈশ্বরের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, যখন তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, ইহজগৎকে যখন তৃণাদপি তুচ্ছ জ্ঞান হয়—ঈশ্বরের জন্য মন এক-লক্ষ্য হইয়া বেগে ধাবমান হইতে থাকে—আর কোনও দিকে দৃষ্টি করে না, তখন মনুষ্যের জীবন Morality বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-রাজ্যের পরপারে উপনীত হয়; -দেখে 'অপূর্ব্ব একমাত্র নিরপেক্ষ-পরমকর্ত্তব্য যে ঈশ্বর লাভ' তাহারই উপায়-বিধানস্বরূপ -ধর্ম্মরাজ্য। এই ধর্ম্মরাজ্য প্রত্যক্ষ উজ্জলরত্নের ন্যায় তখন নয়নপথে ভাসমান হয় —তখন আর সেই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মকে 'অন্ধ বিশ্বাসের পদার্থ' বা কেবল 'মতামতের' ব্যাপার বলিতে পারেন না; ধর্ম্মের জন্য তখন তিনি কত কঠোর তপস্যা করেন, কত প্রকার যোগ-সাধনাদি করিতে থাকেন, অবশেষে পরমবস্তুতে আত্মহারা হইয়া যান। যদি তিনি কখন সেই

অনির্ব্বচনীয় অবস্থা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তিনি কি বলিবেন না "Religion is the most practical of all practical sciences ?"

অবশ্য, প্রথম অবস্থায় morality ধরিয়া না থাকিলে কোন মনুষ্য উন্নতি করিতে পারেন না, ইহাও অতি সত্য ; moralityর আশ্রয় ছাড়িলে 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ' হইয়া পড়িতে হয় ; না হয় কর্ম্ম না হয় ধর্ম্ম ; ইহকালে ত শান্তি পাওয়াই যাইবে না, পরকালের পথেও কণ্টক পড়িয়া যায়।

ব্যবহারিক ও ব্যাবহারিক।

সভাপতি মহাশয় একস্থলে আক্ষেপ করিতেছেন যে, যখন 'মানসিক' 'শারীরিক' প্রভৃতি ষ্ণিক প্রত্যয়ান্ত শব্দের পূর্ব্বস্বরবৃদ্ধি, তখন 'ব্যবহারিক'এর স্থলে 'ব্যাবহারিক' লেখা হয় না কেন। ইহার উত্তর—তদ্ধিতের সাধারণ নিয়মমতে ষ্ণিক প্রত্যয় করিলে পূর্ব্বস্বরের বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলে—"ন ণিৎকার্য্যং সর্ব্বত্র" এই সূত্রানুসারে আবার হয়ও না ; যেমন—শিল্পিক, রসিক, কণিক, ক্ষণিক, চূলিক, দেবিক (দৈবিকও হয়) প্রভৃতি। যদি বলেন ইহারা দ্বিস্বরযুক্ত শব্দ, ইহাদের সম্বন্ধে কোন কোন ব্যাকরণ মতে ঐরূপ বিশেষ নিয়ম আছে, দ্ব্যতিরিক্তস্বর-বিশিষ্ট শব্দেরও দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—ব্যবসায়িক, প্রস্থানিক, অনুযাত্রিক, জ্যোতিষিক (জ্যৌতিষিকও হয়), অপ্রস্তাবিক, অশ্বমেধিক, অহিতুণ্ডিক, দশমিক, কুসীদিক, কিঙ্কিণিক, করতুণ্ডিক, কোজাগরিক, পরিণামিক, পল্লবিক প্রভৃতি। এইরূপ, 'ব্যবহারিক' শব্দের আদ্যস্বরবৃদ্ধি হইতে দেখা যায় না ; ইহা শিষ্টপ্রয়োগসিদ্ধ। সভাপতি মহাশয় বোধ হয় কোনও অভিধান বা প্রামাণিক পুস্তক হইতে 'ব্যাবহারিক' এইরূপ দেখাইতে পারিবেন না। কদাচিৎ দুই একখানি সংস্কৃত অভিধানে 'ব্যবহারিক' ও 'ব্যাবহারিক' দুই রকম শব্দেরই উল্লেখ দেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু শেষোক্ত শব্দটির অর্থ অন্য প্রকার।

সাহিত্যপরিষদের চতুর্থ উদ্দেশ্য।

সাহিত্যপরিষদের চতুর্থ উদ্দেশ্য—"দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা"। এই স্থলে সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন—'দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য' এই বাক্যটীর মাথা-নীচু পা-উঁচু অবস্থা ঘুচাইয়া উহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করানো উচিত ; উহাকে করা উচিত 'কাব্য ইতিহাস বিজ্ঞান দর্শন'। কেন না, প্রথমে কাব্য, পরে ইতিহাস, পরে বিজ্ঞান, পরে দর্শন, ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের উত্তরোত্তর ক্রমান্বয় পদ্ধতি। সভাপতি মহাশয় যেরূপ শব্দগুলি সাজাইয়াছেন তাহা যে মন্দ, তা নয় ; তবে, শব্দগুলির যেরূপ বিন্যাস পূর্ব্বে ছিল তাহাই অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া বোধ হয়। সভাপতি মহাশয় একরূপ প্রণালীতে বিন্যাস করিয়াছেন ; সাহিত্যপরিষৎ আর একরূপ প্রণালীতে করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত প্রণালী—ক্রমাবস্থা মতে ; শেষোক্ত প্রণালী—প্রয়োজনীয়ত্ব-ক্রমে। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন—ইংরাজি ইডিয়ম 'pennywise poundfoolish', 'cut and dry' প্রভৃতি। শেষোক্ত প্রণালীর দৃষ্টান্ত, যেমন—'black and white', 'root and branch', 'day and night', 'buy and sell' প্রভৃতি। সাহিত্যপরিষৎ যদি মনে করেন—ইতিহাস ও কাব্য অপেক্ষা দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা বেশী আবশ্যক ; তাহা হইলে—তাঁহাদিগের এইরূপ শব্দ-

(ভাদ্র, ১৩৮৪, পৃঃ ৪৪৭)

বিন্যাস—দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস কাব্য—কিছু অযথা হয় নাই। বাস্তবিক কথা—সকল দেশেই দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা অন্যান্য বিষয়ের অপেক্ষা বেশী আবশ্যক। যে দেশে যত বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চ্চা, সেই দেশে তত সভ্যতার আধিক্য।

সাহিত্যপরিষদ্ সভার উন্নতিতেই তৎপত্রিকার উন্নতি, এবং স্বদেশেরও উন্নতি।

উপসংহার।

সাহিত্যপরিষদ্‌সভা বঙ্গের অমূল্য ভূষণ হউন, ইহাই সাহিত্য-সেবকগণের এবং বঙ্গবাসিমাত্রেরই একান্ত ইচ্ছা। পারিষদগণের যেন ইহা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক থাকে। বাঙ্গালীর চিরন্তন চরিত্র বশতঃ যেন পরস্পর গরমিল না ঘটে; ব্রত, উদ্দেশ্য ও পরমদায়িত্ব যেন কেহ ভুলিয়া না যান; ইহাই প্রার্থনা।

সাধু দুর্গাচরণ নাগ।

বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রায় ৫১ বৎসর, অতি পবিত্রভাবে, অতি সন্তর্পণে, অতিবাহিত করিয়া, সে দিন আবার আর একটী ঈশ্বরের প্রিয়তম সন্তান, সকলকে ফেলিয়া—অনেককেই অকূল শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া, স্বস্থানে পুনর্যাত্রা করিয়াছেন! নাম ছিল তাঁহার—শ্রীমান্ দুর্গাচরণ নাগ; নিবাস ছিল—ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জে, দেবভোগ নামক এক অপরিচিত ক্ষুদ্র গ্রামে। সকলে তাঁহাকে জানিতেন না, সকলে বোধ হয় তাঁহাকে চিনিবেনও না। তিনি ইহজগতের লোক ছিলেন না; সর্ব্বদাই তদ্‌গতচিত্তে থাকিতেন। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, মন প্রভৃতি সবই তাঁর ছিল বটে, কিন্তু দেখিলে মানবীয় বোধ হইত না;—যেন অন্য উপাদানে অন্য রকমে গঠিত, যেন অন্য কার্য্যের জন্য অভিপ্রেত। সে অদ্ভুত সাধু পুরুষকে এই ক্ষুদ্র পত্রে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করা বাতুলতা মাত্র। তাঁহার পবিত্র জীবনের দুই একটী সামান্য সামান্য কথা দ্বারা, যদি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিচয় দিতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করিব।

দুর্গাচরণের কোনও ধন সম্পত্তি ছিল না; সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করিতেন মাত্র। কার্য্যোপলক্ষে যদি কখন কোন মজুর নিযুক্ত করিতে হইত, ২/১ ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করিতে দিতেন না এবং তাহার নিকট হইতে সানুনয়ে অপরাধক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে বাটী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আসিতেন। সকলকে নারায়ণ জ্ঞানে দেখিতেন। যদি কাহারও নিকট আসিতেন, ফিরিয়া যাইবার সময়—পিছন ফিরিয়া যাইলে পাছে তাঁহাকে অবমাননা করা হয়—তাঁহার দিকে সম্মুখ করিয়া, কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জোড়হস্তে নমস্কার করিতে করিতে যাইতেন। সকলের নিকটই সর্ব্বদা জোড়হস্ত এবং নতশির; মুখে অনবরত ঠাকুর দেবতার নাম; কখনও বা "গুরুদেব গুরুদেব" অথবা "কৃপা কৃপা"—উচ্চারণ করিতেন। এত দয়ার সাগর ছিলেন যে, বৃক্ষের পত্র পুষ্প বা ফল পর্য্যন্তও পাড়িতে পারিতেন না। বাটীর পশ্চাদ্ভাগে একটি বাঁশঝাড় ছিল, জীর্ণ পর্ণকুটীরে কোনরকমে একটী বাঁশ প্রবেশ করে, সাধু দুর্গাচরণ কখনও তাহা কাটিতে দেন নাই; বলিতেন—আহা! ঘরে আশ্রয় লইয়াছে, থাক্ থাক্। অতিথি অভ্যাগত বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি যে কি অপূর্ব্ব আনন্দ পাইতেন এবং তাঁহাদিগের সেবার জন্য যে কি ব্যস্ত হইতেন তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখিয়া আসিয়াছেন। নিজ শরীরের প্রতি কিছুমাত্র যত্ন তাঁহার ছিল না; স্নান পর্য্যন্তও করিতেন না। একবেলা দুই তিন গ্রাস মাত্র—যাহা হউক

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১৯·০০। ২য় ভাগ ১৭·০০

সাধারণ ১ম খণ্ড ৩·৫০; ২য় খণ্ড ৭·৮০; ৩য় খণ্ড ৫·২০; ৪র্থ খণ্ড ৭·০০; ৫ম খণ্ড ৭·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১·৬০; কাপড়ে বাঁধাই ১·৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। (ছাপা নাই)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬; সাধারণ ৬·০০; হাফ-রেক্সিন বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। মূল্য ৫·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—স্বামী নিখিলানন্দ। পৃঃ ২২৯, মূল্য ৬·০০

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। (ছাপা নাই)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ০·৭০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭·০০, ২য় ভাগ ৬·৫০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬। মূল্য ৬·০০ টাকা

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য—১৫·০০

শিশুদের মা সারদাদেবী, (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। (যন্ত্রস্থ)

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য প্রতি খণ্ড ৮·০০

(প্রথম খণ্ড—যন্ত্রস্থ)

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪·২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ছেলেদের উপযোগী। পৃঃ ৬৪, মূল্য ০·৭০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে) শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭·০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩৬৯, মূল্য ৬·০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১·২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ— স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১৭, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর— স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই) ; ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরত্রিক-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১৬; মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাধাই ৩'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। (ছাপা নাই)

কলাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৭, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৮০, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ প্রসঙ্গ— (ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে— স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৫২, মূল্য ৩'৩০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০, (ছাপা নাই)

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

'উদ্বোধন' ১ম বর্ষ (পুনর্মুদ্রণ)। (যন্ত্রস্থ)

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৯৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ—স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি—স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০ ; ৩য় অঃ ১৩'০০ ; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি— (যন্ত্রস্থ)

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮১, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ-চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃঃ ২৭৪, মূল্য ১০'০০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ২'০০ (ছাপা নাই)

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৬২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

Udbodhan—Phone : 55-2447 AUGUST 1977 Regd. No. WB/NC-19

COVER PRINTED BY -

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্ট্রীগণের পক্ষে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৯তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭৷৷০টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫৷৷০টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৮৪

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বেনারসী
সিল্ক
সাড়ী
পোষাক
শৈলেন মণিলাল
স্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২
কাশ্মিরী
শাল
বিছানা
হোসিয়ারি

সূচীপত্র

"ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, তখন নির্জনে বাস ক'রবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'রবে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী

শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

তোমরা আহারের দ্বারা শরীরের পুষ্টি করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার? তোমরা অধ্যয়নাদির দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার?
—স্বামী বিবেকানন্দ

লেখার সাথী
সুলেখা
স্পেশ্যাল
আপনার কলমে আনবে
সাবলীল গতি
বিভিন্ন রংএ পাওয়া যায় :-
ব্লু-ব্ল্যাক • রয়েল-ব্লু
ব্ল্যাক • রেড্ • গ্রীণ্
সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
কলিকাতা • গাজিয়াবাদ্
ADMAN

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥

দিব্য বাণী

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দনন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

—বিশ্বসার, আপদুদ্ধারকল্প, দুর্গাস্তবরাজ, ১,২

প্রণাম তোমায় মঙ্গলময়ী শরণ্য করুণারূপিণী
প্রণাম তোমায় বিশ্বরূপিণী কল্যাণী বিশ্বব্যাপিনী
প্রণাম তোমায় ভুবন-পূজিত-পদাব্জ জগৎপালিনী
প্রণাম তোমায় দুর্গা জননী ত্রাণ করো জগত্তারিণী।

প্রণাম তোমায়—স্বরূপ তোমার অনুমিত সৃষ্টি-মাঝারে
প্রণাম তোমায় হে মহাযোগিনী জ্ঞানরূপা মোহ-সংসারে
প্রণাম তোমায় সদানন্দের আনন্দ-সার-স্বরূপিণী
প্রণাম তোমায় দুর্গা জননী ত্রাণ করো জগত্তারিণী।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীদুর্গার স্বরূপ

আচার্য শংকর তাঁহার ভাষ্যে বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। এইজন্য শাংকর-ভাষ্য সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে বৌদ্ধ দর্শনের সহিত সম্যক্ পরিচিত হওয়া আবশ্যক। রামানুজ-প্রমুখ আচার্যগণ তাঁহাদের ভাষ্যে অদ্বৈতমতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। এই কারণে তাঁহাদের ভাষ্য বুঝিতে হইলে শাংকর-ভাষ্যের সহিত বিশেষ পরিচয় থাকা প্রয়োজন। শ্রীদুর্গার স্বরূপ সম্বন্ধে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়বিধ মতবাদ বিদ্যমান থাকায় এবং প্রখ্যাত বৈষ্ণব আচার্যগণ শাক্ত-মতবাদ খণ্ডন করায় একটি মতবাদ বুঝিতে হইলে অপরটিরও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমরা দুইটি মতেরই উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। তবে প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, আমরা সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্যভাবেই মতদ্বয় উপস্থাপিত করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু-বিশ্রুত 'যত মত তত পথ' সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া আমরা সকল সম্প্রদায়ের মতবাদকেই শ্রদ্ধা ও সমাদর করি এবং বিশ্বাস করি যে, মানুষের বিভিন্ন সংস্কার- ও রুচিবৈচিত্র্য-হেতু প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উপযোগিতা অবশ্যই আছে। সকল সম্প্রদায়ের আচার্য ও উপাস্য দেবতাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই নির্দেশ স্মরণে রাখিয়াই আমরা অগ্রসর হইতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, কংস দৈববাণী শুনিয়াছিল—দেবকীর অষ্টম-গর্ভজাত সন্তান তাহাকে বধ করিবেন। ইহাতে ভীত হইয়া কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করে এবং একে একে দেবকীর ছয়টি পুত্রকে বধ করে। দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরাম আবির্ভূত হইলেন। বলরাম যদি ভূমিষ্ঠ হন, তাহা হইলে কংস তাঁহাকে অবশ্যই বধ করিবে; ফলে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, কারণ ঐ লীলায় বলরামের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে বৈকুণ্ঠনিবাসী শ্রীহরি তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়াকে এই আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন ব্রজে গমন করেন এবং দেবকীর গর্ভ হইতে ভ্রূণরূপী বলরামকে আকর্ষণ করিয়া গোকুলে নন্দালয়-বাসিনী বসুদেবের অপর এক পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেন। শ্রীহরি যোগমায়াকে আরও বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং দেবকীর অষ্টম-গর্ভস্থ পুত্ররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন, যোগমায়াও নন্দপত্নী যশোদার কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করিবেন এবং সর্বকামনাপূরণকারিণী বরদাত্রীগণের শ্রেষ্ঠা তাঁহাকে মনুষ্যগণ বিবিধ উপচারে পূজা করিবে, নানা স্থানে তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তিনি দুর্গা ভদ্রকালী বিজয়া বৈষ্ণবী কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকা মায়া নারায়ণী ঈশানী শারদা অম্বিকা ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধা হইবেন।

অতঃপর যোগমায়া দেবকীর গর্ভ হইতে বলরামকে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলে যথা-সময়ে বলরাম ভূমিষ্ঠ হইলেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন এবং মথুরায় কংস-কারাগারে তাঁহার জন্ম হইল। যোগ-

মায়াও গোকুলে যশোদার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন।

শ্রীভগবানের নির্দেশ অনুসারে বসুদেব সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া কারাগার হইতে নির্গত হইয়া যমুনা অতিক্রম করিয়া নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। যোগমায়ার প্রভাবে কংস-কারাগারের প্রহরীগণ নিদ্রিত হইয়া পড়ে, বসুদেবের শৃঙ্খল অপসারিত হয় এবং লৌহ-কপাটও উন্মুক্ত হয়। গোকুলেও অনুরূপ অবস্থা! যোগমায়ার প্রভাবে গোপগোপীগণ গভীর নিদ্রায় যশোদাও প্রসবের পরই নিদ্রিতা হইয়া পড়ায় তাঁহার পুত্র অথবা কন্যা হইয়াছে, জানিতে পারেন নাই। বসুদেব বিনা বাধায় শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া যশোদার কন্যা যোগমায়াকে লইয়া মথুরায় কংস-কারাগারে ফিরিয়া আসিলেন। কারাগারের দ্বার রুদ্ধ হইল, বসুদেবের পদদ্বয় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল এবং শিশুর ক্রন্দনধ্বনিতে প্রহরীগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া প্রাণভয়ে ভীত কংস তৎক্ষণাৎ কারাগারে আসিয়া দেবকীর ক্রোড় হইতে শিশুটিকে লইয়া শিলাখণ্ডে নিক্ষেপ করিল। পূর্বে এইভাবেই দেবকীর ছয়টি পুত্র নিহত হইয়াছিল, কিন্তু এইবার ব্যাপার অন্যরূপ হইল। যোগমায়া কংসের হস্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিব্যমাল্য-বস্ত্র-চন্দন ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা দেবীমূর্তিতে উর্ধ্বাকাশে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি অষ্টভুজা—অষ্টভুজে ধনু শূল বাণ চর্ম অসি শঙ্খ চক্র ও গদা ধারণ করিয়া আছেন। সিদ্ধ চারণ গন্ধর্ব অপ্সরা কিন্নর প্রভৃতি পূজোপহার প্রদানপূর্বক তাঁহার স্তবস্তুতি করিতেছিলেন। সেই সময়ে দেবী কংসকে বলিলেন, 'রে মন্দবুদ্ধি, আমাকে বধ করিতে পারিলেই বা তোর কী লাভ হইত? তোকে যে বধ করিবে, তোর সেই পূর্বজন্মের শত্রু যে-কোন স্থানেই হউক নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অসহায় দেবকীর প্রতি অত্যাচার বৃথা।' ইহা বলিয়াই ভগবতী বহু স্থানে বহু নামযুক্তা হইয়া অধিষ্ঠিতা হইলেন।

সুবিদিত এই কাহিনীটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা এই তত্ত্বে উপনীত হই যে, ভাগবতকারের মতে দেবী দুর্গা স্বরূপতঃ শ্রীভগবানের যোগমায়া-শক্তি। অর্থাৎ যে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিতে শ্রীভগবানের অবতার-লীলা সাধিত হয়, দেবী দুর্গা সেই শক্তি এবং তিনি স্বাধীনা নহেন—শ্রীভগবানেরই আশ্রিতা ও তাঁহারই ইচ্ছানুসারে কার্য করেন। ভাগবতকারের আরও অভিমত এই যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর হইতেই অথবা—যাহা একই কথা—যোগমায়ার দেহধারণের পর হইতেই দুর্গাপূজার সূত্রপাত। তখন হইতেই দেবী দুর্গা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে সর্বাভীষ্টদায়িনীরূপে পূজিতা হইতেছেন। ব্রজেও যে তিনিই কাত্যায়নী নামে পূজিতা হইতে লাগিলেন, তাহার উল্লেখ ভাগবতকার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন প্রায় সাত বৎসর, তখন গোপকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য অগ্রহায়ণমাসব্যাপী ব্রত গ্রহণ করিয়া হবিষ্যাশী হইয়া মন্ত্রজপাদিসহ কাত্যায়নী-পূজা করিয়াছিলেন। পরে অবশ্য তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের স্বাভাবিক লজ্জা শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিলে, তাঁহাদের মাসব্যাপী ব্রত উদ্‌যাপিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, তাঁহাদের কাত্যায়নীপূজার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং শারদীয়া পূর্ণিমাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবেন। কয়েক বৎসর পরে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিশোর শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন। এই লীলাও

যে যোগমায়াকেই অবলম্বন করিয়া সাধিত হইয়াছিল, ভাগবতকার তাহা রাসক্রীড়া-বর্ণনার প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণেও আমরা দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং যশোদার গর্ভে যোগমায়ার জন্মের কথা পাই। অবশ্য 'যোগমায়া' শব্দটি সেখানে ব্যবহৃত হয় নাই। 'যোগনিদ্রা' 'মহামায়া' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীহরি মহামায়াকে বলিলেন, কংস মহামায়াকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিলে ইন্দ্র শ্রীহরির সুবাদে মহামায়াকে নতশিরে ভগিনীরূপে গ্রহণ করিবেন এবং তাহার পর দেবী শুম্ভ-নিশুম্ভাদিকে বধ করিয়া (জালন্ধর বিন্ধ্যাচল প্রভৃতি) নানা স্থানে বিরাজ করিবেন। যে-কেহ তাঁহাকে দুর্গা অম্বিকা ভদ্রকালী ইত্যাদি নামে ভক্তিভরে স্তব করিবে, সে শ্রীহরির প্রসাদে সমস্ত প্রার্থিত বস্তু লাভ করিবে। সুরা মাংস ইত্যাদি পূজোপকরণের দ্বারা পূজিতা হইলে দেবী প্রসন্না হইয়া অশেষ কামনা পূরণ করিবেন। এখানেও মহামায়া দুর্গা শ্রীহরিরই শক্তি, তাঁহারই আশ্রিতা এবং শ্রীহরি যে মহামায়া অপেক্ষা গরীয়ান্ তাহার ইঙ্গিত প্রতি পদেই দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণবমতে শ্রীদুর্গা স্বরূপতঃ বিষ্ণুরই শক্তি এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই বর্তমান থাকেন। এইজন্যই শ্রীদুর্গাকে নারায়ণী বৈষ্ণবী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। তিনি কখনও স্বতন্ত্রা নহেন, সর্বদাই বিষ্ণুতন্ত্রা।

কিন্তু এই বৈষ্ণবীয় মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি মতবাদ—যাহাকে নিখাদ শাক্তমতবাদ বলা যাইতে পারে—নিঃসংশয়ে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও আছে। সেই মতে দেবী স্বাধীনা স্বতন্ত্রা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—সকলেই তাঁহার অধীন, ঠিক যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব, তিনি অবতারী এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহারই 'গুণাবতার'।

এই শাক্তমতবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাসপ্তশতীতে। টীকাকারগণ অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই শক্তি-শক্তিমানের প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিয়াছেন, কারণ শাক্তদর্শনে শৈবদর্শনের চিন্তাধারার প্রভাব এবং বেদান্তেরও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শক্তিপূজা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অপেক্ষা সম্ভবতঃ আরও অনেক প্রাচীন, কিন্তু মতবাদ বা দর্শনের ক্ষেত্রে বেদান্ত শাক্তদর্শনের বহু পূর্বেই সুগঠিতরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই সকল কারণে বেদান্তের 'ব্রহ্ম' শব্দটি বারংবার শাক্তমতবাদে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাতে বিষয়টি সহজবোধ্য হয়। যে দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত আমরা বিশেষভাবে পরিচিত, তাহার সাহায্যে অন্য দার্শনিক মতবাদ বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক। সমন্বয়াবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদত্ব নানা উপমার সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, বেদান্তের ব্রহ্মকে বাদ দিয়া শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় কিনা—এমন কি শৈবগণের শিবকেও অনুরূপভাবে বাদ দিয়া শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় কিনা। মনে হয়—যায়। এবং এইরূপ নিখাদ শক্তিবাদ—যাহাতে শক্তি-শক্তিমানের কোন প্রসঙ্গই নাই—এদেশে পাকাপোক্তভাবে প্রচলিত থাকায় নিম্বার্ক বলদেব প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণ সেই শক্তিবাদ তাঁহাদের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐরূপ খণ্ডন অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ তাঁহারা অদ্বৈতবাদও খণ্ডন

করিয়াছেন। আর উক্ত শক্তিবাদে এবং অদ্বৈতবাদে সামান্যই প্রভেদ আছে।

দুর্গাসপ্তশতীকে অবলম্বন করিয়া আমরা উক্ত শক্তিবাদের আলোচনা করিতে পারি। প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা নিশুম্ভ নিহত হইলে শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবী দুর্গাকে বলিয়াছিল: 'বলগর্বে উদ্ধতা দুর্গা! তুমি গর্ব করিও না। কারণ অভিমানিনী তুমি অন্যান্য দেবীর বল আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ করিতেছ।' প্রত্যুত্তরে দেবী দুর্গা বলিলেন, 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'।—একা আমিই এই জগতে বিরাজিতা, আমা হইতে ভিন্না দ্বিতীয়া আর কে আছে? দেবী দুর্গা আরও বলিলেন: 'রে দুষ্ট, (ব্রহ্মাণী-প্রমুখ) এই সকল দেবী আমারই বিভূতি। এই দেখ, ইহারা সকলে আমাতেই বিলীন হইতেছে।' তখন ব্রহ্মাণী মাহেশ্বরী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী নারসিংহী ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডা—এই অষ্ট মাতৃকা দেবী দুর্গার শরীরে বিলীন হইয়া গেলে দেবী একাকিনীই রহিলেন। এবং শুম্ভকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—দেবীর এই উক্তিতেই তাঁহার স্বরূপের পরিচয় আমরা পাই। আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, বেদান্তে যাঁহাকে 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে, দুর্গাসপ্তশতীতে তাঁহাকেই দুর্গা বলা হইতেছে। টীকাকারগণ 'একা' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্যা। এই ত্রিবিধভেদরহিত বস্তু বা তত্ত্ব একটিই হয়—অদ্বৈতবেদান্তে সেই তত্ত্বকেই 'ব্রহ্ম' বলা হয়, দুর্গাসপ্তশতীতে সেই তত্ত্বকেই 'দুর্গা' বলা হইয়াছে। অধিকন্তু এখানে শক্তি-শক্তিমানের কোন প্রসঙ্গই নাই, যেমন নির্গুণ ব্রহ্মেও শক্তি-শক্তিমানের কোনও প্রসঙ্গ নাই।

শাক্তমতবাদের খণ্ডন-প্রসঙ্গে আচার্য বলদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের টীকায় বলিয়াছেন, স্বতন্ত্রা শক্তি যে জগৎকারণ নহেন, তাহা মার্কণ্ডেয়ও বারংবার 'নারায়ণী' শব্দের প্রয়োগ করিয়া বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ দুর্গা নারায়ণেরই শক্তি। কিন্তু দুর্গাসপ্তশতীতে নারায়ণ বা বিষ্ণুর স্থান কোথায়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—সকলেই দেবী দুর্গার অধীন। দেবী দুর্গাই ব্রাহ্মী নারায়ণী মাহেশ্বরী ইত্যাদি শক্তিরূপে বিরাজিত। শুধু তাহাই নহে—'যেখানে যাহা কিছু আছে, অতীত অনাগত ও বর্তমান, সকল বস্তুরই শক্তিরূপে তিনিই বিরাজিত, তিনি অখিলাত্মিকা'—দুর্গাসপ্তশতীর সুপ্রসিদ্ধ চারিটি স্তবের মধ্যে প্রথম স্তবেই ইহা বলা হইয়াছে। সুতরাং দেবী দুর্গাকে 'নারায়ণী' বলাতে অর্থাৎ নারায়ণের শক্তি বলাতে, তিনি যে কেবলমাত্র নারায়ণের শক্তি তাহা বুঝায় না এবং বৈষ্ণবগণ যেভাবে নারায়ণকে গ্রহণ করেন, দুর্গাসপ্তশতীতে সেভাবে গৃহীত না হওয়ায় 'নারায়ণী' শব্দের তাৎপর্যও অন্যরূপ হইয়া যায়।

অধিকন্তু টীকাকারগণ 'নারায়ণী' শব্দের প্রচলিত অর্থ ছাড়াও বহুভাবে শব্দটির ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছেন এবং তদনুসারে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। 'নারায়ণী'-স্তুতিতে 'নারায়ণী' শব্দটি বোলবার ব্যবহৃত হইয়াছে। 'শান্তনবী'-টীকাকার প্রত্যেক বারেই নূতন নূতন ব্যুৎপত্তি ও অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন—এমন কি 'নারায়ণি নমঃ অস্তু তে', এই চারিটি পদের ছেদ নূতন নূতন প্রকারে করিয়া অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। সেগুলির অনুপুঙ্খে যাইবার প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে 'নারায়ণী' শব্দের কয়েকটি অর্থ দেওয়া হইল—(১) মুক্তি, (২) ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্বর্গের সাধিকা, (৩) মুক্তির কারণীভূতা

ব্রহ্মবিদ্যা, (৪) বল ধর্ম সুখ ও ধন, এই চতুর্বর্গের প্রাপয়িত্রী, (৫) সর্বমন্ত্রময়ী ইত্যাদি। এই সকল অর্থ 'নারায়ণী' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি অনুসারেই করা হইয়াছে।

পরিশেষে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শক্তিবাদ ও অদ্বৈতবেদান্তের মধ্যে পার্থক্য এই যে, শক্তিবাদে পরিণামমুখে অদ্বৈতবাদ স্থাপিত, অদ্বৈতবেদান্তে বিবর্তমুখে অদ্বৈতবাদ স্থাপিত। 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—দেবী দুর্গার এই প্রসিদ্ধ উক্তিটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে টীকাকার শান্তনু চক্রবর্তী দেবীর আরেকটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছেন। সেটির অর্থ হইল :

আমি জগৎ হইতে পৃথক্ নহি এবং জগৎও আমা হইতে পৃথক্ নহে। জগতের এবং আমার একত্বহেতু অন্ত 'ব্যক্তি' অর্থাৎ প্রকাশ আর কিছুই নাই। (অর্থাৎ একমাত্র আমিই জগদ্রূপে প্রকাশিত)। যেমন দধি দুগ্ধের পরিণাম হওয়ায় দুগ্ধ ও দধি একই বস্তু, সেইরূপ আমিই জগদ্রূপে পরিণত হওয়ায় জগৎ ও আমি এক ও অভিন্ন।

যাঁহারা জগৎকে রজ্জুতে আরোপিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহাদের নিকট এই শাক্তাদ্বৈতবাদ রুচিকর মনে হইতে পারে, কারণ এই মতে জগৎ শক্তিরই রূপ, মিথ্যা নহে।

স্বামী ধীরেশানন্দ

মর্যাদা-পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠভক্ত মহাত্মা তুলসীদাস স্বরচিত রামায়ণে (রামচরিতমানসে) একটি সুন্দর চিত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন। মনোনিবেশপূর্বক দেখিলে উহার বিশেষ তাৎপর্য অনুভূত হয়। সীতা-উদ্ধারমানসে সাগরে সেতুবন্ধনপূর্বক বিরাট বানরবাহিনীসহ ভগবান লঙ্কায় আসিয়াছেন ও সাঙ্গোপাঙ্গসহ তিনি 'সুবেল' পর্বতোপরি বিরাজ করিতেছেন। সময় রাত্রি। বন্ধু-প্রবর সুগ্রীবের অঙ্কে শিরঃস্থাপন করিয়া ভগবান মৃগচর্মোপরি শয়ান। পার্শ্বে উপবিষ্ট বিভীষণ কানে কানে মন্ত্রণাদানে রত। বালিপুত্র অঙ্গদ ও ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান উভয়ে তাঁহার পাদসংবাহনে ব্যাপৃত। প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ হস্তে ধনুর্ধারণ করিয়া বীরাসনে ভগবানের পশ্চাতে উপবিষ্ট। ঊর্ধ্বে নীল নভোমণ্ডল বিমল চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত। হঠাৎ চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে কলঙ্কদর্শনে শ্রীরামচন্দ্র সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রে এইরূপ কলঙ্ক কেন, তাহা তোমরা সকলে বল।

'কহ প্রভু সসি মহুঁ মেচকতাই।
কহহু কাহ নিজ নিজ মতি ভাঈ॥'

—চন্দ্রে কলঙ্ক কি করিয়া হইল তাহা তোমরা আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে বর্ণনা কর।

'কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুরাঈ।
সসি মহুঁ প্রগট ভূমি কৈ ঝাঁঈ॥'

প্রথমেই সুগ্রীব বলিলেন—হে রঘুনাথ! চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়াতেই এইরূপ দেখাইতেছে।

বিভীষণ বলিলেন,—

'মারেউ রাহু সসিহি কহ কোঈ।
উর মহঁ পরী শ্যামতা সোঈ॥'

কেহ অর্থাৎ বিভীষণ বলিলেন,—চন্দ্রকে রাহু প্রহার করিয়াছে, তাই তার হৃদ্দেশে কালো দাগ।

'কোউ কহ জব বিধি রতি মুখ কীন্‌হা।
সার ভাগ সসিকর হরি লীন্‌হা॥
ছিদ্র সো প্রগট ইন্দু উর মাহীঁ।
তেহি মগ দেখিঅ নভ পরিছাহীঁ॥'

পুনরায় কেহ (অঙ্গদ) বলিলেন—কামদেবের স্ত্রী রতির মুখনির্মাণকালে ব্রহ্মা চন্দ্রের সারভাগ হরণ করিয়া নিয়াছেন। উহাতে রতির মুখ সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে চন্দ্রমার হৃদয়ে ছিদ্র হইয়া যাওয়াতে তাহার মধ্য দিয়া আকাশের কালো ছায়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

'প্রভু কহ গরল বন্ধু সসি কেরা।
অতি প্রিয় নিজ উর দীন্‌হ বসেরা॥
বিষ সংজুত কর নিকর পসারী।
জারত বিরহবন্ত নর নারী॥'

এইবার শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বলিলেন তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত,—বিষ চন্দ্রের প্রিয় ভ্রাতা (সমুদ্রমন্থনকালে উভয়ের উৎপত্তি, ইহা পুরাণপ্রসিদ্ধ)। তাই প্রিয় ভ্রাতাকে স্বহৃদয়ে স্থান দিয়া বিষযুক্ত কিরণসমূহ দ্বারা চন্দ্র বিরহী নরনারীগণকে সন্তাপিত করিয়া থাকে।

সর্বশেষে 'বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ' আঞ্জনেয় পবনসুত শ্রীহনুমানের পালা আসিল। তিনি ভগবানের একান্ত ভক্ত। তিনি বলিলেন,—

'কহ হনুমন্ত সুনহু প্রভু
সসি তুমহার প্রিয় দাস।
তব মূরতি বিধু উর বসতি
সোঈ শ্যামতা অভাস॥'

—অর্থাৎ হে প্রভু! চন্দ্র তোমার প্রিয় দাস, অতি প্রিয় ভক্ত। সে তোমার মনোহর নবদূর্বাদলশ্যামল রূপ নিরন্তর হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকে। তাই চন্দ্রে এই শ্যামতা (কলঙ্ক) দৃষ্ট হইতেছে।

কাহিনীটি বড়ই সুন্দর ও কুতূহলোদ্দীপক। সুগ্রীব, বিভীষণ, অঙ্গদ, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং এবং হনুমান—সকলেই চন্দ্রের কলঙ্কবিষয়ে স্ব স্ব বিচার প্রকট করিলেন। সকলেই বুদ্ধিমান, বিচারশীল ও সত্যবাদী। কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তে পরস্পর বিরোধ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধানে বোঝা যায় যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবনা অর্থাৎ সংস্কারানুযায়ী চন্দ্র দর্শন ও বিচার করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বালিনিগৃহীত সুগ্রীব রাজ্যহারা হইয়া বহু দিন অশেষ দুঃখ পাইয়াছেন। সম্প্রতি বালিবধ করিয়া ভগবান তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছেন মাত্র। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বটে, কিন্তু অধিক ভূমির প্রত্যাশা সর্ব রাজন্যবর্গেরই সাধারণ দুর্বলতা। তাই তিনি চন্দ্রে ভূমি অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়া দেখিলেন।

বিভীষণ সর্বজনসমক্ষে রাজসভামধ্যে রাবণের পদপ্রহারে জর্জরিত। অবমানিত ও বিতাড়িত হইয়া তিনি শ্রীরামচন্দ্রের শরণ লইয়াছেন। হৃদয়ে সেই অপমান, সেই দুঃখ শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাই তিনি বলিলেন—চন্দ্রকে রাহু মারিয়াছে, সে জন্যই চন্দ্রমার হৃদয়ে সেই মারের কালো দাগ।

বালিপুত্র অঙ্গদও পিতৃহারা ও রাজ্যহারা। হৃদয়ে তাঁহার নিদারুণ দুঃখরূপ ছিদ্র। তাই হৃতসারভাগ চন্দ্রের হৃদয়ে তিনি ছিদ্র ও তন্মধ্য দিয়া আকাশের কালো ছায়া দর্শন করিলেন। অঙ্গদের স্বীয় হৃদয়ের দুঃখরূপ ছিদ্রমধ্য দিয়াও বৈরভাবের কালো ছায়া সময় সময় দেখা দেয়।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়তমা স্ত্রী সীতার বিরহে নিজে অতীব কাতর। তাই সীতাবিরহাতুর প্রভু চন্দ্রকে বিরহবিষসন্তাপের প্রয়োজকরূপেই

দর্শন করিলেন।

দাস হনুমান নিজে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত। তাই তিনি শ্যামল রামরূপ হৃদয়ে ধ্যানকারী ভক্তরূপেই চন্দ্রকে দর্শন করিলেন।

দেখা যাইতেছে সকলেই স্ব স্ব ভাবনা অর্থাৎ পূর্বসংস্কারদ্বারা প্রভাবিত হইয়া তদনুরূপ চন্দ্র দর্শন করিতেছেন ও তাহাই ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন।

ভাগবতেও দেখিতে পাই,—অগ্রজ বলভদ্র সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় মহারাজ কংসের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবার কালে সভাগত সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই ভিন্ন ভাবে। যথা—

'মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতে র্বিরাডবিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥' (ভাঃ—১০।৪৩।১৭)

—রঙ্গালয়ে মল্লদের নিকট যেন তিনি সাক্ষাৎ অশনি অর্থাৎ সর্ববিধ্বংসক বজ্ররূপে প্রতীয়মান হইলেন। সর্বজনসাধারণের চক্ষে তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ, সমবেত নারীগণের দৃষ্টিতে তিনি অপূর্ব রূপবান্ সশরীর কামদেব, গোপগণের নিকট তিনি তাহাদের স্বজন, দুষ্টরাজকুলের নিকট ভীতিকর দণ্ডবিধানকারী, পিতা ও মাতা—বসুদেব ও দেবকীর বাৎসল্যরসপূর্ণ স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে কোমলাঙ্গ শিশু, ভোজপতি কংসের নিকট সাক্ষাৎ প্রাণান্তকারী যমরাজ, অবিদ্বান্দিগের নিকট বিরাট পুরুষ, যোগীদের দৃষ্টিতে পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিদিগের সমক্ষে পরদেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব সহ মহারাজ কংসের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

বিষয়টি একটু বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। লঙ্কায় আকাশে সুগ্রীব যে চন্দ্র দর্শন করিলেন অপর সকলেও সেই চন্দ্রই দর্শন করিলেন কি? অথবা তাঁহারা প্রত্যেকে যে চন্দ্র দর্শন করিলেন অপর সকলেও সেই চন্দ্রই দর্শন করিলেন কি? না, তাহা করেন নাই, কারণ প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন চন্দ্র দর্শন হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের উক্তি হইতেই স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। প্রত্যেকেই স্ব স্ব উদ্ভূত সংস্কার ও ভাবনা অনুযায়ী চন্দ্র দর্শন করিয়াছেন ও তাহাই ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই যথার্থভাষী। মথুরায় মহারাজ কংসের রঙ্গমঞ্চে সমাগত সকলের শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ক্ষেত্রেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ সেখানেও সকলে আপন আপন ভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণই দর্শন করিয়াছেন। সকলে একই মূর্তি দর্শন করেন নাই।

দৈনন্দিন জীবনেও আমরা দেখিতে পাই যে-বস্তুকে আমি একভাবে দেখি, অপরে তদ্রূপ দেখে না। আবার সে যাহা দেখে, আমি তাহা দেখি না। একই বস্তু বা স্থান একদিন যেভাবে দেখি, সেই বস্তু বা সেই স্থান অপর সময়ে অন্যরূপ দেখি।

পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন দুইটি শান্তস্বভাব ভজনশীল সাধু হৃষীকেশে তপস্যা করিতেন। বেশ ভজন ধ্যান বেদান্তবিচারাদি-সহায়ে সেখানে তাঁহারা কালাতিপাত করিতেছিলেন। শীতকাল আসিল। হৃষীকেশে অত্যধিক শীত। তখন একজন অপরকে বলিলেন,—'কি আছে এখানে? চল দেশে (পাঞ্জাবে) যাই। এখানে সত্রে ভীড়। এক টুকরা রুটির জন্য সত্রে

কুকুরের মত দাঁড়িয়ে থাকা! কত কষ্ট! চল, দেশে মাধুকরী ভিক্ষা ক'রে খাব ও সানন্দে ধ্যানভজন করব। আহা! মাধুকরী ভিক্ষার অন্ন কত পবিত্র! শুদ্ধ অন্ন না খেলে কি ভজনে ঠিক ঠিক মন সমাহিত হয়? এখানে সত্রে গৃহস্থদের দেওয়া কত ঘোর কামনা-বাসনার অন্ন!' ইত্যাদি। দুই বন্ধু পাঞ্জাবে চলিয়া গেলেন। শীতের সময় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া খাইয়া ধ্যানভজনও করিয়াছেন। এখন শীত শেষ হইয়া আসিল। গ্রীষ্ম সমাগত। এই সময় পাঞ্জাবাদি দেশে ভয়ানক গরম পড়ে। তখন ঐ সাধুটিই বন্ধুকে বলিতেছেন, 'চল, এখান থেকে চলে যাই। কি আছে এখানে? কোন সাধুসঙ্গ নাই, কিছু নাই। চারিদিকে কেবল গৃহস্থ। সাধুদর্শন করতেই পারা যায় না। চল যাই হৃষীকেশ। আহা! হৃষীকেশের মত জায়গা আছে? অমন স্বচ্ছসলিলা, পতিত-পাবনী, কুলুকুলুনাদিনী গঙ্গাদর্শন—দেবতাত্মা হিমালয়দর্শন, পবিত্র উত্তরাখণ্ড! কত সাধু সেখানে, তাঁদের সঙ্গ, আহা! সত্রে ভিক্ষারও অভাব নাই। মন সেখানে স্বভাবতই আত্মস্থ হয়ে থাকে। চল হৃষীকেশে চলে যাই' ইত্যাদি। তখন আবার দুই বন্ধু হৃষীকেশে চলিয়া আসিলেন।

দেখা যায়, মনই ভাল-মন্দ কল্পনা করিয়া আমাদের বাঁদরনাচ নাচায়। আর আমরা সেই তালে নাচিয়া হয়রান হইয়া পড়ি। সব মনের খেলা। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, মান-অপমান, আশা-নৈরাশ্য—সবই মনেরই কল্পনামাত্র, মনঃসমকালীন। মন যেরূপে কোনও বস্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেছে, যেন অবশ হইয়া আমরা তাহা সেইরূপেই দর্শন করিতেছি বা শুনিতেছি। মন যখন নাই (যেমন সুষুপ্তিতে), তখন সে সব বস্তু কোথায়? আবার জাগ্রৎ ও স্বপ্নে মন আসিয়া হাজির হওয়া মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে সব ভাল-মন্দ পদার্থ যেন কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মন যে বস্তুকে ভাল বলে, আমরা তাহাই ভাল বলিয়া গ্রহণ করি; মন যাহাকে মন্দ বলে, আমরাও তাহা ঐরূপই ভাবি। মনঃকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ববস্তুর উদয় ও মন নিঃসংকল্প হইলেই সর্ববস্তুরও বিলয়। কল্পনার পূর্বেও বস্তু নাই এবং কল্পনাবিরতির পরও তাহা নাই। কেবল কল্পনাকালেই বস্তুর স্থিতি। অতএব সর্বপদার্থ কেবল প্রাতীতিক অর্থাৎ প্রতীতিকালমাত্রস্থায়ী। স্বপ্নে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, গ্রহনক্ষত্র, চন্দ্রসূর্য, অগণিত জীবজন্তু, কত কিছু আমরা দেখি ও তৎকালে সেগুলি সব সত্য বলিয়াই মনে করি। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে উহারা কোথায় মিলাইয়া যায়, উহাদের চিহ্নমাত্রও থাকে না। স্বপ্নপদার্থ স্বপ্নদর্শনের পূর্বেও ছিল না ও স্বপ্নভঙ্গের পরও থাকে না। উহা যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণই উহার স্থিতি। অর্থাৎ প্রতীতিকালমাত্রস্থায়ী। ইহাকেই বেদান্তের পরিভাষায় প্রাতীতিক বা প্রাতিভাসিক বস্তু বলা হইয়া থাকে।

স্বপ্নবিচারে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ তাহা হইলে সৃষ্টিরহস্যসমাধানে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে। নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূত অবস্থাগুলি লইয়া বিচার করিবার অধিকার আমাদের অবশ্যই আছে। নতুবা কে কি বলিয়াছে তাহাই " 'বাবা'-বাক্যং প্রমাণম্" বলিয়া মানিয়া লইয়া 'অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ'—ন্যায়ে অন্ধকূপে পড়িয়া চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। স্বপ্নে এক দ্রষ্টা আমাতেই যাবতীয় দৃশ্যের প্রতীতি হইতেছে। জাগ্রতে আসিয়া কিন্তু আমরা সে অবস্থার দ্রষ্টা

ও দৃশ্যের অধ্যস্তত্ব (মিথ্যা আরোপিতত্ব) স্পষ্টই বুঝিতে পারি। এইরূপে জাগ্রতের দ্রষ্টৃত্ব এবং দৃশ্যত্বও বিচারণীয়।

দেশ কাল বস্তু সবই আমাদের মনেরই কল্পনা বা বিলাসমাত্র। এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্যই যেন করুণাময় ভগবান্ তাঁহার অপূর্ব সৃষ্টি-রচনার মধ্যে আমাদের জীবনে এই স্বপ্নাবস্থাটি দিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সকলেরই প্রত্যক্ষ যে, স্বপ্নের দেশ কাল জীব জগৎ আদি সব কিছুই আমাদের স্বীয় সামর্থ্যে নির্মিত। স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ এক আমিই তখন বিদ্যমান এবং আমার জ্যোতিতেই উদ্ভাসিত হইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ইহকাল-পরকাল, পাপ-পুণ্য, জীব-ঈশ্বর চিত্তপটে ভাসিয়া উঠে। আমিই সেখানে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডনির্মাতা—ব্রহ্মা। স্বপ্নে আমার সামর্থ্য কি অপরিসীম! জাগ্রতে আসিয়া কিন্তু আমরা ঐ নিজ সামর্থ্য ভুলিয়া যাই। জাগ্রৎকালীন সৃষ্টিরহস্যসমাধানের চাবিকাঠি ঐ স্বপ্নাবস্থায় পাওয়া যাইবে। জাগ্রৎসৃষ্টিও স্বপ্নের ন্যায় আমারই মনের বিলাসমাত্র অর্থাৎ আমারই জ্ঞানের বিলাসমাত্র। কারণ, আমার কল্পনা হইতে আমি কখনই ভিন্ন নহি। এই তত্ত্বটি সত্য হইলেও ধারণা করা কঠিন। অনাদিকাল-পুষ্ট সুদৃঢ় দ্বৈতভেদের প্রভাবে (সংস্কারবশতঃ) আমরা আমাদের সহজাত এই জাগ্রৎ-সৃষ্টি-কর্তৃত্ব কল্পিত ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদির উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হই ও সংকটকালে পরিত্রাণ পাইবার আশায় তাঁহাদের আরাধনায় ব্যাপৃত হই অথবা স্তবস্তুতি এবং রসনাপরিতৃপ্তিকর নানা ভোগ্য দ্রব্যসম্ভার উপহার দিয়া তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভের জন্য ব্যাকুল হই। কিন্তু ঐ সব দেবদেবী, ব্রহ্মলোক, শিবলোকাদি কল্পনার মূলেও যে 'আমি', 'চেতন আমি'! 'আমি' না থাকিলে এ সকল কিছুই নাই। প্রমাতার প্রথম অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে প্রমাণপ্রমেয়বিষয়ক কোন অনুসন্ধান বা প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। ('সিদ্ধে হ্যাত্মনি প্রমাতরি প্রমিৎসোঃ প্রমাণা-ন্বেষণা ভবতি।' —(গীতা, শংকরভাষ্য ২।১৮) জাগ্রৎ ও স্বপ্নে সর্ববস্তুর প্রকাশ আমিই করিয়া থাকি ও সুষুপ্তিতেও সর্বাভাবের আমিই জ্ঞাতা বা প্রকাশক। সুষুপ্তিকালে সর্বাভাব হইলেও 'আমি' থাকি। সুতরাং আমা হইতেই সর্ববস্তুর উদ্ভব, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। আমিই বহুরূপে প্রতীত হই।

'আমি' বা চেতন আত্মা হইতে এই জগৎ-সৃষ্টি হইল কি প্রকারে—এই শঙ্কার উত্তরে আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, নিরবয়ব পরমাণু হইতে ঈশ্বর এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু নিরবয়ব পরমাণু হইতে সাবয়ব স্থূল সৃষ্টি অসম্ভব। উপাসক হয়তো বলিবেন ঈশ্বর স্বয়ং সৃষ্টিরূপ হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ঈশ্বর পরিণামী ও বিনাশী হইবেন। জড়বস্তুর ন্যায় পরিণামী ও বিনাশী ঈশ্বর হইতে পারেন না। অতএব চেতন হইতে সৃষ্টি কেবল ভানাত্মক, প্রতীতিমাত্র, ইহাই স্বীকার্য—যেমন জলে তরঙ্গ, সূর্যে কিরণ ইত্যাদি। সৃষ্টি চেতনে কেবল একটা স্ফুরণ বা প্রতীতিরূপ, দ্রব্যরূপ নহে। সৃষ্টি চেতনের বিবর্ত, অর্থাৎ এক চেতনই সর্বরূপে প্রতীত হইতেছেন মাত্র। এই প্রতীতি সত্য বা অসত্য কিছুই নহে—উহা অনির্বচনীয় মিথ্যা। সুতরাং চেতনকে ঘটনির্মাতা কুলালের ন্যায় নিমিত্তকারণ বা মৃত্তিকার ন্যায় উপাদানকারণ বা উর্ণনাভির ন্যায় অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণ —বস্তুতঃ, এসব কিছুই বলা যায় না। জিজ্ঞাসুকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সময় সময় এ সব কথার অবতারণা করা হয় মাত্র।

স্বপ্নকালে যেমন একই আত্মা স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্বপ্নদৃশ্যরূপে প্রতিভাত হন, জাগ্রতেও সেইপ্রকার

এক আত্মাই দ্রষ্টা ও দৃশ্যাকারে প্রতীত হইতেছেন। স্বপ্নের জীব, জগৎ ও ঈশ্বর এককালে যুগপৎ উৎপন্ন হয় ও উহা সাক্ষিভাস্য। জাগ্রৎকালের জীব, জগৎ ও ঈশ্বরও তদ্রূপ শুদ্ধচৈতন্যের উপর অবিদ্যাবশতঃ যুগপৎ উৎপন্ন ও সাক্ষিদ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। স্বপ্নের কার্যকারণভাব, পিতাপুত্র ইত্যাদি একইকালে উৎপন্ন; জাগ্রতেও তদ্রূপ। দেশ-কাল, পাপ-পুণ্য, ইহকাল-পরকাল—সবই জাগ্রতে এক আত্মারই বিস্তার বা মায়িক স্পন্দনমাত্র। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই সেই বস্তু আছে বলিয়া মনে হয়, জাগ্রতেও তাহাই। সর্ববস্তুই জ্ঞাতসত্তা অর্থাৎ জ্ঞানকালেই উহাদের সত্তা, অন্যকালে নহে। অর্থাৎ সৃষ্টি কেবল প্রতীতি-কালমাত্রস্থায়ী। ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ বলিয়া কিছু নাই। এই দৃষ্টিলাভেই জ্ঞানের চরম সার্থকতা। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তোক্ত—

'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ'

-দৃষ্টি অর্থাৎ মনের বৃত্তি বা কল্পনার সমকালে ঐ কল্পনার অনুরূপ বস্তুর একটা মিথ্যা প্রতীতিরূপ সৃষ্টি এবং তদ্রূপ দর্শন ও কথন। বস্তুতঃ বাহিরে বস্তু বলিয়া কিছু নাই। স্বপ্নে যেমন বস্তুতঃ কোন বস্তু না থাকিলেও মনই সব কল্পনা করিয়া থাকে ও সেখানে বাহির ভিতর বলিয়া অনুভব হইলেও সে সবই মনের কল্পনা-মাত্র, জাগ্রদ্‌ব্যবহারেও সেইরূপ।

'নাস্তি প্রতীত্যবসরে ন পুরা ন পশ্চাদ্‌
আশ্চর্যমেতদবভাতি তথাপি বিশ্বম্‌।
যদ্বা কিমদ্ভুতমিবেহ মহেন্দ্রজালং
মায়াবিকল্পিতমপি প্রতিভাসতে হি॥'

—দৃশ্যমান বিষয়সকল প্রতীতিকালেও বস্তুতঃ নাই এবং প্রতীতির পূর্বে বা পরেও নাই, তথাপি এই দৃশ্য-প্রতিভাস হইতেছে, কি আশ্চর্য! মহা ইন্দ্রজালসদৃশ এই জগৎ মায়া দ্বারা কল্পিত হইলেও সত্যবস্তুর ন্যায় প্রতীত হয়, ইহা কি অদ্ভুত!

মহাত্মা তুলসীদাসকৃত রামায়ণের ও ভাগবতের পূর্বোল্লিখিত স্থলে বেদান্তের এই অতি উৎকৃষ্ট সিদ্ধান্তই ধ্বনিত হইতেছে না কি?

জপমালা

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সাধক জপমালায় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন—রুদ্রাক্ষের মালা, তুলসী-মালা, স্ফটিকের মালা, চন্দনের মালা বা অন্য কোনও মালা। মালা ঘুরিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে কণ্ঠে বা জিহ্বায় বা মনে মনে। মালা একবার ঘুরিলে ৫৪ বা ১০৮ সংখ্যা জপ পূর্ণ হইল, দশবার ঘুরিলে ৫৪০ বা ১০৮০ সংখ্যা। মালার প্রাথমিক কাজ হইল জাপকের জপ-সংখ্যা ঠিক রাখা। দ্বিতীয় কাজ জাপকের মনোনিবেশে সহায়তা করা। চঞ্চল মন দশ দিকে ছুটিতে চায়, মালার সাহায্যে জপ করিলে খানিকটা মন মালাতে নিবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হয়। মন্ত্রে সে যতটা সম্ভব বসুক, বাকীটা হাট বাজারে না ছুটিয়া মালায় বাঁধা থাকুক—ইহাই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই দুটি কাজ ছাড়া মালার একটি তৃতীয় কাজ আছে—জপ-সাধনাটিকে বলিষ্ঠ করা, উহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে লইয়া যাওয়া।

জপ-সাধনার প্রাথমিক স্তরে মালাজপের এই তৃতীয় অবদানটি ধরা যায় না। মন্ত্রে বিশ্বাস ও

প্রীতি যত বাড়িতে থাকে এই বিষয়টি তত বোধগম্য হয়। সাধক তখন মালাজপ করেন সংখ্যা রাখিবার জন্যও নয়, মনঃসংযোগের সহায়তার জন্যও নয়। মালার ঘূর্ণন তাঁহার নিকট উত্তরোত্তর মন্ত্রজপের শক্তি ও আনন্দের সঙ্গে একীভূত হইতে থাকে। সারা বিশ্বপ্রকৃতি যেন মালার ঘূর্ণনে যোগ দিয়াছে, তাঁহার মন্ত্রজপের সহিত তালে তালে নাচিতেছে। রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধের অজস্র অভিব্যক্তি মনকে আর বাহিরে না টানিয়া বন্ধুরূপে মালাকে আশ্রয় করিয়া মন্ত্রস্বরূপ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভ করিতে চাহিতেছে। মন্ত্র-সাধনার সময় মালা যদি বাহিরের নানা বিক্ষেপকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া সাধকের জপবিঘ্ন দূর করিতে পারে তো মালা অবশ্যই তাঁহার পরম মিত্র। মালার এই সূক্ষ্মতর, বলবত্তর অবদান আমরা যখন বুঝিতে পারি, তখন আমাদের জপপ্রণালীও ক্রমশঃ বদলাইতে থাকে, মালার উপাদানও রুদ্রাক্ষ-তুলসী-স্ফটিকাদি হইতে অন্য বস্তুতে পরিবর্তিত হয়।

* * *

ভারতবর্ষের ধর্মসংস্কৃতিতে ভগবানের নাম একটি শব্দ মাত্র নয়—উহা তাঁহার বাণীমূর্তি। ঈশ্বরের নাম ও মন্ত্রকে ঈশ্বরস্বরূপ জ্ঞান করিবার উপদেশ শাস্ত্র ও সাধু মহাপুরুষগণ প্রাচীনকাল হইতে দিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষের যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়েই মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ভগবদুপাসনা প্রচলিত। নাম-জপের প্রথম অবস্থায় নামকে শব্দ বলিয়া জ্ঞান স্বাভাবিক। কিন্তু নামে বিশ্বাস এবং নিবিষ্টতা যত বাড়িতে থাকে নামের চৈতন্যসত্তা ততই বোধগম্য হয়। সাধক নাম ও মন্ত্রের মধ্যে আরাধ্য ইষ্টের জ্ঞানঘন অস্তিত্ব ও প্রেমের স্পর্শ সুস্পষ্ট অনুভব করেন। মন্ত্রজপ তাঁহার সারা দেহমনঃপ্রাণকে অমৃতসিক্ত করে, জ্যোতির্ময় করে।

* * *

যে প্রাণবায়ু দেহে অবিশ্রান্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সঞ্চারিত হইতেছে এবং একটি চক্র রচনা করিয়া বহিতেছে, ঐ প্রাণ সাধকের জপমালায় রূপান্তরিত হইতে পারে। প্রাণ তখন তাহার জৈবিক দায়িত্ব দেহের সংরক্ষণ করা ব্যতীত সাধকের অধ্যাত্মসাধনার সহচর হয়। সাধক বোধ করিতে থাকেন তাঁহার জপ-মন্ত্র প্রাণের আবর্তনের সঙ্গে ব্যঞ্জিত হইতেছে। মন্ত্রচৈতন্য প্রাণগতির সহিত যুক্ত হইয়া জৈবিক প্রাণকে দিব্যপ্রাণে রূপান্তরিত করিতেছে। প্রাণের জৈবিক কাজ হইল রক্তকে পরিশুদ্ধ করা, দেহের কোটি কোটি জীবকোষকে (cell) বলাধ্যাত করা। দিব্য প্রাণের কাজ হইল শোণিত-প্রবাহে এবং জীবকোষের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষসাধন। প্রাণমালা জপের সংখ্যা রাখে না, মন্ত্রের চৈতন্যসত্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ থাকিয়া দেহের কামক্রোধাদি জৈবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সুসংযত করে, ঐ প্রবৃত্তিগুলির মোড় ফিরাইয়া দেয়। প্রাণকে জপমালা করিবার সময় বাহিরের রুদ্রাক্ষ বা তুলসীমালায় জপও চলিতে পারে। অধিকন্তু ন দোষায়। ঐকতান বাদনে দশটি যন্ত্র যদি সমান নিয়মে একসঙ্গে বাজে, তাহাতে সঙ্গীতের হানি হয় না—বরং মর্যাদা বাড়ে।

* * *

মন সাধকের জপমালা। মনের নানা বৃত্তির উদয় ও বিলয় যেন জপমালার ঘূর্ণন। বৃত্তিগুলি তখন আর বিক্ষেপকর নয়, জপসাধনার আনুষঙ্গিক আধ্যাত্মিক সহচর। সাধকের কণ্ঠে বা হৃদয়ে জপমন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে। সেই ধ্বনি চিত্তের বৃত্তিসমূহকে স্পর্শ করিয়া উহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতেছে। তামসিক এবং রাজসিক

অভিব্যক্তি কাটাইয়া উহারা সাত্ত্বিক ভূমিতে উপনীত হইতেছে। জপের সময় চিত্তের নানা বৃত্তি দেখা দিলে পূর্বে সাধক ক্লিষ্ট হইতেন, বিক্ষিপ্ত মনকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেন, জপে নিবিষ্টতালাভের জন্য ভগবানের কাছে ভূয়োভূয়ঃ প্রার্থনা জানাইতেন। এখন আর সে ক্লেশ নাই। এখন মন যে তাঁহার জপমালা, মনের বৃত্তিগুলি সেই মালার গুটি। প্রত্যেকটি বৃত্তি মন্ত্রচৈতন্যে আলোকিত। মন আর শত্রু নয়, জপ-বন্ধু। মনের বৃত্তিগুলি তাহাদের মায়িক রূপ ছাড়িয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত চেতন সত্তায় উদ্ভাসিত। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮ম প্রপাঠকের ১ম, ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদে সত্য বাসনা ও মিথ্যা বাসনার আলোচনায় এই ইঙ্গিত দিয়াছেন। যে চৈতন্য-সত্তায় জগৎ-সংসার বিধৃত ও ওতপ্রোত তাঁহাকে যখন জানি নাই তখন ত্রিভুবনের যাবতীয় কাম্য বিষয় 'অনৃতাপিধানাঃ'—মিথ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন। যে ভাগ্যবান সাধক আপন হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট ঐ মিথ্যা কাম্য বিষয়গুলিই 'সত্যাঃ কামাঃ'—সত্য বাসনারূপে প্রতীয়মান হয়। পরলোকগত পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি পিতৃলোকবাসী আত্মীয়গণ; মাতা, মাতামহী প্রভৃতি মাতৃলোকবাসিনীগণ; ভ্রাতা, ভগিনী, বন্ধুগণ—কি জীবিত, কি মৃত ইঁহারা সকলেই আত্মসত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া সাধককে আনন্দ দান করেন। গন্ধমাল্য, অন্নপান, গীতবাদ্য এমন কি রূপযৌবন-সম্পন্না সুন্দরী বনিতামণ্ডলী—যাহারা এককালে চিত্তকে ভোগ্যবিষয়রূপে সম্মোহিত করিত, এখন তাহারা পরমাত্মার প্রতিভাসরূপে ভাগবত আনন্দ বহন করিয়া আনে। স্পর্শমণি লোহাকে স্পর্শ করিলে লোহা যেমন সোনা হইয়া যায়, আত্মচৈতন্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া ভোগ্য বিষয়গুলিকে দেখিতে পারিলে উহারা মায়িক ভোগ্য বিষয় হইতে সচ্চিদানন্দের খণ্ড খণ্ড মূর্তিতে পরিণত হয়। মন যখন সাধকের জপমালা হইয়া তাঁহার জপ-সাধনায় যোগদান করে তখন মনের বৃত্তিগুলি ইষ্টমূর্তিরই 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইয়া যায়।

* * *

এই ভৌতিক দেহ সাধকের জপমালা। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ঐ মালার গুটি। কণ্ঠে বা মনে জপমন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে—ঐ মন্ত্রের সূক্ষ্ম স্পন্দন দেহের অবয়বগুলিকে অনুরণিত করিতেছে। তাহারা সোল্লাসে সাধকের জপ-ক্রিয়ায় যোগ দিয়াছে। মাথা আর ঢুলিতে বা ঝিমাইতে চায় না, চোখ কান নাক হাত পা বাহিরে ছুটাছুটিতে বিমুখ হইয়াছে। শরীরের উপর হইতে নীচে এবং নীচ হইতে উপরে একটি বৃত্ত রচিত হইয়াছে। ঐ বৃত্তের প্রতি অংশে মহামন্ত্রের চৈতন্য-স্পর্শ লাগিতেছে। সাধক সুস্পষ্টভাবে বোধ করিতেছেন তাঁহার শরীর জৈবিক দেহ নয়—উহা চৈতন্যময়। কঠোপনিষদের উক্তি (২।২।১):

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ॥

'একাদশদ্বারবিশিষ্ট দেহ যেন একটি নগরী। সেই নগরীর অধিপতি হইলেন পরমাত্মা। এই ভাবে সেই অধীশ্বরকে ধ্যান করিয়া সাধক শোকশূন্য হন, তাঁহার বাসনা মায়া মোহ সব চলিয়া যায়, তিনি পরমা মুক্তি লাভ করেন।' জপ-সাধকের নিকট মহামন্ত্রই পরম পুরুষ। এই দেহ পুরুষের বিলাসস্থান। রাজা পুরীতে থাকিলে পুরীর সকল দ্বার যেমন পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত থাকে, পুরীর ঘর বাড়ী দোকান পাট যেমন রাজার ঐশ্বর্য এবং প্রভাবের পরিচয়

প্রদান করে সেইরূপ মন্ত্র-সাধকের দেহ, ইন্দ্রিয় এবং সমুদয় অবয়ব মহামন্ত্রের সাত্ত্বিক শক্তিতে দেদীপ্যমান হয়।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সাধকের জপমালা। সূর্য সেই মালার একটি গুটিকা, চন্দ্র একটি, তারকা-মণ্ডলী একটি, আকাশ একটি, সমুদ্র একটি, বনানী একটি, মরুভূমি একটি—চরাচর জগতের যে কোনও অংশের চিন্তা কর, উহারা সেই বিপুল জপমালার ভিন্ন ভিন্ন দানা। মন্ত্রচৈতন্য প্রাণ ছাড়াইয়া, মন ছাড়াইয়া, দেহ ছাড়াইয়া, অনন্ত দেশকালে পরিব্যাপ্ত। অখিল সংসার মন্ত্রস্ফূর্তিতে সংযুক্ত হইয়াছে। সেই সংযোগের ফলে ভৌতিক জগৎ ভৌতিক মুখস ফেলিয়া দিয়া তাহার চৈতন্যরূপ প্রকট করিয়াছে। কঠোপ-নিষদের পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটির পরবর্তী শ্লোকে (২।২।২) এই অনুভূতির আভাস পাওয়া যায়।

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্
হোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদ্
অব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥

যে ব্রহ্মচৈতন্য একটি ব্যক্তির হৃদয়ে আসীন থাকিয়া তাহার দেহ মন প্রাণকে উদ্ভাসিত করিতেছেন—তিনিই নিকটে দূরে সর্ব বস্তুতে, সকল ক্রিয়ায়, প্রকৃতির সকল অভিব্যক্তিতে বিরাজিত। তিনিই সূর্যরূপে আলোক ও তাপ বিকিরণ করিতেছেন, তিনিই স্বর্গলোকের গরিমা, সর্বব্যাপী তিনিই অন্তরীক্ষলোক ছাইয়া আছেন। তিনিই ধরণীতে অগ্নি, তিনিই যজ্ঞ-কলসের পাবনবারি; তিনি মনুষ্যে, দেব-দেবীতে, তিনিই আকাশে, আকাশচারী বিহঙ্গে, জলচারী জলজন্তুতে, পৃথিবীর উদ্ভিদে, অসংখ্য প্রাণিনিবহে; তিনিই যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত যজ্ঞফল, উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়ায় শুভ্র তুষারাস্তরণ। সকল পরিবর্তনের পরিচালক তিনি, অথচ স্বরূপতঃ অপরিবর্তনীয় সর্বোত্তম মহত্তম বৃহৎ।

* *

বেদ ঘোষণা করিয়াছেন, ওমিতি ব্রহ্ম—আদিশব্দ ওঙ্কার সর্বকারণ ঈশ্বর, আবার বাক্য-মানসাতীত কারণাতীত পরমাত্মা। পুরাণ তন্ত্র সেই আদিশব্দের সহিত ভগবানের নানা নাম ও বীজ সংযুক্ত করিয়া বিভিন্ন পর্যায়ের সাধকের জন্য বহুবিধ মন্ত্রের উপস্থাপনা করিয়াছেন, কিন্তু বেদের আদি ঘোষণাটি মন্ত্রখ্যাপনে পরিত্যক্ত হয় নাই। সাধককে এই বিশ্বাস পাকা করিতে হয় যে ইষ্টমন্ত্র ইষ্টস্বরূপ। শ্রদ্ধা ও প্রীতিসহ জপ অভ্যাস করিলে মন্ত্র সাধককে উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক অনুভূতির অধিকারী করে। কি সাকার, কি নিরাকার, শ্রীভগবানের যে কোনও ভাব মন্ত্রের সহায়তায় সজীব হইয়া উঠে। জপ-মালা মন্ত্রসাধনার বিশেষ উপকারক। মন্ত্রের আধ্যাত্মিক রূপের পরিস্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে জপ-মালারও আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটিতে থাকে। ঐ রূপান্তর জড় দেহ, জড় প্রাণ, জড় মন, জড় জগৎকে ক্রমশঃ চৈতন্যময় করিয়া তুলে। পরিশেষে মন্ত্রজপ 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্' অনির্বচনীয় পরম একত্বে বিলীন হয়, জপমালাও সেই একতায় স্থিতিলাভ করে।

অরূপ ও বিশ্বরূপ

('জল ও বরফ')

ডক্টর রমা চৌধুরী*

আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রে ব্রহ্মকে সাধারণতঃ দুটি আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত অথবা বিরুদ্ধ দিক থেকে দেখা হয়—একদিক থেকে তিনি নিরাকার অথবা অরূপ; অন্যদিক থেকে তিনি সাকার অথবা বিশ্বরূপ। এই প্রসঙ্গে সকল-দর্শনসার মন্থন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ সরল ভঙ্গীতে সর্বজনবোধ্য উপমার সাহায্যে বলছেন:

'জল আর বরফ—নিরাকার ও সাকার। যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়, জ্ঞানের গরমীতে বরফ জল হয়, ভক্তির হিমে জল বরফ হয়।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, (১৯৫৩), পৃঃ ৩৩৪)

আমাদের বিশ্ববরেণ্য উপনিষদসমূহেও এই বিষয়ে সুন্দর প্রপঞ্চনা রয়েছে। যেমন, সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যকোপনিষদে আমরা পেয়েছি সেই সুবিখ্যাত নঙর্থক মন্ত্রটি—

'অথাত আদেশো নেতি নেতি।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২।৩।৬)

—এরপর, এই হেতু, ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ এই: তিনি এ নন, এ নন।

পুনরায়, একই সুরে বলা হচ্ছে—

'স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽশীর্যো নহি শীর্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি।' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২, ৪।৫।১৫)

—এই সেই আত্মা—যিনি এ নন, এ নন। ইনি অগৃহ্য—এঁকে গ্রহণ করা যায় না; ইনি অশীর্য, ইনি শীর্ণ হন না; ইনি অসঙ্গ, ইনি কোনো বস্তুতে আসক্ত হন না; ইনি অসিত, ইনি কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হন না; ইনি ব্যথা প্রাপ্ত হন না; ইনি হিংসিত বা বিনষ্ট হন না।

এই মন্ত্রটির একই বৃহদারণ্যক উপনিষদে চারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সেজন্য মনে হয় যে, এটিকে একটি বিশেষ গুরুত্বদান করা হয়েছিল তৎকালে।

এ ছাড়া, বৃহদারণ্যক উপনিষদের আরো দু-একটি স্থানে ব্রহ্মের অরূপত্ববিষয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যেমন, তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে বিশদভাবে বলা হয়েছে যে, 'অক্ষর' ব্রহ্ম জাগতিক কোনো বস্তুই নন; পার্থিব কোনো গুণও তাঁর মধ্যে নেই।

'স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং, ন তদশ্নাতি কিংচন, ন তদশ্নাতি কশ্চন।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৩।৮।৮)

—তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বললেন, 'হে গার্গি! ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, ইনিই সেই "অক্ষর"—ইনি স্থূল নন, অণুও নন; হ্রস্ব নন, দীর্ঘও নন; লোহিত নন, স্নেহবস্তুও বা তরল তৈলবৎ নন, ছায়া নন,

* প্রাক্তন উপাচার্যা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি—(১) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধিপ্রাপ্ত, (২) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপাচার্যা এবং (৩) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গলের সদস্যা।

ইনি কুড়িটিরও অধিক আধুনিক সংস্কৃত নাটিকা রচনা করিয়া এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঐগুলির অভিনয় পরিচালনা করিয়া ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রচারে ব্রতী রহিয়াছেন। দর্শন-বিষয়ক ইঁহার মূল্যবান প্রকাশনগুলিও উল্লেখযোগ্য।

অন্ধকারও নন ; বায়ু নন, আকাশও নন—তিনি কোন বস্তুতে আসক্ত নন ; তাঁর রস নেই, গন্ধ নেই, চক্ষু নেই, কর্ণ নেই, বাগিন্দ্রিয় নেই, মন নেই, তেজ নেই, প্রাণ নেই, মুখ নেই—তিনি অপরিমেয়, অন্তররহিত, বাহ্যরহিত। তিনি কিছুই ভোজন করেন না, এবং তাঁকেও কেহ ভোজন করেন না।

সেজন্য, পৃথিবীতে তাঁর সদৃশ অথবা সমতুল কোনো কিছুই নেই—তাঁর কোনো প্রতিমা বা মূর্তি, উপমা বা উদাহরণও কোনো কিছুই নেই—তিনি একক অদ্বিতীয় অনুপম অভিনব অত্যাশ্চর্য অপরূপ তত্ত্ব, যিনি তাঁর অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে চিরদীপ্যমান স্বীয় একাকিত্বের মহিমায় গরিমায় মধুরিমায়।

সেজন্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হচ্ছে :

'নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥'

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ৪।১৯)

'ঊর্ধ্বে পার্শ্বে মধ্যে তাঁকে
পারে না কেহই করতে গ্রহণ।
যাঁর নাম "মহদ্‌যশঃ" মধুর,
তাঁর নেই কোনো উপমা কমন ॥'

সুপ্রসিদ্ধ কঠোপনিষদেও, একই ভাবে বলা হচ্ছে ব্রহ্মের অরূপত্বের উল্লেখ ক'রে :

'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥'

(কঠোপনিষদ ১।৩।১৫)

'শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিহীন যিনি,
অক্ষয়-নিত্য-অনাদি-অনন্ত মহদ্‌ভিন্ন তিনি।
তাঁকেই জেনে বদ্ধজীব সদাসংসারপ্রাণ
লভেন মৃত্যুমুখ থেকে শাশ্বত পরিত্রাণ ॥'

মুণ্ডকোপনিষদেও একইভাবে বলা হয়েছে :

'যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্
অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥'

(মুণ্ডকোপনিষদ ১।১।৬)

'অদৃশ্য অগ্রাহ্য অগোত্র এবং অবর্ণ যিনি জেনো,
তথা অচক্ষু অশ্রোত্র অপাণিপাদ অনুক্ষণ।
নিত্য বিভু সর্বগত সুসূক্ষ্ম অব্যয়
সেই ভূতযোনিকে জ্ঞানিগণ করেন দর্শন ॥'

এস্থলে, এই কথাই বলা হচ্ছে যে, ব্রহ্ম অদৃশ্য অথবা চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য ; অগ্রাহ্য অথবা হস্ত প্রভৃতি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় ; অগোত্র অথবা অমূল বা কারণরহিত ; অবর্ণ অথবা রূপ-আকারহীন ; অচক্ষু ও অকর্ণ অথবা চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-বর্জিত ; অপাণিপাদ অথবা হস্ত-পদ প্রভৃতি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়বর্জিত ; অব্যয় অথবা ক্ষয়শূন্য ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্ম নিরাকার অরূপ ও অনুপম।

এই সম্বন্ধে মাণ্ডুক্যোপনিষদের মন্ত্র এই :

'নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিষ্প্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।'

(মাণ্ডুক্যোপনিষদ ৭)

অর্থাৎ, তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ অথবা স্বপ্নাবস্থা-যুক্ত অথবা আন্তর অনুভূতিসম্পন্ন নন ; বহিঃ-প্রজ্ঞ অথবা জাগ্রৎ-অবস্থাযুক্ত অথবা বাহ্যিক অনুভূতিসম্পন্ন নন ; উভয়তঃপ্রজ্ঞ অথবা জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থাযুক্ত নন ; প্রজ্ঞানঘন অথবা দ্বৈতজ্ঞানস্বরূপ নন ; প্রজ্ঞ অথবা দ্বৈত-জ্ঞাতা নন ; অপ্রজ্ঞ

অথবা অচেতন নন; অদৃষ্ট অথবা চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য; অব্যবহার্য অথবা সাধারণ ব্যবহারের অযোগ্য; অগ্রাহ্য অথবা হস্তপ্রভৃতি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়; অলক্ষণ অথবা অননুমেয়; অচিন্তনীয়; অনির্বচনীয়; কেবল এক আত্মাই আছেন—এরূপ প্রত্যয়গম্য; রূপরসাদিগুণসম্পন্ন ও জাগ্রদাদি অবস্থাসম্পন্ন প্রপঞ্চের অথবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত; শান্ত মঙ্গলময় দ্বৈতবিহীন তুরীয়। তিনিই আত্মা। তিনই বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

পরিশেষে আরেকটি সুবিখ্যাত উপনিষদ ছান্দোগ্যে ব্রহ্মের নঙর্থক বর্ণনা এরূপ:

'এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ। (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৮।১।৫)

অর্থাৎ, এই আত্মা পাপরহিত জরারহিত মৃত্যুরহিত শোকরহিত ক্ষুধারহিত পিপাসারহিত সত্যকাম ও সত্যসংকল্প।

অপরপক্ষে, ব্রহ্মের সাকারত্ব ও বিশ্বরূপত্বমূলক সদর্থক বর্ণনা আছে বিশেষ ক'রে ও বিশদভাবে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে:

'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ-
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ।' (৩।৩)

'সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ॥'
(৩।১১)

'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥'
(৩।১৪)

'পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥'
(৩।১৫)

'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥'
(৩।১৬)

'তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥'
(৪।২)

'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি
বিশ্বতোমুখঃ॥' (৪।৩)

'নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-
স্তড়িদ্‌গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥' (৪।৪)

'অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে
বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥' (৫।১৩)

সর্বত্র তাঁর চক্ষু, সর্বত্র তাঁর মুখ, সর্বত্র তাঁর বাহু, সর্বত্র তাঁর পদ—অর্থাৎ পৃথিবীর সকল প্রাণীর সকল চক্ষু মুখ বাহু ও পদ তাঁরই। তিনি মনুষ্যাদিকে বাহু, এবং মনুষ্য ও বিহগাদিকে চরণ- ও পক্ষ-সংযুক্ত করেন। দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি ক'রে তিনিই এক ও অদ্বিতীয় দেবরূপে বিরাজমান। (৩।৩)

তিনি সর্ব-মুখ-মস্তক-গ্রীবাবিশিষ্ট, অর্থাৎ, সর্বপ্রাণীর সকল মুখ মস্তক ও গ্রীবা তাঁরই, তিনি সর্বজীবের হৃদয় অথবা বুদ্ধিতে অবস্থিত, সর্বব্যাপী ও ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান, সেজন্য তিনি সর্বত্র বিদ্যমান ও মঙ্গলস্বরূপ। (৩।১১)

তিনি সহস্রমস্তক, সহস্রচক্ষু সহস্রপদ পুরুষ। তিনি সমগ্র পৃথিবীকে সকল দিক থেকে বেষ্টন ক'রেও দশাঙ্গুল-পরিমাণ ঊর্ধ্বে স্থিতি করছেন—(অর্থাৎ তিনি কেবল জগল্লীনই নন, সেই সঙ্গে জগৎ-বহির্ভূতও সমভাবে)। (৩।১৪)

যা কিছু বর্তমান, যা অতীত এবং যা ভবিষ্যৎ, সে-সমস্তই পুরুষ। তিনি মুক্তির বিধাতা এবং যা কিছু অন্নাবলম্বনে জীবনধারণ করে, তারও বিধাতা। (৩।১৫)

সর্বত্র তাঁর হস্তপদ, সর্বত্র তাঁর চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বত্র তাঁর কর্ণ—অর্থাৎ, সর্বপ্রাণীর সকল হস্ত পদ চক্ষু মস্তক মুখ ও কর্ণ তাঁরই। তিনি সমস্ত ব্যাপ্ত ক'রে বিদ্যমান। (৩।১৬)

তিনিই অগ্নি, তিনিই সূর্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই দীপ্তিমান নক্ষত্রাদি, তিনিই ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ; তিনিই জল; এবং তিনিই প্রজাপতি বা 'বিরাট্'। (৪।২)

তুমিই স্ত্রী; তুমিই পুরুষ; তুমিই কুমার অথবা কুমারী; তুমিই জরাগ্রস্ত হয়ে দণ্ডের সাহায্যে স্খলিতপদে গমনাগমন কর; তুমিই জাত হয়ে বিশ্বতোমুখ হও, অথবা বিশ্বরূপ ধারণ কর। (৪।৩)

তুমিই নীল পতঙ্গ অথবা ভ্রমর; তুমিই হরিদ্বর্ণ ও রক্তচক্ষুবিশিষ্ট শুকাদি পক্ষী; তুমিই বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘ; তুমিই ঋতুসমূহ; তুমিই সাগরসমূহ; তুমিই অনাদি ও বিভুরূপে বর্তমান, যাঁর থেকে সমগ্র বিশ্ব উৎপন্ন হয়েছে। (৪।৪)

গহন সংসারের মধ্যে অনাদি অনন্ত জগৎস্রষ্টা বহুরূপ বিশ্বব্যাপী অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ [পরমাত্মাকে] জেনে [জীব] সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। (৫।১৩)

উপনিষদে যেমন, বেদেও ঠিক তেমনি, ব্রহ্মকে সদর্থক (Positive) এবং নঙর্থক (Negative) দিক থেকে বর্ণনা ক'রে তাঁর বিশ্বরূপত্ব বা সাকারত্ব এবং অরূপত্ব বা নিরাকারত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যথা, সুবিখ্যাত নাসদীয়-সূক্তে (ঋগ্বেদ ১০।১২৯) আমরা আভাস পাই শংকরোক্ত নিগু'ণ নির্বিকার নীরূপ নিরাকার অচিন্তনীয় অনির্বচনীয় ব্রহ্মের, যখন দেখি এস্থলে বলা হচ্ছে যে, তৎকালে সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, পৃথিবীও ছিল না, অন্তরিক্ষও ছিল না, স্বর্গও ছিল না, লোকসমূহও ছিল না, মৃত্যুও ছিল না, অমৃতও ছিল না, দিবসও ছিল না, রাত্রিও ছিল না, জলও ছিল না, বায়ুও ছিল না—কিছুই ছিল না, ছিল কেবল সকলনামরূপবিহীন তমঃ বা অন্ধকার।

অপরপক্ষে, তুল্য সুবিখ্যাত পুরুষ-সূক্ত (ঋগ্বেদ ১০।৯০) এবং বাক্সূক্তে (ঐ ১০।১২৫) পরমাত্মার বিশ্বরূপত্বেরও সুন্দর প্রপঞ্চনা আছে। যথা, পুরুষ-সূক্তের প্রথম দুটি ঋক্ থেকেই উপরে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ৩।১৪-১৫ মন্ত্রদ্বয় উদ্ধৃত—'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' ইত্যাদি। একই ভাবে বাক্সূক্ত বা দেবীসূক্তেও সুপ্রসিদ্ধা নারী ঋষি বাক্ সগৌরবে বলছেন:

'আমি রুদ্রগণের সঙ্গে, বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি (তাঁদের আত্মা রূপে)'—ইত্যাদি (১০।১২৫।১)

'বহুভাবে (প্রপঞ্চে আত্মা রূপে) অবস্থিতা, বহু (ভূতসমূহে) অনুপ্রবিষ্টা আমাকে দেবগণ বহুদেশে সংস্থাপন করেছেন।'—ইত্যাদি (১০।১২৫।৩)

'যে অন্নভোজন করে, সে আমার দ্বারাই তা করে; যে দর্শন করে, যে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে, যে কথিত বাক্য শ্রবণ করে, সে আমার দ্বারাই তা করে। যারা আমাকে এইভাবে বা অন্তর্যামিণীরূপে জানে না, তারা হীনতা প্রাপ্ত হয়' - ইত্যাদি (১০।১২৫।৪)

'আমি সকল ভূতে অনুপ্রবেশ ক'রে তাদের পরিব্যাপ্ত ক'রে অবস্থান করি, এবং দেহদ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করি'—ইত্যাদি (১০।১২৫।৭)

উপরে কয়েকটি সুবিখ্যাত মন্ত্রের উদ্ধৃতি-সমূহ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে, পরমাত্মার

নিরাকারত্ব-সাকারত্ব, অরূপত্ব-বিশ্বরূপত্ব নির্গুণত্ব-সগুণত্ব প্রভৃতি ভারতীয় দর্শনের একটি মূলীভূত প্রশ্ন ও সমস্যা ; এবং এর প্রাবল্য বিশেষ ক'রে দেখা যায় বিশ্ববন্দ্য বেদান্তদর্শনে—যেস্থলে, শংকরাদির অদ্বৈতবাদ ও রামানুজাদির বিভিন্ন প্রকারের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ হল এই বিষয়েই। আমরা জানি যে, এই নিয়ে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা, কলহ-বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমরা এও জানি যে, আদ্যন্ত সমন্বয়বাদী ভারতবর্ষে মতভেদ ও সম্প্রদায়-স্বাতন্ত্র্য সাদরে অভ্যর্থিত হ'লেও শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিরোধ-বিভেদ অতিক্রম ক'রে একটি সর্বজনস্বীকৃত তত্ত্বে উপনীত হওয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য। এস্থলেও ঠিক তাই ঘটেছে। অধিকারিভেদে, আমরা জগৎ থেকে ব্রহ্মকে পেতে পারি, অথবা ব্রহ্ম থেকে জগৎকে পেতে পারি। প্রথম ক্ষেত্রে—জগতেই দেখি আমরা ব্রহ্মকে পরিণামবাদ অনুসারে— দেখি সর্বত্রই তাঁর রূপ, তাঁর প্রকাশ, তাঁর মূর্তি, তাঁর লীলা—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই মধুরমোহন ভাবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে—ব্রহ্মকে পেয়ে, অরূপ নিরাকার নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নির্বিকার ব্রহ্মকে পেয়ে, বিবর্তবাদ অনুসারে জগৎকে আমরা আর চাই না রূপ-রসাদির আধাররূপে, তাকে আমরা চাই একমাত্র ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক ও অভিন্নরূপে। সে যাই হোক, যে উপায়েই হোক, শেষ পর্যন্ত ত আমরা পেয়েই গেলাম ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়কেই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রথমে উদ্ধৃত সেই অনবদ্য উপমা অনুসারে— বরফ থেকে আমরা অনায়াসে পেতে পারি জল ; পুনরায়, জল থেকেও অনায়াসে পেতে পারি বরফ—শেষ পর্যন্ত ত পেয়ে গেলাম দুই-ই—জল ও বরফ—প্রভেদ কোথায়, ক্ষতিই বা কি ?

জ্ঞানবাদী অদ্বৈতবাদী এবং ভক্তিবাদী দ্বৈতাদ্বৈত-দ্বৈতবাদী অসংখ্য যুক্তিবিচার, আলোচনা-প্রপঞ্চনা, বাদ-বিসংবাদের মাধ্যমেও যা পাননি, পূর্ণসমন্বয়বাদী, 'যত মত, তত পথে'র সমগ্র জগতে এক ও অদ্বিতীয় উদারহৃদয় প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অতি সরল-সহজ-সুমধুর ভঙ্গীতে এক নিমেষেই তার সন্দেহাতীত সন্ধান আমাদের দিয়ে আমাদের ধন্যাতিধন্য করেছেন :

'ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়, সাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া, এই দুটি দরকার। মানুষ ত অজ্ঞান, ভুল হতেই পারে। একসের ঘটীতে কি চারসের দুধ ধরে! তবে যে পথেই থাকো, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই। তিনি ত অন্তর্যামী—সে আন্তরিক ডাক শুনবেনই শুনবেন। ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকে) পাবে।' [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৫৯) পৃঃ ২৯১]

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাকালে এই নিরাকার-সাকার, অরূপ-সরূপের প্রশ্নটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—যেহেতু, এই সুগভীর তত্ত্বটির প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি না ক'রে বহু দেশী বিদেশী পণ্ডিত আমাদের এই অপূর্ব প্রতিমাপূজার কদর্থ করেছেন। বস্তুতঃ, আপাতদৃষ্টিতে একটি ক্ষুদ্র মৃন্ময়ী প্রতিমা ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, তারই মধ্যে রয়েছেন সর্বব্যাপিনী ষড়ৈশ্বর্যশালিনী সচ্চিদানন্দরূপিণী চিন্ময়ী জগজ্জননী স্বয়ং। সেজন্য শ্রীশ্রীদুর্গা-প্রতিমায় নিরাকার-সাকার, অরূপ-সরূপ, ব্রহ্ম-শক্তি, নিত্য-লীলা, স্থিতি-গতির এক অভিনব সমন্বয় সংঘটিত হয়েছে পূর্ণতম গৌরবে।

আমরা অমৃতবর্ষী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের প্রারম্ভেই দেখি যে, এই সাকার-নিরাকার ও

প্রতিমাপূজা-তত্ত্বটির উল্লেখ আছে।

[১ম ভাগ (১৩৫৯) পৃঃ ২৪-২৬]।

স্বয়ং মাষ্টার সংশয়াক্লিষ্ট, ভাবছেন :

'সাকারে বিশ্বাস থাকিলে কি নিরাকারে বিশ্বাস হয়? ঈশ্বর নিরাকার, এ বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বর সাকার এ বিশ্বাস কি হইতে পারে? বিরুদ্ধ অবস্থা দুটাই কি সত্য হইতে পারে? সাদা জিনিস—দুধ, কি আবার কালো হইতে পারে?'

মুখে বলছেন—'আজ্ঞা, নিরাকার আমার এইটি ভালো লাগে।'

সকল সংশয় দূর ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : 'তা বেশ। একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। নিরাকারে বিশ্বাস, তা তো ভালই। তবে এ বুদ্ধি ক'রো না যে—এইটি কেবল সত্য, আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধ'রে থাকবে।' 'মাষ্টার দুই-ই সত্য এই কথা বার বার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। এ কথা ত তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নাই।'

তথাপি, তিনি পুনরায় বললেন : 'আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ বিশ্বাস যেন হ'ল। কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি ত নন।'

'শ্রীরামকৃষ্ণ—মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।'

'মাষ্টার "চিন্ময়ী প্রতিমা" বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন—আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের ত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে পূজা করো; মাটিকে পূজা করা উচিত নয়।'

'শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)—তোমাদের কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেক্‌চার দেওয়া; আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই। তুমি বোঝাবার কে? যাঁর জগৎ তিনি বুঝাবেন। ...তিনি ত অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না তাঁকেই ডাকা হচ্ছে? তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন।...তুমি মাটির প্রতিমা পূজা বলছিলে। যদি মাটিরই হয়, সে পূজাতে প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন। যাঁর জগৎ, তিনিই এসব করেছেন—অধিকারিভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।'

সত্যই, কিভাবে মৃন্ময়ী প্রতিমাকে চিন্ময়ী জগজ্জননীতে উন্নীত করা যায়—তার প্রত্যক্ষ, জাজ্বল্যমান প্রমাণ ত শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই! লোকশিক্ষার জন্য, মাতৃলাভার্থে তিনি যে আবেগোদ্বেল রসঘন প্রেমোন্মত্ত সাধনা ক'রে গিয়েছেন, তার তুলনা জগতে কোথায়? আজ এই মহামাতৃপূজাকালে আমরাও যেন সেই মহাভাবে উদ্বুদ্ধ হতে পারি বিন্দুমাত্রও—এই প্রার্থনা।

সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী। রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে॥

—দেবীভাগবত

—সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী শক্তি মহামায়া অরূপা হইয়াও ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য রূপ ধারণ করেন।

দীঘা থেকে জুহু

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ*

সমুদ্র আমার শৈশবসঙ্গী। মায়ের কোলে জাহাজে চড়ে তার উপর দিয়ে প্রথম যাত্রা। মনে নেই, কল্পনা করতে পারি। কখনো কলকাতা থেকে রেঙ্গুন, কখনো চাটগাঁ থেকে রেঙ্গুন, আবার কখনো বা রেঙ্গুন থেকে ওই দুই বঙ্গদেশের কোনোটিতে নেমে পূব-বাংলার সেই নিভৃত গ্রামটিতে পাড়ি দেওয়া। আমার গ্রাম আমার শহর—এ দুয়ের সেতুবন্ধ সমুদ্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অনেক বাঙালীরই তাই ছিল। তারপর একদিন জাপানীরা বোমা ফেললো পার্ল হারবারে। উন্মুক্ত তরবারির মতো ইতিহাস আমাদের শৈশবের স্বপ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এলো। সন্দেহ কি, রেঙ্গুন, সেকালের রেঙ্গুন স্বপ্নসম্ভব শহরই ছিল। শহর রেঙ্গুনে আবার হয়তো যাওয়া যায়, আমাদের সেই রেঙ্গুনে আর কখনোই ফেরা যাবে না!

তারপর দীর্ঘদিন সমুদ্র-বিচ্ছেদ। একদা সমুদ্রের উপর দিয়ে গেছি, কিন্তু সমুদ্রতীর থেকে সমুদ্র আমার দেখা হয় নি। এ যেন স্বামীজীর সেই উপমা—খেলার আনন্দ কার বেশি? যে খেলছে, তার? না, যে খেলা দেখছে?

রেঙ্গুন বা হুগলী—যে কোনো নদীপথ বেয়ে সমুদ্রে এসে পড়ার আনন্দ এবং বিষাদ—এর কোনোটিই আজ অবধি মন থেকে মুছে যায় নি। জলের রঙ মাটির রঙে এক থাকতে থাকতে এক সময় হালকা সবুজ, সবুজতর, গাঢ় সবুজ, নীল, নীলে নীলময়—বঙ্গোপসাগর—সেই রঙবদলের খেলা দেখার কৈশোর, সেই গৃহকোণ থেকে অসীম অনন্তে উত্তরণের প্রথম আস্বাদ। কিন্তু তারপরই দেখতে দেখতে চারদিকের নীল জলের একঘেয়েমিতে নিষ্ঠুর বন্দিদশা—একদিন পার না হ'তেই বিশাল সমুদ্র কখন কারাগারে পরিণত,—'ফিরে চলো মাটির টানে'—কোথায় কোন দিকচক্রবালে একটু রেখা, একটু সবুজ, গাছপালা, বাড়ীঘর, মানুষের ঠিকানা! চারদিকের নীলিমায় সমুদ্রতরঙ্গের শুভ্রতা এসে দেখা দিয়ে যাচ্ছে কত সহস্রবার, তবু একটি মাত্র সিন্ধুসারস যখন আকাশ থেকে নেমে এলো কোথাও কোনো তীরের সংবাদ নিয়ে, সে তখন সবার আত্মীয়। সমুদ্রে না গেলে তীরের আহ্বান কে শুনতে পেয়েছে?

তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রকে প্রথম দেখেছিলাম আকিয়াব-বন্দরে। কিন্তু তীরে আর সমুদ্রে কোনো দূরত্ব ছিল না। বন্দরের অব্যবহিত নীচেই খরসমুদ্র। ফলে যে দূরত্ব ছবিকে স্পষ্ট করে, যথার্থ পটভূমি বিস্তার করে, সে দূরত্ব আয়ত্তের বাইরে থেকে যায়।

পুরীর সমুদ্রই একসঙ্গে সমুদ্রতীর ও সমুদ্র—এ দুই চিত্রকল্প কোনো এক শীতের সকালে আমার সামনে একসঙ্গে মেলে ধরেছিল। ওই সুনীল সৌন্দর্যে জগন্নাথের অচল অধিষ্ঠান বলেই কি পুরীর আর এক নাম 'নীলাচল'? মন্দিরের নীলাভ জগন্নাথ স্থির সমাহিত, আর সমুদ্রে সহস্রকল্লোলিত জগন্নাথ বাইরে চিরবৈচিত্র্যে লীলাময়, অন্তরে পরমশান্তিতে গহনানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলতেন, 'সমুদ্র আর

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। 'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' বিষয়ে গবেষণাগ্রন্থের জন্ম উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. উপাধিপ্রাপ্ত। 'ভারতাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য' এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাংলাসাহিত্য'—ইঁহার অপর তিনটি বিশিষ্ট গ্রন্থ।

হিমালয় না দেখলে অনন্তের ধারণা হয় না'—সেকথা একবার বুঝেছি পুরীর সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে, আর একবার অনুভব করেছি মায়াবতী থেকে হিমালয়ের শিখরচূড়া দেখে। সমুদ্রের অজস্র তরঙ্গে, আর হিমালয়ের অগণিত শৃঙ্গ-মালায় কোথাও মিল আছে—একটি জলের ঢেউ, আর একটি শিলার। এই পৃথিবীর তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ ওদের দিকে যখন চেয়ে দেখে, সীমাহীন বিস্ময় সেই মুহূর্তে তাকে জীবন্মুক্তির আভাস দিয়ে যায়। অনন্তের সান্নিধ্যে আমরাও অনন্ত হয়ে উঠি—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—'তদাকারকারিত'।

আবার রামপ্রসাদ ওরই মধ্যে একটু আস্বাদনের পার্থক্য রাখতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের উপমায় 'নুনের পুতুল সমুদ্রে গলে এক হয়ে যাওয়া' আর রামপ্রসাদের উপমায় 'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালো-বাসি।' অবশ্য ভালো-মন্দ একসময়ে সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়! তার আগেই 'চিনি খাওয়া'র পালা। তেমনি সমুদ্রকে দেখার জন্য দরকার সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ানো। যত বিস্তীর্ণ সেই সমুদ্রসৈকত, তত অন্তরঙ্গ মানুষের সঙ্গে সমুদ্রের কলভাষণ। পুরীর সমুদ্রতীরে সহস্র যাত্রীর পদক্ষেপের অন্তরালে একটি নিভৃত নির্জন চরণধ্বনি—কান পেতে থাকলে ঠিক শোনা যায়।

*

বাংলার দক্ষিণে তো কতদূর নীলসমুদ্র! তবু এখনো ঠিক সমুদ্রতীরের তেমন কোনো জনপদ গড়ে ওঠে নি, যা মহিমায় ও সৌন্দর্যে পুরীর সমুদ্রের কাছাকাছি কিছু হতে পারে। তবু সমুদ্র মানেই আহ্বান। দীঘায়, জুনপুটে, ফ্রেজারগঞ্জে বা বকখালিতে যাঁরা বেড়াতে যান, তাঁরাও অসীমের স্পর্শ পান বৈ কি—কিন্তু পুরীর সমুদ্র যেমন সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতায় কল্পনাকেও হার মানায়, তেমন কিছু এসব জায়গায় আশা না করাই ভালো। তবু যদি কাঁথির দিকে কোনো উধাও বাসে যেতে যেতে চঞ্চল হাওয়ার স্পর্শে সমুদ্রের দূরাগত আহ্বান শুনতে পান, তাহলে অবাক হবার কিছু নেই। তারপর এক সময় দীঘার সমুদ্রতটে এসে নীলাভ জলের ঢেউ দেখতে দেখতে অনেক পরিমাণে স্থির শান্ত বিস্তীর্ণ জলরাশির দিকে চাইতে চাইতে যদি মনে হয় সমুদ্র এখানে সংবৃতরূপে আপন মহিমায় আপনি মগ্ন হয়ে আছে, কোনো উচ্ছ্বসিত আহ্বান নয়, প্রতিমুহূর্তের উদ্বেল তরঙ্গে রহস্যময় সৃষ্টি নয়, এক প্রশান্ত বিস্তীর্ণ অবাধ বারিধি দিগন্ত স্পর্শ করে আবার কখন নিজের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে—তখন মনে রাখা ভালো, এও কম পাওয়া নয়। প্রকৃতির এমন অনন্ত অবকাশ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি থেকে পুনরুজ্জীবনের পক্ষে প্রায় বিশল্যকরণী।

আজ অবধি সহজগম্য ওই একটি সমুদ্রসৈকত বলেই দীঘায় জনারণ্য অনেক বেশী। অনেক মানুষের এক ধরণের আকর্ষণ আছে। আবার প্রায় জনহীন সমুদ্রতীরের আকর্ষণও কম নয়। যাঁরা সেই একলা সমুদ্রকে পেতে চান, তাঁরা দীঘার অদূরে জুনপুটে যেতে পারেন, যেখানে দীঘার মতো তীরভূমি ক্ষয়িষ্ণু নয়, যে সমুদ্র-তীরের ঝাউগাছগুলিতে আর একটু ছায়াঘন নির্জনতা। এখানেও সমুদ্র অনেক শান্ত, তীর থেকে অসীম বিস্তারে নিমেষে হৃদয়হারী, কখনো বা জেলেদের নৌকো আর জালে জীবিকা ও জীবনের আর এক জগৎ!

পুরীর সমুদ্র একই সঙ্গে ঈশ্বর ও মানুষ—এ দুয়ের কথাই মনে পড়ায়। যাঁরা সেখানে যান, তাঁরা অর্ধেক তীর্থযাত্রী, অর্ধেক ভ্রমণবিলাসী।

কেউ যদি বলেন, একালের মানুষ আর ঈশ্বরকে চায় না, কেবল সৌন্দর্যকেই চায়, তার উত্তরে বলা যায়, সৌন্দর্যই কি আর এক অর্থে ঈশ্বর নয়?

তাই যদি না হবে, দীঘা বা জুনপুটে এসেও কেন বাইরের সব কথা থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকি আমরা? প্রকৃতি যেখানে সবচেয়ে উদার উন্মুক্ত, সেখানেই কেন সে সবচেয়ে গভীর আত্মীয়তম? এ আত্মীয়তা কি আসলে সেই অনির্বচনীয়তাই নয়, উপনিষদ যাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'! কথায় নয়, বিচারে নয়, শুধু উপলব্ধির দ্বারাই সীমাহীন সমুদ্র আমাদের কাছে ধরা দেয়, আর সেই ধরা-দেওয়াতেই প্রমাণ করে যে সে ঈশ্বরের প্রতিরূপ।

*

বাংলার দীঘা আর জুনপুট যে বছর দেখলাম, তার পরের বছর এলো আরব-সমুদ্রের আহ্বান। মাঝে আর একবার সিন্ধুতীরে জগন্নাথের দর্শনে সচল ও অচল বিগ্রহে মহাপ্রভুর দর্শনধন্য হ'বার সুযোগ মিলেছিল। তারপরই বিমানপথে বোম্বে।

রেঙ্গুন থেকেও সমুদ্র দূরে নয়, কলকাতার কাছেই ডায়মণ্ড হারবার। কিন্তু বোম্বে একেবারে লক্ষীর মতো সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে। সমস্ত শহরটাই যেন প্রসারিত দ্বীপ। কিছুটা প্রকৃতির, অনেকটা মানুষের চেষ্টায় তৈরী এ দ্বীপকে সমস্ত পশ্চিমদিকে ধারণ করে আছে আরব-সমুদ্র। এদিকে 'খার' থেকে ওদিকে 'নরীম্যানস্ পয়েন্ট' অবধি শহরের যে কোনো দিক থেকেই সমুদ্র আপনার গন্তব্য হ'তে পারে। ঋজু বা কুটিল যে কোনো পথেই বোম্বের মানুষ সমুদ্রে গিয়ে পৌছুতে পারে— এ যে কত বড়ো সৌভাগ্য—তা আমরা নদীতীর-বাসী নাগরিকেরা (কলকাতা বা রেঙ্গুনের লোকেরা) অনুমান করতে পারি মাত্র।

বঙ্গোপসাগর থেকে আরব-সাগর—দীঘা থেকে জুহু—সমুদ্রের দ্বারা ত্রিধাবেষ্টিত এই ভারতবর্ষের সব প্রান্ত শুধু মাটির দিক থেকেই যুক্ত নয়, জলের দিক থেকেও সমান যুক্ত। এই জলপথে একদা বাংলার সঙ্গে গুজরাটের সহজ যোগাযোগ ঘটতো। বোম্বে তখনও বন্দর হিসাবে গুরুত্ব পায় নি। বাঙালীর 'সিংহল বিজয়' কতোটা ঐতিহাসিক, বলা কঠিন। কিন্তু রামায়ণ থেকে মঙ্গলকাব্যে—'লঙ্কা' বা 'সিংহল' বাঙলা সাহিত্যে সেই দ্বীপ—যার সঙ্গে জলপথে বা কল্পনায় আমাদের যোগ কখনো ছিন্ন হয় নি। মধুসূদনের রাবণ যে লঙ্কাপুরীর অধীশ্বর, সে লঙ্কা কবি-কল্পনার স্বর্ণপুরী। যদি কোনো বাঙালী সন্তান লঙ্কা জয় করেও থাকেন, সে ঘটনার ক্ষতিপূরণ 'মেঘনাদবধকাব্যে' খুব ভালো ভাবেই হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে আমরা চিরকাল কোনো দূরতম দ্বীপ কল্পনা করে থাকি, যার চার দিক ঘিরে অলঙ্ঘ্য সমুদ্রের কলরোল। সে দ্বীপের সঙ্গে সেতুবন্ধ স্থাপন করেই আমাদের বেঁচে থাকা—কবিতায়, ছবিতে, গানে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, তপস্যায়, আরাধনায় সেই কল্পদ্বীপটির সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপনের চেষ্টা। হয়তো সে দ্বীপ আছে, হয়তো বা নেই— তবু সমুদ্র আছে, আর আছে চিরন্তন অন্বেষণ!

বোম্বে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে সামান্য দূরত্বে জুহু সমুদ্রোপকূল। বোম্বের খ্যাতিই জুহুর খ্যাতির কারণ, এ বিষয়ে সমুদ্রতীর-অভিলাষীরা দ্বিমত হবেন না। দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে নিতান্ত সীমাবদ্ধ এই সমুদ্রতীর কিন্তু বোম্বের সব স্তরের নরনারীকে আকর্ষণ করে। তীর হয়তো প্রশস্ত নয়, কিন্তু 'সম্মুখে উদার সিন্ধু।' জনবহুল বোম্বের কলরবকে ছাপিয়ে উঠতে পারে না এর

সমুদ্রস্বর, তবু সমুদ্রের পাশে এলেই ধীরে ধীরে বাসস্থানের জন্য বোম্বের অধিবাসীদের অধীর ব্যাকুলতার এক নিঃশব্দ প্রতিবাদ মনের মধ্যে বাজতে থাকে। পৃথিবী অনেক বড়ো, সমুদ্র সীমাহীন,- বেঁচে থাকার আরো কোনো অর্থ আছে। কেবল অর্থসঞ্চয়, উর্ধ্বগামী অট্টালিকা, নম্রতম ঝোপড়ি, দিনরাত্রির প্রশ্নহীন অবক্ষয়—এরও পারে কিছু আছে। সূর্যাস্তের আগে জুহুর তীরে এসে দাঁড়ালে সমুদ্র আপনাকে একান্ত আত্মীয়ের মতো আহ্বান করবে, ধীরে ধীরে অস্তায়মান রশ্মিছটায় জগতের রঙ বদলাতে থাকবে, অগণিত ঊর্মিল সংকেতে আপন হৃদয়ের আলাপচারী শোনাতে শোনাতে কখন এক অকূল নৈঃশব্দ্যের পারে এনে দাঁড় করাবে ; মনে হবে, পৃথিবীতে এত মানুষ সত্ত্বেও এত নির্জনতা !

এমনি এক সন্ধ্যার লগ্নে জুহুর উপর দিয়ে পশ্চিমের দিকে উড়ে গেল এরোপ্লেন। তাকিয়ে দেখি বিগলিত স্বর্ণ-তরঙ্গে সূর্য অর্ধেক ডুবে আছে, তার মাথার উপরে মেঘের রেখা, আর সেই রেখার সমান্তরালে বিলীয়মান কোনো দূরগামী বিমান। মুহূর্তে মনে পড়লো এই বোম্বে থেকে পশ্চিম পৃথিবীর আকাশ-বাতায়ন খুলে গেছে, আমরা ভারত থেকে বিশ্বের পটভূমিতে উত্তীর্ণ এই বাতায়নপথে। কোনো সন্দেহ নেই, বৃহত্তর জগতের কর্মকেন্দ্র আজো প্রতীচ্য, আর প্রতীচ্যের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র-রচনার সিংহদ্বার এই বোম্বে নগরী। পশ্চিমের দিক-চক্রবাল থেকে আকাশভরা এক আমন্ত্রণলিপি গোধূলির বহুবর্ণ অক্ষরে হৃদয়প্রান্ত স্পর্শ করে প্রসারিত হলো। 'জুহু'-সমুদ্রতীর বিশ্বতোমুখ ভারতসত্যের আর এক পরিচয়।

*

বোম্বের সমুদ্র আপনাকে শহরের সব প্রান্ত থেকেই নানাভাবে ডাক দিয়ে যাবে। কখন কীভাবে আপনি সাড়া দেবেন, তারই উপর নির্ভর করছে তার অনন্ত সৌন্দর্যের উন্মীলন। যেমন ধরুন, ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড নামে একটি সমুদ্র-দর্শনের নির্দিষ্ট স্থান, যেখানে বেশ কিছু সমুদ্র-রসিক এসে হাজির হন সকালে-বিকালে। ছোট্ট একটি কফিপানের কাফে রয়েছে—ইচ্ছে করলে কফির কাপ সামনে রেখে সামনের জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখতে পারেন প্রাণভরে। যদি তেমন ভীড় না থাকে সেদিন, (যেমন যে নির্জন মেঘলা দিনে আমি গিয়েছিলুম), আর কাজের তাড়া না থাকে, তাহলে একটি বিকেল সেখানেই থাকুন না !

সেদিন দুপুর থেকেই বোম্বের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। তরুণ এক সহযাত্রীর আমন্ত্রণে ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে সমুদ্র দেখতে চললুম। ঝড়ের সমুদ্র জাহাজে চড়ে অনুভব করেছি, মেঘলা দিনের সমুদ্রকে দেখবো তীরে দাঁড়িয়ে।

যখন পৌঁছলুম, লোকজন প্রায় নেই। প্রথম দর্শনে একটু হতাশই হতে হয়, ছোট্ট এই জায়গা থেকে কতটুকু দেখবো সমুদ্রের রূপ! কিন্তু না, সমস্ত আকাশ জুড়ে মেঘ ও রৌদ্রের সমারোহে এক বিশাল পটভূমি রচনা হয়ে আছে। আর সেই সঙ্গে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গ-বিস্তার মুহূর্তে মুহূর্তে তীরের গ্রানাইট পাথরে আছড়ে পড়ছে। বোম্বে এসে মনে হয়েছিল, সমুদ্র নিয়েছে মৌন, শহর—কল্লোল। কিন্তু সেদিন সমুদ্রের প্রশান্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করে তার অন্তরবাসী অশান্ত আত্মা দিকে দিকে প্রতিবাদ জানাতে চাইছিল। অথচ তারই মধ্যে আকাশে বাতাসে সমুদ্রে মিলে এক রুদ্রসুন্দর নটরাজের তাণ্ডব লীলায় কতক্ষণ মগ্ন হয়ে ছিলাম! চির-অপরিচিত সমুদ্র আমাদের কত ভাবেই মুগ্ধ করে রাখে!

বোম্বের সমুদ্রের আর এক স্মৃতি 'মেরিন ড্রাইভ'—যেখানে মানুষের শিল্প এসে সমুদ্রের শিল্পকে আরো মোহময় করেছে, যেখানে ফেনিল জীবনস্রোতের সঙ্গে তরঙ্গিত সমুদ্রের অর্ধ-বলয়িত নীলিমা সন্ধ্যার অন্ধকারে আলোকমালার চন্দ্রহার গলায় পরে এক নন্দন-কল্পনার শ্রেষ্ঠ আভাস দিয়ে যায়। যদি 'মালাবার হিলে'র উপর থেকে কোনো সন্ধ্যায় 'মেরিন ড্রাইভে'র মসৃণ রাজপথে সেতুর উপর দিয়ে যানবাহনের চলাচল দেখতে পান, তাহলে এই যন্ত্রযুগের জীবনধারা যে শুধু যন্ত্রণা নয়, এরও নিজস্ব ছন্দ, সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনা আছে সেকথা আপনিই মনে জাগবে।

*

সমুদ্র-মন্থনে একদা অমৃত, পারিজাত, দেবী লক্ষ্মী—এমন কতো কিছু কাম্যতম সম্পদ উঠে এসেছিল, আবার সবশেষে এসেছিল বাসুকির গরল। সিন্ধুসমাসীন বোম্বে জীবন-মন্থনের সেই অমৃত এবং বিষ—দুইই আধুনিক ভারতবর্ষের অধরপ্রান্তে উপস্থাপিত করেছে। আমরা দুটিকেই সমান দূরত্বে রেখে, আসুন, সমুদ্র দেখি।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু*

উনিশ শতকের শেষে স্বামী বিবেকানন্দ সহসা যেন কোনো অদৃশ্য স্থান থেকে আবির্ভূত হয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে পতিত ভারতবর্ষকে টেনে তুলে আধুনিক বিশ্ব-মানচিত্রে স্থাপন করে-ছিলেন। সেই কাজ করবার সময়ে তাঁকে অনেক কিছুকে দারুণ আঘাত করতে হয়েছিল—তার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যগোঁড়ামি এবং ধর্মীয় আচার-সর্বস্বতাও আছে। অচিরকালে দেখা গেল, বৃহত্তর ভারতীয় জাতি স্বামীজীর নামে যখন উন্মাদনা বোধ করছে, ঠিক তখন রক্ষণশীলরা প্রতিঘাত করছে তাঁকে। বাংলাদেশে এই হিন্দু-রক্ষণশীলতার পক্ষে বিবেকানন্দ-বিরোধী আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল বহুল-প্রচারিত বঙ্গবাসী কাগজ। বঙ্গবাসী কাগজের ঐকালের সংখ্যা পাওয়া যায় না। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বঙ্গবাসীর উদ্ধৃতি থেকে আমরা ঐ বিরোধী প্রচারের কিছু রূপ অনুমান করতে পারি।

১৮৯৭ সালে স্বামীজী যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বঙ্গবাসীর সম্পাদক ছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঁচকড়ি বাংলাদেশে একযুগে বিখ্যাত ব্যক্তি। তিনি ঐকালে এবং পরবর্তী কালে স্বামীজী সম্পর্কে অনেক বার লিখেছেন। তার অল্প অংশই উদ্ধার করতে পেরেছি। সেইসকল রচনা থেকে দেখতে পাই, রক্ষণশীলতার পক্ষে যাঁরা কলম ধরেছিলেন, তাঁরা সকলেই পুরো রক্ষণশীল ছিলেন না, এবং অনেক সময়ে তাঁদের লেখার পিছনে ব্যক্তিগত বিশ্বাস অপেক্ষা অন্নদাসত্ব বা গোষ্ঠী-দাসত্বের প্রভাব বেশি সক্রিয় ছিল।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (দুই খণ্ডে), 'সহাস্য বিবেকানন্দ', 'নিবেদিতা লোকমাতা', 'সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং', 'ভারতচন্দ্র', 'চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি', 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। 'বিবেকানন্দ ইন্ ইণ্ডিয়ান নিউজপেপার্স'-গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক।

পাঁচকড়ি সম্বন্ধে আমি দেশ পত্রিকায় ২৫ জুন, ১৯৬৬, এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলুম। পাঁচকড়ির শক্তিসামর্থ্য, পাণ্ডিত্য, তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রবলতা, অস্থিরতা, আত্মখণ্ডন, সুগভীর বিষাদ—যথাসম্ভব ঐ লেখায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলুম। তার থেকে অল্প-কিছু ভূমিকারূপে এখানে সংকলন করছি।

পাঁচকড়ির জন্ম ভাগলপুরে, ২০ ডিসেম্বর, ১৮৬৬; মৃত্যু—১৭ নভেম্বর, ১৯২৩। তিনি মেধাবী ছাত্র; সংস্কৃতে অনার্সসহ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেন: কাশীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি পান; ধর্মশাস্ত্রেরও বিশেষ চর্চা করেন; এক্ষেত্রে সহায়ক কৃষ্ণ-প্রসন্ন সেন, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি; ভাগলপুরে প্রথম বয়স কেটেছিল বলে হিন্দী, উর্দু, ফার্সী জানতেন; ইংরেজি সাহিত্যেরও বিশেষ অনুশীলন করেন; সব জড়িয়ে অর্জনের পরিমাণ এমনই বিপুল ছিল যে, স্টেটসম্যান লিখেছিল: "Panchcowri was probably the most well informed and well read of Bengali journalists." (17. 11. 23)

সাংবাদিক হিসাবে পাঁচকড়ি অতুলনীয়—তাঁর মতো সংখ্যায় নানা ধরনের সংবাদপত্রে আর কেউ কাজ করেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত পাঁচকড়ির সংক্ষিপ্ত জীবনীতে যা পাই তার সঙ্গে নূতন সংবাদ যোগ করে দাঁড়িয়েছে:

'বঙ্গবাসী' কাগজে ১৮৯২ (?) সালে কাজ শুরু করেন, ১৮৯৫ থেকে ঐ কাগজের প্রধান সম্পাদক; ১৮৯৯ ফেব্রুয়ারি থেকে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সম্পাদক; ১৯০১ থেকে 'রঙ্গালয়'-এর সম্পাদক; ১৯০৭-এ 'দৈনিক হিতবাদী'র সম্পাদক। 'বাঙ্গালী' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন। 'স্বরাজ' পত্রিকায় প্রত্যহ লিখতেন; ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা'-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বঙ্গবাসী-গোষ্ঠীর ইংরেজি দৈনিক 'টেলিগ্রাফ'-এর সম্পাদনা করেছেন; সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সান্ধ্য সম্পাদকীয় বিভাগেও যুক্ত ছিলেন। 'ভারত মিত্র' নামক হিন্দী পত্রিকার সম্পাদক। 'কলিকাতা সমাচার' নামক হিন্দী পত্রিকা এবং 'দৈনিক পত্রিকা' নামক বাংলা পত্রিকার সঙ্গেও যোগ ছিল। 'বেদব্যাস', 'ধর্মপ্রচারক', 'জন্মভূমি', 'অনুসন্ধান', 'বঙ্গবাণী', 'ধ্রুব', 'সাহিত্য', 'নারায়ণী', 'বিজয়া' ইত্যাদি পত্রিকার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 'প্রবাহিণী' নামক সচিত্র সাপ্তাহিকের সম্পাদনা করেছেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পরে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনাও। আর, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত এমন কে আছেন যিনি 'নায়ক' পত্রিকার নাম জানেন না, যার দীর্ঘদিনের সম্পাদক এই পাঁচকড়ি।

এই বিস্ময়কর হিসাবও অসম্পূর্ণ বলেই আমাদের ধারণা। তাহলেও বোঝা যায়, সাংবাদিক হিসাবে কেন তাঁকে আমরা শীর্ষে স্থাপন করতে চাই। কিন্তু অতগুলি পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগ কেন? কারণ—পাঁচকড়ি বাংলার সেরা 'পেশাদার' সাংবাদিক। কাগজে-কাগজে তিনি ঘুরেছেন পেটের দায়ে। সকালে এক কাগজে যা লিখেছেন, সন্ধ্যায় অন্য এক কাগজে তার উল্টো কথা—ঐ পেটের দায়ে। বিরাট পণ্ডিত তিনি, কিন্তু কর্মজীবনের বড় অংশে তাঁকে রঙ্গ-রসিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে লোকরঞ্জন করতে হয়েছে। নগদ মূল্যে পাঁচকড়ি লেখা বেচেছেন আর কেঁদেছেন গভীরে—গভীরস্বভাব ঐ মানুষটি: "'বিকায় যে —!' কথাটা রঙ্গের নহে, বড়ই ক্ষোভের ও

লজ্জায়। ব্রাহ্মণ আমি, আমাকে বিক্রয়ের দিকে কাগজে কলমে এক করিতে হয়। ...ভাঁড়ামী বিকায় বলিয়া সকলে আমাকে রাখে। আমাকে দেখিয়া, আমার আমিত্বের পরিচয় লইয়া, কেহ আমার প্রতিপালন করিল না। কাজেই বলিতে হয়, আমার ক্ষুধার অন্ন আমায় নিজে অর্জন করিয়া লইতে হইতেছে।... কাঁদিলে কেহ শুনে না, বুঝে না, তাই হাসিতে হয়। হায় বিধি! হাসিও যে কত ব্যথার হাসি, তাহাও ইহারা বুঝিল না।" [প্রবাহিণী, ২৭ পৌষ, ১৩২১]।

হাসি-তামাশার লেখাতেই যে, পাঁচকড়ির একমাত্র পরিচয় আবদ্ধ ছিল না, সে-বিষয়ে অন্য কেউ নয়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৫ শক, অগ্রহায়ণ) লিখেছিল: "তিনি যে কেবল তীব্র শ্লেষ ও রসিকতার সঙ্গে হালকা লেখাই লিখিতেন, তাহা নহে—আবশ্যক হইলে তাঁহার লেখনীমুখ হইতে গুরুগম্ভীর রচনাও অবলীলা-ক্রমে বাহির হইত। তিনি বাংলার সমাজ ও ধর্মের একটা প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন।" পাঁচকড়ির মৃত্যুতে ভারতী পত্রিকা লিখেছিল (১৩৩০ অগ্রহায়ণ): "তাঁর মতো চিন্তাশীল পণ্ডিত সাহিত্যসেবীকে হারাইয়া বাংলা সাহিত্য আজ প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এ দেশের পুরাণ-শাস্ত্র ও প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও তাঁর আলোচনার প্রকাশ-ভঙ্গি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়

প্রধানতঃ সাময়িকপত্রেই পাঁচকড়ির লেখা বেরিয়েছে, যাদের অধিকাংশই এখন পাওয়া যায় না, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনার পরিমাণ কম—তাই পাঁচকড়ি কতখানি পণ্ডিত ছিলেন, তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখার কিছু সংকলন করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে দুই খণ্ডে পাঁচকড়ি রচনাবলী বেরিয়েছে। তার মধ্যে প্রচুর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আছে, যদিও সাময়িক পত্রের প্রয়োজনে লেখা বলে, এবং পাঠকের মনের মধ্যে সরাসরি প্রবেশ করতে তিনি উৎসুক ছিলেন বলে, সেগুলিতে অতিরিক্ত সরলতা, ক্ষেত্রবিশেষে তরলতা আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি দ্রুত লিখেছেন, ফলে রচনা-শৈলীতে সময়সঞ্চিত ধীরতা ছিল না। তবু বোঝা যায়, কতদিকে প্রসারিত ছিল তাঁর মন। এদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব সম্বন্ধে লেখাগুলিতে দেশ ও জাতির জীবনতরঙ্গের ওঠাপড়াকে প্রত্যক্ষ করা যায়। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' 'স্টাডিজ্ ফ্রম অ্যান ইসটার্ণ হোম' ইত্যাদি গ্রন্থে ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে আরও উন্নত কল্পনায় ও শ্রেষ্ঠতর রচনাশৈলীতে যে-কাজ করেছেন, পাঁচকড়ি সহজতরভাবে, অধিকতর শাস্ত্রনিষ্ঠ হয়ে, সেই কাজই করেছেন বাংলায়। সমাজতত্ত্বে ছিল পাঁচকড়ির সহজ অধিকার, তৎসহ দেশপ্রীতি এবং ধর্মবিজ্ঞানে অনুপ্রবেশ। পুরাতন তত্ত্ব ও শাস্ত্রের নূতন অর্থ আবিষ্কারে তাঁর দক্ষতার সার্থক পরিচয়—তন্ত্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী।

বাংলার আধুনিক সমাজজীবন সম্বন্ধেও পাঁচকড়ির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার শেষ ছিল না। অজস্র সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযোগের জন্য অজস্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, নানা স্বার্থে জড়ানো সেই জীবকুল পাঁচকড়িকে মনুষ্য-হাটের ঝানু ব্যাপারী করে তুলেছিল। বাংলাদেশের বিখ্যাত অনেক মানুষকে পাঁচকড়ি সাক্ষাতে জেনে-ছিলেন—বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ভূদেব, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, ইন্দ্রনাথ, আশুতোষ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাথ—কে নন? তালিকা স্বচ্ছন্দে বাড়িয়ে

খাওয়া যায়। এক কথায় তিনি উনিশ শতকের শেষ দুই দশক এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বাঙালীকে (অর্থাৎ বাংলার মনীষার স্বর্ণ যুগের সেরা বাঙালীদের) নিকটে দেখেছিলেন। এইজন্ম কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি সম্বন্ধে লিখবার সময়ে তাঁকে বিচলিত বিগলিত হতে হত না। বিচারশীল মন নিয়েই পাঁচকড়ি মনীষী-বিচার করতেন। এমন মানুষ যদি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লেখেন, অকারণ বিহ্বলতা তাঁর কাছ থেকে আশা না করাই উচিত।

১৮৯৫-৯৭ সময়ে বঙ্গবাসী পত্রিকায় পাঁচকড়ির বিবেকানন্দ-সমালোচনাত্মক লেখা-গুলি বিচার করবার সময়ে উপরের কথাগুলি আমরা যেন স্মরণ রাখি। স্মরণ করিয়ে দেব আরও কয়েকটি কথা। বঙ্গবাসী পত্রিকায় পাঁচকড়ির প্রথম সাংবাদিক-জীবন বলে তখন তিনি নানা হাটে ঘুরছেন না, সেজন্ম প্রথম বয়সের কিছু মতনিষ্ঠা ঐ সাংবাদিক-জীবনে ছিল। আর সে মত রক্ষণশীল। পাঁচকড়ি বাংলার রক্ষণশীল আন্দোলনের দুই প্রধান নেতা—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং শশধর তর্ক-চূড়ামণির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। কৃষ্ণপ্রসন্নের সঙ্গেই তিনি রামকৃষ্ণ-দর্শনে একবার গিয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর সাহিত্যগুরু, যিনি ব্রহ্মণ্যগোঁড়ামির আর এক শক্ত খুঁটি। ইন্দ্রনাথই তাঁকে বঙ্গবাসীতে প্রবেশ করিয়ে দেন।

১৮৯৭ সালে স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনকালে বঙ্গবাসী যে-সম্পাদকীয় রচনাটি লেখে, তা সমকালে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সেই জন্ম 'লাইট অব দি ইস্ট' পত্রিকা ১৮৯৭, ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় সেটি অনুবাদ করে প্রকাশ করে। তার আগে নিম্নের মন্তব্য করে:

"That a prophet is not honoured in his own country is a saying whose truth is verified by long experience. The Bangabasi, the leading vernacular paper of Bengal, having at least a lac of readers, in a leader on Swami Vivekananda says—"

বঙ্গবাসীর বাংলা সম্পাদকীয়ের ইংরেজি অনুবাদের পুনশ্চ বঙ্গানুবাদ করছি আমরা। এটি পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়েরই লেখা।—

"বিবেকানন্দ কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ইণ্ডিয়ান মিরার তাঁর বিষয়ে লম্বা-লম্বা প্রবন্ধ লিখছে। অমৃতবাজার ও হিন্দু পেট্রিয়ট তাঁকে উচ্চরবে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। কিছুসংখ্যক দেশীয় পত্রিকা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। কুমার বিনয়কৃষ্ণ তাঁকে ফুলমাল্য ও গন্ধদ্রব্য দিয়ে পূজা করতে প্রস্তুত, এবং পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সম্ভবতঃ এই বীরপূজার মহাপুরোহিত হবেন। জনসাধারণ এইসব সৎসঙ্গে আমোদিত হোক, প্রশস্তি করুক, বিবেকানন্দের গুণগানে ভাবাবেগে নৃত্য করুক; তারা তাঁকে আলিঙ্গন করে বুকে ধরে রাখুক; রাজরাজেশ্বরের যোগ্য অর্ঘ্যে তাঁকে ভূষিত করুক; সেসব অভি-ব্যক্তিতে আমাদের আপত্তি নেই। অপরপক্ষে আমরা বিবেকানন্দের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি-সম্পন্ন। যে-ব্যক্তি হিন্দুধর্মের সত্য আমেরিকার জনগণের কাছে ঘোষণা করেছেন, তাঁকে অনুরাগিগণ সম্মান করুক, সেটা তাদের কর্তব্য। সে-কাজ না করলেই আমরা বরং দুঃখিত হব। ওসব বিষয়ে আমাদের সায় আছে। আমাদের আপত্তি অন্য ক্ষেত্রে। যখন দাবি করা হয়—বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা, তিনি সন্ন্যাসী, দণ্ডী, স্বামী, যোগী, পরমহংস—তখনই আমরা

কঠোর প্রতিবাদ করতে বাধ্য হই। বিবেকানন্দকে যদি আমাদের কাছে বাবু নরেন্দ্রনাথ-রূপে উপস্থিত করা হয়, যা তাঁর পুরাতন পরিচিত নাম—তাহলে আমরা তাঁকে সর্বপ্রকার বিহিত সম্মানসহকারে সানন্দে অভ্যর্থনা জানাব। বিবেকানন্দ অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ করেছেন। তাঁকে সম্মান জানাতে আমাদের কুণ্ঠা হওয়া উচিত নয়। ভারতে রাশিয়ার যুবরাজ, মিঃ ব্রাড্‌লো, ডিউক অব কনট উপস্থিত হলে আমরা আনন্দপ্রকাশ করেছি। তাহলে বিবেকানন্দের বেলায় চুপ করে থাকব কেন? তিনি পাশ্চাত্ত্যদেশে ধর্ম-বিজয়ের অন্তে শিরোপা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

"বস্তুতঃপক্ষে আমরা বিবেকানন্দকে দীর্ঘদিন ধরে ভালবাসি। যখন তিনি বিবেকানন্দ নাম ধরেন নি, তারও আগে থেকে তাঁর বিষয়ে আমাদের একপ্রকার শ্রদ্ধা। বি-এ পাস করার পরে তিনি যখন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, তখনো তাঁকে ভালবাসতাম। মেট্রো-পলিটান ইনস্টিটিউশনে যখন তিনি শিক্ষক-হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন, এবং নানাবিধ তর্কযুক্তির দ্বারা হিন্দুধর্মের অসারত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করতেন, তখনো তাঁকে ভাল-বাসতাম, যদিও তাঁর মতামত আমাদের বিশেষ আঘাত করত। তারপর যখন তিনি হিন্দুশাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্যাদি গ্রহণ করতেন, এবং অপরকে সেই কাজে প্রণোদিত করতেন, তখনো তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা যায় নি। তারপর তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য হয়েছিলেন।

"আমরা তাঁকে ভালবাসতাম কারণ প্রখর ছিল তাঁর চিৎশক্তি, প্রবল তাঁর জীবনীশক্তি, এবং নৈতিক সাহস; কারণ, সূক্ষ্ম দার্শনিক ও তাত্ত্বিক আলোচনায় গোলমেলে জট খুলে গোটা ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য তাঁর ছিল; কারণ, পৃথিবীর বহুবিধ ধর্মবিষয়ে তাঁর সর্বাত্মক জ্ঞান ছিল; কারণ, তাঁর ছিল সম্মোহন-কারী আকার আর সর্বজয়ী কণ্ঠস্বর। তাঁকে তখন যদি আমরা ভালবেসে থাকি তাহলে এখন—যাঁর হিন্দুধর্ম-ব্যাখ্যা ইংলণ্ড আমেরিকার নরনারীর চিত্তজয় করেছে, এবং বিদেশভূমি থেকে নীতিধর্মের বিজয়ী বীর-রূপে যিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন—তাঁকে না ভালবাসা কি ? সিজারকে তাঁর প্রাপ্য না দিয়ে পারি কখনো? আমাদের বীরের মস্তকে আশীর্বাদ বর্ষণ করব না? তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি জানাবো না? তাকি হয়? তাই, স্বাগত! স্বাগত নরেন্দ্রনাথ! মাতৃভূমির অঙ্ক আলোকিত করে উপবেশন করো! হৃদয়ের ভরা পাত্রে উচ্ছলিত আনন্দ নিয়ে তোমার অনুরাগিগণ সুবর্ণমুকুট এবং হীরকখচিত সিংহাসন প্রস্তুত করে রেখেছে—তাকে স্বীকার করো।"

এই লেখাটির মধ্যে বিশেষ খোঁচাটি কোথায় ছিল তা একালের পাঠক সম্পূর্ণ বুঝতে পারবেন না। বঙ্গবাসীর পক্ষে বিবেকানন্দের প্রতিভা-স্বীকারে অসুবিধা ছিল না—অসুবিধা তাঁকে পরমহংস সন্ন্যাসী বলে স্বীকার করতে। তা যদি করা হয়, তাহলে রক্ষণশীল সমাজকে বিবেকানন্দ-নির্দেশিত পথ গ্রহণ করতে হয়, যা করা অসম্ভব। প্রথমতঃ বিবেকানন্দ কায়স্থ, রঘুনন্দনী-মতে তিনি শূদ্র, সুতরাং সন্ন্যাসে তাঁর অধিকার নেই। দ্বিতীয়তঃ তিনি কালাপানি পারে যাওয়ার মতো মহাপাতক-কর্ম করেছেন, তার দ্বারা সমুদ্রগর্ভে নিজ জাতিকে ডুবিয়েছেন, তথাপি প্রায়শ্চিত্ত-রজ্জুতে তাকে টেনে তুলতে গররাজি। তারপরে, যেখানে ম্লেচ্ছের ছায়াস্পর্শ

পর্যন্ত নিষিদ্ধ, সেখানে তিনি ম্লেচ্ছদের সঙ্গে একত্র আহার করেছেন—মাংসাহার পর্যন্ত! এত সব পাপ করার পরে তাঁকে হিন্দুধর্মের আচার্য মানলে হিন্দুধর্ম রসাতলে যাবে—যাবেই!—এসব কথা গভীরভাবে সমকালীন রক্ষণশীল পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছিল, আর বঙ্গবাসী ছিল তাদেরই প্রধান নেতা।

কিন্তু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিক থেকে দেখলে—যিনি বিদ্যাভিমানী, সংশয়ী, রক্ষণশীলতার দুর্গরক্ষী—উপরে উদ্ধৃত বিবেকানন্দ-বিষয়ক লেখাটিতে সমুচ্চ প্রশংসাই আছে বলতে হবে। পাঁচকড়ি যখন বিবেকানন্দকে হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা বলতে গররাজি, তখন ধরে নিতে পারি, তার মধ্যে সংবাদপত্রের মালিকের মতের প্রতিধ্বনি ছিল। কিন্তু কথাগুলি পাঁচকড়ির ব্যক্তিগত কথা হতেও বাধা নেই, কারণ তিনি পূর্বে কেবল নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক ক্ষুরধার দার্শনিক প্রাতিভাসম্পন্ন এক যুবককে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু তারপরে সে যুবক কতখানি পরিবর্তিত হয়েছেন রামকৃষ্ণ-আশ্রয়ে, কী পরিমাণে আত্মবিকশিত হয়েছেন পরিব্রাজক-জীবনে, কোন্ অভাবিতের উন্মোচন ঘটেছে তাঁর মধ্যে বহির্ভারতে—তা জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, এবং প্রত্যক্ষ না জেনে তাকে মানাও সম্ভব ছিল না এই বুদ্ধিদর্পিত মানুষটির পক্ষে।

স্বামীজী কলকাতায় ফিরবার পরে পাঁচকড়ি তাঁকে সাক্ষাতে আবার দেখলেন, জানলেন। এবং মুগ্ধ হলেন। ফলে তাঁর পক্ষে এক্ষেত্রে আর বঙ্গবাসীর দাসত্ব করা সম্ভব হল না।

অন্য দিক দিয়েও পাঁচকড়ি গুটি কেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। অবশ্যই তাঁর ব্রহ্মণ্যগৌরববোধ ছিল, তার প্রাপ্য মর্যাদা তিনি বুঝে নিতে চাইতেন; কিন্তু একই সঙ্গে আবার মাত্রাতিরিক্ত আচারী ব্রাহ্মণও ছিলেন না। বঙ্গবাসীর গোঁড়ামির কলম-সৈনিক হয়ে থাকা তাই শক্ত হয়ে উঠছিল। পাঁচকড়ির দেহত্যাগের পরে অমৃতবাজার ২১ নভেম্বর, ১৯২৩ এ-সম্বন্ধে লিখেছিলঃ "কলকাতায় এসে বঙ্গবাসী কাগজে প্রথম যোগদান করলেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার যোগ্য প্রকাশক্ষেত্র ঐ পত্রিকা ছিল না। বঙ্গবাসী ক্রমে যে-রকম দারুণ গোঁড়া হয়ে উঠেছিল—পাঁচকড়ি ঠিক সেই রকম আপসহীন গোঁড়া ছিলেন না। 'সন্ধ্যা'র জন্ম ও নূতন জাতীয়তার উদয়ের সময় থেকে তাঁর অপূর্ব লেখনীর মুক্তি ঘটল—'সন্ধ্যা'র মধ্যে তাঁর চিত্তপ্রোথিত রক্ষণশীলতার সঙ্গে যুগ-প্রয়োজনের সমন্বয় ঘটল।"

এই নূতন জাতীয়তা বহুলাংশে বিবেকানন্দের সৃষ্টি এবং যেসব শক্তি পাঁচকড়িকে রক্ষণশীলতার গণ্ডী কাটিয়ে উদারতর মানবপ্রেমের দিকে আকর্ষণ করেছিল, তার মধ্যে প্রধান একটি—বিবেকানন্দ।

স্বামীজীর দেহত্যাগ-কালে পাঁচকড়ি বঙ্গবাসীর দাসত্ব করছিলেন না—তখন তিনি 'রঙ্গালয়' পত্রিকার সম্পাদক। এই নূতন 'দাসত্বে' বিবেকানন্দ-নিন্দা করার বাধ্যবাধকতা ছিল না। সুতরাং বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মনের কথা খুলে লিখতে পারলেন:

"বিবেকানন্দের তিরোভাবে বাঙালী যে-নিধি হারাইল তেমন 'সাত রাজার ধন একটি মাণিক' আর বাঙালী সহসা পাইবে না। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে, রূপে-গুণে, বাক্‌শক্তিতে, তেজস্বিতায়, স্বাবলম্বনে, সাহসিকতায় বিবেকানন্দের মতো আর কে ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী আছে? আর তেমন হইতে কি পারিবে? মনে পড়ে সে সুঠাম, সুপুষ্ট, সুকান্ত দেহযষ্টি, মনে পড়ে সে

কোকিলঝঙ্কারতুল্য কোমল মধুর সুকণ্ঠের সুসঙ্গীত, মনে পড়ে সে স্পর্ধা, সে মর্যাদাবুদ্ধি, সে জ্ঞানগৌরবের তেজ— আর মনে পড়ে সেই লোকমোহন সামর্থ্য, অপূর্ব সরলতা ও সাধনপ্রিয়তা। একে-একে ধীরে-ধীরে দিনে-দিনে কত কথা মনে পড়িতেছে, কত কথা আরও মনে পড়িবে। বসন্তরোগের বিস্ফোটকের ন্যায়, একে-একে সকল ঘটনা স্মৃতিপথে ফুটিয়া মনকে জর্জরীভূত করিবে। সাধারণ জীবের ভাগ্যে যাহা আছে, আমাদের তাহাই সহিতে হইবে। যে মহাপুরুষ—সে তো নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেল।" ['রঙ্গালয়,' ২৮ আষাঢ়, ১৩০৯]।

একই সংখ্যায় পাঁচকড়ি "বঙ্গবাসীর প্রলাপ" নাম দিয়ে স্বামীজীর মৃত্যুতে বঙ্গবাসীর নীরস নির্বিবেক রচনার সমালোচনা করলেন। এর মধ্যে বঙ্গবাসীর মন্তব্যের বাংলা উদ্ধৃতি পাচ্ছি।

পাঁচকড়ি লিখেছিলেন :

"অতি বড় শত্রু হইলেও তাহার মৃত্যুতে মানুষের মনে একটু দুঃখের ভাব ফুটিয়া ওঠা স্বাভাবিক। অন্ততঃ লৌকিকতার খাতিরেও পিশাচবুদ্ধি জীবেও দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। সহযোগী বঙ্গবাসী কি লিখিতেছে দেখুন :

> 'মঠে মৃত্যু।—২৪ পরগণা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ৺রামকৃষ্ণ অনেকের পরিচিত। তাঁহার সেই বুদ্ধিমান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত—হাবড়া বেলুড়ের মঠে—ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই নরেন্দ্রনাথ অধুনা বিবেকানন্দ-স্বামী বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু ইঁহাকে আমরা বাহাদুর পুরুষ বলিতে কুণ্ঠিত নহি। ইনি অল্পবয়সে রামকৃষ্ণের শিষ্য হইয়া আপন মেধা ও বুদ্ধির প্রভাবে এবং বক্তৃতার মোহজালে অনেককেই আপন পথে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মার্কিন মুলুকে ইঁহার বাক্‌কৃতিত্বের একটা বিজয় ঘোষণা হইয়াছিল। কোনো কোনো রমণী তাঁহারই ভাবে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহারই পথানুসরণ করিয়া, তাঁহাকে পথপ্রদর্শক গুরুরূপে ভাবিয়া, নূতন পথে আসিয়া, এক নূতন ভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই বাহাদুরীর কথা। শুনিতে পাই, নরেন্দ্রনাথের বহুমূত্রের পীড়া ছিল। গত সপ্তাহের শুক্রবার সন্ধ্যার সময় তিনি বেড়াইয়া মঠে ফিরিয়া আসেন, কিয়ৎক্ষণ পর তিনি যেন কেমন একটু অসুস্থ হন। অতঃপর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।'

"মৃতশত্রুর বিষয়েও কি কোনো ভদ্রলোক এমন ভাষায় কোনো কথা লিখিতে পারে? জানি না আজকাল ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এমনইভাবে সকল মনুষ্যত্বের ওলটপালট হইয়া থাকিবে। বঙ্গবাসী যখন বিবেকানন্দের প্রতিকূলাচরণ করেন, তখন আমরাই বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় চাকুরি করিতাম। সে সকল মতামতের জন্য আমরা দায়ী। আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ্য বজায় রাখিবার পক্ষে আমাদের সাধ তীব্রতর হইবার কথা। কিন্তু এখন যে বঙ্গবাসী সৎশূদ্র, এখনও সেই পূর্বেকার অমর্ষ কেন ফুটিয়া বাহির হয়? মরার বাড়া গালি নাই; যে মরিয়াছে সে তো আপদ চুকাইয়া গিয়াছে—মরার উপর খাঁড়ার ঘা মানুষ দেয় কি? ইংরেজ ইংলিশম্যান যে বাঙালীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে পারে, বাঙালী বঙ্গবাসী তাহা শ্লেষের ভাষায় উড়াইয়া দেয়। ধিক্ বঙ্গবাসী।

"বঙ্গবাসীকে এখনও আমরা বড়ই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। বঙ্গবাসীর সুখ্যাতি

শুনিলে এখনও আমাদের লোমহর্ষণ হয়। সেই বঙ্গবাসীর রুচিবিকার দেখিয়া আমরা এতই ব্যথিত হইয়াছি যে, এই দুঃখের সময়ও বাজে কথার উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। পাঠকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।"

স্বামীজীর দেহত্যাগে বঙ্গবাসীর 'শোক-মন্তব্য' এবং তাতে শোকের অভাব ও বিদ্বেষের আধিক্য দেখে পাঁচকড়ির মন্তব্য, আমরা দেখলাম। এখানে বলে নিতে পারি, বঙ্গবাসী উপরের ঐ মন্তব্য করে অন্যায় কিছু করেনি, কারণ সে নিজ স্বভাবরক্ষাই করেছিল—যদি কেউ বদলে গিয়ে থাকেন তিনি পাঁচকড়ি। বঙ্গবাসীর নিস্পৃহ মন্তব্যে কিন্তু স্বামীজীর শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে স্বীকৃতি যথেষ্টই আছে। বঙ্গবাসী যা বলেছিল, তার বেশি কিছু বললে মনে হতে পারত, তার স্বভাববিকার ঘটেছে। কেবল একটি অসভ্যতা ঐ লেখাটিতে ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দকে' শেষ পর্যন্ত 'নরেন্দ্রনাথ' নামে সম্বোধন করা। বঙ্গবাসী পছন্দ করুক বা না করুক, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নাম গ্রহণ করেন, তাকে স্বীকার করতে ভদ্রজন বাধ্য। (যেমন, বঙ্গবাসী-সম্পাদকের বাল্যে যদি বিদ্‌ঘুটে ডাক-নাম থাকত, তাহলেও তাঁর কোনো বাল্যবন্ধু পরবর্তী কালে মুদ্রিত রচনায় সেই নামে তাঁকে পরিচায়িত করতে পারেন না। এক্ষেত্রে মনে হয়, ভদ্ররীতিকে লঙ্ঘন করবার মতো কোনো শাস্ত্রনির্দেশ উক্ত পত্রিকার সম্পাদক পেয়েছিলেন!)

সুতরাং পাঁচকড়ি বদলেছিলেন। বঙ্গবাসীর পাথরের চোখ পরে সত্যই পথ চলা আর সম্ভব ছিল না। রক্ষণশীলদের পক্ষে 'অনুসন্ধান' পত্রিকা স্বামীজীকে একদা কটু ব্যঙ্গ করেছিল। একই কাগজ স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে স্বীকার করল, বিবেকানন্দ সমুদ্রপারে যাওয়ার জন্য সমাজচ্যুত হয়েছেন, একথা লোকে ভুলে গিয়েছে।

১৯০২ সালের পরে এক দশক পাঁচকড়ি প্রচণ্ড ঘটনাবর্তের মধ্যে ছিলেন। বহু সংবাদ-পত্রের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন এইকালে। যখন প্রভুর মতের সঙ্গে নিজের মত মিলেছে তখন সানন্দে নিজেকে খুলে ধরেছেন, যখন মেলেনি, তখন নিজের গ্লানিময় প্রতিভাকে প্রভুর কণ্ঠ-স্বরের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে অম্লরসাক্ত করে তুলেছেন। কিন্তু সব সময়েই ভেবেছেন—এমন একটি পত্রিকা চালাবেন, যার মধ্যে তাঁর গভীর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। মনে করলেন, 'প্রবাহিণী' তাঁকে সেই সুযোগ দেবে। "প্রবাহিণীকে বিদ্বজ্জন-সমাজের চিত্তবিনোদিনী করাই আমাদের অভিলাষ। ধর্মকথা, সমাজ-কথা, কাব্যশাস্ত্রের কথা…কহিবার জন্যই আমরা কৃতসংকল্প হইয়াছি। রাজনীতির পাঁক ঘাঁটিয়া তো এতদিন কাটাইলাম।…আশা আছে 'প্রবাহিণী' এ পঙ্কাশয় হইতে অধমকে উদ্ধার করিতে পারিবে।" [প্রবাহিণী, ১৭ মাঘ, ১৩২০]। এই আদর্শ তিনি সম্পূর্ণ রক্ষা করতে না পারলেও অনেকটাই পেরেছিলেন, এবং পাঁচকড়ি রচনাবলীতে সংকলিত গভীর ভাবাত্মক রচনার বেশি অংশ প্রবাহিণী থেকেই গৃহীত। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতে পাঁচকড়ি রাম-কৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বিষয়ে যা লিখেছিলেন—তাকেই বলতে পারি, তাঁর পরিণত মনের সার সিদ্ধান্ত। আমরা দেখি, এর মধ্যে তিনি ঐ দুই চরিত্রকে সর্বোচ্চসম্ভব শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছেন। ঐ দুই চরিত্র পাঁচকড়ির কাছে—অবতার ও অবতারসঙ্গী।

সে লেখার উল্লেখ পরে করব—তার আগে পাঁচকড়ির মনোভূমে আর একবার দৃষ্টিপাত

করা যাক। রক্ষণশীলতা এক বিচিত্র বস্তু, তার জড় যায় না। জীবনের শেষভাগে পাঁচকড়ি এমন একটি কাজ করেছিলেন, যা তাঁকে সত্যই বিপাকে ফেলেছিল—এবং মৃত্যুর আগে দেশপ্রেমিক বাঙালীর ধিক্কার নিয়ে তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল। কাজটি আর কিছু নয়—সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পরে 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিয়ে তাতে আসামের গোঁড়া পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিন্দামূলক লেখাগুলি প্রকাশ করা। পাঁচকড়ি নিজেই স্বীকার করেছেন, লেখাগুলিতে 'ঝাঁঝ্'-এর বিষ যথেষ্ট—তবু সেগুলি ছেপেছিলেন—কেন? পাঁচকড়ির কৈফিয়ত—তিনি বুদ্ধির মুক্তি চান। দার্শনিক আলোচনা চলুক দেশে, বিচার চলুক, সকলে যুক্তিসহ নিজের মত প্রকাশ করুক। পাঁচকড়ি জানিয়েছিলেন—'সাহিত্য' পত্রিকার প্রাণস্বরূপ স্বর্গত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যদিও বিবেকানন্দের পরম ভক্ত [এবং রামকৃষ্ণের অবতারত্বে আস্থাবান], তিনিও যুক্তিপূর্ণ সমালোচনাত্মক রচনা প্রকাশের বিরোধী ছিলেন না। বুদ্ধের বিরুদ্ধে কি শঙ্করাচার্য লেখেন নি? কিংবা শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে রামানুজ?—পাঁচকড়ি প্রশ্ন করেছিলেন।

বৃহত্তর বাঙালী সমাজের কাছে এই কৈফিয়ত যথেষ্ট মনে হয়নি। তাঁরা পদ্মনাথের রচনা প্রকাশের মধ্যে পাঁচকড়ির কুৎসা-বিক্রীর ফন্দী দেখেছিলেন এবং 'সাহিত্য' পত্রিকা বয়কটের আয়োজন হয়েছিল। এইখানে পাঁচকড়ি হিসাবে কিছু ভুল করেছিলেন। বাংলাদেশের সমাজজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বুঝতে পারেন নি—১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যে-বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় যথেচ্ছ লেখা যায়, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেই কাজ করা যায় না, কারণ বাংলাদেশের সংগ্রামী শক্তি ইতিমধ্যে বিবেকানন্দের প্রাণপ্রেরণায় সংগ্রামে নেমেছে—সে আর তাঁর স্মৃতি নিয়ে বুদ্ধির চালাকি সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

কিন্তু পাঁচকড়ি কেন ঐ লেখা ছেপেছিলেন—তাঁর অনেক কারণের একটি কারণ - পূর্বাগত রক্ষণশীলতা—কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন এবং শশধর তর্কচূড়ামণির প্রতি পূর্বতন আনুগত্য—যা শশধরের ভক্ত পদ্মনাথের রচনা ছাপতে তাঁকে প্রণোদিত করেছিল।

কিন্তু একই সঙ্গে পাঁচকড়ি বিবেকানন্দের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। বিবেকানন্দই তাঁকে বদলে দিয়েছিলেন বহুলাংশে। আমরা যে, এখানে পাঁচকড়ির প্রসঙ্গ বিস্তারিত তুলেছি, তার কারণ আর কিছু নয়—বিবেকানন্দ রক্ষণশীলতার দুর্গে কতখানি ভাঙন ধরিয়েছিলেন, তার রূপ আর একবার দেখিয়ে দেওয়া। বঙ্গবাসী ছেড়ে চলে আসবার সময়ে পাঁচকড়ি পিছনে তাঁর অনেক অভ্যস্ত মতও ফেলে এসেছিলেন। যেমন, বঙ্গবাসীর কুক্ষিগত পাঁচকড়ির কাছে সমুদ্রযাত্রা করার জন্য বিবেকানন্দ পাতকগ্রস্ত—বঙ্গবাসী ছাড়ার পরে সেই সমুদ্রযাত্রার পক্ষেই পাঁচকড়ির লেখনী সোচ্চার। বাংলাদেশের ব্রহ্মণ্যসমাজ আর্যামিতে 'ঊর্ধ্বশিখ'—পাঁচকড়ি তার একদা সমর্থক—তিনিই পরবর্তী কালে বাংলার সমাজ প্রসঙ্গে পরিষ্কার লিখেছেন (বিবেকানন্দের মতবর্তী হয়ে) বাংলার ব্রাহ্মণের রক্ত শুদ্ধ নয়—মিশ্র। ব্রাহ্মণ পাঁচকড়ি লিখে জানিয়েছেন, বাংলার সমাজধর্মের ক্ষেত্রে ব্রহ্মণ্যসংস্কৃতির মুখ্যত্ব নেই, ব্রহ্মণ্যসংস্কারকে বহু চেষ্টাতেও (বহু অপচেষ্টাতেও, পাঁচকড়ি বলেছেন,) বাংলার গভীরে প্রবেশ করানো যায়নি; এখানে 'ব্রাহ্মণের চাষ' (কিংবা 'আর্যামির চাষ') করতে হয়েছে,

কিন্তু যথেষ্ট ফসল ফলেনি। তন্ত্রের মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে তিনি এও লিখেছিলেন, "চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত বাংলার ছত্রিশ জাতিকে একসূত্রে সমভাবে বন্ধন করিতে তন্ত্র যতটা সহায়তা করিয়াছিল, এত আর কোনো ধর্মই করে নাই।"

পরিবর্তিত পাঁচকড়ি এই নবভাবনার প্রেক্ষা-পটে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে দেখতে চেয়ে-ছিলেন। গোঁড়া পদ্মনাথ যেখানে কোনো বিশেষ সময়ের স্মৃতিশাস্ত্রের চকমকি ঠুকে ফিন্‌কি আলোয় এক বিরাট ব্যক্তির আচরণের ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিচার-চেষ্টায় স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করেছেন, সেখানে পাঁচকড়ি নতুন চোখে দেখলেন—সমুদ্রলঙ্ঘনকারী, খাদ্যাখাদ্যবিচারে উদাসীন, ভারতীয় ও ইউরোপীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ, 'কায়েত সাধু' বিবেকানন্দের মধ্যে অভিনব শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে, যা ব্যষ্টিকে গ্রাস করে সমষ্টির জাগরণ ঘটাচ্ছে। পাঁচকড়ি লিখলেন, "ভবদেব এবং রঘুনন্দনের মাপকাঠিতে ইঁহাদের ধর্মকর্মকে মাপিতে চেষ্টা করিলে কুলাইবে না। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সমাজের শাসন রঘুনন্দন করিতে পারেন নাই ; সেজন্য হরিভক্তি-বিলাসের রচনা প্রয়োজন হইয়াছিল। তেমনি রামকৃষ্ণের শিষ্যশাখার কর্মের পরিমাণ রঘুনন্দনী গজে হইবে না।" (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩২৮)।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের উল্লেখ করে পাঁচকড়ি লিখলেন, "স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ যে কয়জন পুরাতন ব্যক্তি এখনো বেলুড়ে আছেন, তাঁহারা জানেন, স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের কতটা প্রিয়জন ছিলেন। সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা যে আমাদের হয় নাই তাহা নহে। অক্ষয়চন্দ্রের সামাজিক আলোচনা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আমরা বসুমতীতে চালাইয়াছিলাম। স্বামীজীও সে সময় আমাদের কার্যে যোগ দিয়াছিলেন।"

এরপরে পাঁচকড়ি তাঁর 'পুরাতন নোটবহি হইতে' স্বামীজীর সঙ্গে কথোপকথনের যে অংশ তুলেছিলেন, তার মধ্যে স্বামীজীর সমাজ ও বিশ্বভাবনার গভীর বিশাল রূপের আভাস পাওয়া যায় :

"গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৃহে বসিয়া আলোচনা হয়। স্বামী জিজ্ঞাসিলেন—পাঁচু, এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে? উত্তরে আমরা বলিলাম—ভগবান্।

"স্বামী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—দূর্! খাঁটি বামুনের মতো উত্তর দিলি! তোদের বামুনের দোষই এই—তোরা কিছুতেই বাম্‌নাই ভুলিতে পারিস্‌নে। ওরে হনুমান, ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্কার ছাড়িবি কেমন করিয়া? আইকনক্ল্যাজম্-এর ঠেলায় যে ভগবানের বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে। ভগবানটা মৌখিক আলাপের বিষয় হয়েছে।

"পাঁচু—তবে তোমরা ধর্মপ্রচারক হয়েছ কিসের জন্য? গেরুয়া পরা কেন? ধর্মে কর্মে চিন্তায় ব্যসনে সজীব ভগবানটাকে যদি আম-দানী করিয়া বসাইতে না পারো, তবে আর করিলে কি? বাংলায় বা ভারতবর্ষে ভগবান ছাড়া কাজ হয়?

"স্বামী— কথাটা খুলিয়া বলিব। এ জল-তরঙ্গ রোধিবে কে — জানিস?— আমি! —'আমি' বিবেকানন্দ কেবল নহি। এই আমরা যে ছয়-সাতজন এখানে বসে আছি, আমাদের পরমাত্মা আমিটা জাগিয়া উঠিলে তবে তরঙ্গ রুদ্ধ হইবে। আমি জাগিয়া উঠিব, আমি কর্মময় হইব। কর্ম করিতে করিতে যখন আমাদের হৃদ্গত সকল আমি অন্তরে বুঝিতে পারিবে যে, আমি ছাড়া আর একটা বড় আমি আছে—সে বড় আমির

শক্তি অসীম—সে অসীম শক্তির আনুগত্য না করিতে পারিলে কোন কর্ম ঠিকমতো করা চলে না—তখনই শ্রীভগবান আসিয়া প্রকট হইবেন। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে চাই আমিটাকে প্রকট করিতে। বেদান্ত ছাড়া এ কর্ম সিদ্ধ হইবে না। যাহাকে হেয় বলিয়া আমরা বামুন-কায়েত এত-দিন দূরে রাখিয়াছি, তাহাদিগকে কোলে তুলিতে হইলে চাই বেদান্ত। আর সবটাকে আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারিলে—প্রত্যেক আমি জাতীয় বিশাল আমিতে পরিণত হইতে না পারিলে—কোনো কাজই হইবে না। তোমার তন্ত্রের বা বৈষ্ণবধর্মের যুক্তি-তর্ক এই ইউরোপীয় সভ্যতা-বিদগ্ধ সমাজে চলিবে না। চাই বেদান্ত —উহার সনাতন সত্যবাণীর প্রচার। কি বলিস্?

"পাঁচু—তা বটে। বেদান্তটাকে, বৌদ্ধ ফিলজফির উপর উপনিষদের মহাবাক্যের সমন্বয় মনে করি। রামানুজ, শঙ্করের মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বা শূন্যবাদ বলিয়াছেন। তা, বেদান্তের সহিত বৌদ্ধ সেবাধর্মটা জড়াইয়া দিলে সকল শঙ্কা দূর হয়। ইংরাজি লেখাপড়া জানা বুদ্ধিতে এ বেদান্ত লাগছে ভালো। পরন্তু 'আমি' জাগিবে কি? দেবীসূক্তের 'আমি' ফুটাইতে পারিবে কি? তা যদি পারো, শিবমস্তেহহং।"   [ঐ, শ্রাবণ ১৩২৮]

পূর্বে উল্লিখিত 'প্রবাহিনী'র (২২ ফাল্গুন, ১৩২০) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক রচনার ('ভগবান্ রামকৃষ্ণ') প্রসঙ্গে আসতে পারি। রামকৃষ্ণ যে ঈশ্বরের অবতার, তা দেখাবার জন্য পাঁচকড়ি গোড়াতেই গীতার সুবিখ্যাত 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ' শ্লোক উদ্ধৃত করেন। ধর্মের গ্লানি কাকে বলে, অধর্মের অভ্যুত্থানই বা কী, তা ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, যুগের পরিবর্তন হয়েছে, সুতরাং পূর্বের ধর্মগ্লানি, বা অভ্যুত্থিত অধর্মের চরিত্রের সঙ্গে এখনকার অনুরূপ বিষয়ের আকারপার্থক্য থাকবেই। এখনকার অর্থে বিকৃতিই 'গ্লানি'। বিকৃতি সামঞ্জস্য নষ্ট করে। 'অধর্মের অভ্যুত্থানের' অর্থ তাই দুষ্ট আদর্শের প্রাবল্য। ইংরাজ আমলের সূচনায় এদেশের ধর্মে ও সংস্কৃতিতে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছিল এবং প্রবল হয়েছিল দুষ্ট আদর্শ—তখনই আবির্ভাব হয়েছিল রামকৃষ্ণের।

"কৃপার সাগর, সমাজের দুষ্ট আদর্শকে চূর্ণ করিবার জন্য—দরিদ্রের মান বাড়াইবার জন্য—দারিদ্র্যকে স্বর্ণ-সিংহাসন দিবার জন্য, সেবা-ব্রতকে সকল ব্রতের সার করিবার জন্য কাঙাল ফকিরের মধ্যে নারায়ণের অস্তিত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য— ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কর্মের পথ দেখাইবার জন্য— **রামকৃষ্ণ** — কৃপার অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্তমান যুগের ধর্মের গ্লানির সংহরণ ক্ষাত্রবীর্যে সম্ভবপর নহে। তাই তিনি দীনহীন পূজক ব্রাহ্মণের বেশে বাংলার নিত্য শ্যামায়মান পল্লীবাসের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ার তলে, করুণা ও দয়ার, সংযম ও সন্ন্যাসের, বিনয় ও বৈরাগ্যের, ঔদার্য ও তিতিক্ষার ঠাকুররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি সামঞ্জস্যের পূর্ণাবতার। সকল ধর্মের, সকল মতের, সকল বিশ্বাসের, সকল আচারের, সকল সাধনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিনি বাংলায় শান্তিরাজ্য স্থাপনের বনিয়াদ গড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহাতে তন্ত্রের ঔদার্য ও বিশ্বপ্রেম ছিল, বৈষ্ণবের মাধুর্য এবং অপরাজেয় দৈন্য ছিল। তিনি তাঁহার বিশাল যুগল বাহুর দ্বারা বিশ্বমানবতার বিরাট পুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের ঈশ্বরপদে বরণ করিতে পারিয়াছিলেন। তন্ত্রের মহামন্ত্র—নারীমাত্রেই জগজ্জননীর অংশরূপিণী— এই মন্ত্রে একা

তিনিই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীকে মা বলিতে শিখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার ঘৃণা ছিল না, উপেক্ষা ছিল না, অবহেলা ছিল না—পাপী, তাপী, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ম্লেচ্ছ, যবন—সকলকেই, সকল মানুষকেই তিনি কোল দিয়াছিলেন।"

রামকৃষ্ণ তাহলে শেষপর্যন্ত পাঁচকড়ির কাছেও অবতার! ব্রহ্মবান্ধবের কাছে কিভাবে রামকৃষ্ণ অবতার বা ততোধিক হয়ে উঠেছিলেন—সে অপূর্ব কাহিনী "বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে নিবেদন করেছি। রামকৃষ্ণের অবতারত্বের একটি প্রমাণ, পাঁচকড়ির কাছে, "ইংরেজি-শিক্ষিত নবযুবকদিগের মধ্য হইতে ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণের" সৃষ্টি করা। নরেন্দ্রনাথ কী ছিলেন, পাঁচকড়ি সাক্ষাতে জানতেন। ১৮৯৭-এর বঙ্গবাসীর পৃষ্ঠায় বিদ্রোহী যুবক নরেন্দ্রনাথের বর্ণনাও তিনি করেছেন। সেই নরেন্দ্রনাথ কিভাবে বিবেকানন্দে রূপান্তরিত হলেন !! "আমরা নরেন্দ্রনাথকে জানি, চিনি। সেই নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে পরিণতিও জানি ও বুঝি। তাই ভগবান্ রামকৃষ্ণের মহিমায় মুগ্ধ।" সেই পরিণতির একটা ছবি, পাঁচকড়ির চোখে এই :

"একবার বিবেকানন্দের সম্মুখেই তাহার একটা বক্তৃতার সুখ্যাতি করিতেছিলাম। সে আমাদের মুখে হাত চাপিয়া মুখ বন্ধ করিয়াছিল, এবং সেইসঙ্গে বলিয়াছিল—'তোরা যদি অমন কথা বলবি তো আমি দাঁড়াই কোথা? কার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সখ্যের সাধ মিটাইব?' উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—'দেখ দাদা, শলুই চিনিতে পারলে জাত-সাপের পরিচয় অনেকটা জানতে পারা যায়। আমি তোমায় দেখে ঠাকুরের মহত্ত্ব অনেকটা চেনবার চেষ্টা করছি। তাঁকে তো দুইবারের অধিক দেখি নাই। তোমার মতো সামগ্রী যাঁহার কৃপায় তৈয়ার হইতে পারে—তিনি যে কৃপার সাগর—সর্বনিধির আধার।' বিবেকানন্দ আমার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শেষে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বীণানিন্দিত কণ্ঠে—

'আমি সেই ভয়ে মুদি না আঁখি
পাছে তারা-হারা হয়ে থাকি'

—এই গানটি বাষ্পগদ্‌গদ কণ্ঠে অপূর্ব ভাব মিশাইয়া গাহিলেন।"

যুগাবতারের মুখ্য সহায়ক-সঙ্গীরূপে বিবেকানন্দের ভূমিকার কথা পাঁচকড়ি লিখেছেন :

"[বিবেকানন্দের] ইংরেজি বিদ্যার বহর জানিতাম। পরে আমেরিকা ও ইউরোপে যাইয়া সে যে-বিদ্যার ও যে-তেজের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারও অপূর্ব লীলা দেখিয়াছিলাম। ভগবান্ রামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পলিমাটি ছড়াইয়া বাংলার যে-উর্বরতা সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মানবতার বীজ না দিলে ফসল ভালো হইবে কেন? তাই বিবেকানন্দের উপর এই রোয়া-বোয়ার ভার পড়িয়াছিল। এ কাজের জন্য যেটুকু তেজ, যেটুকু সাহস, পাকা কৃষির ভূয়োদর্শনজাত যেটুকু স্পর্ধার প্রয়োজন, সে সকলই বিবেকানন্দে পূর্ণমাত্রায় ছিল। বিবেকানন্দে ইউরোপের তেজস্বিতা, মানবতা এবং ভারতের ভক্তি, বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, সংযম ও সাধনা পুরামাত্রায় ছিল।...ধর্ম ও সাধনার উপর জাতীয়তার পালিশ চড়াইয়া, সেবাব্রতকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া বিবেকানন্দ, সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায়, ভোগবতীর জল টানিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত সমাজের উপরের স্তরগুলিকে স্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গরীব-দুঃখী, মূর্খ-পণ্ডিত

—সবাই এখন একসূত্রে বাঁধা হইয়াছে, সবাই এক আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছেন। যে মন্ত্রের প্রভাবে বিলাসীবাবু সন্ন্যাসী হইতে পারে, রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অহর্নিশ সেবা করিতে পারে, প্লেগে ভয় পায় না, বসন্তরোগী দেখিলে সংকুচিত হয় না, উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরসঙ্গমে ঝম্পপ্রদান করিতে ইতস্তত: করে না—সে মন্ত্রই বা কেমন, সে মন্ত্রীই বা কেমন—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি!"

'নায়ক' বিবেকানন্দের চেয়ে 'মানুষ' বিবেকানন্দ পাঁচকড়িকে কম মুগ্ধ করেননি। এইকালে তিনি—যৌবন-উত্তীর্ণ পাঁচকড়ি—শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ যৌবনের স্বপ্নচ্ছবি উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন 'শুকদেব' রচনায় (প্রবাহিণী, ১৮ মাঘ, ১৩২১)। এর মধ্যে তিনি ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন, শুকদেবের মতো আশ্চর্য পৌরাণিক চরিত্রের একমাত্র আধুনিক তুলনা বিবেকানন্দ। "যাঁহারা পুরাণ পাঠ করেন, তাঁহারা পদে-পদে উদাহরণ পাইলে ভাবটাকে ষোল আনা ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন। ... পুত্র শুকদেবের জন্ত ব্যাসের মহিমা কোটিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। যেমন, ভগবান্ রামকৃষ্ণের ঐশ্বর্য স্বামী বিবেকানন্দে প্রকট, তেমনি দ্বৈপায়ন ব্যাসের মাহাত্ম্য ও দেবত্ব শুকদেবে পূর্ণতালাভ করিয়াছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ যে নরেন্দ্রনাথকে 'আমার শুকদেব' বলতেন পাঁচকড়ি অবশ্যই তা জানতেন।

পাঁচকড়ির ভাবনায়, শুকদেব পুরাণের অতুলনীয় চরিত্র। এমন চরিত্র আর আঁকা হয়নি। ঐ অপূর্বত্বের কারণ—শুকদেবে অম্লান যৌবন এবং পূর্ণজ্ঞানের সম্মিলন। পাঁচকড়ি ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, যৌবনে থাকে অন্ধ আকাঙ্ক্ষা, তাই পদে-পদে ভ্রান্তি। ঠেকে-ঠেকে যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন যুবক আর যুবক নেই, প্রৌঢ়। তখন অপচিত যৌবনের জন্ত তার বৃথা দীর্ঘশ্বাস। পুরাণ তাই এমন একটি চরিত্রের কল্পনা করতে চেয়েছে যেখানে যৌবন ও জ্ঞান সমন্বিত থাকবে। শুকদেব সেই চরিত্র। "শুকদেব জ্ঞানী যুবক, স্বয়ংসিদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, অথচ তিনি সদাই নবযৌবনের আগ্রহ-সমন্বিত। সর্বসিদ্ধির সহিত যৌবনের উল্লাস প্রায়ই দেখা যায় না।... বাস্তবিক প্রৌঢ়ের বিচারশীলতা এবং যৌবনের শক্তিসামর্থ্য সম্মিলিত হইলে একটা অপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়া যায়।... তাঁহার অক্ষয় যৌবন, অক্ষয় সৌন্দর্য, দেহ সদা রসে ঢল-ঢল করিতেছে, অন্ধ যৌবনশক্তি তাঁহার সর্বাঙ্গে সুষমা ঢালিয়া দিয়াছে। অথচ তিনি মহা জ্ঞানী-পুরুষ।... সৌন্দর্য-উপভোগের সামর্থ্য তাঁহাতে অপর্যাপ্ত আছে, বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যের অনুভূতি তিনি পলে-পলে করিতেছেন, তথাপি তিনি সংযমী। ... পুরাণভরা বৃদ্ধ ঋষিমুনির দলের মধ্যে একা শুকদেবই যুবক। শুকদেব অনুশীলনের প্রতিমূর্তি, শিক্ষা বা 'কালচার'-এর সাকার দেবতা। শুকদেব আদর্শ মনুষ্য—মানবতার প্রতিমা।"

কল্পনার সঙ্গে বাস্তব অক্ষরে-অক্ষরে মেলে না। কিন্তু বাস্তবের ছায়া না থাকলে কল্পনা মনোবিকার। বিবেকানন্দের চিরযৌবনছবি যে অম্লান অক্ষরে পাঁচকড়ির মনে আঁকা ছিল, তা বঙ্গালয় পত্রিকায় তাঁর লেখা বিবেকানন্দের সম্বন্ধে শোকমন্তব্যে আমরা পূর্বেই দেখেছি।

প্রবাহিণীর পূর্বোক্ত 'ভগবান্ রামকৃষ্ণ' প্রবন্ধ থেকে বিবেকানন্দের আর একটি চিত্র উদ্ধার করব। বিবেকানন্দের সব হারানো, সব ভাসানো মহাভাবের রূপ এঁকেছেন পাঁচকড়ি, ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে:

"তেমন সরল হাস্তময় মিত্র, তেমন তেজস্বী

সত্যসন্ধ সহচর আর কখনও দেখি নাই। তাহাকে ফাঁকি দিবার জো-টি ছিল না, মনের কথাটি টানিয়া বাহির করিত। তাহার কথনো অভিমান ছিল না। আমি একজন পণ্ডিত, আমি একজন বড় বক্তা—মিত্র-সংসর্গে এ-ভাবটা তাহার কখনই ফুটিয়া উঠিত না। বিবেকানন্দ একজন বড় দরের ভক্ত ছিলেন। গোপনে ভক্তি-তত্ত্বের আলোচনা করিতে-করিতে অনেক সময় তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু তিনি সে ভাব চাপিয়া রাখিতেন। একবার নারদ-ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন—'না ভাই, আমায় মজাইও না। আমি তাল সামলাইতে পারিব না। আমার যে-কাজ, সে-কাজ এখনো তো শেষ হয় নাই। আমার ও-দিকটা ফুটাইও না—আমি পাগল হইব।' গান গায়িতে গায়িতে বিবেকানন্দ এক-একসময় সত্যই মূৰ্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদিন আমার কন্যাকে লইয়া 'তেমনি তেমনি করে নাচো দেখি শ্যামা'—এই গানটি গায়িতে-গায়িতে, চারি বৎসরের কন্যাটিকে নাচাইতে-নাচাইতে বিবেকানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। আর মেয়েটিও তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্থির ধীর নিস্পন্দবৎ তাঁহার বুকের উপর শুইয়াছিল কিন্তু বিবেকানন্দ এ-ভাব প্রায়ই চাপিতেন তিনি প্রায়ই বলিতেন—"দ্যাখ, এই ভাবের বাড়াবাড়ি হওয়াতেই আমরা কলা খেয়ে বসেছি। পৃথিবীতে এমন মদ নেই যাহাকে ভক্তিরসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সকল মদের সেরা ভক্তি-মদ। সেই মদ খেয়ে বাঙালী চারশো বছর মাতাল হয়েছিল। আর ও মদ চালানো ঠিক নয়।' তাই বিবেকানন্দ কর্ম-জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া বক্তৃতা করিতেন।"

প্রসঙ্গ এখনো শেষ হয়নি। বাকি আছে পাঁচকড়ির শেষ নমস্কারের কথা। সাহিত্য পত্রিকাতেই "স্বামী বিবেকানন্দ", এই নামে পাঁচকড়ির একটি লেখা বেরিয়েছিল ফাল্গুন, ১৩২৯ সংখ্যায়। এই সংখ্যার পরে সাহিত্য পত্রিকার আর মাত্র দুটি সংখ্যা বেরিয়েছিল, তার পরেই বন্ধ হয়ে যায়। এবং পাঁচকড়িও কয়েক মাস পরে মারা যান।

ঐ প্রবন্ধের সূচনায় বলা হয়—বিবেকানন্দের মতো 'স্বরাট পুরুষ' পৃথিবীর বহু দুঃখ ও যন্ত্রণার কান্না ছাড়া আবির্ভূত হন না। তারপর পাঁচকড়ি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকৃত জাগরণের সঙ্গে পূর্ববর্তী জাগরণের তুলনা করে বলেন—পূর্বের জাগরণ প্রকৃত জাগরণ নয়—জাগরণচেষ্টা মাত্র :

"রাজা রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের কাল পর্যন্ত এই জাগরণের চেষ্টা—সে কেবল স্বপ্নেরই চেষ্টা। প্রকৃত-জাগা মানুষে [দেশকে] জাগায় নাই—মশা ছারপোকার কামড়ে নিদ্রিত একজন অপরের অঙ্গে চাপড় মারিয়াছেন, তাহার জন্য কদাচিৎ একটু পার্শ্বপরিবর্তন ঘটিয়াছে, একটু-বা নিদ্রিতের প্রলাপ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।"

পাঁচকড়ি রামপ্রসাদের গান উদ্ধৃত করে বললেন, 'যে-দেশে রজনী নাই' সেই দেশের মানুষ যদি কেউ আসেন তবেই যথার্থ জাগরণ ঘটতে পারে। রামকৃষ্ণ সেই অতন্দ্রলোকের অধিবাসী—বাঙালীকে জাগাবার জন্য তিনি আনলেন বাঙালীর 'সাধের, সোহাগের, সাধনার' ধন বিবেকানন্দকে। 'শুক্লতোয়া ভাগীরথীর মাটি' তুলে বিবেকানন্দ-শিবকে রামকৃষ্ণ গড়লেন। সেই শিব বাঙালীর 'শ্রুতি-মূলে সিদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ' করলেন। "তাঁহার স্মৃতির ত্রিশূল ধরিয়া আজ ভারতবর্ষের যেখানে রোগ,

যেখানে শোক, যেখানে বেদনা, যেখানে ভাবনা, সেইখানে বাঙালী ছুটিতেছে ··· ইংরেজিনবিশ বাঙালী, বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়, ব্রহ্মচারী-সেবকদল বনে দুর্গমে যাইতেছে।”

সেই 'স্মৃতির ত্রিশূল' বহন করে দিকে-দিগন্তরে ছুটবার ভাগ্য পাঁচকড়ির হয়নি। কিন্তু স্মৃতি অনির্বাণ—শিখায়িত ব্যাকুল ভাষায় সেই স্মৃতির পুরশ্চরণ করলেন পাঁচকড়ি জীবনপ্রান্তে বসে। আনন্দে বিষাদে মাখা সেই রচনা —তারই কিছু অংশ উদ্ধৃত করে প্রসঙ্গ শেষ করব :

“ঐ গঙ্গার পশ্চিমতটে, বেলুড়ের মঠের দিকে একবার তাকাও। ··· যে-দুন্দুভিনাদে তোমার নিদ্রাঘোর ভাঙিয়াছিল, সেই দুন্দুভি ওখানে লুকানো আছে; যে-অনাবিল রূপের বিকাশে তোমার মোহান্ধতা দূর হইয়াছিল, সে মাধুরীর প্রতিচ্ছায়া ওখানে ঝুলানো আছে; যাঁহারা তাঁহার সঙ্গগুণে ধন্য তাঁহারা ওখানে সজীবদেহে বিচরণ করিতেছেন; ঐখানে তাঁহার দেহের ভস্মরাশি, স্মৃতির প্রচ্ছন্ন পুষ্পরাশি, বাগ্‌বিভূতির প্রতিধ্বনির সৌরভরাশি।··· দেখ-দেখ! পতিত-পাবনী সুরতরঙ্গিণী কুলকুল রবে উহার পদধৌত করিয়া অনন্ত সাগরকে সে সমাচার দিতে তরল-তরঙ্গে কেমন ছুটিয়াছেন।”

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাঁচকড়ি লিখলেন :

“বড় ভাগ্য আমাদের যে, এই বিলাসব্যসন-বিকৃত দেহে সে কুমারকান্তের মুখে কান্ত-পদাবলী শুনিয়াছিলাম। তখন তাহাকে বুঝি নাই বটে, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াছিলাম, স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গ করিয়াছিলাম, তাহার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াছিলাম, সমুদ্রোপম সে অগাধ হৃদয়ে ডুবিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ডুব দিয়া তল স্পর্শ করিতে পারি নাই, তলার মণিমাণিক্য আহরণ করিতে পারি নাই, পরন্তু সে স্নেহের শীতল সলিলস্পর্শে প্রাণমন শীতল হইয়াছিল, অনেক জ্বালা জুড়াইয়াছিলাম। সে মানুষ এখন ··· অতীতের চক্রবালক্রোড়ে সন্ধ্যার সপ্তরাগে রঞ্জিত হইয়া দিব্যপুরুষের ন্যায় শোভা পাইতেছে।”

সেই দিব্যপুরুষের উদ্দেশে পাঁচকড়ির শেষ বন্দনাস্তোত্র :

“একবার তাহাকে দেখিয়া লও! হিমালয়ের সানুদেশে বসিলে হিমালয়ের উদার মহিমা বুঝা যায় না। ··· কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ রূপ দেখিতে হইলে দার্জিলিঙের চূড়ায় উঠিয়া দেখিতে হয়। এই হিমবান অতিমানুষের পরিমাণ ও মহিমা বুঝিতে হইলে বেলুড়ে যাইয়া, ভাবের উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়া, একবার তাহাকে দেখিয়া লও।···যে ধর্ম শিখাইয়াছে, শ্রদ্ধা শিখাইয়াছে, কর্ম শিখাইয়াছে, ত্যাগ শিখাইয়াছে, বাঙালীকে আবার মানুষ গড়িবার পথ দেখাইয়াছে—সেই নিজের মানুষকে মমতার বাষ্পাকুল নয়নে, ভক্তির নির্নিমেষদৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লও! এই সন্ধিক্ষণে, এই জগদ্ব্যাপী বিরাট পরিবর্তনের মহা মুহূর্তে, একবার 'যে-দেশে রজনী নাই' সেই সেই দেশের মানুষকে দেখিয়া লও।”

বরণমালা

শ্রীদিলীপকুমার রায়*

কত দিকেই চেয়েছিলাম হ'তে উধাও—ভাবি যেই,
পাই দেখতে চোখের জলে—আছি তোমার চরণেই।
তাই ভয় আর নেই আজ আমার, নেই এখানেও গর্ব আর,
আছে কেবল তোমার রক্ষাকবচেরি অঙ্গীকার।

দিনে দিনে কত কিছুই চাই আমরা ভুল ক'রে,
পড়ি না যে তবুও—তুমি থাকো ব'লে হাত ধ'রে।
নিষ্কাম হওয়া নয় যে সহজ—দেখিয়ে দিতেই দাও আঘাত,
সব কামনার উর্ধ্বে টেনে নিতেই করো নিরাশ, নাথ!

সন্ধ্যাকাশের ঘনায় ছায়া, অস্তপারের পাই হাওয়া,
চাই শুধু আজ—খেয়া আমার নিত্য যেন হয় বাওয়া
কান্ত, তোমার শান্ত উদার তটের পানে, যেন আর
অবান্তরকে ঠাঁই না দিয়ে চাই রাঙা চরণ তোমার।

এ-বিশ্ব নয় মায়ার খেলা—জানি আমি অন্তরে,
বাদলেরই অশ্রু সে নয়, আজো যে দিগন্তরে
রাঙে তোমার অচিনচেনা হাসির অরুণ রোজ প্রাতে,
নামো তুমি ধুলার ধরায় নিয়ে তোমার দান হাতে—

প্রীতি-অমল রূপের কমল চিরশ্যামল করুণায়ঃ
তোমার বেদী পৃথিবীকে প্রাণ কি বিদায় দিতে চায়?
না না, তুমি চাও যদি নাথ, জন্ম জন্ম এখানে
বিরহেও গাইব তোমার গান তোমারি সন্ধানে,

তোমার বরণমালা গেঁথেই করব তোমার বন্দনা,
সান্ত্বনা-ফুল ফুটবে কাঁটায়, গান হবে সুর-অর্চনা।
আমার কোনো জাদুমন্ত্রে ঘটবে না এ-অঘটন,
শুধু তোমার কৃপায় হবে জ্বালামুখীও বৃন্দাবন।

---

* সুপ্রসিদ্ধ গায়ক, কবি, সাহিত্যিক, গ্রন্থকার। পুনা হরিকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

ক্লান্ত এ-মন, তাই কি সাজাই অঘটনের দরবারে
প্রার্থনার এ-অর্ঘ্য আত্মসমর্পণের সম্ভারে ?
না নয় নয়, যে শুনেছে বাঁশি তোমার ক্রন্দনে,
বিষাদ কি তার বিষাদ থাকে, কাঁদে সে কি বন্ধনে ?

শৃঙ্খলও হয় নূপুর যে তার, শোকতাপও তার আনন্দে
যুগ যুগ যুগান্তর আনে, সীমায় সে ছোঁয় অনন্তে।
তাই যদি না বন্ধু, হবে কেমন ক'রে বলো না
অন্তর আমার গায় ব্যথায়ও : "নয় এ-জীবন ছলনা ?"

আহ্বান

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী*

মৃদু হেসে চুপি চুপি কানেকানে ডাকে মহাকাল
চারিদিকে জমায়েছ কত না জঞ্জাল !
আয়ুর সীমান্তে এসে দাঁড়াল জীবন—
দিগন্তে দিনের রশ্মি যেতেছে মিলায়ে,
পাখীদল ফিরিছে কুলায়ে।
হের তাহাদের পক্ষপুটে জমা নাই কিছু—
ফিরে চাহিছে না পিছু।
সমুখে পিছনে নাই তার পুঁথি-কোষাগার—
তুচ্ছ হাসি অশ্রুর ভাণ্ডার !
চারিদিকে মহাশূন্য। নামে অন্ধকার।
উথলে তাহার মাঝে কাল-পারাবার।
কেহ নাহি দাঁড়াইয়া হোথা
বলিতে শুনিতে কোন কথা।
অপার রহস্যময় রূপহীন রূপময় কাহার আহ্বান—
চমকিছে চারিভিতে, সমুখে পিছনে তার বৃদ্ধ কাল ধাবমান।

লজ্জাতুর মূঢ় প্রাণ স্তব্ধ চেয়ে রয়—
কোথায় ফেলিবে তার আতুর সঞ্চয়।

* সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকা। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল বাংলা সাহিত্যের সেবিকা। ১২টি গ্রন্থের লেখিকা। 'সোনা রূপা নয়'-গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিতা।

তুমি আর আমি

বনফুল

১

তোমাকে মাপার মাপ-কাঠি যার নাই
তবুও তোমারে কেন যে মাপিতে যাই!
অঙ্ক কষিয়া যাবে না তোমারে পাওয়া
তবু কেন বৃথা অঙ্ক কষিতে যাওয়া!
অপরিমিতকে পরিমাণে ধরিবার
কেন এ অহঙ্কার?

২

মনের মাঝারে তবু কে বসিয়া কহে
তোমার চেষ্টা অনর্থক তো নহে,
তব আগ্রহ সত্যকে জানিবার
ব্যর্থ হয় তো হইতেছে বারবার,
তবু দমিও না। রহুক তীক্ষ্ণধার
তোমার অহঙ্কার।
তিনিই অহং, তোমার মাঝারে তিনি
অনেক রূপেতে আপনারে লন চিনি
এই তো লীলা তাঁহার।
তাঁহারই অহঙ্কার
নব নব রূপে নিজেরে করিছে
নিত্য আবিষ্কার।

৩

বসিয়া মনের কোণে
তুমিই কি মোরে এই কথাগুলি
কহিলে সঙ্গোপনে?
তুমি কি কহিলে—দেখ্
তুই আর আমি এক?

অমৃত আশ্বাস

ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত*

আগুনে বরফে কী জানি কিসে যে
হবে পৃথিবীর ধ্বংস ?
কতদিন বাদে ? পূর্বপুরুষ
করেছেন বহু পুণ্য,
আজও তাই বেঁচে রয়েছি আমরা—
মানুষের শেষ বংশ
ভয়ে থরোথরো : এই বুঝি এলো
মহাশূন্যের শূন্য !

পারমাণবিক শরশয্যায়
শুয়ে ভাবি মনে মনে
বরফ-যুগেই পৃথিবীর শেষ—
সায়ুধ শীতল যুদ্ধ ;
ধর্মচক্র স্তব্ধগতি কি
তবে ঋষিপত্তনে ?

প্রতিভাত বোধিপদ্মে সহসা
অভয়মুদ্রা বুদ্ধ ॥

রামকৃষ্ণায়

শ্রীমতী বিভা সরকার

'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'—
অহোরাত্র এই চেষ্টা প্রভু !
আমার আমিত্ব জাগি গ্রাস করে মোরে
চেষ্টা যে বিফল হয় তবু—
হার আমি মানিব না আমি যে মানুষ
সকলি সম্ভবে জানি প্রভু মোর দ্বারা
জন্মজন্মান্তরে হবে সফল সাধনা
অনিরুদ্ধ চিরন্তন শাশ্বত এ ধারা ।

তটের তপস্যা নয় গভীরে আরতি
চেষ্টা তাই বারবার ব্যর্থ হয়ে যায়
মন মোর পিপাসার্ত অমৃতের লাগি
তোমায় স্মরণ করি অসীমে তাকায় ।

ধরা দাও—দিব্যরূপ আভাসে প্রকাশি
প্রতীক্ষা যন্ত্রণা শুধু, ধৈর্যহারা প্রাণ
অধরা ধরিতে আশা, তাই কি এ দ্বন্দ্ব !
সকল সংশয় ভাঙি' কর সুধাদান ।

হে অমর্ত ! মৃত্যুলোকে মৃত্যুঞ্জয় তুমি
তোমার ও পথে প্রভু টানি লও মোরে
চরণ-স্মরণে থাক এ বিক্ষুব্ধ মন
অমৃত-পরশ দাও এ দীন অন্তরে ।

---

* অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আধুনিক বাংলা কবিতার বিশিষ্ট লেখক। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ : 'সোনাটা' ও 'একটি দিনের জন্মদিনে'। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'স্মৃতি যখন সমুদ্র' (যন্ত্রস্থ)।

ইঁহার প্রধান গ্রন্থ A Tribal History of Ancient India : A Numismatic Approach প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও মুদ্রাতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সর্বজনস্বীকৃত। অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থ : Indian Historiography and Rajendralal Mitra এবং 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি'। Comprehensive History of India, Dictionary of National Biography প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ইঁহার রচনায় সমৃদ্ধ। একাধিক বিশিষ্ট গ্রন্থের সম্পাদনা তথা বঙ্গানুবাদ ইঁহার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

দুইটি নদীর গান

'বৈভব'

অলকানন্দা

অলকানন্দা পরমানন্দে
চলে চলচঞ্চল নৃত্যের ছন্দে
ভ্রুকুটিভঙ্গে তরঙ্গরঙ্গে
মিলি কত তটিনীসঙ্গিনী-সঙ্গে—
কভু কল কল্লোল, কভু মৃদু হিল্লোল
কভু, বালিকার লাস্যে, তরুণীর হাস্যে
মুখরিত গিরিতট বন উপবন—
যেন, কন্যার কলরোলে পিতার ভবন।

*

অলকানন্দা পরমানন্দে
বহিছে স্বচ্ছ প্রশান্ত ছন্দে
শত শত সাধকের শাশ্বত সাধনা
বিশাল সে বদরীর কল্যাণ ভাবনা
নেমে আসে ধীরে ধরণীর তীরে
পাষাণ হিমালয় বুক চিরে চিরে—
নেমে আসে কন্যা শত স্নেহধন্যা,
নরনারায়ণপ্রেমে জাগে নব বন্যা।

*

অলকানন্দা পরমানন্দে
নেচে এস হৃদয়ের নূতনছন্দে
আনন্দ-কলরব তোমারি সে বৈভব
আমার প্রাণের স্রোতে মিশে গেছে
জানি সব।

অলকানন্দা নয়নানন্দে
জাগো মম জীবনের মরণেরো ছন্দে।

নর্মদা

নর্মদা তব মর্মরময়—
মর্মের মহাবাণী
জাগালো আবার নূতন করিয়া
আমার হৃদয়খানি।

সংসারস্রোতে কোলাহলপথে
কোথা হতে কোথা যাই,
কূলের খেলায় ভুলের মেলায়
ঠিকানা কিছুই নাই।

আজি এ প্রভাতে তোমার প্রপাতে
বাজে অনাহত-ধ্বনি,
গুরুগম্ভীর অথই গভীর
মন্ত্রের মতো শুনি।

আকৃতি*

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞ বীর
আরণ্য-কুঞ্জর তুমি! চলো পৃথিবীর
বাধা-বিঘ্ন-দুঃখে রহি অটল অচল।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদে আনন্দ নির্মল
ভুঞ্জ তুমি! নহে কভু অমিতব্যয়িতা!
অপরের পুণ্যকর্মে অন্তরে মুদিতা;
সুখে মৈত্রী; বেদনায় করুণা ঢালিও;
কটূক্তি করিলে কেহ, উপেক্ষা করিও।
স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!—ক্রন্দন আত্মার
কখনো কাহারো কাছে দাসত্ব স্বীকার
নহে! নহে! নহে কভু! আত্মকেন্দ্রিকতা-
মানবের আদি পাপ বর্জিও সর্বথা।
বিশ্বাস-বচন-কর্ম থাকুক জীবনে
এক ও অখণ্ড;—সত্য অজেয় ভুবনে।

---

* চারণ কবির অপ্রকাশিত কবিতা।

কামনা

শ্রীশান্তশীল দাশ*

প্রণাম হয়ে রইবো আমি
মা, তোর চরণতলে এসে ;
রাখবি মা, তুই হাতটি কোমল
মাথায় আমার ভালবেসে।
থাকবে নাকো প্রদীপ জ্বালা,
গাঁথবো নাকো কথার মালা ;
আঁধার মাঝে রইবো প'ড়ে
মা, তোর কোলে শিশুর বেশে।

মা, তোর মুখের মধুর হাসি
দেখবো আমি মনে মনেই ;
মুছবে আমার সকল ব্যথা,
কোমল হাতের ওই পরশেই।
চাওয়ার কিছু থাকবে না আর,
শেষ হবে যে সকল পাওয়ার ;
মা, তোর শীতল চরণছায়ায়,
সব কামনা যেথায় মেশে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত

[ভৈরবী—ঝাঁপতাল]

বকলম

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ ভগবান
রামকৃষ্ণ অনুধ্যানে মগ্ন হোক মনপ্রাণ ॥
রামকৃষ্ণ নাম হৃদয় অভিরাম
সে নামধারা চিত্তমাঝে হোক নিত্য বহমান ॥
রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ জপো মন
রামকৃষ্ণ-শ্রীচরণ আমরণ লও শরণ।
রামকৃষ্ণরূপ আনন্দস্বরূপ
সে রূপসুধা মনমধুপ সংগোপনে করো পান॥

তোমার ভাবে বিভোর হৃদয়

সেখ সদরউদ্দীন †

অভাব আছে, বলবো না মা,
অভাব করো দূর গো।
বলবো তোমার ভাবে হৃদয়
করো না ভরপুর গো।
যতই আঘাত লাগুক মনে,
আঁধার নামুক ঘরের কোণে,
তোমার নামের নেশায় যেন
হৃদয় থাকে চুর গো!

তুমি আছো, তাই তো আছি
তোমার দয়ায় বেঁচে
আছি,
অনেক দূরে, আবার তুমি
সবার চেয়ে কাছাকাছি।
জীবন আমার তোমার দানে,
তোমার সুরই আমার গানে,
তোমার কৃপা আছে বলেই
তোমারি প্রেম যাচি।

জীবন যখন করেছ দান,
জীবন কেড়ে তুমিই নেবে,
তবু আমায় রাখবে তুমি,
কেন তবে মরবো ভেবে!
তোমার ইচ্ছা যা তাই হবে,
তোমার আশিস রবেই রবে,
ভুলিয়েছ যা সকলই তা
ফিরিয়ে আবার তুমিই
দেবে!

---

* সুপ্রসিদ্ধ কবি।

† এম. এ., বি. এড., প্রধান শিক্ষক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠ, পাণিহাটি। সম্পাদক, নীলিমা

চাতকতৃষ্ণা

শ্রীশিবশম্ভু সরকার*

সত্যের পরে যদি শ্রদ্ধা রহে
দুঃখের ভার তবে বইতে হবে—
পলে পলে তিলে তিলে দহন জ্বালা
দিনে দিনে অহ-নিশি পরাণে সবে !
খাদ ভেঙে সোনা আনা
আগুনের আনাগোনা
হাপরের হাওয়াটানা
একই সাথে, এত খেলা অতীব কঠিন !
খোসা ছিঁড়ে শাঁস নিলে যদি
খোসা গেল, এলো মনে বর্ণ নবীন !

দ্রুত যদি হাতে পেতে চাও
মুহু মুহু পা চালাও ভাই—
ঘোরাঘুরি চালাচালি হবে
নিশানাটি সরে সরে যায় !
অধীর চতুর হোয়ে
এলোমেলো আশা ব'য়ে
যাহা চায় তাই কোয়ে—
আসল সে নকলে হারায় !
হারি-জিতি, খুন হোয়ে যাই
তবু, মেঘ-জলে তৃষ্ণা মিটায় !

---

* প্রধান অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ (নৈশ বিভাগ), কলিকাতা। কবিতা ও প্রবন্ধাদি রচনার মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যসেবী।

ভারতাত্মা বিবেকানন্দ

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ*

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ সশ্রদ্ধ আবেগে একদিন
বললেন, "তোদের কাছে কি করে বোঝাবো বলতো আজ?
সে এক অকল্পনীয় ব্যক্তিত্বের শক্তি সীমাহীন
উত্তুঙ্গ সে হিমালয় নররূপী যেন গিরিরাজ।"

এর বেশি কোন কথা বলেননি বিপ্লবী সেদিন
অবিশ্বাস্য সে বিরাট হিমাদ্রিকে মানবসমাজ
দেখেছে বিস্ময়ে মুগ্ধ, শুনেছে সে মহারুদ্রবীণ
অনন্ত মূর্চ্ছনা মীড়ে বাক্‌সিদ্ধ কণ্ঠের আওয়াজ।

কৈশোরে অনেকবার শিমুলিয়া দত্তাবাসে গিয়ে
মনীষী মহেন্দ্রনাথে, বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথে আমি
প্রণাম করেছি। বুকে অন্তহীন কৌতূহল নিয়ে
স্বামীজীর স্মৃতিকথা শ্রবণের দিয়েছি প্রণামী
ভক্তিভরে নতশিরে। ভারতাত্মা বীর সন্ন্যাসীর
উজ্জীবনী শৈববীর্য বিস্ময় অখিল পৃথিবীর।

---

* সুপ্রসিদ্ধ কবি। অর্ধশতাব্দী যাবৎ কবিতা ও কাব্যসমালোচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের সেবক। মোট ১৭টি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। ইংরেজী ফরাসী জার্মান রুশ ও চীন ভাষায় ইঁহার বহু কবিতা অনূদিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ: 'উদাত্ত ভারত' ও 'রক্ত গোলাপ'।

অমৃতবাণী

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

সাধ যদি পেতে তব বিশুদ্ধ মাখন
নির্জনে পাতিয়া দই করগো মন্থন।
সে মাখন রাখা যায় জলে অনায়াসে
মিশে না জলে সে আর, জলেতেই ভাসে।
নির্জনে সাধন করে লভিয়া ঈশ্বর
সংসারে থাকিলে জেনো নাই কোন ডর।

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

[উদ্বোধনের কর্মী চন্দ্রমোহন দত্তকে লিখিত]

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণং

কোয়ালপাড়া
১৩২৬।২৫ বৈশাখ

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্রে তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদ জানিয়া সুখী হইলাম। কারণ বৃদ্ধ বয়সে তোমার পিতা তোমাদের সকলকে রাখিয়া ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন সেইজন্য। আমি উপস্থিত ভাল আছি। গতরাত্রে শ্রীমতী রাধারাণী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। প্রসূতি ও সন্তান উভয়েই ভাল আছে। বাকী মঙ্গল। ইতি— আশীর্ব্বাদিকা

তোমার **মাতাঠাকুরাণী**

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত]

Ramkrishna Math
Belur P.O., Howrah Dist.
16. 2. 1926

শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ,

তোমার প্রেরিত চিঠি পাইলাম। তোমরা ওখানে বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় এবং নিজেদের কল্যাণের জন্য বিবেকানন্দ সমিতি স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ। যে ভাবে কাজ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তোমরা যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পার তাহলে ইহাতে তোমাদের এবং যারা তোমাদের সংস্রবে আসিবে তাদের মহৎ কল্যাণ হইবে। যদি তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবে নিজেদের চরিত্র গঠন করিতে চেষ্টা কর এবং সাধারণের ভিতর এবং ছেলেদের ভিতর নিঃস্বার্থভাবে তাঁর ভাব দিতে চেষ্টা কর, তাহলে তিনিই তোমাদের শক্তি দিবেন। তাঁর ইচ্ছায় তোমাদের এইরূপ সদিচ্ছা হইয়াছে। তোমরা নিঃস্বার্থভাবে এইভাবে তাঁর সেবা করিয়া গেলে ক্রমশঃ তিনি তোমাদের ভিতর শক্তি দিবেন। আমি খুব আন্তরিক ভাবে সম্মতি দিতেছি। তোমাদের এই সদিচ্ছা পূর্ণ হউক।

আমি এখানে ছিলাম না, দেওঘর ও জামতাড়ায় মাসখানেক ছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের আগের দিন এখানে এসেছি। আমার শরীর মন্দ নয়। এখানকার অন্যান্য কুশল। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও এবং ওখানকার অন্যান্য সকলকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিও। ইতি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

---

* শ্রীঅবনীমোহন গুপ্তের সৌজন্যে মুদ্রিত।—সঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ ও দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় *

দ্বিজেন্দ্রলাল যে-যুগে নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে-যুগে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সমকালীন অন্যান্য নাট্যকার-দের মত দ্বিজেন্দ্রলালের ওপরেও এই প্রভাব এসে পড়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এর কোনও পরিচয় চোখে পড়েনি।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাতযাত্রাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁকে যে সামাজিক লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার জন্যে তাঁর মন শুধু রক্ষণশীল হিন্দুসমাজেরই প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেনি—হিন্দুধর্ম ও তৎকালীন ধর্মনেতা-গণের প্রতি উদাসীনও হয়ে উঠতে পারে। প্রথম জীবনে 'একঘরে' রচনায় (১৮৮৯) তাঁর তাৎক্ষণিক ক্ষোভ অত্যন্ত তীব্রভাবে অভিব্যক্ত। এই রচনায় হিন্দুসমাজের ওপর তাঁর কশাঘাত নির্মম হয়ে উঠেছে:

"হিন্দুসমাজ পচিতেছে—

পৃথিবীর লজ্জা মনুষ্যজাতির আবর্জনা, প্রতাড়িত পদাহত হিন্দুসমাজ—আজ পচিতেছে।

জীর্ণ শীর্ণ ভাঁড় হিন্দুসমাজ—আজ পচিতেছে।

শঠতার ভাণ্ডার, মিথ্যাকথার ওস্তাদ, লুকোচুরীর সর্দার, ভীরুতার সেনাপতি হিন্দু-সমাজ আজ পচিতেছে—

এ মিথ্যা, এ প্রতারণা, এ ভাঁড়ামি, এ নির্মমতা, এ নির্বিবেকতা, সে পচার দুর্গন্ধ ও দূষিত বায়ু।"

'এমন ধর্ম নাই' হাসির গানে ধর্মের ও ধর্মনেতাগণের প্রতিও কটাক্ষ—অবশ্য তা' সমাজকে আক্রমণের সূত্রেই:

"ঐ ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর হো!
কার্তিক গণপতি—
আর দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী
লক্ষ্মী সরস্বতী—
আর শচী ঊষা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি যম;
সবই আছে হিন্দুধর্ম তবে কিসে কম?
(কোরাস) ছেড়ো না ক এমন ধর্ম
ছেড়ো না ক ভাই
এমন ধর্ম নাই আর দাদা এমন ধর্ম নাই।...
ঐ কৃষ্ণ রাধা, কৃষ্ণের দাদা বলরাম বীর
আর শ্রীরাম, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীর
হন নিত্য নিত্য উদয়, নব নব অবতার;
ব্যস—বেছে নেও—মনোমত যিনি হন যাঁর
ছেড়ো না ক" ইত্যাদি।

অথচ তাঁর মত সরলহৃদয়, উদার, আবেগ-প্রবণ মানুষের এই মনোভাব রক্ষা করা স্বাভাবিক ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই অস্বাভাবিকতা থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর স্বচ্ছন্দ মানসচারণার পথে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন —এবং সেই মুক্তি তাঁকে এনে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণই। দ্বিজেন্দ্রতনয় দিলীপকুমারের

* কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। ইনি 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' বিষয়ে গবেষণায় নিরত আছেন। বর্তমান প্রবন্ধটি আসন্নপ্রকাশ 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থের অংশবিশেষ।

'স্মৃতিচারণ' ও দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর সাক্ষ্য অবলম্বন ক'রে তাঁর পরিবর্তনের পটভূমিকা আলোচনা করা যেতে পারে।

গিরিশ রচনাবলীর ভূমিকায় ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন:

"যশস্বী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের স্বভাবতই রেষারেষি ছিল।" তিনি শিশিরকুমারের মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন: "গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজুবাবুর সদ্ভাব ছিল না।" অবশ্য শেষের দিকে যে উভয়ের মধ্যে হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দেবকুমার রায়চৌধুরীর দ্বিজেন্দ্রজীবনী থেকে তার উপযুক্ত সাক্ষ্যও উপস্থিত করেছেন (গিরিশ রচনাবলী, সংসদ সংস্করণ, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮)।

যে কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে একটি চক্র গড়ে ওঠে, যাঁদের স্তাবকতা কেন্দ্রীয় মানুষটিকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করতে পারে। এ বিভ্রান্তি থেকে তিনি সহজে বেরিয়ে আসতে পারেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন, তখন গিরিশচন্দ্র পূর্ণশক্তিতে বিরাজিত। উদাসী দ্বিজেন্দ্রলালকে তাই গিরিশ-বিরূপ ক'রে তোলা সহজ ছিল এবং সেই সহজ পথেই দ্বিজেন্দ্রসুহৃদেরা অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু এ নিয়ে প্রথম সংঘর্ষ দেখা দিল দ্বিজেন্দ্রভাগিনেয় বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সঙ্গে। নির্মলেন্দু তখন ছাত্র, কলকাতায় এসেছেন কলেজে পড়তে—থাকতেন মাতুলালয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে। পিত্রালয়ের ধর্মীয় পরিবেশে লালিত নির্মলেন্দু কলকাতায় এসে গিরিশচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। নাট্যকার-অভিনেতার অনন্য আর এক পরিচয়ে মুগ্ধ নির্মলেন্দু তাঁকে মনে মনে প্রতিষ্ঠা করলেন গুরুর আসনে।

বন্ধুবৎসল দ্বিজেন্দ্রলালকে ঘিরে যে চক্রটি গড়ে উঠেছিল তারই একজনের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে নির্মলেন্দুর প্রত্যক্ষ বাদানুবাদের নালিশ গেল দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে। বন্ধুর অপমানে দ্বিজেন্দ্রলালের ধৈর্যচ্যুতি নির্মলেন্দুকে এক তীব্র সঙ্কটের সম্মুখীন করল। সেদিনের ঘটনার বিবরণ শোনা যাক্ দিলীপকুমারের কাছ থেকে:

"দেখলাম পিতৃদেবের মুখ গম্ভীর। নির্মলদাকে (নির্মলেন্দু লাহিড়ী) দেখেই বললেন—তুমি অমুককে অপমান করেছ?

নির্মলদা (রুখে উঠে)—তিনি আগে আমাকে অপমান করেছেন।

পিতৃদেব—না। তিনি বললেন, তোমাকে তিনি কিছুই বলেননি।

নির্মলদা—গিরিশবাবু সম্পর্কে ঠেস দিয়ে কথা—

পিতৃদেব—সে তাঁর মত—তার জন্যে তুমি তাঁকে যা তা বলতে পারো না। তিনি আমার বন্ধু মনে রেখো। আর শোনো নির্মল, তোমার বাবা তোমাকে আমার এখানে পাঠিয়েছেন পড়াশুনা করতে। আমি চাই না তুমি থিয়েটারী দলে মেশো।

নির্মলদা—গিরিশবাবুর কাছে আমি যাই থিয়েটারী দলে মিশতে না—সৎ কথা শুনতে।

পিতৃদেব—(উষ্ণস্বরে) কথার ওপর কথা কোয়ো না। শোনো, এখানে যদি থাকো আমার কথা শুনতে হবে।

জেদী নির্মলেন্দু কথা শুনেছিলেন। মাতুলালয় পরিত্যাগ ক'রে এক সস্তা মেসে গিয়ে উঠেছিলেন—সেই সঙ্গে মাতুলের কথা

শোনার দায় থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন। যাবার সময় রেখে গিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশে তীব্র ভাষায় লেখা একখানি চিঠি যার শেষ ক'টি কথা :

I love Girish Babu, I adore Girish Babu, but I am sorry I can't say the same about your flawless friends—who are not fit to lace his shoes..."

(স্মৃতিচারণ, পৃঃ ২০২-৩)

এই ঘটনায় দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে দেখা দিল এক আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া। গিরিশচন্দ্র! —নাটক লেখে—থিয়েটার করে! কোথায় যেন তাঁর একটা ঠিকে ভুল হয়েছে। একটা আঠার উনিশ বছরের ছেলে তার নিরাপদ সুখস্বাচ্ছন্দ্য, দীর্ঘ আত্মীয়তার আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে—ভুলে যেতে—পারে কেমন ক'রে, যদি মানুষটির মধ্যে অন্য কোন আকর্ষণ না থাকে? গিরিশচন্দ্রকে নির্মলেন্দু গুরুরূপে বরণ করেছে একথা তিনি আগেই শুনেছিলেন দিলীপকুমারের কাছে—বিশ্বাস করেননি। কিন্তু আজ আর অবিশ্বাস করার মত কিছু পেলেন না। কিন্তু গিরিশচন্দ্র গুরু! কিসের গুরু? কি তাঁর পরিচয়?

পরিচয়টা উদ্ঘাটন করলেন গিরিশচন্দ্র স্বয়ং। মাঝে মাঝে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়ি 'সুরধামে' আসতেন। সেদিনও এলেন, কিন্তু যাবার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের মনে তাঁর নতুন পরিচয়ের ছাপ মুদ্রিত ক'রে দিয়ে গেলেন। সেদিন খোলাখুলি আলোচনায় তাঁদের এতদিনের মালিন্য ঘুচে গেল। অভিভূত দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশকে বললেন, "আপনি তো আমাদের গুরু। বাস্তবিক আপনাকে অনুসরণ করেই তো এই-যা দু'এক খানা নাটক লিখতে শিখেছি।... আপনার বিরুদ্ধে কোনো কথা বিশ্বাস করব সে কি সম্ভব?" (দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৬২৪)

গুরুদাস-গিরিশচন্দ্রকেও চিনলেন সেইদিন। দ্বিজেন্দ্র-পুত্র দিলীপকুমার যে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করেছেন, এই কথাটা জানাতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র তুললেন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ। তাঁর ভক্তিনম্র হৃদয় দ্বিজেন্দ্রলালকেও স্পর্শ করল। তিনি জানতেন, দিলীপকুমার নির্মলেন্দুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যায়, বেলুড় যায় কিন্তু সেখানকার মূল আকর্ষণের কেন্দ্রে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই তাঁর গড়ে ওঠেনি।

গিরিশচন্দ্র-অমৃতলালের মত দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত থেকে নাটক লেখেননি—তাই তাঁর পরিচয়ও ঘটেনি বঙ্গরঙ্গমঞ্চ-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। আজ নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র শুধু নিজের নতুন পরিচয় দিয়ে গেলেন না, সেই সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করলেন মঞ্চগুরুকেও। নির্মলেন্দুর গৃহত্যাগের প্রকৃত মর্ম তাঁর কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেল। আর ঠিক এই সময়ই দিলীপকুমার পিতার হাতে তুলে দিলেন—এ যুগের গীতা 'কথামৃত'।

সেই কথামৃত পড়ে গিরিশচন্দ্রকে আরো স্পষ্ট ক'রে বুঝলেন, তাঁর স্বকীয় পরিচয়ে—গিরিশগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয়ও হল স্পষ্টতর।

সেই সময়েই তাঁর সন্ন্যাস-রোগের সূত্রপাত। রক্তের চাপ পরীক্ষা ক'রে চিকিৎসকরা প্রমাদ গণলেন—অবসর নেবার পরামর্শ দিলেন। সেই দুর্যোগের অন্ধকারের মধ্যে 'কথামৃতে'র অমৃতকণা তাঁর কাছে পৌঁছে দিল আলোর সন্ধান। পুত্রের সঙ্গে এই সময়কার

সংলাপের কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করি দিলীপ-কুমারের জবানীতে :

(দিলীপকুমার)—"শ্রীম-কে দেখে এলাম বাবা।

পিতৃদেব (হেসে)–কে তোর ঠাকুরের বসওয়েল ?—বেশ বেশ। বল কি হল ?

আমি (হেসে)—নির্মলদার সঙ্গে কাল হঠাৎ তর্ক বাঁধল। আমি পরমহংসদেবকে বিশ্বাস করি বটে—আরো সেদিন আপনার ভরসা পেয়ে—

পিতৃদেব—রোস, রোস, আমার ভরসা মানে ?

আমি–বাঃ আপনি সেদিন বলেন নি যে পরমহংসদেব সাধু একথা জলজ্যান্ত সত্য, যেমন সত্য—ঐ দোরটা দোর।

পিতৃদেব (প্রসন্ন)—বলেছি, আর বলার পরে কথাটা শুধু যে ফিরিয়ে নেব না তাই নয় আরো একটু জুড়ে দেব—তাঁর ভাবেভোলা ছবি দেখলে মনে না হয়েই পারে না যে তিনি মহাপুরুষ।…

আমি (সংক্ষেপে)—আমি বলি, তিনি মহাপুরুষ, অপাপবিদ্ধ সবই মানি কিন্তু তিনি যে একেবারে সাক্ষাৎ ভগবান এ—এ গোঁড়ামি নয় ? বলুন তো ?

পিতৃদেব (হেসে)—কী করে বলি বল ? আমার চোদ্দপুরুষেও কেউ ভগবানকে চর্মচক্ষে দেখেনি।

আমি (চমকে গিয়ে বিজ্ঞভাবে)—তা বটে, তবে কি বলবো—আমার বলা উচিত নয় যে তিনি সাক্ষাৎ ভগবান হতে পারেন না ?

পিতৃদেব—নিজের ধারণা বলবি না কেন ? তবে বেশি জোর করে বলা ভালো নয়—তিনি কি হতে পারেন আর কি হতে পারেন না। তবে এ আমার কথা নয় বাবা। সেদিন তোর দেওয়া 'কথামৃতে'ই পড়েছিলাম —যাকে পরমহংসদেব বলতেন মতুয়ার বুদ্ধি, আর পড়ে পড়ে একটু চমকে গিয়েছিলাম।" (স্মৃতিচারণ, পৃঃ ২৩৬-৩৮)

আর একদিনের কথা।

সুরধামে গিরিশ-দ্বিজেন্দ্র মিলনের সময় গিরিশচন্দ্র তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর নতুন নাটক 'শঙ্করাচার্য' দেখবার জন্যে। দ্বিজেন্দ্রলাল সপুত্র গেলেন নাটক দেখতে। দিলীপকুমারের সেদিনের অভিজ্ঞতা—

"নাটকটি দেখতে দেখতে তাঁর মুখ-চোখের ভাব দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। থেকে থেকে কেবল 'আহা-আহা' আর দ্বিতীয় উক্তি নেই। মনে আমার কী যে পুলক জেগে উঠল।…কথামৃতের বটিকাই সক্রিয় হয়ে উঠেছে অবধারিত।"

(স্মৃতিচারণ, পৃঃ ২১৫)

দিলীপকুমারের দেওয়া 'কথামৃত' ছাড়াও যে তিনি দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছ থেকে ঐ একই বই এবং রামকৃষ্ণ-জীবনী গোপনে সংগ্রহ ক"রে পড়েছেন তা' জানতে পারা যায় দেবকুমারবাবুর সাক্ষ্য থেকে :

"এই সময়ে তিনি যথার্থ ভগবদ্‌জন—সাধু মহাত্মা ও ভক্তদের প্রতিও শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়েন। পরমারাধ্য ভক্ত-ভগবান শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং সিদ্ধদেবতা পরমহংস রামকৃষ্ণের পাদপদ্মে তিনি এই সময় যে কতদূর ভক্তিমান হইয়া উঠিয়াছিলেন —আমি নিজে তাহার অনেক পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলাম। তিনি গোপনে সাধারণ বন্ধুদের অগোচরে, উক্ত মহাপুরুষদের অমূল্য জীবনী, উপদেশ ও কথামৃত অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত, বহুবার আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া পাঠ করিয়াছেন।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৬৯২)

২

কথামৃত, রামকৃষ্ণ-জীবনী ও উপদেশ মন্থনের এই পটভূমিকায় শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লিখেছেন মাত্র তিনখানি। দু'খানি সামাজিক নাটক---'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' এবং অপরটি পৌরাণিক নাটক 'ভীষ্ম'। 'এমন ধর্ম নাই' হাসির গানে যে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গ করেছিলেন :

'যদি চোরই হও কি ডাকাতই হও
তা গঙ্গায় দাও গে ডুব
আর গয়া কাশী পুরী যাও সে
পুণ্যি হবে খুব—'

তিনিই 'ভীষ্ম' নাটকে লিখলেন :

'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে
শ্যামবিটপীঘন তটবিপ্লাবিনী
ধূসর তরঙ্গভঙ্গে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে
বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা ভাগীরথি ! জাহ্নবি ! সুরধুনি !
কলকল্লোলিনী গঙ্গে।'

তাঁর এই পরিবর্তন সম্পর্কে দিলীপকুমার লিখছেন "তাঁর হাতে তখন বিস্তর কাজ। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকা বেরুবে, তিনি 'ভারত আমার, ভারত আমার' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' জাতীয় গান ও প্রবন্ধ লিখছেন। তবু আমার উপরোধে 'কথামৃত' দুখণ্ড পড়ে ফেললেন। ঠিক এর পরেই তিনি কয়েকটি অপরূপ শরণাগতির গান বাঁধেন।...

"পরিহরি ভবসুখদুঃখ যখন মা
শায়িত অন্তিম শয়নে,... ।"

(স্মৃতিচারণ, পৃঃ ২০৬-৭)

দিলীপকুমার এই স্তবকটি যখন গাইতেন তখন তিনি নিজেও অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়তেন কারণ এর মধ্যেই শুনতে পেতেন অনিবার্যের পদধ্বনি। তিনি লিখেছেন, "সঙ্গে সঙ্গে মনে হত যে, পিতৃদেবও টের পেয়েছিলেন তাই বুঝি তাঁর বিখ্যাত 'নীলাকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো' গানটি-তে দিনের শেষে চেয়েছিলেন মায়ের কোলে পরম শরণাগতি :

সাঙ্গ আমার ধূলাখেলা,
সাঙ্গ আমার বেচাকেনা
দিইছি করে হিসেবনিকেশ
যাহার যত পাওনাদেনা।
এখন বড় ক্লান্ত আমি,
ওমা কোলে তুলে নেনা
যেখানে ঐ অসীম সাদায়
মিশেছে ঐ অসীম কালো।"

(স্মৃতিচারণ, পৃঃ ২০৭)

অপূর্ব এই সঙ্গীতগুলি কত সহস্র প্রাণকে উদ্বেলিত করেছে আমরা সবাই জানি—অনেক সময়ে এই গানগুলির মধ্যে দিয়েই অনেকের কাছে তিনি পরিচিত কিন্তু আমরা কি জানি, এগুলির পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব কতখানি ? তাঁর পুত্রের সাক্ষ্যের চেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর কি হতে পারে ? দিলীপকুমার লিখছেন :

"এই সময় তাঁর আর একটি কথা মনে পড়ে পরমহংসদেব সম্পর্কে। বোধহয় মার ছেলে মা-র কোলে ফিরবার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন বলেই তিনি আমাকে বলেছিলেন সহজ উচ্ছ্বাসে 'ওরে কথামৃত পড়লে মনে সন্দেহ থাকে না যে তিনি ছিলেন নিখাদ সোনা।' "

(স্মৃতিচারণ, পৃঃ ২০৭)

'ভীষ্ম' নাটকের আরও একটি দিক

সহজে আমাদের দৃ আকর্ষণ করে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে দেশমাতৃকার বন্দনা করেছেন। চন্দ্রগুপ্তের কাছে চাণক্যের মাতৃপ্রশস্তি কূটনৈতিক কৌশলমাত্র; কিন্তু 'ভীষ্ম' নাটকের মাতৃপ্রশস্তি গভীরতর উপলব্ধির সংবাদ বহন করে আনে। অম্বার মধ্যে মাতৃচেতনার উদ্বোধনে ভীষ্মের উক্তি:

"তুমি কি বুঝিবে?
মাতৃনামে কত শক্তি তুমি কি বুঝিবে?
কত অর্থ যাহা কোন অভিধানে নাই,
কত সুধা যাহা নাই ইন্দ্রের ভাণ্ডারে;
কণ্টক-শয্যায় রোগী তীব্র যন্ত্রণায়
যবে 'মা' বলিয়ে ডাকে—অর্ধেক যন্ত্রণা
যেন সে অমৃতহ্রদে গলে যায়।
মাতৃনামে পশু বশ হয়। মাতৃনাম
শোকতপ্ত বক্ষস্থল সুশীতল করে;
শ্রবণবিবরে বর্ষে স্বর্গের সংগীত।
মাতৃনাম আনন্দবিহ্বল রসনায়
জড়াইয়া যায়। ইহা তপ্ত ওষ্ঠাধরে
বিকম্পিত হয়। ইহা বায়ুর উপরে
নৃত্য করে। মাতৃনামে ধরণী পবিত্র হয়।
মাতৃনামে ধন্যা হন স্বয়ং ঈশ্বরী।"

আরও প্রত্যক্ষভাবে মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন তিনি 'পরপারে' নাটকে। 'পরপারে'র মঞ্চসাফল্য ও নাটকীয় সুষ্ঠুতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে—উঠেছেও; কিন্তু দ্বিজেন্দ্রমানসের বিবর্তন এ নাটকে যে-ভাবে ধরা পড়েছে, তা অন্যত্র ততখানি স্পষ্ট নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্রথম সামাজিক নাটক (অবশ্য 'বঙ্গনারী' পূর্বেই লিখিত হয়েছিল—প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে)। 'পরপারে' নাটকে এমন একটি নারীচরিত্র প্রাধান্যলাভ করল যা তার এতোদিনের ধারণাকে অতিক্রম ক'রে গেছে। শান্তা বারবনিতা। সেই শান্তা-চরিত্রের মহত্ত্ব ও পরিবর্তন দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকে দেখিয়েছেন। এতদিন পর্যন্ত বারবনিতা সম্পর্কে তিনি যে মনোভাব পোষণ ক'রে এসেছেন 'কথামৃত' পাঠের পরে তার পরিবর্তন ঘটেছে। দেবকুমার রায়চৌধুরী সাক্ষ্য দিচ্ছেন:

"প্রথম প্রথম রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের সম্পর্কে তাঁর যেরূপ ধারণাই থাক না, শেষ বয়সে আমরা দেখিতেছি যে, তিনি এদেশীয় সামাজিক অবস্থানুসারে এই সব পতিতা রমণীর দ্বারা অভিনয় করানো অপরিহার্য ও একহিসাবে উচিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিতেন সংক্ষেপে তাহার মর্ম এই যে, আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থানুসারে এই ব্যবস্থা শুধু যে অনিবার্য তাহা নহে—এই সব অভাগী রমণীদের পক্ষেও হিতকর বটে। সমাজের সকল শ্রেণীর, সকল অবস্থার নরনারীর মধ্যেই ভালমন্দ দুই-ই আছে। এই সব অসহায়া পতিতাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত অনুতপ্ত কিংবা সৎভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক ও আগ্রহান্বিত, রঙ্গালয় তাহাদের জীবিকার্জনের একটা উপায় করিয়া দিয়া বরং অতি উদার ও সঙ্গত, সাধু কর্তব্যই সম্পন্ন করিতেছে।...তিনি স্বীয় জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন, 'বরং থিয়েটারে গিয়া ভাল বইয়ের অভিনয় দেখিলে লোকের মন তাহাতে উন্নত ও পবিত্র হয়। আমি নিজে ভুক্তভোগী; তাই এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারি। 'চৈতন্যলীলা' 'বিল্বমঙ্গল' 'নন্দবিদায়' 'প্রহ্লাদচরিত্র' 'প্রফুল্ল' 'স্বর্ণলতা' 'বলিদান'

প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়া নিজের মন যে কত মার্জিত, পবিত্র, উন্নত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে আজও আমার উপকার হয়। .. ' " (দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৪১০)

বারবনিতা-সংক্রান্ত এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং থিয়েটারের লোকশিক্ষকের ভূমিকা-সম্পর্কিত অভিমত সমকালীন চিন্তার বিরোধী—'কথামৃত' ও রামকৃষ্ণজীবনী-পাঠের ফলেই যে তাঁর সুদৃঢ় মতামত গড়ে উঠেছে, এ কথা মনে করা অযৌক্তিক নয়। এবং উদার দৃষ্টির আলোতেই তিনি দেখেছেন শান্তাকে।

শান্তার মানসিক পরিবর্তনের আকস্মিকতা নিয়ে একদা শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারকে বলেছিলেন, "তোমার বাবা তাদের সঙ্গে ঘর করেন নি তো, তাই জানবেন কেমন করে যে গণিকারা ঠিক ও-ভাবে বদলে যায় না।" দিলীপকুমারও সে কথা মেনে নিয়েছেন। (স্মৃতিচারণ, পৃঃ ২১৬) কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যে জেনেছেন "হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যখন আলো আসে তখন একটু একটু করে আসে না।" —এ কথা সব মানুষের পক্ষে সত্য এবং গণিকাদের মানবিক স্বীকৃতি দিতে তাঁর কুণ্ঠা নেই আর।

কিন্তু শান্তা-চরিত্র কি সত্যই অসম্ভব ?

অভিনেত্রী সুশীলাসুন্দরীর অকালমৃত্যু —১৯ পৌষ ১৩২১। এটা কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়—স্মরণীয় সাল তারিখও নয়। অভাবনীয় হল, তার মৃত্যুতে থিয়েটার-দর্শকেরা শোকগাথা লিখে, ছাপিয়ে, মিনার্ভা থিয়েটারে বিলি করলেন দর্শকদের মধ্যে। একজন দর্শক, বিভূতিভূষণ ঘোষাল তাঁর শোকোচ্ছ্বাসে লিখলেন :

"কলঙ্কতমঃ করিয়া বিনাশ
পুণ্যের আলো জ্বলিত প্রাণে
অনলশুদ্ধ স্বর্গের মত
হৃদয় তাহার কষিত শানে।...
কবির লেখনী তাহার চরিত
গেছে চিরতরে অমর করি
'শান্তা'র সেই পবিত্র কথা
অঙ্কিত তারি চিত্র ধরি—
পতিতা হয়েও সতীর মহিমা
গিয়াছে দেখায়ে আপন কাজে
বঙ্গের প্রতি গৃহে গৃহে আজি
অতুল তাহার কীর্তি রাজে।"

(শ্রীহরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে তাঁর সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত)

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসার পর গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। নিষেধ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—বলেছিলেন, 'না না ও বেশ আছে—ওতে অনেকের উপকার হচ্ছে।' গিরিশচন্দ্র পরে একথার তাৎপর্য বুঝেছিলেন। সেকালের রঙ্গমঞ্চের পতিতা অভিনেত্রীদের জীবনের আলোকিত দিকটির যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হবে। সে প্রসঙ্গ এখন থাক।

শান্তা-চরিত্র দুর্লভ হতে পারে—অসম্ভব নয়। যে উদার দৃষ্টি দিয়ে তিনি তাকে উদ্ভাসিত করেছিলেন, সে দৃষ্টি দ্বিজেন্দ্রলাল লাভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন থেকে যেখানে তিনি দেখেছেন 'নিখাদ সোনা' অপাপবিদ্ধ 'মহাপুরুষ'-এর কৃপা থেকে পতিতা নারীও বঞ্চিত হয়নি। ঘৃণা দিয়ে নয়—দয়া দিয়েই তিনি তাদের জীবনে এনে দিয়েছেন নতুন আলোর সন্ধান। অনুপ্রাণিত দ্বিজেন্দ্রলাল শান্তার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন :

"বেশ্যাদের ঘৃণা করবেন না। তারা বড় অভাগিনী। তাদের অনুকম্পা করুন। তাদের গৃহ নাই, পরিবার নাই, বন্ধু নাই। তারা যেন অন্ধকার রাত্রিকালে পরিত্যক্ত রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, দুধারে দেখতে পাচ্ছে দরিদ্রের কুটিরে আলো জ্বলছে; দম্পতির প্রেমের মিলন-হাস্যের ফোয়ারা উঠেছে। শিশুরা স্নেহের নীড়ে নিদ্রা যাচ্ছে।...কোটি জ্যোতিষ্কের মধ্য দিয়ে তারাই লক্ষ্যহীন ধূমকেতুর ন্যায় ছুটে চলেছে।...তারাই নিজেদের যথেষ্ট ঘৃণা করে। তার ওপর আপনাদের ঘৃণা আর চাপাবেন না।"

সে যুগে সেই স্তূপীকৃত ঘৃণার মধ্যে থেকে তাঁদের 'আনন্দময়ী মাতৃরূপে' দর্শন ক'রে চৈতন্যলাভের আশীর্বাদ করেছিলেন একজনই—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

'পরপারে' নাটকে 'ভবানীপ্রসাদ' চরিত্রটি দ্বিজেন্দ্রলালের মানসবিবর্তনের সবচেয়ে জোরালো সাক্ষী। ভবানীপ্রসাদ শ্যামাভক্ত উদাসী মানুষ। মাতৃনাম গান ক'রে সে শান্তি পায়, অপরকেও শান্তি দেয়। নাটকে তার গান তিনখানি:

(১) এবার তোরে চিনেছি মা
আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা
(এবার) পঠিয়ে দিইছি যমের বাড়ি।...
ভবার্ণবে দিশেহারা
পাচ্ছিলাম না কূলকিনারা
(তখন) দেখা দিলি ধ্রুবতারা
(অমনি) তারা বলে দিলাম পাড়ি।

(২) আর কেন মা ডাকছ আমায়,
এই যে এইছি তোমার কাছে
নাও মা কোলে দাও মা চুমা
এখন তোমার যত আছে।

(৩) পেয়ে মাণিক হারালাম মা
আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া
আঁধারে পথ দেখতে পাইনে
কোথা আছিস দে মা সাড়া।

এ গানগুলি ভবানীপ্রসাদের চরিত্রকেই শুধু পরিস্ফুট করেনি—দ্বিজেন্দ্রহৃদয়কেও উদ্‌ঘাটিত করেছে। এগুলি তাঁর অন্তরমথিত প্রার্থনামন্ত্র।

'ভবার্ণবে দিশেহারা' দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের গোধূলিলগ্নে পেয়েছেন 'ধ্রুবতারা'র সন্ধান। একদিনের একটি ঘটনাই তার বড় প্রমাণ। দেবকুমার রায়চৌধুরী লিখেছেন:

"একদিন আমার বেশ মনে পড়ে 'পরপারে' নাটকের সদ্যরচিত একটি গান ('আর কেন মা ডাকছ আমায়—এই যে এইছি তোমার কাছে' ইত্যাদি) আমাকে শুনাইতে গিয়া কয়েককলি গাইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল ভগ্নজড়িত স্বরে (স্বর চড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে) একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিলেন; ...আমি তাঁহার অতখানি পরিবর্তন দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না; কিছুক্ষণ তাই, আমারও বাক্যস্ফূর্তি হইল না।" (দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৬৮৭)

যে সদ্যরচিত গান গাইতে গিয়ে সেদিন তিনি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন সে গানে ছিল তাঁরই আত্মআকুতি:

...আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে
বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি
মা তোমার ঐ বুকের মাঝে
এবার যদি পেয়েছি শ্যামা
আর তো তোমায় ছাড়ব না মা
ওমা ঘরের ছেলে পরের কাছে
মায়ে ছেড়ে সে কি বাঁচে।

এ সময় কালীঘাটে গিয়ে তাঁর দেবী-মূর্তির কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও উপস্থিত করেছেন জীবনীকার।

দেবকুমারবাবু লিখেছেন, "তাঁহার 'পরপারে' নাটকের সেই একমাত্র ভবানী-প্রসাদ ছাড়া আর কোন নাটকেই তিনি ভক্তির চিত্র অঙ্কন করিয়া যান নাই" (দ্বিজেন্দ্রলাল পৃঃ ৭৪৩)। ভক্তিচিত্র না থাক, তাঁর শেষ জীবনের দু'খানি নাটকেই ভক্তের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ভবানীপ্রসাদ তার ভক্তিকে উৎসারিত করেছে প্রত্যক্ষভাবে আর 'বঙ্গনারী'তে কেদার প্রচ্ছন্নভাবে। কেদার পরার্থে জীবন উৎসর্গ করেছে, নিজের সুখ জলাঞ্জলি দিয়েছে, পরের জন্যে কারাগার পর্যন্ত বরণ করে নিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে সে পাগল, কিন্তু তার পাগলামির মধ্যে আছে সারল্য ও নিষ্কামকর্মের উজ্জ্বলতা। কারাগারে ঘানি ঘোরানোর সময় দূর থেকে ভেসে আসা গানটি নাট্যকার ব্যবহার করেছেন তার অন্তর-প্রক্ষেপরূপে:

ঘোরো ঘোরো আমার ঘানি।
আমি শুধু চক্ষু বুজে কেবল টানি
—কেবল টানি।...
আমরা ভবঘোরে মর্চ্ছি ঘুরে
কেন ঘুরি নাহি জানি
জন্মজন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে
প্রাণটা হেঁচড়ে টেনে আনি।
এ প্রাণের তবুও তো যায় না ক্ষুধা
কেন জানেন ভগবানই—
হোক,—তবু যদি তোমার
পানে চক্ষু থাকে
—তবেই ঘোরা ধন্য মানি।

ক্ষেপামির ঝোঁকে কেদার কখনো নাচে, কখনো বিচিত্রভাষায় গালাগালি দেয়, কখনো দোয়াত-কলম নিয়ে তখনই লিখে রাখে 'ঈশ্বর আছেন' পাছে ভুলে যায়, কখনো বা নিজেকে শাসন করে 'কেদার সভ্য হও'। সদানন্দ (অপর একটি চরিত্র) তার এই অ-সভ্যতার মধ্যে খুঁজে পায় বিশুদ্ধ মনুষ্যত্ব। সে বলে:

"না কেদার! সভ্য হয়ো না। বড় খাঁটি জিনিস আছ। আগে এ রকম সরল গোঁয়ার ভট্টাচার্যি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে ছিল। এখন ইংরাজি শিক্ষার সঙ্ঘাতে তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। তারই দু'এক টুকরো এখানে ওখানে পড়ে আছে।...এ জিনিস ভারতের নিজস্ব। পায়ে চটি জুতো, পরণে সাদা ধুতি,—শরীরে বল, মনে স্ফূর্তি—মুখে সারল্যের জ্যোতিঃ—এ আর কোনও দেশে নাই।"

—"তোমার মহৎ হৃদয়ের গুণে পৃথিবী জয় করেছ, কেদার, পুরাণে অনেক চরিত্র পড়েছি, ইতিহাসও অনেক ঘেঁটেছি কিন্তু এরকম সরল, গোঁয়ার, ত্যাগী, অস্থির, সদানন্দ চরিত্র আর দেখিনি।"

একটি পাষণ্ড-চরিত্রের শেষ উপলব্ধি:

"কেদারবাবু, ঋষি সংসারে যদি কেউ থাকে, ত আপনি। নিজের জন্য কখনও ভাবেননি; পরের জন্যেই ভেবেছেন।"

এ রকম পুরাণ-ইতিহাস-বহির্ভূত ঋষি-চরিত্র গিরিশচন্দ্রের রঙ্গলালের ('ভ্রান্তি' নাটক) কথাই মনে পড়িয়ে দেয়; কিন্তু হিন্দুসমাজ-লাঞ্ছিত দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন যে সমাজকে অস্বীকার ক'রে নিজের বেদনা ও বিদ্বেষে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন, তিনি সেই হিন্দুসমাজের মধ্যেই কোথায় পেলেন এমন চরিত্রের সন্ধান!

দ্বিজেন্দ্রলালের দু'খানি সামাজিক নাটকই

তাঁর পরিণত জীবনের রচনা। যে ঘরের বন্ধ দুয়ার থেকে একদিন তিনি অনেক বেদনা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন আসন্ন জীবন-সন্ধ্যায় সেই ঘরেই তিনি ফিরতে চেয়েছেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন এখানে শুধু নিষেধের অন্ধকারই সত্য নয়—মুক্তি আলো হাতে তাঁকে গ্রহণ করার জন্য দুই ব্যগ্র বাহু প্রসারিত ক'রে আছে। দিলীপকুমার লিখেছেন, "নির্মলদা ও আমার মাধ্যমে তাঁর ভক্তিজীবন কিছু খোরাক পেয়েছিল—তাঁর দৃষ্টি ঐ দিক থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিল পরমার্থিক আলোকে যার প্রধান উপজীব্য ভক্তিসুধার নিত্য রস। ..." (স্মৃতিচারণ, পৃঃ ২১৭)

দ্বিজেন্দ্রতনয়ের দুঃখ—"এই শ্রেষ্ঠবিকাশের উষালগ্নেই কাল তাঁকে আমাদের কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে গেল—নৈলে আমরা তাঁর কাছ থেকে পেতাম আরো কত অনুপম ভক্তির নাটক, শরণাগতির গান, মহৎ চরিত্র।" (স্মৃতিচারণ, পৃঃ ২১৮)

সে দুঃখ আমাদেরও।

আমি কেন ডাকবো না মাকে

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত*

মা আমাকে ডাকে যদি, আমি কেন ডাকবো না মাকে ?
শরতের স্নিগ্ধ হাসি জাগে যেন মার হাসি হয়ে,
সেই তো মায়ের ডাক ঃ সেই ডাক মনের আলয়ে
আনন্দের সুর আনে। কোন্ সে অজানা শিল্পী আঁকে
মার সেই রূপখানি বক্ষপটে,—সুর শুনে শাঁখে
মঙ্গল কাব্যের ফুল ফুটে ওঠে সুস্মিত প্রত্যয়ে।
হৃদয়ের রামায়ণে পুণ্য এক কাহিনী-আশ্রয়ে
অভয়দাত্রীর মূর্তি পুরোভাগে স্থির হয়ে থাকে।

জীবনের জনপদ ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস-মরু থেকে
মার কথা প্রাণে নিয়ে জেগে ওঠে নতুন আশার
স্বপ্নের ব্যঞ্জনা মেখে, বাল্যের আনন্দ দিয়ে লেখে
স্মরণের কত কথা,—ঢাক-ঢোল-কাঁসর-ঝংকার।
মায়ের স্পর্শের পুণ্যে পরিস্রুত সৌন্দর্যের সোনা,
আমার বুকের কাছে আজ শুধু ফুলের প্রার্থনা।

* বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, শ্যামসুন্দর কলেজ, বর্ধমান। 'কৃষ্ণযাত্রা ও নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়', 'বাংলা সাহিত্যের রূপচিত্র', 'বঙ্কিমসাহিত্য পরিক্রমা' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[শ্রীউমাচরণ সেনমজুমদারকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

Ramkrishna Math

Belur, P.O. Howrah Dist.

Dated...12th May 1914

প্রিয় উমাচরণবাবু—

কিছুদিন আগে তোমার পত্র পাইয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, রাখাল মহারাজ শীঘ্র আসিবেন, তারপর উত্তর দিব; সম্প্রতি লোকমুখে শুনিলাম, রাখাল মহারাজ এখন মঠে আসিবেন না, ৺কাশীধামেই থাকিবেন; নীরদ মহারাজ ৺কাশীধামে মহারাজের কাছেই আছেন, শুনিয়াছি, কতদিনে তিনি কনখলে যাইবেন, সে বিষয়ে কিছু শুনি নাই।

কলিকাতায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শারীরিক ভাল আছেন ও অন্য ২ সকলে ভাল আছেন। মঠে বাবুরাম মহারাজের আবার জ্বর হইয়াছিল, ৪।৫ দিন হইল তিনি সারিয়াছেন, এখানকার আর সকলে ভাল আছেন, আমিও ভাল আছি। গতকল্য কন্‌টায়ের রিলীফকার্য্যের জন্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা মঠে ফিরিয়া আসিলেন, সেখানকার কার্য্য বন্ধ হইল।

এখানে আজকাল তুপুর বেলায় বড় গরম অনুভব হয়, মাঝে ২ সন্ধ্যার পর বৃষ্টি হয়, কয়েকদিন আগে এমন শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল, গড়ের মাঠে হাজার ২ কাক ও অন্য ২ পক্ষী শিলাবৃষ্টিতে মরিয়াছিল, সেটা হইয়াছিল রাত্রিকালে; আর অনেক গাছ শিকড় সুদ্ধ উপড়ে পড়িয়াছিল এমন ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল; রাঁচিতে আজকাল ঝড়বৃষ্টি কিরকম? এ বৎসর মনে করিয়াছি পুরীতে ৺জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করিব, তারপর কতদূর কি দাঁড়ায় বলা যায় না, ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা, তাই হবে। তোমায় একটি কাজ করিতে হইবে, যদি পার তো ভাল, জগন্নাথে যাইবার জন্য কিছু ২ চাঁদা তোলো, কিন্তু কারোর কাছে আমার নাম লইয়ো না, বলিবে কোন সাধুর জন্য। জুন মাসের ৩।৪ তারিখ নাগাদ মঠ থেকে বাহির হইবার ইচ্ছা আছে। ৺পুরীধামে বলরামবাবুদের বাড়ি আছে, সে না থাকার মধ্যে, ভাড়াটে আছে, পুরীতে গিয়ে হয়তো একটি ঘর ভাড়া করিতে হইবে।

তুমি ঠাকুরের উপদেশের কথা বলিয়াছিলে, কিন্তু জানিবে মা যখন তোমাদের দয়া করিয়াছেন এবং মঠের সকলে তোমাদের ভালবাসেন, তখন তোমাদের আর কোন ভাবনার

* শ্রীআনন্দ দাশগুপ্তর সৌজন্যে মুদ্রিত।—সঃ

বিষয় নাই, এখন তোমাদের দেশে অন্য লোক মঠের বিষয়, ঠাকুরের বিষয় বুঝিবে, অনুভব করিবে। ঠাকুর মাঝে মাঝে ভক্তদের কষ্ট দেন, তাঁর উপর সমস্ত ভক্তদের ভালবাসা বাড়াইবার জন্য ; ঠাকুর আগে কষ্ট দেন তারপর শান্তি ; এ সব বিষয়ে যে যত চিন্তা করিবে, সে তত বুঝিবে। আমার ভালবাসাদি জানিবে ও সকলকে জানাবে ; আশা করি ডুরেণ্ডা, হিনু ও তোমাদের সকলকারই কুশল সমাচার।

Affectionately
Subodhananda

অবিদ্যালেশ

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য*

ব্রহ্মবিদ্যালাভ হইলে সঞ্চিত অর্থাৎ পরবর্তী জন্মে ফলপ্রদানে সমর্থ পাপ বা পুণ্য —যাবতীয় কর্মের বিনাশ হয়, ইহা শ্রুতি- ও স্মৃতি-সম্মত বলিয়াই বৈদান্তিক আচার্যগণ স্বীকার করেন।[১] এই বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা সঞ্চিত পাপের বিনাশক হইতে পারে ; কারণ ব্রহ্মবিদ্যা শাস্ত্রীয় বলিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপের বিরোধী হইবে। কিন্তু ধর্ম বা পুণ্য শাস্ত্রবিহিত হওয়ায় শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তাহার বিরোধ নাই। ব্রহ্মবিদ্যা যে সমস্ত পাপ নাশ করে—এই বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ। 'যথা পুষ্কর-পলাশে আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবম্ এবংবিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষ্যতে' (ছাঃ উঃ ৪।১৪।৩) অর্থাৎ জল যেমন পদ্মপত্রে সংশ্লিষ্ট হয় না, তেমনই পাপকর্ম ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিতে সংশ্লিষ্ট হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা পাপের বিনাশক—ইহা শ্রুতিতে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। 'তদ্ যথা ইষীকাতুলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হ অস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে' (ছাঃ উঃ ৫।২৪।৩)। ইহার অর্থ - মুঞ্জাঘাসের তুলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেমন নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়, তেমনই ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তির পাপ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও 'সর্বং পাপ্মানং তরতি, তরতি ব্রহ্মহত্যাম্' ইত্যাদি মন্ত্রে (তৈত্তিরীয় সঃ ৫।৩।১২।২) পরিষ্কারভাবে ব্রহ্মবিদের পাপক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম বা পুণ্য ব্রহ্মবিদ্যার

* ন্যায়-তর্ক-তর্ক-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। যাদবপুর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক। 'ক্ষণভঙ্গবাদ' ও 'মাধ্যমক-কারিকা' গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা।

১। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ (মুঃ উঃ ২।২।৮) ইহার অর্থ—কার্যকারণাত্মক পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং যাবতীয় সন্দেহ দুর হয় ও কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

বিরোধী নহে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ধর্মের বিনাশ করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান তাহার বিরোধী পাপের বাধক হইলেও ধর্ম ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী না হওয়ায় ইহাদের মধ্যে বাধ্য-বাধকভাব হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মবিদের সঞ্চিত পাপকর্মের ক্ষয় হইলেও পুণ্যকর্মের ক্ষয় না হওয়ায় কর্মফলভোগের জন্য পুনরায় জন্মও অনিবার্য হইবে। এই আপত্তির উত্তরে ব্রহ্মসূত্রকার বলেন—ব্রহ্মবিদ্যা পাপের ন্যায় পুণ্যকেও বিনাশ করে। 'উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি' (বৃহঃ উঃ ৪।৪।২২)—এই শ্রুতি স্পষ্টভাবেই পাপ-পুণ্য উভয়ের বিনাশ ঘোষণা করিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সঞ্চিত পাপ ও পুণ্য—উভয়েরই বিনাশ হওয়ায় প্রারব্ধ-ক্ষয়ের পর দেহপাত ঘটিলেই মুক্তি হইবে। (ব্রহ্মসূঃ ৪।১।১৪)

ফলপ্রদানে অপ্রবৃত্ত সঞ্চিত কর্মের ন্যায় ফলদানে প্রবৃত্ত অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্মও ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় না কেন ? —এই প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই করা যায়। কারণ 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি' (মুঃ উঃ ২।২।৮)—এই শ্রুতি ব্রহ্মবিদের অবিশেষে সকল কর্মনাশের কথাই বলিয়াছে। সুতরাং সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ—এই দ্বিবিধ কর্মনাশ হওয়াই সঙ্গত মনে হইতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের শ্রুতিও উভয়বিধ কর্মনাশের কথাই বলিয়াছে। 'উভে উ হ এব এষঃ এতে তরতি' (বৃহঃ ৪।৪।২২)। অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পুণ্য ও পাপ—এই উভয়কেই অতিক্রম করেন। সুতরাং প্রারব্ধ ও সঞ্চিত—এইরূপ বিশেষ বিভাগ না করিয়া সাধারণভাবে সমস্ত কর্মক্ষয় বর্ণিত হওয়ায় ব্রহ্মবিদ ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্মও ক্ষয় হইয়া যায়—এইরূপ ধারণা অবশ্যই হইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞান অবিদ্যার নিবৃত্তি করে বলিয়া অবিদ্যার কার্য কোন কর্ম—তাহা সঞ্চিত বা প্রারব্ধ যাহাই হউক না কেন—থাকিতে পারে না। এই আশঙ্কার সমাধান করিয়া ব্রহ্মসূত্রকার বলেন—জন্মান্তরে সঞ্চিত যে সমস্ত কর্মের ফল আরম্ভ হয় নাই এবং এই জন্মেও ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পূর্বে উৎপন্ন অনারব্ধফল কর্মসমূহ—এই উভয় প্রকার কর্মই ব্রহ্মজ্ঞান হইলে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যাহাদের ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, অথবা যে সমস্ত কর্মের অর্ধেক ফল ভোগ হইয়াছে এবং যাহাদের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ এই দেহ নির্মিত হইয়াছে সেই সমস্ত কর্ম ব্রহ্মজ্ঞান হইলে বিনষ্ট হয় না।[২] ইহার প্রমাণ ছান্দোগ্য-শ্রুতি। 'তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে' (ছাঃ ৬।১৪।২)। ইহার অর্থ—যতক্ষণ শরীর হইতে বিমুক্তি না ঘটে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মাত্মভাবপ্রাপ্তির বিলম্ব ততক্ষণ হইবে। কিন্তু শরীরপাত হইলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মোক্ষলাভের জন্য ব্রহ্মবিদেরও শরীরপাত পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য। ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পর প্রারব্ধ কর্ম অবশিষ্ট না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরপাতে বিলম্ব হইতে পারে না। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অব্যবহিত পরক্ষণেই মোক্ষলাভ হইত, শরীরপাতের জন্য বিলম্ব ঘটিত না। এইরূপ হইলে ছান্দোগ্য উপনিষদের পূর্বোল্লিখিত শ্রুতির যথার্থ

২। অনারব্ধকার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ। (ব্রহ্মসূঃ ৪।১।১৫)

ব্যাখ্যা হয় না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার পরেও মোক্ষলাভের জন্য শরীরপাত পর্যন্ত বিলম্বের কথা বলায় বুঝা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান প্রারব্ধ কর্মের নাশক হয় না।

এখানে পুনরায় আশঙ্কা হইতে পারে যে, নির্গুণ পরমাত্মার জ্ঞান অবিদ্যার বিনাশ করে; এই অবিদ্যাবিনাশই ব্রহ্মবিদ্যার স্বভাব, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা নিজশক্তিতেই যাবতীয় কর্ম বিনষ্ট করিবে; এই অবস্থায় কি কারণে প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ না হইয়া কেবল সঞ্চিত কর্মেরই বিনাশ হইবে? অগ্নি যেমন বীজের অঙ্কুর জন্মাইবার শক্তি বিনষ্ট করে, ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনই কর্মের ভোগজনক শক্তি নষ্ট করে। সুতরাং অগ্নির সংস্পর্শে সকল বীজই যেমন দগ্ধ হয়, তেমনই ব্রহ্মবিদ্যা হইলে সমস্ত কর্মই নষ্ট হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। অতএব প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট হইবে না, কেবল সঞ্চিত কর্মই নষ্ট হইবে—ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ইহার উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলেন—ব্রহ্মবিদ্ যে শরীর ধারণ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালাভ করেন, সেই শরীর ধারণের জনক অদৃষ্ট (ধর্ম)ও ব্রহ্মবিদ্যালাভের একটি কারণ। শুভাদৃষ্ট না থাকিলে ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযোগী দেহধারণই সম্ভব হইত না। সুতরাং শরীরধারণের জনক কর্ম নিজফল দান করিতে আরম্ভ করিয়াছে—ইহা মানিতেই হইবে। কর্ম নিজফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে আরব্ধ ফল সম্পূর্ণ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না—ইহাই নিয়ম। কুলালচক্র সবেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিলে মধ্যে যদি বাধা না পায়, তাহা হইলে বেগক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত ঘূর্ণনের নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা মিথ্যাজ্ঞান অপসারিত করিয়া অবিদ্যামূলক কর্মের উচ্ছেদ করিলেও কুলালচক্রের দৃষ্টান্ত অনুসারে বুঝা যায় যে, মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার আশু বিদূরিত হয় না, কিছুকাল পর্যন্ত (প্রারব্ধ ফল শেষ না হওয়া পর্যন্ত) তাহার অনুবর্তন ঘটে। অতএব তত্ত্বজ্ঞান হইলেও ব্রহ্মবিদের প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত শরীর ধারণ করিতেই হয়।[৩] আচার্য শঙ্করের অভিপ্রায় অনুসারে বলা যায় যে, যাহার ফল আরম্ভ হইয়াছে, এমন অনুকূল কর্মকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং যে কর্মকে আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে, ব্রহ্মবিদ্যা সেই কর্মকে বিনাশ করিতে পারে না। পুত্র যেমন পিতার বিনাশক হয় না, তেমনই প্রারব্ধের ফলভূত ব্রহ্মজ্ঞানও প্রারব্ধের বাধক হয় না। বিভিন্ন উপনিষদেও ইহার বর্ণনা আছে। ইন্দ্র-প্রজাপতি (ছাঃ ৮।৭), বসিষ্ঠ, উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্‌রূপে খ্যাত। ইঁহারা এবং অশ্বপতি (ছাঃ ৪।১১।৪), শাণ্ডিল্য (ছাঃ ৩।১৪।৪) প্রভৃতি সগুণ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিগণও প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত দেহ ধারণ করিয়াছেন—ইহা শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্যা আত্মাতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি মিথ্যাজ্ঞানের মূল কারণ অবিদ্যাকেই ধ্বংস করে; এইজন্য উপাদান না থাকায় প্রারব্ধও থাকিবে না—এই আশঙ্কা অমূলক। এখানে স্মরণ রাখা

৩। ন তাবৎ অনাশ্রিত্য আরব্ধকার্যং কর্মাশয়ং জ্ঞানোৎপত্তিঃ উপপদ্যতে। আশ্রিতে চ তস্মিন্ কুলালচক্রবৎ প্রবৃত্তবেগস্য অন্তরালে প্রতিবন্ধাসম্ভবাৎ ভবতি বেগক্ষয়প্রতিপালম্। অকর্ত্রাত্মবোধোঽপি হি মিথ্যাজ্ঞানবাধনেন কর্মাণি উচ্ছিনত্তি। (শাঙ্কর ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১৫)

প্রয়োজন যে, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবন্মুক্তের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে (গীতা ২অঃ ৫৫ শ্লোঃ-৭২ শ্লোঃ)। ব্রহ্মজ্ঞানের পরে প্রারব্ধক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মবিদের জীবিতকালকেই জীবন্মুক্তিদশা বলা হয়। ব্রহ্মজ্ঞান যাবতীয় কর্মের বিনাশক হইলে জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হইত না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অবিদ্যার বিনাশ হয় বটে, কিন্তু অবিদ্যার সংস্কার কিছুকাল থাকে। বৈদান্তিকগণ ইহাকে 'অবিদ্যালেশ' বলেন।

'অবিদ্যালেশ' সম্বন্ধে চিৎসুখাচার্য বলেন —ব্রহ্মজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥
(ঈশোপনিষৎ-৭)

অর্থাৎ যে সময় সমস্ত ভূতবর্গ আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে পরিদৃষ্ট হয়, তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি? অর্থাৎ তখন শোক মোহ থাকে না। 'যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ' (বৃঃ ৪।৫।১৫) অর্থাৎ যে অবস্থায় বিশ্বপ্রপঞ্চের সমস্ত আত্মস্বরূপে পর্যবসিত হয়, ইত্যাদি শ্রুতি সমস্ত দ্বৈতজগতের আত্মাতে লয় বর্ণনা করিয়া ইহাই বুঝাইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত দ্বৈতবুদ্ধি বিদূরিত করে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞান দ্বৈতবুদ্ধি বা মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মবিদ্যা যদি অবিদ্যার সম্পূর্ণ বিনাশ করে, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরধারণ কিরূপে সম্ভব? কারণ অবিদ্যা না থাকিলে তাহার কার্য দেহাদিও থাকিতে পারে না। অবিদ্যালেশ বা অবিদ্যা-সংস্কারের ফলেই ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরধারণ সম্ভব—ইহাও বলা যায় না, কারণ অবিদ্যার বিনাশক তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে অবিদ্যা বিনষ্ট হইবেই, অতএব অবিদ্যালেশ থাকিবারও কোন সম্ভাবনা নাই। সূর্যোদয় হইলে অন্ধকার সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, অন্ধকারের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না। যদি বলা হয় যে, প্রারব্ধ কর্মের ফলে সমুৎপন্ন শরীর তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞান প্রারব্ধ কর্ম বা তাহার কার্যকে বিনষ্ট করিতে পারে না বলিয়া অবিদ্যালেশ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলা যায় যে, যাবতীয় কর্মই অবিদ্যার কার্য বলিয়া অবিদ্যার বিনাশ হইলে তাহার কার্য থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তত্ত্বজ্ঞান যদি অবিদ্যাজনিত যাবতীয় কর্মকে বিনষ্ট করিতে না পারে, তাহা হইলে যেসমস্ত কর্ম অবিদ্যার বিনাশ হইলেও বিনষ্ট হইবে না, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ধ্বংস না হওয়ায় পারমার্থিক বা সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ যাহা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় না, তাহা তো সত্য বস্তু বা পারমার্থিক পদার্থ। সুতরাং প্রারব্ধ কর্ম যদি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাও বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে উহার বিনাশক অপর কিছুই হইবে না, ফলতঃ উহা আত্মার মত পারমার্থিক বস্তুরূপেই পরিগণিত হইবে। অতএব, 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'—এই শ্রুতি কোন বিশেষত্ব- বা তারতম্য-হীনভাবে সমস্ত কর্মের ক্ষয়কারকরূপেই আত্মজ্ঞানের নির্দেশ করায় অবিদ্যালেশ সিদ্ধ হইতে পারে না। এইভাবে প্রথমতঃ অবিদ্যালেশের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষ প্রদর্শন করিয়া চিৎসুখাচার্য ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, অবিদ্যালেশ বলিলে কি বুঝা যায়, তাহাই প্রথমে আলোচ্য। অবিদ্যার একদেশ বা অংশবিশেষকে অবিদ্যালেশ বলা চলে না, কারণ অবিদ্যা ঘট প্রভৃতির মত

সাবয়ব বস্তু নহে ; সুতরাং তাহার একদেশ কল্পনা করা যায় না। যদি অবিদ্যার একটি অন্যবিধ প্রকারকে অবিদ্যালেশ বলা হয়, তাহা হইলেও মূল অবিদ্যার নিবৃত্তি ঘটিলে তাহার অন্য একটি প্রকারও থাকিবে না। পুনরায় যদি বলা হয় যে, যেমন রজ্জুসর্পের নিবৃত্তি হইলেও মিথ্যাসর্পদর্শনজনিত ভয় হইতে উৎপন্ন শরীরের কম্পন প্রভৃতি কিছুক্ষণ থাকে, তেমনই অবিদ্যানিবৃত্তি হইলেও অবিদ্যাজনিত সংস্কারের ফলেই প্রারব্ধ কর্ম তাহার ফল পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত থাকিবে, সুতরাং অবিদ্যাসংস্কারকেই অবিদ্যালেশ বলা চলে এবং এইরূপ অবিদ্যাসংস্কার কুলালচক্রের দৃষ্টান্তের সহিতও সামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহা হইলেও অবিদ্যালেশ সিদ্ধ হইবে না। কারণ অবিদ্যার সংস্কার অবিদ্যা হইতেই উদ্ভূত বলিয়া উহা অবিদ্যার কার্য। কারণ না থাকিলে কারণাশ্রয়ী কার্যও থাকে না। মৃত্তিকা না থাকিলে মৃত্তিকানির্ভর ঘটও থাকিতে পারে না। সুতরাং অবিদ্যাসংস্কার অবিদ্যাশ্রয়ী কার্য হওয়ায় অবিদ্যার বিনাশ হইলে অবিদ্যাসংস্কারও থাকিবে না। সুতরাং 'অবিদ্যালেশ' বলিলে কি বুঝা যায়, তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন। চিৎসুখাচার্য বলেন —সংসারের কারণীভূত মূল অবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে এক হইলেও তাহার বিবিধ আকার অনুভবসিদ্ধরূপে স্বীকার করিতে হয়। যেমন—বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্যত্ববোধনামক বৈদান্তিকসম্মত ভ্রমজ্ঞানের কারণীভূত অবিদ্যার একটি আকার রহিয়াছে। আবার প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তুর অর্থক্রিয়াকারিত্ব বা প্রয়োজন-নির্বাহসামর্থ্যের কল্পনাকারী অবিদ্যার দ্বিতীয় একটি আকার আছে। তৃতীয়তঃ লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে বস্তুর কল্পনাকারী অবিদ্যার আকার রহিয়াছে।[৪] ব্রহ্মাদ্বৈতজ্ঞান জন্মিলে সমস্ত দ্বৈতবুদ্ধির বিলোপ ঘটে, ইহা যুক্তি- এবং অনুভব-সিদ্ধ। সুতরাং অবিদ্যার পূর্বোক্ত ত্রিবিধ আকারের মধ্যে ব্রহ্মাদ্বৈতজ্ঞান সমস্ত প্রপঞ্চের সত্যতা-কল্পক প্রথম আকারের নিবৃত্তি করে। বিশ্ব-প্রপঞ্চের উপাদান মায়া নামক অবিদ্যার দ্বিতীয় আকার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে বিনষ্ট হয়। কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়রূপে জাগতিক বস্তুর প্রতিপাদক অবিদ্যার তৃতীয় আকারটি অবিদ্যালেশ নামে অভিহিত হয়। —(অপরোক্ষপ্রতিভাসযোগ্যার্থাভাসজনকস্তু মায়ালেশঃ—তত্ত্বপ্রঃ ৪র্থ পরিঃ ৬০৭ পৃঃ)। এই অবিদ্যালেশ সমাধি-অবস্থায় তিরোহিত থাকে, কিন্তু ব্যুত্থান-দশায় আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরও ব্যাবহারিক জীবনযাত্রা সম্পাদন করে। সুতরাং জীবন্মুক্ত পুরুষের অবিদ্যালেশ বর্তমান থাকে এবং প্রারব্ধকর্ম-ফলভোগের সহায়ক হয়। (জীবন্মুক্তস্যানিবৃত্তঃ সমাধ্যবস্থায়াং তিরোহিতঃ অন্যদা দেহাভাস-জগদাভাসহেতুতয়া অনুবর্ততে। —তত্ত্বপ্রঃ ৪র্থ পরিঃ ৬০৭ পৃঃ) এইরূপ অবিদ্যার আকার—যাহা অবিদ্যালেশ নামে অভিহিত হয়—প্রারব্ধকর্মের ফলপরিসমাপ্তির সহিত নিবৃত্ত হয়। প্রারব্ধকর্মের ফলভোগ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই

৪। সংসারমূলকারণভূতা অবিদ্যা যদ্যপি একৈব, তথাপি তস্যাঃ সন্ত্যেব বহবঃ আকারাঃ। তত্র একঃ প্রপঞ্চস্য সত্ত্বভ্রমহেতুঃ, দ্বিতীয়ঃ অর্থক্রিয়াসমর্থবস্তুকল্পকঃ, তৃতীয়স্তু অপরোক্ষপ্রতিভাসবিষয়াকারকল্পকঃ। (তত্ত্বপ্রদীপিকা ৪র্থ পরিঃ ৬০৬-৭ পৃঃ)

অবিদ্যালেশের নিবৃত্তি হয় না ; তাহার কারণ —প্রারব্ধ অবিদ্যালেশনিবৃত্তির প্রতিবন্ধক। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে শরীর ধারণের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, সেই জন্মেই যে ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী কর্মসাধন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইবে—ইহাও প্রারব্ধনির্দিষ্ট। প্রারব্ধের ফলেই ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী পবিত্র ও সুগঠিত দেহলাভ করিয়া যথোপযুক্ত অনুষ্ঠানাদির ফলে যোগী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। তাঁহার যদি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রারব্ধ না থাকিত, তাহা হইলে কোনক্রমেই এইজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইতনা ; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানও প্রারব্ধেরই ফল। এই জন্যই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সহায়ক কর্মাদির সহিত প্রারব্ধ কর্মের বিরোধ নাই। অনুকূল প্রারব্ধ না থাকিলে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত ব্যাপারও ভোগরূপ ফলই জন্মাইবে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীরারম্ভক প্রারব্ধের ভিত্তিতেই জ্ঞানজনক কর্ম প্রকৃত ফল দান করে বলিয়া প্রারব্ধই অবিদ্যালেশকে বিনষ্ট হইতে দেয় না। প্রারব্ধ শেষ হইলে প্রতিবন্ধক দূর হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান অবিদ্যালেশের নিবারক হয়। যদিও অবিদ্যাই সমস্ত কর্মের মূলীভূত কারণ, তথাপি অবিদ্যার নিবর্তক ব্রহ্মজ্ঞানেরও কারণ প্রারব্ধ ফলোন্মুখ অবস্থায় বিদ্যমান থাকায় মূল অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধের বিনাশ হইবে না। কোনও ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করিয়াই নিজে মরিয়া গেলেও তাহার নিক্ষিপ্ত তীর সঞ্চারিত গতিবেগের ফলে যথাস্থানে যাইবেই, নিক্ষেপকারী নাই বলিয়া তীরের গতিক্রিয়া বন্ধ হইবে না। এখানে একটি আপত্তি হইতে পারে যে, প্রবৃত্ত-ফল কর্মের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ অবিদ্যালেশ বিনষ্ট হইবে না ; অন্যদিকে অবিদ্যালেশ বিনষ্ট হয় না—ইহা সিদ্ধ হইলেই প্রারব্ধের প্রতিবন্ধকতা সিদ্ধ হয়, ইহা একটি দোষ অর্থাৎ অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয়। ইহার উত্তরে চিৎসুখাচার্য বলেন—'ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ'। (শ্বেঃ উঃ ১।১০) অর্থাৎ পরিশেষে পুনরায় সমস্ত মায়ার নিবৃত্তি ঘটে ; —এই শ্রুতিদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও জ্ঞানশক্তির প্রতিবন্ধক প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হইলে প্রতিবন্ধকশূন্য তত্ত্বজ্ঞান অবশিষ্ট অবিদ্যালেশকেও নিবৃত্ত করে। শ্রুতিতে 'ভূয়ঃ' অর্থাৎ পুনরায় নিবৃত্তির কথা থাকাতেই ইহা বুঝা যায়। সুতরাং এই শ্রুতির সহিত 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি' এই শ্রুতির একবাক্যতা করিয়া অর্থ নির্ধারণ করিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, প্রারব্ধকর্মভিন্ন অন্যান্য কর্মই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে প্রথম বিনষ্ট হয়। 'তস্য তাবদেব চিরং'—অর্থাৎ 'ব্রহ্মজ্ঞানীর পরিপূর্ণভাবে ব্রহ্মপ্রাপ্তির ততক্ষণ বিলম্ব ঘটে'—ছান্দোগ্য উপনিষদের এই শ্রুতিও উক্ত প্রকার অর্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।[৫]

এই বিষয়ের তাৎপর্য এই যে, অদ্বৈত-

অবিদ্যালেশশব্দেন মোহাকারান্তরোক্তিতঃ।
জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধাচ্চ প্রবলারব্ধকর্মভিঃ ॥
লেশানুবৃত্তৌ তজ্জন্যকর্মাদেরনুবৃত্তিতঃ।
উৎপন্নাত্মাববোধস্য জীবন্মুক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥
(তত্ত্বপ্রদীপিকা, ৪র্থ পরিঃ, ১০-১১ কারিকা)

বেদান্তমতে অবিদ্যার দুইটি শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি ব্রহ্মকে আবৃত করিয়া রাখে বলিয়া সাধারণ মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। অতএব অজ্ঞাত রজ্জু যেমন সর্পভ্রমের কারণ হয়, সেইরূপ অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মই জগদ্ভ্রমের কারণ। বিক্ষেপশক্তি সেই আবৃত ও অজ্ঞাত ব্রহ্মে অনির্বাচ্য জগৎ সৃষ্টি করে। অতএব অবিদ্যার এই বিক্ষেপশক্তিই জগতের উপাদান কারণ হওয়ায় সঞ্চিত ও প্রারব্ধ কর্মেরও উপাদান। 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই আকারের বৃত্তি উদিত হইলে এই দ্বিবিধশক্তিযুক্ত অবিদ্যা বাধিত হয়। কিন্তু বিক্ষেপশক্তির কার্য প্রারব্ধ কর্ম তখন ফলপ্রদরূপে ক্রিয়াশীল থাকায় নিষ্ক্রিয় সঞ্চিতকর্ম অপেক্ষা প্রবল থাকে বলিয়া মাতৃ-হত্যায় পুত্রকর্তৃক বাধাদানের মত ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ বিক্ষেপশক্তির বিনাশে বাধা দান করে। ফলে বিক্ষেপশক্তির অংশবিশেষ বিনষ্ট না হইয়া থকিয়াই যায়। বিক্ষেপশক্তির এই অংশবিশেষই অবিদ্যালেশ। 'পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮) —'এই পরমাত্মার অসাধারণ ও বিবিধশক্তি প্রসিদ্ধ'—এই শ্রুতি অনুসারে বিক্ষেপশক্তির নানা অংশ স্বীকৃত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও বিক্ষেপশক্তির অংশবিশেষ প্রারব্ধ কর্মের প্রতিবন্ধকতার ফলে তখনই বিনষ্ট হয় না, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ শেষ হইলে প্রারব্ধ ক্ষয় হওয়ায় প্রতিবন্ধক না থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই বিপেক্ষশক্তির সেই অংশ বিনষ্ট হয়। বিক্ষেপশক্তির এই অংশবিশেষ বেদান্তশাস্ত্রে অবিদ্যালেশ, অবিদ্যাসংস্কার, মায়ালেশ, অজ্ঞানলেশ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।

এখানে প্রশ্ন হইতে পরে—প্রারব্ধক্ষয় হইলে অবিদ্যালেশ স্বয়ং নিবৃত্ত হয়? অথবা নূতনভাবে উদিত ব্রহ্মজ্ঞান উহাকে নাশ করে? অবিদ্যালেশের স্বয়ং নিবৃত্তি স্বীকার করিলে নিমিত্তব্যতীত নিবৃত্তি স্বীকৃত হওয়ায় নির্নিমিত্ত নিবৃত্তি মানিতে হয়। কিন্তু ইহা সিদ্ধান্তবিরোধী। কারণ নির্নিমিত্ত অবিদ্যা-লেশ-নিবৃত্তি স্বীকার করিলে তুল্যযুক্তিতে মূল অবিদ্যার নিবৃত্তিও কারণব্যতীতই হইতে পারে। অতএব স্বয়ংনিবৃত্তিপক্ষ গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রথমে যে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মাকারা বৃত্তিদ্বারা অভিব্যক্ত ছিল। ঐরূপ বৃত্তিই ব্রহ্মাবরক অজ্ঞানের নিবর্তক। সুতরাং সেই বৃত্তি প্রারব্ধক্ষয়ের পরে বর্তমান না থাকায় অবিদ্যালেশ-নিবৃত্তিরও কারণ নাই। এইজন্য প্রারব্ধক্ষয়ের সমকালেই পুনরায় উদিত 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই আকারের চরম বৃত্তি অবিদ্যা-লেশের নিবৃত্তি করে—ইহা কোন কোন বৈদান্তিকগণ[৬] স্বীকার করেন। 'ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ'—এই শ্রুতি অনুসারেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপ চরমবৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। সংক্ষেপশারীরকের মতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই আকারের বৃত্তিদ্বারা অভিব্যক্ত স্বরূপচৈতন্য নিত্য স্বপ্রকাশ বলিয়া তাহার অনুবর্তন চলিতেই থাকে। ইহার নাম 'বিদ্যাসন্ততি'। এই বিদ্যাসন্ততিই প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধকের ক্ষয় হইলে স্বাভাবিকভাবেই অবিদ্যালেশ নিবৃত্ত করে। (সংক্ষেপ-শারীরক ৪।৪০ কাঃ দ্রষ্টব্য)।

এই বিষয়ে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধিতে যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ অলোচনা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ সম্ভব নহে।

৬। প্রকটার্থকার।

ধর্মবিশ্বাসের বৈধতা

ডক্টর শিবপদ চক্রবর্তী*

ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিবাদ রয়েছে চিরকাল। তবু মানুষের জীবনে, তার সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণায়, যুগ যুগ ধরে, কোন না কোন ভাবে ঈশ্বর-প্রত্যয় রয়ে গেছে। যিনি ঈশ্বর-বিরোধী, তাঁরও ঈশ্বর-ভাবনা থাকতে আপত্তি নেই, যদিও তিনি ঐ প্রত্যয়ের বৈধতা বা প্রামাণ্য স্বীকার করবেন না। এই ঈশ্বর-প্রত্যয় কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি; যেমন, 'ঈশ্বর অস্তিত্ববান, জগতের সৃষ্টি ও পালন-কর্তা'; 'ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান'; 'ঈশ্বর অনন্ত, সর্বব্যাপী, মঙ্গলময়' ইত্যাদি। ধার্মিক ব্যক্তিরা এই বাক্যগুলির সত্যতায় অচল আস্থা রাখেন আর এই বিশ্বাসকেই 'ধর্ম-বিশ্বাস' বলা যায়। এই প্রবন্ধে এই বাক্যগুলির বৈধতা বিচার করব।

ঈশ্বরপ্রেমী মানুষেরা যে এই বাক্য-গুলিকে বৈধ বা নিশ্চয়াত্মক মনে করেন তাই নয়, তাঁরা বিশ্বপ্রকৃতির এমনই একটা সুসংহত ব্যাখ্যা রচনা করেন যে, ঐ বাক্য-গুলির বক্তব্য কখনও মিথ্যা হতে পারে না। এঁরা অনুকূল যুক্তিতর্কের সাহায্যে নাস্তিকের আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করেন।

অবশ্য যুক্তি যদি অমোঘ হ'ত, তবে একটি বা একধারার যুক্তিই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারত। কিন্তু সব ঈশ্বরপ্রেমীরাই যে একই যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন এমন নয়। তাই মনে হয় যেন কোন যুক্তিই ধর্মবিশ্বাসের বৈধতা-স্থাপনে পর্যাপ্ত নয়। উদাহরণ-স্বরূপে 'অমঙ্গলের সমস্যার' উল্লেখ করা যেতে পারে। নাস্তিকেরা বলতে চান যে, 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময়'—এই তথাকথিত সত্যের সঙ্গে 'বিশ্বপ্রকৃতি অমঙ্গল আর দুঃখ-বিজড়িত' এই সত্যের অসঙ্গতি রয়েছে। ঈশ্বর-প্রেমীরা ঐ সঙ্গতি রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। কোন কোন ঈশ্বর-বিশ্বাসী দার্শনিক বলেন যে, আমাদের জীবনে দুঃখকষ্ট বিপৎপাতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে—বাধা-বিপত্তি জয়ের মধ্য দিয়েই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করতে হয়।

'আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছু নাহি ঢালে।'

কিন্তু পরিবারে অকালমৃত্যু, রেল ও বিমান দুর্ঘটনা, খাদ্যে বিষক্রিয়া, ব্যাধি ও বন্যা যে কি ভাবে আমার মনুষ্যত্বলাভের সহায়ক হয়, তা আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যায় না।

তাই অন্যেরা বলেন যে, দুঃখকষ্ট আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে বাস্তব হলেও, অসীম ব্রহ্মদৃষ্টিতে একান্তই অলীক—

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যতদূরে আমি ধাই।
কোথাও দুঃখ কোথায় মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই॥'

কিন্তু যে ভাগ্যহত ব্যক্তি সংসারজ্বালায়, নানারকমের কায়িক-মানসিক দুঃখভোগে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আত্মহননের কথা ভাবে তাকে যদি এই বলে সান্ত্বনা দেওয়া হয় যে তার দুঃখ চরমতম দৃষ্টিতে অলীক, তবে তা পরিহাসেরই সামিল।

---

* এম. এ, ডি. লিট্। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান।

আবার অন্য দার্শনিকদের সমাধান হ'ল, ঈশ্বর মঙ্গলময় ঠিকই, কিন্তু সর্বশক্তিমান নন। তিনি কেবল মঙ্গলের জনক, অমঙ্গলের নন। এই 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' ভাবটি কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দেয়। তাই শেষ পর্যন্ত অন্যেরা যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে নির্বিচার 'বিশ্বাসে' ফিরে যেতে চান আর বলেন যে, মানুষের সীমিত জ্ঞানশক্তি অপার সৃষ্টিরহস্যের অবগুণ্ঠন মুক্ত করতে একান্তই অপারগ। অতএব ঈশ্বরপ্রসঙ্গে যুক্তি-বিচারের অসারতাই দেখা যায়। মহা-নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য তাঁর 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে যে অদৃষ্টের নিয়ন্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন, গঠনপারিপাট্যে ও সদ্‌যুক্তি-সৌকর্যে তা ত্রুটিহীনতার কাষ্ঠাপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ সত্ত্বেও এ যুক্তির প্রাণ নেই—এদের পূর্ণতা কলঙ্কখিন্ন শশাঙ্কের মতো।

সুতরাং ঈশ্বর-সম্পর্কিত বাক্যগুলির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণায়ক কোন পদ্ধতি নেই—না প্রত্যক্ষ, না যুক্তিপ্রমাণ। এই বাক্যগুলির কোন সত্য-মিথ্যা অর্থ নেই। 'আমার কলমটি কালো রঙের'—এই বাক্যটির সত্য-মিথ্যা অর্থ রয়েছে; কেননা এর সত্যতা-মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের পদ্ধতি রয়েছে। এদিক থেকে 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং মঙ্গলময়' এ বাক্যের সত্য-মিথ্যা অর্থ নেই, আর তাই এ বাক্যের সঙ্গে 'সংসার দুঃখময়' এ বাক্যের কোন অসঙ্গতিও নেই। অসঙ্গতি থাকতে হ'লে দুই বাক্যকেই সত্য বলে ভাবতে হবে; অথচ দ্বিতীয়টি যদি বা সত্য, প্রথমটি সত্য-মিথ্যা কিছুই নয়। এ ক্ষেত্রে নাস্তিক-আস্তিক উভয়পক্ষই বিভ্রান্ত, কেননা তাঁরা দুটি বাক্যকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন।

যে সব দার্শনিক ঈশ্বর-বিষয়ক বাক্যের সত্য-মিথ্যা অর্থ নেই বলতে চান, তাঁদের মতে এ বাক্যগুলির নির্দেশ থাকে সংকল্প-গ্রহণ ও মূল্য-নির্বাচনের মধ্যে। এই মতে সজ্জন ব্যক্তিরা, এসব বাক্যের সাহায্যে, এক বিশেষ ধরনের নৈতিক সদাচরণের সংকল্প ব্যক্ত করে থাকেন। আক্ষরিক অর্থে এরা ঈশ্বরবোধক হলেও, প্রকৃতপক্ষে এদের ব্যঞ্জনা থাকে সংকল্পগ্রহণে। 'আমি এটা করব' প্রভৃতি সংকল্পবোধক বাক্য সত্য-মিথ্যা হয় না—অনুসৃত বা অননুসৃত হতে পারে মাত্র। যখন বলি যে 'ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা; তিনি কলুষহীন, মঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান', তখন প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ ধরনের নৈতিক জীবন-যাপনের সংকল্পই প্রকাশ পায়। এই সংকল্প কল্যাণকর কর্মের উপাদেয়তা স্বীকার করে।

উপরোক্ত মতের সম্পূর্ণ বিরোধিতা না করেও হয়তো বলা যায় যে, ধর্মবিশ্বাস-বোধক বাক্যগুলিকে নিছক বিধিবাক্যরূপে ব্যবহার করলে বিভ্রান্তি হবার কথা। এই বাক্যগুলির প্রতিপাদ্য ফল হয়তো কোন নৈতিক বিধি বা সংকল্পের অনুমোদন করা; কিন্তু এদের মুখ্যার্থ যে সংকল্পবোধক এমন মনে করা সঙ্গত নয়। 'আমি সদাচরণ করব' যে মুখ্যার্থে সংকল্পবোধক, 'ঈশ্বর মঙ্গলময়' বা 'মঙ্গলের মূল্য অপরিসীম' সেই মুখ্যার্থে অবশ্যই সংকল্পবোধক নয়। ধর্ম-প্রাণ মানুষেরা ধর্মবিশ্বাসবোধক বাক্যগুলিকে 'সত্য'ই বলেন; নাস্তিকেরা বলেন 'মিথ্যা'। উপরের মতটি এই সাধারণ অনুভবের অপলাপ করে থাকে। মানুষ শুভাশুভ-নির্বাচন বা সংকল্পগ্রহণের কিছু যুক্তি খোঁজে। ধর্মবিশ্বাসবোধক বাক্যগুলি ঐ যুক্তি—নিছক সংকল্প নয়। বাঙালীর দুর্গামূর্তি এক অর্থে হয়তো আমাদের অশুভদমনের

সংকল্প এবং শক্তি, বীর্য, সিদ্ধি, বিদ্যা ও সম্পদ লাভের সংকল্পকে রূপায়িত করে; তবু ধার্মিকের জীবন কেবলমাত্র সংকল্পগ্রহণ নয়।

ঈশ্বর-সম্পর্কিত বাক্যগুলির প্রত্যক্ষ বা অনুমানগম্য অন্যান্য বাক্যের মতো সত্য-মিথ্যা অর্থ না থাকলেও, অন্যভাবে তাদের বৈধ বা যুক্তিযুক্ত ভাবা যেতে পারে। ঈশ্বর-সত্তাকে যদি অপার্থিব বা অতীন্দ্রিয় মনে করি, তবে সেই সত্তা বিশ্বাতিবর্তী হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি ঐ সত্তাকে বিশ্বান্তর্বর্তী বা অন্তর্যামী রূপে ভাবা যায়, তা হলে তা এক ধরণের প্রত্যক্ষ-যোগ্যতা লাভ ক'রে বাস্তব বলেও গণ্য হতে পারে। বিশ্বান্তর্ভাবী এই বাস্তব সত্তারই একটি প্রতীক বা কল্পচিত্র হলো অপার্থিব ঈশ্বর। 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, অপহত-পাপ, মঙ্গলময় সৃষ্টিকর্তা' প্রভৃতি বাক্যকে যদি কোন বিশ্বলীন ঐশী-সত্তার প্রতীকায়িত বর্ণনা বলে মনে করি, তা হ'লে এরা এক রূপকার্থে বৈধ হতে পারে। এরা একেবারে ভিত্তিহীন বাক্য নয়।

জগতে প্রায় সব মহাপুরুষেরাই প্রকৃতির মধ্যে লীন ঐশী সত্তার প্রত্যক্ষ-যোগ্যতা স্বীকার করেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ এঁদের অন্যতম। এ প্রত্যক্ষ অবশ্য সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক অর্থে প্রাকৃত বিষয়ের পর্যবেক্ষণ নয়—এ একপ্রকার মরমী সাক্ষাৎকার। যন্ত্রাদির সাহায্যে বাস্তবের মাত্রা পরিমাপ ক'রে বৈজ্ঞানিক যে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করেন, তা সাধারণ পর্যবেক্ষণের তুলনায় খানিকটা বিমূর্ত; সাধারণ প্রত্যক্ষে উপলব্ধ প্রকৃতির অনেক ঐশ্বর্য তাতে বাদ পড়ে যায়। আলোকতরঙ্গ বা বায়ুতরঙ্গের কম্পনাঙ্ক এক নির্দিষ্ট সময়ে কতবার হ'ল, তা গাণিতিক উপলব্ধির বিষয় ও একান্তই দেশ-কাল মাত্রাগত সাধারণ পর্যবেক্ষণে ঐ দেশ-কালের চতুর্মাত্রা ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত মাত্রা প্রকাশ পায়। এখানে কেবল বায়ুতরঙ্গের কম্পনাঙ্ক নয়—ললিত সঙ্গীতকলার মূর্চ্ছনা! কেবল আলোকের স্পন্দন নয়—সূর্যাস্তের বর্ণাঢ্য সমারোহ! সাধারণ পর্যবেক্ষণ কিছুটা অস্পষ্ট হলেও, যতটা জটিল ও প্রাণবন্ত, বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণ ততটা নয়।

দেশ-কালের চতুর্মাত্রা ছাড়াও সাধারণ পর্যবেক্ষণে এবং সীমিত পরিবেশে ধরা দেয় বাস্তবের এক অতিরিক্ত, নবীন মাত্রা; আর ঐ মাত্রা হল সৌন্দর্য বা 'রস'। সমুদ্রের বিশাল বিস্তার, আকাশের গায়ে তুষারমৌলি হিমালয়ের পরিলেখ, সুবকরোজ্জ্বল বনস্থলীর সমারোহ প্রকাশ করে 'বাহার', 'আনন্দ' বা 'সুন্দর'কে। সহৃদয় দর্শকের কাছে এই রস পরিদৃশ্যমান বাস্তব, যদিও বিজ্ঞানীর বিমূর্ত পর্যবেক্ষণে তা অনুপস্থিত। ঠিক এইভাবে কোন বিশেষ সীমিত বাস্তব পরিবেশে 'কল্যাণ-অকল্যাণ' মাত্রাও প্রকাশ পেতে পারে। যেখানে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু উদার, যা কিছু মহান বা পরার্থে আত্মত্যাগ সেখানেই কি ঈশ্বরের ছোঁয়া নেই—নেই তাঁর সীমিত ইঙ্গিত? রসের আস্বাদনকে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলা হ'য়েছে; কেননা সীমিত পরিবেশের মধ্যে এখানে ঐশ আবির্ভাব। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির এক অসাধারণ পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে যে চতুর্মাত্রাতিরিক্ত দিব্যমাত্রা তারই নাম আনন্দঘন চৈতন্যসত্তা। সেই বিশ্বলীন চৈতন্যসত্তাকেই কেউ কেউ 'ঈশ্বর' বলেন। এখানে সীমাবদ্ধ প্রকৃতির পর্যবেক্ষণে অসীমের দিকে প্রয়াণের সম্ভাবনা থাকে। ঐ সীমাহীন সমগ্রের অনুভবে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একই কেন্দ্রে বিধৃত।

অবশ্য সকলেই যে এই চৈতন্যময় দিব্য উপস্থিতি গ্রহণ করতে পারবে, এমন কথা নেই। রসবোধের বেলাতেও তো সেই কথা—তার জন্য লাগে সহৃদয়তা। তেমনি যিনি সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির দ্বারা এক বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হবেন, তিনি জগতের অন্তর্ভাবী চৈতন্যকে পাবেন, নিজের অন্তরে আর বাইরে। 'বড় আমি', 'ছোট আমি'র থেকে দূরে নয়—আভাসে ইঙ্গিতে তার উপস্থিতি 'টের' পাওয়া যায়। যিনি 'টের' পাবেন না, তিনি নাস্তিক; তবু তাঁর অবিশ্বাসে কোন ফাঁকি নেই, তাঁর মরমী দৃষ্টি নেই, এই পর্যন্ত কেবল বলা যায়।

জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে কেবল বিষয়ের জ্ঞান পাই বিজ্ঞানে—বিজ্ঞানের সত্যগুলি নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিচেতনা-সমন্বিত সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অন্তর্লীন চেতনসত্তার দিব্য উপস্থিতি ধরা পড়েছে কবিগুরুর মরমী-দৃষ্টিতে—

'...যে বিরাট গূঢ় অনুভবে/রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে/আলোক বন্দনা মন্ত্র জপে—আমার বাঁশিরে রাখি/ আপন বক্ষের পরে তারে আমি পেয়েছি একাকী/হৃদয়কম্পনে মম।'

কোন ধাঁধার ছবিতে প্রথমেই যে শিশুমুখগুলি পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না, একটু মনোযোগ দিলেই সেগুলি ফুটে উঠতে থাকে। এই বিশ্বপ্রকৃতিও ঐ ধাঁধার ছবির মতো। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে যার অস্তিত্ব খুঁজে পাই নে, সামগ্রিক সত্তার অনুভবে তাকেই দেখা যায়। তখনকার পর্যবেক্ষণে যে নূতন মাত্রার সংযোজন হয়, তাকে অবাস্তব বলা যায় কি? এই সংযোজনে বোঝা যায়—

'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।'

অবশ্য এই চৈতন্য বা আনন্দের পৃথগুপন্যাস করা সহজ নয়—তার জন্য ঋষিদৃষ্টির প্রয়োজন।

যিনি বিশ্বলীন এই নিরাকার আনন্দঘন চৈতন্যের অস্তিত্ব টের পান, তিনি এর পৃথগুপন্যাস করতে গিয়ে একে এক প্রতীকী রূপ দেন। তখন নিরাকার হয় সাকার, অরূপ হয় রূপবান; আর তখনই এই অনন্ত রূপবানের সান্নিধ্যলাভের আকূতি থেকে ঈশ্বরোপাসনার জন্ম হয়। ধর্মবিশ্বাসবোধক বাক্যগুলি রচিত হয় এই প্রতীক বা রূপককে আশ্রয় করে। এভাবেই রচিত হয় অতীন্দ্রিয়, অপার্থিব বিশ্বাতিবর্তী ঈশ্বরের কল্পনা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, মঙ্গলময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান বলে বর্ণিত হন। আক্ষরিক অর্থে এ বাক্যগুলির সত্য-মিথ্যা অর্থ নেই। কিন্তু এদের রূপকার্থ গ্রহণ করলে এদেরকে একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় না। এদের পশ্চাতে রয়েছে জগদনুস্যূত চৈতন্যের দিব্যানুভূতি আর ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক বা রূপকগুলি ঐ অনুভূত বাস্তবের নির্দেশক হয়ে বৈধ হতে পারে। আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীরা ধর্মবিশ্বাসের কিছুটা মর্যাদা দিলেও, শেষপর্যন্ত আক্ষরিক অর্থে একে গ্রহণ করেন নি। ঈশ্বর-সম্পর্কিত বাক্যগুলি রূপকধর্মী বলে এদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা অসঙ্গতি থাকা আশ্চর্য নয়। একথা হয়তো স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বরোপাসনায় চিত্তমল পরিশোধিত হয়ে মানুষ আধ্যাত্মিকতার অনেক ঊর্ধ্বস্তরে উন্নীত হতে পারে। তবে ধর্মবিশ্বাসবোধক বাক্যগুলির প্রতীকী-রূপ ত্যাগ না করলে আকাঙ্ক্ষিত মার্গ লাভ করা যাবে না। প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মের অনুভূতিতেই মানুষের

পরাগতি আর ঐ অনুভূতিই হ'ল ধর্মীয় জীবনের ও বিশ্বাসবোধক বাক্যগুলির সুদৃঢ় মূলভিত্তি।

ঈশ্বরপ্রেমী ভক্ত কখনো কখনো 'পথিক', 'তীর্থযাত্রী', 'পরিব্রাজক'-রূপে কল্পিত হয়েছেন, যেন কোন দুর্গম পর্বতগাত্রে রক্ষিত ইষ্টলাভের জন্য তাঁর ঘোরাঘুরি! অথচ বিশ্বলীন অন্তর্যামী তো আমার মধ্যেই—তাঁকে পরিস্ফুট করার নানারূপ প্রচেষ্টাই এই 'পথিকের' ধারণায় প্রতীকায়িত হয়েছে। তেমনি যখন গাই, 'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হলো, পার কর আমারে', তখন ভবসাগর-পারের এই কাণ্ডারী বিশ্বাতিবর্তী ঈশ্বর; আর আমরা দেখেছি যে এই ধারণাটি বিশ্বলীন চৈতন্যের প্রতীকমাত্র। 'স্বর্গ' 'নরক' প্রভৃতি কল্পনা যে প্রতীক বা রূপকধর্মী, তা বোধ হয় যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করবেন। এ সব কারণে আমার মনে হয় যে, ধর্মীয় বাক্যগুলি নিছক কল্পনা-বিলাস নয়, অথচ আক্ষরিক অর্থে সত্য-মিথ্যাও নয়। এগুলি কোন এক দিব্য-প্রকাশের রূপকধর্মী বর্ণনামাত্র।

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যধারায় ওড়িয়া কবিদের অবদান

ডক্টর বিষ্ণুপদ পাণ্ডা*

আপন মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন স্বদেশীয় বা বিদেশীয় ভাষায় কাব্যরচনার নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে সবই কবিদের ব্যক্তিগত প্রয়াস। সমষ্টিগতভাবে প্রায় চার'শ বছর ধরে ভিন্ন একটি ভাষায় কাব্য-রচনার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেল। বর্তমান যুগে বিজ্ঞান আর কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে বিস্ময়জনক বহু আবিষ্কার আমাদের দীর্ঘ-সঞ্চিত ধ্যানধারণাকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করে দিচ্ছে। ঠিক সেই পরিমাণে না হলেও, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু আবিষ্কার আমাদের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবেই প্রভাবিত করছে। উড়িষ্যা সরকারের প্রদর্শ-শালার পুঁথিবিভাগে আবিষ্কৃত কিছু পুথি এর একটি বিশিষ্ট উদাহরণ।

এই পুথিবিভাগে প্রায় শতাধিক এমন বাংলা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, যেগুলি ১৬শ থেকে ১৯শ শতক কালসীমার মধ্যে ওড়িয়া কবিদের রচনা। পুথিগুলি সবই তালপাতায় ওড়িয়া হরপে লেখা। এই পুথিগুলির বিষয়নির্ভর শ্রেণীবিন্যাস করলে দেখা যায় যে, এগুলির অধিকাংশই কৃষ্ণলীলা-সম্পর্কিত। এ ছাড়া পৌরাণিক দেবদেবী-সম্পর্কিত কিছু রচনা এবং পদসমষ্টিও এর মধ্যে আছে। কিছু রচনা শ্রীচৈতন্য এবং বৈষ্ণবধর্ম-সম্পর্কিত।

সব পুথির না হলেও, অধিকাংশেরই কালনির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে। সেদিক থেকে দেখা যায় যে ১৬শ শতকের এবং ১৯শ শতকের রচনাসংখ্যা ১৭শ ও ১৮শ শতকের

* ভুবনেশ্বরে ভারত সরকারের রিজিওনাল কলেজ অফ এডুকেশনের বাংলা বিভাগের প্রধান। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্বন্ধে গবেষণাপত্রের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পিএইচ ডি. উপাধিতে ভূষিত। বর্তমানে ওড়িয়া অক্ষরে লেখা বাংলা পুথি সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণাকার্যে নিযুক্ত। ইঁহার আবিষ্কৃত পুথিগুলি বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

তুলনায় কম। অতএব বিষয়টিকে এইভাবে বলা যায় যে, ওড়িয়া কবিদের বাংলা কাব্য-রচনার প্রয়াস শুরু হয় ১৬শ শতকে। পরবর্তী দুই শতকে এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করার পর ১৯শ শতকে এর অবলুপ্তি ঘটে।

পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয় মধ্য-দ্বাদশ শতকে। এই সময় থেকেই পুরী ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের অন্যতম মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠে। শুধু তাই নয়, জগন্নাথমন্দিরের স্থাপত্যকলা, পুরীর ও এর নিকটবর্তী অন্যান্য মন্দিরগুলির সৌন্দর্য শিল্পরসিকদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত হয় মহাম্বুধির অমোঘ আকর্ষণ। সব মিলিয়ে নীলাচল হয়ে উঠে একই কালে ধর্মপিপাসু, শিল্পবোদ্ধা এবং প্রকৃতিপ্রেমিক নরনারীর অতিপ্রিয় তীর্থক্ষেত্র। বলা বাহুল্য, পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বঙ্গদেশের নরনারীর কাছে নীলাচলের আকর্ষণ চিরকালই অপ্রতিরোধ্য। এর কারণ শুধু ধর্মপ্রবণতাই নয়, শিল্প ও প্রকৃতিপ্রীতিও বটে। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে, পুরী ও ভুবনেশ্বরে প্রাচীন বাসগৃহগুলির অধিকারী মূলতঃ বঙ্গদেশীয়রা।

যে নীলাচল ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয়দের প্রিয়ক্ষেত্র ছিল, যুগাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন এবং স্থায়িভাবে অবস্থিতির ফলে তা হয়ে উঠল প্রিয়তর। সেদিক থেকে ১৪৩৭ একটি স্মরণীয় শকাব্দ। পণ্ডিতদের মতে ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসে মহাপ্রভু তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে তিনি ছ'বছর গমনাগমনে অতিবাহিত করেন। ডঃ বিমান-বিহারী মজুমদার তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' নামক মূল্যবান গ্রন্থে যে সূক্ষ্ম কালবিচার করেছেন, সেভাবে বিচার না করে শকের বিচারে গোস্বামীর বর্ণিত ছ'বছর অর্থবহ মনে হয়। যাইহোক, ঐ ছ'বছরের মধ্যে একাধিকবার তিনি নীলাচলে এসেছেন এবং শ্রীজগন্নাথ ও তাঁর রথযাত্রা দর্শন করেছেন। ১৪৩৭ শকাব্দে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করার পর থেকে তিরোভাব পর্যন্ত তিনি এখানেই বসবাস করেন।

প্রাক্‌চৈতন্য যুগে উড়িষ্যায় যে বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মের প্রচার ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। রাধাকৃষ্ণাশ্রিত বিশুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম আর শ্রীজগন্নাথকে আশ্রয় করে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিধর্ম পূতসলিলা গঙ্গা ও যমুনার মত উড়িষ্যার ভক্তিপ্রবণ মানুষদের অন্তর চৈতন্যপূর্ব যুগেও প্লাবিত করে রেখেছিল। মহাপ্রভু এই উভয়ধারার মিলনমোহানায় নিজেকে প্রকটিত করেন। নীলাচলের আকর্ষণ সর্বাত্মক হয়ে উঠে এবং মূলতঃ তাঁকে কেন্দ্র করে উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের মধ্যে একটি নিগূঢ় সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠে। এই ঐক্য-বোধের সূচনা ১৬শ শতকে, বিকাশ ১৭শ ও ১৮শ শতকে এবং অবলুপ্তি ১৯শ শতকে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ওড়িয়া কবিদের রচিত বাংলা কাব্যগুলির সংখ্যা এই অভিমতকেই সমর্থন করে। অতএব অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে, সমন্বয়ধর্মী ভাবপ্রবাহ ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবলুপ্ত হয়েছিল। এর ফলে, শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলাভাষার চর্চা যে মূল্যবত্তা অর্জন করেছিল এবং তাঁর অনুগামীদের মধ্যে যার গুরুত্ব দীর্ঘ দু'শ বছর অক্ষুণ্ণ ছিল, ১৯শ শতকে তার অবসান ঘটে।

আবিষ্কৃত পুথিগুলির মধ্যে যাঁদের রচনা ষোড়শ শতকের বলে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায় তাঁরা হলেন রায় রামানন্দ, জগন্নাথ দাস

এবং অনন্ত দাস। সপ্তদশ শতকের কবিগণের মধ্যে আছেন দ্বারিকা দাস, দ্বিজ লোকনাথ, জগন্নাথ মিশ্র, মাধব দাস, মধু দাস, মাধব রথ, পুরুষোত্তম দাস, শেখর দাস, ধনঞ্জয় ভঞ্জ, শীতলাচরণ, যদুনন্দন দাস ও কবিপ্রসাদ নামক কবিবৃন্দ। অষ্টাদশ শতকের যে সব কবি বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ভৃঙ্গবর রায়, ব্রজবন্ধু সিংহ, দুর্গীশ্যাম দাস, রঘুনাথ দাস, গোকুল রায়, হরিচরণ দাস, পিণ্ডিকা শ্রীচন্দন, নিত্যানন্দ দাস, রামচন্দ্র দেব, রামচন্দ্র দাস, শংকর আচার্য, শ্যামসুন্দর ভঞ্জ প্রভৃতি কবিরা। ঊনবিংশ শতকের কবি হিসেবে যাঁরা পরিচিত এবং যাঁদের রচিত বাংলা কাব্য পাওয়া গিয়েছে, তাঁরা হলেন দ্বিজ গৌরচরণ, কবিচন্দ্র জগন্নাথ, নটবর দাস ও নারায়ণ মর্দরাজ। এ ছাড়া কয়েকখানি রচনা পাওয়া গিয়েছে সেগুলিতে রচয়িতার নাম নেই। এদিকে পুথিশালার তত্ত্বাবধায়ক সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকে এখনো প্রচুর পুথি সংগ্রহ করছেন, অতএব এ আশা করা অন্যায় নয় যে, আরও কিছু বাংলা রচনা আমাদের হস্তগত হবে।

যে সব কবিদের নাম উল্লিখিত হোল, এঁদের অধিকাংশই ওড়িয়া কবি হিসেবে সুপরিচিত। এঁদের মধ্যে কয়েকজন সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন।

ষোড়শ শতকের যে সব কবি বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে জগন্নাথ দাস নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। ইনিই সেই বিপ্র জগন্নাথ, যিনি ওড়িয়া ভাষায় ভাগবত অনুবাদ করে অমর হয়ে আছেন। শ্রীচৈতন্য এঁর ভাগবত ব্যাখ্যা শুনে এঁর সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় সমাধিস্থ হন। ইনিই মহাপ্রভুর কাছ থেকে 'অতিবড়' আখ্যা লাভ করেন। উড়িষ্যার যে ভাগবতবৃত্ত আছে তার মধ্যমণি এই জগন্নাথ দাস বাংলায় 'গঙ্গামঙ্গল' নামক একটি কাব্য রচনা করেছেন। গঙ্গার জন্মবৃত্তান্ত থেকে শুরু করে সগর বংশের উদ্ধার পর্যন্ত কাহিনী ইনি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, এ কাহিনী অনেকখানি পল্লবিত। এ ক্ষেত্রে জগন্নাথ তাঁর পূর্বসূরী সারলাদাসকে অনুসরণ করেছেন। জগন্নাথের বাংলাভাষায় দক্ষতা এবং রচনাশৈলীর কিছু উদাহরণ নিম্নোদ্ধৃত অংশে পাওয়া যাবে। কবি তাঁর কাব্যের ভূমিকা বন্দনা দিয়েই যথারীতি শুরু করেছেন—

বন্দো আগে গণনাথ মস্তকে জুড়িয়া হাত
সেই বটে গৌরীর নন্দন।
যার পিতা ত্রিপুরারি কপিলাশে অধিকারী
বন্দো তার পুত্রের চরণ॥
সাবধানে বন্দো আগে শ্রীগুরুচরণযুগে
যাহা হৈতে পাইব নিস্তার।
পড়্যাছি বিষম ঘোরে উদ্ধারণ কর মোরে
গুরু বৈ কে করিবে পার॥

এই বন্দনার শেষাংশে বলেছেন—

নারদাদি মুনি যত বন্দো তারে অবিরত
আর বন্দো নদিয়ানাগর।
বন্দো শচী ঠাকুরাণী জুড়িয়া যুগল পাণি
বন্দো প্রভু গৌরসুন্দর॥

প্রথম উদ্ধৃতিটির মধ্যে 'কপিলাশ' একটি স্থান-নাম এবং উড়িষ্যার একটি বিখ্যাত শৈবক্ষেত্র। যাইহোক, কবি জগন্নাথ এই ভাবে শুরু করে বিরাট একখানি কাব্য রচনা করেছেন। এবার কাব্যের মধ্যভাগ থেকে রচনার আর একটিমাত্র উদ্ধৃতি দেখা যাক। এই অংশে ব্রহ্মা ভগীরথকে বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণের সেবা করে গঙ্গাকে নিয়ে আসার

উপদেশ দিয়েছেন। এরপর কবি বৈকুণ্ঠের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন—

বকুল মালতি জাতি কদম্ব টগর।
সেবতী মাধবী তথা অতি মনোহর॥
রঙ্গন কাঞ্চন যূথি সহস্র যে মেলে।
শতদল পদ্ম যাতে মধুকর ভুলে॥
বৈকুণ্ঠের সম স্থান নাই সমতুল।
নানা পুষ্প ফুটে তথা মল্লিকা বকুল॥
বৃন্দাবনে যেই বৃক্ষ সেই বৃক্ষ তায়।
সেই পক্ষীগণ তথা ডাকিয়া বেড়ায়॥
সারী শুক পিকগণ তারা গায় গীত।
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা শিব শুনিয়া মোহিত॥
ঊনকোটি দেবগণ আছে সেই স্থানে।
হেন যে বৈকুণ্ঠধাম আছে বিদ্যমানে॥

রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এই অংশগুলির ব্যাখ্যা করতে যাওয়া ধৃষ্টতা। বিপ্র জগন্নাথ ষোড়শ শতকের কবি, কিন্তু প্রতিভার বিচারে চার'শ বছর ধরে যে সব ওড়িয়া কবি বাংলায় কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। এবার সপ্তদশ শতকের কবি দ্বারিকা দাসের যে বাংলা কাব্যের উল্লেখ করা হবে, বিষয়-বিচারে সেখানি শ্রেষ্ঠ। এখানি একটি মনসামঙ্গল। কাব্যের মধ্যে কবি একাধিক স্থানেই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি গুমগড়ের নিকটবর্তী নন্দীগ্রামে গিয়ে বসবাস করছিলেন। নন্দীগ্রাম তমলুক মহকুমার (মেদিনীপুর) গুমগড় পরগণার অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল পড়লে মনে হয় তিনি মেদিনীপুরে অবস্থানকালেই পশ্চিমবঙ্গের কেতকাদাসকৃত মনসামঙ্গল কাব্যখানি পাঠ করেছিলেন বা এখানি গীত হতে শুনেছিলেন। দ্বারিকা দাস ছিলেন প্রখ্যাত কবি। তিনি ওড়িয়া ভাষায় বহু কাব্য রচনা করেছিলেন। অতএব অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে, মনসামঙ্গলের কাহিনী তাঁকে আকৃষ্ট করে এবং তিনি স্বয়ং একখানি মনসামঙ্গল রচনায় ব্রতী হন। দ্বারিকা দাস ছিলেন সাধক এবং তাঁর রচিত ওড়িয়া কাব্যগুলির মধ্যে উচ্চকোটির দার্শনিকতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে, এঁর রচিত মনসামঙ্গলখানি ঐ শ্রেণীর কাব্যগুলিতে যে স্থূলতা দেখা যায়, তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রকৃতপক্ষে মাত্রাজ্ঞান, পরিমিতিবোধ এবং শালীনতাবোধ এই কাব্যখানির মধ্যে সুস্পষ্ট।

দ্বারিকা দাসের কাব্যে কেতকাদাসের ছায়া কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। তবু এ দুখানি কাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য তা বিশেষভাবেই আলোচনার যোগ্য। কেতকাদাস পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। চাঁদ সদাগরের পূর্ববঙ্গীয় মাঝি মাল্লাদের নিয়ে একটু রসিকতা করার লোভ তিনি সামলাতে পারেননি। তাঁর রচিত মনসামঙ্গলের পাঠকমাত্রেই তা জানেন। দ্বারিকা দাস ঐ অংশের রচনায় লিখেছেন—

মনসা করিল বল সাত ডিঙ্গা গেল তল
মরিল বাঙ্গাল কর্ণধার।
সর্বস্ব ভাসিল জলে চাঁদ বাণ্যা কোপে বলে
মনসারে নিন্দয়ে অপার॥
বলে কানি চেঙ্গ মুড়ি ভরা নৌকা খাইল বুড়ী
প্রাণে মাইল সকল বাঙ্গালে।
ছ পুত্র আমার খ্যায়া আছিল ভরসা পায়া
আজু ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥

এঁর মাত্রাজ্ঞান সম্পর্কে আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। লৌহবাসরের মধ্যে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু হয়েছে এ সংবাদ পেয়ে কেতকাদাসের চাঁদ সদাগর বলেছে—

ক্রোধ হৈয়া নাড়ারে বলিছে চাঁদ বাণ্যা।
কানির উচ্ছিষ্ট মড়া ফেল নিয়া টান্যা॥
ঝাট কর্যা কাট নাড়া রামকলার পাত।
মৎস্য পোড়া দিয়ে আজি খাব পান্তাভাত॥[১]

এই অংশের বর্ণনায় দ্বারিকা দাস বলেছেন—

রজনীর শেষভাগে   দংশিল কালিনী নাগে
বুঝিয়া সকল সমাচার।
হেন্তালের বাড়ি কান্ধে নাচিতে লাগিল চান্দে
আনন্দেতে হাসিয়া অপার॥
বলে মোর ভাল হৈল   পুত্র লক্ষীন্দর মৈল
ঘুচিলেক কানির বিবাদ।
শিব বিশ্বনাথ বলি   নাচে দুই বাহু তুলি
বড়ই নিষ্ঠুর তনু চাঁদ॥
হাসি বলে চাঁদ বাণ্যা   মড়া ফেল দূরে টান্যা
সনকা কান্দয়ে কি লাগিয়া।
চেঙ্গমুড়ি বিষহরী   উচ্ছিষ্ট করিল পুরী
পবিত্র করিব শীঘ্র হয়্যা॥

বর্ণনা দুটির মধ্যে পার্থক্য এবং দ্বারিকা দাসের বাংলাভাষার দক্ষতা এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে অবশ্যই প্রমাণিত হবে।

অষ্টাদশ শতকের আর একজন মাত্র ওড়িয়া কবির রচনা থেকে শুধুমাত্র উপসংহার অংশটুকু উপহার দিই। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত রঘুনাথ দাস। এঁর রচিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যখানির নাম 'ভুবন-মঙ্গল'। ইনি কাব্যটির মাঝখানে কয়েক জায়গায় আপন বাংলাভাষার দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও তার মধ্যে বৈষ্ণবোচিত বিনয়টিই আকর্ষণীয়। এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, তুলনামূলক বিচারে রঘুনাথের বাংলা অনেকখানি দুর্বল, তবুও তাঁর সবিনয় ক্ষমা-প্রার্থনা যথেষ্ট উপভোগ্য। কাব্যের উপসংহারে রঘুনাথ বলেছেন—

ওড্রদেশী হৈয়া কৈল বঙ্গলা বর্ণন।
না লৈবে বচনদোষ সব সাধুজন॥
যইসনে তুলসী গান্থি আনি নিজ পটে।
না লয়ে তা দোষ দেবে ভূষণ মুকুটে॥
তৈছে ব্রজলীলা গান্থি ওড়িয়া বঙ্গালে।
এ কবি কহিল এই ভুবনমঙ্গলে॥

দীর্ঘ চার'শ বছর উড়িষ্যার বেশ কয়েকজন কবি বাংলায় কাব্য রচনা করে গিয়েছেন, কিন্তু কেউই ভিন্ন ভাষায় আপনার দক্ষতা সম্পর্কে কোন উক্তিই লিপিবদ্ধ করেননি। সেদিক থেকে কবি রঘুনাথ দাসের এই উক্তি বিশেষ মূল্যবান।

উৎকল ও বঙ্গদেশের মধ্যে এককালে যে নিগূঢ় আন্তরিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, আবিষ্কৃত পুথিগুলি তার উজ্জ্বল নিদর্শন। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় দীর্ঘ চার'শ বছর ধরে বেশ কয়েকজন কবির কাব্যরচনার সমান্তরাল উদাহরণ ভারতবর্ষে অন্য কোথাও দেখা যায়নি। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আছে বলেও জানা যায়নি। এই পুথিগুলি সে দিক থেকে অবশ্যই অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। ভাবসংহতির যে শুচিশুভ্র যুগ আমরা হারিয়েছি, পুথিগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তার জন্যে আন্তরিকভাবে ব্যথিত হওয়া ছাড়া ঐ যুগে প্রত্যাবর্তনের পথ বোধ হয় আমাদের সামনে আজ আর উন্মুক্ত নেই। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক যে কারণেই হোক আমাদের মনোবৃত্তি আজ প্রাদেশিক

১। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত কেতকাদাসের মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯, পৃঃ ২৫৮

সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন। তবু পুথিগুলির সম্পাদনায় ব্রতী হয়ে বারবার আশাবাদী হয়ে উঠছি, হয়ত এই কাব্যগুলি আমাদের চিন্তাধারাকে নতুন পথাশ্রয়ী করে তুলবে, আমাদের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

যুগজিজ্ঞাসা ও রবীন্দ্রজীবনসাধনার মৌলভূমিকা

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী*

এক

সামগ্রিকভাবে দেখলে রবীন্দ্রজীবন-সাধনার স্বরূপ ও রবীন্দ্রজীবনজিজ্ঞাসার সদুত্তর বহুকর্মাশ্রয়ী হয়েও মৌলপ্রকৃতিতে ভাবপ্রধান এবং সেই সাধনার মৌল বিশিষ্টতা ও সার্থকতা যা-কিছু তা এক অ-সাধারণ ব্যক্তিত্বের বা অতি-ব্যক্তিত্বেরই বৈচিত্র্য-বিরোধ উত্তরণে বা সমন্বয়-সন্ধানে ভাবৈক্য-বাহী ;—আর তা দলগত কিংবা সমষ্টিনির্ভর নয়, রাজনীতিক বা দলগত ঐক্যবলে প্রয়োগ-নির্ভরও নয়, এমনকি ব্যক্তিক ভূমিকায়ও উদ্দেশ্যসাধক কি কর্তব্যবোধকও নয়। তা প্রধানত পরৈস্মপদী ক্রিয়াবাচক বা কর্মবাচক নয়—বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত মতে বরং আত্মনেপদী এবং ভাববাচক বা কর্মকর্তৃবাচক। আরো স্পষ্ট করে বললেঃ (১) রবীন্দ্রজীবনে কোনো ভাবাদর্শমুখী কর্মরূপসিদ্ধি ঘটবার পূর্বেই দেখা দেয় তার অসম্পূর্ণতা অকিঞ্চিৎ-করতা ও ভাববিরূপতা অর্থাৎ ভাব ও কর্মে অন্তর্নিহিত বিরোধিতা, এবং সুরু হয় নবস্বপ্নাঙ্গনে নবভাবের উদয়রাগ দর্শন ও পুরানো কর্মবন্ধন ত্যাগ করে ভাবান্তরে আনন্দ-অভিযাত্রা। নব সম্ভাবনার স্বপ্না-লোকে দেখা দেয় মুক্তির আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ এই ভূমিকায় বিচিত্র ও বহুরূপে সাহিত্য-শিল্পী বা মানস-শিল্পী—কর্মী নন। (২) সম্ভাবনার উদয়রাগে আত্মজাগরণ ও বোধনমন্ত্র উচ্চারণ ও ষোড়শোপচার পূর্ণ নিবেদনে ভাবের মহোৎসবেই রবীন্দ্রজীবন-সাধনার সম্যক স্ফূর্তি বা আদর্শ অভিব্যক্তি। বারংবার অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে এইরূপ স্থূল কর্মবন্ধন ত্যাগ ও নবভাবের রূপবন্ধন বরণেই রবীন্দ্রসত্তার স্বাধীন ও স্বানন্দ স্বপ্রকাশ। (৩) নবারুণ ভাবসূর্য কর্মলোকের মধ্যাহ্ন দীপ্তিদহনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে ও অবকাশশূন্য ঘনিষ্ঠতার সুস্পষ্ট জটিলতায় ও কর্মসিদ্ধির নিয়মনিষ্ঠ পন্থায় ভাবজ্যোতিহীন অকিঞ্চিৎ-করতা ও স্থূলতা দর্শনে রবীন্দ্রনাথের ভাবসত্তা (স্ব-ভাব) বিরূপ ও হতাশ হয়ে ওঠে। কর্ম যখন অপ্রস্তুত বা অ-সাধক সহযোগীদের হাতে ভাবের চেয়ে অভাবের মূর্তিই গড়ে তোলে, আনন্দাশ্রিত কর্ম না হয়ে কর্ম যখন কর্মবন্ধন বা কর্তব্যপালন হয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ তখন ভাবে ও কর্মে আত্ম-বিরোধের ফলে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা বর্জন করেন। তাঁর জীবনে এমনটা বারংবার ঘটেছে। এসব ক্ষেত্রে সংশোধন ও সংস্কার নয়, সম্পূর্ণরূপেই কর্মপন্থা ও কর্মরূপ বর্জনই রবীন্দ্রপন্থা—নতুনের প্রত্যাশায় ও নতুনের প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্মপ্রস্তুতির অপেক্ষায়।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিটি কলেজ, কলিকাতা। সাহিত্যগবেষক ও গ্রন্থকার

এই আত্মপ্রস্তুতি প্রধানত সাহিত্যবাহন। (৪) পুরানো বন্ধন (কেবল কর্মবন্ধনই নয়, পুরানো ভাববন্ধনও বটে) ত্যাগ করে নতুন স্বপ্নরাগের আকর্ষণ, নতুন ভাবলোকে পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ, এবং তারপরে তাকে কর্মরূপে (যথার্থরূপে বললে ভাবকর্মরূপে) প্রত্যক্ষ করার জন্যে সুরু হয় নব কর্মকাণ্ড। এ প্রসঙ্গে বিশেষিত রবীন্দ্রবক্তব্য হল :

'...my freedom is to be moving from bondage to bondage.' কারণ 'absolute fluidity in work can only be at its commencement.'—এবং 'Unless I keep myself aloof, I cannot help maintaining their ideal character.' '...therefore my duty is to start things and leave them.'

'...এক বন্ধন ত্যাগ করে নতুন বন্ধনে ধরা দেওয়াতেই আমার স্বভাবের স্বাধীনতা।' কারণ 'একমাত্র কাজের আরম্ভেই থাকতে পারে তার বিশুদ্ধ সাবলীল প্রকাশ।' —এবং 'কর্মক্ষেত্র থেকে সরে না দাঁড়ালে আমি কর্মের আদর্শ চরিত্রটি রক্ষা করতে ব্যর্থ হই।' '...সুতরাং আমার কর্তব্য হল কাজ সুরু করেই ত্যাগ করা।' (লেখক-কৃত অনুবাদ ; সূত্র : Letters to a Friend, p.61)

—বস্তুতই, রবীন্দ্রজীবনসাধনা কর্ম-কেন্দ্রকে আত্মকেন্দ্রিক, স্বাতন্ত্র্যধর্মী এবং ঐকান্তিকভাবে ভাবোত্তরণমুখী করে রেখেছে। আর, এইরকম শিথিলবন্ধন অর্থাৎ মুক্তবন্ধ কর্মরূপ ও কর্মপদ্ধতি বাস্তব ও সার্বিক জীবনগ্রাহ্য ও সাধারণ জীবনসহ হতে পারে না। মৌলভাবেই এটা মানস-জীবনবাহী ও নিরপেক্ষ অধ্যাত্মসৌন্দর্যমুখী এবং অধ্যাত্মজীবনের নিগূঢ় প্রয়োজনেই নিয়ন্ত্রিত।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির সমস্যাকে মূলত বা সর্বোপরি নান্দনিক-আধ্যাত্মিক প্রকৃতি-নির্ভর রূপে ব্যক্তিরই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের বা পরমাত্মার প্রেরণা ও মুক্তিলীলার মধ্যেই দেখতে চান। এই রকম অধ্যাত্ম সংস্কার তথা প্রত্যয় যাঁর চিত্তে প্রবল তাঁর দৃষ্টিতে বস্তু-স্বরূপ বাস্তবিকরূপে দেখা না দিয়ে ভাবসত্তা রূপে দেখা দেবেই, এবং ঐ ভাবসত্তাই তাঁর শিল্পীসত্তাকে উদ্বোধিত, প্রকাশিত করবে। আর, এই ভাবাসক্তির ফলেই যে দেখা দেবে ব্যক্তিমুখিতার বা আত্মপ্রবণতার প্রাধান্য, তাই ত স্বাভাবিক। সীমিত রূপের বাস্তব-ধর্মের চেয়ে ভাবের অসীম সঙ্কেতের দিকে প্রবণতা, এবং বাস্তবানুগামিতার স্থলে কল্পনামুখিতা এবং সমাজসত্তার চেয়ে ব্যক্তিসত্তার প্রাধান্যই মুখ্যরূপে দেখা দেয়। এবং এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসা ও তার সদুত্তরসন্ধান বস্তুমুখী (বা বস্তুকেন্দ্রিক ভাবমুখী) বর্তমান জগতের যৌথ উত্থানপতনে ও জীবনযন্ত্রণায় প্রেরণা বা প্রত্যয় সঞ্চার করতে অপারগ হয়েছে—কি স্বদেশে কি বিদেশে। তবু জগৎ জুড়ে ভাবসম্মিলনের তথা প্রেম-মৈত্রীর চিরন্তন অধ্যাত্মসৌন্দর্যে আমাদের এই বাস্তব জীবনেই নির্বিরোধ সাধনলোক সৃজনের আকাঙ্ক্ষায়ই —রবীন্দ্রজীবনসাধনার বিশেষিত তাৎপর্য।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল একমাত্র অনাহত অধ্যাত্মজীবনে বা মানসজীবনকেন্দ্রেই মানুষ বাহিরের বাস্তব বিক্ষোভ-পীড়নের মধ্যেও মানবিক মৌল অধিকারের ভিত্তিতে দাঁড়াতে পারে এবং সেখানেই পরস্পরের সঙ্গে প্রেম-শান্তি-সাম্যে মিলতে পারে—অর্থাৎ

মানুষের স্থায়ী ও যথার্থ মিলনই হ'ল অধ্যাত্ম মিলন বা ভাবসম্মিলন। কারণ, 'ভাবের জগতেই মানুষের প্রকৃত বাস—এটাই তার জীবনের পরম সত্য। সেখানে তাকে ধূলোর টানে নীচে নামতে হয় না।' অর্থাৎ বৈষয়িকতা বা বিষয়স্বার্থ-বৈষম্যের নিত্য-উদগ্র বহুবন্ধনপীড়ন ও বাধাবন্ধকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করে সাংস্কৃতিক-আধ্যাত্মিক পথে হৃদয়-বিনিময়েই এটা সম্ভব। কিন্তু বিষয়স্বার্থ ও বিষয়বৈষম্যের উদগ্র সংঘাতে ও বিরোধসম্পর্কের মধ্যেও এই ভাবসম্মিলন কেবলমাত্র কয়েকটি ব্যক্তিজীবনের ঊর্ধ্বচারী সাধনমার্গেই নয়, সার্বিকক্ষেত্রে বা এমনকি একটি দেশের কোনো ক্ষুদ্রসীমায়ও [এমনকি শান্তিনিকেতনেও] কিভাবে অর্থাৎ কি উপায়ে সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথের জীবনজিজ্ঞাসা ও তার সদুত্তর য়ুটোপীয় স্বপ্নাদর্শবাদের দ্বারা আচ্ছন্ন ও ব্যাহত। আত্মজীবনজিজ্ঞাসার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন—'আমি জানি যে আমার জীবনের সত্যিকারের উদ্দেশ্য একটিই—সেটি যুগে যুগে লোকে লোকে আমার সৃষ্টির একমাত্র অভিপ্রায়—তা হল আমি যা তার ধ্যানরূপ সম্পূর্ণ হতে দেওয়া।'

'অভিযোগের কথা বিদ্বেষের কথা সে গুলো আমি কেন ভাষা দিতে যাব? সত্যের মহাশান্তি থেকে যে অমৃতবাণীর উদ্ভব হয়েছে, যা পৃথিবীর সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি দূর করে দেয়, ঘৃণাকে ক্ষমায় রূপান্তরিত করে—তারই জন্যে আমার ব্যাকুল প্রার্থনা।'

আত্মজীবনে অহংলোকের অন্তস্তলে এক সু-সম সামঞ্জস্য-বিধানের দ্বারা সত্যের অনাহত শান্তিসৌন্দর্য আহরণ ও সংরক্ষণ করাই ছিল রবীন্দ্রজীবনসাধনার মৌল অভীপ্সা। তাই প্রত্যক্ষ বাস্তবের ও বাস্তব-সংঘর্ষের প্রত্যাঘাত, বিরোধ-স্বার্থের উৎপীড়ন, বৈষম্যের উন্মার্গ উদগ্রতা, সীমিত ক্ষেত্রজ চেতনা এবং সংকীর্ণ সীমাসিদ্ধির প্রাথমিক দাবী রবীন্দ্রমানসকে আন্দোলিত কি উত্তেজিত করে না—জীবনের প্রাত্যহিক ও ঘাটনিক মূল্য এক পরমমূল্যচেতনায় অতি-কেন্দ্রিত, এবং সমষ্টি-নিরপেক্ষ অসাধারণ এক অতিব্যক্তিক সিদ্ধিরই অভিমুখীন হয়। জীবনপ্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ ব্যষ্টিসিদ্ধির সমাহিত কোটর থেকে সমষ্টির দ্বন্দ্ববাহী কঠিন জীবনবোধের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চেয়েছেন। এবং মানবজীবনের সর্বব্যাপী ক্রমোত্তরণ ভূমিকায়ই ব্যক্তিসিদ্ধিকে উৎসর্জিত-বিসর্জিত দেখতে চেয়েছেন। জীবনবোধের ক্রমপরিণামে তাই রবীন্দ্র-উপলব্ধি হল :

'সমস্ত মানবসংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে অভাব আছে অপমান আছে ততক্ষণ কোনো একটি মাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না।'

—প্রথম-উদ্ধৃত রবীন্দ্র-উপলব্ধির কথার সঙ্গে এই উদ্ধৃতিটির পরিণামসূচক পার্থক্য স্বতই চোখে পড়ার মতো। কিন্তু তবুও এটা বোধের বোধন বা উন্মেষ মাত্র—বাণীবাহনেও পূর্ণ প্রত্যায়িত নয়, ভাবাধিকারেও পূর্ণ বিস্তার ঘটেনি সাহিত্যক্ষেত্রেও। তাই ভাবপরিণাম-স্তরে কর্মমুখী কোনো পন্থায় ও রূপে প্রকাশিতও নয়—রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে নবজাতক মানবিক চেতনা ও তার দায়দায়িত্ব সম্পর্কে আত্মবিচার ও পুনর্মূল্যায়নের প্রয়াস লক্ষ্য করবার মতো। তবু তা প্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধ ও সু-সম বোধে সুসমঞ্জস নয়। এটা আয়োজন, সিদ্ধি নয়; আবাহন, অধিকার নয়; প্রেরণা, প্রতিষ্ঠা নয়। বাণীলোকের প্রাথমিক উন্মেষেই তা

আত্ম-সন্দর্শন ও আত্ম-উদ্বোধনের নবপীঠে স্থান গ্রহণ করাতেই নিঃশেষিত। ভাব-এর সঙ্গে ভব-এর সম্পর্ক নির্ণয়ে ভাব এখানে ভবের চেয়ে অগ্রসর নয়। যুগযন্ত্রণার বাণীরূপ রবীন্দ্রজীবনসীমান্তে এসে একদিক থেকে অর্ধোচ্চারিত এবং সংশয়াহতও বটে।

দুই

বিরুদ্ধশক্তির সংঘর্ষে নেমে পঙ্কমন্থনেই পদ্মসুধালাভের সাধনা ভাবাদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথের নয়, এই সাধনা মন্থনোত্থিত অমৃত সঞ্জীবনের আশ্বাস বিতরণের। এবং সেই হেতুই তিনি ভাবসংগ্রামী—ভাবসংঘর্ষে সর্বোত্তরণমুখী; তবে নির্বিরোধ শ্মশানিক শান্তিও কাম্য নয় কখনো, বা অন্ধের আত্মতৃপ্তিও নয়। মানবজীবনের ক্ষেত্রে জাগতিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার বিরোধ বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতাকে স্থূল জাগতিকতার নাড়ীবন্ধন থেকে মুক্ত করার বাস্তব সংগ্রাম [মূলত যা অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনীতিক], এবং বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সভ্যতার অধিকারকে মানবজনতার ক্ষেত্রে স্বাধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠিত করার কার্যকরী সুস্থির পন্থা বা আন্দোলন-প্রক্রিয়া রবীন্দ্রজীবনজিজ্ঞাসার অন্তর্ভূ‘ত নয়। তাই কঠিন বাস্তব চেতনা ও তার প্রয়োজনবোধ থাকা-সত্ত্বেও রবীন্দ্রকর্মরূপ মৌলপ্রকৃতিতেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা ও তার বিকাশের উপর নির্ভরশীল, এবং তা প্রধানত ও মূলত আধ্যাত্মিক-নান্দনিক। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নিম্নস্তর ভিত্তিতেই সমুচ্চ অধ্যাত্ম-মানবিক সভ্যতাকে শেষপর্যন্ত জয়যুক্ত করার অর্থাৎ 'ততঃ কিম্'-এর শেষোত্তর লাভের উদ্দেশে দূরপ্রসারী পথপরিক্রমার কঠিন বন্ধুর ইতিহাস রচনায় অংশগ্রহণ কিংবা সেই পথের দ্বন্দ্বযন্ত্রণাবিদ্ধ চেতন-দর্শনও রবীন্দ্র-সাধনসীমায় অভিব্যক্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যক্তি-সত্তাশ্রিত এক মহাশক্তিতে স্বতন্ত্ররূপে জাগতিকতার কণ্টকিত পাদভূমি থেকে আধ্যাত্মিকতার উদয়চূড়ে উত্তরণক্ষম; মানুষের এই ঐশী সক্ষমতায় বিশ্বাস ও প্রাসঙ্গিক সহজ ও স্বতোদিত বিকাশের প্রত্যাশাও ছিল তাঁর সকলেরই কাছে। বাস্তব দীনতাদুর্গতির অন্তস্তলাধৃত এই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ-শক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ বাস্তব-সমস্যারও [তা রাজনৈতিক হোক বা সামাজিক-অর্থনীতিক হোক] মৌল ও স্থায়ী সমাধানরূপে দেখতেন।

'আজকের দিনে পৃথিবীর জীবনযাত্রা স্বাভাবিক নয়। সমস্যাসঙ্কুল চারিদিক।' তবু এরি মধ্যে 'জীবনে সামঞ্জস্য স্থাপন করে কবে আমি আত্মার জগতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হব ?'—রবীন্দ্রমর্মজীবনের এই দ্বন্দ্বাতীত এক সমস্যা-উত্তীর্ণ সামঞ্জস্য-রচনার সাধনাই গভীরভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। জগৎজোড়া জীবন-যন্ত্রণাকেই যেন আপন এককজীবনে সমাহিত করে রবীন্দ্র-অতি-ব্যক্তিত্ব জীবনোত্তরণের নিঃসঙ্গ মহাপথিক-রূপেই অতি-অগ্রসর। স্বপনশিল্পীর চেয়েও জীবনশিল্পীরূপেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ নিরলস কর্মব্রতী, সেখানেও তাই প্রত্যক্ষ বাস্তব দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষক্ষেত্রের চেয়েও সন্ধিস্বাক্ষরিত শান্তি-সীমান্তের দিকে—ঊর্ধ্ব'লোকের চিরজ্যোতি তারকার দিকেই সর্বদা তাঁর দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ। এই দূরদৃষ্টি যাঁর, তাঁর পক্ষে প্রত্যক্ষ বিরোধ-সম্পর্ক-চেতন কঠোর জীবনসংগ্রামে নামা বা সেই সংগ্রামকে সরাসরি সমর্থনও সম্ভব নয়।

মূলত মানুষের জীবনকে নৈতিক স্তরে

উন্নীত দেখার জন্যই পাপের বা প্রতিক্রিয়া-শক্তির সঙ্গে বিরোধ এক নৈতিক স্তরেই ভাববদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু জগতে ও জীবনে যে দুঃসহ দুর্নীতি ও ধ্বংসলীলার প্রচণ্ডতা—সেখানে বিরোধী দস্তুর শক্তি তো নৈতিক সংগ্রামেই লিপ্ত নয়, এবং সে যুদ্ধকে কেবল অধ্যাত্মসঙ্কট কি আধ্যাত্মিক অগ্নি-পরীক্ষা বলেও বিবেক-সজাগ ব্যাখ্যা করা যায় না; অথবা নির্লিপ্ত দূরত্বের দূরদৃষ্টিতে দেখে মহাকালের নাট্যলীলার তালরক্ষা বলেও আশ্বস্ত হওয়া যায় না। এত পাপ লোভ, এত লুণ্ঠন শোষণ হত্যা অপমৃত্যু, এত ধ্বংস বিভীষিকা—এসবও তো এক শ্রেণীর দানবশক্তির যান্ত্রিক সংঘবদ্ধতায়ই সক্রিয়। আবার, ঐ সংঘবদ্ধ দানবশক্তিকেই আর এক সংঘবদ্ধ মানবিক শক্তিই যখন মৃত্যুদহনযজ্ঞে আত্মবলি দিয়েই মানুষেরই নিরাপত্তা, তার শান্তি, তার স্বপ্ন ও সভ্যতাকে রক্ষা করে—তখনো তো তা কেবলমাত্র নৈতিক স্তরের ভাবসংগ্রামই নয়, নৈতিক বিজয়ের পথে পথে সংগ্রামী মানবতাকেই রচনা করতে হয় আদর্শ উদ্বুদ্ধ পবিত্র-সুন্দর কত প্রাণ-মিছিলের অপাপবিদ্ধ মৃত্যু-অঞ্জলি। 'এ আমার এ তোমার পাপ, কারণ সমস্ত মানুষই যে এক'—এই দৃষ্টিতে অত্যাচারীর কাছেই নিরপরাধের ও আদর্শব্রতীর শাস্তি গ্রহণ প্রসঙ্গে যে গভীরার্থক আধ্যাত্মিক সমর্থন রয়েছে তার পশ্চাতেও রয়েছে এক নঞ্‌-জীবনদর্শন। ধনবৈষম্য-পীড়নের ক্ষেত্রে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' যেখানে মানবজীবনের মর্মান্তিক পরিণাম সৃষ্টি করে, সেখানে ঐশ্বরিক বিধানে 'মা গৃধঃ' মহামন্ত্রে দারিদ্র্য-দুর্গতিতে সন্তোষবিধানের প্রয়াসও অনুরূপ। কিন্তু আর এক মহাজীবনদর্শন ও তার কর্ম-প্রেরণায়ই ঘটে ন্যায়ের ও সাম্যের পক্ষসমর্থনে আপোষহীন বিজয়ী শক্তির প্রকাশ—মৃত্যুঞ্জয়ী মানবিক আদর্শপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই সেখানে ঘটে বিধাতার প্রতিনিধিরূপেই রণে দীক্ষা-গ্রহণ—এবং ব্যক্তিপ্রেমকে দেশপ্রেমে ও দেশ-প্রেমকে বিশ্বপ্রেমে প্রসারিত করবার নান্যপন্থা অনুসরণ। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে মুক্তি দিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্র থেকে যথার্থ করে তুলবার জন্যেই স্বাদেশিক স্বাধীনতা ও শোষণমুক্তি-পথে বিশ্বমৈত্রীর মহাবোধন এবং জাগতিকতা থেকে আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণই সভ্যতার সংগ্রাম। এতে জাগতিক বন্ধনমুক্তিরই সোপানরচনা—বিদ্যামৃত লাভের জন্যেই অবিদ্যা-আয়োজিত অন্ধকার একমনে পাড়ি দেবার কঠিন ব্রত—মানবের দেবতা হবার অগ্নিপরীক্ষা। এ তো নিদারুণ দুঃখরাতে মৃত্যুঘাতে মানুষের নিজমর্তসীমা পার হয়ে দেবতার অমর মহিমা লাভ করবারই আদর্শ সংগ্রাম। কিন্তু মহাভাবাদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশামতো সকল মানুষই এখনো এমন নৈতিক স্তরে জীবন ধারণ করে না যে তার সমস্ত সংগ্রামই হয় ভাবসংগ্রাম। জীবন-সীমান্তে এসে রবীন্দ্রনাথকেই কিন্তু বহু বেদনাঘাতের ও বিরূপ অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই 'সভ্যতার সঙ্কট' কালে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আহ্বান জানাতে হয়েছে তাদেরই—

'দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।'

—আর এটা যে কেবল ভাবসংগ্রাম নয়, বলাই বাহুল্য।*

* লেখকের ডক্টরেট ডিগ্রীপ্রাপ্ত অমুদ্রিত গবেষণাপত্রের পরিণাম-পর্বের অংশবিশেষ।

শক্তিপূজা

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

শক্তি ছাড়া যে কোন কাজ হয় না, তা আমরা সবাই জানি। কোন কিছুর স্থানান্তর বা কোন কিছুর ভেতর পরিবর্তন ঘটানোই কাজ। একটা মার্বেল পড়ে আছে, আঙুল দিয়ে ঠেলে দিলাম খানিকটা গড়িয়ে গেল; কাজ হল। একটুকরো কাঠে বাটালির মাধ্যমে শক্তি প্রয়োগ করলাম, একটা মূর্তি গড়ে উঠল; কাজ হল। আবার বই পড়ছি, চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করছি, মনে পরিবর্তন হচ্ছে; কাজ হচ্ছে। চুপ করে বসে আছি, ভাবছি 'আমি কিছু করছি না'—কিন্তু সেখানেও কাজ হচ্ছে—মনে চিন্তাতরঙ্গ তোলা হচ্ছে। একটা নতুন জিনিস দেখে ঠিক করতে পারছি না সেটা কি; অনেক বিচার করে শেষে ঠিক করলাম এটা 'এই'; কাজ হল, বুদ্ধির ভেতর পরিবর্তন ঘটল।

বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ যে কোন জায়গায় যে কোন পরিবর্তনই কাজ। অনবরতই তা ঘটছে, আর তা ঘটাচ্ছে কোন না কোন আকারে বাইরের বা ভেতরের শক্তি।

এ কাজগুলো সবই আবার নিয়ম ধরে হয়। এলোমেলো কিছুই ঘটে না। বাইরের কাজ, জড়জগতের, স্থূল জগতের সব কাজ ঘটে, যাকে আমরা জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত 'প্রকৃতির নিয়ম' বলি, তদনুযায়ী। কদাচিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে বলা যায় তার নিয়ম এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি।

একটা কাজ কেন হল তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তার নিজের বা তার ভেতরকার বস্তুগুলোর—তার উপাদানগুলোর—নিয়ম মেনে চলার ধারা দিয়ে; তারো ব্যাখ্যা করা হয় তার ভেতরকার বস্তুর নিয়ম মেনে চলার ধারা দিয়ে। এমনি ভাবে বাইরের জগতের সব ঘটনার, পরমাণু-চূর্ণ থেকে নক্ষত্র-সূর্য-গ্রহ-উপগ্রহ, জীব-জন্তু, বহুবিচিত্র বস্তুর, জীবের দেহ-মনাদির সৃষ্টি-স্থিতিকালীন পরিবর্তন ও বিনাশ বা পূর্ব উপাদানে পুনরায় রূপায়িত হওয়ার ব্যাখ্যা করা যায়। সর্ববিধ 'কাজের'ই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এনারজি-তরঙ্গ বা -কণা কিভাবে নিয়ম মেনে চলে, ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন পজিট্রন প্রভৃতি 'কণা'গুলি, পরমাণু অণু ও তাদের অসংখ্য সমাবেশগুলি কিভাবে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে তারই বিবৃতি দিয়ে। এখানে যেন মনে রাখি আমরা, যে কোন কারণেই হোক, তারা একটা নিয়মমতো চলছে, চলে আসছে, যার ফলে বহু ঘটনা ঘটে আসছে, বহু 'কাজ' হয়ে আসছে; কোন্‌টি কি পরিবেশে কিভাবে চলছে তার বিবৃতির নামই প্রকৃতির নিয়ম। যেন মনে রাখি, বিজ্ঞানের মতে (এখনো) 'প্রকৃতি' বলে কোন বস্তু বা সত্তা নেই, যে নিয়মগুলি করেছে, যে সেই নিয়মবশে সবকিছুকে চালিয়ে বিশ্বে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ ঘটাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে এগুলি একটা নিয়ম মতো চলছে, এই পর্যন্ত। বিজ্ঞানের মতে 'প্রকৃতি' হল সেই নিয়মগুলির কাল্পনিক কর্ত্রীর বা পরিচালিকার কাল্পনিক নামমাত্র। অবশ্য কোন কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মনে বিশ্বের সৃষ্টি ও পরিচালনার মূলে একটা বিরাট মন বা বুদ্ধির অস্তিত্বের সম্ভাবনা উদ্ভাসিত হয়েছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য বলে তা গৃহীত হয় নি।

অন্তর্জগতেও, মন-বুদ্ধি প্রভৃতিতে যে-সব পরিবর্তন ঘটছে, চিন্তা, ভয় হর্ষ বিষাদাদি অনুভূতি ঘটছে—সে-সবও অন্তঃ-প্রকৃতির নিয়মের বশেই ঘটছে। সেখানে এই সব পরিবর্তনের যে সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্তর্জগতের বিজ্ঞানীরা, সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা, সে-সবও ঘটনার বিবৃতি মাত্র। তাঁরা অবশ্য এই নিয়মের কর্ত্রীকে, চৈতন্যময়ী বিশ্ব-পরিচালিকাকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

দুই

স্বামীজী মায়ার একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন 'ঘটনার বিবৃতি' বলে—যা ঘটছে বহির্জগতে এবং অন্তর্জগতে, তারই বিবৃতির নাম মায়া। অবশ্য একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, বহির্জগতের (সেখানে যাই-ই থাকুক বা ঘটুক না কেন) বিষয় ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে আমাদের অন্তর্জগতে যে পরিবর্তন ঘটায়, তাই-ই আমাদের কাছে বহির্জগতের ঘটনা।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি মহাপুরুষ অবতারাদি অচেতন এনারজিরও অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর বস্তু বা সত্তার সন্ধান পেয়েছেন, জড়বিজ্ঞানীদের মতোই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন, সব কিছুর মূল সত্তাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রত্যক্ষ করেই তাঁরা বলে গেছেন, একজন দু'জন নয় যুগে যুগে অসংখ্যজন বলে গেছেন—আধুনিক যুগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতিও বলে গেলেন যে, বাহ্য জগতেরই হোক বা অন্তর্জগতেরই হোক, কাজগুলো, ঘটনাগুলো 'কাল্পনিক' প্রকৃতির নিয়মে ঘটে না—একটি চেতন সত্তার ইচ্ছায় ঘটে - "তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না।" তাঁরা এই সত্তার নাম দিয়েছেন—ঈশ্বর, ভগবান, জগন্মাতা প্রভৃতি। আবার প্রকৃতি—'পরমা প্রকৃতি'ও। তিনিই সব শক্তির মূলতিনি, মহাশক্তি—ইচ্ছাময়ী বা ইচ্ছাময়; তাঁর ইচ্ছাতেই সূক্ষ্ম জগতের মন-প্রাণ প্রভৃতি এবং স্থূল জগতের, জড় জগতের আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত এনারজি ইলেকট্রন প্রোটনাদি সবই নিয়ম মেনে, তাঁর নির্দেশ মেনে, তাঁর ইচ্ছা মেনে চলছে। তাঁর ইচ্ছাই নিয়ম—দেশ-কাল-নিমিত্ত, তাঁর ইচ্ছার স্থূলতর, স্থূলতম রূপই আবার অচেতন মন-বুদ্ধি, ইলেকট্রন-প্রোটনাদি জীবজগতের সবকিছুই। মন বুদ্ধি প্রভৃতিকে আপাতদৃষ্টিতে চেতন ব'লে মনে হলেও আসলে এরা অচেতন; যা দিয়ে বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বস্তু গড়া, তারই উপাদানের সূক্ষ্মতর সত্তা দিয়েই মনবুদ্ধ্যাদি গঠিত। এসব অন্তর্জগতের বিজ্ঞানীরা, সত্যদ্রষ্টারা দেখেই বলেছেন; যেমন ইট পাথর ইত্যাদি আমরা দেখি, তেমনি দেখেছেন। সূক্ষ্ম জিনিস দেখার মতো মন হলে আমরাও এসব তেমনি দেখতে পাবো। পবিত্রতা ও একাগ্রতা সহায়ে মন-বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, সূক্ষ্ম হয়; তখন এসব সূক্ষ্ম জিনিস দেখা যায়—"দৃশ্যতে তু অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"

তিন

আমরা আগে বলেছি, ঘটনার বিবৃতিকেই—ঈশ্বরের বা জগন্মাতার বা পরমা প্রকৃতির ইচ্ছায় যা কিছু ভেতরে বাইরে ঘটছে তার বিবৃতিকেই স্বামীজী মায়ার অন্যতম সংজ্ঞারূপে উল্লেখ করেছেন। কেন?

বলা যায়, মায়া বলতে অতি সাধারণভাবে আমরা বুঝি ভেলকিবাজির মতো কিছু—যা নয় তাই ঘটছে, যা নেই তা দেখা যাচ্ছে। মায়ার অন্য নাম অজ্ঞান, অবিদ্যা ইত্যাদি—ভুল দেখা বা বোঝা, একটা জিনিসকে অন্য জিনিস বলে মনে করা, সত্যকে অন্যরূপে দেখা। তাহলে আমরা যা কিছু দেখছি, শুনছি, অনুভব করছি, সবই কি তাই? সত্যকে অন্যরূপে দেখা? সত্যই তাই।

জড়বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখলেও, বাহ্য-জগতে, জড়জগতে যা ঘটছে, তা সত্যই তাই, সত্যকে অন্যরূপে দেখা। আমাদের দেহটাকেই ধরা যাক। আমরা দেখছি, অনুভব করছি, এটা একটা নিরেট বস্তু, অনেকখানি জায়গা-জোড়া বস্তু। সত্য কি আসলে তাই? না। বিজ্ঞানই বলছে, ইলেকট্রন-প্রোটনকে বস্তু বলে ধরে নিলেও বলছে। এর ভেতর প্রায় সবটাই ফাঁক—বস্তু যা, তা একত্র করলে একটা মসুর-ডালের দানার মতো বা আরো কম জায়গা নেবে। অবশ্য ওজন তার এই দেহেরই সমান থাকবে, কারণ ওজন বস্তুরই, ফাঁকের নয়। 'বস্তু' বলে যা ভাবি আমরা, তার ভেতর বস্তু কতখানি, আর ফাঁক কতটা তা বোঝার একটু চেষ্টা করা যাক। পরমাণু খুব ছোট বস্তু, খালি চোখে দেখা তো দূরের কথা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্রেও দেখা যায় না। আমরা তাকে বহু বহু গুণ বড় করে ভাবলাম, বোঝার সুবিধের জন্য—ভাবলাম সেটা তিনশো ফুট ব্যাসের একটা গোলকের মতো। ধরে নিলাম সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে কি দেখবো? দেখবো এই বিরাট গোলকটির মাঝখানে মটর দানার আকারের একটা দানা রয়েছে (ধরা গেল সেটা বস্তু)— প্রোটনকণা; আর গোলকটার বৃত্তপথে ঐ ভেতরকার দানার সাড়ে আঠারোশো ভাগের একভাগ পরিমাণ ওজনের আর একটা ক্ষুদে দানা, ইলেকট্রনকণা ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচণ্ডগতিতে এবং এত ক্ষিপ্রতায় তার কক্ষপথ পরিবর্তন করে চলেছে যে ভেতরের দানাটার চারিধারে প্রায় দেড়শো ফুট দূরে দানাটাকে ঘিরে একটা গোলাকার আবরণ সৃষ্টি করে রেখেছে—যার ভেতর কারো ঢোকা প্রায় দুঃসাধ্য। অর্থাৎ ঐ দুটো ক্ষুদে দানা প্রায় দেড়শো ফুট ব্যাসের একটা নিরেট বস্তুর প্রতীতি জন্মাচ্ছে। রাসায়নিক-পরিবর্তনাদি 'কাজে' ওটা অতখানি নিরেট বস্তুর মতোই ব্যবহার করছে। অথচ এর সবটাই প্রায় ফাঁকা।* এটা একটা হাইড্রোজেনের পরমাণু—যা পরমাণুর মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত গঠনের ও সবচেয়ে কম ওজনের। এই ধরনের পরমাণু দিয়েই আমরা যেসব 'বস্তু' দেখি, তা সব গড়া। সেখানে সত্যকে, বিরাট বিরাট ফাঁকের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র কয়েকটি বস্তুকে ঘুরতে— সত্যকে —দেখি না আমরা। দেখি সব ফাঁকটাকেই নিরেট বস্তুরূপে। যেমন আমাদের দেহটাকে, তেমনি সব কিছুকেই। এই ঘটনার বিবৃতিই, সত্যকে অন্যরূপে দেখার বিবৃতিই মায়া। আমাদের সমগ্র জগৎ-বোধই তাই। শুধু দেখার দিক থেকে নয়, অন্য অনুভবের দিক থেকেও।

অন্তর্জগতেও তাই। আমরা বলেছি, মন বুদ্ধি প্রভৃতি অচেতন। স্থূলদেহ তো বটেই। সেগুলিকে চেতন বোধ হয়—সত্যকে অন্যরূপে দেখি; যার চরম অবস্থা হল এগুলিকে 'আমি' মনে করা, দেহ-মন-বুদ্ধির পরিবর্তনকে আমার পরিবর্তন মনে করা—যা সত্য নয়। সত্য হল 'আমি' এসব থেকে আলাদা, আমি চির অপরিবর্তনীয়। এই জগৎ-বোধ, এই দেহাত্মবোধ—স্থূলদেহে এবং মনবুদ্ধ্যাদি-সমন্বিত সূক্ষ্মদেহে 'আমি'-বোধ এই মায়া—সত্যকে অন্যরূপে দেখা—ঈশ্বরের, পরমা প্রকৃতির, বা

* An Approach to Modern Physics—E. N. da C. Andrade, 3rd Ed., Chapter VIII

মহাশক্তির—শক্তির প্রকাশ-সমন্বিত চরম সত্তার—সগুণ ব্রহ্মের ইচ্ছাতেই ঘটছে। তাই তাঁর, এই মহাশক্তির অন্য নাম 'মহামায়া'। আমরা আসলে শুদ্ধ-চৈতন্য-স্বরূপ—পরমানন্দময় অবিনাশী চেতন সত্তা হয়েও তাঁর ইচ্ছাতেই নিজেদের দেহ বলে মনে করছি, আমার সুখ-দুঃখ অনুভব হচ্ছে বলে মনে করছি, জন্মেছি বলে মনে করছি, মৃত্যুভয়ে ভীত হচ্ছি!

চার

এই সত্যকে অসত্য বোধ হওয়ার হাত থেকে, মায়ার বা অজ্ঞানের বা সত্যকে অন্যরূপে দেখার হাত থেকে মুক্ত হয়ে নিজ আনন্দময় অবিনাশী স্বরূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য শক্তির আরাধনার প্রয়োজন। কারণ তিনি প্রসন্না না হলে এ মায়া যাবার নয়। বিভিন্ন অধিকারীর উপযোগী বিভিন্নরূপ আরাধনার মধ্যে তন্ত্রে তাই শ্রেষ্ঠ আরাধনা বলেছে বিশ্বের মূল সত্তার সঙ্গে—ব্রহ্মের সঙ্গে, 'নির্গুণা মায়ের'ই সঙ্গে নিজের অভেদত্ব ভাবনাকে। তন্ত্রে যাকে মহাশক্তি, মহামায়া, 'মা' বলছে, বেদান্তে তাকেই ব্রহ্ম বলছে। তাই-ই বিশ্বের মূল সত্তা, তাই-ই আমাদের স্বরূপ। তাঁর সঙ্গে একত্ববোধের প্রয়াসে তাই মায়ার অতি ক্ষীণ আবরণও খুলে, নিজেকে তাঁর সঙ্গে আলাদা ভেবে মায়ের চিন্ময়ী রূপদর্শনেরও পারে যেতে বলছে। ঐ ক্ষীণতম মায়াটুকুরও পারে যেতে বলছে, যে মায়া মায়ের সত্যস্বরূপকে—নির্গুণা নিরাকারা মাকে আমার সত্তার সঙ্গে অভেদ মাকে অন্যরূপে, আমা হতে পৃথক্ সাকাররূপে দেখায়।

বলেছি আমরা, যাঁকে ঈশ্বর বা জগন্মাতা বা মহাশক্তি মা বলি, তাঁর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ হচ্ছে। তাঁর নিকটতম রূপের কল্পনা কালীরূপ। মাতৃরূপের সঙ্গে সৃষ্টি ও পালনের ভাব স্বতই জড়িত, তার সঙ্গে কালীরূপে যুক্ত হয়েছে বিনাশের ভাব। তাই মুক্তিকামী যাঁরা, যাঁরা দেহাত্মবুদ্ধি রেখে ইহ-পরলোকের কোন ভোগই চান না, তাঁদের জন্য তন্ত্রে মা কালীর উপাসনাই সর্বাধিক প্রশস্ত বলেছে।

মায়ের যে কোন রূপই মহাবিদ্যা—তাঁরই অন্যরূপ; এইসব রূপের যে কোনটির আরাধনাতেই ভোগ বা মুক্তি যে যা চায় তাই পায়। তবু, মুক্তিকামীর জন্য তন্ত্রে কালীসাধনার বিশেষ নির্দেশ আছে। নিরুক্ততন্ত্রমতে মহিষমর্দিনী দুর্গাও মহাবিদ্যা। এই দুর্গাপূজায় এক দিন, একদিন কেন, পূজার মধ্যে যে দিনটিকে আমরা বিশেষ পূজার দিন বলে ভাবি সেই দিন—সন্ধিপূজার দিন—মাকে চামুণ্ডারূপে—মা কালীর প্রচলিত রূপের চেয়েও যে রূপে বিনাশের ভাব অধিকতর প্রকট, সেরূপে পূজা করতে হয়।

যে কোন রূপে, যে কোন ভাবে শক্তি-আরাধনার মূল কথাটি যেন না ভুলি আমরা। (স্বামী সারদানন্দের কথায়) যে শক্তি আমাদের ভেতরে রয়েছে সংযম-সহায়ে তার সংরক্ষণ, একাগ্রতার অভ্যাস-সহায়ে অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির উদ্বোধন, এবং যথাযথভাবে সে শক্তি প্রয়োগ ক'রে মহামায়ার কৃপায় নিজের স্বরূপ উপলব্ধি। এটাই যথার্থ শক্তিপূজা।

রামকৃষ্ণ মিশন

বন্যাসেবাকার্য

আবেদন

অস্বাভাবিক বৃষ্টির ফলে দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বন্যায় যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ও বিপর্যয় হইয়াছে, জনসাধারণ সে বিষয় অবগত আছেন। ইতিমধ্যেই নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় দুর্দশাগ্রস্তদের অবস্থা আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন সীমিত সামর্থ্য লইয়া দিল্লীতে, হাওড়া জেলায় বালি থানার অন্তর্গত চাঁদমারী অঞ্চলে, ২৪ পরগণা জেলার রহড়ায় এবং মেদিনীপুর জেলায় ঘাটালে বন্যাপীড়িত জনগণের মধ্যে চিড়া, গুড়, গম, খিচুড়ি ইত্যাদি বিতরণ শুরু করিয়াছে। সাধ্যমত রোগীদের ঔষধপত্রও দেওয়া হইতেছে।

এই সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনমত আরও বৃহত্তর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সেবাকার্য শুরু করার জন্য মুক্তহস্তে অর্থ এবং সাহায্যদ্রব্য দান করিয়া আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে উদারহৃদয় জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকল প্রকার দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

চেক ও ড্রাফট "রামকৃষ্ণ মিশন"—এই নামে লিখিবেন এবং "একাউণ্ট পেয়ী" করিয়া দিবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা -

১। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ ৭১১-২০২, হাওড়া
২। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি ইণ্টালী রোড, কলিকাতা ৭০০-০১৪
৩। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩
৪। রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা ৭০০-০২৯
৫। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান, ৯৯ শরৎ বসু রোড, কলিকাতা ৭০০-০২৬
৬। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই ৪০০-০৫২
৭। রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী ১১০-০৫৫
৮। রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ ৬০০-০০৪

তারিখ, বেলুড় মঠ
১৫ই আগস্ট, ১৯৭১

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

সমালোচনা

শাক্তপদ-শতদল : প্রথম অর্ঘ্য : শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। প্রকাশিকা : শ্রীমতী অঞ্জনা ভট্টাচার্য, ৩৯।১, জয়নারায়ণ ব্যানার্জী লেন, কলিকাতা ৩৬। (১৯৭৬), পৃষ্ঠা ৭০, মূল্য চার টাকা।

বাংলা সাহিত্যে শাক্তসংগীত এক অপূর্ব সংযোজন। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই এর বিশেষ প্রকাশ দেখা দিলেও শাক্তসাধনার ঐতিহ্য বাংলাদেশে বহুযুগের। মঙ্গলকাব্যের মাতৃ-কেন্দ্রিক ঈশ্বরভাবনাই পরবর্তী কালে শাক্ত-গানের শুভসূচনা। রামপ্রসাদ কমলাকান্ত থেকে আরম্ভ ক'রে একালের নজরুল অবধি এই সংগীতধারার বিস্তৃতি। শাক্ত-ভাবসাধনার পথিক কবি আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর একাগ্র নিষ্ঠা ও ভক্তির পরিচায়ক একশোটি শাক্তগানের রক্তপদ্ম জগজ্জননীর চরণপ্রান্তে সাজিয়ে দিয়েছেন। ভাবে ভাষায় ছন্দে গভীরতায় এ গানগুলি বাংলার শাক্ত ঐতিহ্যের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। সেইসঙ্গে তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্তির রূপগত ও ভাবগত বৈচিত্র্যের প্রকাশে রচয়িতার শাস্ত্রীয় চর্চাপ্রসূত মানসিক পরিমণ্ডলটিও সব কটি গানের পটভূমিরূপে এক অভিনব সৌন্দর্য বহন ক'রে এনেছে।

'মায়ের রূপ'-অংশে তন্ত্রোক্ত দেবীর বিভিন্ন রূপমূর্তির ধ্যান-অবলম্বনে গানগুলি বিশেষভাবে পাঠক ও শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। উদাহরণস্বরূপ দুটি গানের উল্লেখ করা যায়—

করালবদনা কালী ভয়ঙ্করী রূপ ধরে,
মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, কণ্ঠে মুণ্ডমালা পরে।
বাম অধোহস্তে মুণ্ড, খড়্গ শোভে ঊর্ধ্ব করে,
অভয় ও বরমুদ্রা দক্ষহাতে পুত্র তরে॥
মহামেঘসমপ্রভা, শ্যামবর্ণা দিগম্বরী,
মুণ্ডমালা বিনির্গত রক্তে সিক্ত মহেশ্বরী।
ভীমাকৃতি রূপ আরো শবযুগ্ম কর্ণে পরি,
ঘোরদংষ্ট্রা, করালাস্যা, পীনোন্নতপয়োধরী॥

(পৃঃ সতেরো)

সুপ্রচলিত দক্ষিণকালিকার ধ্যানমন্ত্রের সহজ বাংলা রূপান্তরে লেখক এটিকে সুরারোপের উপযোগী বাংলা গানে পরিণত করেছেন।

'দশমহাবিদ্যা'র বিভিন্ন ধ্যানমন্ত্রের অনুবাদেও লেখকের স্বাভাবিক দক্ষতা প্রকাশিত। 'শারদাতিলক' থেকে ভুবনেশ্বরীর কয়েকটি ধ্যানের মধ্যে একটি ধ্যান লেখক পাদটীকায় উদ্ধৃত করেছেন—

'উদ্যদ্দিনকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং
তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশা-
ভীতিকরাং প্রভজেদ্ভুবনেশীম্॥'

যদিও উদ্ধৃতিটি শুদ্ধ নয় (শুদ্ধ পাঠ : উদ্য-দিনদ্যুতি···ইত্যাদি। উদ্যৎ + ইনদ্যুতি। ইন = সূর্য। ছন্দঃ দোধক - প্রতি চরণে ১১ অক্ষর), তবু অর্থের কোন হেরফের হয়নি—পদ্যানুবাদটিও হয়েছে মনোরম—

নবোদিত সূর্য সম আলো করা অবনীর—
দেহপ্রভা দ্যুতিময়ী ভুবনেশ্বরী জননীর।
কপালেতে অর্ধ-ইন্দু, বিগলিত সুধাসিন্ধু,
উত্তুঙ্গ যুগলস্তন মনোরমা ঈশ্বরীর॥
চতুর্ভুজার নিম্নহাতে বর ও অভয় মুদ্রা আছে,
অঙ্কুশ ও পাশ অস্ত্র ঊর্ধ্ব দুটি হস্তে সাজে।
জননী সে ত্রিনয়নী হাস্যময়ী সুবদনী,
মস্তকেতে মনোলোভা কিবা শোভা কিরীটির॥

(পৃঃ পঁচিশ-ছাব্বিশ)

শাক্তপদাবলীর অন্তর্নিহিত একান্ত শরণাগতি ও নির্ভয় আত্মোপলব্ধির সুরটি লেখক সার্থকভাবেই অনুধাবন করেছেন। 'নাম-মাহাত্ম্য', 'মায়ের লীলা', 'ভক্তের আকুতি' প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে মাতৃভাবতন্ময় কবিচিত্তের প্রকাশ পাঠককেও অনেকখানি পরিতৃপ্তির আস্বাদ দেয়। 'সমন্বয়'-অংশে বহুরূপে প্রকাশিতা জগন্মাতার অখণ্ড অভেদ রূপটি শাক্ত ঐতিহ্যের মহাপরিণামের স্মৃতিবহ। আবার বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বৈষ্ণব ও শাক্ত চেতনার শুভসম্মেলনে লেখকের 'আত্মসমর্পণ' তাৎপর্যমণ্ডিত। সব মিলিয়ে কবি-হৃদয়ের অনুভবে—

কালীর নামে পাড়ি দে তুই ভব-সিন্ধু রে,
পারে গেলে দেখতে পাবি পরাণ-ইন্দু রে।
নেই কিনারা অথই জলে,
হারায় দিশা পলে পলে,
বিশাল সিন্ধু মাঝে তো তুই একটি বিন্দু রে॥
(পৃঃ ছত্রিশ)

আলোচ্য কাব্যে ভক্তহৃদয়ের ব্যাকুলতার সঙ্গে শাস্ত্রীয় ধ্যানধারণার নিপুণ অঙ্গাঙ্গী বিন্যাসে কবির বৈশিষ্ট্য পাঠকদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করবে সন্দেহ নেই। তবে কবিতার বিচারে কবির নিজস্ব ভাব ও ভাষার জগৎ এখনও অপেক্ষিত। সংগীতের এই শতদল-রচনার প্রয়াস কালে মৌলিক কাব্যসিদ্ধির সহস্রদলে বিকশিত হোক—এই প্রার্থনা।

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারত: গত অগস্ট মাসে (১৯৭৭) পশ্চিমবঙ্গ দিল্লী ও আসামে বন্যাত্রাণকার্য আরম্ভ করা হয়। ঐ মাসে রামকৃষ্ণ মিশন ২৪ পরগণা জেলার রহড়ায় খিচুড়ি চিঁড়া ও গুড়; মেদিনীপুর জেলার এগ্‌রা রামনগর ও ঘাটালে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দিতে গম; হাওড়া জেলার চাঁদমারীতে চিঁড়া গুড় গম ও গুঁড়া দুধ বিতরণ করে। চাঁদমারীতে রোগীদের চিকিৎসাও করা হয়। দিল্লীতে বন্যাপীড়িতদের মধ্যে খিচুড়ি বিতরিত হয়।

বাংলাদেশ: বাগেরহাট ঢাকা দিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা ও গুঁড়া দুধ বিতরণ অব্যাহত আছে।

দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি:

স্বামী সৌম্যানন্দ (দেবেন মহারাজ) গত ৪ঠা অগস্ট (১৯৭৭) সকাল ৯-৪৫ মিনিটে ৮২ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। মস্তিষ্কাংশের ক্ষয়জনিত অসুখ ও শ্বাসযন্ত্রে রোগজীবাণু-সংক্রমণের ফলেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৫ সালে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি সংঘের শ্রীহট্ট কেন্দ্রে যোগদান করেন। শ্রীহট্ট শিলং ও ভুবনেশ্বর কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত তিনি নানাভাবে সংঘের সেবা করিয়া গিয়াছেন। আসামের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু ভক্ত তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভক্তগণ কর্তৃক পরিচালিত ত্রিশটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সুগায়ক এবং তবলা ও মৃদঙ্গ বাদনেও সুদক্ষ ছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ ডিগবয় পাণ্ডু ও অবশেষে বেলুড় মঠে তিনি অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন। কয়েক মাস পূর্বে বেলুড় মঠ হইতে তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ

করা হয়। তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা ও সহৃদয়তার জন্য তিনি সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (শুদ্ধ মহারাজ) গত ২৫শে অগস্ট (১৯৭৭) বেলা ৩-১০ মিনিটে ৭৮ বৎসর বয়সে আলমোড়ায় দেহত্যাগ করেন। বৃক্ক-বৈকল্যের ফলেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। ১৯২১ সালে তিনি সংঘের বরানগর কেন্দ্রে যোগদান করেন। ভুবনেশ্বর ও আলমোড়া কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত তিনি ঢাকা বাঁকুড়া ও জয়রামবাটী কেন্দ্রের এবং বেলুড় মঠেরও কর্মী-রূপে নানাভাবে সংঘের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বাংলা ও উড়িষ্যায় ত্রাণকার্যও পরিচালনা করেন। সরলতা ও একান্ত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা তাঁহার চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

আরারিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ২০শে হইতে ২৭শে ফেব্রুআরি আশ্রমের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ২০শে মঙ্গলারতি উষাকীর্তন বিশেষ পূজা হোম ও ভক্ত নরনারীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় শ্রীঅনিলকুমার বসু, শ্রীশক্তিভূষণ দাস, শ্রীনিরঞ্জন দাসগুপ্ত, শ্রীহীরালাল ঝাঁ ও সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সেন ভাষণ দেন। ২১শে সকালে বালক-বালিকাদের ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা ও বিকালে শ্রীহীরালাল ঝাঁ কর্তৃক 'কৃষ্ণায়ণ' পাঠ; ২২শে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের শ্রীরামকৃষ্ণ-দেব সম্বন্ধে আবৃত্তি ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা; ২৩শে হস্তশিল্প-প্রদর্শনী; ২৪ ও ২৫শে শ্রীনিখিল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণগান; ২৬শে অষ্টপ্রহর নামকীর্তন ও ২৭শে পূজা পাঠ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া নগর-পরিক্রমা হয়। প্রায় পনের শতাধিক নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। পরে ধর্মসভায় ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীভরতপ্রসাদ শর্মা ও সভাপতি স্বামী বিকাশানন্দ।

পরলোকে

পাটনার বিশিষ্ট ভক্ত **মহাদেব মুখোপাধ্যায়** বিগত ২৭শে জুলাই (১৯৭৭) তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের রাঁচিস্থিত বাসভবনে ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন ১৯২৩ সনের মে মাসে। পূজ্যপাদ মহা-পুরুষ মহারাজ মহাদেববাবুর পাটনার বাড়ী 'শিবানন্দ ধামে' ১৯২৮ সনের ফেব্রুআরি মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন ও পূজা করেন এবং রাত্রিবাস করেন। পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজও তাঁহার পাটনার বাড়ীতে অবস্থান করেন এবং কালীপূজা করেন। পাটনা শ্রীরাম-কৃষ্ণ আশ্রমের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং আশ্রমস্থ হোমিওপ্যাথিক্ ডিস্‌পেনসা-রিতে কার্যভার গ্রহণ করিয়া সেবাকর্ম করিয়া-ছিলেন। মহাদেববাবু কর্মজীবনে ডাক বিভাগে কাজ করিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-রূপে অবসর গ্রহণ করেন। ভক্তি-বিশ্বাস সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। মহাপুরুষজী ও বিজ্ঞানানন্দজীর পূত সঙ্গলাভে ধন্য তিনি তাঁহাদের স্মৃতিচারণা করিয়াছেন 'শিবানন্দ স্মৃতিসংগ্রহ', ৩য় ভাগে এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সংখ্যায়। তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়—আমাকে ভক্তি, বিশ্বাস দাও। বিশ্বাস হয়ে গেলেই হ'লো। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন। মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা।

প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।

—শ্রীসারদাদেবী

মনমুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি—'হে ভগবান, তুমি আমার সর্বস্ব ধন' এবং মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে ব'সে রয়েছি; এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

বাসনার লেশমাত্র থাকলে ভগবান লাভ হয় না। মন যখন বাসনারহিত হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের এখন এমন ধর্ম চাই যাহা আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে। আমাদের এমন সব মতবাদ আবশ্যক, যেগুলি আমাদিগকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে। যাহাতে মানুষ গঠিত হয় এমন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান। তিনি সর্বভূতে আছেন বটে, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। যেমন কোনও জমিদার জমিদারীর সকল স্থানে থাকতে পারে, তবে অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায়ই থাকেন, এই কথা লোকে বলে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব
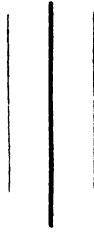
বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল, তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।

ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে।

-শ্রীরামকৃষ্ণদেব

গুরুই ধর্মশিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির সহিত তাহার বংশধরের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত শিষ্যেরও ঠিক সেই সম্বন্ধ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনয়নম্র আচরণ, তাঁহার নিকট শরণগ্রহণ ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্মের বিকাশ হইতেই পারে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

যতদিন না হিন্দুজাতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং এক নূতন জাতি তাহার স্থান অধিকার করে, ততদিন প্রাচ্যে প্রতীচ্যে যতই চেষ্টা কর না কেন, জীবিত থাকিতে ভারত কখনও ইওরোপ হইতে পারে না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

তুমি তো মা ছিলে ভুলে আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা জানে না সে আমা বই।
ভাঙ্ খেয়ে মা সদাই আছে
থাকতে হয় মা কাছে কাছে
ভাল মন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি তাই॥
দিতে হয় মা মুখে তুলে, নয়তো খেতে যায় গো ভুলে,
ক্ষেপার দশা ভাবতে গেলে আমাতে আর আমি নই।
ভুলিয়ে যখন এলাম ছলে
(ওমা) ভেসে গেল নয়ন জলে
একলা পাছে যায় গো চলে আপন হারা এমন কই॥

—গিরীশচন্দ্র ঘোষ

মাছ যতদূরে থাক না, ভাল ভাল চার ফেলবামাত্র যেমন তারা ছুটে আসে, ভগবান্ হরিও সেইরূপ বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র এসে উদিত হন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

কোলে
বিস্কুট
লজেন্স
জ্যাম জেলী আচার
স্কোয়াশ
ORANGE SQUASH
বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
৭০০ ০৫০
K B—3/74/B.

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪১, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬. মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই) ; ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরত্তি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী আনাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬; মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। (ছাপা নাই)

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৬২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৮০, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ প্রসঙ্গ— (ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে— স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৫২, মূল্য ৩'৩০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০,

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

'উদ্বোধন' ১ম বর্ষ (পুনর্মুদ্রণ)। (যন্ত্রস্থ)

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৭৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি — স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্ — স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ— স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি — স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র —স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬৩, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০ ; ৩য় অঃ ১৩'০০ ; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি —
পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮১, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব —স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ-চরিত — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। পৃঃ ২৭৪, মূল্য ১০'০০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ২'০০ (ছাপা নাই)

ছোটদের বিবেকানন্দ — স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৬২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

দশের কল্যাণে
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

Udbodhan—Phone : 55-2447 SEPTEMBER 1977 Regd. No. WB/NC-19

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৯তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনাঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥৹টা হইতে ১১টা; বিকাল ২॥৹টা হইতে ৫॥৹টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

সূচীপত্র

সূচীপত্র

ডাঃ পি. মজুমদারের
এন্টিকার্বাঙ্কল
কার্বাঙ্কল কিওর (রেজিঃ)
কার্ব্বঙ্কল, শোষ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া বা
পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল
লাগাইলেই সারিয়া যায়
বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে রোগ মুক্তি
সেলিং এজেন্ট—লিটন এণ্ড কোং কলিকাতা-১৩
IT CUTS
IT CLEANSES
IT CURES

বেনারসী
সিল্ক
সাড়ী
পোষাক
শৈলেন মণিলাল
স্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট • কলি-১২
(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)
বঙ্গবাজার ৩৫-৮৬৩৭
শ্যামবাজার ৫৫-২০০৭
কাশ্মিরী
শাল
বিছানা
হোসিয়ারী

পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জী
সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

"ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে আর এক হাতে কাজ করবে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধ'রে থাকবে, তখন নির্জনে বাস ক'রবে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা ক'রবে।" —শ্রীরামকৃষ্ণদেব

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

উদ্বোধন, ৮০তম বর্ষ, ১৩৮৪-৮৫

নিবেদন

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৭৯তম বর্ষ শেষ হইবে। আগামী মাঘ (১৩৮৪) মাসে পত্রিকা ৮০তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের (১৯৭৭) মধ্যে তাঁহাদের পুরা নাম ও ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ষিক চাঁদা ১২৲ টাকা (ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩.০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১.০০ টাকা) মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। তৎপূর্বে, কার্তিক সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানি যদি ইতিমধ্যে না পাঠাইয়া থাকেন, তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব উহা পূরণ করিয়া জানাইবেন—মনিঅর্ডার-যোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে গ্রহণ করিতে চান; কার্ডটিতে ১৫ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন। ভি. পি. পি.-তে লইলে ১৫৲ টাকা ৮০ পয়সা লাগিবে।

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহাও উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন।

উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১২৲ টাকা না আসিলে অথবা কোন পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা পাঠানো হইবে না। কারণ ভি পি পি ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়; সেজন্য সংলগ্ন কার্ডখানি অতি অবশ্যই অবিলম্বে পূরণ করিয়া পাঠাইবেন।

সুদীর্ঘ ৭৯ বর্ষ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়: { সকাল ৭॥—১১টা; বিকাল ২॥—৫টা }

[রবিবার অফিস বন্ধ থাকে]

কার্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

দিব্য বাণী

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ং
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ ॥

—ভর্তৃহরি : বৈরাগ্যশতকম্, ৩১

বিষয়ভোগেতে সদা থাকে রোগভয়
(কখন কি রোগে ধরে বলা নাহি যায় !)
উচ্চকুলে জন্ম হ'লে (আচারদোষেতে)
চ্যুতিভয় থাকিবেই (মর্যাদা হইতে)।
বিত্তের সঞ্চয় হ'লে নৃপ হ'তে ত্রাস—
(যদি মোর ধনরত্ন নৃপ করে গ্রাস !)
মানে অপমান- আর শৌর্যে শত্রু-ভয়
সুন্দর রূপেতে সদা জরাভয় হয়।
বিচারকুশলী হ'তে শাস্ত্রজ্ঞের ভয়
খল-অপবাদ-ভয় গুণীদের রয়।
দেহ থাকিলেই সদা হয় মৃত্যুভয়
(যদিও সবাই জানে দেহ নিত্য নয়)।
সকল বস্তুর সাথে ভয়ের অন্বয়
এ জগতে একমাত্র বৈরাগ্য অভয়।

কথাপ্রসঙ্গে

বৈরাগ্য

'মৃত্যুর পর কোথায় যাইব?'—এই চিরকালের প্রশ্ন সমস্ত চিন্তাশীল মানুষেরই মনে জীবনের কোন-না-কোন সময়ে জাগে। যুবকদের মনে এই প্রশ্ন সাধারণতঃ না জাগিলেও প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের মনে অবশ্যই জাগিয়া থাকে। শেষের দিন যতই ঘনাইয়া আসিতে থাকে, বৃদ্ধগণ ততই চিন্তামগ্ন হন। অনেকেই আকাশ-পাতাল ভাবিয়াও কোন কূল-কিনারা পান না। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র ও মহাজনগণের কথায় আস্থাবান, তাঁহাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, লোক-লোকান্তর আছেই এবং মৃত্যুর পর মনুষ্যগণ নিজ নিজ কর্মানুসারে সেই সেই লোকে গমন করিয়া থাকেন।

ইহলোক আমাদের প্রত্যক্ষ—শাস্ত্রের ভাষায় 'দৃষ্ট'; পরলোক অপ্রত্যক্ষ—শাস্ত্রের ভাষায় 'অ-দৃষ্ট'। যাহা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিব কেন?—ইহা মূর্খের প্রশ্ন। এমন সব নক্ষত্র আছে, যাহাদের আলোক এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে আসিয়াই পৌঁছায় নাই—এতদূরে তাহারা রহিয়াছে। তাহাদের আমরা দেখি না। সূর্যাপেক্ষাও অনেক বড় বড় নক্ষত্র আছে। তাহাদের বৃহত্ত্বের চাক্ষুষ পরিচয় আমরা পাই না। তথাপি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই সকল কথা আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারি, পক্ষান্তরে ঋষিদের কথাতেই যত সংশয়! কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে লোক-লোকান্তরও একান্ত অদৃষ্ট নহে। এই মর্তের মানুষেরই মন যখন সাধনার প্রভাবে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, তখন সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মতর লোক-লোকান্তর সেই মনের দৃষ্টিগোচর হয়। সাধনার অভাবে আমাদের মন স্থূল জগতেই আবদ্ধ থাকে, সূক্ষ্ম জগতের কোনও সন্ধানই পায় না, তাই পরলোককে অদৃষ্ট বলা হয়। উহা অদৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু অদৃশ্য নহে।

বেদ-বেদান্ত এবং গীতাদি শাস্ত্রে আমরা লোক-লোকান্তরের উল্লেখ পাই। বৈরাগ্যের মহিমা-কীর্তন প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ মনুষ্যলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত কয়েকটি লোকের বর্ণনা করিয়াছেন। মনুষ্য-লোকে প্রকৃষ্টতম আনন্দ কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলিতেছেন:

> যদি কেহ যুবক হয়, শুধু যুবক নহে, সচ্চরিত্র কৃতবিদ্য সুগঠিতদেহ বলিষ্ঠ যুবক হয় এবং বিত্তপূর্ণ সমগ্র ধরণীর অধীশ্বর হয়, তাহা হইলে তাহার যে আনন্দ, সেই আনন্দই মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ। কিন্তু মনুষ্যগন্ধর্বগণের আনন্দ এই আনন্দেরও শতগুণ অধিক।

মনুষ্যগন্ধর্বগণের পরিচয় দিতে গিয়া শংকরাচার্য অনেক কথা লিখিয়াছেন—পড়িলে মনে হয় যেন ঐ লোক তাঁহার অদৃষ্ট নহে। তিনি লিখিয়াছেন:

> একদা যাঁহারা মানুষ ছিলেন এবং কর্ম ও বিদ্যাবিশেষের ফলে গন্ধর্ব হইয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্যগন্ধর্ব। তাঁহারা অন্তর্ধান প্রভৃতি কার্যের অনুকূল শক্তিসম্পন্ন। তাঁহাদের শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ অতি সূক্ষ্ম। এই কারণে তাঁহাদের বাধাবিঘ্ন অতি অল্প এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-প্রতিকারের

সামর্থ্যও প্রচুর। অপ্রতিহত প্রতিকার-সামর্থ্য থাকায় তাঁহাদের চিত্তের প্রসন্নতা অনিবার্য। চিত্তের এই প্রসাদ-প্রাচুর্যই তাঁহাদের মানবীয় প্রকৃষ্টতম আনন্দের শতগুণ আনন্দ-প্রাপ্তির কারণ।

এই মনুষ্যগন্ধর্বগণের যে আনন্দ, দেবগন্ধর্বগণের আনন্দ তাহার শতগুণ। এইভাবে বিভিন্ন লোকে উত্তরোত্তর আনন্দের শতগুণিত উৎকর্ষ দেখাইয়া তৈত্তিরীয় উপনিষদ ব্রহ্মলোকেই যে সংসারমণ্ডলের যাবতীয় আনন্দের পরাকাষ্ঠা, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, যদি কোন মানুষ বৈরাগ্যবান হয়, তাহা হইলে বৈরাগ্যের তারতম্য অনুসারে সে এই পৃথিবীতে থাকিয়াই মনুষ্যগন্ধর্বাদি উত্তরোত্তর সমস্ত লোক-লোকান্তরের আনন্দ লাভ করিতে পারে ; আর যাঁহার বৈরাগ্য এত অধিক যে, ব্রহ্মলোকের আনন্দেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, তিনিই অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন অর্থাৎ স্বীয় আনন্দস্বরূপতা উপলব্ধি করেন।

শংকরাচার্যও তাঁহার 'অপরোক্ষানুভূতি' গ্রন্থে এই তীব্র বৈরাগ্যের অনুরূপ পরিচয় দিয়াছেন :

ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্মলম্॥

—কাকবিষ্ঠায় ঘৃণার ন্যায়, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত অর্থাৎ সংসারমণ্ডলের যাবতীয় বিষয়ে যে বৈরাগ্য, তাহাই নির্মল বৈরাগ্য।

গীতার ষষ্ঠ, ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে 'বৈরাগ্য' শব্দটির উল্লেখ আছে—সর্বত্রই শংকরাচার্য ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, বৈরাগ্যের অর্থ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভোগ্যবিষয়ে বিতৃষ্ণা। উক্ত ব্যাখ্যাত্রয়ের এক জায়গায় লিখিয়াছেন, 'বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টেষ্ট-ভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাৎ বৈতৃষ্ণ্যম্।' অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অভিলষিত ভোগসমূহে দোষদর্শনের অভ্যাসহেতু বিতৃষ্ণাই হইল বৈরাগ্য। এই ব্যাখ্যার ব্যঞ্জনা হইতেছে—মুষ্টিমেয় লোকেরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৈরাগ্য হয়, অধিকাংশ মানুষকেই বৈরাগ্যের জন্য বিষয়ে দোষদর্শনরূপ অভ্যাস করিতে হয়। বিচারের দ্বারা ক্রমাগত দোষ-দর্শনের ফলে বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান যেখানে জ্ঞানের সাধন হিসাবে জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধিতে দুঃখরূপ দোষ দর্শন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, সেখানেও শংকরাচার্য ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, ঐভাবে দোষদর্শনের ফলে শরীর, ইন্দ্রিয়সমূহ ও বিষয়ভোগে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়।

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে দুই প্রকার বৈরাগ্যের উল্লেখ করিয়াছেন—অপরবৈরাগ্য ও পরবৈরাগ্য। প্রথমটিকে তিনি 'বশীকার' বৈরাগ্য বলিয়াছেন। 'বশীকার' বৈরাগ্য বিষয়ে তাঁহার সূত্র : 'দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্' (১।১৫)। 'অনুশ্রব' শব্দের অর্থ বেদ। আনুশ্রবিকের অর্থ বেদ-বোধিত স্বর্গাদি ফল। 'সংজ্ঞা' শব্দের অর্থ সম্যক্ জ্ঞান। 'বশীকার-সংজ্ঞা' অর্থাৎ 'বিষয়-সমূহ আমার বশীভূত, আমি উহাদের বশীভূত নহি'—এইরূপ সম্যক্ জ্ঞান। সুতরাং সম্পূর্ণ সূত্রটির তাৎপর্য হইল : ঐহিক ও পারত্রিক যাবতীয় ভোগ্য বিষয়ই নশ্বর ও দুঃখবিদ্ধ—এইভাবে দোষদর্শন করিয়া যিনি বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়াছেন এমন ব্যক্তির—'বিষয়সমূহ আমার বশীভূত, আমি উহাদের বশীভূত নহি'—এইরূপ যে সম্যক্ জ্ঞান, তাহারই নাম বৈরাগ্য। এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যের উপর বাচস্পতি মিশ্রের

'তত্ত্ববৈশারদী'-টীকায় নানা দিক হইতে বিষয়টির যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে, তাহার অনুসরণে বলা যাইতে পারে, মহর্ষি তো সূত্রটিকে আরও ছোট করিয়া বলিতে পারিতেন —দৃষ্টানুশ্রবিক-বিষয়-বৈতৃষ্ণ্যং বৈরাগ্যম্। আর সূত্র যত অল্পাক্ষর হয়, ততই তাহার গৌরব! কিন্তু ইহাতে এই দোষ হয় যে, তাহা হইলে মর্কটবৈরাগ্য, শ্মশানবৈরাগ্য এবং আধি-ব্যাধি-ও ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতা-হেতু বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাও প্রকৃত বৈরাগ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এইজন্যই 'বশীকার' শব্দটির প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। বিষয়ে দোষদর্শনের অভ্যাসের ফলে লৌকিক ও অলৌকিক যে-কোন ভোগ্য বিষয়ই যোগীর নিকট উপস্থিত হউক না কেন, অবাধে উহা ভোগ করিবার সামর্থ্য থাকিলেও, উহাতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা-বুদ্ধি থাকায় তাঁহার বৈরাগ্যই যথার্থ বৈরাগ্য।

বাচস্পতি মিশ্র আরও বলিয়াছেন, আগমবিদ্‌গণ বলেন, এই 'বশীকার' বৈরাগ্যের পূর্ববর্তী আরও তিন প্রকারের বৈরাগ্য আছে। যথা, 'যতমান' বৈরাগ্য, 'ব্যতিরেক' বৈরাগ্য ও 'একেন্দ্রিয়' বৈরাগ্য। চিত্তে যে বিষয়ানুরাগ রহিয়াছে, তাহার ফলে ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়; সেই বিষয়ানুরাগ দূর করিবার জন্য সাধক যখন ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে বিরত করিবার জন্য প্রযত্নশীল হন, তখনই তাঁহার 'যতমান' বৈরাগ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রযত্নের ফলে সাধকের কোন কোন বিষয়ে আসক্তি দূর হয়, অন্যান্য বিষয়ে আসক্তি থাকিয়া যায়। সাধক তখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহার আসক্তি রহিয়া গিয়াছে এবং তদ্‌ব্যতিরিক্ত কোন্ কোন্ বিষয়ে তিনি অনাসক্ত হইতে পারিয়াছেন। এইরূপ ব্যতিরেকে অবধারণের পর যে যে বিষয়ে আসক্তি রহিয়া গিয়াছে তিনি সেই সেই বিষয়ে আসক্তি দূর করিতে প্রয়াসী হন। ইহাই 'ব্যতিরেক' বৈরাগ্যের অবস্থা। আরও অগ্রসর হইলে সাধকের ইন্দ্রিয়সমূহ কোনও ভোগ্যবিষয়েই প্রবৃত্ত হয় না। তথাপি তাঁহার মনে বিষয় সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে কিছু-না-কিছু উৎসুকভাব থাকে। এই অবস্থাকে 'একেন্দ্রিয়' বৈরাগ্য বলা হয়। স্মরণীয় যে, মনও একটি ইন্দ্রিয় (তুলনীয়: 'ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ', গীতা, ১৩।৬; 'মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি', গীতা, ১৫।৭ ইত্যাদি)। 'একেন্দ্রিয়' বৈরাগ্যের পরবর্তী অবস্থায় মনে বিষয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও ঔৎসুক্য থাকে না। ইহাকেই 'বশীকার' বৈরাগ্য বলা হয়।

মধুসূদন সরস্বতী ও বেদান্তদেশিক তাঁহাদের গীতাটীকায় এই চতুর্বিধ অপরবৈরাগ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়েই বাচস্পতি মিশ্রের অনেক পরবর্তী যুগের মানুষ। সুতরাং এইরূপ অনুমান করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত হইবে না যে, সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এই উভয় আচার্য আলোচ্য বিষয়টির ব্যাখ্যা সম্পর্কে বাচস্পতি মিশ্রের নিকট ঋণী। 'যতমান' বৈরাগ্যের ব্যাখ্যায় মধুসূদন যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ: 'এই জগতে কি সার এবং কি অসার, তাহা গুরু ও শাস্ত্র-সহায়ে আমি জানিব'—এই প্রকার উদ্যোগের নাম 'যতমান' বৈরাগ্য। আমাদের মনে হয়, মধুসূদনের এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা অনেক বেশী সমীচীন। কারণ, শেষোক্ত ব্যাখ্যায় যে-ধারায় 'ব্যতিরেক' প্রভৃতি বৈরাগ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই ধারা অব্যাহত আছে, অধিকন্তু 'যতমান' শব্দটির ব্যঞ্জনাও এই ব্যাখ্যায় অধিকতর পরিস্ফুট। অপর তিনটি বৈরাগ্যের ব্যাখ্যায় মধুসূদন বাচস্পতি মিশ্রকেই অনুসরণ করিয়াছেন।

বেদান্তদেশিক রামানুজভাষ্যের প্রখ্যাত টীকাকার। রামানুজ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ হইতে ৫৮ শ্লোকে স্থিতপ্রজ্ঞগণকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 'প্রজহাতি যদা কামান্' ইত্যাদি ৫৫-শ্লোকোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞই সর্বশ্রেষ্ঠ ; পরবর্তী শ্লোকত্রয়ে নিকৃষ্ট, নিকৃষ্টতর ও নিকৃষ্টতম স্থিতপ্রজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে— ইহাই রামানুজের অভিমত। বেদান্তদেশিক লিখিয়াছেন, ৫৫-শ্লোকে 'বশীকার' বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে এবং পরবর্তী শ্লোকত্রয়ে যথাক্রমে 'একেন্দ্রিয়', 'ব্যতিরেক' ও 'যতমান' বৈরাগ্যের কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোক-চতুষ্টয়ের উপর রামানুজের ভাষ্য অভিনব হইলেও, কতটা যুক্তিপূর্ণ তাহা সুধীগণের বিচার্য। শংকরাচার্য, শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ অদ্বৈতবাদী আচার্যগণ, এমন কি যাঁহারা অদ্বৈতবাদী নহেন, রামানুজ ভিন্ন সেই সকল আচার্যগণও তাঁহাদের টীকা-ভাষ্যে এইরূপ শ্রেণীবিন্যাস করেন নাই। অর্জুনের প্রশ্ন এবং শ্রীভগবানের উত্তর বিশ্লেষণ করিলে এই শ্রেণীবিন্যাস কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। 'যতমান' বৈরাগ্যের ব্যাখ্যায় (গীতা, ২।৫৮) বেদান্তদেশিক বলপূর্বক ইন্দ্রিয়-গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কূর্মের দৃষ্টান্তের সহিত তাহার কোনও সামঞ্জস্য হয় না। ভীতির কারণ উপস্থিত হইলে কূর্মকে স্বীয় মস্তক শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইতে বা করচরণাদি সঙ্কুচিত করিতে বলপ্রয়োগ করিতে হয় না— আপনা হইতেই ঐ সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীধরস্বামীও লিখিয়াছেন : 'অনায়াসেন সংহারে দৃষ্টান্তঃ— অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্মো যথা স্বভাবেন এব আকর্ষতি তদ্বৎ।' অর্থাৎ বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের প্রত্যাহার স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কিরূপ অনায়াসে হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত হইতেছে কূর্ম ; সে স্বভাবতই— স্বতঃস্ফূর্তভাবেই—নিজ করচরণাদি অঙ্গসমূহ আকর্ষণ করিয়া থাকে। অনুরূপভাবে বেদান্ত-দেশিকের 'ব্যতিরেক', 'একেন্দ্রিয়' ও 'বশীকার' বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে গীতার অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিনটি শ্লোকের উল্লেখও যুক্তি-সঙ্গত মনে হয় না। ঠিক ঠিক বলিতে গেলে পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত 'পরবৈরাগ্য', যাহার পরিণতি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে, তাহার অধিকারী না হইলে স্থিতপ্রজ্ঞত্ব আসিতেই পারে না। কিন্তু রামানুজ-দর্শনে চিত্তের যাবতীয় বৃত্তির নিরোধস্বরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্থান নাই। এই কারণে বেদান্তদেশিক 'বশীকার' বৈরাগ্যকেই পরম বৈরাগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের চির-পরিচিত গীতার শ্লোকে 'যতমান' প্রভৃতি চতুর্বিধ বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত পাইলে আমরা অবশ্যই সুখী হইতাম। কারণ, সকলেই জানেন, সংজ্ঞা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বোধসৌকর্যে অনেক বেশী সহায়ক। কিন্তু বেদান্তদেশিকের ব্যাখ্যা আমাদের পরিতৃপ্ত করে না। উপরি-উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ের কোথাও আমরা যতমানাদি বৈরাগ্যবানের লক্ষণ দেখিতে পাই না— জীবন্মুক্তেরই লক্ষণ দেখি।

'অপরবৈরাগ্য' লইয়া আমরা অনেক আলোচনা করিলাম। এইবার 'পরবৈরাগ্যে'র প্রসঙ্গ। পরবৈরাগ্যের প্রয়োজন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির জন্য, কারণ 'বশীকার' বৈরাগ্যের দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি পর্যন্ত হয়, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় না। আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ব্যতীত কৈবল্যও হইতে পারে না। সুতরাং পরবৈরাগ্য কী, স্বভাবতই এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। এই বিষয়ে মহর্ষি পতঞ্জলির সূত্র : 'তৎ

পরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্।' (১।১৬)। 'খ্যাতি' শব্দের অর্থ জ্ঞান। পুরুষ অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান হইলে গুণের প্রতি যে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহার নাম পরবৈরাগ্য। সূত্রটির তাৎপর্য এই যে, চিত্তের যে সত্ত্বগুণাত্মিকা বৃত্তির সহায়ে যোগী উপলব্ধি করেন যে, আত্মা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে ভিন্ন—আত্মা চৈতন্য-স্বরূপ, প্রকৃতি জড়া, আত্মা নির্বিকার, প্রকৃতি পরিণামিনী; আত্মা শুদ্ধ, প্রকৃতি অশুদ্ধা ইত্যাদি—সেই চিত্তবৃত্তি প্রকৃতিরই অন্তর্গত হওয়ায় তাঁহার ঐ সত্ত্বগুণাত্মিকা চিত্তবৃত্তির উপরও বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং তিনি ঐ বৃত্তিটিকেও নিরুদ্ধ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভে প্রয়াসী হন। 'বশীকার'-বৈরাগ্যহেতু তাঁহার তো রজঃ ও তমঃ গুণের প্রতি বিরাগ স্বভাবসিদ্ধই হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সত্ত্বগুণের যে বিশেষ বিকাশের ফলে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান তাঁহার নিকট সুপরিস্ফুট হইয়াছে, তাহার প্রতিও তাঁহার বৈরাগ্য সমুৎপন্ন হয়। 'গুণবৈতৃষ্ণ্যম্' শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে। এই পরবৈরাগ্যের প্রসঙ্গ মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনের তৃতীয় পাদেও (৩।৪৯-৫০) একটু অন্যভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি ও আত্মার ভেদজ্ঞান হইতে যোগীর সর্ব-শক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞত্ব লাভ হয়। এই উভয় সিদ্ধির প্রতিও বৈরাগ্য হইলে অবিদ্যাদি দোষের অঙ্কুর পর্যন্ত বিনষ্ট হওয়ায় মুক্তিলাভ ঘটে। সুতরাং পরবৈরাগ্যের অর্থ সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞত্বের প্রতিও বৈরাগ্য।

দার্শনিকতার উত্তুঙ্গ শিখর হইতে আমরা এখন আমাদের অতি পরিচিত শ্যাম-স্নিগ্ধকর সমতল ভূমিতে অবতরণ করিতেছি—বেদান্ত ও যোগদর্শনের সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ হইতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথায় আসিতেছি। জটিল দার্শনিকতা আমাদের বিস্ময়াহত করে, সরল কথা মুগ্ধ করে। যদিও তত্ত্ব উভয় ক্ষেত্রে একই, তথাপি পরিবেশনার তারতম্যে বিস্তর পার্থক্য থাকিয়া যায়। উচ্চ দার্শনিকতা সকলের জন্য নহে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা ও গল্প সকলেরই জন্য। 'কথামৃতে' আমরা তিন ডাকাতের গল্পটি একাধিকবার পাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, 'সত্ত্বগুণও চোর, তত্ত্বজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু সেই পরম-ধামে যাবার পথে তুলে দেয়। দিয়ে বলে, ঐ দেখ তোমার বাড়ি দেখা যায়।' আমরা পরবৈরাগ্য প্রসঙ্গে মহর্ষি পতঞ্জলির সূত্রের যে আলোচনা করিয়াছি, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত এই গল্পটির নিগূঢ় তাৎপর্য অনায়াসে বুঝিতে পারি। চিত্তের যে উচ্চতম সাত্ত্বিক বৃত্তির ফলে 'পুরুষখ্যাতি' উপস্থিত হয়, সেই বৃত্তিও সাধককে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ করিতে পারে না। সেই বৃত্তিকেও নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সাধক স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন। স্বরূপই জীবের 'পরম-ধাম'।

'বশীকার' বৈরাগ্যের প্রসঙ্গে আমরা মর্কট বৈরাগ্যের উল্লেখ করিয়াছি। 'কথামৃতে' বহুবার সদৃষ্টান্ত এই বৈরাগ্যের উল্লেখ আছে:

'মা সুতো কেটে খায়—ছেলের একটু কাজ ছিল, সে কাজ গেছে—তখন বৈরাগ্য হয়, গেরুয়া পরলে; কাশী চলে গেল। আবার কিছু দিন পরে পত্র লিখছে—আমার একটি কর্ম হইয়াছে, দশ টাকা মাহিনা। ওরি ভিতরে সোনার আংটি আর জামা-জোড়া কেনবার চেষ্টা করছে। ভোগের ইচ্ছা যাবে কোথায়!'

'বশীকার' বৈরাগ্য একদিনেই হয় না। যতমানাদি বৈরাগ্যের অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ উপস্থিত হয়। শংকরাচার্যের কথা—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট অভিলষিত ভোগে দোষদর্শনের অভ্যাসের

কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিয়াছেন: 'বৈরাগ্য অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি। এটি একবারে হয় না—রোজ অভ্যাস করতে হয়। ...অভ্যাস দ্বারা মনে অসাধারণ শক্তি এসে পড়ে।' অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন: 'বৈরাগ্য একবারে হয় না। সময় না হলে হয় না। তবে একটা কথা আছে—শুনে রাখা ভাল। শুনতে শুনতে বিষয়বাসনা একটু একটু ক'রে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্তে একটু একটু চালুনি জল খেতে হয়। তা হ'লে ক্রমে ক্রমে নেশা ছুটতে থাকে।'

বিবেক-বৈরাগ্য সম্বন্ধে একদিন অনেক কথা বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব মণিকে প্রশ্ন করিতেছেন: 'বৈরাগ্যের মানে কি বলো দেখি?'

মণি। বৈরাগ্য মানে শুধু সংসারে বিরাগ নয়। ঈশ্বরে অনুরাগ আর সংসারে বিরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।'

স্বামী বিবেকানন্দও একটি সংস্কৃত চিঠিতে ঐ কথাই লিখিয়াছেন: 'বৈরাগ্যং বস্তুশূন্যং বস্তুভূতং বা? প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোঽপি কীটভক্ষিতমস্তিষ্কেন বিনা; যদ্যপরং তদেদম্ আপততি—ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনম্ অন্যস্মাৎ বস্তুনঃ পিণ্ডীকরণং চ ঈশ্বরে বা আত্মনি।' তাৎপর্য এই যে, বৈরাগ্য যদি অভাবাত্মক হয়, তবে কীটভক্ষিত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তাহা লাভ করিতে যত্ন করিবে না। আর বৈরাগ্য যদি ভাবাত্মক হয়, তবে বৈরাগ্য বা ত্যাগের অর্থ অন্য বস্তু হইতে মনকে সরাইয়া আনা এবং ঈশ্বরে বা আত্মায় কেন্দ্রীভূত করা।

বৈরাগ্য সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ একটি পত্রে লিখিয়াছেন: 'বৈরাগ্য না আসিলে ঠিক ভগবানের ভাব ধারণা করিতে পারা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁর যত বৈরাগ্য, তিনি তত ভিতরের শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যথার্থই বিবেক ও বৈরাগ্যের মূর্তি ছিলেন। যত দিন যাইতেছে, ততই তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারিতেছি। বিবেক-বৈরাগ্য শাস্ত্রে পড়িয়াছি, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে তাহা জ্বলন্ত দেখিয়াছি।'

'অভ্যাস' ও 'বৈরাগ্য' এই দুইটি কথার একত্র উল্লেখ আমাদের শাস্ত্রে বারংবার দেখিতে পাওয়া যায়। 'অভ্যাস' বলিতে কি বুঝায়, তাহা আমরা সকলেই জানি। বৈরাগ্য সম্বন্ধেও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিলাম। এই অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়। জাগতিক ও অতিজাগতিক উভয়বিধ জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় মনের একাগ্রতা। তবে জাগতিক জ্ঞানলাভের জন্য যে পরিমাণ একাগ্রতার প্রয়োজন, অতিজাগতিক জ্ঞানলাভের জন্য তদপেক্ষা অনেক বেশী একাগ্রতার প্রয়োজন। প্রথম ক্ষেত্রে একাগ্রতা সত্ত্বেও দেহবোধ থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেহবোধ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। আমরা যদি অতিজাগতিক জ্ঞানলাভের অভিলাষী হই, তাহা হইলে দেহবোধরহিত এই আপাত-অবিশ্বাস্য একাগ্রতার অধিকারী হইতে হইবে এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্য ব্যতীত ঐ অধিকার-অর্জনের অন্য উপায় নাই

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : 'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুর্ণশ্চ॥' [শ্বে. উ. ৬।১১], 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥' [মু. উ. ৩।১।১, শ্বে. উ. ৪।৬] ইমৌ মন্ত্রৌ আত্মনঃ অবিদ্যয়া কর্তৃত্বাদিকং পরমার্থতঃ তদ্‌রাহিত্যং চ বোধয়তঃ। অনয়োঃ চ এবম্ অর্থঃ— পুরাণপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং ভেদং বারয়তি একঃ ইতি। দেবঃ স্বপ্রকাশঃ চিদ্রূপঃ ; সঃ কুত্র ইতি আকাঙ্ক্ষায়াম্ আহ—সর্বভূতেষু ইতি, ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তেষু। তর্হি কিম্ ইতি ন অনুভূয়তে ইতি অতঃ আহ—গূঢ়ঃ ইতি। অজ্ঞানেন আবৃতত্বাৎ ন সামান্যপ্রজ্ঞৈঃ অনুভূয়তে ইতি অর্থঃ। তস্য ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদ-রাহিত্যম্ আহ—সর্বব্যাপী ইতি। দেশকালৌ জীবেশ্বরৌ জগৎ ইতি এতৎ সর্বং ব্যাপ্য স্থাতুং শীলম্ অস্য ইতি সর্বব্যাপী। তৎ এব প্রতিপাদয়ন্ প্রথমং চেতন-প্রতিযোগিক-ভেদাভাবম্ আহ—সর্বভূতান্তরাত্মা ইতি। চৈতন্যম্ একম্ এব সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেষু প্রবিশ্য অন্তঃ জীবাত্মতয়া বর্ততে ইতি অর্থঃ। তৎ এব শুদ্ধসত্ত্ব-মায়া-প্রতিবিম্বতয়া ঈশ্বরঃ সন্ সর্বেষাং কর্মফলং দদাতি ইতি আহ—কর্মাধ্যক্ষঃ ইতি। কর্মণাং পুণ্যপাপরূপাণাম্ অধ্যক্ষঃ অধিষ্ঠায় ফলদাতা ইতি অর্থঃ। জড়-প্রতিযোগিক-ভেদং বারয়তি—সর্বভূতাধিবাসঃ ইতি। সর্বেষাং পৃথিব্যাদীনাং ভূতানাং অধিবাসঃ অধিষ্ঠানম্ ইতি অর্থঃ। আরোপিতস্য অধিষ্ঠানাব্যতিরেকাৎ ন তন্নিরূপিতঃ ভেদঃ ইতি অর্থঃ। জীবেশ্বর-রূপেণ অবস্থানাৎ প্রাপ্তং পুণ্যাদি-কর্তৃত্বং জগৎস্রষ্টৃত্বাদিকং চ বারয়তি—সাক্ষী ইতি। স্বসন্নিধৌ প্রবর্তমান-কার্য-করণাদেঃ জগদাকার-পরিণামিন্যাঃ অবিদ্যায়াঃ চ সাক্ষী সাক্ষাৎ ঈক্ষিতা। সাক্ষিত্বে হেতুম্ আহ—চেতা ইতি। চৈতন্যরূপঃ ইতি অর্থঃ। বস্তুতঃ সাক্ষিত্বাদি-রাহিত্যম্ আহ—কেবলঃ ইতি। সকল-বিশেষ-শূন্যঃ ইতি অর্থঃ। জ্ঞানানন্দয়োঃ গুণত্বং কেচিৎ বাঞ্ছন্তি, তান্ নিবারয়তি—নির্গুণঃ ইতি। 'বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম' (বৃ. উ. ৩।৯।২৮) ইতি শ্রুতেঃ জ্ঞানানন্দৌ স্বরূপম্ এব ইতি অর্থঃ। দ্বা সুপর্ণা সুপর্ণৌ ইব সুপর্ণৌ, সযুজৌ নিত্যম্ অবিযুক্তৌ, সখায়ৌ চিদ্রূপৌ অন্তঃকরণোপহিতানুপহিতৌ, সমানং বৃক্ষং বৃশ্চ্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন সমূলম্ উচ্ছিদ্যতে ইতি বৃক্ষঃ ; কার্য-করণোপাধিঃ। তং পরিষস্বজাতে আশ্রয়েতে। যথা লৌকিকৌ সুপর্ণৌ পরস্পরং সখায়ৌ একম অশ্বত্থাদি-বৃক্ষম,

আশ্রয়েতে তদ্বৎ। তয়োঃ মধ্যে অন্যঃ একঃ, পিপ্পলং কর্মফলং, স্বাদু রসবৎ। উপলক্ষণম্ এতৎ। সুখদুঃখম্ ইতি অর্থঃ। অত্তি কর্তৃত্বাদি-রূপ-কার্য-করণাবিবেকাৎ ভুঙ্‌ক্তে। অন্যঃ কার্য-করণাদ্ বিবিক্তঃ অভিচাকশীতি কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-রূপং কার্য-করণং কেবলং পশ্যতি ইতি অর্থঃ। এবম্ এতাভ্যাম্ মন্ত্রাভ্যাম্ অবিদ্যাবস্থায়াং কর্তৃত্বাদি-রূপত্বেন স্বতঃ সাক্ষিকূটস্থ-চিন্মাত্রত্বেন প্রতিপাদিতং বিষ্ণুং স্তৌতি—

(**মূলস্তোত্রম্** ঃ)

সর্বত্রৈকঃ পশ্যতি জিঘ্রত্যথ ভুঙ্‌ক্তে
স্প্রষ্টা শ্রোতা বুধ্যতি চেত্যাহুরিমং যম্।
সাক্ষী চাস্তে কর্তৃষু পশ্যন্নিতি চান্যে
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৪ ॥

সর্বত্র ইতি। **সর্বত্র** ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেষু কার্যকারণ-সংঘাতেষু, প্রবিষ্টঃ **বস্তুতঃ একঃ** এব সন্ অপি বহুধা প্রবিভক্তঃ। **পশ্যতি** দর্শন-ব্যাপারং করোতি। **জিঘ্রতি** ঘ্রাণেন গন্ধং গৃহ্লাতি। **ভুঙ্‌ক্তে** ভোজনং করোতি। **স্প্রষ্টা** ত্বচা শীতম্ উষ্ণং চ বেত্তি। **শ্রোতা** শ্রোত্রেণ শব্দং গৃহ্লাতি। **বুধ্যতি** কেবলম্ অন্তঃস্থয়া বুদ্ধ্যা ভূতং ভাবি চ জানাতি। **চ**কারঃ অনুক্ত-সকলেন্দ্রিয়-ব্যাপার-সমুচ্চয়ার্থঃ। **ইতি** এবং বহুব্যাপারবত্ত্বেন **যম্ ইমম্** অপরোক্ষতয়া অনুভূয়মানম্ অবিদ্যাবস্থম্ **আহুঃ**। **অন্যে** বিবেকিনঃ বাস্তব-স্বরূপ-প্রতিপাদক-মন্ত্রাঃ বা **কর্তৃষু** কার্যকারণোপাধিষু স্বব্যাপারে প্রবর্তমানেষু **পশ্যন্** কর্তৃ-কার্য-করণানি **পশ্যন্** ভাসয়ন্ **সাক্ষী** কেবলম্ **আস্তে**, পরমার্থতঃ ন কিঞ্চিৎ অপি করোতি **ইতি** চ যম্ আহুঃ **তম্** ইতি অর্থঃ। তৎ উক্তং বাসিষ্ঠরামায়ণে —'কুর্বন্নপীহজগতাং মহতামনন্তং, বৃন্দং ন কিঞ্চন করোতি কদাচনাপি। স্বাত্মন্যনস্তময়-সংবিদি নির্বিকল্পে, ত্যক্তোদয়স্থিতিমৃতে স্থিত এক এব ॥' ইতি ॥ ১৪ ॥

টীকানুবাদঃ 'অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ [পরমাত্মা] সমস্ত প্রাণীতে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা, কর্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ কর্মফলদাতা, সর্বভূতের আশ্রয়স্থল, সর্বসাক্ষী, চেতয়িতা, নিরুপাধিক এবং নির্গুণ।' 'সর্বদা সংযুক্ত ও তুল্যনাম-বিশিষ্ট দুইটি পক্ষী (জীব ও পরমাত্মা) একই [শরীররূপ] বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। তন্মধ্যে একটি বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল (শুভাশুভ কর্মফল) আস্বাদন করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে।'

[শ্রুতিদ্বয়ের তাৎপর্য বর্ণিত হইতেছে —] এই উভয় মন্ত্র আত্মার অবিদ্যাজনিত কর্তৃত্বাদি ও পারমার্থিক কর্তৃত্বাদিরাহিত্য জ্ঞাপন করিতেছে। মন্ত্র দুইটির অর্থ এই প্রকার: 'একঃ' এই শব্দ দ্বারা পুরাণপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতির ভেদ নিষিদ্ধ হইতেছে। 'দেবঃ' অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ। তিনি কোথায় আছেন, এই শঙ্কার উত্তরে বলা হইয়াছে, 'সর্বভূতেষু' অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্ব (ক্ষুদ্র তৃণ) পর্যন্ত [সর্ববস্তুতে]। তাহা হইলে [সর্বত্র] তাঁহার অনুভব হয় না কেন? এই শঙ্কার উত্তরে বলা হইয়াছে 'গূঢ়ঃ' অর্থাৎ অজ্ঞানদ্বারা [তিনি] আবৃত

থাকেন বলিয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অনুভব করিতে পারে না। 'সর্বব্যাপী' এই শব্দ দ্বারা তাঁহার ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদ-রাহিত্য কথিত হইয়াছে। দেশ, কাল, জীব, ঈশ্বর, জগৎ—এই সমস্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করাই যাঁহার স্বভাব, তিনিই সর্বব্যাপী। ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রথমে [তাঁহাতে] অন্য চেতন-প্রতিযোগিক[১] ভেদের অভাব (অন্য কোন চেতন নাই) বলিতেছেন—'সর্বভূতান্তরাত্মা'—একই চৈতন্য ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত সর্বভূতে প্রবেশ করিয়া অন্তরে জীবাত্মা-রূপে বিরাজ করিতেছেন, ইহাই অর্থ। তাহাই (সেই চৈতন্যই) শুদ্ধসত্ত্ব-মায়াতে[২] প্রতিবিম্বিত হইয়া ঈশ্বররূপে সকলের কর্মফল প্রদান করেন, এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, [তিনি] 'কর্মাধ্যক্ষ'। পুণ্যাপাপরূপ কর্মসমূহের অধ্যক্ষ—অধিষ্ঠানরূপে ফলদাতা, ইহাই অর্থ। 'সর্বভূতাধিবাস', এই শব্দের দ্বারা জড়-প্রতিযোগিক ভেদ নিবারিত হইতেছে। [তিনি] পৃথিবী আদি সর্বভূতের অধিবাস অধিষ্ঠান, ইহাই অর্থ। অধিষ্ঠান-সত্তার অতিরিক্ত সত্তা আরোপিত বস্তুর থাকে না বলিয়াই আরোপিত [জড়] বস্তুর ভেদ [চৈতন্যে] থাকে না, ইহাই অর্থ।

তিনিই জীব ও ঈশ্বররূপে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার [জীবরূপে] পুণ্যাদি-কর্তৃত্ব ও [ঈশ্বররূপে] জগৎ-স্রষ্টৃত্বের সম্ভাবনা নিবারণ করিতেছেন 'সাক্ষী', এই শব্দের দ্বারা। নিজের সান্নিধ্যে প্রবর্তমান কার্যকরণাদি (দেহেন্দ্রিয়াদি) এবং জগদাকারে পরিণামিনী অবিদ্যার তিনি সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষাৎ দর্শনকারী মাত্র। [তাঁহার] সাক্ষিত্বের কারণ বলিতেছেন—'চেতা', এই শব্দের দ্বারা। [তিনি] চৈতন্যস্বরূপ, ইহাই অর্থ। বস্তুতঃ সাক্ষিত্ব প্রভৃতি তাঁহার নাই, ইহাই 'কেবল' শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। 'কেবল' শব্দের অর্থ—সকল বিশেষ [অবস্থা]-শূন্য। কেহ কেহ[৩] জ্ঞান ও আনন্দকে [ব্রহ্মের] গুণ বলিতে চান। তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা হইতেছে 'নির্গুণ', এই শব্দের দ্বারা। [কারণ] 'বিজ্ঞান

১ একটি বস্তুতে অন্য বস্তুর ভেদ থাকে। যাহার ভেদ থাকে সেই বস্তুটিকে ভেদের প্রতিযোগী বলে। (যে বস্তুতে ভেদ থাকে, ভেদের অধিকরণ সেই বস্তুকে অনুযোগী বলে।)। সুতরাং একাধিক বস্তু না হইলে ভেদ হয় না। চেতন আত্মা অদ্বিতীয় বলিয়াই তাঁহাতে অন্য চেতন-প্রতিযোগিক ভেদ থাকিতে পারে না।

২ সমষ্টিগত আবরণাত্মিকা শক্তি মায়া এবং ব্যষ্টিগত আবরণাত্মিকা শক্তি অবিদ্যা। মায়া সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা। সমষ্টিগত অবস্থায় সত্ত্বগুণ প্রধান থাকে বলিয়াই মায়াকে 'শুদ্ধসত্ত্ব' বলা হয়। ব্যষ্টিগত অবস্থায় সত্ত্বগুণ মালিন্যযুক্ত হয় বলিয়া 'অবিদ্যা' নামে অভিহিত হয়।

৩ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ জ্ঞান ইচ্ছা সুখ দুঃখ দ্বেষ এবং প্রযত্ন—এই ছয়টিকে আত্মার বিশেষ গুণ বলেন। যে-গুণসমূহ অন্য দ্রব্যে থাকে না, কেবল একটি বিশেষ দ্রব্যেই থাকে, সেই গুণসমূহকে সেই দ্রব্যের বিশেষ গুণ বলে। সুতরাং ইঁহাদের মতে আত্মা সগুণ। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ও আনন্দই ব্রহ্ম'—এই শ্রুতি হইতে জ্ঞান ও আনন্দ [ব্রহ্মের] স্বরূপই, [ইহা জানা যায়] ইহাই অর্থ। [অতএব উহারা গুণ হইতে পারে না]।

[অপর মন্ত্রার্থ বর্ণিত হইতেছে—] 'দ্বা সুপর্ণা'—উত্তম-পক্ষ-বিশিষ্ট দুইটি পক্ষীর ন্যায় পক্ষী 'সযুজৌ'—নিত্য অপৃথক্ 'সখায়ৌ'—অন্তঃকরণ-উপহিত ও অনুপহিত উভয়েই চৈতন্যস্বরূপ; 'সমানং বৃক্ষং'—তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সমূলে উচ্ছিন্ন হয় বলিয়া এই কার্যকরণোপাধি অর্থাৎ এই দেহেন্দ্রিয়াদির সমষ্টিকে বৃক্ষ বলা হয়; তাহাকে (সেই বৃক্ষকে) 'পরিষস্বজাতে'—আশ্রয় করিয়া থাকে। যেমন লৌকিক, পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একই অশ্বত্থাদি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে, [এখানেও] সেইরূপ [বুঝিতে হইবে]। 'তয়োঃ'—সেই দুইটির মধ্যে 'একঃ'—একটি 'পিপ্পলং'—কর্মফল 'স্বাদু'—সরস, ইহা উপলক্ষণ, [সরস ও বিরস—উভয় প্রকার ফলই, বুঝিতে হইবে] সুখ ও দুঃখ, ইহাই অর্থ; 'অত্তি'—কর্তৃত্বাদিরূপ কার্যকরণের (দেহেন্দ্রিয়াদির) অবিবেকবশতঃ ভোগ করে।[৪] 'অন্যঃ'—অপর (পক্ষী)-টি অর্থাৎ কার্যকরণ (দেহেন্দ্রিয়াদি) হইতে পৃথক্ [অজ্ঞান অনুপহিত চৈতন্য] 'অভিচাকশীতি'—কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-রূপ, এই কার্যকরণ [সংঘাত]-কে কেবল দর্শন করিয়া থাকে (সাক্ষিরূপে অবস্থান করিয়া থাকে)।

এইরূপে এই দুইটি মন্ত্রের দ্বারা অবিদ্যাবস্থায় কর্তৃত্বাদিরূপে [এবং] পরমার্থতঃ কূটস্থ চিন্মাত্র সাক্ষিরূপে প্রতিপাদিত বিষ্ণুকে [আচার্য] স্তুতি করিতেছেন: [মূলস্তোত্র, শ্লোক ১৪, পৃঃ ৫৯৩ দ্রষ্টব্য]।

অন্বয়: একঃ সর্বত্র পশ্যতি জিঘ্রতি অথ ভুঙ্‌ক্তে; যম্ ইমং স্প্রষ্টা শ্রোতা বুধ্যতি চ ইতি আহুঃ, অন্যে কর্তৃষু পশ্যন্ সাক্ষী চ আস্তে ইতি চ [আহুঃ], তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে। ১৪।

স্তোত্রানুবাদ: সর্বত্র এক [হইয়াও ইনি] দর্শন আঘ্রাণ এবং ভোজন করেন; [এবং] ইনি স্পর্শকর্তা শ্রোতা ও জ্ঞাতা [অবিবেকিগণ] এই [প্রকার] যাঁহাকে বর্ণনা করে; এবং অপরে (বিবেকিগণ) [যাঁহাকে] কর্তা প্রভৃতি বিষয়ের উদ্ভাসক ও সাক্ষিরূপে অবস্থিত বলেন, সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকার বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি। ১৪।

টীকানুবাদ: **সর্বত্র** ইত্যাদি। **সর্বত্র**—ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত যাবতীয় দেহেন্দ্রিয়-সংঘাতে প্রবিষ্ট যিনি বস্তুতঃ **একঃ**—এক হইয়াও বহুরূপে প্রবিভক্ত [এবং] **পশ্যতি**—দর্শন-ব্যাপার করেন, **জিঘ্রতি**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়সহায়ে গন্ধ গ্রহণ করেন, **ভুঙ্‌ক্তে**—ভোজন করেন, **স্প্রষ্টা**—ত্বক্-ইন্দ্রিয়দ্বারা শীতোষ্ণাদি জানেন, **শ্রোতা**—কর্ণসহায়ে শব্দ গ্রহণ করেন, **বুধ্যতি** কেবল

---

৪ সুখ বা দুঃখের সাক্ষাৎকারকেই ভোগ বলে। সুতরাং ভোগ চেতনের ধর্ম। অথচ অদ্বৈতবেদান্তমতে নির্গুণ চেতন কর্তৃত্বাদি-ধর্ম-রহিত বলিয়াই ভোগ করিতে পারে না। অপর-পক্ষে অন্তঃকরণ প্রভৃতি অচেতন বলিয়া ভোগ তাহাদেরও সম্ভব হয় না। অতএব সুখদুঃখাকারে পরিণত অন্তঃকরণবৃত্তিতে চৈতন্যের অধ্যাস এবং চৈতন্যে অন্তঃকরণধর্ম সুখদুঃখাদি ভোগের অধ্যাস করিয়াই ভোগ সিদ্ধ হয়। এইজন্যই অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যকে জীব বলা হইয়াছে।

অন্তঃকরণস্থ বুদ্ধিদ্বারা অতীত এবং অনাগত জানেন; **চ**-কার অনুক্ত [অন্য] সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের সমুচ্চয়ার্থক ; **ইতি**—এই প্রকারে বহু-ব্যাপার-বিশিষ্ট-রূপে **যম্ ইমং**—[অবিবেকিগণ] সাক্ষাৎ অনুভূয়মান এই যাঁহাকে অবিদ্যাসম্বলিত **আহুঃ**—বলেন ; **অন্যে**—অপরে অর্থাৎ বিবেকিগণ অথবা [আত্মার] বাস্তব-স্বরূপ-প্রতিপাদক [শ্রুতি-]মন্ত্রসমূহ **কর্তৃষু**—দেহেন্দ্রিয়-উপাধিসমূহ নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে **পশ্যন্**—কর্তা, কার্য ও করণ [-রূপে] দর্শন করিয়া অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া **সাক্ষী**—কেবল সাক্ষিরূপে **আস্তে**—বিদ্যমান, প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই করেন না, **ইতি চ**—এই প্রকারে যাঁহাকে [**আহুঃ**]—বলিয়া থাকেন, **তং**—তাঁহাকে, ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণে বলা হইয়াছে : এই বিশাল জগতের অনন্ত [ব্যাপার-]সমূহ নিষ্পাদন করিয়াও [প্রকৃতপক্ষে চিদাত্মা] কখনও কিছুই করেন না। [তিনি সর্বদাই] উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ-বিহীন বিকল্পরহিত অবিনাশি-চৈতন্যাত্মক স্বস্বরূপে এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় [ভাবেই] অবস্থিত। ১০। [ক্রমশঃ]

স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[যতীন্দ্রনাথ ঘোষকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

উদ্বোধন আফিস,
বাগবাজার
২১।৫।১৭

শ্রীমান যতীন্দ্র,

তোমার ১৭ই মে তারিখের পত্র পাইয়া খুসী হইলাম। আমার শরীর অন্য সকল বিষয়ে সুস্থ হইয়াছে কিন্তু বাত বাড়িয়া ভুগিতেছি। শ্রীশ্রীমার বাটীর পার্শ্বে যে পুষ্করিণীটি আছে তাহার মৌরসী স্বত্ব ক্রয় করা হইয়াছে—বাৎসরিক ৮০ আনা করিয়া খাজনা দিতে হয়। উহা খনন করান আবশ্যক নিশ্চয় এবং তজ্জন্য ফণ্ড সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তুমি ঐ জন্য যে যুক্তি বলিয়াছ তাহা মন্দ নয়। এখানকার ভক্তদিগের নিকট আমরা বলিয়া যাহা পারি আদায় করিতেছি। পূর্ববঙ্গের ভক্তসকলের নিকট তুমি যদি ঐরূপে কিছু আদায় করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে সুখী হইব। হরি মহারাজ, মহাপুরুষ এখন মঠেই আছেন। তাঁহাদিগের পুরী যাইবার এখন কিছু স্থির হয় নাই। মঠের এবং শ্রীশ্রীমার বাড়ীর সকলে ভাল আছে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং তত্রত্য সকল ভক্তদিগকে জানাইবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসারদানন্দ

* শ্রীব্রজদুলাল ঘোষের সৌজন্যে মুদ্রিত। —সঃ

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র*

[শ্রীমতী ফুলরাণী সেনমজুমদারকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

বেলুড় মঠ।
5.7.20
সোমবার।

পরমকল্যাণীয়া শ্রীমতী রাণীমায়ী—

মায়ী, তোমার তিনখানা পত্র পাইয়াছি, উত্তর দিতে দেরি হইল, মনে করিয়াছিলাম মার একটু ভাল দেখিলেই তোমায় খবর দোবো; কিন্তু এখন মার যেরকম অসুখ-শরীর, জ্বর রোজ ২ হয়, শরীর খুব দুর্ব্বল, তাঁকে ধরে পাশ ফিরাইয়া শোয়াতে হয়, মঠের ছেলেরা অন্ত লোকের কাছে মার সংবাদ লয়। নিবেদিতা বোর্ডিং ইস্কুলের মেয়েরা মার সেবা করে দিনরাত; তারা মার জন্ম পরিশ্রম খুব করে, যাহাতে মা একটু সুস্থ থাকেন, ভাল হন। ডাক্তার কবিরাজ তাঁহারা মার বুক, পিঠ পরীক্ষা করিয়াছেন ও বলেন মা ভাল হবেন, সারিয়া যাবেন, আশা করা যায়, বুকে, পিঠে কোন রকম অসুখের দোষ নাই। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন মার কাছে এখন কারোকে আসিতে দেবেন না, যাহাতে মা ভাল হন, সে বিষয়ে খুব চেষ্টা হইতেছে. সকলকারই ইচ্ছা মা ভাল হোয়ে উঠুন, এ সময় মার কাছে কেহই যায় না। ভাল হইয়া গেলে অনেকে আসিবে, মাকে দর্শন করিবে, কথা কহিবে। রাণীমায়ী, তোমাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি এ অবস্থায় মার কাছে আসা কি ভাল? মায়ী, ঠাকুরের কাছে সকলে মিলে প্রার্থনা কর, যাহাতে শ্রীশ্রীমা ভাল হইয়া সুস্থশরীর হন, ভক্তের বাঞ্ছা ভগবান পূর্ণ করেন। শীঘ্রই কলিকাতায় যাইব, সারদানন্দস্বামীকে তোমার কথা বলিব। মঠের সকলে ও আমি ভাল আছি, আমাদের সকলের ভালবাসা শুভেচ্ছা তোমরা সকলে জানিবে।

সত্যবাবুদের বাসার ঠিকানা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, এইবার যখন পত্র দেবে তাদের ঠিকানা দিও। আশা করি সকলের কুশল।

পুঃ মার ঠিকুজি কোষ্ঠিতে আছে এখন কোন ভয়ের কারণ নাই।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

* শ্রীআনন্দ দাশগুপ্তের সৌজন্যে মুদ্রিত।—সঃ

চিরপ্রতীক্ষমাণা

শ্রীহিমাংশু গঙ্গোপাধ্যায়

ত্রিবান্দ্রাম হইতে যখন আমাদের বাস যাত্রা করিল, তখনও বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, সত্যই আমার বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হইতে চলিয়াছে—সত্যই মাতা কন্যাকুমারী দর্শনে চলিয়াছি। রৌদ্রকরোজ্জ্বল শীতকালের দ্বিপ্রহর। দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও গ্রাম দেখা যাইতেছে। সুন্দর মসৃণ পথ। বাস প্রথম থামিল নাগেরকয়েলে।

আবার যাত্রা শুরু করিয়া মোট ষাট মাইল পথ চারি ঘণ্টায় অতিক্রম করিয়া কেপ কমোরিন বা কন্যাকুমারীতে যখন পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যার বেশী দেরী নাই। 'কেরালা হাউস' হোটেলে জিনিসপত্র রাখিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া অবাক হইলাম। বস্তুতঃ তিনটি সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে কন্যাকুমারী। তিন সমুদ্র—আরব সাগর বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর এখানে আসিয়া মিশিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা বলেন, কখনও কখনও তিনটি সমুদ্রের রং তিন রকমের হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া কন্যাকুমারীর মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হইলাম। সমুদ্রের নিকটে অনাড়ম্বর ক্ষুদ্র মন্দির। কাঁসর ঘণ্টার বাজনায় আরতির লগ্ন সমাগত বুঝিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র যেমন নিয়ম, এখানেও তাহাই—পুরুষদের পক্ষে ঊর্ধ্বাঙ্গ আবরণহীন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরে প্রবেশের পর মায়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুহূর্তে সব ভুল হইয়া গেল—একি মূর্তি! ১৫।১৬ বৎসরের এক পরমা সুন্দরী কন্যা অপরূপ বধূসাজে সজ্জিতা—আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ নানা আভরণে ভূষিত—তাঁহার সুগঠিত হস্তে একটি সুন্দর আভূমিলম্বিত ফুলের মালা। তাঁহার আয়ত অভিরাম চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল আমার কন্যা হঠাৎ এখানে কখন আসিল! কতক্ষণ এভাবে চাহিয়াছিলাম জানি না—আরতি শেষ হইলে খেয়াল হইল। আরতির শেষে সামান্য প্রসাদ সকলের মধ্যে বিতরণ করা হইল। মন্দিরতল শূন্য হইয়া গেলে সুদর্শন প্রবীণ প্রধান পূজারী মহারাজকে সমুদ্রের দিকের প্রাঙ্গণে একান্তে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইয়া আমরা কয়েকজন মাতা কন্যাকুমারীর কাহিনী বলিবার আবেদন জানাইলাম।

সেই স্বল্পচন্দ্রালোকিত সমুদ্রতীরবর্তী নির্জন প্রাঙ্গণে বসিয়া পূজারীজী বলিতে লাগিলেন—মাতা কন্যাকুমারী কত শত শত বা হাজার বৎসর ধরিয়া এই বিশাল সমুদ্রতীরে ভারতের শেষ প্রান্তে এভাবে একাকিনী দণ্ডায়মানা আছেন, তাহা সঠিক বলা সম্ভব নহে। এক সময় লবণাসুর নামে এক অসুর প্রচণ্ড প্রতাপশালী হইয়া উঠে। তাহার অত্যাচারে দেবতাগণ অস্থির হইয়া পড়েন। তাঁহারা তাহাকে বধ করিতে না পারিয়া ভগবান ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভগবান সমাগত দেবতাগণের প্রার্থনা শুনিলেন ও কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'ইহাকে বধ করিতে পারেন মাত্র একজন—পার্বতী—তাহাও একটি মাত্র শর্তে—যদি তিনি অবিবাহিতা থাকেন।' দেবতারা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া সাগ্রহ অপেক্ষায় দিন অতিবাহিত

করিতে লাগিলেন। এদিকে পার্বতী ধীরে ধীরে বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিলেন এবং শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করিলেন। তাঁহার একাগ্র তপস্যায় প্রীত হইয়া শিব পার্বতীর অভিলষিত বর প্রদান করিলেন।

উল্লসিতা পার্বতী একথা পিতামাতাকে জানাইলে তাঁহারা সানন্দে বিবাহের বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিলেন। দিকে দিকে নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন ও প্রাসাদ সুসজ্জিত করিলেন। বিবাহের দিন নিমন্ত্রিতেরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। ভারে ভারে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইল। পার্বতীকে বধূবেশে সজ্জিতা করিয়া আনন্দিত মনে সকলে অধীর প্রতীক্ষায় বরের আগমন-পথ চাহিয়া রহিলেন। শিবও বিবাহ-বাসরের দিকে যাত্রা করিলেন। এদিকে নারদ ঋষির মনে পড়িয়া গেল, যদি পার্বতীর বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে লবণাসুরকে আর বধ করা যাইবে না।

বরপক্ষ যখন বিবাহবাটী হইতে দশ মাইল দূরে সুচিন্দ্রম নামক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন—রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে—সুচতুর নারদ সমগ্র পক্ষিকুলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেওয়ায় তাহারা একত্রে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। প্রভাত হইয়া গিয়াছে—বিবাহের লগ্ন অতিক্রান্ত মনে করিয়া বরপক্ষ আর অগ্রসর হইলেন না। এদিকে বধূভবনে বরের প্রতীক্ষায় সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাত সমাগত দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন। কন্যার পিতামাতা শিরে করাঘাত করিয়া কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—নিমন্ত্রিতেরা বিষণ্নমনে একে একে বিদায় লইলেন। খাদ্য-বস্তুসমূহ স্তূপাকারে সমুদ্রতীরে নিক্ষিপ্ত হইল, প্রাসাদের ধূপদীপ নির্বাপিত করা হইল আর বধূ একাকিনী মালাহস্তে প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মানা রহিলেন—তাঁহার পদ্মপলাশ-নয়নদ্বয় হইতে অবিরাম অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সেইদিন হইতে প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় মাতা কন্যাকুমারী অপরূপ বধূবেশে সজ্জিতা হইয়া প্রিয়তমের আগমন-পথ চাহিয়া থাকেন—প্রতিদিনই সময় বহিয়া যায়—প্রিয়তম আসিয়া উপস্থিত হন না—মাতার অপূর্বসুন্দর চক্ষু অশ্রু-ভারে টলমল করিতে থাকে, সমস্ত স্থানটি এক অবর্ণনীয় বিরহবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

কাহিনীটি শেষ হইল। সমুদ্রের একটানা গর্জন ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নাই। সেই সুদূর সমুদ্রতীরে স্বল্পান্ধকার নীরব নির্জন মন্দির-প্রাঙ্গণে এই করুণ কাহিনী শুনিয়া আমাদের ব্যথাহত চিত্ত আলোড়িত হইয়া চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কাহারও কোন বাক্যস্ফুরণ হইল না। পরে আমাদের মধ্য হইতে একজন লবণাসুরের কি হইল জানিতে চাহিলে পূজারীজী বলিলেন—পার্বতীর অপরূপ রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়া লবণাসুর তাঁহাকে বিবাহের প্রস্তাব করিলে পার্বতী উত্তর করিলেন, 'আমার এক শর্ত আছে, যে আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবে তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।' একটি 'সামান্য স্ত্রীলোক'কে পরাস্ত করা অতি সহজ বিবেচনা করিয়া লবণাসুর তখনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। নিমেষে পার্বতী তাহাকে বধ করিয়া দেবতাদের ভয়শূন্য করিলেন।

পূজারীজীকে প্রণাম জানাইয়া উঠিলাম ও মাতার অভিষেক-দর্শনের নিয়মাবলী জানিয়া বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন ভোর চারটায় মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মাতাকে অন্য মূর্তিতে দেখিলাম। মাতার আসল মূর্তি ও বেশভূষা সকলই কাল পাথরে নিখুঁত-

ভাবে খোদিত। নানা সুগন্ধ-মিশ্রিত বালতি বালতি দুধ ঢালিয়া পূজারী মহারাজ যখন মাতাকে স্নান করাইতে লাগিলেন তখন সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া আমার মনে হইল—এই তো শিবপার্বতীর মিলন হইয়াছে—এই তো বহু-প্রতীক্ষিত দয়িতের স্পর্শ ও সঙ্গ লাভ করিয়া মাতা আমার দিব্য আনন্দে রোমাঞ্চিতা হইয়া উঠিয়াছেন—এই তো তাঁহার সুদীর্ঘ বিরহের অবসান হইয়াছে!

গত সন্ধ্যায় দেখা ব্যথাক্রান্ত তাঁহার মুখখানি আজ কি যেন এক অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্নানের শেষে অতি সন্তর্পণে পূজারীজী মাতার গাত্র মার্জনা করিয়া মুছাইয়া দিলেন—পিতা যেমন সযত্নে আদরিণী কন্যাকে স্নান করাইয়া দেন—ঠিক তদ্রূপ। ইহার পর কিছুক্ষণ মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইল। দেখিলাম স্তূপীকৃত চন্দন মন্দিরের ভিতর লইয়া যাওয়া হইতেছে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে মন্দিরদ্বার খোলা হইলে দেখিলাম অপরূপ সাজে সজ্জিতা এক অতি সুন্দরী বালিকা সামনে দণ্ডায়মানা। এত জীবন্ত ও প্রাণবন্ত সে মূর্তি যে, দেখিলে আত্মহারা হইয়া শুধু চাহিয়া থাকিতে হয়—মনে হয় বাকী জীবন শুধু সেই অপরূপ বালিকার সুন্দর চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলেই জীবন ধন্য হইবে। চন্দনের এরূপ ব্যবহার ভারতের অন্য কোন মন্দিরে হয় বলিয়া আমার জানা নাই। যতক্ষণ পারিলাম প্রাণ ভরিয়া সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলাম—দেখিয়া দেখিয়া আশা যেন আর মিটিতে চাহে না।

অবশেষে বিদায়ের সময় আসিল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উঠিলাম ও ত্রিবান্দ্রামে ফিরিবার সমস্ত পথ কন্যাকে রাখিয়া চলিয়া যাইবার সময় পিতামাতার অন্তরে যে বিচ্ছেদব্যথা জাগে অনুরূপ ব্যথায় ও বেদনায় মন-প্রাণ সর্বক্ষণ জর্জরিত হইয়া রহিল।

ইহার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও প্রতিদিন গোধূলিলগ্নে যখন আকাশে সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠে, গাভীরা গৃহে ফেরে, ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিয়া উঠে, মন্দিরে মন্দিরে আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, আমার মন ছুটিয়া যায় ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তে যেখানে সীমাহীন সমুদ্রকূলের এক নাতিবৃহৎ মন্দিরে এতক্ষণ কন্যাকুমারী মাতার আরাত্রিক শুরু হইয়াছে—মাতার সে অপরূপ রূপসজ্জা ও দিব্য বধূবেশ মনে পড়ে—মনে পড়ে মাতা সুদীর্ঘ সুগন্ধি পুষ্পমাল্যহস্তে প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মানা। আরও মনে হয় কিছু পরেই লগ্ন অতিবাহিত হইবে—মায়ের অধীর প্রতীক্ষা বিফল হইবে, মায়ের আয়ত চক্ষু দুইটি হইতে মুক্তাবিন্দুর মতো অশ্রু অঝোরে ঝরিয়া পড়িবে। প্রতিদিন সেই সময়ে মনে প্রবল ইচ্ছা হয় তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া যাইয়া মায়ের চরণতলে উপস্থিত হই ও তাঁহার আয়ত চক্ষু দুইটি মুছাইয়া দিয়া চিরপ্রতীক্ষমাণা, চিরবিরহিনী আদরিণী কন্যাকুমারী মাতাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়া শান্ত করি!

আহ্নিক কৃত্য

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

রাত্রি কথা কয়ে যায় চিরকাল তারার অক্ষরে।
দিবস আহ্নিক মন্ত্র জপে ধরণী অম্বরে
মেঘে মেঘে আলোকে ছায়ায় প্রহরে প্রহরে
রঙে রূপে উষা সন্ধ্যা মধ্য-দিন-লোকে
ধরাতলে জীবকণ্ঠে পশুপাখী নদী-কলস্বরে—
তরুলতা পত্রপুষ্প ফুলফল-শ্লোকে
রুদ্র ঝড়ে—মৃদু সমীরণে
কথা জাগে ত্রিভুবনে।

হের পঞ্চভূত চরাচর একমনে চাহি' অবিরাম—
অপার বিরহ বুকে জপে কার নাম!
কোথা তিনি! কোথা তুমি!
প্রভু, নাথ, বিরহের মিলনের সীমাহীন ধন।
ভাষাতীত ভাষাময় ভাষাহীন জপ—অব্যক্ত-স্মরণ!
মাগে বিশ্বের শরণ!
সকল পাওয়ার পারে যিনি ওপারের ধন।
সব পাওয়া না পাওয়ার মাঝে যিনি পরশ রতন!

পরশে হারায় 'আমি'। অনুভূতি মানে পরাজয়!
বিষণ্ণ আনন্দময় মূঢ় প্রাণে—
রূপময় রূপহীন বিশ্বরূপ! অপার বিস্ময়!*

---

* উদ্বোধনে গত আশ্বিনে প্রকাশিত স্বামী শ্রদ্ধানন্দের "জপমালা"-পাঠে —লেখিকা।

আনন্দের অনুভব

'বৈভব'

প্রশান্ত প্রভাত আজ দেখা দিল আমার জীবনে
স্তব্ধ একা বাক্যহীন উদাসীন বিরহে মিলনে।
সমগ্র জগৎ যেন ভেসে ওঠে ছবির মতন
সমসূত্রে গাঁথা যেন ধ্যান সুপ্তি জাগ্রৎ স্বপন।

এক বস্তু, এক ব্যক্তি—কভু হাসে নাচে কাঁদে গায়—
কভু ধীর, শান্ত, স্থির—অচঞ্চল আকাশের প্রায়।

*

প্রভাতের পূর্বদ্বারে আজ একি আশার আলোক!
দুধারে জীবন মৃত্যু তারি মাঝে অমৃত অশোক!
এ এক অপূর্ব মূর্তি নিরুচ্ছ্বাস আনন্দ উজ্জ্বল।
অনপেক্ষ আত্মরতি অন্তরের সঙ্গীতে বিহ্বল!

কভু গাহে, কভু হাসে, কভু বা সে প্রশ্নে নিরুত্তর,
অধরে আনন্দ ভাসে, চক্ষে শান্তি, বক্ষেতে সুন্দর!
প্রেমের প্রতিমাখানি মূর্ত বুঝি মনের মাঝেতে।
তারি লাগি ছন্দারতি বাজে নিতি সকালে সাঁঝেতে।

বিশ্বরূপদর্শন

শ্রীমোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আমার সমুখে তুমিই দাঁড়িয়ে—তুমি ছাড়া কিছু নাই
বিশ্বের এই অনন্ত রূপে তোমারে দেখিতে পাই।
তৃতীয় নয়নে জেগেছে দৃষ্টি—সারা সৃষ্টির মাঝে
তোমার মধুর মোহন মুরলী শত সুর তুলি বাজে।

হে অরূপ! তুমি রূপে রূপে কিবা হয়ে আছো অপরূপ
তোমার অঙ্গ-মধুর-ঘ্রাণেতে মগ্ন মনমধুপ।
সকলি তোমাতে, তুমি সকলেতে—তোমা ছাড়া কিছু নাই
বিশ্বের রূপে হে বিশ্বরূপ! দরশন তব পাই।

অনুশোচনা

শ্রীমতী ছায়া সিংহ

শিশুকাল হ'তে আমার বলিতে শিখায়েছে মোরে সবে,
মোর 'আমি' টুকু বড় হয়ে তাই নিতে চায় সব ভবে।
তারি লাগি মোর চলিল সাধনা, করিনু কঠোর শ্রম,
লভিনু জীবনে কত না বিভব, মান-যশ মনোরম।
জীবনের শেষে বিধির বিধানে সব হয়ে যায় হারা,
বেদনায় ভারে রহিল সম্বল ছু'টি নয়নের ধারা।
বাজার হইতে আনিনু সওদা পুরাণো কাগজে মোড়া,
খুলে দেখি তায় ঠাকুরের বাণী ছাপা আছে পাতা জোড়া।
মরি, মরি, একি অনুপম বাণী, পশিল মরম-তলে
'জীবের দুর্গতি শেষ হয় যবে আমি ছেড়ে তুঁহু বলে।'
ভাবি মনে মনে অমৃত এ-বাণী জানিতাম যদি আগে
'আমি' ফেলে দিয়ে 'তুঁহু' 'তুঁহু' বলে মিলিতাম অনুরাগে।
সারাটি জীবন এমন করিয়া বৃথায় যেত না ভুলে,
তুঁহু প্রেমরসে সিঞ্চিত হয়ে মুকুলিত হত ফুলে।

প্রার্থনা

শ্রীমতী রমা গুপ্ত

নিত্য দিনের গ্লানি যত তোমার কাছে বলি
তোমার আশিস্ মাথায় নিয়ে সারাটি দিন চলি।
এই যে বোঝা নামবে কবে
তোমার আসার সময় হবে
হাতটি ধরে টেনে নেবে তোমার চরণতলে
মাথা আমার পড়বে নুয়ে ভাসব চোখের জলে!

আমার যত দুর্বলতা তুমিই শুধু জানো
বারে বারে তাই তো তুমি এত আঘাত হানো
দগ্ধ ধূপ গন্ধ বিলায়
প্রদীপতেজে আঁধার মিলায়
তেমনি তুমি শুদ্ধ করো আরো দুঃখ দানি'
ফুলের মত শুদ্ধ হোক আমার জীবনখানি।

তুমি এলে, ঘুচলো আঁধার

শ্রীনিমাই মণ্ডল

তুমি এলে—শতেক যুগের
আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার গেল দূরে ;
মানুষ খুঁজে পেল নিজেকে।
প্রবৃত্তির কাছে আত্ম-নিবেদিত প্রাণ
তোমার স্পর্শে দাসত্ব থেকে পেল মুক্তি।
তোমার ডাক পৌঁছালো হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে—
ওঠো, জাগো, উপলব্ধি করো নিজেকে।
ভ্রান্তির বশে স্ব-পথ ত্যাগ ক'রে চলছিল যারা
তারা ফিরে এলো তোমার ভালোবাসা পেয়ে।
তুমি তাদের বুঝিয়ে দিলে—
ওগো, সব পথই সমান। চলাটা ঠিক হ'লে
সব পথই পৌঁছে দেবে মুক্তির তীর্থে।
বললে—মন-মুখ এক করে ডাকতে হয় ;
নিজেকে মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত না করলে,
মহান যিনি, তাঁকে পাওয়া যাবে কেমন করে।

ভয়াবহ রোগ ধনুষ্টঙ্কার

ডক্টর জলধি কুমার সরকার*

বাড়ীতে বিষাদের ছায়া। জন্মের চারদিন পরেই নবজাত শিশুটি মুখ খুলতে বা খেতে পারছে না, ক্ষীণকণ্ঠে কেঁদে চলেছে, আর মাঝে মাঝে সারা শরীর নীলাভ হয়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ঝাড়ফুঁক, দেবতার নামে তুলে রাখা মানসিক, 'দোষ' পাওয়ার জন্য তুকতাক্—কিছুতেই কিছু হোল না। আঁতুড় ঘরের বাইরের আলো দেখবার আগেই শিশু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। 'দাই মা' অবশ্য বলেছিল যে, এরকম দোষ পেলে—বাচ্চারা বাঁচে না, কারণ তার দীর্ঘ ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতায় সে এরকম ঘটনা অনেক দেখেছে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়া অল্প-বয়স্কা মা'টিকে সবাই সান্ত্বনা দিলেন, 'ভয় কি? আবার মা ষষ্ঠীর দয়া হবে।' গোয়ালঘরের পাশের ঘরটি যেটা হতে ভাঙ্গাঝুড়ি, খড় ও অন্যান্য পড়ে থাকা জিনিস বার ক'রে আঁতুড় ঘর করা হয়েছিল, আবার ভর্তি হোল সেই সব জিনিসে। দৈনক জীবন আগের মতই চলতে লাগল। কেউ জানল না যে, শিশুটির ধনুষ্টঙ্কার বা টেটেনাস (Tetanus) রোগ হয়েছিল, এবং প্রসবের সময় ময়লা ন্যাকড়া ব্যবহার, আঁতুড় ঘরের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ অথবা শিশুর নাড়ী কাটার জন্য বাড়ীতে পড়ে থাকা বাঁশের চোকলা ব্যবহারের মাধ্যমেই এই রোগ জন্ম নিয়েছিল।

উপরে যে ঘটনার ছবিটি আঁকা হোল, তিন চার দশক আগে সেরকম ঘটনা দেখা যেত প্রায় প্রতিটি পল্লীগ্রামে। এখন হাসপাতালে প্রসবের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই রোগে শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। তবুও সামগ্রিকভাবে দেখলে দেশে ধনুষ্টঙ্কার রোগীর সংখ্যা অল্প নয় এবং রোগের ভয়াবহতা ও রোগীর মৃত্যুহার প্রায় আগের মতই আছে।

ধনুষ্টঙ্কার রোগটি বহু পুরাতন, হিপোক্রেটিসও এর কথা লিখে গেছেন। এই রোগে সময় সময় রোগী ধনুকের মত বেঁকে যায় ব'লে এর নামকরণ হয়েছে ধনুষ্টঙ্কার। রোগের প্রধান লক্ষণ হোল শরীরের মাংসপেশীগুলির অস্বাভাবিক সংকোচন। পৃথিবীর সর্বত্রই এই রোগ কমবেশী দেখা যায়, যদিও আমাদের মত গরম দেশে এর প্রাদুর্ভাব আরও বেশী। এটি একটি জীবাণুঘটিত রোগ। অনেকেই জানেন যে, বিভিন্ন রোগের জীবাণু বিভিন্ন। ধনুষ্টঙ্কার রোগের জীবাণু—যাকে আমরা টেটেনাস-জীবাণু (Clostridium tetani) বলব—বহু জন্তু-জানোয়ারের অন্ত্রে বাস করে, এবং মানুষের অন্ত্রেও কখনও কখনও থাকে। টেটে-নাস-জীবাণুর কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। প্রথম বিশেষত্ব হোল—এদের নানা প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে উঠার ক্ষমতা। অধিকাংশ রোগের জীবাণু সূর্যের তাপে, গরম জলে বা সামান্য প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে মারা যায়, কিন্তু কয়েকটি রোগের জীবাণু, এই সব প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য নিজেদের শরীরের চারিধারে একটি শক্ত আবরণীর সৃষ্টি করে, এবং

* কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরলজি বিভাগে এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট। এফ. এন. এ.।

সেই আবরণীর মধ্যে থাকাকালীন এই সব প্রতিকূল অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে পারে। এই আবরণী-বিশিষ্ট জীবাণুকে স্পোর (spore) বলে। টেটেনাস-জীবাণুও এই রকম স্পোর তৈরী করতে সক্ষম। টেটেনাস স্পোর এমন কি ফুটন্ত গরম জলেও মারা যায় না। জন্তু-জানোয়ারের মলের সঙ্গে বার হওয়া টেটেনাস স্পোর মাটি বা ধুলায় মিশে থেকে বহু বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। বলা বাহুল্য যে, টেটেনাস স্পোর এত ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে তাদের দেখা সম্ভব নয়। স্পোর-মিশান মাটি বা ধুলা যদি শরীরের কোন কাটা জায়গায় ঢোকে এবং স্পোর যদি অনুকূল পরিবেশ পায়, তখন স্পোরের উপরের আবরণী ভেদ ক'রে জীবাণুগুলি বার হয়ে বংশবৃদ্ধি করতে বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ সৃষ্টি করতে পারবে। পল্লীগ্রামের মাঠে বা রাস্তায় যেখানে গো-মহিষাদির বা অন্য জন্তুর মল থাকা সম্ভব, বা শহরের রাস্তার ধুলায় যেখানে বিশেষ ক'রে ঘোড়ার মল থাকতে পারে, সেখানে স্বভাবতই অসংখ্য টেটেনাস স্পোর থাকারই সম্ভাবনা।

টেটেনাস-জীবাণুর দ্বিতীয় বিশেষত্ব হোল, এদের অক্সিজেনবিহীন অবস্থায় বাঁচা। বেশীর ভাগ জীবাণু তাদের বাঁচবার জন্য বা বংশবৃদ্ধি করবার জন্য অক্সিজেন চায়—তা না পেলে তারা মারা যায়। কিন্তু টেটেনাস-জীবাণুর বেলায় ঠিক উল্টো। এরা অক্সিজেনের অভাব হ'লে তবে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এবং স্পোর হ'তে জীবাণু বার হবার জন্য অক্সিজেনবিহীন পরিবেশ খোঁজে। এই জীবাণুর তৃতীয় বিশেষত্ব হোল, এরা সাংঘাতিক ধরনের টক্সিন (toxin) বা বিষ তৈরী করে, যা রক্তের মাধ্যমে বা স্নায়ুর (nerve-এর) মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে তার জীবকোষগুলিকে ধ্বংস করে। শরীরের কোথাও যদি ঘা বা ফোড়া হয় তা হ'লে ধরে নিতে হবে যে, ঘা বা ফোড়ার জীবাণুগুলিও সেই স্থানে আছে; কিন্তু মস্তিষ্কের ক্ষতি ক'রে ধনুষ্টঙ্কার অসুখ সৃষ্টি করার জন্য টেটেনাস-জীবাণুকে মস্তিষ্কে যেতে হবে না, শরীরের যে কোন অংশে বাসা বেঁধে তার তৈরী টক্সিন বা বিষকে মস্তিষ্কে পাঠাতে পারলেই হোল। এই ব্যাপারে টেটেনাস-জীবাণুর সঙ্গে ডিপথিরিয়া-জীবাণুর তুলনা করা যেতে পারে, কারণ ডিপথিরিয়া-জীবাণুও গলদেশে বাসা বেঁধে তার টক্সিন পাঠিয়ে হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয় প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করতে পারে।

এবারে আসা যাক, কিভাবে ধনুষ্টঙ্কার রোগের সৃষ্টি হয়। ধরে নেওয়া যাক, রাস্তায় বা মাঠে কেউ পড়ে গেলেন এবং তাঁর শরীরের কোন অংশ ছড়ে বা কেটে গেল, অথবা রাস্তায় পড়ে থাকা পেরেক কারও পায়ে ফুটে গেল। কেটে যাওয়া অংশে খানিকটা ধুলামাটি লাগা খুবই সম্ভব এবং সেই ধুলামাটিতে টেটেনাস স্পোর থাকাও সম্ভব। সুস্থ শরীরের রক্তে বা জীবকোষে যে অক্সিজেন সাধারণতঃ থাকে, তা টেটেনাস স্পোরের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, কিন্তু শরীরের কেটে যাওয়া অংশে যে সব জীবকোষ মারা যায় সেখানে অক্সিজেন বিশেষ থাকে না; তা ছাড়া কেটে যাওয়া অংশে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়ে অক্সিজেন কমে যায়। আর একটা ব্যাপার ঘটে; যখন মাটির সঙ্গে টেটেনাস স্পোর ঢোকে, সেই মাটিতে পড়ে থাকা অন্যান্য ঘা করার জীবাণুও তার সঙ্গে ঢুকে আশে পাশে যেটুকু অক্সিজেন পায়, তা তাড়াতাড়ি ব্যবহার করে ফেলে। এই সব কারণে কেটে যাওয়া অংশে একটা অক্সিজেন-বিহীন অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সেই সুযোগে

টেটেনাস-জীবাণু তার বাইরের আবরণী ভেদ ক'রে বার হয় এবং বংশবৃদ্ধি ও টক্সিন তৈরী করতে আরম্ভ করে। সেই টক্সিন রক্তের মাধ্যমে বা স্নায়ুর মাধ্যমে গিয়ে মস্তিষ্কের জীবকোষের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে ধনুষ্টঙ্কার রোগ সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ শরীরে স্পোর ঢোকার ২-১৪ দিনের মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয়। তবে কখনও কখনও দেখা গেছে যে, শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়া স্পোর অনুকূল পরিবেশের অভাবে বহুদিন চুপচাপ থেকে পরে কোন কারণে অক্সিজেন-বিহীন অবস্থা পেয়ে হঠাৎ রোগের সৃষ্টি করেছে।

আমরা যে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করতে পারি, তা সম্ভব হয়, কারণ আমাদের শরীরের মাংসপেশীগুলিকে আমরা ইচ্ছামত সঙ্কুচিত-প্রসারিত করতে পারি। মাংসপেশী-গুলি স্নায়ুর বশে থাকে, আবার স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কের বশে চালিত হয়। টেটেনাস-জীবাণুর বিষ মস্তিষ্কের জীবকোষগুলিকে বিকল করার ফলে মাংসপেশীগুলির উপর রোগীর কোন শাসন-ক্ষমতা থাকে না, ফলে মাংসপেশীগুলি রোগীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতিমাত্রায় ও যন্ত্রণা-দায়কভাবে সঙ্কোচন করে। মুখের ভিতরের মাংসপেশীগুলির সঙ্কোচনে রোগী মুখ খুলতে পারে না, শিরদাঁড়ার আশেপাশে মাংসপেশীর সঙ্কোচনে দেহ ধনুকের মত বেঁকে যায়। এই-ভাবে পুষ্টির অভাবে মাংসপেশীর অনবরত সঙ্কোচনের দরুন ক্লান্তিতে এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে রোগীর মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

যে-কোন বয়সের স্ত্রী ও পুরুষের এই রোগ হ'তে পারে। হাতুড়ে ডাক্তার দ্বারা গর্ভপাত করাতে গিয়ে কত নারী যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তার ইয়ত্তা নেই। হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পরে ধনুষ্টঙ্কার হলে অবশ্য সে কথা খবরের কাগজে ওঠে।

এইবার এই রোগের প্রতিকার ও প্রতি-রোধে আসা যাক। রোগ যখন ধরা পড়ে, তখন রোগের অগ্রগতির জন্য বাঁচার আশা কমই থাকে, যদি ভাল আধুনিক হাসপাতালের সাহায্য না পাওয়া যায়। এই রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ৫০-এরও বেশী। সেইজন্য এই রোগের প্রতিরোধের উপর জোর দিতে হবে। এটা সহজেই বোধগম্য যে, বহু বন্য ও গৃহপালিত জন্তুর মলে টেটেনাস-জীবাণু থাকার জন্য সারা পৃথিবী হ'তে এই রোগের সম্পূর্ণ নির্মূলীকরণ (যেমন বসন্ত রোগের করা হয়েছে) সম্ভব নয়। তবে সুখের বিষয়, এই রোগের ভাল প্রতিষেধক টিকা আছে যার নাম টেটেনাস টক্সয়েড (tetanus toxoid)। সকল সভ্য দেশেই জন্মের মাস তিনেক পরেই শিশুকে এই টিকা দেওয়া হয়। সুবিধার জন্য এই টিকার সঙ্গে অন্য দুইটি রোগের (ডিপথিরিয়া ও যুঙড়ি কাশি) টিকাও যোগ ক'রে দেওয়া হয়, যার নাম ট্রিপল্ এ্যান্টিজেন (triple antigen)। এর কথা অন্য সংখ্যায়[১] বলা হয়েছে। পাঁচ হতে দশ বৎসর অন্তর টেটেনাস টক্সয়েড নেওয়া উচিত, কারণ তা না হ'লে শরীরে টেটেনাস-প্রতিষেধক ক্ষমতা কমতে থাকে। এখানে বক্তব্য এই যে, শুধু শিশুদের নয়, প্রাপ্ত-বয়স্কদেরও এই টক্সয়েড (ট্রিপল্ এ্যান্টিজেন নয়) নেওয়া উচিত, কারণ কর্মরত জীবনে রাস্তায় পড়ে যাওয়া বা বাড়ীতে কেটে যাওয়া যে কোন সময়ে ঘটতে পারে টক্সয়েড নেওয়া থাকলে ধনুষ্টঙ্কার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে

১ উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৮৪, পৃঃ ৩১০-১১

যায়। দেখা গেছে যে, সেনাবাহিনীতে টেটেনাস টক্সয়েড বাধ্যতামূলক ভাবে দেওয়ার ফলে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে আহত সৈনিকদের মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার রোগীর সংখ্যা এক দশমাংশ হয়ে গিয়েছিল। আজকাল অনেক হাসপাতালে যে-কোন শল্য চিকিৎসার পূর্বে, অথবা গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিতভাবে এই টক্সয়েড দেওয়া চালু হয়েছে। কারণ হাসপাতালকে যথাসাধ্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করলেও, ওখানকার ধুলায় বা হাওয়ায় উড়ে আসা টেটেনাস স্পোর অস্ত্রোপচারের জায়গায় এসে পড়তে পারে।

রাস্তায় পড়ে গিয়ে কারও কেটে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে কি করা কর্তব্য? প্রথমত: থেঁতলে বা ঝুলে পড়া চামড়ার অংশগুলি বাদ দিয়ে আহত অংশটিকে ভাল ভাবে পরিষ্কার (toilet) করে, টিংকচার আয়োডিন লাগালে টেটেনাস হবার সম্ভাবনা কমে। পুরু ব্যাণ্ডেজ না দেওয়াই ভাল, কারণ তাতে বায়ু বা অক্সিজেন চলাচলে ব্যাঘাত হতে পারে। ডাক্তার নিশ্চয়ই টেটেনাস টক্সয়েড এবং পেনিসিলিন-জাতীয় ওষুধ দেবেন। এ্যান্টিটক্সিন সিরাম (antitoxin serum), সংক্ষেপে যাকে এ. টি. এস. (A. T. S.) বলে,—সেটার ইন্‌জেকসন নেওয়া সম্বন্ধে চিকিৎসকদের মধ্যে মতভেদ আছে, কারণ এ. টি. এস. ঘোড়ার রক্ত হ'তে তৈরী হয় ব'লে মানুষের দেহে কখনও কখনও সাংঘাতিক রকমের প্রতিক্রিয়া (allergy) করতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ. টি এস. ইন্‌জেকসন দেওয়ার ফলে দেহে টেটেনাসপ্রতিরোধক্ষমতা তাড়াতাড়ি জন্মে, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু টক্সয়েড ইন্‌জেকসন নিলে ওই ক্ষমতা জন্মাতে সময় লাগে, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। শেষোক্ত ইন্‌জেকসনে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার ভয় নাই। যাই হোক, কেটে যাওয়া যদি বেশী মাত্রায় হয় এবং কাটা অংশে যদি অনেক ধুলা মাটি লাগে, তা হ'লে টক্সয়েডের সঙ্গে এ টি. এস. দেওয়াই ভাল, কারণ টক্সয়েডের ফলে প্রতিরোধক্ষমতা জন্মাতে যে সময় লাগবে, সেই সময়ে এ. টি. এস. ধনুষ্টঙ্কার রোগকে বাধা দিতে পারবে।

ধনুষ্টঙ্কার রোগ কখনও মড়ক আকারে দেখা দেয় না বলেই হয়ত জনসাধারণের এই রোগটি সম্বন্ধে ঔৎসুক্য কম। কিন্তু মনে রাখা উচিত, কলেরা বসন্ত অপেক্ষা এই রোগের মারণ-ক্ষমতা বেশী, আর এর জীবাণু ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে সর্বত্র সবসময় লুকিয়ে আছে। কলেরা বসন্তর বেলায় কিন্তু সেরূপ নয়।

ভ্রম-সংশোধন

গত ভাদ্র সংখ্যার ৪১১ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ২৩শ পঙ্‌ক্তিতে 'কাঁটা-দেওয়া' স্থলে 'কাঁটাশুদ্ধ (কাঁটা-সমেত)' পড়িতে হইবে।

গত আশ্বিন সংখ্যার ৫৩০ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভের শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'মূলতিনি' স্থলে 'মূল, তিনি' এবং ৫৩১ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে 'ব্যাসের' স্থলে 'ব্যাসার্ধের' পড়িতে হইবে।—সঃ

মহাকাশের দূত—উল্কা

ডক্টর ধ্রুব মার্জিত*

মহাশূন্য থেকে আসা কোন বস্তুর সবচেয়ে দর্শনীয় সবচেয়ে রহস্যজনক আবির্ভাব ঘটেছিল ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন মধ্য-সাইবেরিয়ার তাইগাতে। তখন সকাল সাতটা বেজে সতেরো মিনিট। সহসা উর্ধ্বাকাশে দেখা গেল একটি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত পিণ্ড তীব্র বেগে ছুটে আসছে। ঠিক সেই সময় সাইবেরিয়ার ঐ বিজন প্রান্তরের বুক চিরে চলছিল নবনির্মিত ট্রান্স-সাইবেরিয় রেলপথে একটি যাত্রিবাহী ট্রেন। চলন্ত সেই রেলগাড়ীর কামরা-ভর্তি যাত্রীরা অবাক্ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন—অতি উজ্জ্বল এবং বিশালকায় একটি উল্কাপিণ্ড উত্তর-পূর্ব দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে এবং তার সেই ছুটে চলার সময় সেটি পিছনে প্রশস্ত এবং উজ্জ্বল একটি পথরেখা ছড়িয়ে রাখছে। একসময় সেই অগ্নিপিণ্ডটি নিচের দিকে নেমে এসে সম্ভবত পাঁচ-ছ'শ কিলোমিটার দূরে দিগন্তের ওপারে কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেল। পরক্ষণেই শোনা গেল কান-বধির-হওয়া প্রচণ্ড এক বজ্রধ্বনি। সেই শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রেলগাড়ীটি ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল। উল্কাপিণ্ডটি আছড়ে পড়ে সোভিয়েৎ রাশিয়ার অন্তর্গত তুঙ্গুস্কা-র একটি উপনদী খুশমার অববাহিকায়। তুঙ্গুস্কা (Tunguska) উল্কাপিণ্ড নামে খ্যাত এবং বহুবিদিত এই উল্কাবিস্ফোরণের মতো এত বড় এ-জাতীয় ঘটনা পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ঘটেনি। তুঙ্গুস্কা-উল্কার আবির্ভাব এবং তার পতনের সঙ্গে বহু ব্যতিক্রমী ঘটনা জড়িয়ে আছে। এর বিকট গর্জন শোনা গিয়েছিল প্রায় ১২০০ কিলোমিটার দূর থেকে এবং উল্কাটির পতনস্থল থেকে আকাশে বিকীর্ণ আভা চোখে পড়েছিল ৭০০ কিলোমিটার দূর থেকে। এর আঘাতে মাটি এত জোরে দুলে উঠেছিল যে ৪০০ কিলোমিটার দূরে হালের ঘোড়া জমিতে ছিটকে পড়েছিল এবং ১০০ কিলোমিটার দূরের বাড়ী-ঘরের জানালার ফ্রেম এই বিস্ফোরণের ফলে ভেঙ্গে গিয়েছিল। এছাড়া আরও নানান ধরনের ক্ষয়ক্ষতি এবং হতবাক্-করা সব বৈজ্ঞানিক তথ্য জড়িত হয়ে আছে এই অদ্বিতীয় ঘটনাটির সঙ্গে।

৪৫০ কিলোমিটার দূরের লেনা নদীর তীরের একটি শহর কিরেনস্কের বাসিন্দারা অবাক্ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন উল্কাপিণ্ডের পতন-স্থল হতে গাঢ় ধোঁয়ার এক কুণ্ডলীকে ক্রমাগত আকাশের দিকে উঠে যেতে। এক সময়ে সেই ধূম্রকুণ্ডলী স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণের জন্য। হিসাব করলে দেখা যাবে ৪৫০ কিলোমিটার দূর হতে কোন কিছুকে দেখতে গেলে সে বস্তুটির আকৃতিটি অন্তত কুড়ি কিলোমিটার উঁচু না হলে অত দূর থেকে তাকে কোন মতেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যুক্তির খাতিরে আমরা মেনে নিতে বাধ্য যে, সেদিনের সেই ধূম্রকুণ্ডলীটি নিশ্চয়ই কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত উঁচু একসময় হয়েছিল। ভাবতে অবাক্ লাগে গত মহাযুদ্ধের সময় জাপানের

* পদার্থবিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি.। পারমাণবিক এবং আণবিক বর্ণালী সম্পর্কে লেখকের উচ্চতর গবেষণা দেশে বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "ফরেনসিক সায়েন্স গবেষণাগারে" পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত আছেন।

হিরোসিমা বন্দরে মার্কিন পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সময় যে রক্তবর্ণের বিকট-দর্শন 'ব্যাঙের ছাতা' (mushroom cloud from atomic explosion) আকাশে গজিয়ে উঠেছিল, তার উচ্চতা একসময় পাঁচ কিলো-মিটার পর্যন্ত হয়েছিল এবং সম্প্রতি পেণ্টাগনের মার্কিন সমরবিশারদগণ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে যে প্রচণ্ড শক্তিধর হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন, তার ধূম্রকুণ্ডলী উঠেছিল বারো কিলোমিটার উঁচুতে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে একটি সাধারণ মানের হাইড্রোজেন বোমার ক্ষমতা সাধারণ মানের কোন একটি পরমাণু বোমার চেয়ে ০ থেকে ১০০ গুণ পর্যন্ত বেশী হতে পারে।

তুঙ্গুস্কা-র এই ঘটনার ফলে বিশ্বব্যাপী কৌতূহলের সৃষ্টি হলেও সে সময় এ ব্যাপারে কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয়নি। কারণ সময়টা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের এবং অক্টোবর বিপ্লবের আগের, তাতে আবার নিকটতম রেলপথ থেকে অকুস্থলটি ৬০০ কিলো-মিটার দূরে জলাভূমির দুর্ভেদ্য এক অরণ্যের ভিতর—তাই সে যুগে এ রকম এক দুঃসাহসে-ভরা অভিযান সম্পন্ন করা ছিল কার্যত অসম্ভব ব্যাপার। তুঙ্গুস্কা উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান শুরু হয় এ ঘটনা ঘটার অনেক পরে—১৯২১ সালে এবং এই অভিযানের প্রধান ছিলেন প্রখ্যাত উল্কাবিশেষজ্ঞ ডঃ লেওনিদ কুলিক। উল্কাটির পতন-স্থল নিরূপণের জন্য বিজ্ঞানীরা বিস্তীর্ণ এক অঞ্চল জুড়ে তাঁদের গবেষণা চালান; সংগ্রহ করেন উল্কাপিণ্ডের পতনসংক্রান্ত নানান তথ্যাদি এবং শত শত প্রত্যক্ষদর্শীকে তাঁরা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। গবেষণার কাজে নেমে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন যে, এ রহস্যের কোন সীমা-পরিসীমা নেই—সবটাই হতবাক্ করার মতো। প্রথম আবিষ্কারটি করলেন কুলিক স্বয়ং—দেখা গেল সেই বিপুলকায় পিণ্ডটির আঘাতে মাটিতে কোন গর্ত হয়নি এবং উল্কার দেহাংশের কোন অবশেষও খুঁজে পেলেন না তিনি। অথচ বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়ানো এই বিস্ফোরণের ব্যাপক ধ্বংসচিহ্ন তখনও সুস্পষ্ট। ৮০ কিলোমিটার দূরের ভেঙ্গে-পড়া এবং ৩০ কিলোমিটার দূরের পুড়ে-যাওয়া গাছপালা আজও দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে এই অভিঘাত মাটি হতে ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার উর্ধ্বে বিস্ফোরিত ২ থেকে ৪ কোটি টন টি. এন. টি. (ট্রাই-নাইট্রো টলুইন) ক্ষমতাধর বোমার সমান অর্থাৎ একটি পরমাণু বোমার চেয়ে ১০০০ থেকে ২০০০ গুণ বেশী শক্তিশালী। রাজস্থানে ফাটানো ভারত-বর্ষের প্রথম পরমাণু বোমাটির শক্তি ছিল ১৬০০ টন টি. এন. টি.র সমান।

তুঙ্গুস্কা প্রসঙ্গে আমরা আবার পরে আসছি তার আগে উল্কা কাকে বলে সে সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। সন্ধ্যার আকাশে লক্ষ্য করলে কখনো কখনো দেখা যায় মহাকাশের বুক চিরে আগুনের গোলার মত বস্তু পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই সেই আগ্নাপণ্ডগুলি তাদের কঠিন অবশেষ নিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে। তাদের ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য সেগুলি প্রায়ই মাটিতে আছড়ে পড়ার আগেই বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণ-জনিত উত্তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রাচীন কালে এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিয়ে নানান কাল্পনিক গাথা প্রচলিত ছিল। উল্কাপাতের আধিক্যকে মহামারী বন্যা খরা দৈন্য ইত্যাদির প্রতীক বলে মনে করা হতো। 'মহাকাশের দূত'-রূপে বর্ণিত উল্কাপিণ্ডকে নিয়ে আধুনিক

ভূ-বিজ্ঞানীদের ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে। তাঁদের ভাবনা-চিন্তার প্রধান উদ্দেশ্য হল উল্কাদের সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা লাভ করা, মহাবিশ্ব-সৃষ্টির মূল সূত্র আবিষ্কার এবং পৃথিবী ও তার প্রতিবেশী গ্রহের উপাদান সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান আহরণ করা। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, উল্কাপিণ্ডগুলি সেকেণ্ডে ১০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গতি নিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে ৮০ হতে ২০ কিলোমিটার উঁচুতে থাকা বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে তীব্র ঘর্ষণের ফলে সেগুলি এক সময়ে জ্বলতে শুরু করে। সেই প্রজ্বলিত অবস্থাতেই উল্কাপিণ্ড আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

বহুলকথিত 'বিগ ব্যাংগ' (Big bang)[১] তত্ত্ব অনুযায়ী সৌর জগতের সৃষ্টির সময় যখন ছোট বড় নানান আকারের গ্রহাদি সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সময় কোন দু'টি বা তার অধিক বস্তু-পিণ্ড পরস্পরের সংস্পর্শে আসাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে। সেই চূর্ণ-বিচূর্ণ অংশগুলিও কালক্রমে মহাকাশের আবর্তে প্রাকৃতিক নিয়মে ঘুরে চলতে থাকে এবং যখন এরা কোন গ্রহের আকর্ষণ-ক্ষেত্রের মধ্যে এসে পড়ে, তখন তার আকর্ষণে সেটি তীব্র গতিতে ছুটে গিয়ে গ্রহটির বুকে আছড়ে পড়ে।

যেহেতু পৃথিবী এবং সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত অপরাপর গ্রহ উপগ্রহগুলির উপাদান প্রায় একই ধরনের, তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা তাদের অভ্যন্তরের বস্তুসকলের গঠন বৈচিত্র্য এবং জন্মরহস্যের সমাধান হয়ত পাওয়া যাবে ঐ 'মহাকাশের দূতে'র আনা খবরগুলি থেকেই। উল্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সচেতন এবং আগ্রহান্বিত হবার কারণ কেবলমাত্র মহাজাগতিক তথ্যের প্রেরণাই নয়—পৃথিবী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও এর মূল্য কম নয়। বর্তমানে যে ধরনের ভূ-তাত্ত্বিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সমীক্ষা প্রচলিত আছে, তার দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তরের উপাদানের গঠন-বৈচিত্র্য সম্পর্কে

১ প্রখ্যাত গণিতবিদ্ এবং পদার্থবিজ্ঞানী জর্জেস লিমেট্রির মতে কোটি কোটি বছর আগে কখনও মহাশূন্যের যাবতীয় বস্তুকণা জমাট হয়ে একটি বিশাল গোলকের আকৃতি নিয়েছিল। বেলজিয়ান বিজ্ঞানী লিমেট্রি গোলকটির নাম দিয়েছিলেন atome primitif বা primordial atom। কালক্রমে সেই গোলকটি এক বিশাল বিস্ফোরণের ফলে ফেটে যায়। বিশালকায় সেই গোলকটি যদিও মহাশূন্যের যাবতীয় বস্তুকণিকা দিয়ে গঠিত ছিল, তবু সেই গোলকটির আকার কিন্তু তার ঘনত্বের তুলনায় ছিল নিতান্তই কম। পৃথিবী হতে সূর্যের দূরত্ব যতখানি (অর্থাৎ /৭০,০০০ আলোক বর্ষের দূরত্ব) প্রায় ততটুকুই ছিল তার ব্যাস। বিস্ফোরণের ফলে সেই atome primitif হতে ছিটকে বেরিয়ে-আসা অংশগুলিই পরবর্তী কালে নীহারিকা ছায়াপথ নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ ইত্যাদি 'স্বর্গীয় বস্তুতে' রূপান্তরিত হয়। লিমেট্রি প্রদত্ত এই তত্ত্ব নিয়ে পরবর্তী কালে আরও গবেষণা হয়েছে—হচ্ছে এখনও। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো এই বিস্ফোরণের নামকরণ করেছেন 'বিগ ব্যাংগ' এবং জমাট-বাঁধা ঐ অতি ঘনত্বের গোলকটির নাম দিয়েছিলেন ylem। বিগ-ব্যাংগ সম্পর্কে আরও অনেকগুলি মতামত প্রচলিত আছে—তার মধ্যে প্রখ্যাত সুইডিস বিজ্ঞানী হান্স আলফ্‌ভেন ও অসকার ক্লিসের তত্ত্বটি বহুলপ্রচলিত।

প্রত্যক্ষ তথ্য না পাওয়া যাওয়ায় বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণার কাজে উল্কাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। জ্যোতিঃপদার্থবিদ্‌গণ এবং পরমাণু-বিজ্ঞানিগণও উল্কার সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহী—তার কারণ উল্কাদেহে তাঁদের অচেনা বহু মৌলিক পদার্থ, বিচিত্র সব রাসায়নিক গঠন ও ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়, যা পৃথিবীতে বিরল। অর্থাৎ বলা চলে আজ হতে পাঁচ শ' কোটি বছর আগে শুরু-হওয়া মহাবিশ্বসৃষ্টির যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে বুকে নিয়ে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোট বড় নানান আকারের অসংখ্য উল্কাপিণ্ড। আর মাঝে মাঝে পৃথিবীর মহাকর্ষ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তারা পৃথিবীর বুকে এসে আছড়ে পড়ছে এতদিনের না-জানা অনেক সব বিস্ময়কর তথ্য আর সম্ভাবনা নিয়ে। মোটের উপর একথা আজ বিজ্ঞানীরা মেনেই নিয়েছেন যে, উল্কার বয়স এবং তার আকৃতি-প্রকৃতি থেকে উদ্ধার-করা ধর্মাবলী মহাবিশ্বের বয়স ও তার সৃষ্টিরহস্য উন্মোচনে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

পৃথিবীতে-আসা উল্কার অবশিষ্টাংশের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক হতে শুরু ক'রে বেশ ক'য়েক টন ওজনের বস্তুর সদৃশ পর্যন্ত হতে পারে। উল্কাদেহ প্রধানত ধাতব লোহা নিকেল এবং ক্ষারজাতীয় ধাতুর সিলিকেট সংমিশ্রণে গঠিত হয়। এ ছাড়া 'টেকটাইট' নামের এক ধরনের কাচসদৃশ পদার্থকেও মাঝে মাঝে উল্কাদেহে খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার উল্কাদের জন্য একটি কার্যকরী ও সন্তোষজনক শ্রেণীবিন্যাস করার চেষ্টা চলছে দীর্ঘ দিন যাবৎ। উল্কা নিয়ে আলোচনা করার সময় বহু বিজ্ঞানীই বহু ধরনের শ্রেণীবিন্যাসের কথা বলেছেন। উল্কাদের দেহের গঠন-বৈচিত্র্য অনুযায়ী একটি বিজ্ঞানগ্রাহ্য শ্রেণীবিন্যাসের কথা এখানে উল্লেখ করা হল— ১। প্রস্তর উল্কা বা এরোলাইট (Aerolite): এ ধরনের উল্কার দেহের প্রায় সম্পূর্ণটাই তৈরী হয় ভারী ক্ষার-জাতীয় ধাতুর সিলিকেট দিয়ে, যদিও সামান্য পরিমাণে ধাতব লোহা এবং নিকেলের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায় সেখানে। প্রস্তর উল্কাকে আবার (ক) কুণ্ডল (Chondrite) ও (খ) অ-কুণ্ডল (Achondrite) এই দু'ই ভাগে ভাগ করা হয়।

২। মিশ্র উল্কা বা সিডেরোলাইট (Siderolite): এ ধরনের উল্কার দেহের প্রায় সম্পূর্ণটাই তৈরী হয় লোহা নিকেল এবং ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতির ক্ষারজাতীয় সিলিকেটের সংমিশ্রণে।

৩। লৌহ উল্কা বা সিডেরাইট (Siderite): এ ধরনের উল্কার দেহের প্রায় সম্পূর্ণটাই ধাতব লোহা ও নিকেলের সংমিশ্রণে তৈরী হয় অর্থাৎ এদের দেহের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ লোহা এবং পঞ্চাশ ভাগ নিকেল। সুতরাং এদের ঘনত্ব যে খুব বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য।[২]

২ উল্কাদের নিয়ে গবেষণার সুবিধার জন্য এছাড়াও আরও দু'শ্রেণীতে এদের ভাগ করা হয়ে থাকে, সে শ্রেণী দু'টি হল: (১) 'কুড়িয়ে-পাওয়া' (finds) এবং (২) 'ভূ-পাতিত' (falls)। কুড়িয়ে-পাওয়া উল্কা হল যেগুলিকে পড়তে দেখা যায়নি কিন্তু পরে তাদের বিভিন্ন গুণাবলীর সাহায্যে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বুঝা গেছে এরা 'অপার্থিব' বস্তু অর্থাৎ মহাশূন্য হতে আসা বিচিত্র কোন আগন্তুক। আর ভূ-পাতিত উল্কা হল যেগুলিকে পৃথিবীর বুকে পড়তে দেখা গেছে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে গবেষণাগারে অধ্যয়নের জন্য তাদের সংগ্রহ করা হয়েছে। মিশ্র উল্কা এবং লৌহ উল্কাদের সাধারণত কুড়িয়ে-পাওয়া উল্কা হিসাবেই প্রকৃতিতে

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উল্কার ওজন ও আয়তন ধূলিকণার চেয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র থেকে শুরু করে বেশ কিছু টন পর্যন্ত হতে পারে। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে বড় উল্কাটির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার 'হোবা' নামক স্থানে। এই উল্কাটির উপরের সমতল ক্ষেত্রের পরিমাপ হল ২'৯১ মিটার × ২'৮৪ মিটার এবং উচ্চতা ০৫ মিটার থেকে .'২৫ মিটারের মধ্যে। এটির ওজন ছিল ৬০ টনের কাছাকাছি। ভূ-বিজ্ঞানিগণ অবশ্য মনে করেন যে, পতনকালে উল্কাটির ওজন ছিল আরও বেশী কারণ আবহাওয়া-জনিত ক্ষয়-ক্ষতির জন্য উল্কাটির গায়ে প্রায় ০'৫ মিটার পুরু লিমোনাইট নামক একটি ভঙ্গুর যৌগের আবরণের সৃষ্টি হয়েছিল—অন্যথা উল্কাটির প্রকৃত ওজন হতো ১০০ টনের কাছাকাছি। হোবায় পাওয়া উল্কাটি ছিল লৌহ উল্কা শ্রেণীভুক্ত।

ক্ষুদ্রতম উল্কাটিকে পাওয়া গেছে সোভিয়েৎ রাশিয়ার সিঘোটিএলিন নামক স্থান থেকে। এই ক্ষুদে উল্কাটির ব্যাস এক মিলিমিটারের চেয়েও কম এবং ওজন ০'৩ মিলিগ্রাম। পৃথিবীতে পাওয়া উল্কাগুলির গড় ওজন ৫ টন থেকে ৩০ টনের মধ্যে। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ১৭৫০টি উল্কাদেহের অবশিষ্টাংশের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীদের হিসাবে আছে।

একটি বিচিত্র ব্যাপার বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। তা হলো উল্কাপাতের ঘটনা সাধারণত শিলাময় পর্বত অপেক্ষা সমতল এবং ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলেই লক্ষ্য করা যায় বেশী ক'রে। এর কারণ হিসাবে বলা চলে, কোন দেশের জনসংখ্যা এবং সেখানকার সভ্যতা-বিকাশের উপর উল্কা-আবিষ্কারের একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। জনবহুল কোন দেশে প্রায় সব উল্কাপাতগুলিই লক্ষ্য করা যায় এবং তাদের সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়; তাছাড়া সেখানকার সভ্যতা তথা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে সেগুলির যথাযথ সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করাও সম্ভব হয়। উল্কা-পতনের প্রাপ্ত সংখ্যার ভিত্তিতে ভূ-তাত্ত্বিকগণ হিসাব করে দেখেছেন যে, প্রতি বছর প্রতি এককোটি বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রে একটি করে উল্কাপাত ঘটে থাকে। তাঁদের এই হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রতি বছর উল্কাপাতের সংখ্যা হওয়া উচিত ৫০০টির কাছাকাছি। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগই জলে পূর্ণ, সেজন্য ঐ সংখ্যার মধ্যে প্রায় ৩৫০টি উল্কাই গিয়ে পড়বে সমুদ্রে এবং স্বভাবতই তাদের উদ্ধার করার সম্ভাবনা হবে খুবই কম। এই ধরনের কতকগুলি কারণের জন্য বিজ্ঞানীদের দেওয়া হিসাব এবং সেখান হতে পাওয়া সংখ্যার

পাওয়া গেছে বেশী পরিমাণে। কিন্তু প্রস্তর উল্কাদের (কুণ্ডল এবং অ-কুণ্ডল উভয় শ্রেণীর) অধিকাংশ-গুলিকেই পতনকালে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এর কারণ হিসাবে বলা চলে, মিশ্র উল্কা ও লৌহ উল্কাকে অতি সহজেই পার্থিব বা জাগতিক শিলাদের থেকে পৃথক্ করে চিনে নেওয়া সম্ভবপর; অপরদিকে প্রস্তর উল্কাদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য নিরূপণ করা জটিল এক বৈজ্ঞানিক সমস্যাবিশেষ। এছাড়াও মিশ্র ও লৌহ উল্কাগুলি ধাতব লৌহ ও নিকেলের সংমিশ্রণে গঠিত হওয়ায় এ ধরনের উল্কাদেহ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নষ্ট হতে অনেক দেরী হয়, কিন্তু প্রস্তর উল্কারা ক্ষারজাতীয় ধাতুর সিলিকেট ইত্যাদি ভঙ্গুর খনিজে সমৃদ্ধ হওয়ায় খুব সহজেই অবক্ষয়ের শিকার হয়।

সঙ্গে প্রকৃত উল্কাপাতের সংখ্যার তুলনা করলে এটা দেখা যায় যে, আবিষ্কৃত উল্কার সংখ্যা—তাঁদের হিসাব হতে পাওয়া সংখ্যার সঙ্গে প্রকৃত উল্কাপাতের সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। বিগত দেড়শ' বছরে (১৮১০-১৯৬০ সংগৃহীত উল্কাপাতের সংখ্যা মাত্র ৬৭০টি অর্থাৎ গড়ে বছরে ৪'৫টি করে। ইদানীং অবশ্য বিশ্বের বিভিন্ন গবেষণাগারগুলিতে প্রতি বছরে এর চেয়ে অনেক বেশীসংখ্যার উল্কার বিশ্লেষণ করে থাকেন বিজ্ঞানীরা। প্রতি বছর উল্কা-আবিষ্কারের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা থেকে মানুষের বিজ্ঞানচেতনার বৃদ্ধি, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি উল্কা সম্পর্কে আগ্রহবৃদ্ধির কথাই প্রমাণিত হয়।

উল্কার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে পৃথিবীর সব ক'টি মহাদেশেই। এমন কি দক্ষিণ মেরুতেও উল্কা পাওয়া গেছে। ভারত ভূখণ্ডে পাওয়া উল্কার মোট সংখ্যা একশ'টিরও বেশী এবং সেগুলির বেশীর ভাগই পাওয়া গেছে সিন্ধু ও গঙ্গার সমতল ভূমিতে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশ হলেও জাপান এবং গ্রেট ব্রিটেন থেকে যথাক্রমে ৩০টি এবং ২৪টি উল্কা পাওয়া গেছে, যা ঐ দু'টি ঘনবসতিসম্পন্ন দেশের উচ্চ শিক্ষামান এবং বিজ্ঞান-চেতনার কথাই প্রমাণিত করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাস্য একটি পরিসংখ্যান হল চীন থেকে মাত্র ছ'টি উল্কা-আবিষ্কারের ঘটনা। এ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে উল্কাপাতের পরিমাণের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, আমেরিকা ভূখণ্ডের স্থান প্রথম, ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয় এবং সোভিয়েৎ ইউনিয়নের স্থান তৃতীয়। এর পর অন্যান্য দেশের স্থান যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্স মেক্সিকো ও চিলি।

ভারতবর্ষের উল্কাপাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯২০ সালের ৩০শে অগস্ট এলাহাবাদের মেরুয়ায় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ উল্কাটি বৃষ্টির আকারে মাটিতে ঝরে পড়েছিল। মোট ছ'টি খণ্ডে বিভক্ত উল্কাটির ওজন ছিল প্রায় ৭১'৪ কিলোগ্রাম এবং সবচেয়ে বড় খণ্ডটির একক ওজন ছিল ৫৩'৭ কিলোগ্রাম। আছড়ে পড়ার সময় সেগুলি প্রায় ০'৫ মিটার গর্ত করে মাটিতে ঢুকে যায়। এটি ছিল একটি কুণ্ডল শ্রেণীর উল্কা। দ্বিতীয় বৃহৎ উল্কাবৃষ্টি হয় তামিলনাড়ুর কুট্টিপুরমে। সেখানে প্রায় ১৫টি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে উল্কাপিণ্ডটি মাটিতে ছিটিয়ে পড়েছিল, সমস্ত টুকরোগুলির মোট ওজন ছিল ৩৮'৪ কিলোগ্রাম। তামিলনাড়ুর কোডাই-কানাল অঞ্চল থেকে একটি লৌহ উল্কা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, যেটির ওজন ছিল ১৬ কিলোগ্রাম। এককভাবে সর্ববৃহৎ উল্কাপতন হয়েছিল ত্রিপুরার পোটওয়ারে ১৯৩৫ সালের ২৯শে জুলাইয়ের গভীর নিশীথে। ৩৭'৩ কিলোগ্রাম ওজনের সে উল্কাটিও ছিল লৌহ উল্কার শ্রেণীভুক্ত।

শ্রেণী অনুযায়ী ভারতে পাওয়া উল্কাদের বিন্যাস ক'রে দেখা গেছে—কুণ্ডল শ্রেণীর উল্কার সংখ্যা ৪ (এই শ্রেণীর উল্কাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২'৫৩ থেকে ২'৭৯ এর মধ্যে), অকুণ্ডল শ্রেণীর উল্কার সংখ্যা ১০ (এই শ্রেণীর উল্কাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩'১২ থেকে ৩'২৮ এর মধ্যে) এবং লৌহ উল্কার সংখ্যা ৫ (এই শ্রেণীর উল্কার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭'২৯ থেকে ৭'৭৩ পর্যন্ত হয়)।

উল্কাপাতের পরিমাণ ঋতুচক্রের পরিবর্তনের উপরেও কিছুটা নির্ভরশীল। দেখা গেছে মার্চ থেকে জুলাই এই গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায় উল্কা-পাতের ঘটনা লক্ষ্য করা যায় বেশী, অপরদিকে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী এই শীতকালীন

আবহাওয়ায় উল্কাপাতের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় কম। এর কারণ হিসাবে বলা হয় 'মার্চ থেকে জুলাই' এই সময়ে পৃথিবী তার কক্ষপথের এমন একটি অঞ্চল দিয়ে সূর্য-পরিক্রমায় রত থাকে, যে অঞ্চলটিকে বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন উল্কা-অধ্যুষিত অঞ্চল।

উল্কার উৎপত্তি এবং তার বয়স নির্ণয় করার জন্য দম-বন্ধ-করা গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে এই শতাব্দীর প্রথম হতেই। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কতকগুলি মূল্যবান তথ্যের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। চন্দ্র-বিজয়ের পর মানুষের হাতে যে সব তথ্য এসেছে, তার ভিত্তিতে উল্কাপিণ্ডের জন্মরহস্য সম্পর্কে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আগে মনে করা হত, চন্দ্রপৃষ্ঠে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নিক্ষিপ্ত বস্তুকণাই উল্কারূপে সরাসরি পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, কিন্তু চন্দ্রাভিযানের সময় জানা গেল, চন্দ্রের অভিকর্ষজ টান এড়িয়ে এই অংশগুলির ছিটকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারটি কার্যত একটি অসম্ভব ঘটনা। যদিও চাঁদের বুকের আগ্নেয়গিরিগুলির প্রধান জ্বালামুখের চারপাশে অসংখ্য গৌণ জ্বালামুখের অস্তিত্ব এবং তাদের বিকীর্ণ রেখা এ কথাই প্রমাণিত করে যে, প্রচুর পরিমাণে বস্তুকণা অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বেগে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং সে সময় হয়তো কিছু কিছু টুকরো চাঁদের অভিকর্ষজ টান এড়িয়ে পৃথিবীর বুকে নেমেও এসেছিল, কারণ চাঁদের পাথরগুলির রাসায়নিক, খনিজ (mineralogical) ও অন্তর্বিন্যাস-সংক্রান্ত (textural) পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মূর' অঞ্চলের 'ইউক্রাইট' এবং কাবওয়েটার অঞ্চলের 'হাউআরডাইট' নামে পরিচিত দু'টি অ-কুণ্ডল শ্রেণীর উল্কার সঙ্গে চান্দ্রশিলার ঐ ব্যাসল্টের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিল আছে।

উল্কাসৃষ্টির কারণ সম্পর্কে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রিং উড (১৯৬১) বলেন যে, উল্কা গঠিত হয়েছিল সৌর উপাদান নামে কথিত এক প্রকার শীতল ধূলিপুঞ্জের ক্রম-পিণ্ডীভবনের (nucelation) ফলে। পিণ্ডীভবনের পর এগুলি অত্যন্ত বেশী পরিমাণে উদ্বায়ী (volatile) বস্তুর সংমিশ্রণে অঙ্গার-শ্রেণীর কুণ্ডল উল্কায় পরিণত হয়, এবং পরবর্তী কালে মহাশূন্যের নিম্ন তাপমাত্রায় তাদের দেহের আভ্যন্তরীণ তাপের প্রভাবে ভিতরের গলিত অংশগুলি উপরের দিকে সবেগে বেরিয়ে আসে অনেকটা অগ্ন্যুৎপাতের আকার নিয়ে। এর ফলে তখন এই টুকরো টুকরো অংশবিশেষের মধ্যে এক ব্যাপক রাসায়নিক বিভক্তি ঘটে যায়। তাঁর মতে এই ছিটকে-আসা টুকরোগুলিই হল 'উল্কা'—সেই মহাকাশের দূত।

উল্কার বয়স নির্ণয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা কতকগুলি পারমাণবিক বিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। সেগুলি হল—(১) রেনিয়াম-ওসমিয়াম প্রক্রিয়া: এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে উল্কার বয়স যদি ৩০০ থেকে ৫০০ কোটি বছরের মধ্যে থেকে থাকে, তবে তা যথেষ্ট নিখুঁত ভাবেই নির্ণয় করা সম্ভবপর; (২) লেড-আইসোটোপ প্রক্রিয়া: এই প্রক্রিয়ার নির্ণয়কাল হল ৪৫৫ $\pm$ ৭৫ কোটি বছর, (৩) রুবিডিয়াম-স্ট্রনসিয়াম প্রক্রিয়া: ৪৫০ কোটি বছর; (৪) পটাসিয়াম-আরগন প্রক্রিয়া: এই প্রক্রিয়াতেও ৪৫০ কোটি বছর পর্যন্ত বয়স পরিমাপ করা সম্ভব; (৫) ইউরেনিয়াম-হিলিয়াম প্রক্রিয়া: ৫০ কোটি বছর থেকে ৪২০০ কোটি বছরের এক সুবিশাল সময় কাল এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরিমাপ করা যেতে পারে। এ ছাড়াও মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic ray) সাহায্যেও পরমাণু-বিজ্ঞানিগণ উল্কাদের বয়স নির্ণয় করে থাকেন।

মহাজাগতিক রশ্মির সাহায্যে ১৫০ কোটি বছর বয়সের উল্কাদের বয়স যথেষ্ট নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা যায়। মোটামুটি ভাবে এ কথা আজ স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত যে, পৃথিবীতে-পাওয়া উল্কাদের বয়স ৪৫০ কোটি বছরের বেশী এবং ৫০০ কোটি বছরের কম।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রবন্ধের শেষে আবার আমরা তুঙ্গুস্কা-উল্কাপিণ্ডের কথায় ফিরে আসি। সেদিনের সেই উল্কাটির তথ্যাদি থেকে উদ্ভূত নানা রকম বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের কোন কোনটি ছিল অত্যন্ত উদ্ভট। সাংবাদিক ও লেখকেরা আবার রঙ চড়িয়ে এগুলিকে অবিশ্বাস্যতর করে তুলেছিলেন। অন্যদিকে আবার পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভাঙন এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে সদ্য আহরিত জ্ঞান এই কল্পনা-বিলাসে যে 'সংশোধনী' যোগ করেছিল তাতে ব্যাপারটি জনসাধারণের কাছে সবিশেষ গ্রহণীয় হয়ে উঠল। তুঙ্গুস্কা-ঘটনাটি সম্পর্কে সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রকল্পটি হল, বিস্ফোরণটি মোটেই উল্কাপিণ্ডের নয়, গ্রহান্তরের পরমাণু-শক্তি-চালিত ব্যোমযান ভেঙ্গে পড়ারই ফল। পরবর্তী কালে এতে যুক্ত হয়েছে বহু নবতর প্রকল্প: মহাশূন্যের কোন 'ব্ল্যাকহোলের'[৩] গভীর ঘনত্বের টুকরোর পৃথিবীতে আকস্মিক প্রবেশ-ফল অথবা 'এ্যান্টি-ম্যাটারের'[৪] ভূমণ্ডলে প্রবেশ ও তার আনুষঙ্গিক ধ্বংস ইত্যাদি চমক-

৩ প্রতিটি তারকা তার জীবনের বেশীর ভাগ শক্তিই ব্যয়িত করতে বাধ্য হয় তার নিজস্ব অভিকর্ষ-বলকে প্রশমিত করতে। আমরা যেমন পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে অদৃশ্য এক বল দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আকৃষ্ট হচ্ছি ঠিক তেমনি যেকোন নক্ষত্রের প্রতিটি গ্যাসীয় পরমাণুই সেই নক্ষত্রের কেন্দ্রের দিকে বিপুল বল দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নক্ষত্র-দেহে সংঘটিত বিভিন্ন শ্রেণীর নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত শক্তি পরমাণুগুলিকে কেন্দ্রের দিকে যেতে না দিয়ে একটি সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। এখন এমন যদি হয়, যাতে ঐ তারকা কোনমতেই তার অভিকর্ষ-বলের আকর্ষণ থেকে তার পরমাণুদের আর রক্ষা করতে পারছে না, অর্থাৎ যখন সেখানে একমাত্র অভিকর্ষ-বলই ক্রিয়াশীল হয়, অপর সকল শক্তি এবং বল হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়, তখন এর ফলে স্বভাবতই নক্ষত্রদেহের প্রতিটি পরমাণু সেই নক্ষত্রটির কেন্দ্রের দিকে তীব্র বেগে ধাবিত হয়, ফলে কেন্দ্রে সৃষ্টি হয় এক অকল্পনীয় চাপের। যখন কোন তারকা এই ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন সেটি পরিণত হয় একটি মৃত নক্ষত্রে—যার বৈজ্ঞানিক নাম (কৃষ্ণ গহ্বর) ব্ল্যাকহোল। ব্ল্যাকহোল হল মৃত তারকা। এরা মহাশূন্যে বিরাজ করলেও এদের দেহ থেকে কোনরূপ আলোক-কণিকা ফোটন নির্গত হয় না। ব্ল্যাকহোল-রা আকৃতিতে অবশ্য খুব বড় হয় না, যদিও এদের ঘনত্ব এত বেশী হয় যে, চিন্তাও করা যায় না। একটি দেশলাই-বাক্স-ভর্তি ব্ল্যাকহোলের পদার্থের ওজন হবে ১০,০০০ কিলোগ্রাম বা দশ টনের কাছাকাছি।

৪ এ্যান্টি-ম্যাটার বা 'বিপরীত পদার্থ' সম্পর্কে প্রথম ধারণা পাওয়া যায় ১৯৩২ সালে অধ্যাপক পল ডিরাকের গাণিতিক মন্তব্য হতে। বিপরীত মৌলিক কণিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনিই গবেষণার সূত্রপাত করে যান। ইলেকট্রনের বিপরীত কণিকাটি হল পজিট্রন। নামেই বোঝা যায় যে এটি হল একটি ধনাত্মক চার্জ-সম্পন্ন কণিকা। তেমনি প্রোটন ও নিউট্রনের

প্রদ ধারণাবলী, যদিও তাপ-নিউক্লীয় বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত কোন তেজস্ক্রিয় বস্তুর কণামাত্রও ঘটনাস্থলে ও তার চারপাশে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তুঙ্গুস্কা-উল্কার ব্যাপারটি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা আজ প্রায় সমাপ্ত। এটি পাথর বা ধাতুর তৈরী অত্যধিক ঘনত্বের কোন উল্কাপিণ্ড ছিল না। আসলে জলের ঘনত্বের শতাংশের চেয়ে কম ঘন হলেই কেবল মাত্র ১,০০,০০০ টন বা ১০,০০,০০০ টন ভরযুক্ত (মনে করা হয় তুঙ্গুস্কা-উল্কার ভর ছিল এই সংখ্যা দু'টির মাঝামাঝি।) কোন বস্তুর পক্ষে আবহমণ্ডলে তার শক্তির বেশীর ভাগ অংশটিকে শক্তিতরঙ্গের আকারে মুক্ত করে দেওয়া সম্ভবপর—বেশী ঘনত্বের কোন বস্তুর পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়।

শেষ প্রশ্ন মনে জাগে তুঙ্গুস্কা-উল্কাপিণ্ড কি ধরনের ছিল? আবহমণ্ডলের দিকে মারাত্মক বেগে ধাবিত এত হালকা ঘনত্বের বিশাল ভর-যুক্ত এই বস্তুটি এমন কি বস্তু যা কিনা এমন প্রচণ্ড অভিঘাত-তরঙ্গ ও আনুষঙ্গিক হাজার হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রা উৎপাদনে সক্ষম?

এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা একটি মাত্র প্রত্যয়কেই স্বীকার্য বলে মনে করেন। সেটি হল—তুঙ্গুস্কা-উল্কাপিণ্ড শিথিল তুষারপুঞ্জাকার কোন বস্তু যার উপাদান তরলিত না হয়ে সহজেই উদ্বায়ী হয়। (এ ধরনের উদ্বায়ী পদার্থদের কোন কোনটিকে আমরা চিনি, যেমন আইওডিন; আইওডিন কঠিন অবস্থা থেকে সরাসরি গ্যাসীয় আইওডিনে রূপান্তরিত হয়—তরলিত না হয়েই)। এর সম্পূর্ণ দেহটি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাপসহিষ্ণু কণাখচিত। কুলিকের গবেষণাকালে আবহমণ্ডল থেকে পৃথিবীর উপর বিক্ষিপ্ত সেই সব কণার চিহ্ন বিস্ফোরণ-উপকেন্দ্রের কাছাকাছি খুঁজে পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া উল্কাপিণ্ডটির আবির্ভাবে আটলান্টিকের পার পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপে বেশ কয়েকটি রাতেই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আলোক পরিলক্ষিত হয়েছিল। আকাশের অনেক উঁচুতে প্রচুর পরিমাণে যে ধূলিকণা ছড়িয়ে থাকে, তার দ্বারা আলোক-প্রক্ষেপণের (scattering) ফলেই বহুদূর পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোক লক্ষ্য করা গেছে। নতুবা কেবলমাত্র উল্কার বিস্ফোরণের ফলে এমন বিস্ময়কর 'মহাদেশীয় আলোকসজ্জা' প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হতো না। মহাকাশের দূতদের সম্পর্কে মানুষ বিরামহীন গবেষণা চালিয়ে গেলেও তাদের রহস্য কখনই সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত করা যাচ্ছে না। নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে উল্কাদের

বিপরীত কণিকা দুটি হল এ্যান্টি-প্রোটন ও এ্যান্টি-নিউট্রন। বিপরীত মৌলিক কণিকা দ্বারা গঠিত পদার্থদের বলা হয় বিপরীত পদার্থ বা এ্যান্টি-ম্যাটার। এ্যান্টি-ম্যাটার সম্পর্কে ধারণা এবং পরীক্ষাগারে এদের অস্তিত্ব যাচাই করা সম্ভবপর হওয়ার পর এখন বিজ্ঞানীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে ভাবতে শুরু করেছেন বিপরীত পৃথিবী (এ্যান্টি-ওয়ার্লড) এবং বিপরীত জীবন (এ্যান্টি-লাইফ) সম্পর্কে। মহাশূন্যের গ্রহনক্ষত্রদের অনেকগুলি যে বিপরীত পদার্থদ্বারা সৃষ্ট এ কথা বিজ্ঞানীরা অঙ্কের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। বিপরীত পদার্থ যদি কোন ভাবে পদার্থের সংস্পর্শে এসে পড়ে, তবে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের সাহায্যে তারা ধ্বংস হয়ে যায়; প্রতিটি কণিকা তার বিপরীত কণিকার দ্বারা শোষিত হয় এবং অকম্পনিক শক্তি-তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

বয়ে-নিয়ে-আসা সমস্যা আর প্রশ্নগুলি নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণে রত; উদ্বাদের বিশ্লেষণের সময় সমস্যার সমাধান হয় যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে নতুন নতুন হতবাক্-করা সমস্যা তথা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তাঁদের। বলা বাহুল্য নতুন নতুন প্রশ্নাবলী বিজ্ঞানীদের মনে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তা খুব সহায়ক।

শৈবধাম এক্তেশ্বর

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ভৌমিক

প্রাচীন মধ্যরাঢ়ের অংশবিশেষ বর্তমান বাঁকুড়া জেলা। সমগ্র রাঢ়-অঞ্চলের এই কেন্দ্র-ভূমি তৎকালীন কৃষ্টি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছিল ব'লেই আজো বাঁকুড়া জেলায় রাঢ়-সভ্যতার প্রভাব সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

জেলার বিশুষ্ক গৈরিক প্রান্তরে প্রাণদ জল-ধারা দান ক'রে থাকে দ্বারকেশ্বর ধলকিশোর গন্ধেশ্বরী কংসাবতী শিলাবতী প্রভৃতি ছোট-বড় নদনদী। এ সমস্ত স্বাভাবিক জলধারা সমগ্র জেলার জনজীবনে জাগতিক কর্মচাঞ্চল্য যেমন রক্ষা ক'রে চলেছে, তেমনি সুপ্রাচীনকাল থেকে এ সমস্ত নদনদী এতদঞ্চলের আধ্যাত্মিক চিন্তা-ধারাকেও প্রভাবিত করেছে। তাই এ জেলার বেশীর ভাগ দেবস্থান উপরোক্ত নদনদীগুলির তীরে তীরেই গড়ে উঠেছে।

দ্বারকেশ্বর এ জেলার প্রধান জলধারা। এ জলধারাকে অনুসরণ ক'রেই জেলার সর্বাপেক্ষা অধিক ধর্মীয় স্থান আত্মপ্রকাশ করেছে। নয়টি মন্দিরশোভিত শৈব ও বৈষ্ণবের সমন্বয়স্থান খটনগর, পঞ্চরত্ন শ্রীধরমন্দিরের অবস্থান-ভূমি পাহাড়পুর, চক্রেশ্বরী শক্তিপীঠ কাস্তোড়, সর্বমঙ্গলা দেবীর অচলাসন নারিচা, ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিবের যুগ্ম-আবাস ডিহর, অর্ধশত মন্দির সমাকীর্ণ জয়কৃষ্ণপুর, জৈনতীর্থের স্মৃতি-বহনকারী ধরাপাট, দ্বাদশ-শিব-নিবাস অযোধ্যা, সিদ্ধেশ্বর শিবের আশিস্পূত মন্দির বহুলাড়া, বর্তমানে বিগ্রহশূন্য দেবস্থান হরিহরপুর, রাধাকৃষ্ণের শ্রীমন্দিরযুক্ত এল্যাটি, সমগ্র বাঁকুড়া জেলার অবি-স্মরণীয় পুরাকীর্তি সোনাতপল, আর পুণ্যার্থীদের সমাবেশ-মুখর শিবাশিস্-ধন্য এক্তেশ্বর প্রভৃতি পুণ্যস্থান দ্বারকেশ্বর নদের উভয় তীরেই আত্ম-প্রকাশ করেছে।

বাঁকুড়া জেলায় হিন্দু-সম্প্রদায়ের প্রায় সকল ধর্মমতের সমাবেশ থাকলেও শিব এখানকার মহাপ্রতাপশালী দেবতা। সে কারণেই বাঁকুড়ায় শিবস্থানের যেমন আধিক্য দেখা যায়, তেমনি এখানকার শিবমন্দিরগুলি বিশালতায় ও মন্দির-ভাস্কর্যের মনোহারিত্বে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাঁকুড়া জেলায় শিবস্থানের আ[illegible] এতদঞ্চলের ধর্মীয় আন্দোলন সম্পর্কে এব[illegible] ঐতিহাসিক ইঙ্গিত বহন করে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন—আড়াই হাজার বৎস[illegible] পূর্বে অর্থাৎ জৈনধর্মের প্রচারক মহাবীরে[illegible] আবির্ভাব-কালে রাঢ়ভূমিসহ সমগ্র বঙ্গদেশে[illegible] সুবিস্তৃত অঞ্চল আর্যপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মু[illegible] ছিল এবং পরবর্তী কালে মুখ্যত উত্তর বঙ্গে[illegible] পথে আর্যপ্রভাব বঙ্গদেশে উল্লেখযোগ্যভা[illegible] প্রবেশ করে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের কে[illegible]

সময়ে জৈনধর্মকে অবলম্বন ক'রে রাঢ়-অঞ্চলে আর্যপ্রভাব ক্ষীণভাবে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল। অনার্য-অধ্যুষিত রাঢ়-অঞ্চলে জৈন-ধর্মের সে অনুপ্রবেশ হয়ত সহজ ছিল না। কিন্তু নব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে তখন যে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, নানা দিক থেকে অনগ্রসর রাঢ়-অঞ্চল শেষ পর্যন্ত সে ধর্মীয় আন্দোলনের প্রবল চাপ পরিহার করতে পারে নি। ফলে অষ্টম-নবম শতাব্দীর মধ্যেই রাঢ়-ভূমিতে জৈনধর্ম সুপ্রতিষ্ঠ হ'তে পেরেছিল এবং জৈনধর্মের সে প্রতিষ্ঠা অন্তত দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এদেশে বর্তমান ছিল বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাঢ়-অঞ্চলে জৈনধর্ম যখন সুপ্রতিষ্ঠ হবার দীর্ঘ সাধনায় রত ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী হ'তে শুরু ক'রে সারা দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান-প্রচেষ্টাও প্রবল আকার ধারণ করে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রতিবাদ-স্বরূপেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম একদিন ভারতের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছিল। তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান স্বভাবতই সহজ ছিল না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবেশী জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সে সর্বগ্রাসী আন্দোলনের প্রভাব ধীরে ধীরে হলেও একদিন সমগ্র রাঢ়-অঞ্চলকে প্রভাবিত করেছিল। ফলে অনার্য-অধ্যুষিত রাঢ়-অঞ্চলে জৈন ও কোন কোন ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং তৎপরে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের আবির্ভাব—সব মিলিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছিল—একদিন সমন্বয়ের উদার পথেই তার সমাধান হয়েছিল। তাতে রাঢ়ের অনার্য-অধিবাসীরা বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মিলিত প্রভাবের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করেই জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার এক নবতর সূত্র আবিষ্কার করে নিল। এইভাবে রাঢ়ে অনার্য-কৃষ্টির সঙ্গে আর্য তথা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অনেক উপাদান যেমন মিলেমিশে গেল তেমনি পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবলতর আন্দোলনের মুখে রাঢ়ভূমি শেষবারের মত আর এক পরিবর্তনকে আত্মসাৎ করে নিল। সে পরিবর্তনের স্থায়ী ফল হল—হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান, যে অভ্যুত্থানের পটভূমিতে র'য়ে গেল অনার্যকৃষ্টি ও সংহতির সঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অনেক অবদান।

অনার্য-স্বভাবে রক্ষণশীলতার প্রাবল্য দেখা যায়। শত পরিবর্তনের মধ্যেও অনার্য জাতি তার নিজস্ব চিন্তা ও ভাবধারাকে সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারে না। বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্পর্শে এসে রাঢ়-অঞ্চলের অনার্য অধিবাসীরাও তাদের নিজস্ব চিন্তা ও ধর্মীয় ধারণা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'ল না—তাদের দেব, দেবী ও ধর্মীয় আচরণের অনেকটাই অপরিবর্তিত বা পরিবর্তনের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে বেঁচে রইল। তাই দেখা যায়—অনার্যদের মাতৃপূজা পরবর্তী কালে মাতৃশক্তির নানা প্রকার ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের গ্রহণযোগ্য দেবীপূজাতে পরিণতিলাভ করেছে। আমাদের শিবও আদিতে অনার্যদেরই ব্যাপকভাবে পূজিত অমিতশক্তিধর প্রচণ্ড দেবতা। তাঁর সঙ্গে জৈন তীর্থঙ্করদের সমন্বয়সাধন অনেকটা সহজ ছিল ব'লেই হয়তো সেই শিব তীর্থঙ্কর অথবা বুদ্ধের সঙ্গে একাকার হয়ে পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্যধারণায় ধ্যানমৌন শিবে পরিণত হয়েছিলেন। তাই রাঢ়ের বর্তমান শিব জৈনপ্রভাবের ফলেই হয়তো প্রবলতর হয়েছেন এবং পরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রবক্তারা শিবের সেই প্রবলতাকে স্বীকার ক'রে নিজেদের প্রয়োজন-মতো সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে হিন্দুর শাস্ত্রীয় দেবতায় উন্নীত করে নিয়েছেন। সেই প্রাচীন

কাল থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত রাঢ়-অঞ্চলে শিবের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকার সম্ভবত এই হ'ল অন্যতম প্রধান কারণ। রাঢ়-অঞ্চলের কয়েকটি জনপ্রসিদ্ধ শিবের পরিচয় নিলেই উপরোক্ত ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তালডাংড়ার দেউল-ভিড়্যার শিবমন্দির বাঁকুড়া জেলার অন্যতম প্রাচীন মন্দির বলে কথিত অথচ দশম শতাব্দীতে এই মন্দিরটি জৈন মন্দির হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। তেমনি ধারাপাটের প্রাচীন মন্দিরও ছিল জৈনদেরই ধর্মস্থান—কালে তা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে হিন্দু মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবস্থান—বাঁকুড়ার জনমানসে আজ যার বিশেষ স্থান স্থিরীকৃত হয়ে আছে—দশম শতাব্দীতে তাও ছিল জৈনধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। বিহারীনাথ—বর্তমানে যা শিব হিসেবে পূজিত—আদিতে তা জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। হাড়মাস্ড়া—যা বর্তমানে বাঁকুড়ার বিখ্যাত শিবমন্দির—পূর্বে সেটিও ছিল জৈন তীর্থস্থান। সোনাতপল মন্দিরে যদিও আজ কোন বিগ্রহ নেই—তাও কিন্তু জৈন মন্দিরের মহিমা বহন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তেমনি আমাদের আলোচ্য এক্তেশ্বর শিবও প্রথমে ছিলেন বৌদ্ধদের অবলোকিতেশ্বর।

জেলার সদর শহর বাঁকুড়া হতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর তীরে শৈবতীর্থ এক্তেশ্বর অবস্থিত। শহর হ'তে বাসে বা সাইকেল-রিক্সায় এই পুণ্যস্থানে যাতায়াত করা চলে। এক্তেশ্বর শিবের নামানুসারেই গ্রামেরও নাম হয়েছে এক্তেশ্বর।

বলা হয়, এক্তেশ্বর নামটির উৎপত্তি বৌদ্ধদের 'অবলোকিতেশ্বর' হ'তে। বাঁকুড়ার সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় কিন্তু উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। তাঁর মতে বেদে উল্লিখিত রুদ্রদেবতা 'একপাদেশ্বরে'র প্রতীকই হলেন এক্তেশ্বর—একপাদেশ্বরের অপভ্রংশ—যেহেতু লিঙ্গরূপী এই শিবের আকৃতি হল মানুষেরই পায়ের মতো। বিদ্যানিধি মহাশয়ের এ সিদ্ধান্তও কিন্তু অনেকে মেনে নিতে নারাজ—কারণ, শাস্ত্রোক্ত একপাদেশ্বরের আকৃতির সঙ্গে এক্তেশ্বর শিবের আকৃতিগত কোন সামঞ্জস্য তাঁরা খুঁজে পান না। মতান্তরে স্থানীয় কোন হিন্দুরাজা শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দু-সমাজের সকল মানুষের মধ্যে মিলন- ও সমন্বয়-স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই স্থানের সকল শ্রেণীর লোককে একত্রিত ক'রে বিশাল এক পঙ্‌ক্তি-ভোজনের আয়োজন করেছিলেন—সমাজে একতা-স্থাপনকারী সেই ঐতিহাসিক প্রয়াসের স্মৃতি-স্বরূপেই পরবর্তী কালে স্থানের নাম হয়েছে এক্তেশ্বর। অনুরূপ আর একটি কাহিনী অনুসারে মল্লভূম ও সামন্তভূম রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে সীমানা-ঘটিত বিরোধের মীমাংসায় কৈলাসপতি মহাদেব স্বয়ং মধ্যস্থতা ক'রে দুই রাজ্যের বিরোধ চিরতরে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। একতা-স্থাপনের সেই চিহ্নিত স্থানে পরে একতেশ্বর শিব-মন্দির স্থাপিত হয়। সেই একতেশ্বরই কালে এক্তেশ্বর শিবে পরিণত হয়েছেন।

এক্তেশ্বর স্বয়ম্ভু শিব—কোন সাধক বা ভক্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নন। এ শিবের প্রকাশ-বৃত্তান্ত কিছুই জানা যায় না। তবে বৌদ্ধদের অবলোকিতেশ্বরই এক্তেশ্বরে পরিণত হয়েছেন—এ সিদ্ধান্ত যদি অভ্রান্ত হয়—তা হ'লে অনুমান করা অসমীচীন নয় যে, অন্তত এক সহস্র বৎসর পূর্বেই এই শিবের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, যেহেতু ইতিহাসের নজিরে ঐ সময়েই হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমন্বয়ের পথে পরস্পর পরস্পরের নিকটতর হয়েছিল। মন্দিরের মেঝে থেকে ৬।৭ ফুট নীচে এক স্বল্পপরিসর কুণ্ডের

মধ্যে গৌরীপট্টহীন এক্তেশ্বর শিবের লিঙ্গমূর্তি বিরাজিত। দশটি সিঁড়ি নীচে নেমে যাত্রীদের শিবকে দর্শন করতে হয়। পূর্বে এই কুণ্ডের সঙ্গে দ্বারকেশ্বর নদের এক সুড়ঙ্গ-সংযোগ ছিল এবং সেই সুড়ঙ্গপথেই দ্বারকেশ্বরের জল শিব-লিঙ্গকে স্পর্শ করত। এক্তেশ্বর সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি মহিষপৃষ্ঠের মতো বক্রাকৃতি প্রস্তর-খণ্ড। কেউ কেউ মনে করেন, দ্বারকেশ্বর-তীরে মাটির নীচে অবস্থিত সুবিস্তৃত এক প্রস্তরস্তরের উপরিভাগের কিঞ্চিৎ উদ্‌গত অংশ-বিশেষকেই লিঙ্গমূর্তি বলে কল্পনা করা হয়েছে—আর সে কারণেই এক্তেশ্বর শিব গৌরীপট্টহীন। অনেকের ধারণা—পূর্বে পূর্ণাঙ্গ কোন বিগ্রহ এ মন্দিরে শোভা পেত। পরবর্তী কালে সে বিগ্রহ নষ্ট বা অপসারিত হবার পর স্থানীয় ভূ-প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থাকে ধর্মীয় ধারণার অনুকূলে কাজে লাগান হয়েছে। ঐতিহাসিক সত্য এই যে, এক্তেশ্বর-মন্দির কালের প্রভাবে জীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং একাধিকবার তার সংস্কার সাধিত হয়েছে। মন্দিরের জীর্ণতা-প্রাপ্তি ও তার সংস্কারকালে আসল বিগ্রহ নষ্ট বা অপসারিত হওয়াটা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। এক্তেশ্বর-মন্দিরের অভ্যন্তরে 'বিরূপাক্ষের আসর' নামে একটি নির্দিষ্ট স্থান দেখান হয়। কোন এক শক্তিধর যোগীপুরুষ এই আসনে বসে কোন এক সময়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ব'লে শোনা যায়।

প্রাচীরঘেরা এক্তেশ্বর-মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে মূল মন্দির ব্যতীত আরো কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দির দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরগুলির মধ্যে দুটি শিব-মন্দির, একটি সিদ্ধিদাতা গণেশের এবং অপরটি এক অপরিচিত দেবতার মন্দির। এই অজ্ঞাতনামা দেবতাকে সাধারণ লোকেরা 'খাঁদারাণী' ব'লে অভিহিত করে। বিগ্রহটি বেলে পাথরে নির্মিত—বর্তমানে ভগ্ন-দশাপ্রাপ্ত। আদিতে এ বিগ্রহ জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি ছিল ব'লে অনুমান করা হয়। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তা-হ'লে বলা চলে—বর্তমানে অজ্ঞাতনামা এই বিগ্রহ-ই আদিতে হয়তো এই মন্দিরের প্রধান দেবতা হিসেবে পূজিত হতেন এবং তখন এই মন্দিরও ছিল জৈন সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থস্থান।

বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর-মন্দির দেবশিল্পী বিশ্ব-কর্মার স্বহস্ত-নির্মিত ব'লে প্রবাদ আছে। নিতান্ত জাগতিক সৃষ্টি এই এক্তেশ্বর-মন্দির—প্রবাদানুসারে দেবশিল্পীর কৃতিত্ব তাতে আরোপিত হওয়ায় এক্তেশ্বর-মন্দির-নির্মাতার সৃষ্টিনৈপুণ্যের মহিমাই পরোক্ষে প্রচার করা হয়েছে। বাস্তবিকই এক্তেশ্বর-মন্দির এক অভাবনীয় সৃষ্টি—এতদ্দেশীয় মন্দিরস্থাপত্যের এক বিরল নিদর্শন। তাই শ্রীযুত বিনয় ঘোষ মহাশয় এই মন্দির সম্পর্কে বলেছেন—'এক্তেশ্বর-মন্দির বিস্ময়কর, মন্দিরের এরকম ভারী ও নিরেট গড়ন আর কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন পাহাড়ের গা থেকে খোদাই করা শিখা-মন্দিরের মতন এক্তেশ্বর-মন্দিরটি বাঁকুড়া দ্বারকেশ্বর নদের তীরে ঠেলে উঠেছে।' পশ্চিম বাংলায় প্রস্তরনির্মিত মন্দিরসমূহের মধ্যে এক্তেশ্বর নিঃসন্দেহে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

এক্তেশ্বর-মন্দির প্রথমে কখন এবং কার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে প্রমাণাভাব, তবে একথা সর্ববাদিসম্মত যে, এ মন্দির বাঁকুড়া জেলার বহু প্রাচীন মন্দিরসমূহের অন্যতম এবং সম্ভবত বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীরের আমলে এই মন্দির পুনর্নির্মিত হয় এবং তখন থেকেই শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে এখানে

এক্তেশ্বর শিবের পূজা প্রচলিত হয়ে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

এক্তেশ্বর শিবের মন্দির পশ্চিমদ্বারী। এ মন্দিরটিকে এতদ্দেশীয় মন্দির-স্থাপত্যের কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অথচ যে কালে এ দেবসৌধ নির্মিত হয়েছিল, সে কালে মন্দিরস্থাপত্যের রীতি লঙ্ঘন ক'রে অনুরূপ গোত্রহীন দেবায়তন নির্মাণ না হওয়ারই কথা। তাই অনুমান করা অসমীচীন নয় যে, এক্তেশ্বর-মন্দিরের বর্তমান রূপ এর আদিরূপ নয়—মন্দিরসংস্কার-জনিত রূপ।

এক্তেশ্বর-মন্দিরের প্রকৃতি-বা শ্রেণী-নির্ধারণে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলে প্রমাণেরও অভাব নেই। মন্দিরশিল্পের তৎকালীন অন্যতম প্রথানুসারে এক্তেশ্বর-মন্দিরের গাত্র-অলঙ্করণে মূল মন্দিরের ক্ষুদ্রকায় প্রতিকৃতির ব্যবহার করা হয়েছে। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ সে সমস্ত প্রতিকৃতি আজো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। তাতে দেখা যায় যে, এক্তেশ্বর-মন্দির আদিতে পীড়া দেউল পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল এবং তখন দীর্ঘশিখরযুক্ত এ মন্দিরের উচ্চতা এর বর্তমান উচ্চতা থেকে অনেক বেশী ছিল।

এক্তেশ্বর-মন্দিরের বর্তমান উচ্চতা ৪০ ফুট। স্তম্ভাকৃতি পুরু ও নিরেট দেওয়ালের তুলনায় এ মন্দিরের উর্ধ্বাংশ নিতান্তই বেমানান ও সামঞ্জস্যহীন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এক্তেশ্বর-মন্দিরকে প্রথমে দীর্ঘশিখর ক'রে নির্মাণ করা হয়েছিল ব'লেই সে উর্ধ্বাংশের সমস্ত ভার যাতে মন্দিরের দেওয়াল বহন করতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই দেওয়ালগুলি সবিশেষ পুরু ও মজবুত করে গড়া হয়েছিল। শতাধিক বৎসর পূর্বে মিঃ বেগ্‌লার নামক জনৈক ইংরেজ 'Report of the Archaeological Survey of India'-গ্রন্থে এ মন্দির সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এক্তেশ্বর-মন্দিরের উর্ধ্বাংশ যে এককালে ভেঙে পড়েছিল একথা তিনিও স্বীকার করেছেন। অনুমান—মন্দিরটি যখন সংস্কার করার প্রয়োজন হয়, তখন স্থপতিরা মন্দিরের আদিরূপ ও মূলপ্রকৃতির কথা চিন্তা না ক'রে মন্দির দেওয়ালের চতুর্দিক হতে ছাদকে বেশীদূর উপরের দিকে না তুলে সহসা জুড়ে দিয়ে এর সংস্কারের কাজ সমাপ্ত করেছেন, আর তারই ফলে মন্দিরের শ্রী- ও শ্রেণী-পরিচিতি উভয়ই লুপ্ত হয়েছে।

অনেকের ধারণা, সংস্কারকাজে নিযুক্ত শিল্পীদের ভুলের জন্যই সংস্কারের পর এক্তেশ্বর-মন্দিরটি শ্রী- ও সামঞ্জস্য-হীন হয়ে পড়েছে। এই অভিযোগ অনেকে আবার মেনে নিতে চান না। তাঁদের মতে মন্দিরের সংস্কার-দায়িত্ব যে- সমস্ত শিল্পীদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল, তাঁরা ইচ্ছাকৃত-ভাবেই মন্দিরের দীর্ঘশিখর পরিহার ক'রে আমলক-শোভিত মন্দির-সংস্কার সম্পন্ন করেছেন। উদ্দেশ্য মন্দিরের উর্ধ্বাংশের ভার অনেকাংশে লাঘব করা। এক্তেশ্বর-মন্দিরের ভিত ও দেওয়াল সবিশেষ মজবুত থাকা সত্ত্বেও উর্ধ্বাংশ কাল-প্রভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল—অর্থাৎ মন্দিরের সবিশেষ মজবুত নিম্নাংশ ইহার সুউচ্চ ও ভারী শিখর অংশকে আনুপাতিক স্থায়িত্ব দিতে পারে নি—কালের কষ্টিপাথরে তা প্রমাণিত হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে অনুরূপ বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে উদ্দেশ্যেই হয়তো মন্দির-সংস্কারে নিযুক্ত শিল্পীরা ইচ্ছাকৃতভাবেই মন্দিরের মূলপ্রকৃতি বিনষ্ট ক'রেও এর উর্ধ্বাংশকে হালকা ক'রে গড়েছেন। যুক্তিটি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শৈব তীর্থ হিসেবে এক্তেশ্বরের খ্যাতি দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ফলে প্রতিদিন এ মন্দিরে পুণ্যার্থীর আগমন দেখা

যায়। সপ্তাহের মধ্যে প্রতি সোমবার যাত্রি-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যেহেতু সোমবার একেশ্বর শিবের পূজানিবেদনের বিশেষ দিন হিসেবে স্বীকৃত। পৌষসংক্রান্তি হতে শুরু ক'রে ভীমাষ্টমী তিথি পর্যন্ত প্রতিদিন একেশ্বরের স্থানে বিশেষ পূজানিবেদন এখানকার এক বৈশিষ্ট্য। এই উৎসবে স্থানীয় জনগণই অংশ গ্রহণ করেন। উৎসব-সমাপ্তির দিন গণদেবতা গণেশের নামে অন্নভোগ দেওয়ার বিধি। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলকেই এই অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সর্বজনীনভাবে এই অন্নপ্রসাদ-বিতরণ সাময়িক-ভাবে হ'লেও মানুষের মনে সামাজিক মিলন ও সম্প্রীতির প্রভাব বিস্তার করে—এই অনুষ্ঠান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহোৎসবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্ভবত হিন্দু সমাজের জাতিভেদ-প্রথার কুফল চিন্তা ক'রেই মানব-মিলনের উদার ব্যবস্থা হিসেবে একেশ্বর-মন্দিরে সর্বজনীন ভোগ-বিতরণ-প্রথার প্রচলন করা হয়েছিল। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ-প্রথার অবসান ঘটিয়ে একতা-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন সময়ে এতদঞ্চলে সর্বজনীন পঙ্‌ক্তি-ভোজনের এক ঐতিহাসিক আয়োজন হয়েছিল ব'লে ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি—হয়তো বা সেই মঙ্গলপ্রদ উৎসবের পুনরাবৃত্তি হিসেবে আজো একেশ্বরে গণদেবতার নামে সর্ব-জনগণের জন্য অন্নভোগ-প্রথা বেঁচে আছে।

এখানকার শিবরাত্রি একটি আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব। এই সময়ে বহুদূরের পুণ্যার্থীরাও একেশ্বরে আসেন এবং ব্রত উৎসব ও রাত্রি-জাগরণের মাধ্যমে দেবতার তুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে যথারীতি পূজানিবেদন ক'রে মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

চৈত্র মাসের শেষ দুই সপ্তাহব্যাপী গাজন-উৎসব একেশ্বর-স্থানে একটি মহা আড়ম্বরপূর্ণ পর্ব। স্থানীয়ভাবে এ উৎসবকে 'চোতগাজন' অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধদের ধর্মঠাকুরের গাজনই কালক্রমে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে ব'লে অনেকের ধারণা।

চৈত্র মাসের ১৫ তারিখ থেকে চোত-গাজনের সূচনা হয়। গ্রামের ব্রাহ্মণসম্প্রদায়-ভুক্ত কোন নৈষ্ঠিক ব্যক্তিকে চোতগাজন সূচনা করার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। তাঁকে বলা হয় প্রধান ভক্ত বা পাটভক্তা। উৎসব-আরম্ভের পূর্ব-দিন সেই পাটভক্তাকে ক্ষৌরকর্মাদি সমাপন ক'রে নানা প্রকার আচার-আচরণের মাধ্যমে উৎসবের দায়িত্বপালনের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। ১৫ই চৈত্রের প্রত্যূষে ঢাকঢোলের আওয়াজের সঙ্গে প্রত্যাশিত পরবের আগমন ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা একেশ্বর-মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে 'একেশ্বরনাথ মণি মহাদেব', 'পাতালভেদিনাথ মণি মহাদেব' প্রভৃতি শিব-মাহাত্ম্যসূচক ধ্বনি তোলেন। এই পাটভক্তা গেরুয়া বসন ও বিশেষ উত্তরীয় ধারণ করেন। তাঁর হাতে থাকে মন্ত্রপূত বেতের ছড়ি। এই দিন থেকে সংক্রান্তি তিথি পর্যন্ত প্রতিদিন তিনি মন্দির হতে শিবের পাটকে (সুতীক্ষ্ণ লোহার পেরেক-বসান কাষ্ঠনির্মিত দেবাসন) বহন ক'রে নিয়ে নিকটবর্তী পুষ্করিণীতে স্নান করিয়ে আবার মন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। সংক্রান্তি তিথি যত এগিয়ে আসে মানতধারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 'ভক্তা'বৃন্দ পাটভক্তার সঙ্গে এসে যোগ দেন এবং গেরুয়া বসন ও উত্তরীয় পরিধানের সঙ্গে মন্ত্রপূত বেত্রদণ্ড ধারণ ক'রে আনুষ্ঠানিকভাবে শিব-গোত্রান্তরিত হয়ে সাময়িক সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসীরা ব্রত-সমাপন পর্যন্ত মন্দিরেই অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন প্রকার আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনান্তে হবিষ্য গ্রহণ করেন। চৈত্রসংক্রান্তি যত এগিয়ে আসে 'ভক্তা'দের সংখ্যা তত বৃদ্ধি পায়। একেশ্বরের 'ভক্তা'দের

মতো এত বেশী সংখ্যায় মানতধারী ভক্তা অন্যত্র দেখা যায় না। কোন কোন বৎসর এস্থানে কয়েক শ ভক্তারও সমাবেশ ঘটে। ২৮শে চৈত্র (মাস যদি ৩১ দিনে হয় তা হ'লে ২৯শে চৈত্র) সমস্ত ভক্তারা 'ফলভাঙ্গা দিবস' পালন করেন। এই দিন তাঁরা সকলে ফলাহার করেন। পূর্বে এই দিন ভক্তাবৃন্দ গ্রামের যে কোন বাড়ীর যে কোন বৃক্ষ থেকে অবাধে ফলসংগ্রহের স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ফলভাঙ্গা দিবসের পরদিন থেকেই সত্যিকারের গাজন উৎসব শুরু হয়। চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন মধ্যরাত্রে সন্ন্যাসী ভক্তারা 'আগুন সন্ন্যাসব্রত' পালন করেন। এই ব্রতে সকল সন্ন্যাসীকে জলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে খালি পায়ে একের পর এক ধীরে ধীরে হেঁটে যেতে হয়।

চৈত্র মাসের শেষ তিন দিন এক্তেশ্বরকে বিশেষ পূজানিবেদনের বিধি আছে। এই সময় সমবেত সকল পুণ্যার্থীকে বিনা বাধায় মন্দিরে প্রবেশ ক'রে এক্তেশ্বর শিবকে স্পর্শ করার সুযোগ দিতে হয়। সংক্রান্তির দিন নীলপূজায় মহিলাদের সমাবেশ সবিশেষ লক্ষণীয়।

চৈত্রসংক্রান্তির অপরাহ্ণে শিবের পাটকে পুষ্করিণীর পরিবর্তে দ্বারকেশ্বর নদে স্নান করান হয়। ব্রতধারী সকল ভক্তা ও অগণিত দর্শনার্থী এ উপলক্ষে দ্বারকেশ্বর-তীরে উপস্থিত থেকে পাটস্নানপর্ব দর্শন করে। এই দিন শিবের পাটের সুতীক্ষ্ণ পেরেকের উপর পাটভক্তাকে শুইয়ে দিয়ে সেই পাট সহযোগী ভক্তারা কাঁধে ক'রে মন্দিরে ফিরিয়ে আনেন। অন্যান্য সকল ভক্তা ও দর্শনার্থীরা শোভাযাত্রা সহকারে পাট-ভক্তার অনুসরণ করেন। ঢাকঢোলের তুমুল শব্দের সঙ্গে এই সময় এক্তেশ্বর শিবের মাহাত্ম্য-সূচক ধ্বনি মুহুর্মুহুঃ শোনা যায়। এই দিন বহু পুণ্যার্থীকে দণ্ডী কেটে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

চড়কপূজা সংক্রান্তি-দিনের প্রধান আকর্ষণ। সাধারণতঃ ২৫শে চৈত্রের দিন থেকে এক্তেশ্বর-স্থানে মেলা বসলেও চৈত্রসংক্রান্তির দিনই এ মেলায় সর্বাপেক্ষা বেশী লোকের সমাবেশ দেখা যায়। কোন কোন বৎসর এক্তেশ্বরের চৈত্র-সংক্রান্তির মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ লক্ষ্য করা গেছে। এক্তেশ্বরের 'চোত মেলা' বাঁকুড়া জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বৃহৎ মেলা ব'লে পরিচিত। এটি সহস্রাধিক বৎসরের পুরাতন মেলা ব'লেও কেউ কেউ দাবী করেন। এখানে পৌষসংক্রান্তি ও শিবরাত্রি উপলক্ষে যে মেলা বসে তাতেও ত্রিশ চল্লিশ হাজার স্থানীয় লোকের সমাবেশ দেখা যায়।

চিরাচরিত প্রথায় এক্তেশ্বরে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয় ব'লে বেগ্‌লার সাহেব স্বীকার করেছেন। পূর্বে চড়কগাছে 'বাণফোঁড়' অর্থাৎ ব্রতধারী সন্ন্যাসীর পিঠে বঁড়শির মতো বড় লোহার কাঁটা গেঁথে দিয়ে তাঁকে চড়কগাছে ঘুরান হত। বাণফোঁড় প্রথা বে-আইনী ঘোষিত হবার ফলে সে নিষ্ঠুর প্রথা বর্তমানে অবলুপ্ত। তবে তার পরিবর্তে কোমরে দড়ি বেঁধে মানুষকে চড়কে ঘুরান এখনো লোপ পায় নি।

সন্ধ্যা-সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে চড়ক উৎসব সমাপ্ত হয়ে যায়। তবে মেলার ভিড় আরো কিছুক্ষণ থাকে। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে মেলা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। তখন কেবলমাত্র ভক্তারাই মন্দির-চত্বরে অবস্থান করেন। গভীর রাত্রিতে বিশাল আকারে অগ্নি প্রজ্জলিত করা হয়। উদ্যোক্তারা বলেন, এই অগ্নির দ্বারা অতীতের সতীদাহ-প্রথাকে নাকি স্মরণ করা হয়। কেউ কেউ বলেন, যোগেশ্বর শিবের পুণ্যস্থানে এসে কামনাবাসনাকে ভস্মীভূত করার প্রতীকই হল এই অগ্নি।

পরদিন ১লা বৈশাখ তারিখে এক্তেশ্বর-মন্দিরে 'শিবযজ্ঞ' অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন চার মন চাউলে শিবের অন্নভোগ দেওয়া হয়। এক্তেশ্বরের নিত্য পূজায় আধসের আতপ চাউল, আধসের দুধ ও সামান্য মিষ্টি প্রদানই বিধি। কেবলমাত্র ১লা বৈশাখেই অন্নভোগ দেওয়া হয়। এইদিন অন্নভোগের প্রচুর প্রসাদ পেয়ে সন্ন্যাসী ভক্তারা ব্রতভঙ্গ করেন এবং তৎসঙ্গে গেরুয়া বসন, উত্তরীয় ও বেত্রদণ্ড পরিত্যাগ ক'রে শিবস্থানের নির্মাল্য ও চরণামৃত সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরে যান।

চৈত্র মাসের শেষপক্ষকালব্যাপী গাজন-উৎসবে এক্তেশ্বর-স্থানে প্রতিদিন বাউল গান, রামায়ণ গান, কবি গান, কীর্তন, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণকে আনন্দদানের ব্যবস্থা থাকে।

যে-কোন রোগের আরোগ্যকামনায় এক্তেশ্বর-মন্দিরে পূজানিবেদনের রীতি বহু-কালের। সে রীতি আজও এখানে বর্তমান, যদিও ভবরোগনাশের প্রকৃষ্ট স্থান হিসেবেই এক্তেশ্বর আজ দূরান্তের যাত্রীকেও অধিক সংখ্যায় আকর্ষণ করে।

সমালোচনা

প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস ও শ্রীজ্যোতির্ময় বসুরায় সম্পাদিত ও সংকলিত। **প্রকাশক:** শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণি, কলিকাতা ৭০০০১৩। (১৩৮৪), পৃষ্ঠা ৩৭২, মূল্য দশ টাকা।

সাম্প্রতিক 'স্মৃতিকথা'-জাতীয় রচনা-সংকলনের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়-প্রকাশিত স্বামী নিরাময়ানন্দের 'স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়' ও স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের 'পুণ্যস্মৃতি' পাঠকসমাজে বিশেষ আদৃত হয়েছে। এ-জাতীয় আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন জেনারেল প্রিণ্টার্সের 'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ'। এ গ্রন্থের প্রকাশক ও সংকলয়িতাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যের অমৃতপিপাসুগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। পরিচ্ছন্ন শোভন মুদ্রণে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের চিত্তচমৎকারী স্মৃতি ও বাণীর এ সংগ্রহটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারার সঙ্গে গভীর পরিচয়স্থাপনে উৎসুক পাঠকের পক্ষে অবশ্য সংগ্রহ- ও সংরক্ষণ-যোগ্য।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান—এ দুই ক্ষেত্রেই পারদর্শী এক লোকোত্তর সাধক-ব্যক্তিত্বের অপূর্ব পরিচিতি এ সংগ্রহের পাঠক-চিত্তকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিস্ময়ে পূর্ণ করে রাখে। তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিজ্ঞানানন্দের দু'চারটি মন্তব্য সর্বাগ্রে স্মরণ করি। তাছাড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানানন্দের দৃষ্টির আলোকে যে-সব নূতনতর তথ্য ও সত্য গোচরে আসে, সেগুলিও এ গ্রন্থের মহামূল্য উপকরণ।

ভক্ত শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকারের প্রশ্ন ছিল: "মহারাজ, ঠাকুর কেমন ছিলেন?" প্রশ্ন শোনামাত্র তিনি ইংরেজীতে বলে ওঠেন: 'A very simple, but wonderful man (অতি সরল, কিন্তু এক আশ্চর্য মানুষ)!' ('স্মরণীয় কয়েকটি মুহূর্ত': পৃঃ ১৭২)

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গে আর একটি স্মৃতিচারণ—

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ : "তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। ক'জনে মিলে একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবকে দেখতে গেলুম।...তাঁর কাছে গিয়ে বসতে তিনি নাম জিজ্ঞাসা করলেন। নাম বললাম হরিপ্রসন্ন চাটুজ্জে। তিনি খুব স্নেহভরে বললেন, কোন সংশয় আছে কি? উত্তর দিতে পারলাম না।

"তিনি আবার বললেন—'কোন সংশয় আছে কি? বল—বল।' তখন বলে ফেললাম—'ঈশ্বর আছেন কি?' ঠাকুর দৃঢ়স্বরে বললেন—'হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছেন।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'তিনি সাকার না নিরাকার?' ঠাকুর বললেন—'তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে—আবার সাকার-নিরাকারের পারও।' আমি ভাবলাম —'বাবা, সে আবার কি?'...বললাম, 'যদি ঈশ্বর সাকার হন, তবে এই যে তক্তপোশ, এটিও ঈশ্বর?' ঠাকুর তখন খুব জোরের সহিত বললেন,—'হ্যাঁ, এই তক্তপোশ ঈশ্বর। এই ঘটি ঈশ্বর, বাটি ঈশ্বর, দেওয়াল ঈশ্বর, যা কিছু আছে সব ঈশ্বর।'" (শ্রীমতী বীণাপাণি বসুরায়ের 'পুণ্যকথা' পৃঃ ১৭-১৯)

শ্রীশ্রীমা-প্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ : "আমি তখনো মাকে দেখি নি, দেখতে গিয়েচি। মা উপরে রয়েচেন, আমি নীচের তলায় বসে। আমার হৃৎপদ্ম ফুটে উঠল!...ঠাকুরের মত মার আশীর্বাদও যে পেয়েচি তারই একটি দৃষ্টান্ত...।" (শ্রীঅক্ষয়চৈতন্যের 'বিজ্ঞানানন্দ-স্মৃতি' : পৃঃ ৩১-৩২)

স্বামীজীকে বিজ্ঞানানন্দজী কি চোখে দেখতেন—"...তাঁর সামনে এগোয় কে? আমরা দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করতাম। আগুনের কাছে গেলে যেমন আঁচ লাগে, তাঁর কাছে গেলেও ঐরূপ আঁচ অনুভব করতাম।...তিনি মঠে উপস্থিত থাকলে মঠের ওই গেট (এখন যাহার নিকটে সারদাপীঠের প্রদর্শনীকক্ষ—Show Room—হইয়াছে) থেকেই তা বোঝা যেত। সারা মঠ তখন গমগম করত।" (স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে যেমন দেখিয়াছি' : পৃঃ ২৪২)

স্বামীজী-প্রসঙ্গে বিজ্ঞানমহারাজের সবচেয়ে বিস্ময়কর স্মৃতিচারণের উদাহরণটি রয়েছে পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের ছোট্ট স্মৃতিকথাটিতে। তাছাড়া আর যাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার নিদর্শন এ গ্রন্থে আছে, তাঁদের মধ্যে স্বামী সদাশিবানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী ওঙ্কারানন্দ, স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, রায় নগেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখদের এবং আরো অনেকের স্মৃতিসম্ভার বিশেষ মূল্যবান।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর "সূর্যসিদ্ধান্তের" অনুবাদ বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় কীর্তি। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কারিগরী বিদ্যাবিষয়ে "জলসরবরাহের কারখানা" এবং "এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা" বই দুইখানির জন্যও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জেনারেল প্রিণ্টার্স কর্তৃপক্ষ যদি 'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ রচনাবলী' নাম দিয়ে তাঁর বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ-জাতীয় রচনা (এবং বাংলায় মৌথিক রচনা কিছু থাকলে সেগুলি) প্রকাশ করেন, তাহলে এই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষের আর একটি মহৎ দিকও সাধারণ পাঠকের কাছে উন্মোচিত হয়। বিজ্ঞান মহারাজের সহপাঠী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—"এলাহাবাদে তিনি যখন 'জলসরবরাহের কারখানা' (Water Works) নামক বহুচিত্রসম্বলিত বাংলা বহি লেখেন, তখন আমি সেখানকার সিটি রোডে...একটি

ছোট বাংলায় ভাড়াটিয়া ছিলাম। অনেকদিন সেখানে এঞ্জিনীয়ারিং-এর অনেক ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ তাঁহাকে ও আমাকে আবিষ্কার করিতে বা গড়িতে হইয়াছিল।" (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ সংখ্যা। দ্র আলোচ্য গ্রন্থে পৃঃ ২০৫-৬)

দেহে মনে অসাধারণ বলিষ্ঠ, আত্মজ্ঞানে ভাস্বর স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর ব্যক্তিত্বে বালকবৎ সরলতা ও অনির্দেয় ইচ্ছাময়তার মধুর মিশ্রণ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের আদর্শকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে তিনি সেবা ও সাধনার সমন্বয়ে বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত নবযুগের অধ্যাত্মচেতনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। সন্ন্যাসপূর্ব জীবনে তাঁর ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা ও জীবিকা সন্ন্যাসোত্তর কালে বেলুড় মঠের গঙ্গাতীরে পোস্তা-নির্মাণে, স্বামীজীর মন্দির-রূপায়ণে ও সবার উপরে স্বামীজী-পরিকল্পিত বেলুড়ের রামকৃষ্ণ-মন্দির-পরিকল্পনার মাধ্যমে ঈশ্বর-আরাধনায় পরিণত হয়ে বস্তুবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মহাসম্মেলন ঘটিয়েছে। এমন সর্বত্যাগী জ্ঞান ভক্তি কর্ম ও যোগের সম্মিলিত বিগ্রহ লোকোত্তরচরিত্র-অনুধ্যানের ও সেই দিব্যচরিত্রের দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ-চরিত্রের তাৎপর্য উপলব্ধির যে সুবর্ণসুযোগ এ গ্রন্থের সংকলয়িতারা আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, তার জন্য তাঁরা সাধারণ ধন্যবাদের বহু উর্ধ্বে।

সম্পাদনার দিক থেকে মনে হয় পরবর্তী সংস্করণে রচনাগুলিকে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনকথার কালপঞ্জী-অনুসারে সাজালে ভালো হবে। যে ভক্ত বা অনুরাগী যখন তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, সেই কাল-অনুসারে পর পর সাজালে জীবনীর দিক থেকেও উপাদানগত সমগ্রতা দেখা দিয়ে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য আরো বাড়িয়ে দেবে। মাঝে মাঝে সম্পাদনা করতে গিয়ে কোনো কোনো স্মৃতিচারণে তাঁরা মূল্যবান পাদটীকা দিয়েছেন। দু'এক ক্ষেত্রে সেগুলি তেমন প্রয়োজনীয় নয়, (দ্র পৃঃ ২৪০) এমন কি পরিহার্য।

পরবর্তী সংস্করণে পরমপূজনীয় বিজ্ঞান-মহারাজের পূত সান্নিধ্যলাভে ধন্য আরো কিছু অনুরাগীর স্মৃতিকথা সংযোজিত হয়ে গ্রন্থখানি যথাসাধ্য সম্পূর্ণতা লাভ করবে—এ আশা স্বাভাবিক। এজাতীয় গ্রন্থে মূল্য কখনোই বাধা নয়। আনন্দের বিষয়, এ সংকলনের অমূল্য সম্পদ সম্বন্ধে প্রকাশক বিশেষভাবে সচেতন।

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়াঃ হীরক জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। প্রকাশক: স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, কলিকাতা ৭০০০৫৬। (১৯৭৬), পৃষ্ঠা ৩২৮, মূল্য আট টাকা।

বেলঘরিয়াস্থ কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উহার সূচনা, ক্রমোন্নতি ও অধুনাতন সার্থক প্রতিষ্ঠানে পরিণতির আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত ও তৎসহ অনেকগুলি অতি মূল্যবান চিরনূতন নিবন্ধ আলোচ্য স্মারক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। বিদ্যার্থী আশ্রমের মূলে আছে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ: 'মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ-সাধন'—প্রাচীন ভারতের গুরুকুল ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সুসমঞ্জস সমন্বয়—এক কথায় 'প্রকৃত মানুষ-গড়া'র শিক্ষাদর্শ।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ, ধর্মপ্রাণ যুবক সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে স্বামী নির্বেদানন্দ) এই বিদ্যার্থী আশ্রমের গোড়াপত্তন করেন কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে। পর বৎসর উহা করপোরেশন স্ট্রীটে স্থানান্তরিত হইবার অনতিকাল পরেই স্বামী শিবানন্দ মহারাজ স্বামী নির্বেদানন্দকে স্বামীজীর অনন্ত শিক্ষাদর্শ অনুসরণে কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং এইভাবে আশ্রমটির নবজীবনের সূত্রপাত হয়। ১৯১৯ সালে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের আগ্রহে আশ্রমটি রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমোদন লাভ করে। পর বৎসর স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ স্বামী নির্বেদানন্দকে বলেন যে, বিদ্যার্থী আশ্রম যেন উহার নিজস্ব কর্মিগঠনে সচেষ্ট হয়, তাহা হইলেই উহার ক্রমোন্নতি সুনিশ্চিত। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তী কালে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। এই বিদ্যার্থী আশ্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত চল্লিশ জনেরও বেশী যুবক—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—ত্যাগী কর্মী-রূপে রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে কর্মযজ্ঞে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন এবং শত শত প্রাক্তন ছাত্র কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১৯২০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কর্তৃক বিদ্যার্থী আশ্রম পরিদর্শনের পুণ্যদিবসটি সবিশেষ স্মরণীয়। স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 'ঠাকুরই ওখানকার (বিদ্যার্থী আশ্রমের) ছেলেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখবেন।' বস্তুতঃ বাহিরের চাকচিক্য নয়, 'আশ্রমের ভাবটিই' প্রতিষ্ঠানটির প্রাণবস্তু হইয়াছে। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ, স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ, স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ বিভিন্ন সময়ে বিদ্যার্থী আশ্রমের পরিচালক ও আবাসিকগণকে নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

পঁচিশটি বাংলা, ষোলটি ইংরেজী এবং তিনটি সংস্কৃত সুচিন্তিত ও সুরচিত লেখায় স্মরণিকাটি সমৃদ্ধ। Karma-Yoga হইতে উদ্ধৃত 'The Secret of Work'-শীর্ষক স্বামীজীর একটি ভাষণকে মূল্যায়নের ঊর্ধ্বে রাখিলে লেখাগুলির মধ্যে স্বামী নির্বেদানন্দের 'As It Has Been Growing'-শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রাসঙ্গিকতার বিচারে সর্বাগ্রগণ্য। ইহা প্রতিষ্ঠানটির পটভূমি ও প্রথম ২৪ বৎসরের ক্রমবিকাশের একটি প্রদীপ্ত প্রতিবেদন। তদ্ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় কর্মসচিব স্বামী সন্তোষানন্দের 'Fifty Years of Progress' ও বর্তমান কর্ণধার স্বামী ধ্যানাত্মানন্দের 'The Past Decade' প্রবন্ধদ্বয়েও আশ্রমের বিশদ বিবরণ অতি সুন্দরভাবে বিধৃত। এতদ্ব্যতীত The Wonder Drug That is Humane: Swami Atmasthananda, The Journey Within: Swami Shraddhananda, Ramakrishna Mission's Educational Work—Its Distinctive Features: Swami Lokeswarananda, Role of Religion in Our Life: Swami Adinathananda, Lead Kindly Light: Sri Jnanendra Chandra Datta, অমৃতকথা: শ্রীরামকৃষ্ণস্য, কঠোপনিষৎ-প্রসঙ্গ: স্বামী ভূতেশানন্দ, বিদ্যার্থী আশ্রমে: সিংহাবলোকন: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, 'জ্যান্ত দুর্গা': স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, বেলঘরিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ: স্বামী অমলানন্দ, দাসোঽহমভিবন্দে: শ্রীজিতেন্দ্রনাথ-দাসস্য, কশ্চ মোদতে: শ্রীনরনারায়ণ-বন্দ্যোপাধ্যায়স্য, স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ: স্বামী মুমুক্ষানন্দ প্রভৃতি কালজয়ী উজ্জ্বল নিবন্ধগুলিও উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন প্রাক্তন বিদ্যার্থীর স্মৃতিচারণও বিশেষ উপভোগ্য।

বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির আশীর্বাণী ও প্রীতি-শুভেচ্ছাবাণী এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের প্রতিকৃতি এবং অন্যান্য নানা নয়নাভিরাম চিত্র স্মরণিকাটির মূল্য- ও মাধুর্য-বৃদ্ধি করিয়াছে। বিষয়-বিন্যাস এবং মুদ্রণ-সৌষ্ঠবও প্রশংসনীয়।

বিদ্যার্থী আশ্রমের এই সর্বাঙ্গসুন্দর সারগর্ভ স্মারক গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে জ্ঞানার্জনের এক নব-দিগন্ত উন্মুক্ত করিবে। শিক্ষাব্রতীদের এবং আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে ও পরিচালনে আগ্রহী ব্যক্তিদের ইহা দিগ্‌দর্শক। সুধীসমাজের অকুণ্ঠ অভিনন্দনের দাবি লইয়া উপস্থিত এই অমূল্য গ্রন্থটি সকল সদ্‌গ্রন্থাগারে শ্রদ্ধাসহকারে সংরক্ষণযোগ্য।

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

অমৃতের সন্নিধানে : লেখক ও প্রকাশক : শ্রীদেবপ্রসাদ রায়, ৩৫, জনক রোড, কলিকাতা ২৯। (১৩৮৩), পৃষ্ঠা ১৩৬, মূল্য সাত টাকা।

লেখক শ্রীদেবপ্রসাদ রায় দীক্ষান্তে তাঁহার শ্রীগুরুর সন্নিধানে কিছুকাল অতিবাহিত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার মহাভারতে বর্ণিত 'ধৃতরাষ্ট্র-সনৎসুজাত-অধ্যাত্ম-সংবাদ' শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিবার সুযোগ হয়। অমৃতস্বরূপ গুরুসন্নিধানে আস্বাদিত শাস্ত্রামৃত তিনি আলোচ্য গ্রন্থে পরিবেশন করিয়াছেন সুতরাং গ্রন্থের নামকরণ সার্থক হইয়াছে বলা যায়।

গুরুভক্ত মেধাবী একনিষ্ঠ শিষ্যের শাস্ত্রের মর্মার্থ-গ্রহণ-ক্ষমতা-দর্শনেই বোধ হয় তাঁহার গুরুদেব আশ্রমচালিত 'অমৃত' পত্রিকায় শিষ্যের উপলব্ধ শাস্ত্রার্থ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে বলেন। মহাভারতে বর্ণিত 'ধৃতরাষ্ট্র-সনৎসুজাত-অধ্যাত্মসংবাদ' গীতা উপনিষদাদির মতই অমৃত-রসের খনি। ব্রহ্মার মানসপুত্র ভগবান সনৎ-কুমার অমৃতের বার্তাবহ। সুতরাং মধুলোলুপ ভ্রমরের ন্যায় সাধু-সুধীজন 'অমৃত' পত্রিকায় উক্ত রচনাসমূহ পাঠ করিয়া উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য লেখককে যে অনুরোধ করিবেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। গুরুভক্ত সাধক উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত স্তবকসমূহ গ্রন্থার্ঘ্যরূপে প্রণয়ন করিয়া অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সনৎকুমার ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন, অমৃত-স্বরূপ পরমাত্মা সত্যে আহিত। নিত্য সত্যপর হইয়া সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠ হইতে পারিলে পর-মাত্মাকে লাভ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করা যায়। এই অমৃত সহজলভ্যও নহে, সত্বরলভ্যও নহে। শ্রীগুরুর সত্যবাণীর মাধ্যমে এই সত্যের সন্ধান লাভ করিতে হয়। ব্রহ্মচর্যসহ অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধনে সত্যলাভের অন্তরায়সমূহ দূর করিয়া সত্যপ্রতিষ্ঠ ও সত্যপর হইলে এই অমৃতত্ব লাভ হয়।

লেখক অতি নিপুণভাবে বেদান্ত, তন্ত্র, বিভিন্ন দর্শন এবং ধর্মশাস্ত্রাদি হইতে যথাসম্ভব অনুকূল উদ্ধৃতি-সহযোগে অমৃতত্ব-সাধন-বিষয়ক সকল প্রকার সংশয় ও অন্তরায় উল্লেখপূর্বক বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃত সাধনতত্ত্বের সন্ধান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গুরুকৃপালব্ধ জ্ঞানালোকে তিনি প্রতি কর্মের মাধ্যমে কিভাবে মৃত্যুগরল বিষয়ের মধ্য হইতে অমৃত আহরণ করিতে হয়, তাহা সার্থকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সাবহিত হইয়া পাঠ করিলে সাধন-জ্ঞানপিপাসু নরনারীগণ উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন বলিয়া মনে করি। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুধীররঞ্জন সেনগুপ্ত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা গত ২রা ও ৩রা কার্তিক মহাসমারোহে যথোচিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় দিবস সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে হাতে হাতে অন্ন-প্রসাদ দেওয়া হয়। মহাষ্টমীর দিন প্রায় পনের হাজার এবং মহানবমীর দিন প্রায় দশ হাজার ভক্ত প্রসাদ পান।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত ২৩টি শাখাকেন্দ্রেও প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়:

আসানসোল বালিয়াটি বরিশাল বোম্বাই কাঁথি ঢাকা গৌহাটি জলপাইগুড়ি জামশেদপুর জয়রামবাটী কামারপুকুর করিমগঞ্জ লখ্‌নৌ মালদহ মেদিনীপুর নারায়ণগঞ্জ পাটনা রহড়া শেলা (চেরাপুঞ্জি) শিলং শিলচর শ্রীহট্ট ও বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

ত্রাণকার্য

ভারত: জোড়হাট ও হাতিখাল (শিবসাগর) এবং খাওয়াঙ ও মারঘেরিটা (ডিব্রুগড়) বন্যা-ত্রাণকেন্দ্রের মাধ্যমে মিশন ৯,২৩৯ জনের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিতরণ করিয়াছে:

চাল ১,৫০০ কেজি, বাসনপত্র ১২০ সেট (প্রতি সেটে ১৬টি বাসন), মার্কিন কাপড় ৩,৭৫০ মিটার, হাফ প্যাণ্ট ১,১৫০, পশমী কম্বল ৬৫০, সুতির কম্বল ১,৫০০, মেখলা ১৫০, ধুতি ৭৬৮, চাদর ১১০ ও শিশুদের পোশাক ১,৬৫৩।

বাংলাদেশ: বাগেরহাট দিনাজপুর ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা অব্যাহত আছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধ-বিতরণও অব্যাহত আছে।

কার্যবিবরণী

চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭৬-৭৭ সালের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:

প্রার্থনা-গৃহে নিয়মিত ধ্যান ও প্রার্থনা, পাক্ষিক রামনাম-সংকীর্তন, রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ যীশু গুরু নানক প্রভৃতি মহাপুরুষদের আবির্ভাব-দিবস উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা ভজন বক্তৃতা ও 'রামচরিত-মানস' আলোচনা করা হয়। বিকলাঙ্গ শিশুদের মধ্যে ফল মিষ্টান্ন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা হয়।

প্রতি শনি ও রবিবার নিয়মিত 'শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণকথামৃত' ও 'রামচরিত-মানস' পঠিত ও আলোচিত হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের জন্য স্বতন্ত্র-ভাবে সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়। চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে শিশুদের শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা হয়।

আম্বালা ব্যাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ মহীশূর চেরাপুঞ্জি কোচিন কালাডি নাঙ্গল পাতিয়ালা শিলং ত্রিচুর প্রভৃতি স্থানে আমন্ত্রিত হইয়া আশ্রমাধ্যক্ষ ধর্মীয় আলোচনা করেন।

একটি অধিবেশন-ভবনের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় এবং ১৪ই নভেম্বর ১৯৭৬ উহা জনসেবায় উৎসর্গীকৃত হয়।

পুস্তকাগারে ১,৬৩৪ খানি বই ছিল; ব্যবহৃত হয় ৪১৫ খানি।

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২,৯৭৮ জন রোগী চিকিৎসিত হন। তন্মধ্যে নূতনের সংখ্যা ৬০২।

কলেজের ছাত্রদের জন্ম ৪০টি আসনযুক্ত বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৭৪-৭৬ সালের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

গ্রন্থাগার: পুস্তকের মোট সংখ্যা ১০,৫৮৯। পঠিত পুস্তকের সংখ্যা ২১,৩৯৬। দৈনিক উপস্থিতির গড় ১৪৫। ১৪টি সংবাদপত্র ও ৭১টি সাময়িক পত্রিকা পাঠাগারে রাখা হয়। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের জন্ম পৃথক্ একটি গ্রন্থাগারে ১,৪৩২ খানি পাঠ্য পুস্তক আছে।

ছাত্রাবাস: উড়িষ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত এই ছাত্রাবাসটি প্রধানতঃ তফসিলী সম্প্রদায় ও তফসিলী উপজাতির উন্নতিবিধানের জন্ম। মোট ৬৫ জন ছাত্রের মধ্যে ১৩ জন তফসিলী সম্প্রদায়ের, ৪৭ জন তফসিলী উপজাতির এবং অবশিষ্ট অন্যান্ম সম্প্রদায়ের ছিল। ছাত্রগণকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বাসস্থান, আহার্য ও পুস্তকাদি দেওয়া হয়। ছাত্রাবাসের সকলের জন্ম প্রার্থনা ও বৈদিক স্তোত্রপাঠ বাধ্যতামূলক। অল্পমেধার ছাত্রদের জন্য ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। রান্না, পরিবেশন, গো-পালন ও বাগানের কার্যে ছাত্রেরা অংশগ্রহণ করে। আলোচ্য দুই বর্ষে ছাত্রগণ ৪,৯২৩ টাকা মূল্যের তরিতরকারি উৎপন্ন করে।

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান: আশ্রমে নিত্য প্রাতে ও সন্ধ্যায় প্রার্থনাদি ও পাক্ষিক রামনাম-সংকীর্তন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমা সারদাদেবী স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্যের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। ইহা ছাড়া গণেশপূজা, সরস্বতীপূজা এবং জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের অধ্যক্ষ সাপ্তাহিক গীতাব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে ও আগরতলায় ধর্মীয় আলোচনা ও বক্তৃতা করেন। আশ্রমপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অনেকগুলি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভাষণ দেন।

ত্রাণকার্য: কালাহাণ্ডী জেলার নওয়াপাড়ায় দুই মাসব্যাপী দুর্ভিক্ষত্রাণকার্যে ১,০০০ আদিবাসী পরিবারকে ৩২,২০০ কেজি গম, ৮৫৫ খানি নববস্ত্র এবং কিছু পুরাতন বস্ত্রও বিতরণ করা হয়। বালেশ্বর জিলার 'বস্থ' ব্লকে বন্যাপীড়িত হরিজন পরিবারদিগকে ৮,০৩৮'৬১ টাকা মূল্যের নূতন বাসনপত্র ও পুরাতন বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়।

আশ্রমকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনা ও প্রসারকল্পে আশ্রমকর্তৃপক্ষ সরকার ও সহৃদয় জনসাধারণের নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন।

খেতড়ি (রাজস্থান) 'বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির'-এর ১৯৭৫-৭৬ সালের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী :

স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত খেতড়ি রাজপ্রাসাদে রামকৃষ্ণ মিশনের এই কেন্দ্রটি রাজা অজিত সিং-এর প্রপৌত্র রাজাবাহাদুর সরদার সিং-এর বদান্যতায় ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রে চিকিৎসা শিক্ষা ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক সেবাকার্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা: প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামসংবলিত একটি প্রসূতিভবন পরিচালিত হয়। যে-সব ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার নিষ্প্রয়োজন সেই সব প্রসবের ব্যবস্থা এখানে হয়। সকল প্রকার

সেবাকার্যই ব্যয়মুক্ত। অন্তর্বিভাগে দুধ, বলবর্ধক ও ব্যাধিহর ঔষধাদি বিনামূল্যে বিতরিত হয়। আলোচ্য বর্ষে প্রসবের সংখ্যা ১০৫। ইহার সেবিকাগণ ১,৪১৯টি ক্ষেত্রে প্রসবের পূর্বকালীন ও উত্তরকালীন পরিচর্যা করেন।

শিক্ষা: কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে 'সারদা শিশু বিহার' নামে একটি শিশু-বিদ্যালয়ে ৩ হইতে ১০ বৎসরের শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৭২টি বালক ও ৭৩টি বালিকা বিদ্যালয়ে ছিল। ২৬ জন বিনাবেতনে এবং ৪ জন অর্ধবেতনে পড়িবার সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ের নিজস্ব শিশু-পাঠাগারে ৮৬২ খানি পুস্তক ছিল। সংলগ্ন ক্রীড়া-উদ্যানে শিশুদের খেলিবার বিভিন্ন সরঞ্জাম আছে। দরিদ্র শিশুদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন পোশাক, পুস্তক ইত্যাদি দেওয়া হয়। গল্প, আবৃত্তি, বক্তৃতা, অভিনয় প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও জাতীয় উৎসব পালন করে।

মিশন একটি অবৈতনিক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালনা করেন। উহার পুস্তক সংখ্যা ছিল ৫,৪৬৭। ব্যবহৃত পুস্তকের সংখ্যা ৩,২০৬। ৪টি দৈনিক ও ৩২টি সাময়িক পত্র-পত্রিকা ছিল। দৈনিক গড় উপস্থিতি ৪১।

সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কার্যাবলী: নিয়মিত সংস্কৃতি- ও ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা হয়। আশ্রমাধ্যক্ষ বিভিন্ন স্থানে আলোচনাদি করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাদের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া জন্মাষ্টমী রামনবমী ও অন্যান্য স্থানীয় ধর্মোৎসব পালিত হয়। সংগীত ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

কসবা দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ২৭শে মার্চ ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ আবির্ভাব-উৎসব পূজা পাঠ ভজন ও ধর্মালোচনার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সহশিল্পিগণ সঙ্গীত এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্টি পরিষদ 'পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। অপরাহ্নে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী ভর্গানন্দ, প্রধান অতিথি স্বামী চিন্ময়ানন্দ এবং অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার। সভার প্রারম্ভে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের জন্য আয়োজিত 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানুষ' প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগদানকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ষোলশতের অধিক ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া প্রসাদ পান।

বিগত ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৭৬ এবং ১৬ই জানুআরি ১৯৭৭, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের উৎসব উপলক্ষে ধর্মসভায় ভাষণ দেন অধ্যাপিকা বিজয়া সেন এবং স্বামীজীর জন্মোৎসবে ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ।

উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা [পুনর্মুদ্রণ]

সাধু দুর্গাচরণ নাগ [পূর্বানুবৃত্তি]

(ভাদ্র, ১৩৮৪ সংখ্যার শেষ লাইন: বস্ত্র তাঁহার ছিল না; স্নান পর্য্যন্তও করিতেন না। একবেলা দুই তিন গ্রাস মাত্র—যাহা হউক)

কিছু—খাইতেন ; দেখিতে—জীর্ণ শীর্ণ কলেবর। দিন কতক তিনি একেবারেই অনাহারে ছিলেন ; আহারের জন্য কেহ অত্যন্ত পেড়াপিড়ি করিলে কাতরস্বরে উত্তর দিতেন "যে শরীর ঈশ্বর লাভ করিতে পারিল না, সে শরীর আহার করিবে কি ?" পরে কোন মহাপুরুষের অনুরোধে, নিতান্ত কায়ক্লেশে জীবনরক্ষা মাত্র হয় এইরূপ পরিমাণে একাহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘরের ভিতরে, অথবা কোন ভাল স্থানে ভাল করিয়া, কখনও শয়ন করিতেন না ; ফাঁকা জায়গায় পড়িয়া থাকিতেন।

ইঁহার সাধ্বী স্ত্রী আজও বর্ত্তমান। সাধু দুর্গাচরণ গৃহস্থ ছিলেন বটে, কিন্তু অবস্থা তাঁর পরমহংসের ন্যায় ছিল। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—তিনি যেন মহাপ্রভুর এই উক্তিটীর প্রতিমূর্ত্তি ; শ্লোকটীর প্রতি শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থ তাঁহাতে জাজ্বল্যমান দেখা গিয়াছিল। ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটী পরমভক্ত ছিলেন।

বৈজ্ঞানিক।

মৃগনাভির গন্ধ এত অধিক কাল স্থায়ী যে, ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে রোমসম্রাট্ জষ্টিনিয়ান যখন সেণ্টসোফিয়ার উপাসনামন্দির নির্ম্মিত করান, তখন তথায় কিছু মৃগনাভি রক্ষিত হইয়াছিল ; সেই উপাসনামন্দির অদ্যাবধি তাহার সৌরভে আমোদিত। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত কেভেণ্ডিস্ ল্যাবরেটরির রাসায়নিক তুলাদণ্ডে এক গ্রেণের দশমাংশ পরিমাণ মৃগনাভি বহুদিন হইতে রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহার ভারের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই।

আগামী বর্ষে প্যারিস্ প্রদর্শনীতে যে সকল বস্তু প্রদর্শিত হইবে, তন্মধ্যে টেলে ইলেক্ট্রস্কোপ নামক অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্র বিশেষ দর্শনীয়। ঐ যন্ত্র এক সামান্য বিদ্যালয়ের পোলাণ্ড-দেশীয় শিক্ষক হার জেপ্‌নিকের উদ্ভাবনাশক্তির বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। দূরবীক্ষণের সাহায্যে দূরবর্ত্তী বস্তু সকল আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু গৃহে বসিয়া দেয়াল ভেদ করিয়া দূরবীক্ষণসাহায্যে দূরস্থ বস্তুসকল দর্শন করা সম্ভবপর নহে। উহার জন্য স্বতন্ত্র যন্ত্রের আবশ্যক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন হইতে এইরূপ একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। হার জেপ্‌নিক ঐরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ঐ অদ্ভুত যন্ত্র সকলবস্তু ভেদ করিয়া ৪০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে নীত করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুতরাং প্যারিস্ প্রদর্শনীতে যাঁহারা গমন করিবেন, তাঁহারা টেলে ইলেক্ট্রস্কোপের সাহায্যে ৪০ মাইল দূরে কি হইতেছে, তাহা অনায়াসে দেখিতে পাইবেন। যন্ত্রটীর যাবতীয় স্বত্ব ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। এই প্রদর্শনী যতদিন না শেষ হয়, ততদিন কেহ ইহার যান্ত্রিক অবয়ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রকাশ করিতে পারিবে না।

পারস্যোপসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশের ন্যায় উষ্ণপ্রধান স্থান পৃথিবীতে বিরল। চারিদিকে বালুকাপূর্ণ শুষ্ক ভূমি এবং জলের চিহ্ন কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তথাকার লোকসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল পানের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, সুতরাং

তথায় পানীয় জলের বিশেষ অভাব। কিন্তু প্রকৃতির সুবন্দোবস্তে সেই অভাব দূর হইয়াছে। তথাকার সমুদ্রের তলদেশ বিদীর্ণ করিয়া বহুসংখ্যক প্রস্রবণ নির্ম্মল বারিধারা প্রবলবেগে উদ্গীরণ করিতেছে। ডুবুরিরা ভারি প্রস্তরের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশে গমন করিয়া এই সকল প্রস্রবণের জলে মসক পূর্ণ করে এবং প্রস্তর ছাড়িয়া দিয়া উপরে উত্থিত হয়। তথাকার লোকেরা এইরূপে পানীয় জল প্রাপ্ত হয়।

ব্যারণ রথ্‌শ্চাইল্ডের পুত্র ওয়াল্টার রথ্‌শ্চাইল্ড পশু পক্ষী লইয়া থাকিতে বড় ভালবাসেন। তাঁহার একদল এমন পোষা জেব্রা আছে যে, তাহারা ঘোড়ার মত গাড়ী টানে। তাঁহার বাগানে একটী পোষা সিংহও ছাড়া আছে। সিংহের ন্যায় মাংসাশী জন্তু কিরূপে গৃহপালিত পশুর ন্যায় শান্তপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইল, তাহার কারণ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে :—

আমোনিয়ম্ নাইট্রেট্ নামক যৌগিক পদার্থে উত্তাপ প্রদান করিয়া নাইট্রস্ অক্সাইড্ নামক গ্যাস্ প্রস্তুত করা যায়। সার্ হাম্ফ্রি ডেভির সময়ে এই গ্যাস্ আবিষ্কৃত হয়। ডেভি পরীক্ষা করিতে করিতে ইহার এক অভিনব গুণ দেখিতে পাইলেন। এই গ্যাসের বিশেষত্ব এই যে, যদি কেহ ইহা বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করে, তাহা হইলে তাহার মনে সাতিশয় হর্ষের উদ্রেক হয় এবং সে ব্যক্তি হাসিতে আরম্ভ করে। বিশুদ্ধ নাইট্রস্ অক্সাইড্ গ্যাস্ সেবন করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই একপ্রকার শব্দ শ্রুত হয় ও পরে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইতে হয়। এই সময়ে রুগ্ন দন্ত উৎপাটনের ন্যায় অল্পক্ষণব্যাপী অস্ত্রচিকিৎসা অনায়াসে করা যাইতে পারে। এইরূপে ঐ গ্যাসের সাহায্যে ঐ সিংহের দন্ত শাবক অবস্থায় উৎপাটিত হইয়াছিল। ঐ দন্ত কয়টাই মাংসাশী জন্তুর হিংস্র স্বভাবের কারণ।

আরবদেশে একপ্রকার গাছ জন্মে, তাহা পীতবর্ণের পুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণের বীজ উৎপাদন করে। ঐ বীজ চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিলে নাইট্রস্ অক্সাইড্ গ্যাসের ন্যায় হাস্য উৎপাদন করে।

এখন তারবিহীন তাড়িতবার্ত্তা কেবল স্বপ্নকল্পিত বিষয় নহে। একদিকে ভারতের উজ্জ্বল রত্ন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু ও অপরদিকে বৈজ্ঞানিক ইটালীয় যুবক মার্কণি তারবিহীন তাড়িতবার্ত্তা কার্য্যে পরিণত করিয়া সভ্য জগতে বিখ্যাত ও বিদ্বৎসমাজে আদৃত হইয়াছেন। অধ্যাপক বসু তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িতবিজ্ঞানবিষয়ক উচ্চ শ্রেণীর জটিল তত্ত্বের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। সিনিয়র মার্কণি কেবল তারবিহীন তাড়িতবার্ত্তার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট। সেদিন তিনি তাঁহার যন্ত্রের দ্বারা এক ইংরাজ রণতরী হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী আর এক রণতরীতে বিনাতারে সংবাদ প্রেরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

ওদিকে বিলাতের ম্যাস্কেলিন্ সাহেব মার্কণির যন্ত্রের সাহায্যে বেলুন হইতে ভূতলে রক্ষিত বারুদাদি দাহ্যমান পদার্থ প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমে তাড়িত ভবিষ্যৎ সমরাস্ত্রে বিপ্লব উপস্থিত করিবে।

রামকৃষ্ণ মিশন।

মহোৎসব।—আগামী ২৮শে ফাল্গুন ইংরাজী ১১ই মার্চ্চ রবিবারে, কলিকাতার

সন্নিকট, ভাগীরথীর পশ্চিমকূলস্থ বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সপ্তষষ্টিতম জন্মোৎসব হইবে।

স্বামী সারদানন্দ।—বিগত ডিসেম্বর মাসে বেলুড় মঠ হইতে স্বামী সারদানন্দ প্রচারার্থ ঢাকায় গিয়াছিলেন। তথায় অনেকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া বরিশালে আসেন। কাশীপুরনিবাসী নামক এক পত্র বলিতেছেন :—

রামকৃষ্ণ মিশনের বিবেকানন্দ স্বামী প্রমুখ প্রচারক-দলের শ্রীযুক্ত সারদানন্দ স্বামী বরিশালে আসিয়াছেন। তিনি অত্রত্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে বিগত ৬ই জানুয়ারী ইংরেজী ভাষায় "Catholicity and Hinduism", ৭ই জানুয়ারী বাঙ্গলা ভাষায় 'শক্তি ও সংযম', ৮ই তারিখে 'ভক্তি ও জ্ঞান' বিষয়ে বক্তৃতা এবং ৯ই ও ১০ই তারিখে সভায় সদালাপ প্রশ্নোত্তর করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন। আমরা ক্রমান্বয়ে পরমহংস মহাশয়ের কয়েকটী প্রিয় শিষ্যের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি; সকলেরই প্রস্ফুটিত ধর্ম্মজ্ঞান এবং শান্তপ্রকৃতি দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। রামকৃষ্ণ মিশনের লোকেরা কালক্রমে একটী বিস্তৃত ধর্ম্মসমাজের অধিনায়ক হইবেন, তাহা প্রচারের সুপ্রণালী দেখিয়াই উপলব্ধি হইল।

সাপ্তাহিক বক্তৃতা।—স্বামী সারদানন্দ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় বাগবাজার বোসপাড়া রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ৫৭ নং ভবনে প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৫॥ টার সময় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জনসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীভাষ্যানুবাদ।

(পণ্ডিতবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ।)

[ব্রহ্মসূত্রের জিজ্ঞাসাধিকরণে মহাপূর্বপক্ষের অন্তর্গত "নন্থ চ 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ'…", এই অংশের বঙ্গানুবাদ এবং "এতদুক্তং ভবতি …" হইতে "…সন্মাত্রস্যৈব প্রকাশকং প্রত্যক্ষম্", এই অংশের ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদের কিয়দংশ—বর্তমান সম্পাদক]

উদ্বোধন

২য় বর্ষ।]　　১৫ই মাঘ। (১৩০৬ সাল)　　[২য় সংখ্যা।]

পরমহংসদেবের উপদেশ।

১। সাধু মহাপুরুষদিগকে নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা অগ্রাহ্য করে, দূরের লোকদিগের নিকট তাঁদের আদর হয়, ইহার কারণ কি?—যেমন বাজীকরের বাজী, তাদের কাছের আত্মীয় লোকেরা দেখে না, দূরের লোকেরা দেখে অবাক্ হয়ে যায়।

২। বস্ত্র বাঁটুলের বিচি গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে গিয়ে দূরে পড়ে ও সেখানে গাছ হয়। সেই রকম ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ভাব দূরেতেই প্রকাশ হয় ও লোকে আদর করে।

(অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪, পৃঃ ৬৩৫)

৩। লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেই রকম সাধু মহাপুরুষদের নিকটের লোকেরা বুঝ্‌তে পারে না, দূরের লোকেরা তাদের ভাবে মুগ্ধ হয়।

৪। যে মাছ ধত্তে ভালবাসে, সে যদি শোনে যে, অমুক পুখুরে বড় বড় মাছ আছে, সে কি করে? যারা সেই পুখুরে মাছ ধরেছে, সে যদি তাদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করে বেড়ায়—সত্যি সত্যি সে পুখুরে বড় ২ মাছ আছে কি না, যদি থাকে তবে কিসের চার ফেলিতে হয়, কি টোপে খায়, এসব বিষয় ভাল করে জেনে নিয়ে যদি তাকে মাছ ধর্‌তে যেতে হয়, তা হলে তার মাছ ত একেবারেই ধরা হয় না। সেখানে গিয়ে ছিপ্‌ ফেলে ধৈর্য্য ধরে বসে থাক্‌তে হয়, তারপর সে, মাছের ঘাই ও ফুট দেখ্‌তে পায় এবং তারপর সে, মাছ ধর্‌তে পারে। ধর্ম্ম-রাজ্যেও সেইরূপ; সাধক ও মহাজনদের কথায় বিশ্বাস করে, ভক্তি-চার ফেলে ধৈর্য্যরূপ ছিপ্‌ ফেলে বসে থাক্‌তে হয়।

৫। মাছ যতদূরে থাক্‌ না, ভাল ভাল চার ফেল্‌বামাত্র যেমন তারা ছুটে আসে, ভগবান্‌ হরিও সেইরূপ বিশ্বাসিভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র আসিয়া উদয় হন।

৬। দাদ্‌ যত চুল্‌কাও ততই চুল্‌কাতে ইচ্ছা হয় ও চুল্‌কে সুখ হয়, ভক্তেরাও সেইরূপ ভগবানের যত গুণকীর্ত্তন কত্তে থাকে ততই সুখ পায়।

৭। যাকে ভূতে পায় সে যদি জান্‌তে পারে যে, তাকে ভূতে পেয়েছ, তা হলে ভূত পালিয়ে যায়। মায়াচ্ছন্ন জীব যদি একবার ঠিক্‌ জান্‌তে পারে যে তাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে, তা হলে মায়া তার নিকট থেকে তখনই পালায়।

আচার্য্য শঙ্কর ও মায়াবাদ।

(পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

[ভাদ্র, ১৩৮৩ সংখ্যার পর—বর্ত্তমান সঃ]

এই যে অহন্তাবাবৃত বিজ্ঞান, যাহার আদি, অন্ত বা মধ্য নাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সূত্রাবলম্বনে বিচিত্র মালার ন্যায়, এই প্রতিক্ষণ পরিবর্তনশীল,—বিচিত্ররূপসম্পন্ন ব্যবহারজগৎ প্রতিভাসমান আবার সুগভীর নিদ্রাবস্থায় সকল ব্যবহারের বিলয়কালে, শ্রাবণে ঘনঘটাবৃত অমাবস্যার রজনীতে বায়ুবিতাড়িত মেঘচ্ছিদ্রের অন্তরাল হইতে প্রকাশমান সুবৃহৎ নক্ষত্রের ন্যায় যাহা নিজেই প্রকাশ পায়, চতুর্দ্দিকে অনন্ত তামস আবরণে আবৃত হইলেও যাহার শান্তিময় নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশভাব, আবরণেরও সত্তাপ্রকাশ করিয়া দেয়, সেই সর্ব্বান্তর অথচ সকল প্রপঞ্চের আশ্রয় আত্মার স্বরূপ, যে আবরণ শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে—রূপান্তরে পরিণতের ন্যায় প্রকাশ পায়, সুখপ্রকাশময় হইয়াও দুঃখময় ও মূঢ়ের ন্যায় প্রতিভাত হয়, অনন্ত ও অসীম হইয়াও বিনশ্বর ও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, এক ও অদ্বিতীয় হইয়াও নানারূপের আশ্রয় ও নানাব্যক্তির ন্যায় জ্ঞাত হয়, সেই অঘটনঘটনপটীয়সী সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারের একমাত্র হেতু, অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী আবরণশক্তির সহিত সেই আত্মার কিপ্রকার সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে না পারিলে মায়াবাদের মর্ম্মে প্রবেশ অসম্ভব, এইজন্য সংক্ষেপে সেই বিষয়ের আলোচনার

জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

বাহ্য বস্তুনিবহের যথার্থ সত্তা আছে, তাহাদের সহিত জীবের সম্বন্ধও যথার্থ, এপ্রকার দার্শনিক মত জগতে চিরদিন প্রচলিত আছে, জীবের সহিত জড়ের এই পারমার্থিক সম্বন্ধের উদেঘাষণকারী দার্শনিকগণের কল্পনাময় যুক্তিজালের প্রতি যাহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস তাহাদের প্রযত্নসঞ্চিত আশার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে বলিয়া সত্যের প্রচার হইতে বিরত হওয়াকে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করা কখনই উচিত নহে। জড়জগতের সত্যতার প্রতি, দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আশা মরীচিকার প্রলোভনে সর্ব্বস্বনাশের পথে উল্লাসের সহিত অগ্রসর মানবের মনের বিষমভ্রান্তি দূর করিবার জন্য অপক্ষপাতে তত্ত্ববিচারের প্রবর্ত্তন, স্বার্থপর বা প্রতারিত সম্প্রদায়বিশেষের নেত্রে নাস্তিকতা বা ভিত্তিহীন প্রাসাদের ন্যায় প্রতীয়মান হউক তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু সেই তত্ত্ববিচারের ফলে নিষ্কলঙ্ক প্রবোধচন্দ্রের অনাদিকালসঞ্চিত মেঘাবরণ দূর হইয়া, যদি ভ্রান্ত ও তাপিত পথভ্রান্ত পথিকের ব্যাকুল নয়নে, শান্তিময় ও চিরাভিলষিত শীতল চন্দ্রিকার বিকাশ হয়, তাহা হইলে কে বলিবে যে, এরূপ কার্য্য মনুষ্য-সমাজের অনভিপ্রেত ?

বল দেখি ধীরভাবে ভাবিয়া এ জগতের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ ? যাহাকে পাইলে হৃদয়ের ভাবসমুদ্র, আনন্দের দীর্ঘ দীর্ঘতর তরঙ্গমালায় আলোড়িত হইয়া উঠে, যাহার বিরহে হৃদয়াকাশে সুখের জ্যোৎস্না কোন্ প্রান্তে মিশাইয়া যায়, বিষাদময় প্রলয় ঘনঘটার নিবিড় অন্ধকারে আপনাকে পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেল, সে কে ? তুমিই বলিবে, সে পূর্ব্বে ছিল না পরেও থাকিবে না, কিন্তু বর্ত্তমানে সে আছে! আগে সে কোথায় ছিল জানি না, পরে সে কোথায় যাইবে বলিতে পারি না। যাহাকে গড়িবার সামর্থ্য আমার নাই ভাঙ্গিবার সামর্থ্যও প্রকৃতপক্ষে আমার আছে কি না তাহাও বলিতে পারি না, সংসারসাগরে ভাসিতে ভাসিতে দুইটী বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য সে ও আমি পরস্পর পরস্পরকে চিনিয়াছি, ইহা না বুঝি তাহা নহে, তথাপি প্রাণ বলে সে আমার! অন্তরের ভিতর হইতে কেমন এক অস্পষ্টস্বরে কে যেন বলিয়া দেয় যে, তারই জন্য তুমি!

ভাবিয়া দেখ দেখি, বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ, কাল্পনিক ছাড়া আর কি হইতে পারে ? এই যে সুন্দর শরীর তারুণ্যের পূর্ণবিলাসে পূর্ণশশধরের ন্যায় কান্তিচ্ছটায় সমুদ্ভাসিত, হাবভাব বিভ্রমের বিলাসকানন, ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা কি কেহ বলিতে পার ? তুমি পরমাণুবাদী, বলিবে প্রত্যক্ষের অযোগ্য নিত্য পরমাণুপুঞ্জের বিজাতীয় সংযোগে ইহার উৎপত্তি! আবার সেই সংযোগ নষ্ট হইলে এই দেহ—এই সুকুমার সৌন্দর্য্যভাণ্ডার দেহ নষ্ট হইবে, সেই নিত্য পরমাণুপুঞ্জ বিশ্লিষ্টভাবে পড়িয়া থাকিবে! কথাগুলি শুনিতে ভাল লাগিলেও ভাবিতে গেলে যেন আল্গা বলিয়া বোধ হয়! কেন তাহাও বলি, আগাগোড়া পরমাণুবাদের বিষয় ভাবিলে কেমন একটা অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে নাকি ? তুমি পরমাণুবাদী, তোমার মতে কারণ অব্যক্ত কিন্তু কার্য্য অব্যক্ত নহে। কারণ প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে কিন্তু কার্য্য প্রত্যক্ষের গোচর, তুমি বলিয়া থাক তন্তুরাশি মিলিত হইলে বস্ত্র উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু তাই বলিয়া তন্তু ও বস্ত্র একই বস্তু নহে। তন্তু ও বস্ত্র যদি একই বস্তু হইত তাহা হইলে বস্ত্র দ্বারা যে সকল কার্য্য সাধিত হয়, তন্তু দ্বারা

(অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪, পৃঃ৬৩৭)

তাহা হয় না কেন? বেশ কথা, তোমার যুক্তিবলে বুঝিলাম তন্তু ও বস্ত্র এক হইতে পারে না কিন্তু বল দেখি ভাই, বস্ত্র ও তন্তু ভিন্ন হইলেই বা চলে কই? তুমি বলিয়া থাক, দ্রব্য মাত্রের একটা পরিমাণ আছে—তন্তুও দ্রব্য বস্ত্রও দ্রব্য সুতরাং তন্তুর পরিমাণ আছে, বস্ত্রেরও পরিমাণ আছে ইহা তোমাকে অবশ্যই মানিতে হইবে! কিন্তু বল দেখি ভাই আরম্ভবাদী, একছটাক সূতা দিয়া যে বস্ত্রখানি প্রণীত হয় তাহা ওজন করিলে আধপোয়া হয় না কেন? বস্ত্ররূপ একটী নূতন দ্রব্যের উৎপত্তি হইল অথচ তাহার পরিমাণটা গেল কোথা? এ সমস্যার উত্তর কে দিবে? কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করিতে গেলে আর এক বিষম সমস্যা আসিয়া পড়ে, তাহাও বলি।

তন্তু হইতে পট উৎপন্ন হয়, ঘট উৎপন্ন হয় না কেন একথার উত্তর কি বল দেখি? তুমি বলিবে "তন্তুর সহিত পটের কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে ঘটের সঙ্গে তন্তুর কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধ নাই এই কারণে তন্তু হইতে পটই উৎপন্ন হয় ঘট উৎপন্ন হয় না" এ উত্তরটী কি প্রকৃত দার্শনিকের উত্তর হইল? না, কখনই নহে। কেন তাহা বলি: সম্বন্ধ থাকিলে সম্বন্ধী থাকিবেই। সংযোগ একটী সম্বন্ধ, ভূতল ও ঘট এই দুইটী সম্বন্ধী যদি পূর্ব্বে থাকে তাহা হইলেই ভূতল ও ঘটের সংযোগ হইতে পারে, ঘট না থাকিলে ভূতলের সহিত ঘটের সংযোগ হইল একথা যে বলিবে তুমিই তাহাকে উন্মত্ত বলিয়া উপহাস করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। এক্ষণে বল দেখি তন্তুর সহিত পটের কার্য্যকারণভাবরূপ একটী সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তন্তু হইতে পট উৎপন্ন হয়, ইহাও একপ্রকার পাগলের কথা না হয় কেন? তুমি বলিতেছ পট ছিল না পরে উৎপন্ন হইবে, অথচ বলিতেছ তন্তুর সহিত পটের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তন্তুতে পটের উৎপত্তি হইবে। কি সুন্দর যুক্তি! পট নাই অথচ পটের সহিত তন্তুর সম্বন্ধ আছে, উৎপত্তির পূর্ব্বে ত পট গগনকুসুমের ন্যায় অসৎ। ইহা তুমিই বলিয়া থাক, অসতের সঙ্গে সতের একটা সম্বন্ধই যদি মানিলে তবে গগনকুসুমের মালায় গাঁথিয়া আপনাকে সৌভাগ্যান্বিত বোধ করিতে এত আপত্তি কর কেন তাহা বলিতে পার?

দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে বস্তুমাত্রেরই স্বভাব এই যে, উহা কোন বস্তু হইতে ভিন্ন এবং কোন বস্তু হইতে অভিন্ন, যেমন ঘট, ঘট হইতে অভিন্ন এবং পটাদি হইতে ভিন্ন, কিন্তু যে বস্তু কোন একটি বস্তু হইতে ভিন্নও নহে অভিন্নও নহে, তাহার সত্তা অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বদর্শিত যুক্তিগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যায় যে পট প্রভৃতি কার্য্য তন্তু প্রভৃতি কারণ হইতে ভিন্নও বলিতে পারা যায় না অভিন্নও বলিতে পারা যায় না। তাহাই যদি হইল তবে পটাদি কার্য্যের সত্তা নির্ণীত হইল না অথচ এই পট লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক অনাদিকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তাহাও স্থির। যাহাকে লইয়া ব্যবহার তাহার স্বরূপ কেহই জানে না। তাহা সৎ কি অসৎ তাহাও স্থির করিবার উপায় নাই, অথচ তাহারই উপর অনন্ত সম্বন্ধের আরোপ করিয়া জীব, শোকের সমুদ্রকে ক্রমেই গভীরতর করিতেছে, ও তাহাতে ডুবিতেছে, এই এক বিচিত্র ব্যাপার। এই এক বিরাট সুবিশাল, অনাদি ও অনন্ত ইন্দ্রজাল! তুচ্ছ ঐন্দ্রজালিক বস্তুর সহিত সকল প্রকার সম্বন্ধের প্রত্যাখ্যান করিতে আমরা অণুমাত্রও বিলম্ব করি না, কিন্তু আদি ও অন্তহীন সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসংহারক

(৭১তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৬৩৮)

ইন্দ্রজালের জালে আবহমান কাল হইতে বেষ্টিত হইয়াও আমরা ইহার প্রতি ক্ষণকালের জন্য অবিশ্বাস করি না আরও বদ্ধ হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, এক কথায় বলিতে গেলে এই ইন্দ্রজালময় ব্যবহারই জীবের সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। কেন যে এমন হয় ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে ?

রামকৃষ্ণ মিশন।

দুই বৎসর আমেরিকায় দক্ষতার সহিত বেদান্ত প্রচার করিয়া স্বামী অভেদানন্দ গত ২২শে অক্টোবর হইতে নিউইয়র্কের ম্যাডিসন এভিনিউস্থ টিউক্সোজ হলে প্রতি রবিবার ৩টার সময় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি রবিবার ব্যতীত অন্যান্য দিন মধ্যে মধ্যে বেদান্ত সভার পুস্তকাগার গৃহে বক্তৃতা ও শিক্ষা দিবেন।

স্বামী সারদানন্দ বাগবাজার ৫৭ নং রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীট ভবনে গত ২১শে জানুয়ারী ও ১১ই ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে 'গীতা ও গীতাকার' এবং 'সংসার ও ধর্ম্ম' সম্বন্ধে দুইটী সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন।

অদ্বৈত আশ্রম।
হিমালয়।

হিমালয় নামটী শুনিবা মাত্র হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক দেবভাবের উদয় হয়; নানাপ্রকার পবিত্রতার কথা উদ্দীপিত হইয়া উঠে; প্রাণ যেন স্বতঃই সেইদিকে ধাবিত হয়; মন আর এখানে থাকিতে চাহে না, এ পৃথিবীর কোলাহলে—এ সংসারের আবর্জ্জনামধ্যে আর বাস করিতে চাহে না। ভীষণ উদ্বেলিত অশান্তি-সাগরে জীব অধিক কাল নিমগ্ন থাকিতে পারে না; নিয়ত ত্রিতাপে তাপিত আত্মা এ দেহপিঞ্জরে আর অধিক আবদ্ধ থাকিতে অক্ষম হইয়া পড়ে,—একবার কোনও মতে গাত্রকে ভাসমান করতঃ সেই স্ব-স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মায় লীন হইয়া চির বিমল শান্তিতে মিশিয়া যাইতে বাঞ্ছা করে। এই অনিত্য সংসার ছাড়িবার জন্য, দুর্ভেদ্য মোহপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য, জীব—দূরে পলাইতে চেষ্টা করে; কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে তাহার মতি হয়; তাই, কোন কোন তৃষিত প্রাণ-- মায়াজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া দেবভূমি-হিমালয় প্রবেশার্থ ধাবমান হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্বর্গোপম শোভায় বিভূষিত শান্তিনিকেতন-হিমালয়—ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ "তপোভূমি"—সন্ন্যাসিগণের কতই ঈপ্সিত স্থান, যোগিগণের অহো কি পবিত্র ধাম! বাদরায়ণ বেদব্যাসের যোগাশ্রম অদ্যাপিও যথায় বিদ্যমান, যথায় নরনারায়ণ স্বয়ং অদ্যাপি তপস্যাচরণ করিতেছেন বলিয়া প্রবাদ, ভারতীয় হিন্দুগৌরবের উচ্চতম সেই আদিম স্থানে, শান্তির জন্য ব্যাকুলান্তঃকরণে দৌড়াইতে, কোন্ তাপিত প্রাণে প্রবল বাসনা জাগিয়া না উঠিবে ?

পুরাকালে সেই হিমাদ্রির গুহায় গুহায়, শিখরে শিখরে, কত মুনি ঋষির পবিত্র

আবাস-স্থান ছিল। দেহাদিভাব হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত, অনাদিকাল অবধি বিদ্যমান এই অবিদ্যা-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিবার বাসনায়, ঘোর দ্বৈতমায়ায় আবদ্ধ এবং নানা-প্রকার মনোমালিন্য ও কুসংস্কারাদিতে জড়ীভূত কত শত জন সদুপদেশলাভার্থ তথায় গমন করিতেন; কত শত ব্যক্তি তাঁহাদিগের শান্তিময় আশ্রমে যাইয়া জ্ঞান লাভ করিয়া আসিতেন।

যে জ্ঞান লাভ করিলে আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না, যে জ্ঞান লাভ করিলে গতাগতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, যে জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইলে অন্ধকার অপসৃত হয়—স্ব স্বরূপ প্রতিভাত হয় এবং মহৎ সত্য বিকাশিত হয়, "যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখম্। যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥ যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্‌ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ। যজ্‌জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ", সেই অমৃতস্বরূপ অদ্বৈত জ্ঞান আজও ভারত হইতে অন্তর্হিত হয় নাই!—আজও সে জ্ঞানের চর্চ্চা স্তম্ভিত হয় নাই। যে জ্ঞানের দ্বারা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া যায়, যে জ্ঞানের দ্বারা আত্মপর জ্ঞান সমস্ত ভেদাভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া কেবল একমাত্র পরমাত্মারই অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, শোক মোহ ভয় প্রভৃতির সম্ভাবনা আর তিলমাত্রও থাকে না—("যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"॥) সেই একমেবাদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় জ্ঞান মানবীয় দৌর্ব্বল্যাদি দূরীকৃত করিয়া আজ অনেকের অন্তরে পুনঃ জাগরিত; পুনরায় সেই পুরাকালের মুনিঋষিদিগের ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত; আজ আবার সেই "অদ্বৈত কেশরী" গর্জ্জিত। দেশদেশান্তরে সেই গর্জ্জন প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সে গর্জ্জন কেবল ভারতে আর আবদ্ধ নাই, এসিয়া ইউরোপ আমেরিকা ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক নরনারীর অন্তরে আজ সেই অমিয় জ্ঞানচর্চ্চার বাসনা উত্তেজিত।

যাহাতে সেই অদ্বৈতবাদিগণ, নিষ্ঠার সহিত নির্ব্বিঘ্নে একাত্মজ্ঞান-সাধনা দ্বারা নিজ নিজ আত্মার উন্নতিপথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারেন, পবিত্র হিমালয়ের এক স্বাস্থ্যকর স্থানে, এমত একটী আশ্রম, স্বামী স্বরূপানন্দ এবং মান্যবর মিষ্টার ও মিসেস সেভিয়ার কর্ত্তৃক, শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশানুযায়ী, স্থাপিত হইয়াছে। জনসাধারণের ভিতর যাহাতে এই অনুপম জ্ঞানের বিস্তার হয়, এমতভাবে উক্ত আশ্রম হইতে পুস্তিকাদি প্রকাশিত হইবে এবং সুশিক্ষিত অদ্বৈতবাদিগণকে চতুর্দ্দিকস্থ দেশদেশান্তরে প্রেরণ করা হইবে। স্বদেশীয় বিদেশীয় নরনারী সকলকেই নির্ব্বিশেষে সমভাবে যাহাতে রীতিমত অদ্বৈতশিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত তথায় হইতেছে। যাঁহাদিগের অদ্বৈতজ্ঞানে বিশ্বাস ও আস্থা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত আশ্রমে যোগদান করিলে আশ্রমস্থ সকলে অতিশয় আনন্দিত হইবেন।

উক্ত আশ্রমের নাম "অদ্বৈত আশ্রম" বলিয়া এবং তথায় কেবলমাত্র অদ্বৈতজ্ঞানের চর্চ্চা হয় বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি উক্ত আশ্রমাধ্যক্ষগণের বা আশ্রমবাসিগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা নাই। তাঁহারা সকল সম্প্রদায়কেই যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকেন। যাঁহারা ঐ আশ্রমের নিয়মাবলী জানিতে ইচ্ছা করেন,—"অধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, কুমাউন, হিমালয়" এই ঠিকানায় লিখিলে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইবেন।

(৭৯তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৬৮০)

কোলে
বিস্কুট
লজেন্স
জ্যাম জেলী আচার
স্কোয়াশ
ORANGE SQUASH
GUAVA JELLY
K B—3/74/B.

গোপাল
Gopal
মার্কা
গেঞ্জি
মোজা

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই); ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১৬৭ মূল্য ৬'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। (যন্ত্রস্থ)

গুণাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৭৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৮০, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ-প্রসঙ্গ—(ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে— স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০,

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

'উদ্বোধন' ১ম বর্ষ (পুনর্মুদ্রণ)। (যন্ত্রস্থ)

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৭৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাসিষ্ঠসারঃ—স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি—স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬০, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০; ৩য় অঃ ১৩'০০; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮১, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ-চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। (ছাপা নাই)

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ২'০০ (ছাপা নাই)

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৬২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

COVER PRINTED BY—

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্ট্রীগণের পক্ষে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কতৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·২০ টাকা

উদ্বোধন

উত্তিষ্ঠত
জাগ্রত
প্রাপ্য
বরান্
নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৭৯তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাষিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সংবাদ দিবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥০টা হইতে ১১টা; বিকাল ২॥০টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

কয়েকখানি নিত্যসঙ্গী বই ঃ

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫৲ টাকা; প্রতি খণ্ড—১৪৲ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। রাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম খণ্ড): ১ম ভাগ ১৯.০০, ২য় ভাগ ১৭.০০। সাধারণ: ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৭.৮০, ৩য় খণ্ড ৫.২০, ৪র্থ খণ্ড ৭.০০, ৫ম খণ্ড ৭.৫০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। ২৬৲ টাকা

শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। ১৫৲ টাকা

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—প্রথম ভাগ ৭৲ টাকা: ২য় ভাগ ৬.৫০ টাকা

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত।
১ম ভাগ ১১৲ টাকা; ২য় ভাগ ৭.৫০ টাকা; তৃতীয় ভাগ ৭.৫০ টাকা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত ৭.৮০ টাকা

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত। ৬.৪০ টাকা

উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন, পৌষ, ১৩৮৪

সূচীপত্র

পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জী
সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

দিব্য বাণী

সমাধিমথ কর্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়েনাস্তসর্বাস্থো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ॥
নৈষ্কর্ম্যেণ ন তস্যার্থো ন তস্যার্থোঽস্তি কর্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্বাসনং মনঃ॥

—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, ৪।৫৭।২৬,২৭

সকল-কামনা-শূন্য যাঁহার হৃদয়
মুক্ত তিনি নিঃসন্দেহে, উত্তম-আশয়।
রন কর্মরত, কিংবা সমাধি-সম্বল
ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নাই, নাই ফলাফল।

মন্ত্রজপ-অনুষ্ঠানে চিত্ত-সমাধানে
কর্মপরিত্যাগে কিংবা কর্ম-অনুষ্ঠানে
প্রয়োজন নাই তাঁর—নাই লাভক্ষতি
(তৃপ্ত, কৃতকৃত্য) যাঁর নির্বাসনা মতি।

কথাপ্রসঙ্গে

'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী'

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় আছে: "জ্ঞান হ'লে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। 'মা', 'মা'—শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়।"

'টীশ্বর'-শব্দটির অর্থ-নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ বাংলা ব্যাকরণের প্রসঙ্গে আসিতে হয়। মূল শব্দের অর্থকে প্রসারিত করিতে ট-বর্ণ-যোগে 'অনুকার'-শব্দসৃষ্টি বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। 'চা-টা', 'ভাত-টাত' ইত্যাদি শব্দদ্বৈত বা দ্বন্দ্ব-সমাসবদ্ধ পদগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়। অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

'টীশ্বর'-শব্দটির অর্থ—আমাদের মতে—জীব ও জগৎ। সুতরাং শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখোচ্চারিত প্রথম বাক্যটির অর্থ হইল: জ্ঞান হইলে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ উড়িয়া যায়।

কেহ কেহ হয়তো আপত্তি করিয়া বলিবেন. 'টীশ্বর'-শব্দটি কথার মাত্রা মাত্র—উহার কোনও অর্থ নাই। সেক্ষেত্রে অব্যবহিত পরবর্তী 'সব'-শব্দটির প্রতি আপত্তিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। 'টীশ্বর'-শব্দটি যদি নিরর্থকই হয়, তাহা হইলে 'সব'-শব্দটির প্রয়োগও অনর্থক হইয়া পড়ে। আর—টীকাভাষ্যকারগণের তর্ক-পদ্ধতির অনুসরণে—একান্তই যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, শ্রীশ্রীমায়ের কথাটির পর্যবসান, 'জ্ঞান হ'লে ঈশ্বর উড়ে যাম', শুধু এইটুকুতেই, তাহা হইলেও বিন্দুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না অর্থের দিক হইতে—অর্থ সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতই থাকে। কারণ, ঈশ্বর না থাকিলে জীব ও জগৎ থাকিতেই পারে না, যেমন জীব ও জগৎ না থাকিলে ঈশ্বরও থাকিতেই পারেন না। জীব ও জগৎ আছে বলিয়াই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। প্রজা ও রাজ্য থাকে বলিয়াই রাজা। নতুবা কিসের রাজা! আচার্য শংকর তাঁহার গীতাভাষ্যে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন যে—

> (ব্যবহারদশায়) ঈশ্বর জীব ও জগৎ—এই তিনই নিত্য এবং যাঁহারা বলেন যে, জীব ও জগৎ নিত্য নহে, ঈশ্বরই নিত্য, তাঁহারা ভ্রান্ত, কারণ জীব ও জগৎ নিত্য না হইলে জীব-জগতের উৎপত্তির পূর্বে ঈশিতব্য কিছুই না থাকায় ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না।

বস্তুতঃ 'ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী'—ইহার অর্থ এই নয় যে, জীব-জগৎ একেবারেই ছিল না, শুধু ঈশ্বরই ছিলেন এবং তিনি জীব-জগৎ সৃষ্টি করিয়া পালন ও সংহার করেন। প্রলয়কালেও জীব-জগৎ অব্যাকৃতভাবে বিদ্যমান থাকে। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—এই তিনের কোনটিই একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ 'আমি' আছি, ততক্ষণ ঈশ্বর, জীব ও জগৎ আছেই। 'আমি'র লোপ হইলে ঈশ্বর, জীব ও জগৎ যুগপৎ লোপ পায়। উহাই পূর্ণজ্ঞানের অবস্থা। 'অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী' শ্রীমা সারদাদেবী এই চরম জ্ঞানের কথা—পরমার্থ-দশায় যে ঈশ্বর-জীব-জগৎ নাই, এই কথাই প্রথম বাক্যটিতে বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় বাক্যটি হইল: 'মা', 'মা'—শেষে দেখে মা আমার জগৎ জুড়ে!

প্রশ্ন উঠিবে, প্রথম বাক্যটির উপরি-উক্ত ব্যাখ্যার সহিত দ্বিতীয় বাক্যটির সঙ্গতি

কোথায়?—ঈশ্বর, জীব ও জগৎ নাই, সুতরাং 'জগৎ জুড়ে' বলার অর্থ কী? ইহার উত্তরে বলা যায়, প্রথম বাক্যটির আমরা যে-ব্যাখ্যা দিয়াছি, তাহা যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় বাক্যটিও তদনুসারেই ব্যাখ্যেয়। এইরূপ ব্যাখ্যা-প্রণালী আমরা আচার্যগণের টীকা-ভাষ্যে ভূরি ভূরি পাইয়া থাকি। পরমার্থদশায় যে এক অখণ্ড সত্তা বিরাজমান, তিনিই 'মা'—'নির্গুণা' মা। তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোন সত্তা নাই। সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্যা সেই 'মা'-ই একমাত্র সদ্‌বস্তু। তাই উপসংহারে তৃতীয় বাক্যে সেই কথাই শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: 'সব এক হয়ে দাঁড়ায়।'

শ্রীশ্রীমা যে 'জগৎ জুড়ে' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার দ্বারা অদ্বৈতবাদ ভিন্ন অন্য কোনও বাদের প্রসঙ্গ উঠিতেই পারে না, কারণ তাহা হইলে উপক্রমের সহিত উপসংহারের সঙ্গতি থাকে না। কোনও ভাষার দ্বারাই মন-বাণীর অতীত সত্তাকে বুঝানো যায় না। তথাপি ভাষাকে অবলম্বন করা ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ই তো নাই! যখন শিবসংহিতা বলিতেছেন, 'একঃ সত্তা-পূরিতানন্দরূপঃ/পূর্ণো ব্যাপী বর্ততে নাস্তি কিঞ্চিৎ', তখন 'ব্যাপী'-শব্দটির তাৎপর্য কী? পূর্ণানন্দস্বরূপ এক সত্তাই আছেন, আর কিছুই নাই। তাহা হইলে কে কাহাকে ব্যাপ্ত করিবে? ব্যাপ্য, ব্যাপী, ব্যাপকতা যেখানে নাই, সেখানে 'ব্যাপী'-শব্দের প্রয়োগ কীভাবে হইতে পারে? এ সকলই ভাষার অক্ষমতা। তথাপি সেই ভাষা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শিবসংহিতার 'ব্যাপী' আর শ্রীশ্রীমায়ের 'জগৎ জুড়ে'—দুই-ই সমার্থক এবং সম-উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত। উদ্দেশ্য—বাক্যমনাতীত অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বকে সাধকের বুদ্ধিতে আরূঢ় করানো।

যে চরম জ্ঞানের কথা শ্রীশ্রীমা উল্লিখিত প্রথম বাক্যটিতে এবং উহারই ব্যাখ্যাত্মক দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে বলিয়াছেন, তাহার প্রাপ্তির প্রথম সোপান হইল দেহের নশ্বরত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করা। এইরূপ চিন্তন বা মননকেও 'জ্ঞান' বলে। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়েও দেখা যায়, শ্রীভগবান জ্ঞানের উপায়কেই 'জ্ঞান'-শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। চরম জ্ঞানের সাধন এই জ্ঞানের কথা জ্ঞানদায়িনী শ্রীশ্রীমা সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন: 'কিসের দেহ, মা, দেড় সের ছাই বই তো নয়—তার আবার গরব কিসের? যত বড় দেহখানাই হোক না, পুড়লে ঐ দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা!'

দেহের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তার ফলে দেহ গেহ ও অর্থাদির প্রতি আসক্তি ক্রমশঃ তিরোহিত হয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বলা হইয়াছে, 'শরীরনাশদর্শিত্বাদ্ বাসনা ন প্রবর্ততে।' অর্থাৎ শরীর যে নশ্বর, এই দৃষ্টির ফলে বাসনা প্রবৃত্ত হয় না। এখানে 'বাসনা'-শব্দটির অর্থ ভোগের সংস্কার। দেহের নশ্বরত্বের দর্শন অর্থাৎ চিন্তার ফলে বাসনা যে একেবারেই নিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। এইজন্য জনৈক বিদগ্ধ শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকার উক্ত শ্লোকার্ধের অনুবাদ করিয়াছেন—'শরীরের নশ্বরত্ব চিন্তা করিলে বাসনা প্রবলভাবে উদ্রিক্ত হয় না।' বস্তুতঃ বাসনা সূক্ষ্মাকারে থাকিয়াই যায়। বৈদিক কর্মকাণ্ডীদের মনোভাবই এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শংকরাচার্য লিখিয়াছেন—

'প্রোক্তোঽপি কর্মকাণ্ডেন হ্যাত্মা দেহাদ্বিলক্ষণঃ।
নিত্যশ্চ তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে দেহপাতাদনন্তরম্॥'

অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডেও বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, আত্মা দেহ হইতে পৃথক্ ও নিত্য এবং দেহান্তের পর স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ

করেন। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই ইহলৌকিক ভোগকুণ্ঠ কর্মকাণ্ডীরা পারলৌকিক সুখের আশায় ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে যাগযজ্ঞাদি করিতেন এবং বর্তমানে বৈদিক যাগযজ্ঞ লুপ্তপ্রায় হইলেও উহারই স্মারক আয়াস-বহুল যে-সকল ধর্মীয় কৃত্য ও নিত্যপূজার্চনা প্রচলিত দেখা যায়, পরম অনুরাগের সহিত অনুষ্ঠিত সেই সকল ক্রিয়াকলাপ অধিকাংশক্ষেত্রেই সকাম— ইহলৌকিক ভোগবাসনার পরিপূর্তির জন্য না হইলেও পারলৌকিক ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যেই সাধিত হইয়া থাকে।

কিন্তু বাসনা নির্মূল না হইলে মুক্তি নাই— দেহান্তের পর আমরা যে সুখময় লোকেই যাই না কেন, তাহা হইতে এই সুখদুঃখময় পৃথিবীতে 'ঘটীযন্ত্রবৎ' গমনাগমন সুনিশ্চিত এবং জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-জনিত দুঃখকষ্ট ও শোকমোহাদিও অনিবার্য। তাই জ্ঞানের শেষ সাধনা হইল বাসনাকে নির্মূল করা। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি: 'নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেন না বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বারবার জন্ম-মৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।'

বাসনারাহিত্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা যে-কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা উপনিষদ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি জ্ঞানগ্রন্থগুলিতে বারংবার পাই। কঠোপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিতেছেন—

'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥'

অর্থাৎ মনুষ্যহৃদয়ে যে-কামনাসমূহ বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত কামনা যখন সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন মরণশীল মানুষ এই দেহেই ব্রহ্মকে লাভ করে ও মুক্ত হয়।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আছে, বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন—

'তস্মাদ্ বাসনয়া বদ্ধং মুক্তং নির্বাসনং মনঃ।
রাম নির্বাসনীভাবমাহরত্ব বিবেকতঃ॥'

—হে রাম, যেহেতু বাসনার দ্বারাই মন বদ্ধ হয় এবং বাসনাশূন্য মনই মুক্ত, সেই হেতু তুমি বিবেকসহায়ে বাসনারাহিত্য আহরণ কর।

গীতাতেও শ্রীভগবান বলিতেছেন—

'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥'

আপাতদৃষ্টিতে শ্লোকটির এইরূপ অর্থ করা যায়: 'হে অর্জুন, কোন ব্যক্তি যখন মনোগত সমস্ত বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার বাসনাশূন্য শুদ্ধ মন যখন নিজ আত্মাতেই তৃপ্ত হয়, তখনই তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন।' কিন্তু শ্রীভগবান আলোচ্য শ্লোকটির কয়েকটি শ্লোকের পরেই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ব্যতীত বিষয়রস চিরতরে উচ্ছিন্ন হয় না। এই কারণে ব্যাখ্যাকারগণ আমাদের আলোচ্য শ্লোকটির ব্যাখ্যায় জানাইয়াছেন যে, শুদ্ধান্তঃ-করণ ব্যক্তি যখন আত্মাতেই তৃপ্তিলাভ করেন, মাত্র তখনই তাঁহার মনোগত সমস্ত বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হওয়ায় তিনি প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হন। সমস্ত বাসনা সর্বথা পরিত্যাগের আর অন্য কোন উপায়ই নাই। এই কথা শ্রীশ্রীমা-ও বলিয়াছেন, "যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে, ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই।" এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—"'আমি' থাকতে ব্রহ্মদর্শন হয় না।" সুতরাং 'আমি' না গেলে, নির্বিকল্প সমাধি না হ'লে—ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার না হলে—'নির্বাসনা' হওয়া যায় না। কিন্তু উহা তো অনেক দূরের কথা! তাই অভয়দায়িনী শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, যদি কেহ ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া বাসনারহিত হইতে আপ্রাণ চেষ্টা করে, ঈশ্বরই তাহাকে রক্ষা করেন —যে-সকল বাসনা তাহার মনে এখন উঠিতেছে, সেগুলি তাহার কিছুই করিতে পারিবে না, কালে সমস্তই নির্মূল হইবে। অর্থাৎ মুক্তি তাহার অবধারিত।

'হরিমীড়ে'-স্তোত্রম্

স্তোত্র-রচয়িতা : আচার্য শংকর ; টীকাকার : স্বয়ংপ্রকাশ-যতি

অনুবাদক : স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

টীকা : নন্থ এবম্ আত্মনঃ কর্তৃত্বাদিরূপত্ব-তদ্রহিতত্বোভয়-প্রতিপাদক-শ্রুতি-স্মৃতিষু সতীষু অন্যতর-মিথ্যাত্বং কিম্ ইতি অঙ্গীক্রিয়তে, স্বাভাবিকত্বৌপাধিকত্বাভ্যাম্ উভয়োঃ অপি বাস্তবত্বোপপত্তেঃ। অন্যতর-মিথ্যাত্বে বা অকর্তৃত্বাদেঃ এব মিথ্যাত্বং কিং ন স্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য স্বতোবিরুদ্ধদ্বয়স্য উপাধিতঃ অপি একত্র-ঘটনাঽসম্ভবাৎ ; স্ফটিকে ঔপাধিক-রক্তিম্নঃ বাস্তবত্বাদর্শনাৎ ; কর্তৃত্বাদেঃ বাস্তবত্বে চ সুষুপ্ত্যাদৌ অপি তৎপ্রসঙ্গাৎ ; কর্তৃত্বাদেঃ এব কার্য কারণান্বয়-ব্যতিরেকানুবিধান-দর্শনাৎ। সূত্রকারেণ অপি 'যথা চ তক্ষোভয়থা' [ব্র. সূ. ২।৩।৪০] ইতি অনেন সূত্রেণ যথা লোকে তক্ষা বাস্যাদিকরণহস্তঃ কর্তা দুঃখী ভবতি। সঃ এব বিমুক্ত-বাস্যাদিকরণঃ স্বস্থঃ সুখী ভবতি। এবম্ অবিদ্যা-প্রত্যুপস্থাপিত-কার্যকারণোপাধিকঃ আত্মা স্বপ্ন-জাগরিতয়োঃ কর্তা দুঃখী ভবতি। সঃ এব তচ্ছ্রমাপনুত্তয়ে স্বাত্মানং পরং প্রবিশ্য বিমুক্ত-কার্যকারণসংঘাতঃ অকর্তা সুখী ভবতি ইতি কর্তৃত্বস্য ঔপাধিকত্বোক্তেঃ ঔপাধিকস্য চ সত্যত্বানুপপত্তেঃ, অনুভবস্য চ তৎ-পর-শ্রুতি-বিরোধেন ভ্রান্তিত্বাৎ কার্যকারণোপাধি-কৃতং ভ্রান্তম্ এব আত্মনঃ কর্তৃত্বাদি, ন পারমার্থিকম্ ইতি অভিপ্রেত্য আহ—

(মূলস্তোত্রম্ :)

পশ্যন্ শৃণ্বন্নত্র বিজানন্ রসয়ন্ সন্
জিঘ্রন্ বিভ্রদ্ দেহমিমং জীবতয়েত্থম্।
ইত্যাত্মানং যং বিদুরীশং বিষয়জ্ঞং
তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৫॥

পশ্যন্ ইতি। **ইমং দেহং** কার্যকারণসংঘাতং **জীবতয়া** প্রবিশ্য **বিভ্রৎ** আত্মা **ইত্থং** চক্ষুষোপাধিনা **পশ্যন্** ভবতি। তথা শ্রোত্রোপাধিনা **শৃণ্বন্** শব্দগ্রাহকঃ। তথা **বিজানন্** বুদ্ধ্যুপাধিনা নিশ্চিন্বন্। তথা রসনেন **রসয়ন্** রসং গৃহ্ণন্। তথা ঘ্রাণেন গন্ধং **জিঘ্রন্** ভবতি ন তু স্বতঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ' [কঠ উ. ১।৩।৪] ইতি। অস্যাঃ চ অয়ম্ অর্থঃ—আত্মশব্দেন বুদ্ধিঃ উচ্যতে। বুদ্ধ্যাদ্যুপাধি-যুক্তম্ আত্মানং কর্তা ভোক্তা ইতি আহুঃ। অথবা আত্মা জীবঃ ইন্দ্রিয়-মনোযুক্তং, প্রথমার্থে দ্বিতীয়া ছান্দসি ; ইন্দ্রিয়াদিযুক্তঃ সন্ ভোক্তা ইতি। এবং **বিষয়জ্ঞম্ আত্মানং যম্ ঈশম্** এব বিদুঃ স্বেন বাস্তবরূপেণ **তম্** ইতি অর্থঃ ॥১৫॥

টীকানুবাদ : শঙ্কা : এইভাবে আত্মার কর্তৃত্বাদি-রূপ এবং তদ্রহিত-রূপ (কর্তৃত্বাদি-রহিত-রূপ), এই উভয় [-বিধ রূপ-] প্রতিপাদক শ্রুতি- ও স্মৃতি-সমূহ যখন রহিয়াছে, তখন [ঐ রূপদ্বয়ের মধ্যে] একটির মিথ্যাত্ব অঙ্গীকার করা হইতেছে কেন?—যেহেতু [আত্মার] স্বাভাবিকত্ব (স্বাভাবিক অকর্তৃত্ব)- ও ঔপাধিকত্ব ঔপাধিক কর্তৃত্ব)-হেতু উভয়েরই (স্বাভাবিক অকর্তৃত্বের এবং ঔপাধিক কর্তৃত্বের) বাস্তবতা যুক্তিযুক্ত। আর [ঐ উভয়ের মধ্যে] যদি [যে কোন] একটির মিথ্যাত্ব [স্বীকার করিতে] হয়, [তাহা হইলে আত্মার] অকর্তৃত্বাদিরই বা মিথ্যাত্ব [স্বীকৃত] হইবে না কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া [বলা হইতেছে :] স্বভাবতই বিরুদ্ধ দুইটি বস্তুর উপাধির দ্বারাও একত্র অবস্থান অসম্ভব ; [আরও কথা এই যে,] স্ফটিকে ঔপাধিক রক্তিমাভার [কখনও] বাস্তবতা দৃষ্টিগোচর হয় না ; [বিশেষতঃ আত্মার] কর্তৃত্বাদি বাস্তব হইলে সুষুপ্তি প্রভৃতি কালেও তাহা (কর্তৃত্বাদি) সম্ভব হইবে ; [এবং] দেহেন্দ্রিয়াদির সহিতই অন্বয় ও ব্যতিরেক নিয়ম দেখা যায় বলিয়া (দেহেন্দ্রিয়াদির বোধ থাকিলেই কর্তৃত্বাদির বোধ থাকে, দেহেন্দ্রিয়াদির বোধ না থাকিলে কর্তৃত্বাদির বোধ থাকে না বলিয়া) [আত্মার ঔপাধিক] কর্তৃত্বাদির [মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়]।

সূত্রকারও 'যথা চ তক্ষোভয়থা'—এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, লোকে দেখা যায়, [নিজ] বাস্য (সূত্রধরের ছেদনোপযোগী যন্ত্রবিশেষ) প্রভৃতি হস্তে লইয়া সূত্রধর [নিজে] কর্তা-রূপে (ছেদনকর্তা-রূপে) দুঃখী হয় ; [পক্ষান্তরে] সেই সূত্রধরই বাস্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুখী হয়। এই প্রকার অবিদ্যা হইতে সমুৎপন্ন দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মা স্বপ্নে ও জাগরণে কর্তা ও দুঃখী হন। তিনিই আবার সেই ভ্রম স্বপ্ন ও জাগরণের ভ্রম) অপনোদনের জন্য নিজেকে পরমাত্মাতে বিলীন করিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি-সংঘাত-বিমুক্ত অবস্থায় অকর্তা ও সুখী হন ; অতএব কর্তৃত্বাদির ঔপাধিকত্ব বর্ণনা করায় ঔপাধিকত্বের সত্যতার অনুপপত্তিবশতঃ এবং [অকর্তৃত্বাদিবোধক-] আত্মপর শ্রুতির সহিত বিরোধ হওয়ায় অনুভবের ভ্রান্তিত্বহেতু দেহেন্দ্রিয়াদি-উপাধিকৃত আত্মার কর্তৃত্ব প্রভৃতি ভ্রান্তই, পারমার্থিক নহে, এই অভিপ্রায়ে [আচার্য] বলিতেছেন : [মূলস্তোত্র, শ্লোক ১৫, পৃঃ ৬৪৫ দ্রষ্টব্য]।

অন্বয় : ইমং দেহং জীবতয়া বিভ্রৎ ইত্থম্ অত্র পশ্যন্ শৃণ্বন্ বিজানন্ রসয়ন্ জিঘ্রন্ সন্ ইতি যম্ ঈশং বিষয়জ্ঞম্ আত্মানং বিদুঃ, তং সংসার-ধ্বান্ত-বিনাশং হরিম্ ঈড়ে। ১৫।

স্তোত্রানুবাদ : জীবরূপে [প্রবিষ্ট আত্মা] এই দেহকে ধারণ করিয়া এই প্রকারে [বিবিধ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে] দর্শনকর্তা- শ্রবণকর্তা- রসাস্বাদনকর্তা- ও আঘ্রাণকর্তা-রূপে বিদ্যমান থাকেন এবং বিবিধ পদার্থকে জানেন। এইরূপে যে [শুদ্ধ] পরমেশ্বরকে লোকে বিষয়জ্ঞ অর্থাৎ বিষয়ভোক্তারূপে জানিয়া থাকে, সংসারের [কারণীভূত অজ্ঞান-] অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে বন্দনা করি। ১৫।

টীকানুবাদ : পশ্যন্ ইত্যাদি। জীবতয়া—জীবরূপে প্রবেশ করিয়া আত্মা কার্য-কারণসংঘাতস্বরূপ (ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এবং তাহাদের কার্যের সমূহাত্মক) ইমং দেহং—এই দেহকে বিভ্রৎ—ধারণ করিয়া ইত্থং—এইভাবে অর্থাৎ চক্ষুরূপ উপাধির দ্বারা পশ্যন্—দর্শনকর্তা ; শ্রোত্ররূপ উপাধির দ্বারা শৃণ্বন্—শব্দগ্রাহক অর্থাৎ শ্রবণকর্তা ; বুদ্ধিরূপ উপাধির

দ্বারা **বিজানন্**—নিশ্চয়কর্তা ; রসনার দ্বারা **রসয়ন্**—রসগ্রহণকর্তা ; ঘ্রাণের দ্বারা **জিঘ্রন্**—গন্ধগ্রহণকর্তা হন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নহে। এই বিষয়ে শ্রুতি—'দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-যুক্ত আত্মাকেই মনীষিগণ ভোক্তা বলেন।' এই শ্রুতিটির অর্থ এই—[এখানে] 'আত্মা' শব্দের দ্বারা বুদ্ধিকে বলা হইয়াছে। বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির দ্বারা যুক্ত আত্মাকে কর্তা ভোক্তা—এইরূপ বলা হয়। অথবা আত্মার অর্থ জীব ; [এই ব্যাখ্যায় আলোচ্য শ্রুতিতে উক্ত] 'ইন্দ্রিয়-মনোযুক্তং'—এই পদটির দ্বিতীয়া বিভক্তিকে প্রথমা বিভক্তি অর্থে বৈদিক প্রয়োগ [বলিয়া বুঝিতে হইবে] ; ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত হইয়াই [আত্মা] ভোক্তা হন। এইরূপে **বিষয়জ্ঞম্**—বিষয়জ্ঞাতা (বিষয়-ভোক্তা) **আত্মানং যম্**—যে আত্মাকে **ঈশম্ বিদুঃ**—শুদ্ধ বাস্তবস্বরূপ পরমেশ্বর বলিয়াই [সাধকগণ] জানেন, **তম্**—তাঁহাকে (সংসারের কারণীভূত অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশকারী সেই হরিকে) [বন্দনা করি]—ইহাই অর্থ। ১৫। [ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীমায়ের অপ্রকাশিত পত্র

[চন্দ্রমোহন দত্তকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

জয়রামবাটী

১৩২৫।৩ ফাল্গুন

কল্যাণবরেষু

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ—পরে বাবাজীবন আমি দেশে আসিয়া কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে আছি এবং ভাল আছি। শ্রীমতী রাধু পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ভাল আছে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমাদের কুশল লিখিও। বাকী মঙ্গল। ইতি

আশীর্ব্বাদিকা

তোমাদের **মা**

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণং

কোয়ালপাড়া

১৩২৫।১৫ ফাল্গুন

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র পাইয়া লিখিত সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তোমার বাড়ীর খুঁটী পুঁতিবার দিন শরৎ যে ঠিক করিয়া দিয়াছে তাহাই উত্তম। আমি ভাল আছি। শ্রীমতী রাধারাণী এখনও সারে নাই। আর আর সকলে ভাল আছে। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

তোমার

মাতাঠাকুরাণী

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পদভরসা

১৬ চৈত্র*

কোয়ালপাড়া

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন চন্দ্র, তোমার পত্র নলিনীর কাছ হইতে পেয়েছি। আমি রাধুকে নিয়ে বড়ই অস্থিরে আছি বাবা। সেই জন্য উত্তর দিতে পারি নাই, কিছু মনে করিও না। তোমার বাবার অসুখের কথা শুনিলাম। ভয় কি? ভাল যায়গায় আছে, ঠাকুর রক্ষা করিবেন। তোমার বাড়ী যতদিন না হয় ততদিন তাদের কাছে মিনতিভাবে থাকিবে এবং যাতে বাড়ী না হওয়া পর্য্যন্ত সেই বাড়ীতেই থাকিতে পাও তার চেষ্টা করিও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার বাড়ী শীঘ্রই হইয়া যাইবে। তুমি আমার অনেক উপকার কোরেছ। বৌমা দেশে গেছে। কি ছেলে হয় লিখিও। তোমাদের কুশল দিও। এখানের মঙ্গল একরূপ জানিও। নলিনীর এখানে এসে আবার কোমরের ব্যথা হোয়েছিল। আজ একটু ভাল আছে, কিছু অত্যাচার করে নাই। রাধু তেমনই আছে। আমি একরূপ ভাল আছি। আমার আশীর্ব্বাদ সকলকে দিও। সকলকার কুশল দিও। ইতি

তোমাদের

মাতাঠাকুরাণী

চন্দ্রদাদা, তোমার পত্র আমি এতদিন লিখে দিতাম। তবে পিসিমা বড় ব্যস্ত আছেন, সেই জন্য দেরী হইল। ইতি—মাকু

(৪)

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণং

কোয়ালপাড়া

১৩২৬।৩০ জ্যৈষ্ঠ

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্রখানি পাইলাম। আমি উপস্থিত ভাল আছি। শ্রীমতী রাধারাণী পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। তাহার ছেলেটী ভালো আছে। তোমার অসুখের কথা শুনিলাম। কেমন আছ লিখিবে। শ্রীমান শরতের পত্রে তোমাদের সংবাদ পাইতাম। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। বাকী মঙ্গল। ইতি

আঃ তোমার

মাতাঠাকুরাণী

* পোস্টকার্ডটিতে ডাকখানার ছাপ আছে: BAGH-BAZAR CALCUTTA 30 MAR 19 [1919]—সঃ

(৫)

জয় মা

জয়রামবাটী

১৫ই চৈত্র*

কল্যাণবরেষু

বাবাজীবন, তোমার পত্রখানা পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। তোমার বাবাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে ও তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। মোকর্দ্দমার জন্য কোন চিন্তা করিও না। শ্রীশ্রীঠাকুর যাহা করেন তোমাদের মঙ্গলের জন্য, তবে সত্যপথে থাকিবা। অধিক কি। আমি ও রাধু ভাল আছি। যোগেন, গোলাপ প্রভৃতি সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবা।

আশীর্ব্বাদিকা

তোমার

মা

* এই পত্রটির সাল নির্ণয় করা যায় নাই।—সঃ

সেবার প্রতিমা শ্রীশ্রীমা

স্বামী নিরাময়ানন্দ

যেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তেরা ছোট্ট একটু ঠাকুরঘর করেছেন, সেখানেই দেখা যায়—মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বড় ছবি, দক্ষিণে শ্রীশ্রীমায়ের একটু ছোট ছবি আর অন্য ধারে স্বামীজীর ছবি। শ্রীরামকৃষ্ণের দুই প্রকার শক্তি—একটি সূর্যের মতো সারা পৃথিবীতে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছে, অন্যটি নীরবে গৃহকোণে জ্বলেছে প্রদীপের মতো।

এঁরা যে ঠাকুরঘরে পূজা পাবার জন্যেই এসেছেন, তা নয়। যদি আমরা সযত্নে আলোচনা করি, তাহলে দেখব জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এঁরা দেখিয়ে গেছেন, শিখিয়ে গেছেন, কিভাবে পূজা করতে হয়— কিভাবে সেবা করতে হয়—শুধু মন্দিরে অবস্থিত প্রতিমার নয়—মানুষের মধ্যে অবস্থিত দেবতারও।

এখানে আমরা শ্রীশ্রীমার জীবন থেকে দেখব কেমন একেবারে শিশুবয়স থেকে তাঁর জীবনে এই সেবাভাবটি রূপ নিয়েছে। ছোট মেয়ে সারদার প্রথম যে রূপটি ধরা পড়ে, সেটি কন্যারূপ—জননী শ্যামাসুন্দরীর আশেপাশে ঘুরছেন, মায়ের কাজে সাহায্য করছেন, ক্রমশঃ দিদিরূপে ভাইগুলিকে দেখাশুনা করছেন, তাদের চান করাচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন—তারপর ক্রমশঃ যুগাবতারের জায়া ও সহধর্মিণীরূপে তিনি অপরূপা, সেখানেও সেবার ভাবই তাঁর সহজাত ভাব।

তারপর গ্রামের লোকেদের সঙ্গে তাঁর কত সম্পর্ক—দিদি, মাসী, পিসী—সকলেই আসে তাঁর কাছে—হয় কোন সাহায্য পেতে—নয় সান্ত্বনা পেতে। সর্বশেষে আমরা দেখি শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্বজননীর ভাব। সর্বত্র কিন্তু

মূল ভাব হচ্ছে মাতৃভাব। যে মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে রেখে গিয়েছিলেন, সেই মাতৃভাবের মর্মকথা হচ্ছে সেবা। মা তো সন্তানের সেবিকা। মায়েরই সেবায় সন্তান ধীরে ধীরে বড় হয়, ধীরে ধীরে মানুষ হয়। তাই তো স্বামীজী এযুগের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শিখিয়ে গেছেন—'মা, আমায় মানুষ কর।'

তাই বলছিলাম, শ্রীশ্রীমা এ যুগে এসেছেন শুধু ঠাকুরঘরে বসে পূজা পাবার জন্যে নয়। এসেছেন—এই অধঃপতিত যুগের মানুষকে সত্যিকারের 'মানুষ' ক'রে তুলতে, উচ্চতম আদর্শ দ্বারা—সেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ জীবনে পরিণত ক'রে শ্রীশ্রীমা রেখেছেন সন্তানদের জন্য, যাতে তারা সেটি অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও আচরণ ক'রে জীবন সার্থক ক'রে নিতে পারে। শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন স্বামীজী-প্রচারিত নব যুগধর্ম ত্যাগ ও সেবার মূর্তবিগ্রহ, শ্রীশ্রীমা ছিলেন সেই ত্যাগ-সেবাধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি— মূর্তপ্রতিমা।

ছোটবেলা থেকেই দেখা যায়, তাঁর ভেতর এই সেবার ভাব সহজ স্বচ্ছ ভাবে ফুটে উঠেছে। মায়ের বড় মেয়ে বলে তাঁর প্রতিটি কাজে সাহায্য করা থেকে শুরু ক'রে মজুরদের জন্যে খেত-খামারে জলখাবার নিয়ে যাওয়া, তারপর গোরুগুলির জন্যে একগলা জলে দাঁড়িয়ে দল-ঘাস কাটা, প্রতিটি কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পরিপূর্ণ সেবার ভাব।

দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্তেরা খেতে বসেছে—তাঁর দরিদ্র পিতা স্বীয় সঞ্চিত চাল ডাল সিদ্ধ ক'রে খিচুড়ি ঢেলে দিচ্ছেন তাদের পাতে, আর তারা সেই গরম খিচুড়ি গোগ্রাসে খেতে যাচ্ছে। সারদা তাড়াতাড়ি এসে দুহাতে দুখানি পাখা এনে বাতাস করছে—যাতে তাদের খিচুড়ি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কি অপূর্ব সেবা! অনলসভাবে কর্মরতা একটি ছোট্ট মধুর সেবার প্রতিমা।

তার পরের প্রকাশটিও কম মধুর নয়—সাত বছরের বালিকা বধূ সারদা পিত্রালয়ে পা ধুইয়ে দিচ্ছেন শ্বশুরালয়ে সমাগত স্বামী শ্রীগদাধরের। কে তাঁকে শিখিয়ে দিল, পথ-ক্লান্ত স্বামীকে বাতাস করতে? এই ভাবেই শুরু হয়েছিল এই দিব্য দম্পতীর যুগ্মলীলা।

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে শ্রীশ্রীমায়ের যে জীবন সে তো একটি নীরব পরিসেবিকার জীবন—সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য ঔষধ-পথ্য প্রস্তুত করছেন, ডাকলেই আসছেন, পাশ ফিরিয়ে দিচ্ছেন। শত রকমে শুশ্রূষা করছেন—অতন্দ্র ও অনলস ভাবে।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাব ষোলকলায় বিকশিত হয়ে উঠল। ত্যাগী সন্তানদের কল্যাণকামনায় অহরহ প্রার্থনার মাধ্যমেই তো গড়ে উঠল নবযুগের ধর্মসংঘ।

সবশেষে আমরা পাই শ্রীশ্রীমায়ের গুরুভাব—সেও এই মহামাতৃভাবাশ্রিত। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন নিজের শরীরটিকে দেখিয়ে শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, 'এ আর কি করেছে, তোমাকে এর অনেক বেশী করতে হবে।' বলেছিলেন, '...লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিল বিল করছে, তুমি তাদের দেখো।' শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর শ্রীশ্রীমা সারাজীবন তাই ক'রে গেছেন। গুরুরূপে শ্রীশ্রীমা শিশুরূপী ভক্ত সন্তানদের সেবাই করেছেন তাদের মনের উন্নতির জন্য, তবু বলছেন—আমি আর তোমাদের জন্য কতটুকু করছি। মা ছোট শিশুর কত সেবা করেন, তোমরা তো আমার কাছে এসেছ বড় হয়ে। বস্তুতঃ প্রকৃত সেবার

লক্ষণই এই - এর সমাপ্তি নেই, শেষ নেই—চিরবিস্তারের পথে নিয়ে যায় এই সেবাভাব—সীমা থেকে অসীমের পথে।

মাতৃভাব এই সেবাভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত—যে-কথা আগেই বলেছি। সন্তানের সেবা কায়মনোবাক্যে,—সন্তানের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-চিন্তা, তার উন্নতির জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণচেষ্টা এবং কল্যাণবাণী—সব দিয়ে কায়মনোবাক্যে মাতা সন্তানের সেবা করেন।

স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন মহাপুরুষগণ মানবজাতিকে দেখেন তাঁদের সন্তানের মতো—তাঁরা এই সন্তানস্বরূপ মানবজাতির উন্নতির জন্য কাজ ক'রে যান —কথা বলে যান।

বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় আমরা পেয়েছি এক অতি অপূর্ব কার্যকর আদর্শ—ত্যাগ ও সেবার আদর্শ। স্বামীজী এইটিকে আমাদের জাতীয় আদর্শ—জাতীয় শক্তির উৎসরূপে ইঙ্গিত ক'রে গেছেন। এই মহৎ আদর্শের একটি অপূর্ব প্রতিমার প্রতিও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে গেছেন—সেই প্রতিমা সেবার প্রতিমা শ্রীশ্রীমা।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বামীজীর 'ভাব্‌বার কথা' বইটির 'ভাব্‌বার কথা' নামে রসরচনাগুচ্ছ ছাড়া আর সব ক'টি রচনাই মূলতঃ গভীর মননধর্মী। তাদের মধ্যে 'বাঙ্গালা ভাষা'[১] নামাঙ্কিত স্বামীজীর চিঠিটি ছাড়া আর সব রচনাই সাধু ভাষায়। 'বাঙ্গালা ভাষা' রচনাটি মূলতঃ চিঠি—এজন্য চিঠিপত্রের ভাষার সঙ্গে এটি আলোচ্য। তবু, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে এ চিঠির যুগান্তকারী ভূমিকার কথা মনে রেখে ভাষা-প্রসঙ্গে স্বামীজীর হাস্য-রসসৃষ্টির কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা আলোচনা করবো।

চলিত ভাষার সাহিত্যগুণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এ চিঠিতে স্বামীজীর প্রশ্ন—"চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর?" এক্ষেত্রে চলিত ভাষার প্রাণশক্তিতে বিশ্বাসী বিবেকানন্দ সাধু ভাষার কৃত্রিম চালচলনকেই মৃদু বিদ্রূপে 'কিম্ভূতকিমাকার' বলে বিশেষিত করেছেন। তদানীন্তন বাংলা সাধু গদ্য সম্বন্ধে স্বামীজীর আরো তীব্র মন্তব্য—"আমাদের ভাষা—সংস্কৃত গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।" সংস্কৃত-অনুযায়ী বাংলা সাধু গদ্যরীতির ধীরমন্থর গতি প্রসঙ্গে 'গদাই-লস্করি চাল' বিশেষণটি এক নিমেষে চলতি বাংলা বিশিষ্টার্থক বাক্যের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর সার্থকতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লেখায় ও কথায় স্বামীজীর কৌতুকপ্রিয়তার সাক্ষ্য।

ভাষা যতই প্রসাধিত হোক, মহৎ ভাবের প্রকাশক না হলে তার মূল্য বিশেষ থাকে না।

১ বাণী ও রচনা: ষষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং: পৃ: ৩৫-৩৭

ভারতচন্দ্রের কলানৈপুণ্য তাঁকে মহৎ কবিতে পরিণত করে নি। স্বামীজী ভাষার ভাব-গৌরব ও ধ্বনিগৌরব—এ দুয়ের সার্থক সমন্বয়ের কথা মনে রেখে ভাবগম্ভীরতাহীন ভাষার কারিগরিকে বিদ্রূপ করেছেন এইভাবে—"ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান, ভাষা পরে। হীরে-মতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায়?" এই মন্তব্যের আলোকে স্বামীজী সংস্কৃতের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের পার্থক্যটি আশ্চর্য নৈপুণ্যে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের সংস্কৃতে ভাবগৌরবের চেয়ে অলঙ্কার-বাহুল্যের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁকের কথা স্বামীজী এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন—"...যখন মানুষ বেঁচে থাকে, তখন জেন্ত-কথা কয়, মরে গেলে মরা-ভাষা কয়। যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।"

একদিকে স্বামীজী বৈদিক সাহিত্যের 'ব্রাহ্মণ'-অংশের ভাষা, শবরস্বামীর 'মীমাংসা-ভাষ্য', পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' এবং আচার্য শঙ্করের ভাষ্যের প্রাণবন্ত অর্থগূঢ় ভাষার আদর্শের কথা ভেবেছেন, অন্য দিকে অর্বাচীন সংস্কৃতে বাণভট্ট, জয়দেব প্রভৃতির শব্দক্রীড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। শব্দ, অলঙ্কার, উপমা প্রভৃতির আতিশয্য যে আসলে ভাষার দুর্বলতা, সেকথা মনে করিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গনৈপুণ্যে লিখেছেন—"বাপ রে, সে কি ধুম—দশপাতা লম্বা লম্বা বিশেষণের পর দুম ক'রে—'রাজা আসীৎ' !!! আহাহা! কি প্যাঁচওয়া বিশেষণ, কি বাহাদুর সমাস, কি শ্লেষ!! ও সব মড়ার লক্ষণ। যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হ'ল, তখন এই সব চিহ্ন উদয় হ'ল। ওটি শুধু ভাষায় নয়, সকল শিল্পতেই এল।"

সমালোচকরূপে স্বামীজী ভারতশিল্প, ভারতীয় সঙ্গীত, ভারতীয় সাহিত্য সব কিছুরই শ্রেষ্ঠ গৌরবের যুগ ও পরবর্তী অবক্ষয়—এ দুয়ের প্রসঙ্গেই কতখানি সচেতন, তা তাঁর এই ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে পরিস্ফুট। অবক্ষয়যুগের শিল্প ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য—"বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা ক'রে দিলে। গয়নাটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতাপাতা চিত্র-বিচিত্রর কি ধুম!!"

"গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য, তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না; আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল—ছত্রিশ নাড়ীর টান তায় রে বাপ!"

স্বামীজী কথাবার্তার সময় কলকাতার শিমলে-পাড়ার যে বিশেষ ধরনটি ব্যবহার করতেন, তারই অবিকল অথচ সাহিত্যিক প্রয়োগ এই শিল্পসমালোচনায়। এদিক থেকে পূর্বগামী 'হুতোম প্যাঁচা' বা সমকালীন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাপদ্ধতি হাস্যরসসৃষ্টির বিচারে স্বামীজীর ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে তুলনীয়। বিশেষভাবে দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গীর কথাই আমরা এখানে আলোচনা করবো। কারণ 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে বহুখ্যাত রচনাটি স্বামীজী যখন তদানীন্তন 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে আমেরিকা থেকে লিখেছিলেন (২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০০) তার আগেই 'উদ্বোধন'-পত্রিকার প্রথম বর্ষের ২৩ ও ২৪ সংখ্যায় "গত ১৫ই আশ্বিনের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। (সমালোচনা)"—এই নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে ১৩০৬ সালের ৫ঠা বৈশাখ সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত

সভাপতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণটি সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হয়। চলিত ভাষা ও চলিত শব্দ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুরাগ সমর্থন করে ওই প্রবন্ধটির লেখক 'উদ্বোধন'-পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, উদ্বোধনে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের চলিত ভাষায় রচিত 'বিলাতযাত্রীর পত্র' নামে ধারাবাহিক রচনাটির ভাষার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেন।

আমরা এখানে ভাষাবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের গদ্যভঙ্গিমার অন্তর্লীন হাস্যরসের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। যেমন ধরুন, দ্বিজেন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'আর্যামি ও সাহেবিআনা' থেকে একটু অংশ—"আর্যামিও যেমন, সাহেবিআনাও তেমনি—দুইই সমান। দুইই নারিকেলের শাঁস ফেলিয়া ছোব্ড়া ভক্ষণ। আমাদের দেশের জ্ঞান ধর্ম ধৈর্য বীর্য দয়া দাক্ষিণ্য অহিংসা ক্ষমা ঋজুতা এইগুলিই শাঁস, আর টিকি রাখা, ফোঁটা কাটা, ভিতরে পদার্থ নাই, মুখে বামনাই, দলাদলির মোড়লগিরি, এইগুলি ছোব্ড়া; এই ছোব্ড়াগুলিই আর্যামির প্রধান সম্বল। তেমনি আবার উন্নত বিজ্ঞান, উন্নত শিল্প, অটল কর্তব্যনিষ্ঠা, কর্মিষ্ঠতা, কার্য-নৈপুণ্য, তেজস্বিতা এইগুলিই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মূল উপাদান—এইগুলিই শাঁস, আর ইংরাজদিগের ন্যায় জড়ানে-জড়ানে বুলি, ইংরাজদিগের ন্যায় রক্তচলাচলের ব্যাঘাতজনক আঁটাসাঁটা অশোভন পরিচ্ছদ, এইগুলিই ছোব্ড়া, এই ছোব্ড়াগুলিই সাহেবিআনার প্রধান সম্বল। তাই আমরা বলি যে, আর্যামি এবং সাহেবিআনা দুইই এপিঠ্-ওপিঠ্—এ বলে আমায় ছাখ, ও বলে আমায় ছাখ।"

ভাষাভঙ্গীর দিক থেকে উচ্চতম মননের বিষয়কে এমন লঘু পরিহাসে প্রাঞ্জল করে তোলার সৌকর্য সেকালের লেখকদের মধ্যে আর একজনের ছিল—তিনি রাজনারায়ণ বসু। তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ চলতি ভঙ্গীর ব্যবহারে ভাষাকে সাধারণ মানুষের অনেক কাছে নিয়ে এলেন, এই তাঁদের বিশিষ্ট কৃতিত্ব। দ্বিজেন্দ্রনাথ সাধু গদ্যকে কখনই সম্পূর্ণ অতিক্রম করেন নি, স্বামীজী সেদিক থেকে সাধু ক্রিয়াপদের শৃঙ্খল থেকে বাংলা গদ্যকে পুরো মুক্তি দিয়েছেন। ফলে হাস্যরসসৃষ্টিতে তাঁর সার্থকতা আরো অবাধ মুক্তির দীপ্তিসমুজ্জ্বল।

"বাঙ্গালা ভাষা" রচনা বা পত্রটি 'উদ্বোধনে'র সমালোচনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের গদ্যরীতি সম্বন্ধে আলোচনারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় রচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' ভাবাদর্শ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার পাশাপাশি বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের ভাষাভঙ্গী রসাত্মকতার দিক থেকে এবারে উপস্থাপিত করা যাক—

"এ সংসার—'দেখ্ তোর, না দেখ্ মোর', কেউ কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দু-শ হাত দিয়ে দেখছে, খাট্‌ছে; আমরা—'গোঁসাইজী যা পুঁথিতে লেখেন নি'—তা কখনই ক'রব না; করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানে চেষ্টা তো অষ্টরম্ভা; খালি চীৎকার হচ্ছে; বস্! কোণ থেকে বেরোও না—দুনিয়াটা কি দেখ না। আপনা আপনি বুদ্ধিশুদ্ধি আসবে।"[২]

দ্বিজেন্দ্রনাথের রসিকতা বৈঠকী মেজাজের

২ বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃঃ ১৩৮

ধীরগতি মৃদুহাস্যময় পারদর্শিতা, স্বামীজীর রসিকতায় কলকাতায় উত্তরাঞ্চলের রাজপথের তরুণসমাজের দ্রুতগতি চমৎকৃতি! বুদ্ধিগত এই তারুণ্য স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র ভাষায় এক চিরনবীনতা সঞ্চার করেছে। এ ভাষা আজও অনুকরণীয়।

* *

'উদ্বোধন'-পত্রিকায় স্বামীজী ম্যাক্সমুলরের 'The Life and Sayings of Ramakrishna' (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী) গ্রন্থখানির সমালোচনা ১৮৯৯ সালে প্রকাশ করেন। বাংলায় এই সমালোচনাটি নানা কারণে বিশেষ মূল্যবান। বর্ষীয়ান এই ভারতপ্রেমিক ভারতের আধুনিক ধর্মান্দোলন সম্বন্ধে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ইতিহাস-চেতনার সমন্বয়ে যে সব রচনা রেখে গেছেন, তার মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের এই জীবনী-গ্রন্থটি বিশ্বময় শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শ-প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। স্বভাবতঃই সমকালীন দেশী ও বিদেশী সমালোচকের একশ্রেণী তারস্বরে এ গ্রন্থের বক্তব্য ও বিশ্লেষণভঙ্গীর তীব্র প্রতিবাদ করেন।

স্বামীজী নিজে ম্যাক্সমুলরকে এ গ্রন্থরচনার উপাদান সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন। সে উপাদানকে ম্যাক্সমুলর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ক'রে (স্বামীজীর ভাষায় "অধ্যাপকের যুক্তি ও বুদ্ধি-উদূখলে বিশেষ কুট্টিত")[৩] অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক এ গ্রন্থটি রচনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্র-প্রসঙ্গে সেকালের মিশনরী ও ব্রাহ্ম-নেতাদের নানামুখী আক্রমণের উত্তর ম্যাক্সমুলর যে বিশেষ পারদর্শিতার সঙ্গেই দিয়েছেন, সেকথা লিখতে গিয়ে স্বামীজী ব্রাহ্ম আপত্তিকারীদের প্রসঙ্গে তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের শাণিত প্রয়োগ করেছেন। প্রথম আপত্তি, রামকৃষ্ণদেবের ভাষায় গ্রাম্যতা প্রসঙ্গে স্বামীজী কেশব সেনের উক্তি স্মরণ ক'রে দেখিয়েছেন—"শ্রীরামকৃষ্ণের সরল মধুর গ্রাম্য ভাষা অতি অলৌকিক পবিত্রতা-বিশিষ্ট।" চরিত্র ও মহত্ত্বের পটভূমিকায় সাধারণে নিন্দিত শব্দগুলিও রামকৃষ্ণদেবের মুখে এক রমণীয় তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতো। দ্বিতীয় আপত্তি, রামকৃষ্ণদেবের নিজের স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার। ম্যাক্সমুলর কিন্তু সাধকের পক্ষে কামবর্জিত বিবাহসম্বন্ধ সম্ভব বলেই স্বীকার করেছেন, বিশেষতঃ ভারতীয় সাধকদের মধ্যে এ আদর্শ সম্ভব বলেই তাঁর সিদ্ধান্ত। এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য—"অধ্যাপকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক! তিনি বিজাতি, বিদেশী হইয়া আমাদের একমাত্র ধর্মসহায় ব্রহ্মচর্য বুঝিতে পারেন, এবং ভারতবর্ষে যে এখনও বিরল নহে, বিশ্বাস করেন; আর আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীর-সম্বন্ধ বই আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না!! যাদৃশী ভাবনা যস্য ইত্যাদি।"[৪]

'যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ'—এ আদর্শ অনুসারে বিচার করলে ব্রাহ্মসমাজের গৃহকেন্দ্রিক জীবনসাধনা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসের আদর্শ এ দুয়ের মূল পার্থক্যটি পরিস্ফুট হয়। সংসার-জীবনকে যাঁরা সন্ন্যাসের পূতমহিমায় নতুন তাৎপর্য দিয়ে গেছেন -তাঁদের আদর্শকে বুঝতে হ'লে সেই ভাবনার অধিকারী হ'তে হবে। অন্তথায়—'যাদৃশী ভাবনা'—'যেমন ভাব'। [ক্রমশঃ]

৩ তদেব: পৃঃ ১২ 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' এই সমালোচনাটি 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

৪ তদেব: পৃঃ ১৩

যুক্ত ও মুক্ত সত্তা

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি কত ছোট
—এ ভাবভাবনা ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সত্তার হীন বিচ্ছিন্নতা,
নঞ্-তৎপুরুষের অভিজ্ঞতা দীন দর্শনের।
এই দেহভর সত্তা ব্যাপ্ত জলে স্থলে স্থাবরে জঙ্গমে,
আকাশে নক্ষত্রে গ্রহে আলো-অন্ধকারে সর্বব্যাপী।
নিত্য আমি সত্য আমি রুদ্ধ করে আছি মিথ্যাকে দুপাশে,
যুক্ত আমি উত্থানে পতনে পুষ্পে ও কণ্টকে—
নৈঃশব্দ্যে ও বজ্রনাদে উচ্চহাস্যে আর্তনাদে ;
মগ্ন আমি অতলের বীজে ভাসমান পদ্মদলে ;
বদ্ধ আমি বৃক্ষ থেকে মূলে ; যুক্তপক্ষ দিগন্তে ও নীড়ে ;
মাধ্য-আকর্ষণ ছাড়ি চিরমুক্ত অনন্ত ব্যাপ্তিতে।
আমি কতটুকু—একথায় সুখ বড় ছোট ; আহা,
কী আনন্দে যুক্ত-মুক্ত বিশ্বজোড়া মহা ঐকতানে।

মহামন্ত্র

শ্রীমতী মানসী বরাট

ঘুচায় দুখের অনল-দাহ জুড়ায় যন্ত্রণা,
একটি ধ্বনি, পরম ধ্বনি সেই ধ্বনিটি 'মা'।
মাতৃনামের প্রদীপ জ্বেলে, সকল বাধা বিঘ্ন ঠেলে,
আঁধার নিশায় পথ দেখি যে, কারেও ডরি না।

মা যে আছেন ঝঞ্ঝা মাঝে প্রলয় ঘনঘটায়,
মা যে আছেন দূর নীলিমায়—সূর্য-কিরণ-ছটায়।
তপ্ত-তনু-শ্রান্তি-হরা আছেন বৃক্ষ-ছায়,
রুক্ষভূমে বৃষ্টিরূপে করুণ করুণায়।
সকল কাজে তাইতো হৃদয়-তন্ত্রীতে দেয় ঘা,
একটি ধ্বনি, পরম ধ্বনি, সেই ধ্বনিটি 'মা'।

মা

বকলম

তুমি সর্বব্যাপী, তোমার মূর্তি সারা চরাচর—
তুমি জগৎকারণ, সৃষ্টির আধার আকর।
বিশ্বের নিয়ন্ত্রী জননী,
তুমি মহামায়া চিৎশক্তি—নবীনা ও সনাতনী ;
তুমি নিত্যা, তুমি লীলাময়ী—
তুমি সগুণা, তুমি নির্গুণা—একাধারে উভয়ই।
সর্বানুস্যূতা ব্রহ্মরূপিণী
আদ্যা পরাশক্তি জগদ্বিমোহিনী—
তোমাতে মিশ্রিত পরমপুরুষ পরমাপ্রকৃতি ;
জীবধাত্রী, তোমার দক্ষিণ হাতে সৃষ্টি স্থিতি ;
মৃত্যুরূপা, তুমি আকারগ্রাসী লয় ;
তুমি অদ্বয়।

তুমি অরূপা, ভক্তকে কৃপা করে নানা রূপ ধরো :
কঠোর-করাল ও সৌম্যের চেয়েও সৌম্যতর—
যে যেমন রূপ দেখতে চায়, যে ভাবে তোমায় ডাকে,
সে রূপে তুমি দেখা দাও তাকে—
ভগবতী দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী আদি ;
যে উপলব্ধির উপায় নির্বিকল্প সমাধি,
সে পথ মহাবীর সাধকের, দুশ্চর সাধনের—
তাতে অধিকার ক'জনের ?
তাইতো দেবী-মানবীর আধারে, মানবীয় আকারে
তোমার আবির্ভাব হলো এ কষ্টের সংসারে,
এ মর্তের মলিন মাটিতে,
শ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠ 'শিবপুরী' জয়রামবাটীতে।
যে সদা থাকে চিকের আড়ালে
সেই বরাভয়করা জগদম্বা দুহাত বাড়ালে
সংসারী নারীরূপে
মোহবদ্ধ অন্ধকূপে।

যেখানে পোকার মতন লোকগুলো কিলবিল করে,
প্রাণধারণের দুঃসহ দহনে মাথা কুটে মরে,
সেখানে দয়া দিয়ে প্রাণ ধুয়ে দিতে এলে ভালোবেসে—
আদর্শরূপিণী তনয়া গৃহিণী জননীর বেশে।
জগতের যতো না যন্ত্রণা সয়ে, জগজ্জননী,
বলে গেলে : অশান্তি কাকে বলে কখনও জাননি ;
অন্তরে আনন্দঘট পূর্ণ কানায় কানায়—
তা জেনে কে মা তোমায় অশান্তির অছিলা জানায় !
শেখালে : সবকিছু সয়ে যেতে,
জীবনটা ভরে নিতে সন্তোষের ঐশ্বর্যেতে।
বলে গেলে : অদোষদর্শী হতে, হতে নির্বাসনা ;
বললে : ভালো এক ভগবান ছাড়া কাউকে বেসো না ;
সবার প্রতি কোরো করণীয়,
হৃদয় শুধু ইষ্টকে দিও ;
নাম কোরো নিয়ত
ঘড়ির কাঁটার মতো ;
ইষ্টচিন্তা পথরোধ করে অনিষ্টের ;
আর কেউ না থাক, একজন মা আছে সকলের।

শ্রীভগবানের তুমি লীলাবিলাস, লীলাসঙ্গিনী—
তিনি তুমি, তুমি তিনি ;
'কুটোবাঁধা' বধূ, সেবিকা, শিষ্যা, আরাধিতা !
তুমি না জানালে কে জানে তুমি কী তা ?
হরিশকে জানিয়েছিলে জিভ টেনে, বুকে হাঁটু দিয়ে ;
শিবরামকে কৃতার্থ করেছিলে আপনাকে জানিয়ে।
অতীন্দ্রিয় আপ্ত প্রতীতি :
তুমি 'জ্যান্ত দুর্গা', 'সাক্ষাৎ সরস্বতী'।
সীমাহীনা শ্রীমা, তুমি চিরচেনা তবু অচেনা—
তোমার করুণাকিরণ ছাড়া ভ্রমতিমির ঘোচে না।
অপসারিত করো তোমার নিপুণ ছলনাজাল,
মুখ-লুকনো মায়াবী আড়াল।

তোমার উচ্ছলিত স্নেহ ভেদরহিত, অবারিত ঃ
আমজদ, পদ্মবিনোদ, স্বামীজী—তুমি সবারি তো!
বিশ্বশরণ চরণতলে
শুধুই কি হীরে মানিক জ্বলে ?
ঝুটো মুক্তোর, খড়কুটোরও তুমি তীর্থসার ;
তাই দাবি আমার মা বলার।
জ্ঞানদায়িনী করুণারূপিণী নারায়ণী ভগবতী—
নাও ক্লান্ত প্রাণের প্রণতি।
রণছোড় দেউলে মানুষ নিয়েছি তোমার শরণ ;
এ আশ্রয় থাকে যেন মা আমরণ, চিরন্তন!

শ্রীশ্রীমায়ের বাণী*

[দরবারী কানাড়া—একতাল]

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

কর্মফলে দুঃখ পেলে
অন্যকে দোষা করো না।
ঠাকুরের পায় শরণ নিয়ে
তাঁর কাছে জানাও বেদনা

তাঁর কৃপার ভরসা ল'য়ে
সহ্য কর ধীর হৃদয়ে
শ্রীমা বলেন এই উপায়ে
ঘুচে যাবে সব যাতনা ॥

* স্বামী সারদেশানন্দ লিখিত 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা' অবলম্বনে (উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৮৪ সংখ্যা, পৃঃ ৪১১, ১ম স্তম্ভ, ১২-১৭ পংক্তি দ্রষ্টব্য)।

মেরীনন্দন

[পাহাড়ী মিশ্র—একতাল]

শ্রীহরিপদ গোস্বামী

ক্রন্দনময় নিখিল বিশ্বে
এস হে যীশু মেরীনন্দন,
এস হে শীতল কর অন্তর
কর হে ত্রাণ বিশ্বভুবন ॥

প্রেমের মূরতি তুমি হে নাথ,
কর আলোকিত তিমির রাত,
মহিমা তোমার সকল বিদিত
ভকত জনের তুমি হে শরণ ॥

সহিলে কত শত লাঞ্ছনা,
কঠোর পীড়ন অবমাননা,
রুধির-প্লুত ক্রুশ-যাতনা
(তবু) শত ধারে বহে করুণা তোমার।

আজি এ হিংসা-দাবানল মাঝে
এস তুমি চির সুন্দর সাজে,
অসত্য গ্লানি যাক সবই মুছে,
প্রেম অমৃত কর বরিষণ ॥

উদ্বোধনে জননী

শ্রীশেফালিকা দেবী

অনাবিল স্বচ্ছ শান্তি রাজিত শ্রীমুখে,
সমাসীন সুখে
জননী পর্যঙ্ক 'পরে।
চাহে স্নেহভরে
প্রণত তনয় পানে।
আয়ত নয়ানে
সুধাধারা অবিরল ঝরে
সংসার-দাবাগ্নিদাহে তপ্ত চিত 'পরে ;
করে সুশীতল,
তাপিতা ধরণী যথা নব ধারাজল।
রক্তিম সিন্দুরবিন্দু ভালে শোভা পায়
শিশু রবি প্রায়।
খচিত কনকসূত্রে পট্টশাটী পরি'
বিরাজিত রাজরাজেশ্বরী
সুগন্ধি কুসুমমাল্যে ভূষিত ও কায়,
পদে শোভা পায়
বিবিধ কুসুমদল।
বসি থির অচপল,
প্রেমময় অঙ্ক পাতি' ভকতের তরে
ডাকে স্নেহভরে।
আমোদিত কক্ষ মৃদু ধূপের সৌরভে।
তাপিত তনয় যবে
চরণে তোমার
আঁখিবারি দেয় উপহার
রাখিয়া ললাট তব পাদপীঠতলে
সিক্ত করে তপ্ত অশ্রুজলে,
কোমল ও করতল রাখি শির 'পরে
সুধারসে হিয়া দাও ভরে।
চিবুক পরশি' চুম্ব আনন তাহার
পলকে হরণ কর বেদনা অপার,
যত দুখভার।

সারদা-প্রণাম

শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

(আজি) প্রণমি চরণে পরমা প্রকৃতি
সারদা বিশ্ব-জননী।
তুমি মা দুর্গা রাধা সীতা সতী
উমা শঙ্কর-ঘরণী।
তুমি নারায়ণী আদ্যা শক্তি
বিশ্ব-ভুবন-পালিনী
তুমি মা শুভদা অভয়া বরদা—
সারদা মুক্তি-দায়িনী !
সকল বিভূতি স্বরূপ আবরি'
এসেছ ধরায় জননী !
তারিছ সবারে এ ভব-সাগরে
দিয়ে শ্রীচরণ-তরণী।
পরশি' তোমার চরণ দুখানি
ঘুচুক ধরার পাপ-তাপ-গ্লানি
নিখিল-হিয়ায় উজল-বিভায়
নিত্য বিরাজো জননী !
(মাগো) তোমারি পুণ্য চরণ-পরশে
ধন্য হয়েছে ধরণী !

শ্রীমা ঃ শ্রীঠাকুর

স্ব-মো-দে

জয়তু সারদা, শ্রীরামকৃষ্ণ জয়—
সাংসারী গৃহী জনজীবনের
বিগ্রহ বরাভয়।
'যত মত তত পথ' শ্রীরামকৃষ্ণবাণী,
ভজন পূজন সারদা মাতার
জীবনসাধনা জানি;
যুগ-যুগান্ত পূজ্য নমস্য
শাশ্বত অক্ষয়।
স্বর্গ হইতে আসিলে ধরায়
মর্ত্যে লীলার স্থান,
ধর্মের পথে অবোধ মানুষ
লভিল পরিত্রাণ;
বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দ
মন্ত্রশিষ্য হয়।
পরমপুরুষ পাগল ঠাকুর
তীর্থক্ষেত্র কামারপুকুর,
জয়রামবাটী তীর্থভূমির
জনপদ বাঙ্ময়।
প্রণাম জানাই অভয় চরণে
জীবন ধন্য স্মরণ-মননে,
জন-মানসের দিব্য মূর্তি
ভাবের গঙ্গা বয়।

শ্রীশ্রীমাতৃসঙ্গীত

[সাহানা—ঝাঁপতাল]

শ্রীমাধুর্যময় মিত্র

নির্বিচারে বিলাও স্নেহ
দেখে মা বিস্ময় জাগে,
অসৎ ছেলেও সৎ-এর মতোই
কৃপা লভে সম ভাগে।
(তোমার) বিশ্বজোড়া আঁচলখানি
আপামরে নিল টানি,
তাই মা তোমার অভয় পদে
নিখিল শরণ মাগে।
(সারদা জননীপদে নিখিল শরণ মাগে)
ক্লেদলিপ্ত সন্তানে মা কভু তো করে না ঘৃণা,
মুক্ত করে গ্লানিরাশি সযতনে স্নেহাধীনা।
শিশুর মতো নির্ভরতায়
মায়ের শরণ নে না রে ভাই,
মা তো নেবেই ধুয়ে মুছে
যদি আবিলতা লাগে।

ভগিনী সুধীরা ও শ্রীমা সারদাদেবী

শ্রীজহর শীল*

ভগিনী সুধীরা একটি বিস্মৃত-প্রায় নাম। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর কলিকাতায় তাঁর জন্ম। আদি নিবাস হুগলী জেলায় হরিপালের নিকট জেজুড় গ্রামে। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন তিনি।[১] সুধীরা-দেবীর বয়স যখন দুবছর তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। এবং তাঁর চোদ্দ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। শোনা যায় মাত্র ষোল বছর বয়সে একবার কমণ্ডলু ও ত্রিশূল হাতে নিয়ে সন্ন্যাসিনীর বেশে তিনি পুরী যান। তখন ১৯০৫ সাল; পুরী যাবার রেলপথ তখনও হয় নি, পথ ছিল দুর্গম। এই তীর্থযাত্রায় তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন তাঁর এক পিসতুত বোন। পুরী যাবার পথে এক দুষ্ট ব্যক্তি তাঁদের অনুসরণ করলে সুধীরাদেবী ত্রিশূল নিয়ে তাকে ভয় দেখান।

উচ্চ আদর্শে জীবনযাপন করবার অভিলাষ নিয়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম নিবেদিতা বিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৭ নং বোসপাড়া লেনে তখন এই বিদ্যালয়ে ভগিনী নিবেদিতা ও ভগিনী ক্রস্টীন রয়েছেন। তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ান সুধীরাদেবী। এই বিদ্যালয়ের পুরস্ত্রী বিভাগে তিনি বাংলা সাহিত্য পড়াতে শুরু করলেন। গীতা ও অন্য ধর্মপুস্তকও পড়াতেন তিনি। উল্লেখযোগ্য যে, সুধীরাদেবী এই কাজের জন্য কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। অধ্যাপনার অবসরে তিনি নিবেদিতা ও ক্রস্টীনের কাছে ইংরেজী শিখতেন এবং ক্রমশঃ ইংরেজীতে কথা বলতেও পারতেন। ক্রস্টীনকে সুধীরা 'ছোড়দি' বলে ডাকতেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সুধীরাদেবীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবব্রত বসু রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ নামে পরিচিত হন। সুধীরাদেবীও ১৯১০ সালে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শ্রীমার কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেন।† অবশ্য তার কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি বিদ্যালয়ের কাজে অবসর পেলেই শ্রীমার কাছে যেতেন। বিদ্যালয়ের কাজকর্ম নিয়ে মায়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর আলোচনা হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীমায়ের কথাতেই। শ্রীমা বলছেন—'সুধীরা বলেছিল, "মা, আর পারিনে। আমার বড়

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, ইটাচুণা।

১ এই সংবাদ আমরা পাচ্ছি শ্রীলক্ষ্মী সিংহের রচনা 'ভগিনী সুধীরা' থেকে, যা কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল গোল্ডেন জুবিলী সুভেনীর-এ ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু তাঁর পুস্তিকা 'শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনীদেবীর স্মৃতিকথা'য় (পৃঃ ৩) লিখেছেন, সুধীরাদেবী বাগবাজার মহাকালী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন।

ইহাও হইতে পারে যে, সুধীরাদেবী বিভিন্ন সময়ে উভয় বিদ্যালয়েই পাঠ করিয়াছিলেন।—সঃ

† এই প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদের এই † চিহ্নিত স্থান পর্যন্ত পরিবেশিত তথ্য শ্রীলক্ষ্মী সিংহের পূর্বোক্ত রচনা থেকে সংকলিত।

কষ্ট হচ্ছে।'' মেয়েদের জন্যে সে কত কষ্ট করে। যখন খরচ আর চলে না, বড়লোকের মেয়েদের গানবাজনা শিখিয়ে মাসে ৪০/৫০্ টাকা আনে। স্কুলের মেয়েদের সব শিখিয়েছে সেলাই করা, জামা তৈরী করা। সে বছর তিনশ' টাকা লাভ হয়েছিল। ঐ টাকায় ওরা হেথা সেথা যায়—পূজোর সময়। সুধীরা দেবব্রতের (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ভগ্নী। ভাই নিজে স্টেশনে আড়ালে থেকে ভগ্নীকে টিকিট কাটতে, একলা গাড়িতে উঠতে— এসব শিখাতো।'[২] শ্রীমা ও সুধীরাদেবীর মধ্যে সম্বন্ধ কত নিবিড় ছিল, উপরের কথা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরও দেখা যায় যে, নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসাবে কাকে গ্রহণ করা হবে বা হবে না—এই সম্পর্কে সুধীরাদেবীর মত পূজনীয় শরৎ মহারাজের মতের থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তার প্রমাণ আমরা কয়েকটি ছত্র পরেই দিচ্ছি। তার আগে, আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সঙ্গে স্বামী সারদানন্দজীর আজীবন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই বিদ্যালয়ের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন নিবেদিতার প্রধান পরামর্শ- ও সাহায্য-দাতা। প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টাতেই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তখন থেকে ১৯২৬ সালে দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ের সম্পাদকপদে আসীন থাকেন।[৩] ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীমা রয়েছেন কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে। প্রবোধবাবু ও মণীন্দ্রবাবু নামে মায়ের দুজন বিশিষ্ট ভক্ত নিবেদিতা স্কুলে তাঁদের মেয়েদের ভর্তি করতে চান। এ বিষয়ে তাঁরা শরৎ মহারাজকে লিখেছিলেন। শরৎ মহারাজ চিঠির উত্তর দিয়েছেন, তাঁরা সে পত্র মায়ের কাছে নিয়ে এসেছেন। প্রবোধবাবু মাকে সে চিঠিটা পড়ে শোনালেন। পত্রের একজায়গায় শরৎ মহারাজ লিখেছেন—'আমার মত হইলে কি হইবে। বীণাকে (প্রবোধবাবুর মেয়ে) এখানে রাখা সম্বন্ধে ঠাকুরের ইচ্ছা অন্যরূপ।' শ্রীমা এই কথা শুনে বললেন, 'তাইতো, এমন কথাটা কেন লিখলে বল দেখি? একেবারে, কাটিয়ে লিখে দিয়েছে। তা বোধ হচ্ছে সুধীরার মত নেই।'[৪] অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে, ঘটনাটি ১৯১৯ সালের। নিবেদিতা দেহত্যাগ করেছেন ১৯১১ সালে। ক্রিস্টীন ১৯১৪ সালে আমেরিকা যান এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে

২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, দশম সংস্করণ, পৃঃ ৩০১

৩ শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'নিবেদিতা লোকমাতা' গ্রন্থে (পৃঃ ২৩৩-৩৪) নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় পত্রিকা (১৯৬৬) থেকে এই সংবাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

স্বামী সারদানন্দজীর দেহত্যাগ হয় ১৯২৭ সালে।—সঃ

১৯৫২ সালে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির তৎকালীন সম্পাদিকা শ্রীরেণুকা বসু কর্তৃক প্রকাশিত 'রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসর' শীর্ষক পুস্তিকার ২২ পৃষ্ঠায় আছে :

'১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় স্বামী সারদানন্দই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন ও পরিচালিকাগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ উপদেশ প্রভৃতি দিতেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগের পর বিদ্যালয়ের কার্য আশানুরূপ চলিতে থাকে না। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ ইহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় ও যথাযথভাবে বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধন ও পরিচালনার জন্য মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য স্বামী আত্মবোধানন্দ প্রথম সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন।'—সঃ

৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, ১০ম সংস্করণ, পৃঃ ৩০০-১

১৯২৪ সালের আগে তাঁর পক্ষে ফেরা সম্ভব হয় নি। এই সময়টায় অর্থাৎ ১৯২০ সাল পর্যন্ত (১৯২০ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন) সুধীরা-দেবীই বিদ্যালয়, আশ্রমবিভাগ মাতৃমন্দির ও ছাত্রীনিবাসের পরিচালন-কার্যের ভার গ্রহণ করেন।

শ্রীমা সুধীরাদেবীর প্রতি কিরকম স্নেহ-পরায়ণা ছিলেন তার আর একটি প্রমাণ আমরা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' দ্বিতীয় ভাগে পাই। 'যেবার-সিস্টার নিবেদিতার দেহত্যাগ হয়, সেবার সুধীরা দিদির খুব অসুখ হয়। তাঁহার জন্য মার কি ভাবনা!...সুধীরা দিদি আরোগ্যলাভ করিলে তিনি, আমি ও সিস্টার ক্রস্টীন একদিন সন্ধ্যার সময় মার বাড়ী যাইলাম। আরতির পর আমরা প্রণাম করিয়া বসিতেই মা সুধীরা দিদিকে বলিলেন, "সেরেছ মা?" সুধীরা দিদি বলিলেন যে অনেকটা সারিয়াছেন, তবে সাবধানে আছেন। মা বলিলেন, "তোমার জন্য বড় ভাবনা হয়েছিল।...এই নিবেদিতাটি গেল, আবার তোমার অসুখ—শুনে ভাবি, সুধীরা গেলে স্কুল চালাবে কে?"'[৫]

সুধীরাদেবীর দাদা স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী (দেবব্রত মহারাজ) যখন দেহত্যাগ করেন, তখন সুধীরাদি স্থিরভাবেই পাশে বসেছিলেন, কাঁদেন নি। শ্রীমা পরে একথা শুনে বলেছিলেন, 'আহা, একটু ডাক ছেড়ে কাঁদলে শোকটার কিছু লাঘব হত। দেখ, ওর আবার কোন অসুখবিসুখ না হয়। একেই হার্টের দোষ আছে।'[৬] সুধীরাদি সম্বন্ধে মায়ের এত চিন্তা ও ভাবনা আমাদের অভিভূত করে।

শ্রীমতী ক্ষীরোদাবালা রায় একবার কালী-পূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় উদ্বোধন মায়ের বাড়িতে শ্রীমাকে দর্শন করতে যান। দেখেন, মায়ের বাড়িতে দারুণ ভিড়। শ্রীমা তাঁকে বললেন, 'আজকে বড় ভিড়। এখানে থেকে কোন কাজ নেই। তুমি সুধীরার সঙ্গে দেখা করে গৌর-দাসীর ওখানে যাও, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাসায় ফিরে যেয়ো।' এই কথা শুনে শ্রীমতী ক্ষীরোদাবালা মায়ের আদেশে একাই সুধীরা-দির স্কুল-বাড়িতে গেলেন। সুধীরাদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাত্রিবেলা তুমি কি করে এলে আবার? কেন এসেছ?' ক্ষীরোদাবালা উত্তর দিলেন, 'জানি না কেন এসেছি; মা এখানে আসতে বললেন তাই এলাম।' তাঁর কথা শুনে সুধীরাদেবী তাঁর স্কুলের মেয়েদের ডেকে বললেন, 'তোমরা পড়াশুনা বন্ধ করে এখানে এসো। ক্ষীরোদাদিদি মার কাছ থেকে এসেছে; তাকে এসে দেখো।' তখন সব মেয়েরা এসে ক্ষীরোদাবালাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর তিনি সারদেশ্বরী আশ্রমে গৌরীমার কাছে গেলেন। এই বিবরণ আমরা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' দ্বিতীয় ভাগ-এ (পৃ: ৪৩১-৩২) পাই। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে শ্রীমা ক্ষীরোদাবালাকে সুধীরাদির কাছে কেন পাঠালেন? তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ক্ষীরোদাদিকে একা যেতে বললেন সুধীরাদির স্কুলে, তারপর গৌরীমার কাছে। মজার ব্যাপার এই যে, গৌরীমা আবার সেইরাত্রে ক্ষীরোদাদিকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের কাছে এলেন মাকে পূজো করতে। যাই হোক, শ্রীমা ত ক্ষীরোদাদিকে সোজা গৌরীমার কাছেই যেতে বলতে পারতেন, কিন্তু তা বললেন না। এক বৃত্ত রচনা হল, মায়ের

৫ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, ৫ম সংস্করণ, পৃ: ৩১৪-১৫

৬ ঐ, পৃ: ২২৪

কাছ থেকে সুধীরাদি, সেখান থেকে গৌরীমা, আবার সেখান থেকে সেই রাত্রেই মায়ের কাছে ফেরা। সুধীরাদিকে মা কি চোখে দেখতেন, কতখানি ভালবাসতেন, সুধীরা-চরিত্রটিকে ক্ষীরোদাদির মত মেয়েদের সামনে আদর্শরূপে স্থাপন করতে তাঁর মনে যে ইচ্ছা ছিল, এসব বিবরণ (ঐ, পৃঃ ৪৩১-৩৪) থেকে আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সুধীরাদি নিবেদিতা স্কুলের মেয়েদের নিয়ে প্রায়ই মায়ের কাছে আসতেন, তার বিবরণ আমরা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-য় বিভিন্ন স্থানে পাই। তিনি নিজে মাকে যেরূপ শ্রদ্ধা করতেন, সেইরূপ শ্রদ্ধা যাতে তাঁর স্কুলের মেয়েদের মনেও জেগে ওঠে, এ চেষ্টায় সুধীরাদির আগ্রহ কম ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমার চরণে আত্ম-সমর্পণই যে শান্তি- ও আনন্দ-লাভের পথ, এ তিনি নিজেও যেমন বুঝেছিলেন, তেমনই উপযুক্ত আধার দেখলেই তাঁকে মায়ের চরণে এনে উপ-স্থিত করতেন। সেরকম মেয়েদের বিশেষ ঝুঁকি নিয়েও ত্যাগ ও সাধনার পথে নিয়ে আসতে সাহায্য করতেন। শ্রীসারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা শ্রদ্ধেয়া প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার জীবনেও ভগিনী সুধীরার প্রভাব কম ছিল না। তাঁর নাম ছিল পারুল, সুধীরাদি নাম রাখেন 'সরলা'। বাল্যকালেই সুধীরাদির বৈরাগ্যপ্রদীপ্ত জীবনের সংস্পর্শে এসে তাঁর মনে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভাব সঞ্চারিত হয়। সুধীরাদির সাহায্যে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সরস্বতীপূজার পরদিন রাত বারটায় গৃহত্যাগ করে গোপনে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে চলে আসেন। ভগিনী সুধীরা স্কুলবাড়ির একতলায় দরজা খুলে রেখে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং সেই মধ্যরাত্রেই তিনি সরলা-দেবীকে গ্রে স্ট্রীটে তাঁর নিজের এক আত্মীয়ার বাড়িতে রেখে আসেন। সুধীরাদি তাঁকে হরিপাল জেজুড় গ্রামে তাঁর পৈতৃক বাড়ীতেও আত্মগোপন ক'রে রাখতেন। আত্মগোপনে থাকাকালীন ঐ বৎসরেই তিনি সুধীরাদির সঙ্গে শ্রীমার কাছে যান ও বুদ্ধপূর্ণিমার দিন তাঁর নিকট মহামন্ত্র লাভ করেন। ভগিনী নিবেদিতার তিরোধানের পর সরলাদেবী সুধীরাদির সঙ্গে কাশীতে যান। সেখানে সুধীরাদির বৈরাগ্যময় পবিত্র সাহচর্য, বিশ্বনাথদর্শন, শিবরাত্রিতে চারি প্রহরের শিবপূজা ও জপধ্যানে সরলাদেবী অভূতপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পান। সুধীরাদির উপদেশ ও আচরণ তাঁর মনে ভগবদনুরাগ ও ব্যাকুলতার সঞ্চার করে। পারিবারিক কারণে সুধীরাদিকে তখন অন্যত্র চলে যেতে হয়। সরলা-দেবী বৃন্দাবনে থাকেন এবং মাঝে মাঝে সুধীরাদির উৎসাহ- ও উপদেশ-পূর্ণ পত্র তাঁকে উদ্দীপিত করত। সুধীরাদি তাঁকে কেবলই লিখতেন—'শ্রীশ্রীঠাকুরই তোমার একমাত্র আপনার। কেবলমাত্র তাঁরই ওপর নির্ভর করবে, আর কোন কিছু অবলম্বন করো না।' একদিন উদ্বোধনে শ্রীমাকে দর্শন করার পর মা সরলাদেবীকে বলেন, 'তুমি মা আর কতদিন এভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে, এখন আমার কাছে এসে থাক।' এইভাবে সুধীরাদির ইচ্ছা পূর্ণ হল, শ্রীমা সরলাদেবীর সকল ভার নিলেন এবং সরলাদেবীও শ্রীমার চরণে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমার মহাসমাধির পর সরলাদেবী আবার ভেঙ্গে পড়লেন, তাঁর কাছে জগৎ শূন্য মনে হল। তিনি ভেবেছিলেন, যে-আশ্রয়ের সন্ধান সুধীরাদি দিয়েছেন এবং যে-আশ্রয় তিনি শেষ পর্যন্ত পেয়ে ধন্য হয়েছেন, সেই আশ্রয়ে শ্রীমার পদপ্রান্তে তাঁর সেবাতেই সারাজীবন কাটিয়ে দেবেন। ঐ সময় ভগিনী সুধীরা ও স্বামী সারদানন্দজীর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার তাঁকে ধীরে ধীরে শান্ত করে। স্বামী বিবেকা-

নন্দের পরিকল্পিত স্ত্রীমঠ যখন ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হল তখন এই তপস্বিনী সরলাদেবীকে ঐ মঠের অধ্যক্ষার পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর নাম হল প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭৩, সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বছর তাঁর মঠজীবন। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী বেলা ২-৫০ মিনিটে তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৭]

শ্রীমায়ের আশ্রয়ে যেমন সুধীরাদি শ্রদ্ধেয়া ভারতীপ্রাণাকে এনেছিলেন, তেমনই অন্য একজন মহিলার কথা আমরা জেনেছি, যাঁর বিপদের দিনে সুধীরাদি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং শান্তির জন্য শ্রীমায়ের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দ-জায়া শ্রদ্ধেয়া মৃণালিনীদেবী। মৃণালিনী-দেবীর জীবনে সুধীরাদির প্রভাবের কথা জেনে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হব, অবশ্য এ ঘটনাও শ্রীমা সারদাদেবীকেই কেন্দ্র ক'রে। তখন ১৯০৮ সাল। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী-দেবীর সঙ্গে কলকাতার গ্রে স্ট্রীটের বাসায় থাকতেন। মধ্যরাত্রে পুলিশ এসে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করল। দক্ষিণেশ্বর থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ ক'রে একটা মাটির ভাঁড়ে রাখা ছিল। পুলিশ পাত্রটিকে অধিকার করল ও বোমা তৈয়ারীর উপকরণ মনে ক'রে উল্লসিত হল। মৃণালিনীদেবী জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখলেন শ্রীঅরবিন্দের মেসোমশায় কৃষ্ণকুমার মিত্রের বাড়ীতে তাঁকে আনা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের আকস্মিক গ্রেপ্তারের ফলে মৃণালিনীদেবীর জীবনে নেমে এল অমাবস্যার অন্ধকার, লক্ষ্যহীন উদ্‌ভ্রান্তি। তিনি কিভাবে শান্তি ও সান্ত্বনা পাবেন কিছুই স্থির ক'রে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর নিজের কথায়: 'তখন স্পষ্ট আমার প্রতীয়মান হইল যে, তাঁহার সঙ্গ-ছিন্ন আমার জীবনে মৃত্যুই একমাত্র পথ। কিন্তু তবুও আমার মৃত্যুবরণ হইল না। এই সময় সুধীরা আসিয়া আমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল।' সুধীরাদি মৃণালিনী-দেবীকে শ্রীমা সারদাদেবীর কাছে নিয়ে এলেন। মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, মানসিক শান্তির জন্য প্রার্থনা জানালেন। শ্রীমা সব কথা মন দিয়ে শুনে বললেন, "চঞ্চল হয়ো না, চাঞ্চল্যে কিছু লাভ নেই। তোমার স্বামী শ্রীভগবানের আশ্রিত পুরুষ, ঠাকুরের আশীর্বাদে তিনি সত্বর নিষ্পাপ প্রমাণে মুক্ত হয়ে আসবেন।" সুধীরাদেবী জানতে চাইলেন, কিভাবে মৃণালিনীদেবীর বর্তমান মানসিক অশান্তি দূর হবে। শ্রীমা বললেন, 'সব সময় ঠাকুরের বই পড়বে, আর এখানে মাঝে মাঝে আসবে, তাহলেই মনের অন্ধকার সব পালাবে।' ঠাকুরের বই অর্থে নিশ্চয়ই শ্রীমা কথামৃত বুঝিয়েছিলেন। তখন ১৯০৮ সালে তিন ভাগ কথামৃত প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৯০২ সালে, দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৫-এ এবং তৃতীয় ভাগ ১৯০৭ সালে। উদ্বোধন অফিস থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য স্বামীজীদের লেখা ও শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধীয় যেসব বই প্রকাশিত হত সবগুলিই মৃণালিনীদেবী আনাতেন এবং ঐ সমস্ত বই নিয়েই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত। জানা যায়, মৃণালিনীদেবী সুধীরা-দেবীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার শ্রীমাকে দর্শন করতে যান। শ্রীমাও মৃণালিনীদেবীকে

৭ এই অংশটির রচনায় শ্রীসারদা মঠ কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা' (১৩৭৯) পুস্তিকাটির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

'বৌমা' ব'লে সম্বোধন করতেন ও বিশেষ স্নেহ করতেন। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় মৃণালিনীদেবী কঠিন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর অসুখের সময় শ্রীমা অত্যন্ত উতলা হয়েছিলেন এবং শেষের দিকে কয়েকবার ফোন করিয়ে তাঁর খবর নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৭ই ডিসেম্বর সকালে। ঐ দিনই বিকালে সুধীরাদি মৃণালিনীদেবীর গর্ভধারিণী মাকে নিয়ে শ্রীমায়ের বাটীতে উদ্বোধনে গিয়েছিলেন। শ্রীমা তখন ধ্যানস্থ ছিলেন, কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে সুধীরাদি ও মৃণালিনীদেবীর মাকে দেখে বলেছিলেন, 'তোমরা এসেছ? আমি এতক্ষণ বৌমাকে দেখছিলাম। ও তো শাপভ্রষ্টা দেবী ছিল, সামান্য কর্মফল ছিল তাই ভোগ করবার জন্য তোমাদের মেয়ে হয়ে জন্মেছিল।' শ্রীঅরবিন্দ ১৯১০ সালে পণ্ডিচেরী চলে যান। তাঁর পণ্ডিচেরী যাবার পর মৃণালিনীদেবী শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুধীরাদেবী একদিন শ্রীমাকে অনুরোধ জানান মৃণালিনীদেবীকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে দীক্ষাদান করতে। একথায় শ্রীমা বলেছিলেন, 'বৌমার আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা নেবার প্রয়োজন নেই।' জানা যায়, মৃণালিনী-দেবীর দীক্ষা নেবার ইচ্ছা শুনে তাঁর পিতা এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মতামত জানবার জন্য পণ্ডিচেরীতে তাঁকে পত্র লেখেন। এই চিঠির উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ জানান, মৃণালিনীর দীক্ষা নেবার প্রয়োজন নেই, তাঁর প্রয়োজনীয় যা কিছু আধ্যাত্মিক সাহায্য শ্রীঅরবিন্দই প্রেরণ করবেন। মৃণালিনীদেবী এই আদেশ সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সুধীরাদেবীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব চিরদিন গভীর ছিল এবং সুবিধা পেলেই সুধীরাদেবীর সঙ্গে শ্রীমায়ের কাছে যেতেন।[৮]

শুধুমাত্র কলকাতাতেই যে শ্রীমায়ের পাশে সুধীরাদিকে দেখা যেত, তা নয়। যখন শ্রীমা জয়রামবাটী, কামারপুকুর বা কোয়ালপাড়াতে থাকতেন, তখনও সুধীরাদিকে মায়ের পাশে ছুটে যেতে দেখা যেত। ১৯১৩ সালে বর্ষার প্রথমে একবার জয়রামবাটীতে খুব ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ের প্রকোপ হয়। এদিকে দীর্ঘকাল খবর না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে স্বামী সারদানন্দজী কলকাতা থেকে লোক পাঠালেন। তিনি এসে দেখলেন শ্রীমা আমাশয়ে ভুগছেন; তিনি পত্রযোগে কলকাতায় এই সংবাদ পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার্থে ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও সেবার জন্য সুধীরাদি জয়রামবাটী এসে উপস্থিত হলেন।[৯] কদিন পর ডাক্তার কাঞ্জিলাল কলকাতা ফিরে গেলেন। সুধীরাদি সেবার জন্য রয়ে গেলেন। কিছুদিন পর মা সম্পূর্ণ সুস্থ হলে সুধীরাদি কলকাতা ফিরবেন ঠিক হল। দুপুরবেলা শ্রীমা শ্রীশচন্দ্রকে ডাকিয়ে বললেন, 'দেখ, সুধীরা তোমাদের সঙ্গে বিষ্ণুপুর

৮ এই অংশটির জন্য নিম্নবর্ণিত দুইটি লেখার সাহায্য নেওয়া হয়েছে: (ক) শ্রীশৈলেন্দ্র-নাথ বসু রচিত পুস্তিকা 'শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনীদেবীর স্মৃতিকথা'; (খ) মৃণালিনী-দেবীর কনিষ্ঠা সহোদরা শৈবলিনী মিত্র রচিত প্রবন্ধ 'মৃণালিনী স্মৃতিকথা' প্রথমে 'অমৃত' পত্রিকায়, পরে 'শৃণ্বন্তু', শ্রাবণ ১৩৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৯ স্বামী গম্ভীরানন্দ: শ্রীমা সারদা দেবী, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ৩২৬

পর্যন্ত যাবে। খুব সাবধানে যেও। ওর গাড়ি তোমাদের দুই গাড়ির মধ্যে রেখো। তোমরা আমার আপনার জন, আমার ছেলে।' শ্রীশচন্দ্র বললেন—'হ্যাঁ, নেব বৈকি। তুমি যেমন বললে ঠিক তেমনি ভাবে নেব।'[১০] মায়ের প্রতি মেয়ের যেমন শ্রদ্ধার অভাব ছিল না, তেমনি কন্যার প্রতি মাতৃহৃদয়ের স্নেহও অফুরন্ত ছিল।

শ্রীমা তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা কখন কখন তাঁর অন্তরঙ্গ মহিলা ভক্তদের বলতেন। সে সব কথা আমরা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', 'মাতৃ-সান্নিধ্যে' ইত্যাদি পুস্তকে পাই। শ্রীমার দৃষ্টিতে ঠাকুর ছিলেন সর্বব্যাপী স্বয়ং ভগবান। একদিন সুধীরাদেবীকে তাঁর নিজের এইরকম অনুভূতি সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'আমার একবার এমন অবস্থা হল যে, নৈবেদ্য থেকে পিঁপড়েটাকে পর্যন্ত তাড়াতে পারি নে, বোধ হয় যেন ঠাকুর খাচ্ছেন।'[১১] শ্রীমা সুধীরাদিকে তাঁর একজন অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত মনে করতেন, তা না হ'লে তাঁর এইরকম আধ্যাত্মিক অনুভূতি সুধীরাদির কাছে ব্যক্ত করতেন না। এই শ্রীরামকৃষ্ণময়তা সুধীরাদেবীর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। তিনি সরলাদেবীকে লিখেছিলেন পত্রে, 'শ্রীশ্রীঠাকুরই তোমার একমাত্র আপনার, কেবলমাত্র তাঁরই ওপর নির্ভর করবে—আর কোনো কিছু অবলম্বন কোরো না।'

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই শ্রীমা বেশ কিছুদিন রোগভোগের পর লীলাসংবরণ করলেন। তাঁর রোগশয্যায় নিবেদিতা বিদ্যালয়ের মেয়েরা ও সুধীরাদি পালাক্রমে সবসময়ে থেকে মায়ের সেবা করেন।[১২] মায়ের দেহরক্ষার পর সুধীরাদির হৃদয় ভেঙ্গে গেল। তিনি নির্জনে কেঁদে হৃদয়ভার লাঘব করতেন। তখন সকলেই শোকে কাতর। পূজাবকাশে একটু শান্তি পাবার আশায় বিদ্যালয়ের সকলকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে গেলেন। হৃষীকেশ হরিদ্বারাদি তীর্থদর্শন ক'রে তাঁরা এলাহাবাদে এলেন। সেখান থেকে তাঁরা কাশী যাত্রা করেন রেল-পথে। কাশীর ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশনে পৌঁছবার আট দশ মাইলমাত্র দূরে অবস্থিত একটা স্টেশনে ট্রেন প্রবেশ করবার সময় তিনি হঠাৎ গাড়ী থেকে মাটিতে প'ড়ে গিয়ে অচেতন হয়ে যান। গাড়ীতে তাঁকে অচেতন অবস্থায় উঠিয়ে কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নিয়ে আসা হয়। পরদিন তাঁর মহাসমাধি হয়। এই বিবরণ আমরা স্বামী সারদানন্দজীর লেখা প্রবন্ধ 'ব্রতধারিণীর মহাসমাধি' থেকে পাই।[১৩] আগেই বলা হয়েছে, শ্রীমা লীলাসংবরণ করেন ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে। তাঁর আদরের কন্যা সুধীরা দেহ বিসর্জন দিয়েছেন ঐ একই বছরের নভেম্বর মাসে। মাঝে মাত্র তিন মাসের ব্যবধান। শ্রদ্ধেয়া প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণাজী লিখেছেন, 'সুধীরার অকালমৃত্যুতে সমগ্রভাবে বিদ্যালয়ের কার্যে যে ক্ষতি হয়, তাহা অপূরণীয়, এবং নারীজাতির শিক্ষা- ও উন্নতি-কল্পে স্বামীজীর পরিকল্পনাটির বাস্তব-রূপ-পরিগ্রহ বহু বৎসরের জন্য স্থগিত থাকে।'[১৪]

১০ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, দশম সংস্করণ, পৃঃ ১৮৭

১১ স্বামী গম্ভীরানন্দ : শ্রীমা সারদা দেবী, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ৫২১

১২ তদেব, পৃঃ ৫৯৮

১৩ স্বামী সারদানন্দ : বিবিধ-প্রসঙ্গ (১৩৩৫), পৃঃ ১২৪-২৭

১৪ প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা : ভগিনী নিবেদিতা, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৪০৬

শ্রীশ্রীমা

স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দ

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ॥

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

—হে অর্জুন! যখনই ধর্মের গ্লানি দেখা দেয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে প্রকট করি। দুষ্কৃতকারীদের ধ্বংসের জন্য, সাধুসন্তদের পরিত্রাণের জন্য ধর্ম সংস্থাপিত করতে অবতীর্ণ হই যুগে যুগে।

তেমনি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দনুজদলনী জগজ্জননী ভগবতী আর্তদের আশ্বস্ত ক'রে বলেছেন :

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥

—এইভাবে যখনই দৈত্যদানবের অত্যাচার হবে, তখনই আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রুনাশ করবো।

এই অরি-সংক্ষয় দু'প্রকারে হ'তে পারে—এক, শক্তিপ্রকাশে অস্ত্র-প্রয়োগে; অপর, সদ্‌গুণাবলীর প্রকাশে অপরের চিত্ত জয় ক'রে আপনার বশে এনে। বর্তমানে স্বার্থসংঘাতের ফলে একে অপরের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারিয়েছে। তাই তো স্বার্থান্ধ হয়ে নিজেদের ধ্বংসের পথ নিজেরাই সৃষ্টি করছে। শোনা যাচ্ছে অস্ত্রের ঝংকার—দেখা যাচ্ছে রেষারেষি, হানাহানি, মারণাস্ত্র তৈরির প্রবল আগ্রহ আর অস্ত্রসংগ্রহের উৎকট উন্মাদনা। অশ্রদ্ধা, জড়বাদ-প্রিয়তা, ভোগেচ্ছা প্রভৃতি আসুরিক প্রবৃত্তি যেন সমর ঘোষণা করেছে। সৎ প্রবৃত্তি ও অসৎ প্রবৃত্তির মধ্যে অবিরাম সংগ্রাম চলেছে অন্তর্জগতে। উপনিষদে একেই 'দেবাসুরসংগ্রাম' সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে শক্তির ক্রিয়া এবং অরিধ্বংস হবে অন্তর্জগতে—মানসিক ক্ষেত্রে। সৎ বৃত্তি ও অসৎ বৃত্তির দ্বন্দ্বে দেখা দিয়েছে ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান এবং ঈর্ষা, দ্বেষ ও কামক্রোধাদির আধিক্য। জগতের দুঃখে কাতরা জগন্মাতা এই অশান্তি নিরাকরণে সারদামণি মূর্তিতে আবির্ভূতা। তিনি এসেছেন লজ্জা, বিনয়, সরলতা, পবিত্রতা, সদাচার, কল্যাণস্পৃহা এবং ঈশানুভূতির দ্বারা সকলের মনের আবিলতা দূর ক'রে পবিত্রতা জাগাতে।

ভারতে শক্তিপূজার প্রচলন রয়েছে পুরাকাল হতে। প্রাচীনকাল হতেই দেবীর বিবিধ বিগ্রহ ও প্রতীক প্রচলিত রয়েছে। শক্তি আরাধিতা হচ্ছেন নানাভাবে—দেবীর স্তব-স্তুতিও অসংখ্য। তিনি ধনদাত্রী, বিদ্যাদাত্রী, নিরাময়কারিণী, ত্রাণকারিণী, কল্যাণদায়িনী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাঁকে সমস্তবিদ্যারূপিণী ও সমস্ত-নারীরূপিণী বলা হয়েছে। তুষ্টা হলে তিনি ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী; আবার রুষ্টা হলে অধার্মিক অনাচারীর দণ্ডবিধায়িনী।

সেই মহাশক্তিরূপিণী শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবে নারী-সমাজের উন্নয়নে, নারী-জাগরণে সর্বত্র সর্বভাবে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেছে। নারীদের ভেতর জেগেছে আত্মচেতনা। এখন জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁদের

শক্তির প্রকাশ পরিস্ফুট। মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত ঘোষণা—'স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে ভারতের কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেইজন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রীগুরুগ্রহণ, সেইজন্যই নারীভাবে সাধন, সেইজন্যই মাতৃভাব-প্রচার।' স্বামীজী ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, 'শ্রীশ্রীমাকে অবলম্বন ক'রে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।' তাই দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্ববিষয়ে উদাসীন থেকেও মায়ের শিক্ষাদীক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন সম্পূর্ণরূপে। আর এই শিক্ষাদীক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন মাকে আদর্শ রমণীরূপে, যাতে ভারতের মায়েদের ভেতর এক অপূর্ব জাগরণের সাড়া পড়ে যায়। বর্তমান যুগে ভারতের নারীসমাজকে পাশ্চাত্যের নারী-জাগরণের আদর্শ আমাদের দেশোপযোগী যুগোপযোগী ক'রে গ্রহণ করতে হবে। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও বাঁচতে হলে আমাদের মাতৃভক্তির খানিকটা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

যুগধর্মপ্রবর্তনে সশক্তিক ভগবানই সক্ষম। তাই শ্রীভগবান যখন নরদেহে অবতীর্ণ হন, শক্তিকেও সঙ্গে আনেন। তাইতো দেখি, শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে, বুদ্ধদেব যশোধরাকে, শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়াকে আর বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। অন্যান্য অবতার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক শক্তির সহায়তা নিয়েই নিজেদের অবতারত্ব প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ শক্তিকে বাদ দিয়ে অবতারের কার্যকলাপ অসম্ভব।

শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক জন্মের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মকাহিনীরই অনুরূপ। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের কথাতেই তাঁর জন্মবৃত্তান্ত বলছি: শ্রীমা বলেছেন—"আমার জন্মও তো ঐ রকমের (ঠাকুরের মত)। আমার মা শিওড়ে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় হঠাৎ শৌচে যাবার ইচ্ছে হওয়ায় দেবালয়ের কাছে এক গাছতলায় যান। শৌচের কিছুই হল না; কিন্তু বোধ করলেন, একটা বায়ু যেন তাঁর উদরের মধ্যে ঢোকায় উদর ভয়ানক ভারী হয়ে উঠল। বসেই আছেন। তখন মা দেখেন যে, লাল চেলী পরা একটি পাঁচ-ছ বছরের অতি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি তোমার ঘরে এলাম মা।' তখন মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। সেই মেয়েই মায়ের উদরে প্রবেশ করে; তা থেকেই আমার জন্ম। বাড়ীতে ফিরে এসে মা এই ঘটনাটি বলেছিলেন।"

মায়ের জন্ম দরিদ্র পরিবারে। সামান্য কিছু চাষের জমির আয় আর যাজনে জীবিকানির্বাহ হ'ত এই পরিবারের। ছোটবেলা থেকেই মা ছিলেন কর্মব্যাপৃতা। মা নিজেই বলেছেন, "ছেলেবেলায় গলা-সমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছি। ক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতুম। এক বছর পঙ্গপালে সব ধান কেটেছিল। ক্ষেতে ক্ষেতে সেই ধান কুড়িয়েছি।" ছোট ভাইবোনদের কোলে কাঁখে ক'রে লালনপালন, রান্নার কাজে সহায়তা, পুকুর থেকে কলসী ক'রে জল আনা ইত্যাদি পরিবারের সকল কাজেই মায়ের উৎসাহ ছিল অক্ষুণ্ণ। আর এই কর্মের প্রবাহ দেখতে পাই মায়ের সারাজীবনে।

মা ছিলেন ঠাকুরের প্রথম শিষ্যা—যোগ্য অধিকারিণী। শুভ সংস্কারের বলে ঠাকুরের শিক্ষা নিজ জীবনে রূপায়িত করেছেন কঠোর নীরব সাধনা ক'রে। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান-কালে শ্রীশ্রীঠাকুরের যুগধর্মপ্রবর্তনের চেষ্টাকে ফলবতী করবার জন্য মা সর্বতোভাবে আগ্রহান্বিতা ছিলেন। আর ঠাকুর মায়ের অন্তর্নিহিত অসীম শক্তির সঙ্গে পরিচিত থাকায় লীলাসংবরণের পর নিজ কার্যভার মা যাতে গ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য তাঁকে প্রস্তুত করেছিলেন। পূর্বে কামারপুকুরেও শ্রীশ্রীমাকে শ্রীশ্রীঠাকুর নানাভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। পবিত্রতম ভালবাসার দ্বারা মায়ের মন আকৃষ্ট ক'রে স্বকীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানরাশি ঢেলে দিয়েছিলেন। একদিকে যেমন নিজের ত্যাগোজ্জ্বল জীবনাদর্শ মায়ের সামনে স্থাপন করেছিলেন—কিরূপে ধর্মজীবন গঠন করতে হয় তা শিক্ষা দিয়েছিলেন, অপর দিকে তেমনি দৈনন্দিন গৃহস্থালিকর্ম, দেব-দ্বিজ-অতিথি-সেবা, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, কনিষ্ঠদের প্রতি স্নেহ-পরায়ণতা, পরিবারের সেবায় আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন। যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন—এই নীতি অনুসরণ ক'রে পরিবারের প্রত্যেকের রুচি, স্বভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার—নৌকায় ও গাড়ীতে যাবার সময় জিনিসপত্রসম্বন্ধে সতর্কতা, এমনকি প্রদীপের সলতেটি পর্যন্ত কেমন ক'রে রাখতে হয়—জাগতিক সব কিছু শিক্ষাই ঠাকুর তাঁকে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ আত্মীয়বর্গের প্রতি ব্যবহার, অপরের গৃহে ভব্যতা ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক শিক্ষা হ'তে আরম্ভ ক'রে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয়েই শ্রীমাকে ঠাকুর উপদেশ দিয়েছিলেন। এইসব উপ-দেশের ফলে শ্রীমা মানবজীবনের কর্তব্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। ঠাকুর একদিন তাঁকে বলেছিলেন, "চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার; তাঁকে ডাকবার সকলেরই অধিকার আছে। যে ডাকবে, তিনি তাকেই দেখা দিয়ে কৃতার্থ করবেন। তুমি ডাক তো তুমিও দেখা পাবে।" শ্রীমা এইসব উপদেশ কতটা পালন করছেন তারও খোঁজ রাখতেন ঠাকুর।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশে সরলা ধর্মপ্রাণা পতিব্রতা পল্লীবালা কিরূপ আনন্দে ভরপুর হয়েছিলেন তা পরে স্ত্রীভক্তদের কাছে প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন, "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ কাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর, স্থির, দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"

মা ছিলেন ঠাকুরের লীলাসহচরী—ধর্ম-পথের সহায়িকা। একদিন পরীক্ষাচ্ছলে ঠাকুর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিগো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে মা বললেন, "না, আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" শ্রীশ্রীমাও একদিন ঠাকুরের পদ-সেবা করতে করতে জানতে চাইলেন, "আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?" ঠাকুর উত্তরে বললেন, "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন, আর তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দ-ময়ীর রূপ ব'লে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য

দেখতে পাই।"

ঠাকুর-মায়ের মিলন আধ্যাত্মিক, আত্মিক মিলন—কামগন্ধহীন দৈহিকসম্বন্ধশূন্য। দেবভাবে বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদামণি উভয়ে একে অপরের মধ্যে দেবভাবের বিকাশ দেখে পূজা করেছেন। শ্রীশ্রীমা একাদিক্রমে আটমাস ঠাকুরের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেছিলেন। তখন ঠাকুরের মন যেমন ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করত, মায়ের মনও তেমনি এই আরাধ্য দেবতার ধ্যানেই নিমগ্ন থাকত। কারও মনে ভোগস্পৃহার অবকাশ ছিল না। এই ভাবের পরিপূর্ণতালাভ শ্রীশ্রীঠাকুরের ৺ষোড়শীপূজায়।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম আগমনের পর প্রায় আড়াই মাস একসঙ্গে শয়ন ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর মায়ের পবিত্রতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। তাই ৫ই জুন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৺ফলহারিণী কালিকাপূজার দিন অমাবস্যা তিথিতে রাত্রে তিনি ষোড়শীমূর্তিতে শ্রীশ্রীমাকে স্বকক্ষে আরাধনা করেন এবং এই আরাধনার দ্বারা মায়ের অন্তর্নিহিত সুপ্ত দেবীত্বকে উদ্বুদ্ধ করেন। পূজাশেষে ঠাকুর নিজ সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব দেবীর শ্রীচরণে চিরকালের জন্য বিসর্জন দিলেন এবং প্রণাম করলেন—"হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি, ত্রিনয়নি, শিবগেহিনি, গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম করি।"

শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ প্রকটিত করতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন ভক্তিমতী গোলাপ-মাকে বলেন: "ও (শ্রীমা) সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধমনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয় তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" আর ভাগ্নে হৃদয়কে বলেছিলেন, "ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী, তাই সাজতে ভালবাসে।" ঠাকুর শ্রীমা সম্বন্ধে রহস্যচ্ছলে বলতেন, "ছাই-চাপা বেরাল।" ছাই-মাখা বেরালের আসল রঙ যেমন চেনা যায় না, শ্রীমায়ের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা করাও সাধারণের পক্ষে অসম্ভব।

স্বামী প্রেমানন্দজী একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "শ্রীশ্রীমাকে কে বুঝেছে? ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নাই। ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু মার তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত। এ কি মহাশক্তি! জয় মা!! জয় মা!! জয় শক্তিময়ী মা!!! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পাচ্ছিনে, সব মা'র নিকট চালান দিচ্ছি। মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন। অনন্ত শক্তি—অপার করুণা! জয় মা! আমাদের কথা কি বলছিস—স্বয়ং ঠাকুরকেও এটি করতে দেখিনি। তিনিও কত 'বাজিয়ে বাছাই করে' লোক নিতেন। আর এখানে—মা'র এখানে কি দেখছিস? অদ্ভুত, অদ্ভুত। সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলের দ্রব্য খাচ্ছেন, আর সব হজম হয়ে যাচ্ছে। মা! মা! জয় মা!!"

স্বামী বিবেকানন্দও একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "দাদা, জ্যান্ত দুর্গাপূজা দেখাব, তবে আমার নাম।... মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি, 'কো রামঃ?' দাদা, ওই যে বলছি, ওখানেই আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন, কি মানুষ ছিলেন—যা হয় বল দাদা; কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নেই, তাকে ধিক্কার দিও।"

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের কাশীধামে অবস্থানকালে ব্রহ্মানন্দজী প্রতিদিন সকালে তাঁর বাসস্থানে গিয়ে গোলাপ-মার কাছে মায়ের কুশলপ্রশ্নাদি করতেন। একদিন মহারাজ এলে গোলাপ-মা বললেন, "রাখাল, মা জিজ্ঞেস

করছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?" মহারাজ উত্তর দিলেন, "মা'র কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা ক'রে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।"

একবার পুত্রশোকে কাতর গিরিশচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে নিরঞ্জনানন্দজী জয়রামবাটী গিয়েছেন। গিরিশচন্দ্র স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে মায়ের চরণে প্রণত হয়ে যেমন উপর দিকে চেয়েছেন, অমনি মায়ের মুখ দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবলেন, "এ্যাঁ, মা তুমি!" এই বিস্ময়ের কারণ—বহুকাল আগে যুবক গিরিশের একবার কলেরা হয়। জীবনের আশা ছিল না। হঠাৎ তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এক মাতৃমূর্তি মহাপ্রসাদ এনে তাঁর মুখে দিয়ে বলছেন, "খাও"। তাঁর পরণে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী, দেহে এক অপার্থিব জ্যোতি, আর মুখে চিত্তহারী স্নেহ। সে প্রসাদ বড় সুস্বাদু ছিল। সে প্রসাদ খেতে খেতে গিরিশের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল; কিন্তু তখনও চোখে সে দেবীমূর্তি ভাসছে, আর জিবে প্রসাদের স্বাদ রয়েছে। ক্রমে তিনি নীরোগ হলেন গিরিশ দেখলেন স্বপ্নের সেই দেবী আজ হঠাৎ সামনে উপস্থিত। তিনি আগে কখনও শ্রীমায়ের মুখ দেখেন নি। আজ বুঝলেন এই দেবীই তাঁকে সর্বদা রক্ষা ক'রে এসেছেন। তবু মায়ের মুখে সত্য জানবার জন্ত অপরের দ্বারা প্রশ্ন ক'রে পাঠালে মা স্বীকার করলেন যে, তিনিই তাঁকে ঐভাবে দর্শন দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দেবীভাবের আলোচনা আমরা করেছি। এখন তাঁর মাতৃভাবের আলোচনা করবো। মাতৃমূর্তির মাধুর্য এবং 'মা' নামের মহিমা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। 'মা' নামে সব ভয় দূরে যায়—শমনের ভয় পর্যন্ত। মাতৃনামোচ্চারণ একটা শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে স্নিগ্ধ ক'রে দেয় মনপ্রাণ। পাপী তাপী আর্তেরা যখন মনের জ্বালা জুড়াবার জন্ত প্রাণভরে 'মা' 'মা' বলে ডাকে, মা তখন সে ডাকে স্থির থাকতে না পেরে তাদের কলুষ-কালিমা ধুয়ে মুছে নিজ হাতে কোলে তুলে নেন। কৃপাপরায়ণী সদা-হাস্যময়ী মা সন্তানের হৃদয় স্নেহে দ্রবীভূত ক'রে তার দুঃখময় অতীত ভুলিয়ে দেন এবং প্রবল আকর্ষণে এক অনির্বচনীয় নিশ্চিন্ততাময় আনন্দ-সাগরের দিকে তাকে টেনে নিয়ে চলেন। সংযমের প্রতিমূর্তি ও প্রসাদময়ী মায়ের তুলনা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "মাতৃভাব সাধনার শেষ কথা"; স্বামী বিবেকানন্দও 'কর্মযোগে' বলেছেন, "জগতে মায়ের স্থান সকলের উপরে, কারণ কেবল এই অবস্থায়ই মানুষ চরম নিঃস্বার্থ-পরতা আয়ত্ত করিতে ও কার্যে প্রকাশ করিতে পারে।"

জনৈক উৎসুক ভক্ত একদিন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহরক্ষা করেছেন; কিন্তু এবারে আপনাকে রেখে ঠাকুর পূর্বে চলে গেলেন কেন?" তদুত্তরে শ্রীমা বললেন, "বাবা, জান তো ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্ত আমাকে এবার রেখে গেছেন।"

কাশীপুরে একদিন অনুযোগের সুরে ঠাকুর মাকে বললেন, "হ্যাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজদেহ দেখিয়ে) এই সব করবে?" মা উত্তর দিলেন, "আমি মেয়েমানুষ, আমি কী করতে পারি?" ঠাকুর প্রত্যুত্তর দিলেন, "না, না, তোমায় অনেক কিছু করতে হবে।"

এরও আগে ঠাকুর সুর ক'রে গাইতেন:

এসে পড়েছি যে দায় সে দায় বলব কায়,
যার দায় সে আপনি জানে,
পর কি জানে পরের দায়?

হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
বলতে নারি কইতে নারি,
নারী হওয়া একি দায়!

আবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমাকে সজাগ ক'রে দিতেন, "শুধু কি আমারই দায়। তোমারও দায়।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পূর্ণ মতানুযায়ী হলেও মাতৃত্বের এলাকায় শ্রীমা নিজ স্বাধীনতা অটুট রাখতেন। দক্ষিণেশ্বরে বালকভক্তদের অনেকেই রাত্রিযাপন করতেন এবং ঠাকুরের নির্দেশে সাধনাদিতে রত থাকতেন। সাধনভজনের যাতে ব্যাঘাত না হয়, তাই ঠাকুর তাঁদের স্বল্পাহারের জন্য নিজেই কয়েকখানি মাত্র রুটির বরাদ্দ ক'রে দিয়েছিলেন। মা কিন্তু সে বরাদ্দ বজায় না রেখে মাতৃস্নেহে তাঁদের বেশী খেতে দিতেন। ঠাকুর যখন এই বিষয়ে অনুযোগ ক'রে মাকে বলেন যে, তিনি বালকদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন, তখন প্রতিবাদে মা বলেন, "ও (বাবুরাম) দুখানি রুটি বেশী খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? ওদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি করো না।" ঠাকুর আর দ্বিরুক্তি না ক'রে মাতৃত্বশক্তির সম্মান-প্রদর্শনের জন্য তখনই স্মিতমুখে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

পশুপাখীও মায়ের বাৎসল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। মায়ের পোষাপাখী চন্দনাকে মা কত আদরযত্নে লালনপালন করেছেন। গাই দুইবার আগে বাছুর 'হাম্বা' 'হাম্বা' রবে যখন ডাকছে—ঐ ডাকে মা স্থির থাকতে না পেরে বাছুরকে ছেড়ে দিয়েছেন আর বাছুর মনের আনন্দে মায়ের দুধ খেয়েছে।

একবার বালকভক্ত পূর্ণ দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর তাকে আহারের জন্য নহবতে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীমা ঠাকুরের অভিপ্রায় অনুসারে সেদিন পূর্ণকে মালাচন্দনে ভূষিত ক'রে সস্নেহে পাশে বসিয়ে বিবিধ ব্যঞ্জনাদির দ্বারা ভোজন করালেন এবং ভোজনান্তে আচমনের জন্য তার হাতে জল ঢেলে দিলেন। সেদিন মা হয়তো মাতৃত্বের পরিপূর্তির সঙ্গে সঙ্গে বালক-নারায়ণের পূজাও শিখেছিলেন।

বেলুড়ে গঙ্গাতীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে নাগ মহাশয় শ্রীমায়ের প্রথম দর্শন পান। মাকে সাক্ষাৎ ভগবতী ব'লে জানতেন তিনি। সিঁড়িতে মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম করতে গিয়ে মাথা এত জোরে ঠুকছেন, মনে হল যেন রক্ত বেরুবে। স্বামী যোগানন্দ পেছন থেকে কত বলছেন থামবার জন্য, কিন্তু কোন হুঁশ নেই তাঁর। ভক্তের আগমনবার্তা জেনে মা তাঁকে নিয়ে আসতে বললেন। নাগ মহাশয়ের কপাল ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে—তিনি যেন এই জগতেই নেই। স্নেহময়ী মা চিরাভ্যস্ত সংকোচ ভুলে গিয়ে ভক্তিবিহ্বল সন্তানকে ধ'রে বসালেন। তখনও তাঁর মুখে খালি, 'মা' 'মা' রব। সামনে একাদশীর আহার্যের কিছু অংশ নিজমুখে দিয়ে মা স্বহস্তে নাগ মহাশয়কে খাওয়াতে লাগলেন। কিন্তু নাগ মহাশয়ের মন তখন মোটেই বাইরের দিকে নেই—মুখে খাবার তুলে দিলেও গিলতে পারেন না। শ্রীমা কিছুক্ষণ তাঁর গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ও ঠাকুরের নাম শোনাতে তাঁর হুঁশ এল। আহারশেষে নীচে নামবার সময় নাগ মহাশয় কেবল বলতে লাগলেন "নাহং, নাহং; তুঁহু, তুঁহু।" মাতাঠাকুরাণীর শ্রীহস্ত থেকে প্রসাদলাভের আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাগ মহাশয় আরও বলেছিলেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল, বাপের চেয়ে মা দয়াল।"

এবার আমরা দেখবো যুগধর্ম-প্রবর্তনে মায়ের প্রস্তুতি। লীলাবসানের কয়েক বৎসর আগে

থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক শক্তিকে যুগোপযোগী সক্রিয় করবার জন্য ৺ষোড়শীপূজা ক'রে, অন্তভাবে সম্মান দিয়ে এবং নানা কথাপ্রসঙ্গে তাঁর দেবীত্বের উল্লেখ ক'রে তাঁর অবচেতনাকে যুগধর্ম-প্রবর্তন-বিষয়ে জাগরূক রাখছিলেন। স্বীয় সাধনলব্ধ ও অনন্ত-শক্তিপূর্ণ বহু মন্ত্র শ্রীমাকে শিখিয়ে এবং কিরূপ অধিকারীকে কিরূপ মন্ত্র দিতে হবে ইত্যাদি ব'লে তাঁর গুরুশক্তিকে কার্যোন্মুখী করছিলেন। এরই সঙ্গে তিনি আবার মাকে স্পষ্টই ভারগ্রহণে আহ্বান করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যুগধর্মস্থাপন-প্রচেষ্টার সঙ্গে শ্রীমাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ক্রমেই অধিকতর সংশ্লিষ্ট হচ্ছিলেন। মাতৃশক্তির উদ্বোধনে শ্রীমা পরবর্তী-কালে আপন অনন্ত শক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত কাজে নিয়োজিত করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরদিন সন্ধ্যা-কালে মা যখন নিজ দেহ থেকে একে একে অলঙ্কার উন্মোচন ক'রে সোনার বালাও খুলতে উদ্যত হলেন, তখন অকস্মাৎ ঠাকুর গলরোগের পূর্বেকার মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে মায়ের হাত চেপে ধ'রে বললেন, "আমি কি মরেছি যে, তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ?" শ্রীমা আর বালা খুললেন না। ঠাকুরের নিত্য লীলার বিরাম নেই। চিরসধবা শ্রীমায়েরও ঠাকুরের সঙ্গে সত্যকারের বিচ্ছেদ নেই কোন কালেই।

তারপর মা বৃন্দাবনে যান। সেখানে ঠাকুর একদিন মাকে দর্শন দিয়ে বললেন, "তুমি যোগেনকে (স্বামী যোগানন্দজীকে) এই মন্ত্র দাও।" প্রথমে সংকোচ বোধ করলেও বারংবার ঠাকুরের নির্দেশ পেয়ে শেষে তিনি স্বামী যোগানন্দজীকে দীক্ষা দিতে সম্মত হলেন। দীক্ষার দিনে ঠাকুরের ছবি ও দেহাবশেষের কৌটা সামনে রেখে পূজা করতে করতে মায়ের ভাবাবেশ হ'ল আর ঐ অবস্থাতেই মন্ত্র দিলেন। এইভাবে মায়ের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হ'ল। পরবর্তীকালে তিনি অসংখ্য ভক্ত নরনারীকে দীক্ষা দিয়েছেন।

মা একদিন বলেছিলেন, "দেখ, সব বলে কিনা আমি রাধু রাধু ক'রেই অস্থির, তার উপর আমার বড় আসক্তি। এই আসক্তিটুকু যদি না থাকত তা হ'লে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা থাকত না। তাঁর কাজের জন্যই না 'রাধী, রাধী' করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন। যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে, তখন আর এ দেহ থাকবে না।"

এবার মায়ের ভাবাবস্থা ও সমাধি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। উদ্বোধনের নূতন বাড়ীতে আসার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রীমা পানি-বসন্তে আক্রান্ত হলেন। আরোগ্যলাভের পর গোলাপ-মা ও যোগীন-মার সঙ্গে ললিত-বাবুর গাড়ীতে মাকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হত। ঐ সময়ে একদিন মিনার্ভা থিয়েটারে 'পাণ্ডবগৌরব' অভিনয়কালে দেবীমূর্তির আবির্ভাব দেখে এবং "হের হরমনোমোহিনী" ইত্যাদি সুললিত গান শুনে শ্রীমা সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

উদ্বোধনে আসার পর মা একদিন লক্ষ্মী দত্ত লেনের দত্তগৃহে যতীন মিত্রের কীর্তন শুনতে যান। সেদিন মাথুর-কীর্তন হচ্ছিল। কীর্তনের ভাব ও সঙ্গীতের মাধুর্যে চিকের ভিতর স্ত্রী-ভক্তদের মধ্যে উপবিষ্টা শ্রীমা অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মাথুর-কীর্তন বিরহে পূর্ণ। অন্যত্র যেতে হবে ব'লে কীর্তনীয়া যতীনবাবু বিরহের মধ্যেই গান সমাপ্ত করছেন দেখে ভাবাবস্থায় শ্রীমা গোলাপ-মার দ্বারা ব'লে পাঠালেন যে,

কীর্তনটি মিলনে শেষ করা উচিত। যতীনবাবু মিলন গেয়ে গান শেষ করলেন। এদিকে মিলন-গানের ভাব, তানলয় ও স্বরমাধুর্যে এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হল যে, গানের শেষে মা সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। ভাবাবস্থার সহিত পরিচিত বুদ্ধিমতী গোলাপ-মার শ্রীমায়ের অবস্থা বুঝতে বাকী রইল না। তিনি মার হাত ধ'রে কোনরকমে গাড়ীতে তুললেন। উদ্বোধনে ফিরে এসেও মা ঠাকুরঘরে নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। সে রাত্রে মার মন কোনরকমেই বাহ্যভুমিতে নামছে না দেখে জনৈক সেবক মায়ের কানের কাছে 'মা' 'মা' ব'লে ডাকতে লাগলেন। ছেলের ডাকে মায়ের মন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

একবার বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সন্ধ্যার পর শ্রীমা, গোলাপ-মা ও যোগীন-মা ছাদে বসে ধ্যান করছিলেন। যোগীন-মার ধ্যান ভাঙ্গলে তিনি দেখেন, শ্রীমা তখনও একভাবে বসে আছেন—স্পন্দহীন, সমাধিস্থা। অনেকক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় মা বলতে লাগলেন "ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই?" সহচরীদ্বয় তাঁর হাত পা টিপে দেখাতে লাগলেন, "এই যে পা, এই যে হাত।" তবু তাঁর দেহবোধ আসতে বহু সময় লেগেছিল।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে কালাবাবুর কুঞ্জে একদিন ধ্যান করতে করতে শ্রীমা গভীর-সমাধিমগ্ন হন। সমাধি কিছুতেই ভাঙ্গে না। যোগীন-মা অনেকক্ষণ নাম শোনালেও ব্যুত্থানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে যোগানন্দ মহারাজ এসে নাম শোনালে সমাধির একটু উপশম হ'ল; এবং ঠাকুর সমাধিভঙ্গে যেমন বলতেন শ্রীমাও তেমনি বললেন, "খাব"। কিছু খাবার, জল ও পান তাঁর সামনে ধরলে ঠাকুরেরই মতো একটু একটু খেলেন। এমনকি ঠাকুর যেমন পানের সরু দিকটা কেটে ফেলে দিয়ে খেতেন, শ্রীমাও ঠিক সেইভাবে খেলেন। সে-সময় মার ভাবভঙ্গি খাওয়াদাওয়া সবই হুবহু ঠাকুরের মতো হয়েছিল।

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

এখন বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা মাতৃমূর্তির দর্শনে কৃতার্থ হবো আমরা। শ্রীশ্রীমায়ের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, "মাড়োয়ারী ভক্ত (লছমীনারায়ণ) যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাইলে তখন আমার মাথায় যেন করাত বসিয়ে দিলে; মাকে বললুম, 'মা, মা, এতদিন পরে আবার প্রলোভন দেখাতে এলি?' সেই সময় ওর মন বুঝবার জন্য ডাকিয়ে বললুম, 'ওগো, এই টাকা দিতে চায়। আমি নিতে পারব না বলায় তোমার নামে দিতে চাইছে। তুমি ওটা নাও না কেন? কি বল?' শুনেই ও বললে, 'তা কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলে ও টাকা তোমারই নেওয়া হবে; কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে খরচ না ক'রে থাকতে পারব না; ফলে ওটা তোমারই নেওয়া হবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য; কাজেই টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।' ওর ঐ কথা শুনে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

একদিন দিনের বেলায় ঠাকুর শ্রীমাকে পান সাজতে ও বিছানা ঝেড়ে ঘরখানি পরিপাটি ক'রে রাখতে ব'লে শ্রীশ্রীজগদম্বাদর্শনে ৺কালীমন্দিরে গেলেন। ক্ষিপ্রহস্তে মা গৃহকার্য প্রায় শেষ করেছেন, এমন সময় ঠাকুর মাতালের মতো টলতে টলতে শ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?"

শ্রীমা উত্তর দিলেন, "না, না, মদ কেন খাবে? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।" ঠাকুর আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "ঠিক বলেছ" আর আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন।

অনুরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমরা পাই ঠাকুরের পাণিহাটির উৎসবে যাওয়ার সময়। ঠাকুর জনৈক স্ত্রীভক্তকে বলেছিলেন, "তোমরা তো যাচ্ছো; যদি ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক।" ঐ কথা শু'নে মা উৎসবে যোগদানের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। উৎসবান্তে ফিরে এসে ঠাকুর বলেছিলেন, 'ও খুব বুদ্ধিমতী।' স্ত্রীভক্তেরা মাকে ঐ কথা শোনালে মা বলেছিলেন যে, মায়ের যাওয়া-না-যাওয়ার মীমাংসার ভার ঠাকুর নিজে না নিয়ে তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়াতেই মা বুঝেছিলেন যে ঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে, মা যান।

শ্রীশ্রীমায়ের লীলাগাথা শেষ করা আমার মতো অকিঞ্চনের পক্ষে অসম্ভব। মায়ের লীলা এখনও শেষ হয়নি। আমার মনে হয়, সবে শুরু হয়েছে। প্রবন্ধ শেষ করতে হবে—তাই মায়ের অন্তিম উপদেশের উল্লেখ ক'রে উপসংহার করছি। লীলাসংবরণের মাত্র পাঁচ দিন বাকী। জনৈক স্ত্রীভক্ত (অন্নপূর্ণার মা) মাকে দেখতে এসেছেন, কিন্তু ভিতরে যেতে নিষেধ থাকায় ঠাকুরঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ পাশ ফিরে মা তাঁকে দেখেই ইশারা ক'রে কাছে ডাকলেন। অন্নপূর্ণার মা কাছে গিয়ে প্রণাম ক'রে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "মা, আমাদের কি হবে?" করুণাবিগলিত ক্ষীণ কণ্ঠে অভয় দিয়ে মা থেমে থেমে বললেন, "ভয় কি? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কি?" একটু পরে আবার ধীরে ধীরে বললেন, "তবে একটি কথা বলি, যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার ক'রে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।" যাঁদের দুঃখে বিচলিত হয়ে ৺অভয়া শরীরপরিগ্রহ ক'রে স্বয়ং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করলেন, সেই আর্তদের প্রতি এ-ই মায়ের শেষ বাণী।

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা ব্যতীত বিমূঢ় বিভ্রান্ত মানুষের আর কোনও গতি নেই। তাই শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আকুল প্রার্থনা—যেন আমাদের উপর মায়ের শুভাশিস এবং কৃপাবারি সতত বর্ষিত হয় যাতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রদর্শিত মহত্তম জীবনাদর্শ অবলম্বনে জীবনপথে এগিয়ে যেতে পারি আর অজ্ঞান-অন্ধকারে জ্ঞানালোকের সন্ধান পেয়ে আমাদের দুঃখময় জীবনকে মধুময় করতে পারি।*

* স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থ হইতে সংকলিত।—সঃ

সমালোচনা

মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর: শ্রীজগন্নাথ মাইতি। প্রকাশক: শ্রীঅশোককুমার মাইতি, মনসাদ্বীপ, সাগর, ২৪ পরগণা। (১৯৭৬), পৃষ্ঠা ১২২+৪, মূল্য চার টাকা।

'সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর একবার'—এই প্রবাদবাক্যের মধ্যেই ফুটে উঠেছে গঙ্গাসাগর সম্বন্ধে বাইরের লোকের ভীতি ও অজ্ঞতা। তাদের অনেককেই বলতে শোনা যায় গঙ্গাসাগর মেলার জায়গাটুকু সারাবছর সমুদ্রেই ডুবে থাকে, মেলার তিন দিন জেগে ওঠে। মেলার পর যদি কেউ ওখানে থাকে—সে যাবে হয় সমুদ্রগর্ভে, নয় বাঘের পেটে,

না হলে শেষ পর্যন্ত সে মরবে সাপের কামড়ে। এখন বছর বছর যাত্রীর সংখ্যা যদিও বাড়ছে—এক লক্ষ থেকে দুই লক্ষ, দুই থেকে এখন বোধ হয় তিনে দাঁড়িয়েছে, যাতায়াতের অনেক সুবিধা হয়েছে—তবু যদি বলা যায়, 'বছরে যে কোন সময় আপনি গঙ্গাসাগরে স্নান ক'রে কপিলমুনির মন্দিরে দর্শন ক'রে সুস্থ শরীরে বাড়ি ফিরতে পারেন,'—এ কথা অনেকেই বিশ্বাস করবেন না।

বর্তমান সমালোচকের সৌভাগ্য হয়েছিল ঐ পুণ্যভূমিতে চারবছর থাকবার এবং বর্তমান লেখকের সঙ্গে সময়ে-অসময়ে গঙ্গাসাগরে স্নান করার সুযোগও হয়েছিল। কখন বৈশাখে—কখন ভাদ্রে; পৌষ সংক্রান্তিতে কথাই নেই—দলবল নিয়ে। তাই যখন 'মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর' বইখানি পেলাম, এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। তীর্থমাহাত্ম্য ছাড়াও লেখক কতকিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ ক'রে ছোট্ট বইখানি সমৃদ্ধ করেছেন। এজন্য সাগরদ্বীপের বাইরের লোকেরা তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে, আর সাগরদ্বীপের মানুষরা তো তাঁকে এখনি ধন্য ধন্য ক'রছে। তাদের দেশের কথা—তাদের ইতিহাস, তাদের ভূগোল, তাদের পথঘাট, শিক্ষা, শাসনব্যবস্থা, সবকিছু সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এই বইটিতে। জগন্নাথবাবু নিজে শিক্ষক—তিনি জানেন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা ও জিজ্ঞাসা—তারই বিবর্ধনে তিনি জেনেছেন, সাধারণ পাঠকরা কি জানতে চান। বহুদিন ধ'রে ভেবেছেন এ বিষয়ে—অনেক পরিশ্রম ক'রে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন—একদিকে পুরাণ কাব্য ও সাহিত্য থেকে, অন্যদিকে আবার সরকারী কাগজপত্র রেকর্ড গেজেট থেকে। একটি মানচিত্র ও কতকগুলি আলোকচিত্র দেওয়াতে বইখানির ব্যাবহারিক মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। সাগরদ্বীপ একটি ছোটখাটো দেশ। সেখানকার অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তা কৃতিত্ব সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন জগন্নাথবাবু, কারণ তিনি যে ঐ দেশেরই মানুষ, ওখানকার মাটির সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ।

সাগরদ্বীপ সম্বন্ধে প্রচলিত অজ্ঞতা দূরীকরণে বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। বইখানির বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ প্রয়োজন, কারণ বঙ্গদেশে গঙ্গাসাগরই একমাত্র সর্বভারতীয় তীর্থ, যেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হন।

স্বামী নিরাময়ানন্দ

শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া বন্দনা : নীলিমা দেবী। প্রকাশক : শ্রীদুর্গাশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পি-১২ সি. আই. টি. স্কীম ৬৪, মনমোহন বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। (১৩৮১) পৃষ্ঠা ১৬০, মূল্য সাত টাকা।

বাঙালীর হৃদয়ের মণিকোঠায় ভগবান শ্রীচৈতন্য অক্ষয় স্থান অধিকার ক'রে আছেন। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে বহু সাহিত্য ও শিল্প গড়ে উঠে জাতির জীবনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর অতুল ভাব-ভক্তি এবং ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহিমা বহুলভাবে কীর্তিত, যা চিরকাল পৃথিবীর মানুষকে দিব্য জীবন লাভ করার প্রেরণা যোগাবে। ঈশ্বর যখন এই পৃথিবীতে মানবের রূপ পরিগ্রহ ক'রে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি পদক্ষেপ জগৎকল্যাণে হয়ে থাকে। তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে আসেন লীলাসহচররূপে। ভগবান শ্রীচৈতন্যের লীলাসঙ্গিনী শক্তিস্বরূপিণী অবতীর্ণা ভগবতী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিঃসন্দেহে সামান্যা নারী নন। কিন্তু দুর্ভাগ্য

এই যে, তাঁর জীবন-কাহিনী নিয়ে সমকালীন লেখকেরা স্বল্পই আলোচনা করেছেন। অন্য কথায়, তিনি আমাদের ধর্মীয় সাহিত্যে একান্তই উপেক্ষিতা এবং জনসমাজে স্বল্প পরিচিতা। তথাপি সুখের কথা এই যে, বৃন্দাবন দাস ও জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের জীবনী রচনা করতে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা কিছু উল্লেখ করেছেন এবং সেই তথ্যকেই অবলম্বন ক'রে বর্তমান লেখিকা শ্রীচৈতন্য-বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে এই নাতিদীর্ঘ উপভোগ্য বন্দনা-গাথা রচনা করেছেন। শ্রীরাধিকার জীবনে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বই আর কোনো ভাবনার স্থান ছিল না, তেমনি বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনেও শ্রীচৈতন্যবিহীন অন্য চেতনা ছিল না। শ্রীভগবানকে স্বামিরূপে লাভ ক'রে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণা, আর যেদিন থেকে শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসীর ব্রত নিয়ে চলে গেলেন, সেইদিন থেকে তাঁর বিরহকাতর প্রাণে শ্রীচৈতন্যই হয়ে রইলেন একমাত্র ধ্যেয় বস্তু।

শ্রীমতী নীলিমা দেবী অত্যন্ত রমণীয় ভাষায় ও ভঙ্গীতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অলৌকিক প্রেমসম্পর্কের কথা বিবৃত করেছেন, যা একই সঙ্গে মানবীয় এবং অতি-মানবীয়। বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর প্রেমাস্পদকে নিজের কাছ থেকে বহু দূরে সন্ন্যাসের বন্ধুর শ্বাপদসঙ্কুল পথে ছেড়ে দিতে চাননি, কিন্তু অবতারপুরুষ তাঁর প্রেমের দাবীতেই স্ত্রীর কাছ থেকে এই কঠিন সম্মতি আদায় করেছেন। উপন্যাসের চেয়েও অনেক মনোরম এই কাহিনী লেখিকা আমাদের উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। উপকরণের অভাবে তিনি কাহিনীকে আর বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি, কিন্তু আমাদের মনে এই আগ্রহ জাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন যে, তাঁদের যুগ্ম-জীবন সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে পেলে ভালো হ'ত।

গ্রন্থের প্রচ্ছদপট, বাঁধাই ও ছাপা ভালোই বলতে হয়। গ্রন্থটি ধর্ম-পিপাসু ও সাহিত্য-পিপাসুদের অকৃত্রিম আনন্দ দান করবে বলেই আমার বিশ্বাস। **শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত**

রামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি (২য় খণ্ড): শ্রীধ্রুব চৌধুরী। প্রকাশিকা: শ্রীমতী আরতি চৌধুরী, পি ২২৮, সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা-১০। (১৯৭৭), পৃষ্ঠা ৮+৫৮+ ২, মূল্য ছয় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে একটি গুরুবন্দনা সহ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর উদ্দেশে রচিত মোট ২৮টি গানের স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। রামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি, ১ম খণ্ডের গানগুলি ছিল রাগাশ্রয়ী, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটির গানগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ সুরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং গানগুলিতে কয়েকটি নতুন রাগের ব্যবহার করাও হয়েছে, যেমন: শুদ্ধ কল্যাণ, সাহানা, কালিংড়া, আহির ভৈরব, পিলু, ইমন এবং ইমন কল্যাণ। এ ছাড়া অন্য কয়েকটি গানে আবার বাউল, ভাটিয়ালী ও কীর্তন গানের আমেজ পাওয়া যায়। ভাষা, ভাব এবং সুরের দিক দিয়ে বিচার করলে সব গানগুলিই রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা চলে এবং গানগুলি স্বভাবতই ভক্তদের উদ্দীপিত করবে। আমরা আন্তরিকভাবে গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মিশন

ঘূর্ণিবাত্যা সেবাকার্য

আবেদন

সম্প্রতি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অস্বাভাবিক ঝড়, বৃষ্টি ও ঘূর্ণিবাত্যার ফলে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি, বিপর্যয় ও জীবনহানি ঘটিয়া গিয়াছে জনসাধারণ তাহা অবগত আছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন তাহার সীমিত সামর্থ্য লইয়া ইতোমধ্যেই তামিলনাডু ও অন্ধ্রের বিপন্ন জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। আপাততঃ তামিলনাডুর তিরুচি জেলায় মনিপ্পারাই তালুকের ৬টি গ্রামের দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে রান্নাকরা খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা হইতেছে। বস্ত্রাদি বিতরণ ও গৃহনির্মাণও আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে আছে।

অন্ধ্রের হায়দ্রাবাদ ও রাজমহেন্দ্রী আশ্রমদ্বয়ের পরিচালনায় ঐ প্রদেশের দুর্গত অঞ্চলেরও ব্যাপক সেবাকার্য শুরু করা হইতেছে। এই সেবাকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনমত আরও বৃহত্তর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সেবাকার্য পরিচালনা করার জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ এবং সাহায্যদ্রব্য দান করিয়া আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে উদারহৃদয় জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সকলপ্রকার দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

এতদুদ্দেশ্যে প্রেরিত চেক্ ও ড্রাফ্ট্ "রামকৃষ্ণ মিশন" এই নামে লিখিবেন এবং "একাউন্ট পেয়ী" করিয়া দিবেন।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা

১। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১-২০২

২। রামকৃষ্ণ মিশন, নিউ দিল্লী ১১০-০৫৫

৩। রামকৃষ্ণ মিশন, খার, বোম্বাই ৪০০-০৫২

৪। রামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ ৬০০-০০৪

৫। রামকৃষ্ণ মঠ, ৭৪। বি, মার্কেট স্ট্রীট, সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ ৫০০-০০৩

৬। রামকৃষ্ণ মিশন, বীরভদ্রপুরম্, রাজমহেন্দ্রী ৫৩৩-১০৪

৭। রামকৃষ্ণ আশ্রম, জগন্নাথ স্ট্রীট, রাজকোট ৩৬০-০০১

৮। রামকৃষ্ণ আশ্রম, বুল টেম্পল্ রোড, ব্যাঙ্গালোর ৫৬০-০১৯

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

বেলুড় মঠ, হাওড়া
তারিখ ২৪. ১১. ৭৭

উদ্বোধন পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

কার্ত্তিক সংখ্যা উদ্বোধন সব গ্রাহকের জন্যই গত ২৯শে ও ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৭, যথারীতি গিরিশ ঘোষ এ্যাভিনিউ পোস্ট আফিসে ডাকে দেওয়া হইয়াছিল। ১লা নভেম্বর সন্ধ্যায় ফোনে সংবাদ আসে যে ৫৮।৪-এ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে একটি দোকানে উদ্বোধন পত্রিকা বিক্রয় হইতেছে। তৎক্ষণাৎ উদ্বোধন কার্যালয়ের কয়েকজন কর্মী সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন স্থানীয় কয়েকজন যুবক দোকানদারকে এবং যে লোকটি তিনটি ব্যাগ ভর্তি পত্রিকাদি লইয়া দোকানদারের নিকট সেগুলি বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল তাহাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। নারকেলডাঙা থানায় খবর দেওয়া হইলে একজন পুলিশ অফিসার দুইজন কনেস্টবলসহ সেখানে আসেন এবং দোকানদারকে ও যে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল তাহাকে থানায় ধরিয়া লইয়া যান। ব্যাগ প্রভৃতিও লইয়া যান। ব্যাগগুলির ভিতর ২৯শে ও ৩১শে অক্টোবর ডাকে দেওয়া কার্ত্তিক সংখ্যা উদ্বোধন ২৮৭ খানা পাওয়া যায়; মেডিক্যাল জার্নাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেজেট এবং চিঠিপত্রও পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় ব্যাগটি দেখিতে পোস্ট অফিসের ব্যাগের মতো। যে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল থানার ও. সি.-র জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বলে যে, সে শিয়ালদহ স্টেশন হইতে ঐগুলি চুরি করিয়া আনিয়াছে। থানার ও. সি. দোকান-দার ও বিক্রেতাকে আটকাইয়া রাখেন এবং থানার পক্ষ হইতে উহাদের নামে মামলা করিবার নির্দেশ দেন। মামলার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকা ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রতিমাসেই এরূপ হইয়া আসিতেছে—পত্রিকা ডাকে দেওয়া সত্ত্বেও ১৫০, ২০০, ৩০০, কখনো বা ততোধিক পত্রিকা গ্রাহকগণ পান না, আমাদের নিকট অভিযোগ আসে, দ্বিতীয় বার পত্রিকা পাঠাইতে হয়; তাহাও সব সময় পান না। গত কয়েক বৎসরে কয়েকবার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল-এর নিকট বিষয়টি জানানো হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই। পূর্বোক্ত ঘটনাটিও তাঁহাকে জানানো হইয়াছে—আশা করি এখন হইতে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে আমরা এবং গ্রাহকগণ অযথা দুর্ভোগ ও অনর্থক অতিরিক্ত ব্যয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাই। পত্রিকা না পাইয়া বহু গ্রাহকের ধারণা হইয়াছে যে, আমরা যথা সময়ে পত্রিকা ডাকে দিই না; আশা করি তাঁহাদের এ ভুল ধারণা আর থাকিবে না।

২।১২।৭৭

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ
কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারত: সাম্প্রতিক ঘূর্ণিবাত্যায় তামিল-নাডুতে অন্যতম প্রধান আক্রান্ত স্থান মানাপ্পারাই তালুকে রামকৃষ্ণ মিশনের মাদ্রাজ কেন্দ্র গত (৬ই নভেম্বর ১৯৭৭) ত্রাণকার্য শুরু করে। প্রথম তিন দিন রান্না-করা খাদ্য বিতরণ করিয়া পরে ১ টি গ্রামের বিপর্যস্ত অধিবাসীদের মধ্যে চাউল, রান্না করিবার বাসন-কোসন, শাড়ি, ধুতি, শিশুদের পোশাক ও ঔষধপত্র বিতরণ করে। ক্ষতিগ্রস্ত গৃহগুলির পুনর্নির্মাণের দায়িত্বও গ্রহণ করা হইয়াছে।

রাজামহেন্দ্রী কেন্দ্র অন্ধ্র-প্রদেশের বিজয়-ওয়াডা ও গুণ্টুর অঞ্চলে ত্রাণকার্য আরম্ভ করিয়াছে।

বাংলাদেশ: বাগেরহাট দিনাজপুর নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগীদের চিকিৎসা অব্যাহত আছে। ঢাকা ও নারায়ণ-গঞ্জ কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধ-বিতরণও অব্যাহত আছে।

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া: রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রমের ১৯৭৫-৭৬ সালের কার্য-বিবরণীর সারসংক্ষেপ:

সারা বৎসর আবাসিক বিদ্যার্থিগণের সংখ্যার গড় ছিল ৯২। তন্মধ্যে ৭৬ জন ছিল বিনা খরচে ও ১০ জন অর্ধেক খরচে। আশ্রমের কার্যে বিদ্যার্থিগণের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসনীয়। ধান্যরোপণ এবং ৬ একর জমির অর্ধেক ফসল সংগ্রহকার্যে তাহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে পাশের হার অন্যান্য বৎসর হইতে অনেক ভাল। আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ডঃ রাজেন্দ্র লাল নাথ পিএইচ. ডি. (লণ্ডন) জীব-রসায়নে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'Practice of Bio-chemistry in Clinical Medicine' নামক গ্রন্থের লভ্যাংশ তিনি বিদ্যার্থী আশ্রমকে দান করিয়াছেন।

আশ্রমে কর্মভিত্তিক শিক্ষা বিভাগের উৎপাদন বাড়িয়াছে। এই বিভাগের সম্পূর্ণ আয় দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের সাহায্যে ব্যয়িত হয়। পশুশালার পশুসংখ্যা ৩৭। ব্যাপকভাবে মৎস্য-চাষ আরম্ভ করা হইয়াছে। ফলবাগান, সব্জী-বাগান ও সাধারণ চাষ হইতেও উৎপাদন সন্তোষজনক।

বুক-ব্যাংকে ২১০০ টাকার পাঠ্যপুস্তক সংযোজিত হইয়াছে।

প্রতিবৎসরের ন্যায় বিদ্যার্থী আশ্রমে কালী-পূজা, সরস্বতীপূজা, বিদ্যার্থীব্রত হোম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ-গণের জন্মতিথি এবং ২৪শে ডিসেম্বর শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের আশ্রমে শুভ পদার্পণ স্মরণে বার্ষিক উৎসব এবং খ্রীষ্টমাস ঈভ পালিত হয়।

প্রশস্ত সভাগৃহে সর্বসাধারণের জন্য সাপ্তাহিক ধর্মীয় আলোচনা এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতানুষ্ঠান, ছায়াছবি-প্রদর্শন ইত্যাদি হয়।

সর্বসাধারণের জন্য পরিচালিত পুস্তকাগার ও অবৈতনিক পাঠাগারে বহুসংখ্যক পাঠক পড়িতে আসেন। ৫০০ নূতন বই এবং কারিগরী বিদ্যাবিষয়ক কিছু বিদেশী সাময়িক পত্রপত্রিকা এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

ইহার অন্য একটি কর্মবিভাগ 'রামকৃষ্ণ মিশন

শিল্পপীঠ'। সরকারী সাহায্যে পরিচালিত এই বহুমুখী শিল্প বিদ্যালয়ে সিভিল, ইলেক্‌ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চার বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স পড়ান হয়। মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৮০। শিল্পপীঠের নিজস্ব গ্রন্থাগারে ৭০০০ বই আছে। ৫টি দৈনিক পত্রিকা ও ৬টি সাময়িক পত্রিকাও ছিল।

আলোচ্য বর্ষে মোট সাধারণ দান ৫০,৫৪৭·৯৫ টাকার মধ্যে অর্ধেকেরও প্রাক্তন ছাত্রগণ কর্তৃক প্রদত্ত।

কোয়াম্বাতুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৭৫-৭৬ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় ৪০০ একর জমির উপর অবস্থিত এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটিতে চৌদ্দটি শিক্ষায়তন, একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থশালা ও পাঠাগার, একটি চিকিৎসালয় এবং একটি মুদ্রাযন্ত্র আছে। আলোচ্য বর্ষে উহাদের কার্যাবলীর সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়: ছাত্রসংখ্যা ১৯৫। আবশ্যিক বিষয়ের অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় ছিল: বীজগণিত ও জ্যামিতি, রসায়ন এবং প্রযুক্তিবিদ্যা।

(২) শিক্ষক-শিক্ষণালয়: ছাত্রসংখ্যা ২৭। দুই বৎসরের শিক্ষাক্রম। বহু শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বেকার থাকায় আলোচ্য বর্ষে তামিলনাডু সরকার ভর্তি নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

(৩) স্বামী শিবানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়: গ্রামের বালক-বালিকাদের জন্য পরিচালিত। ছাত্রসংখ্যা ২৩৪ এবং ছাত্রী-সংখ্যা ৩৮। ঐচ্ছিক বিষয়: বীজগণিত ও জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং ইতিহাস। বিনা খরচে ৩৫টি ছাত্রছাত্রীকে মধ্যাহ্নের আহার এবং ৩৫টি ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়-নির্দিষ্ট পোশাক দেওয়া হয়।

(৪) টি. এ. টি. কলানিলয়ম সিনিয়র বেসিক স্কুল: ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৫২, তন্মধ্যে ছাত্রী ১৭৮। বিনা খরচে ১৬০টি ছাত্রছাত্রীকে মধ্যাহ্নে আহার এবং ৪০টি শিশুকে বিদ্যালয়-নির্দিষ্ট পোশাক দেওয়া হয়। ইহার সহিত একটি প্রাক্ বুনিয়াদী (নার্সারী) স্কুলও আছে।

(৫) শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ: শিক্ষার্থীদের সংখ্যা: বি. এড. ১০০, শিক্ষাবিষয়ে ডিপ্লোমা ১১, এম. এড. ২৫, পিএইচ. ডি. ৬—মোট ১৪২। ১৩৪৭ জন শিক্ষকের জন্য কলেজটির সম্প্রসারিত বিভাগে ৪০টি ওয়ার্কসপ, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এম. এড. ও পিএইচ. ডি. পাঠক্রমে শিক্ষকদের গবেষণার সুযোগ দেওয়া হয়। এম. এড. পাঠক্রমের ঐচ্ছিক বিষয়: শিক্ষাবিষয়ক মনোবিদ্যার উচ্চতর পাঠক্রম, শিক্ষাবিষয়ক প্রশাসন, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা-প্রসঙ্গের ইতিহাস ও বিবর্তন। অধিকন্তু, গবেষণা ও প্রকাশন বিভাগ, মনস্তত্ত্ব ও অডিও-ভিজুয়্যাল বীক্ষণাগার—কলেজটির সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা ও প্রসারণসংক্রান্ত একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও এই কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।

(৬) কলা ও বিজ্ঞান কলেজ: ছাত্রসংখ্যা ৮০৭। প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা আছে। স্নাতক পাঠক্রমে আছে: গণিত পদার্থবিদ্যা রসায়ন ইতিহাস বাণিজ্য ও সমবায়। এম. এস্‌সি. পাঠক্রমের অন্তর্গত পদার্থবিদ্যায় ও গণিতে যথাক্রমে ইলেকট্রনিক্‌স ও পরিসংখ্যান বিশেষ বিষয় হিসাবে পড়ানো হয়। এম. এ. পাঠ্যসূচীতে সমাজসেবা অন্তর্ভুক্ত আছে।

(৭) শারীর শিক্ষা কলেজ: শিক্ষার্থীর সংখ্যা: সার্টিফিকেট ৫৯, স্নাতক (বি. পি.

এড.) ৩০, স্নাতকোত্তর (এম. পি. এড.) ৮ — মোট ৯৭। এই কলেজের অন্তর্গত শারীর চিকিৎসা বিভাগে ৪১৬টি রোগী নিরাময় হয়।

(৮) পলিটেকনিক: শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ত্রৈবার্ষিক সিভিল ও গ্রামীণ ইঞ্জিনিয়ারিং ২১৭, ষাণ্মাসিক অটোমোবিল ইঞ্জিনিয়ারিং ৩৩, কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং ও ট্র্যাকটার সারভিসিং ৬—মোট ২৫৬।

(৯) কৃষি-বিদ্যালয়: কৃষিবিজ্ঞানে দুই বৎসরের সার্টিফিকেট পাঠক্রমে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮৯।

(১০) গ্রামীণ উচ্চতম শিক্ষা কলেজ: কৃষি-বিষয়ক অর্থনীতি ও সমবায়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু আছে। ছাত্রসংখ্যা ৩২। ইহার সম্প্রসারণ ও গবেষণা বিভাগও আছে

(১১) শিল্প প্রতিষ্ঠান: টার্নিং ফিটিং ও মোল্ডিং-এর দুই বৎসরের এবং মুদ্রণবিজ্ঞানে হ্যাণ্ড-কম্পোজিং ও প্রুফ-রিডিং-এর এক বৎসরের পাঠক্রম আছে। ছাত্রসংখ্যা ৭০।

(১২) গ্রামীণ চিকিৎসালয়: চিকিৎসিতের সংখ্যা ২২,২৭৯।

(১৩) শিল্পবিভাগ: এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইলেকট্রীক মোটর, পাম্প-সেট ইত্যাদি নির্মিত হয়। কর্মিসংখ্যা ১২৬।

(১৪) বিদ্যালয়ের মুদ্রণ-যন্ত্র: এখানে শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে মুদ্রিত হয়। ১৪ জন কর্মী নিযুক্ত আছেন।

(১৫) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার: পুস্তকের সংখ্যা ৪৬,৯৩৪। পড়িতে দেওয়া হয় ১৮,৫৭২।

(১৬) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান: এখানে ছাত্রগণ টাইপ-রাইটিং শিখিতে এবং করণিকেরা নিজ নিজ যোগ্যতা বৃদ্ধি করিতে সাহায্য পায়। আলোচ্য বর্ষে ১৫ জন শিক্ষা পায়।

(১৭) বালবিদ্যালয়: আড়াই হইতে ছয় বৎসর বয়স্ক শিশুদের নার্সারী স্কুল। শিশুদের সংখ্যা ৮৩। ইহাদিগকে বিনা খরচে জলযোগ ও মাধ্যাহ্নিক আহার দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তীতে প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। প্রায় দশ হাজার ভক্ত প্রসাদ পান। এই উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

দেহত্যাগ

দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি:

স্বামী সাধনানন্দ (হরসুন্দর মহারাজ) গত ৯ই নভেম্বর (১৯৭৭) সকাল আটটায় ৭৬ বৎসর বয়সে কাশীপুর মঠে দেহত্যাগ করেন। হৃদ্‌যন্ত্রের আকস্মিক বৈকল্যই তাঁহার দেহ-ত্যাগের কারণ। কয়েক মাস পূর্বে তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়; কাশীপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি পুনরায় কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু হঠাৎ দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৬ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। ১৯২১ সালে সংঘের বাগবাজার মঠে (উদ্বোধন) যোগদান করেন। এককালে জামতাড়া কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন এবং দিনাজপুর বরিশাল বাগেরহাট ঢাকা শিলং ও কাশীপুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা করেন। শেষোক্ত স্থানে অধ্যক্ষরূপে তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে ২৫ বৎসর ছিলেন। সরলতা ও তপঃকৃচ্ছ্র জীবনের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন।

স্বামী পবিত্রানন্দ (ভূপেন মহারাজ) গত ১৮ই নভেম্বর (১৯৭৭) ভোর চারটায় ৮১ বৎসর

বয়সে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে দেহত্যাগ করেন। তিনি গত দশ বৎসর যাবৎ মস্তিষ্কের রক্তনালীর ক্রমবর্ধমান ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন এবং তাহার ফলে সন্ন্যাসরোগে তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন এবং ১৯২৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। ১৯২২ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে প্রেরিত হন। উক্ত আশ্রম এবং উহার কলিকাতার প্রকাশন-কেন্দ্রের সহিত ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৪ বৎসর যুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর অদ্বৈত আশ্রমের প্রকাশন-বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩১ সাল হইতে ৪ বৎসর পর্যন্ত 'প্রবুদ্ধ ভারত'-এর সম্পাদক হন। ১৯৩৭ সালে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হইয়া ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ৯৪৭ সালে তাঁহাকে বেলুড় মঠের ট্রাস্টি ও রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য করা হয়। ১৯৪৯ সালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির প্রধানরূপে আমেরিকায় যান এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই থাকেন।

তিনি সুবক্তা ছিলেন। অনেকগুলি নিবন্ধ ও তিনখানি ছোট বই-ও লেখেন কাজকর্ম, কথাবার্তা—সর্ব বিষয়ে নিখুঁত যথাযথতা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। ছোট বড় সকলেই তাঁহার সহিত অবাধে মিশিতে পারিত। শান্ত ও মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

বিবিধ সংবাদ

স্যাকারিন খাওয়া কি নিরাপদ ?

স্যাকারিন (Saccharin) কয়লাজাত টোলুইন (Toluene) হইতে তৈয়ারী একটি রাসায়নিক দ্রব্য। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। শর্করা অপেক্ষা প্রায় তিনশত গুণ বেশী মিষ্ট হওয়ার জন্য ইহা নানা খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার মিষ্টত্ব ছাড়া আর কোন খাদ্যমূল্য না থাকায় সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বহুমূত্ররোগী অথবা স্থূলকায় ব্যক্তি চিনির বদলে ইহা ব্যবহার করেন। তাছাড়া টুথপেষ্ট, শিশুদের সিরাপ-আকারে প্রস্তুত ওষুধ প্রভৃতি নানা দ্রব্যে ইহার ব্যবহার আছে। কিন্তু স্যাকারিন খাওয়ার নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া আজকাল সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে খবর বাহির হওয়ায় কাহারও কাহারও মনে এ বিষয়ে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে।

১৯৫০ সালের আগে পর্যন্ত স্যাকারিন খাওয়ার নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরের দেহের উপর ইহার কিছু বিষক্রিয়া দেখার ফলে ১৯৫৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একাডেমির খাদ্য-নিরাপত্তা কমিটি (Committee on Food Protection of the U. S. National Academy of Medical Sciences) মত প্রকাশ করেন যে, প্রতিদিন এক গ্রাম পর্যন্ত স্যাকারিন খাওয়া নিরাপদ। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডাতে পরীক্ষামূলকভাবে দেখান হইয়াছে যে, ইঁদুর ও অন্যান্য জন্তুর দেহে যদি অনেকদিন

যাবৎ স্যাকারিন প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ঐ সব জন্তুর মূত্রস্থলীতে টিউমার হইতে পারে। এই রকম দেখার ফলে ঐ সব দেশে স্যাকারিনের ব্যবহার সীমিত করার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

১৯৬৮ সালে এবং পরে ১৯৭৪ সালে খাদ্য-কৃষি সংস্থা এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার খাদ্য সংযোজক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ (FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) খাদ্যদ্রব্যে কি কি দ্রব্য মিশান যাইতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া স্থির করেন যে, কোন ব্যক্তি খাদ্যের মাধ্যমে শরীরের ওজনের, প্রতি কিলোগ্রাম প্রতি পনের মিলি-গ্রাম (15 mg/Kg body weight) পর্যন্ত স্যাকারিন খাইতে পারেন। কিন্তু স্যাকারিনের ক্যানসার সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সব তথ্য পাওয়া গিয়াছে, উপরি-উক্ত যুক্ত কমিটি ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :

তিনটি পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ইঁদুরকে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন ও জন্মের পর সারাজীবন খাদ্যের মাধ্যমে স্যাকারিন দেওয়ার ফলে বেশ কিছুসংখ্যক ইঁদুরের মূত্রস্থলীতে টিউমার হইয়াছে। কিন্তু আবার অন্য কিছু পরীক্ষায়, অনেক জন্তুকে জন্মের পর সারাজীবন স্যাকারিন খাওয়ান সত্ত্বেও তাদের টিউমার হয় নাই। এদিকে স্যাকারিনের যে মাতৃগর্ভে থাকা-কালীন ভ্রূণের কোনও পরিবর্তন করার ক্ষমতা আছে, তাহাও প্রমাণিত হয় নাই, এবং ক্যানসার-সৃষ্টিকারী যে সব রাসায়নিক দ্রব্য জানা আছে, তাহাদের গুণাবলী স্যাকা-রিনের মধ্যে পাওয়া যায় নাই। ফলে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে যে, পূর্বোক্ত পরীক্ষা তিনটিতে ব্যবহৃত স্যাকারিনের মধ্যে হয়তো অজ্ঞাতভাবে এমন কিছু রাসায়নিক দ্রব্য সংমিশ্রিত ছিল, যাহার ক্যানসার করিবার ক্ষমতা আছে। কিংবা এমনও হইতে পারে যে, অত্যধিক পরিমাণে স্যাকারিন খাওয়ানর ফলেই উপরি উক্ত জন্তুগুলির দেহে ক্যানসার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যে সকল বহুমূত্ররোগী নিয়মিতভাবে স্যাকারিন ব্যবহার করেন, তাঁহাদের মূত্রস্থলীতে যে বেশী ক্যানসার দেখা যায়, সমীক্ষায় এরূপ ঘটনাও ধরা পড়ে নাই। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, এই সমীক্ষা-কার্যে খুঁত ছিল এবং ইহা যথেষ্ট ব্যাপকভাবে করা হয় নাই।

এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহভাবে আলোক-পাতের জন্য কমিটি নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ দিয়াছেন। ইত্যবসরে স্যাকারিনের দ্বারা শরীরে ক্ষতিকরণের সম্ভাবনা থাকায় জন্য ইহার দৈনিক ব্যবহার কমাইয়া শরীরের ওজনের প্রতি কিলোগ্রাম প্রতি আড়াই মিলিগ্রাম (2.5 mg/Kg) করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ **যাঁহার শরীরের ওজন ৫০ কেজি, তিনি ১২ মিলিগ্রামের ১০টি পর্যন্ত স্যাকারিন ট্যাবলেট দৈনিক খাইতে পারেন।** (WHO Chronicle, July 1977, p 300-301)

উৎসব

খগৌল (পাটনা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ২৭শে মার্চ ১৯৭৭ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ পূজা হোম এবং কীর্তন হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ১৫০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন সভাপতি শ্রীসুখেন্দু-মোহন চট্টোপাধ্যায় স্বামী বেদান্তানন্দ শ্রীজনার্দন ঝা ও শ্রীবিমলেশ্বর দে। সঙ্ঘসচিব শ্রীধীরেন্দ্র

নাথ তলাপাত্র সঙ্ঘের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীসারদা সঙ্ঘ (কলিকাতা) কর্তৃক গত ৩০শে মার্চ বুধবার সকাল ৬ হইতে রবিবার ৩রা এপ্রিল বেলা ১১টা পর্যন্ত ৮ একডালিয়া রোডে, শ্রীশ্রীচিন্তাহরণ মহাদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে ১০১ ঘণ্টা অখণ্ড কথামৃত পাঠ করা হয়। এই সঙ্গে গীতাপাঠ ধ্যানজপ পূজারতি ভজনকীর্তন প্রভৃতিও হয়। শেষ দিন সাড়ম্বরে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্নভোগ দেওয়া হয়। প্রায় তিন শত মহিলা বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবাও করা হয়।

নূতন পুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা এপ্রিল ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলারতি উষাকীর্তন বিশেষ পূজা লীলাপ্রসঙ্গ- ও কথামৃত-পাঠ হয়। প্রায় ৭০০ ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ পান। চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। বৈকালে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ও শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। অন্ধশিল্পী শ্রীজটিরাম সরদার ভক্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দোমড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা এপ্রিল ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব মঙ্গলারতি স্তোত্রপাঠ প্রভাতফেরী বিশেষ পূজা প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। প্রায় ২৫০০ দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ পান। বৈকালে কথামৃতপাঠ, সন্ধ্যায় আরাত্রিক ও ভজনগান এবং রাত্রিতে শ্রীমুক্তিপদ ঘোষ কর্তৃক 'মাথুর পালা' কীর্তন পরিবেশিত হয়।

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ৮ই এপ্রিল হইতে ১০ই এপ্রিল ১৯৭৭ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া- ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা, পূজা-পাঠ ও প্রসাদ-বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দিনে সেবাসমিতির প্রাঙ্গণে স্বামী শ্রেয়সানন্দ শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র জানা ও শ্রীলক্ষ্মী-কান্ত দাস শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৮ই হইতে ১১ই এপ্রিল ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। ১০ই এপ্রিল পূজান্তে সহস্রাধিক ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। প্রত্যহ ধর্মসভা এবং তৎপরে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সৌজন্যে "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাগীতি" পরিবেশিত হয়। বিভিন্ন দিনে ধর্ম-সভায় বক্তৃতা করেন স্বামী তীর্থানন্দ স্বামী বিবিক্তানন্দ স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ স্বামী ঋদ্ধানন্দ শ্রীঅশোকমোহন চক্রবর্তী শ্রীসুনীলকুমার ভৌমিক এবং শ্রীক্রান্তিকুমার।

খুলনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গত ৯ই ও ১০ই এপ্রিল ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। ৯ই ধর্মসভায় ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী পরদেবানন্দ, প্রধান অতিথি জনাব জেড্. এম. নাসিরউদ্দিন, স্বামী অমৃতত্বানন্দ, অধ্যাপক পরমানন্দ রায়, অধ্যাপক অসিতবরণ ঘোষ ও স্বামী কালিকানন্দ। সভান্তে খুলনার শিল্পিবৃন্দ ভক্তিমূলক সঙ্গীত

পরিবেশন করেন। ১০ই ধর্মসভায় ভাষণ দেন সভাপতি শ্রীবিনোদবিহারী সেন, স্বামী অমৃতত্বানন্দ ও স্বামী পরদেবানন্দ।

রাখালচণ্ডী (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ই এপ্রিল ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, কথামৃতপাঠ এবং শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় দুইশতাধিক ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। বৈকালে ধর্মসভায় ভক্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ মণ্ডল এবং ভাষণ দেন শ্রীকিরণ চন্দ্র ঘোষাল ও সভাপতি স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ।

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচনা চক্রের উদ্যোগে গত ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। ১৬ই মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ প্রভাতফেরী বিশেষ পূজা শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। বৈকালে ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীবদ্রীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। ২৭শে প্রায় ৭০০ দরিদ্রনারায়ণকে ভোজন করান হয়। বৈকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন সভাপতি শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য স্বামী অমৃতত্বানন্দ ও স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

বচ্ছিপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসংঘ কর্তৃক গত ২১শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়। প্রভাতফেরী পতাকা-উত্তোলন গ্রাম-সাফাই বিশেষ পূজা ব্যায়াম-প্রদর্শনী প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। সন্ধ্যায় জন-সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশক্তিরঞ্জন মিশ্র। সভান্তে প্রায় ৫০০ জন প্রসাদ পান। পরে রামায়ণগান পরিবেশিত হয়।

আরামবাগ: গত ৩রা মে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন তেলোর চটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও উক্ত মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি-প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় দশ হাজার ভক্তের সমাবেশে মন্দির-প্রতিষ্ঠা ও মূর্তি-প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করেন জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। ঐ দিন বৈকালে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সম্পর্কে বক্তৃতা করেন ডঃ রমা চৌধুরী শ্রীব্রজমোহন মজুমদার শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ 'অর্ঘ্য' প্রকাশিত হয়। ঐ দিন হইতে মন্দিরে প্রত্যহ শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য পূজাদি সম্পন্ন হইতেছে।

তপন শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে গত ৪ঠা হইতে ৮ই মে ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্বামী স্বানুভবানন্দ স্বামী বিবিক্তানন্দ প্রথম চারিদিন প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বেতারশিল্পী শ্রীদিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায় প্রত্যহ রাত্রে বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম ও পাঠ হয়।

ঘোকসাডাঙ্গা (কুচবিহার) শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১০ই ও ১১ই মে ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। ১০ই মঙ্গলারতি পূজা শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও গীতা-পাঠ হয়। অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। ১১ই গীতাপাঠ ও

ধর্মালোচনার পরে দুই সহস্র ভক্ত প্রসাদ পান।

পাঁচগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে নিম্নলিখিত কর্মসূচী অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব পালিত হয়।

১৪ই মে অপরাহ্ণে ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন অধ্যাপক রেজাউল করিম। রাত্রে ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। ১৫ই অপরাহ্ণে ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন স্বামী বিবিক্তানন্দ; রাত্রে শ্রীরমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী কীর্তনগান করেন। ১৬ই প্রাতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আলোচনা হয়। রাত্রে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীগণের বিচিত্রানুষ্ঠানের পরে বাউল গান করেন শ্রীসুবোধ সাহা। ১৭ই প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ গ্রামপরিক্রমা ও কীর্তন হয়। অপরাহ্ণে ১৩।১৪ শত ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। রাত্রে কৃষ্ণযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্যামপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মণ্ডপে গত ১লা জুন ১৯৭৭, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা সারদাদেবীর স্মরণোৎসব পালিত হয়। প্রভাতী সঙ্গীত বিশেষ পূজা হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ হয়। মাণিকতলা সুধা সঙ্ঘ 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা' ও শ্রীভূপেন চক্রবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অমলানন্দ ও শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

গান্ধী কলোনী (কলিকাতা-৪০) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে জুন (১৯৭৭) শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই প্রভাতফেরী গীতাপাঠ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ পূজা হোম ও প্রসাদবিতরণ হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী নিরুত্তানন্দ। ১৯শে গীতাপাঠ শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ষোড়শোপচারে পূজা হোম প্রভৃতি হয় এবং ৭৬ জন দুঃস্থকে বস্ত্রদান করা হয়। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ও অধ্যাপক শিবশম্ভু সরকার। সন্ধ্যায় 'নৌকাবিলাস' পালা পরিবেশন করেন শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। এই দিন প্রায় আড়াই হাজার নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ পান। ২০শে সন্ধ্যায় বেলুড় জন-শিক্ষামন্দিরের সৌজন্যে 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য **জিতেন্দ্র চন্দ্র দত্ত** গত ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৭), ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজজী এবং স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজজীকে ময়মনসিংহে নিজ বাটীতে আনিয়া তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য কয়েকজন সন্তানেরও বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। ঢাকা জিলার অন্তর্গত মান্দাইল গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি পারজোয়ার হোসিয়ারী মিলস্ লিমিটেডের স্থাপয়িতা ছিলেন।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

উদ্বোধন, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা [পুনর্মুদ্রণ]

(**'অদ্বৈত আশ্রম। হিমালয়।'** রচনাটির পুনর্মুদ্রণ গত অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই শেষ হইয়াছে।)

হিমালয়ে বাঙ্গালীর উপনিবেশ।*

মস্তিষ্কবলে বাঙ্গালী পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা যে হীন নহে, তাহা শত্রু অথবা মিত্র কেহই অস্বীকার করেন না। তবে, কলমপেষা ও আইন ব্যবসা ছাড়া বাঙ্গালী অনন্যগতি কেন?—এ প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গালীর শত্রু ও মিত্র উভয়েই পুনরায় একমত হইয়া কহিয়া থাকেন—আত্মনির্ভরাভাবই ইহার একমাত্র কারণ। সেদিন জাপানে, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত উইলিয়ম্ মার্কবি সাহেব Society for staatswissenschaft সভায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতবাসীরা বিদ্যাবুদ্ধিতে, চরিত্রে ও কার্য্যদক্ষতায় যে কোন জাতির নিকট পরাভূত হন না, তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ স্বীকার করেন। অবশেষে আত্মশাসনের কথায় বলেন, একটি মাত্র গুণের অভাববশতঃ ভারতবাসীরা এখনও এ গুরু ভার বহনের উপযুক্ত হয় নাই। সে গুণটিকে তিনি দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভরের মিশ্রণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; তাহাতে কিছু "একগুঁয়েমির"ও অংশ আছে, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। এক কথায় এই গুণটিকে ইংরাজিতে "grit" কহে; জাপানবাসীদের "গ্রিটের" অভাব নাই, একথাও তিনি বলিয়াছিলেন।

বুদ্ধি ও চরিত্র সত্বেও বাঙ্গালীর আত্মনির্ভর নাই, একথা প্রথম দৃষ্টিতে বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। নির্ব্বোধ অর্থাৎ হিতাহিতবিচারশূন্য ব্যক্তিতেই কাপুরুষত্ব সম্ভব। ইষ্টলাভের পথে পশ্চাৎপদ হওয়া নির্ব্বোধের ধর্ম্ম। বাঙ্গালীর অথচ নির্ব্বোধ বলিয়া অখ্যাতি নাই। তবে কি "বাঙ্গালীর আত্মনির্ভর নাই" একথা মিথ্যা?

সর্ব্বাঙ্গীণ সত্য না হইলেও একথা "শিক্ষিত" বাঙ্গালী শ্রেণীর পক্ষে প্রায়শঃ মিথ্যা নহে। বাঙ্গালা দেশে প্রতি সহর ও সহরের আশেপাশের নিবাসীরা শতকরা প্রায় নিরানব্বই জন ম্যালেরিয়া ও ডিস্পেপ্সিয়ার জ্বালায় জর জর। জাপানে ম্যালেরিয়া ও ডিস্পেপ্সিয়ার প্রকোপ কেমন—জানিতে ইচ্ছা হয়! আমাদের মনে হয় বংশাবলীক্রমে ম্যালেরিয়া জ্বরে ও অম্বলের ব্যারামে ভুগিলে সকল জাতিরই স্নায়ুবলের সহিত "গ্রিট"ও অত্যন্তাভাবদশাগ্রস্ত হয়। সাধারণ অথবা অসাধারণ কার্য্যে ধারাবাহিকরূপে দৃঢ়তা ও আত্মনির্ভর রক্ষা করা অনেকটা স্নায়ুদৃঢ়তার অপেক্ষা করে বলিয়া বোধ হয়। ম্যালেরিয়া বা ডিস্পেপ্সিয়ার ক্রমিক দহনে শরীরের স্নায়ুসমস্ত শিথিল ও বলহীন হইয়া পড়িলে সে শরীরের দ্বারা কোন দৃঢ়তা ও সাহসের কার্য্য দীর্ঘকাল যাবৎ হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

* হিমালয়ের উত্তরপূর্ব্ব ভাগে কুমায়ুনের অন্তর্গত মায়াবতী নাম্নী পরমরমণীয় পর্ব্বতশৃঙ্গে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর অনুবর্ত্তী সন্ন্যাসী ভ্রাতৃবর্গ "অদ্বৈত আশ্রম" নামে একটী মঠ করিয়াছেন। তথা হইতে প্রকাশিত "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক মাসিক ইংরাজি পত্রের সেপ্টেম্বর সংখ্যায়, মায়াবতীতে উপনিবেশের প্রস্তাব আছে। ঐ খণ্ড পাঠ করিলে সবিশেষ জানা যাইবে (এক খণ্ড "প্রবুদ্ধ ভারতের" মূল্য তিন আনা।) হিমালয়ে উপনিবেশ সম্বন্ধে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইলে "উদ্বোধন" সম্পাদকের কেয়ারে আমার নামে রিপ্লাই কার্ড লিখিবেন।

"সনন্দ"

(পৌষ, ১৩০৮, পৃঃ ৬৮৯)

দৃঢ় স্নায়ু, সবল মাংসপেশী, ও সতেজ রক্তধারা শরীরে বিদ্যমান থাকিলে মূর্খের অগ্রণীতেও কাপুরুষতা স্থান পায় না, বুদ্ধিমানে কিপ্রকারে পাইবে? তবে যদি বুদ্ধিমান অর্দ্ধপোয়া পুরাতন বাঁক তুলসী চাউল, ও মরিচেরও ঝালশূন্য মাগুর মাছের ঝোল খাইয়া সমস্ত দিনরাত্রি আকণ্ঠ হইয়া অম্বলের উদ্গার, মাথা ধরা, বুক ধড় ধড়, অনিদ্রা প্রভৃতি অভিন্নহৃদয় বন্ধুসমষ্টিকে লইয়া বিরাজিত থাকেন, অথবা মাসের মধ্যে কুড়ি দিন ম্যালেরিয়া জ্বরে সিদ্ধ হন, তবে সে বুদ্ধিমানে দৃঢ়তাদির অবস্থিতির সম্ভাবনা কোথায়? তাহার উপর যদি কয়েক পুরুষানুক্রমে এ ব্যাপার চলিতে থাকে, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই দশা নহে কি?

আমাদের প্রবন্ধের নাম পড়িয়া কেহ যেন ঠাওরাইবেন না, আমরা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিটিকে এখনি পুঁটলি পাঁটলা বাঁধিয়া হিমালয়ে উঠিয়া আসিতে বলিতেছি। সে ইচ্ছা একান্ত থাকিলেও সে সুযোগ কোথায়? তবে আমরা একথা বলিতে চাহি যে, যে সকল শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত যুবক একদিকে কোটরগত অগ্নিমান্দ্য বা জ্বরের তাড়নায় ও অপর দিকে চাকরীর প্রত্যাশায় অথবা চাকরীর পীড়নে জীবনকে জ্বালাময় জ্ঞান করিতেছেন, হিমালয় অপেক্ষা তাঁহাদের উৎকৃষ্ট বন্ধু আর আছে কি না সন্দেহ।

হিমালয়ে স্বাস্থ্যোন্নতি সম্বন্ধে আমরা অধিক বলিতে চাহি না। আমরা স্বচক্ষে কয়েক জন ক্ষয়কাশ, হাঁপানি, ম্যালেরিয়া ও ডিস্পেপ্সিয়াক্রান্ত পুরাতন রোগীকে এক বৎসরের মধ্যে অভিনব স্বাস্থ্য, বল ও আশা লাভ করিতে দেখিয়াছি। বিশুদ্ধ বায়ু ও চিত্তচমৎকারজনক দৃশ্য এই দুইটী মহৌষধি এখানে বিনা মূল্যে যত ইচ্ছা তত পাওয়া যায়। ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমাস্থ গগনস্পর্শী, অর্দ্ধবৃত্তাকার চিরনীহারাবৃত পর্ব্বতমালা হইতে যে পবন প্রবাহিত হয় তাহাকে সাক্ষাৎ ওজঃস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্নায়ুবলসাধনে এ বায়ু অমৃততুল্য।

হিমালয়ের দৃশ্য বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। যখন প্রথম সূর্য্যকিরণ বরফের পাহাড়ে একটির পর আর একটি শৃঙ্গকে রক্তাভ করিতে করিতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সে শোভা মনকে রোগের চিন্তা হইতে অনেক তফাতে লইয়া যায়। যখন নানাবিধ গাছ, পালা, পাহাড়, বাড়ী, জীব জন্তুর আকার ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গধারী মেঘ-শ্রেণী পাহাড়ের চূড়ায় ২ প্রাতঃ বা সায়ংকালীন সূর্য্যদ্বারা রঞ্জিত হইয়া, কোন মহান জীবের ন্যায় মন্থর গমনে চলিতে থাকে; অথবা যখন উপত্যকা হইতে ঘন বাষ্পাকারে উঠিয়া, অর্দ্ধপথে পর্ব্বতরাশির মধ্যে বায়ু-বিতাড়িত শুভ্র তরঙ্গমালাপূর্ণ আলোকিত সমুদ্রের রূপ ধারণ করে ও চারিদিকে পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ-সকল ঐ মেঘ-সমুদ্রের তীরস্থ বৃক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সে দৃশ্য শরীরের অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেয়। একটি উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলে মনে হয়, যেন আমি কোন মহাসমুদ্রের একটি তরঙ্গের উপর চড়িয়া আছি, ও চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় নানাকারের স্থির তরঙ্গমালা সকল দাঁড়াইয়া আছে, এবং সকলের শেষে অর্দ্ধমণ্ডলাকারে স্বীয় বিপুল কলেবর দ্বারা ভারতের উত্তর পূর্ব্ব সীমা ঘেরিয়া অবলীলাক্রমে সকলের মস্তকোপরি বহু উচ্চে নিজ অভ্রভেদী শৃঙ্গসকল —কোনটি মন্দিরের ন্যায়, কোনটি মসজিদের ন্যায়, কোনটি গির্জ্জার ন্যায়, কোনটি কেল্লার প্যারাপেটের ন্যায় এবং আরও কত বিচিত্র বস্তুর ন্যায়—ধারণ করিয়া বরফান। এই সমস্ত

পর্ব্বতশ্রেণীরূপ তরঙ্গমালার পশ্চাতে পশ্চিম আকাশে ও বরফানের চূড়াগুলির উপর সূর্য্যাস্তের ছটা না দেখিলে বুঝা যায় না। লতা, পুষ্প, পক্ষী ও কীট পতঙ্গাদির বহুত্বের ইয়ত্তা করা যায় না। স্থানে স্থানে বাঙ্গালা দেশের বিল্ব, হরিতকী, আমলকী, আম্র, আমড়া, খেজুর, চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষসকল উপত্যকা হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পাহাড়ের উপর পাওয়া যায়, পরে আবার শীতপ্রধান দেশের ওক্, পাইন্, রোডোডেনড্রন্ প্রভৃতি বৃক্ষসকল চূড়া পর্য্যন্ত দলে দলে দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বর্ণনা করিবার শক্তি নাই,—একথা জানা থাকিলেও, আমাদের বিশ্বাস, হিমালয়ের অনন্ত শোভা বর্ণনাতীত।

* * * * *

পাঠকের মনে হইতে পারে হিমালয়ে গেলে ম্যালেরিয়া বা ডিস্পেপ্সিয়া সারিয়া শরীর দৃঢ় ও সবল হইতে পারে, কিন্তু ক্ষুধা-রোগের ঔষধ-আয়োজনের উপায় কি? আমরা এ বিষয়ে, হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহু দিবস অনুসন্ধান করিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে লিখিলাম।

উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় ও গায়ে ঠাণ্ডা জায়গায়, আলু, গম, বার্লি, হলুদ, দোকতা, লঙ্কা, আদা ও বড় এলাচ যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায়, প্রথম পাঁচটী দ্রব্য স্বচ্ছন্দে কলিকাতা পর্য্যন্ত পাঠাইয়া ব্যবসা করা চলে। ধান্য—উৎকৃষ্ট বাঁসমতি চাউল, মাস কলাই, মসুর, মটর, তিল, সরিষা, অপেক্ষাকৃত গরম অংশে ও উপত্যকায় যথেষ্ট হইয়া থাকে। আর একটি অত্যন্ত লাভের ব্যবসা আছে—জ্যামের (jam, মোরব্বা)। এখানে নিতান্ত নীচু গরম জায়গা ছাড়া প্রায় সর্ব্বত্র কিছু যত্ন করিয়া বাগান করিলে যথেষ্ট পরিমাণে আপেল, নাসপাতি, আলুবখারা, খোবানি, পিচ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফল জন্মায়। দেশে এ সমস্ত ফল পাঠান লাভজনক হয় না, অর্দ্ধেকের বেশী নষ্ট হইয়া যায়। জ্যাম করিয়া টিনে বন্ধ করিয়া বিক্রয় করিলে এই ব্যবসা অত্যন্ত লাভকর বলিয়া আমাদের ধারণা। নানা স্থানে পাহাড়ী ও ইংরাজদিগের অনেক ফলের বাগান আছে, ইহাদিগের নিকট ফল কিনিয়াও যদি জ্যামের ব্যবসা করা যায়, তাহা হইলেও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে।

পাহাড়ীরা চাষ করিতে জানে না। জমী কিঞ্চিৎ আঁচড়াইয়া (ঘাস, পালা, আবর্জ্জনা যেমন ছিল, তেমনিই রহিল) বীজ ছড়াইয়া দেয়। বাস! এই পর্য্যন্ত। আবার ক্ষেতে আসে—শস্য পাকিলে! এই প্রকারেই পুরুষানুক্রমে ইহাদের কার্য্য চলিতেছে। মাটী অত্যন্ত উর্ব্বরা বলিয়া এখনও এখানকার লোকের দিন কাটিতেছে, নতুবা অন্যথা ঘটিত।

উত্তম ফসলের জমীর সরকারী-কর প্রতি বিঘায় চারি আনারও কম। জঙ্গলাত-জমীর কর লাগে না। কেবলমাত্র চাষের ক্ষেত ছাড়া আর সমস্ত জমী জঙ্গলাত বলিয়া গণ্য হয়।

আর একটি ব্যবসা আছে—ঘৃতের। এখানে নাইনিতাল আলমোড়া প্রভৃতি সহর ছাড়া সর্ব্বত্রই টাকায় প্রায় দুই সের উত্তম ঘৃত পাওয়া যায়। কিছু দূরে, নেপাল সীমানায় "ডোটী" প্রভৃতি স্থানে তিন সের পাওয়া যায়। বন্দেজ করিয়া কারবার করিতে পারিলে, ইহাতেও লাভ হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

আরও কয়েকটি ছোট ছোট ব্যবসার সামগ্রী আছে, যেমন মৃগচর্ম্ম, মধু ইত্যাদি।

(পৌষ, ১৩০৩, পৃঃ ৩৮১)

এখানকার মজুরের রোজ দুই আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত ; দিনে নয় দশ ঘণ্টা খাটা নিয়ম।

চিররোগী ও পরাধীন হওয়ার পরিবর্ত্তে যাঁহারা সুস্থশরীর ও স্বাধীন হইতে চাহেন হিমালয়ে তাঁহাদের উপায় আছে। শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইবে, আর মোটা ভাত মোটা কাপড় মিলিবে। আবার এই প্রস্তাব লইয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত হইব, আশা রহিল।

"সনন্দ"।

রামানুজ-চরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

[১ম ভাগ, ৯ম ও ১০ম অধ্যায়ের কিয়দংশ—বর্তমান সঃ]

আসামের কথা।

বাবু প্রবোধচন্দ্র দে

[১ম বর্ষ, ২২শ সংখ্যার পর]

তেজপুর সহর দারঙ্গ (Darrang) জেলার সদর ষ্টেশন। এখানে, ডেপুটী কমিশনারের আফিস, দাওয়ানি ও ফৌজদারী আদালত, জেলা স্কুল, একসিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার আফিস, সদর জেলখানা, পাগলা গারদ ইত্যাদি জেলার সদরে যাহা যাহা থাকা উচিত, তৎসমুদায়ই এখানে আছে। এতদ্ব্যতীত, ইণ্ডিয়া জেনারেল, ও রিভার ষ্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পানিদ্বয়ের জাহাজের আফিস আছে, তেজপুর—বালিপাড়া রেলওয়ে কোম্পানিরও এইখানে হেড আফিস।

সহরের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। রাস্তা ঘাট অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথাও সামান্য ময়লা বা আবর্জ্জনা দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ করদাতাদিগের উপর ট্যাক্সের জন্য যে কোন পীড়ন আছে, তাহাও বোধ হয় না এবং কয়মাস মধ্যে তাহা শুনি নাই। মিউনিসিপাল কমিশনরগণ যে বিশেষ কার্য্যকুশল, এতদ্দ্বারা তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণেল গ্রে (Col. Gray) সাহেব জেলার ডেপুটী কমিশনর। ইনিই এক্ষণে মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান। তিনি নিজে মিউনিসিপালিটীর পক্ষ হইতে প্রতিদিন প্রাতে, ঝড়-বৃষ্টি বা প্রখর রৌদ্রের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, বেলা দশটা এগারটা পর্য্যন্ত সমুদায় সহর প্রদক্ষিণ ও পরিদর্শন করিয়া বেড়ান, এবং যেখানে যেরূপ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক, নিজেই তাহার বন্দোবস্ত করেন। অক্ষম লোকদিগের বাটী পরিষ্কার করাইবার আবশ্যক হইলে সরকারী লোক দ্বারা তাহা করাইয়া দেন, সে ব্যয়ভার করদাতাকে বহন করিতে হয় না। সহরের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে গ্রে সাহেবের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা না থাকিলে, তেজপুর সহর কখনই এতদূর পরিষ্কার থাকিত না এবং স্বাস্থ্যসম্পন্নও হইত না, একথা কেহ অস্বীকার করিবে না। তাহা ব্যতীত, যেখানে বাক্যব্যয় কম, সেখানে কার্য্যও অধিক হইয়া থাকে।

আমাদিগের কলিকাতার দয়াময়গণ একবার তেজপুর সহরের অবস্থা দেখিলে আমাদিগের কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য—করদাতাদিগকে পরামর্শ দেওয়া, এবং কার্য্যে সহায়তা করা ; আমাদিগের কার্য্যকরী দয়াময়গণ করদাতাদিগের

ছিদ্রান্বেষণে তৎপর ; এইজন্য করদাতাগণের সহিত মিউনিসিপ্যাল কর্ম্মচারিবর্গের এরূপ বৈষম্যভাব। মিউনিসিপ্যাল আইন ক্রমশঃ যতই সূক্ষ্ম হইতেছে, করদাতাগণ ততই সতর্কতার সহিত বে-আইনী কার্য্য করিতে শিখিতেছে!

মিষ্টার ডি-টীভোলী (T. W. de Tivoly) সাহেব জনৈক ইটালীদেশীয় সম্ভ্রান্তবংশীয় ধীরপ্রকৃতির লোক। ইহার সহিত আমার বিশেষ আলাপ হইয়াছিল। তিনি আমাকে যে কি কৃপার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। আমি যে কুটীরে থাকিতাম, তাহা অতি জীর্ণ। প্রায় প্রতিদিন তিনি আমার কুটীরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেন এবং আমিও প্রায় সর্ব্বদা তাঁহার বাঙ্গালায় যাইতাম। আমার কুটীরের দুরবস্থা দেখিয়া এবং আমার থাকিবার কষ্ট অনুভব করিয়া তিনি সর্ব্বদাই আমাকে তাঁহার সেই সুন্দর বাঙ্গালায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, কিন্তু সর্ব্বদা ইয়ুরোপীয় আদবকায়দা বজায় রাখিয়া সাহেবের সহিত বাস করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় অসম্ভব না হইলেও, কষ্টকর যে, সে বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং আমি তাঁহার কৃপার জন্য বারম্বার ধন্যবাদ দিয়া তথায় যাইয়া থাকিতে রাজি হইতাম না। তাঁহার সদাশয়তার কত পরিচয় দিব? একটি দিনের কথা বলিব, তাহা হইলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, উক্ত সাহেবের হৃদয় কত উচ্চ, কত প্রশস্ত! একদিবস রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় ভয়ানক, মুহুর্ম্মুহুঃ বজ্রাঘাত হইতেছে—মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। আর আমি সেই কুটীরখানির মধ্যে প্রাণ হাতে করিয়া বসিয়া আছি। এমন সময়ে সাহেবের একটি লোক আসিয়া আমাকে একখানি পত্র দিল। পত্রে লেখা ছিল :—

My dear Mr De

Your house must be very cold and damp with all this rain, and I think you may get fever if you stay there. Please come up to sleep in my spare room until we get drier weather.

Yours sincerely
T. W. de Tivoly.

উক্ত ডি-টিভোলী সাহেব তেজপুর বালিপাড়া রেলওয়ে কোম্পানীর চীফ ইঞ্জিনীয়র ও এজেণ্ট। এই রেল-কোম্পানীর লাইন বড় দীর্ঘ নহে, তেজপুর হইতে বালিপাড়া পর্য্যন্ত ২০।২৫ মাইল গিয়াছে এবং উহারই একটি শাখা বড়জুলী চা-বাগান পর্য্যন্ত গিয়াছে। রেলের বন্দোবস্ত ভাল এবং লাইনও বেশ লাভের। এই ক্ষুদ্র লাইনটী কয়েকটী চা-বাগানের মালপত্র সরবরাহ করিয়া থাকে এবং অধিকাংশ আয় ইহারই উপর নির্ভর করে। লোকজনের গতায়াত বড় কম, কারণ দেশেই লোকজন কম। এই লাইনের সুবন্দোবস্ত এবং বার্ষিক ডিবিডেণ্ট বা শতকরা মুনাফা দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। আনন্দের কারণ এই যে, কয়েকটী চা-বাগানের উপর নির্ভর করিয়া এই লাইনটী দিন দিন লাভবান হইতেছে ; আর দুঃখের বিষয় যে, কতিপয় রেলওয়ে কোম্পানী আমাদের বাঙ্গালীর হস্তে থাকিয়া যে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা অংশীদারগণের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের উপরে যে কয়টী সাহেবের বাঙ্গালা আছে, তন্মধ্যে স্থানীয় সিবিল সার্জ্জন

(পৌষ, ১৩০৪, পৃঃ ৩৯৩)

এবং ডি-টীভোলী সাহেবের বাঙ্গালা সুন্দর এবং উভয় স্থান হইতে জেলার দূরদৃশ্য অতীব মনোহর। শেষোক্ত সাহেবের বাঙ্গালাটী পাকা-বাটী এবং উহার বাগানটী অতি সুন্দররূপে রচিত। শুনিলাম, কলিকাতা হইতে কোন বিচক্ষণ উদ্যানিক আসিয়া উহা রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে অনেক রকমের গাছপালা আছে এবং ঔদ্যানিক কারুকার্য্যও আছে।

এখানে পাকা বাটী নাই বলিলেই হয়; অধিকাংশই খড়ের ঘর, দুই চারিখানায় টিনের চাল আছে। সাহেবদিগের যে সমুদায় খড়ের 'বাঙ্গালা' আছে, অট্টালিকা ছাড়িয়া তাহাতে বাস করা যায়। এই সকল বাঙ্গালা আদৌ স্যাঁৎসেঁতে বা ভিজে নহে, তাহার কয়েকটী কারণ আছে। প্রথমতঃ, জমি হইতে ছয় সাত ফুট উচ্চে তাহাদিগের মেজ; দ্বিতীয়তঃ, ঘরসকল এমনভাবে নির্ম্মিত যে, বাটীর চতুর্দ্দিকে ও মধ্যে যথেষ্ট আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, ঘরসকলের উচ্চতাও যথেষ্ট। এ সকল ছাড়া আরও একটী কারণ এই যে, সাহেবেরা যে স্থানে ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তাহার চতুর্দ্দিক উন্মুক্ত থাকে। দেশীয় লোকের যত বাটী দেখা যায়, তাহার কোনটীতে সকল সুবিধা থাকে না। স্বীকার করি, সাহেবদিগের ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে বহু অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, সুতরাং তত অর্থ ব্যয় করিয়া সাধারণ লোকে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে পারে না; কিন্তু অনেক বিত্তসম্পন্ন ব্যক্তির বাঙ্গালাও দেখিয়াছি, এবং তাঁহারা মনে করিলে সাহেবদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারেন। তাঁহারা তবে করেন না কেন? স্বাস্থ্য-রক্ষার মূল নিয়ম তাঁহাদিগের জানা নাই বলিয়া, অথবা কার্পণ্যবশতঃ। সাহেবদিগের বাঙ্গালা যে সমুদায় মালমসলায় নির্ম্মিত, দেশীয়দিগের বাড়ীও সেইসকল সরঞ্জামে গঠিত। আসাম প্রদেশের শর-বন প্রচুর, এবং যে শর জন্মে, তাহাও ৮।১০ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। এই শরকাটী দ্বারা ঘরের প্রাচীর গঠিত হইলে, উহার উপরে মৃত্তিকার প্রলেপ দেওয়া হয়। অনেকে তাহাতে, পাকা বাড়ীর ন্যায়, বালি-পলস্তারা (Plaster) দিয়া তাহার উপরে চুনকাম করিয়া থাকেন। তখন আর তাহাকে মেটে প্রাচীর বলিয়া কিছুতেই চিনিতে পারা যায় না। সে দেশে বেত গাছ যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে, সুতরাং দড়ীর কাজ বেতের দ্বারাই হইয়া থাকে। বেতের দ্বারা বাঁধাই কাজ, দড়ীর অপেক্ষা দৃঢ়, স্থায়ী ও পরিষ্কার হইয়া থাকে।

সমগ্র আসাম দেশ চা'র জন্য বিখ্যাত এবং এই চা'র আবাদ না থাকিলে আসাম দেশকে একটা বৃহৎ জঙ্গল ভিন্ন কিছু বলা যাইত না। সরকার বাহাদুরের যে কিছু রাজস্ব আদায় হয়, তাহার বোধ করি তিন-চতুর্থাংশ চা-বাগিচা হইতেই হইয়া থাকে। চা'র ব্যবসায় খুব লাভজনক, এজন্য আসাম ছাড়া ভারতের অন্যান্য অনেক স্থানে চা'র আবাদ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে দারজিলিং, হিমালয়-তরাই ডুয়ার্স, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম; পশ্চিমে আলমোড়া পার্ব্বত্য প্রদেশ, ছোটনাগপুর; দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর এবং সিংহল দ্বীপ প্রভৃতি নানাস্থানে আজকাল চা জন্মিতেছে।

চা'র উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে; কেহ আসাম 'চা' কেহ বা দারজিলিং 'চা' কেহ বা সিংহলের 'চা'র পক্ষপাতী। যাহা হউক, আসামের চা যে কোনরূপে নিকৃষ্ট তাহা বলিতে পারি না। আসাম প্রদেশে চা'র আবাদ প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(১৭তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৃঃ ৬৯৭)

পাঠকগণের অবগতির জন্য আসাম বন-বিভাগের রিপোর্ট* হইতে আমরা নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম এবং তাহা দেখিলে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, কি দ্রুতগতিতে ইহার আবাদ বাড়িতেছে।

বিগত ইং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে Sir Dietrich Brandis যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত সালে ৫৮৭,৪০৯ একার জমি চা-করদিগের হস্তগত ছিল, তন্মধ্যে ১৪৭,৮৪০ একার ভূমি আবাদে পরিণত এবং অবশিষ্ট—৪৩৯,৫৬৯ একার জঙ্গলাবৃত। কিন্তু ১৮৯৬ সালের তালিকায় দেখা যায়, ১,১৩১,৮০৭ একার ভূমি চা-করদিগের হস্তগত থাকে, তন্মধ্যে ২৯২,০০০ একার আবাদে পরিণত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উক্ত অষ্টাদশ বৎসর মধ্যে চা-আবাদের জন্য ২৪৫ বর্গ-মাইল ভূমি বাড়িয়াছে।

১৮৮৪-৮৫ খৃঃ অব্দে মোট আবাদী জমি ১,৫২৩,০০০ একার ছিল।

সন ১৮৯৫-৯৬ খৃঃ অব্দে ১,৬৯২,০০০ একার ভূমি চা'র আবাদ কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

আসামদেশে জমীর মূল্য নাই বলিলেই হয়, এবং আবশ্যক হইলে অপরিমিত ভূমিখণ্ড একস্থলেই পাওয়া যায়, এজন্য সে দেশে, অন্যান্য দেশের ন্যায় বিঘা হিসাবে মাপ না হইয়া, একার হিসাবে হইয়া থাকে। তাহা ব্যতীত একার হিসাবে মাপ হইবার আর একটী কারণ এই যে, যে পরিমাণে এক একটা বাগানের জন্য জমি আবশ্যক হয়, তাহা বিঘা হিসাবে মাপ করিতে অনেক পরিশ্রম হয়, সুতরাং তাহা লাঘব করিবার জন্য এবং অঙ্কপাতেরও সুবিধার জন্য এরূপ করা হইয়া থাকে। এক একার জমি বঙ্গীয় তিন বিঘা জমিরও কিঞ্চিদধিক। অতিশয় ক্ষুদ্রায়তনের বাগান হইলেও, হাজার বিঘার নিম্নে কোন বাগানই নাই বলিলেই হয়। দশ হাজার বিঘার বাগানও সেদেশে বিরল নহে, Borjuli Tea estate তাহার মধ্যে একটী এবং তেজপুর বা দারঙ্গ জেলায় প্রধান।

দারঙ্গ জেলার অন্তর্গত তেজপুরের এলাকাধীন যতগুলি চা-বাগিচা দেখিলাম, তাহার মধ্যে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড়জুলি টী এষ্টেট সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহার সকল ব্যাপারই অদ্ভুত। বাগিচার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলে তাহার সীমা যে কতদূর বিস্তৃত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বালিপাড়া তেজপুর রেলের মধ্যে উক্ত বাগিচার জন্যই যে শাখা লাইন গিয়াছে, তাহার ষ্টেশন ঐ বাগিচার মধ্যেই এবং সেই শাখা লাইন রাঙ্গাপাড়া ষ্টেশন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ণগতিতে রেল যখন বাগানের সীমানায় প্রবেশ করে, তখন হইতে বাগানের ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিতে প্রায় এক কোয়ার্টার লাগে। রেলের উভয় পার্শ্বে এবং যতদূর যাওয়া যায়, কেবল চা গাছ;—দেখিতেই অতি সুন্দর।

এ বাগানে কেবল আসাম চা'র আবাদ দেখিলাম। পুরাতন বাগানসমূহে (China tea) চীনের চা'র আবাদ আছে, কিন্তু এক্ষণে অনেক স্থানে তাহার পরিবর্ত্তে আসাম চা রোপিত হইতেছে। 'মণিপুর হাইব্রিড'কে আসাম চা কহে। মণিপুর দেশের চা'র সহিত

* Forest Administration Report of Assam 1897-98.

(পৌষ, ১৩৮৪, পৃঃ ৬৯৫)

চীনের চা'র যে সঙ্কর গাছ (hybrid) উৎপন্ন হয়, তাহাকে আসাম চা কহে। চীনের চা-গাছের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট এবং পত্রসকল ছোট ছোট কিন্তু গুণাংশে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আর মণিপুর চা'র গাছ বড় এবং পাতাও বড় হইয়া থাকে, সুতরাং ফলন চীনের চা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এতদুভয়জাতীয় চা'র গুণ একত্রে সমাবেশ করিবার জন্য হাইব্রিড চা সৃষ্ট হইয়াছে ; ইহা অবশ্য মনুষ্যবুদ্ধি ও ঔদ্যানিক কৌশলের পরিচায়ক। চীনের চা'র সুগন্ধ ও উত্তেজনা শক্তি অধিক, পরন্তু ফলন অতি কম। চীনজাতীয় চা'র যে সমুদায় গুণ তাহা মণিপুরী চা'র সহিত সংযোজিত হইলে নবোৎপন্ন চা যে চীনজাতীয় চা'র তাবৎ গুণ লাভ করিয়া মণিপুরী চা'র ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট গাছ হইয়া অধিক পরিমাণে ফসল প্রদান করিবে, সে বিষয়ে সংশয় কি ? উভয়জাতীয় চা'র এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্যই এক্ষণে নূতন বাগানে আসামী চা'র আবাদ হয় এবং পুরাতন বাগানেও চীনজাতীয় উঠিয়া গিয়া আসামী চা প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

আসাম চাগাছের আকার তিন চারি হস্ত বিস্তৃত হয় এবং উর্দ্ধে আট নয় হাতও হইতে দেখিয়াছি। এই যে ৮।৯ হাত উচ্চ গাছের কথা বলিলাম, তাহা ইহার স্বাভাবিক উচ্চতা, কিন্তু আবাদী ক্ষেত্রে উহাকে তিন হাতের অধিক উচ্চ হইতে কখনই দেওয়া হয় না, কারণ প্রতি বৎসরই গাছ ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং প্রতিনিয়ত উহাদিগের নবোদ্গত পত্র, পত্রকলি উঠাইতে হয়। আসাম চা'র পত্রের আকার অনেকটা গন্ধরাজ গাছের ন্যায়, কিন্তু উহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক লম্বা ও চওড়া হইয়া থাকে এবং উহার বর্ণ ঘন সবুজ ও উজ্জ্বল চিক্কণ। আর যে, চায়না টী অর্থাৎ চীনের চা, তাহার গাছ ৫।৬ হাত স্বভাবতঃ উচ্চ হয়, কিন্তু ছাঁটাছাঁটিতে দুই বা সার্দ্ধ দুই হস্তের অধিক উচ্চ হইতে পায় না। ইহার পত্রগুলি দুই ইঞ্চ লম্বা এবং পত্রের মধ্যস্থল এক ইঞ্চ মাত্র চওড়া হয়। ইহার বর্ণ ফিকে সবুজ।

আসামদেশীয় যে মৌলিক (indigenous) চা, তাহা এখনও কোথাও কোথাও পতিত স্থানে দেখা যায়, কিন্তু তাহার আবাদ হয় না। তেজপুরে কপ্‌লিন সাহেবের বাঙ্গালার অন্তর্গত হোলাতে ইহার কয়েকটী গাছ দেখিয়াছি।

চীনের ও আসামী চা'র আবাদ ও চা-প্রস্তুতের তাবৎ প্রণালী একই রকমের, সুতরাং সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই, তবে রোপণ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আসামী চা অপেক্ষা চীনের চা-গাছ ঈষৎ ঘনভাবে বসাইতে হয়।

উদ্ভিদ্ মাত্রেরই স্থানীয় প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এই কারণে কোন স্থানে একই গাছ রুগ্ন শীর্ণ হয়, আবার কোন স্থানে সবল ও পুষ্ট হয়। এবং ইহাতেই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাণিপ্রকৃতির সহিত উদ্ভিদ্প্রকৃতির সামঞ্জস্যের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। প্রাণিপ্রকৃতি বৃহৎ ব্যাপার সুতরাং সংক্ষেপ করিয়া মানবপ্রকৃতির সহিত উদ্ভিদ্-প্রকৃতির তুলনা করিলে অনেক দূর অবধি আমরা উদ্ভিদের পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিতে পারি। মানবজাতিকে যতক্ষণ চৈতন্য হইতে পৃথক্ রাখা যায়, ততক্ষণ উদ্ভিদ্ ও মনুষ্যমধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাক্, যে কথা বলিতেছিলাম। আসামের আবহাওয়া চা-আবাদের বিশেষ উপযোগী, এই জন্যই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা আসাম অঞ্চলে এত অধিক

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭৯তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮৩ হইতে পৌষ, ১৩৮৪ ; ইংরেজী : ১৯৭৭)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০-০০৩

বার্ষিক মূল্য ১২.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৭৯তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮৩ হইতে পৌষ, ১৩৮৪)

চিত্রসূচী

গোপাল

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই : মূল্য ১ম ভাগ ১২·০০। ২য় ভাগ ১১·০০
সাধারণ ১ম খণ্ড ৩·৫০; ২য় খণ্ড ৭·৮০; ৩য় খণ্ড ৫·২০; ৪র্থ খণ্ড ৭·০০; ৫ম খণ্ড ৭·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। মূল্য ২৬·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সংকলিত। মূল্য ১·৬০; কাপড়ে বাঁধাই ১·৮০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা— শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন। মূল্য ৩·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। মূল্য ২·৫০

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। (ছাপা নাই)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ (অনুবাদ : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬; সাধারণ ৬·০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৮, মূল্য ৫·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২২৯, মূল্য ৪·০০

পরমহংসদেব—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। (ছাপা নাই)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ০·৭০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। মূল্য ১ম ভাগ ৭·০০, ২য় ভাগ ৬·৫০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬। মূল্য ৬·০০ টাকা

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য—১৫·০০

শিশুদের মা সারদাদেবী, (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩·০০
[১লা জানুআরি ১৯৭৮ প্রকাশিত হইবে]

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৬·০০; ২য় ও ৩য় প্রতি খণ্ড ৮·০০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীপ্রমথনাথ বসু। ১ম ভাগ (ছাপা নাই), ২য় ভাগ—মূল্য ৪·২৫

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ছেলেদের উপযোগী। পৃঃ ৬৪, মূল্য ০·৭০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে) শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭·০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ : স্বামী মাধবানন্দ)। (যন্ত্রস্থ)

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল ১·২৫

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৩য় সং, মূল্য ২·৫০

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০,
২য় ভাগ পৃঃ ৫২৪, মূল্য ৮'০০

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—(ছাপা নাই)

ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ। (ছাপা নাই)

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

শ্রীশ্রীরামানুজ-চরিত—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। (ছাপা নাই)।

আচার্য শঙ্কর - স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬. মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ (ছাপা নাই) ; ২য় ভাগ-২'৫০

মহাপুরুষজীর পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

সৎকথা — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

অদ্ভুতানন্দ-প্রসঙ্গ — স্বামী সিদ্ধানন্দ-সংগৃহীত। (ছাপা নাই)

স্মৃতি-কথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। (ছাপা নাই)

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী— (ছাপা নাই)

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৭০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬ মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ পৃঃ ১২৮ ; সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০
৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭৬ ; মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। (যন্ত্রস্থ)

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগ মহাশয়—শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৬৩, মূল্য ০'৬৫

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২ মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

লাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা—শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৬০, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৬০

বিবিধ-প্রসঙ্গ—(ছাপা নাই)

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ। (ছাপা নাই)

তিব্বতের পথে হিমালয়ে— স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ১৮১, মূল্য ২'২৫

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন— পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। মূল্য সাধারণ ৪'০০,

অতীতের স্মৃতি—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পৃঃ ৪৬৪ মূল্য ১০'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। মূল্য ৬'০০

ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'২০

'উদ্বোধন' ১ম বর্ষ (পুনর্মুদ্রণ)। (যন্ত্রস্থ)

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত।
১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৭'৫০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ৭'৫০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪৭৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা—স্বামী ধীরেশানন্দ-সংকলিত। (ছাপা নাই)

বৈরাগ্যশতকম্—স্বামী ধীরেশানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ১'৫০

যোগবাশিষ্ঠসারঃ—স্বামী ধীরেশানন্দ। (ছাপা নাই)

বিবেকচূড়ামণি—স্বামী বেদান্তানন্দ-সম্পাদিত। (ছাপা নাই)

নারদীয় ভক্তিসূত্র—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ১৬০, মূল্য সাধারণ ৫'০০, শোভন ৭'৫০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০; ২য় অঃ ১৩'০০ ; ৩য় অঃ ১৩'০০ ; ৪র্থ অঃ ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি— পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫৮১, মূল্য ৩'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। মূল্য ৫'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ০'৫০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

বিবেকানন্দ-চরিত—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। (ছাপা নাই)

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪ মূল্য ২'০০ (যন্ত্রস্থ)

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৬২, মূল্য ০'৫০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'২৫

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩